আহকামুল কুরআন

ইমাম আল হুজ্জাতুল ইসলাম
আবূ বকর আহমাদ বিন আলী যাস্‌সাস (র)

২

অনুবাদ
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র)

আহ্কামুল কুরআন

(কুরআনের বিধান)

২য় খণ্ড

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহ্মাদ ইবনে
আলী আর-রাযী আল-যাস্সাস আল-হানাফী (রহ)

অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৮-২৯৮৪৩১, ০১৭১-৯০৭৭৮৫

আহ্কামুল কুরআন (২য় খণ্ড)

ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহ্মাদ ইবনে আলী
আর-রাযী আল-যাস্সাস আল-হানাফী (রহ)

অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯১

২য় প্রকাশ
(খায়রুন প্রকাশনী প্রথম)
রমযান ঃ ১৪২৪
কার্তিক ঃ ১৪১০
অক্টোবর ঃ ২০০৩

প্রকাশক ঃ
বেগম খায়রুন নেসা
খায়রুন প্রকাশনী
বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

কম্পোজ ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স (ওয়ালী উল্যাহ ভূইয়া)

প্রচ্ছদ ঃ মোস্তাফা নাসিরুল হক

মুদ্রণ ঃ আফতাব আর্ট প্রেস
২/১, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ২৫০.০০ টাকা

প্রসঙ্গ কথা

আল্লামা আবু বকর আল-যাস্‌সাস রচিত 'আহ্‌কামুল কুরআন' তাফসীর সাহিত্যে একটি অসামান্য অবদান। প্রায় বারো শো বছর পূর্বে রচিত এই গ্রন্থখানি তাফসীর জগতে এক অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লামা আল-যাস্‌সাস ছিলেন সেকালে হানাফী মাযহাবের অবিসম্বাদিত ইমাম। তাই এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্বভাবতই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি কুরআন মজীদের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হানাফী ফিকাহ অনুসারে সমস্যাবলীর সমাধান নির্দেশ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এক অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাদের দৈনন্দিন জীবনের তাবৎ কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। এ কারণে তাফসীর সাহিত্য হিসেবে এ গ্রন্থখানি এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ইসলামী পণ্ডিত ও আলেম সমাজেও এটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক তাফসীরখানির ভাষা অত্যন্ত সুপ্রাচীন–ক্লাসিকধর্মী; এর বাক-রীতিও বেশ জটিল। আধুনিক কোন ভাষায় এর অনুবাদ করার কাজও অত্যন্ত দুরূহ। তবু গ্রন্থটির গুরুত্ব ও উপযোগিতা বিবেচনা করে বাংলায় এর ভাষান্তরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও অনুবাদক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)। জীবনের শেষভাগে নানান কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তিনি এ কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। পুরো গ্রন্থটির ভাষান্তর সুসম্পূর্ণ করার জন্যে তিনি চেষ্টা করছিলেন প্রাণপনে। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তাই গ্রন্থের অর্ধেকের কিছু বেশি অংশের ভাষান্তর সম্পন্ন হবার পরই তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আকাংক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদ কর্মটি সুসম্পূর্ণ হতে পারেনি।

তবে মরহুম মওলানার ইন্তেকালের পর অনুবাদ কর্মের উদ্যোক্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁর অনূদিত অংশটিকে দুটি বিরাট খণ্ড রূপে প্রকাশ করে এবং বিদগ্ধ পাঠক মহলে তা যথারীতি সমাদৃতও হয়। তারপর দীর্ঘ একটি যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণের ব্যাপারে আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এদিকে গ্রন্থটির পুনঃমুদ্রণের ব্যাপারে পাঠক মহল থেকে মওলানা মরহুমের গ্রন্থাবলী প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত খায়রুন প্রকাশনীর কাছে ক্রমাগত দাবি আসতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খায়রুন প্রকাশনী আজ গ্রন্থটি পুনঃমুদ্রণের এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মওলানা মরহুমের সৃষ্টি ও অবদানকে ধরে রাখার এবং এর বাকী অংশ অনুবাদ করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমানকে দায়িত্ব দেয়ায় খায়রুন প্রকাশনী নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দুটি বিরাট খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতা ও ব্যবহারের সুবিধার দিকে বিবেচনা করে দুটি খণ্ডকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে তিন খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। বর্তমানে মুদ্রণ ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটির অঙ্গ সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ পারিপাট্য যথাসম্ভব উন্নত করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি, গ্রন্থটির এই সংস্করণও বিদগ্ধ পাঠক মহলে যথারীতি সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ গ্রন্থকার ও অনুবাদক উভয়কে এই মহতী উত্তম কর্মের প্রতিফল দান করুন।

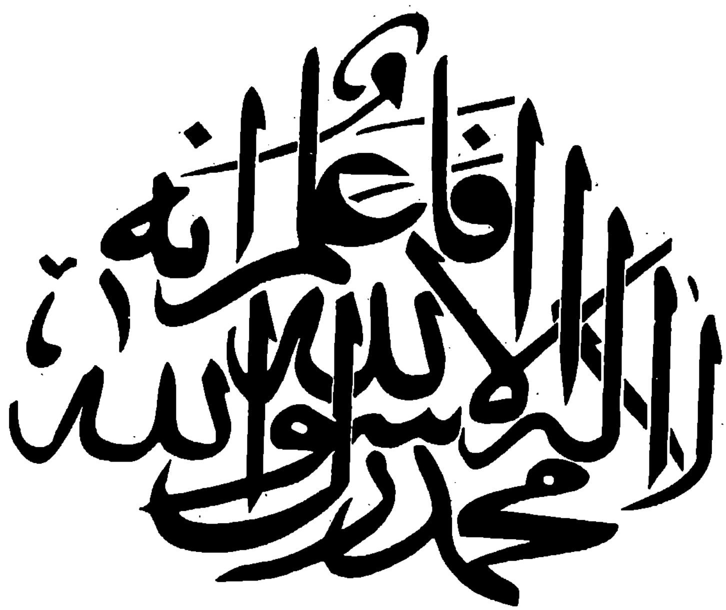
বিনয়বনত

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন

ঢাকা ঃ ১ নভেম্বর, ২০০৩

সূচীপত্র


فاعلم انه لا اله الا الله محمد رسول الله

আহ্‌কামুল কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

بسم الله الرحمن الرحيم

উমরা ফরয, না নফল

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ -

এবং আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আগের দিনের মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। হযরত আলী, উমর (রা), সাঈদ ইবনে যুবায়র ও তায়ূস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার অর্থ, সে দুটির জন্যে ইহরাম বাঁধা হবে তোমার পরিবারের ছোট্ট ঘর থেকে। মুজাহিদ বলেছেন, সে দুটিকে সম্পূর্ণ করার অর্থ সে দুটিকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া তা শুরু করার পর। সাঈদুবনে যুবায়র ও আতা বলেছেন, সে দুটি শেষ পর্যন্ত কায়েম রাখা আল্লাহ্র জন্যে। কেননা এ দুটি ওয়াজিব। মনে হচ্ছে, তাঁরা বুঝেছেন, এ দুটি করা ওয়াজি। কেননা করার আদেশ করা হয়েছে। ঠিক যেন বলেছেন, তোমরা হজ্জ কর, উমরা কর।

ইবনে উমর (রা) ও তায়ূস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা দুজনে বলেছেন, এ দুটি সম্পূর্ণ করার অর্থ দুটিকে আলাদা-আলাদা করে আদায় করা। কাতাদাতা বলেছেন, উমরা সম্পূর্ণ করার অর্থ, হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্যান্য মাসে তা করা। আর 'উমরা আল্লাহ্র জন্যে'— এর ব্যাখ্যা আল-কামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন, তা করতে গিয়ে আল্লাহ্র ঘর অতিক্রম করে যাবে না।

উমরা ওয়াজিব কিনা— এ বিষয়ে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবরাহীম নখঈ, শবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, উমরা নফল। মুজাহিদ উপরোক্ত আয়াত ঃ 'তোমরা হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর' পর্যায়ে বলেছেন, এ আয়াতে ওদুটি করার আদেশ আমাদেরকে করা হয়নি। হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর (রা), আল-হাসান ও ইবনে সিরীন বলেছেন, তা ওয়াজিব। মুজাহিদ থেকেও এইরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তায়ূস— তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, উমরা ওয়াজিব। যাঁরা উমরা ওয়াজিব বলেছেন, তাঁরা 'তোমরা হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর' আয়াত-এর বাহ্যিক অর্থকেই দলীল হিসেবে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন, ব্যবহৃত শব্দ এই তাৎপর্য বহন করে যে, সে দুটি করতে শুরু করার পর তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। আর এ দুটি কাজ শুরু করার আদেশও তাতে রয়েছে। অতএব কোন দলীল ছাড়া তা থেকে শুধু একটি কথা গ্রহণ করা যায় না।

আবূ বকর বলেছেন, হজ্জ ও উমরা দুটি‌ই ওয়াজিব বা ফরয, এমন কোন দলীল আয়াতটিতে নেই। কেননা আয়াতের তাৎপর্যে বড়জোর এটাই বলা যায় যে, সে দুটি সম্পূর্ণ করারই আদেশ

করা হয়েছে। আর তার অর্থ হচ্ছে, সে দুটির অসম্পূর্ণতা প্রতিরোধ করা, যখন তুমি তা করবে। কেননা সম্পূর্ণতার বিপরীত কথা হচ্ছে অসম্পূর্ণতা। সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাওয়া নয়। যা অসম্পূর্ণ তাকেই বলা হয় এটা সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তা থেকে যখন কিছুই পাওয়া যায় না, তখন তা বলাও হয় না। বোঝা গেল, সম্পূর্ণ করার আদেশের দাবি হচ্ছে অসম্পূর্ণ না রাখার নির্দেশ। এজন্যেই হযরত আলী ও উমর (রা) বলেছেন, ওদুটিকে সম্পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে, ওদুটির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা হবে নিজের ঘর থেকে অর্থাৎ নুকসান বা অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করার পূর্ণ মাত্রার ব্যবস্থা হচ্ছে, তার জন্যে নিজের ঘর থেকেই ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হওয়া। যা বললাম, তা-ই যখন আসল কথা, তখন মূল কথাটির তাৎপর্য হবে— ওদুটি কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখবে না। কিন্তু তা ওয়াজিব প্রমাণ করে না। কেননা এই কথা নফল ইবাদত সম্পর্কেও বলা চলে। এই জন্যেই বলা হয়, নফল হজ্জ ও নফল উমরা অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ করবে না। নফল নামাযও অসম্পূর্ণ করা যাবে না। সম্পূর্ণ করার এই আদেশ মূলত অসম্পূর্ণ না রাখার আদেশ। তাই এ আদেশ থেকে তা ওয়াজিব— ফরয প্রমাণিত হয় না।

উক্ত কথার সত্যতা যথার্থভাবে প্রমাণিত একথা থেকেও যে, নফল উমরা ও নফল হজ্জ অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ আয়াতটিতে। মূলতই সে দুটি ওয়াজিব বা ফরয— সে কথা এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না। আয়াতের শব্দ اَتِمُّوا اتْمَام অর্থ হচ্ছে, কাজ শুরু করার পর তাকে সম্পূর্ণ করা।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

এবং খাও, পান কর যতক্ষণ না তোমাদের জন্যে ফজরকালের কালো রেখা থেকে শুভ্র শ্বেত রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতঃপর তোমরা সিয়ামকে রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর।

এ আয়াতেও تمام। শব্দের ব্যবহার হয়েছে কাজ শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করার নির্দেশসহ।

ওদুটি কাজ শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করা ওয়াজিব— এই কথা বোঝান-ই তার বক্তব্য। কেননা নফল হজ্জ ও উমরা শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করাই কর্তব্য। যেন বলা হয়েছে ঃ ওদুটি শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করবে। তাই যে আয়াতের অর্থ হচ্ছে কাজ শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করা, তার অর্থ, সে কাজ শুরু করার নির্দেশ হতে পারে না। কেননা তাতে একটি আয়াতের দুই পরস্পর বিপরীত অর্থ করা। যে কথাটি কাজ শুরু করার আদেশ হিসেবে বলা হয়েছে, সেই কথাটির অর্থ তা শুরু করার পূর্বেই করা কর্তব্য— একথা বলা যায় না। তা বললে তা শুরু করার আদেশের পরিপন্থী হয়ে যাবে। যেমন, একথা বলা যায় যে, ইসলামের হজ্জ তা শুরু করলে পর বাধ্যতামূলক হয়। তেমনি একথাও বলা যায় না যে, যুহরের নামায শুরু করলে পর ফরযও বাধ্যতামূলক হয়। কাজেই হজ্জ ও উমরা শুরু করার পর তা বাধ্যতামূলক হয়— এ কথাও বলা সনবে না। তা শুরু করার পূর্বেই তা ওয়াজিব। অতএব যা বললাম, তা থেকে বোঝা গেল যে, উমরা শুরু করার পূর্বেই তা করা ওয়াজিব বা ফরয। তা যে ওয়াজিব— ফরয নয়, তা একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْعُمْرَةُ هِىَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ -

উমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও মুজাহিদ বলেছেন ঃ 'উমরা, সে তো ছোট হজ্জ'। প্রমাণিত হলো যে, 'হজ্জ' শব্দ উমরাকেও শামিল করে। এর পর-ও একটি হাদীস প্রমাণিত হয়েছে। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর— আবূ দাউদ— যহির ইবনে হরব ও উসমান ইবনে আবূ শায়বা— ইয়াযিদ ইবনে হারুন, সুফিয়ান ইবনে হুসায়ন, জুহ্‌রী, আবূ সিনান ওয়ালী, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আকরা ইবনে হাবিস নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, হে রাসূল!

اَلْحَجُّ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ اَوْمَّةً وَاحِدَةً -

হজ্জ কি প্রত্যেক বছর করতে হবে, না মাত্র একবার ?

জবাবে বললেন, না, বরং মাত্র একবার। তার বেশী যদি কেউ করে, তবে তা নফল হবে। নবী করীম (স) প্রথমোদ্ধৃত হাদীসে উমরাকে 'হজ্জ' বলেছেন। আর আকরাকে বলেছেন ঃ হজ্জ মাত্র একবার। বেশী করলে তা নফল হবে। এই কথা উমরার ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা তাকে তো 'হজ্জ' নামকরণ করা হয়েছে। আরও হাদীস তার প্রমাণ। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে'— ইয়াকুব ইবনে ইউসূফ আল-মুতাওয়াঈ— আবূ আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)— আবদুর রহমান ইবনে সুলায়মান, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে নামায ও হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করল, তা কি ফরয ? বললেন, হ্যাঁ। পরে উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তা কি ফরয (বা ওয়াজিব) ? বললেন, না, তবে তুমি যদি উমরা কর, তাহলে তোমার জন্যেই ভাল। উবাদ ইবনে কাসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে হাজ্জাজ বর্ণিত হাদীসের মতই একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে— বশর ইবনে মূসা— ইবনুল ইসফাহানী— শরীক জরীর ও আবুল আহওয়াস, মুয়াবিআতা ইবনে ইসহাক, আবু সালিহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ -

হজ্জ হচ্ছে জিহাদ। আর উমরা হচ্ছে নফল— ইচ্ছামূলক।

এই মতের আর একটি দলীল হচ্ছে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِىْ الْحَجِّ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

উমরা কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে হজ্জের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

তার অর্থ, হজ্জ উমরার বিকল্প। কেননা উমরায় করণীয় যাবতীয় কাজ হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে শামিল রয়েছে। বরং তার চাইতে বেশীও আছে। কাজেই একথা বলা যায় না যে, তার ওয়াজিব হওয়াটা হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার মত।

জাবির বর্ণিত হাদীসও তাই প্রমাণ করে। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে আদেশ করেছেন, যখন তাঁরা হজ্জের জন্যে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন যে, তাঁরা যেন উমরা করে ইহরাম ভাঙ্গেন। আর

সুরাকা ইবনে মালিক বলেছেন ঃ 'আমাদের এই উমরা কি আমাদের এই বছরের জন্যে না চিরদিনের জন্যে ? তিনি বলেছিলেন, না, চিরদিনের জন্যে। একথা জানা-ই আছে যে, এটা ছিল উমরার আমল। তা করে হজ্জের ইহরাম ভাঙ্গা হয়েছিল। যেমন হজ্জ করতে না পারলে উমরা করেই ইহরাম ভাঙ্গা হয়ে থাকে। যারা উমরাকে ফরয মনে করেন, তাঁরা একাজ দ্বারা উমরা করা হয়ে যায় বলে মনে করেন না। এ থেকে বোঝা গেল যে, উমরা ফরয নয়। কেননা তা যদি ফরয হতো তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন না যে, তোমাদের এই উমরা চিরকালের জন্যে। এ পর্যায়ে আরও খবর রয়েছে যে, এ ছাড়া তাঁদের উপর আর কোন উমরা ধার্য ছিল না।

যা করে হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করা হয় তা যে উমরা নয়, তার আর একটি দলীল হচ্ছে, যারা হজ্জ করতে পারেনি তারা যদি ইহরাম অবস্থায় পড়ে থাকত, পরে হারাম মাসসমূহে উমরা করে তা ভাঙ্গত এবং এই অবস্থায় পরবর্তী বছরের হজ্জ করত, তাহলে তার 'হজ্জ তামাত্তু' হতো না। এ পর্যায়ে চিন্তা করা হয় যে, ফরযসমূহ তো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট, যেই সময়ই তা ফরয হয়। যেমন নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। উমরাও যদি ফরয হতো, তাহলে তার জন্যে একটা সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো। যখন তার জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, সময় নির্বিশেষেই তা করা যায়, যখনই করার ইচ্ছা হয়। তখন তা নফল নামায-রোযার সমতুল্য হয়ে গেল।

যদি বলা হয়, নফল হজ্জ তো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট; কিন্তু তাই বলে তাতে তা ফরয বলে প্রমাণ হয় না।

জবাবে বলা যাবে— না, তা ফরয হয়ে যায় না। কেননা আমরা বলেছি, কোন কাজের ফরয হওয়ার শর্ত হচ্ছে, তা কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ও বিশেষীকৃত হবে। তাই যা সময়ের সাথে বিশেষীকৃত নয়, তা ফরযও নয়। কিন্তু তাতে কোন কোন নফল কাজের কোন সময়ের সাথে বিশেষীকৃত হতে বাধা হয় না, তা নিষিদ্ধও হয় না। আর কোন কোনটির নির্দিষ্ট সময় ছাড়াই হওয়া অসম্ভব নয়। তাই যে যে কাজ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ও বাঁধা নয়, তা সবই নফল। আর যা সময়ের সাথে বাধা তার কিছুটা ফরয আর কিছুটা নফল। এই পর্যায়ের দলীল হিসেবে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি আমাদের নিকট আবদুর বাকী ইবনে কানে— ইসমাঈল ইবনুল ফযল— হিশাম ইবনে আম্মার আল-হাসান ইবনে ইয়াহইয়া আল-হাসানী— উমর ইবনে কায়স— তালহা ইবনে মূসা, তাঁর চাচা ইসহাক ইবনে তালহা, তালহা ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ হজ্জ হচ্ছে জিহাদ আর উমরা নফল। আবদুল বাকী— আহমাদ ইবনে বহতর আল-আতার— মুহাম্মাদ ইবনে বকর— মুহাম্মদ ইবনুল ফযল ইবনে আতীয়াতা, সালিমুল আফতাস, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ হজ্জ হচ্ছে জিহাদ, উমরা নফল। যাঁরা উমরাকে ফরয মনে করেন, তাঁদের একটি দলীল হচ্ছে ইবনে লেহইয়াতা বর্ণিত হাদীস। তা আতা জাবির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْحَجُّ الْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ وَاجِبَتَانِ -

হজ্জ ও উমর— দুটি ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত।

আরও একটি বর্ণনা এসেছে। আল-হাসান সামুরাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَحُجُّوا وَاعْتَمِرُوا وَاسْتَقِيْمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ -

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, হজ্জ কর, উমরা কর আর সুদৃঢ় থাক। তা হলে তোমাদের জন্যে তা সুদৃঢ় হবে।

এ হাদীসে অন্যান্য কয়েকটি ফরয কাজ করার আদেশের সঙ্গে মিলিয়ে উমরা করতেও আদেশ করা হয়েছে। আর রাসূলের আদেশ তো ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূলে করীম (স) থেকে আরও একটি বর্ণনা এসেছে। তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি নামায ইত্যাদির উল্লেখ করে পরে বলেন ঃ

وَأَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ -

এবং হজ্জ করা ও উমরা করাও ইসলামের বিধান।

সবী ইবনে মা'বাদ-এর কথা ঃ 'আমি হজ্জ ও উমরাকে ফরযই পেয়েছি।' কথাটি তিনি হযরত উমর (রা)-কে বলেছিলেন। কিন্তু উমর (রা) তার প্রতিবাদ করেন নি। তাকে বলেছেন, এ দুটি একসাথে কর। বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস হচ্ছে, তিনি নবী করীম (স)-কে বলেছিলেন, 'হে রাসূল! আমার পিতা বড় বুড়ো মানুষ। হজ্জ ও উমরা করতে সক্ষম নন। উষ্ট্রযানেও সফর করতে অপারগ। তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

اُحْجُجْ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ-

তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর, উমরা কর।

জাবির বর্ণিত যে হাদীসটি ইবনে লেহ্ইয়াতা সূত্রে উমরা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে এসেছে, তা অত্যন্ত দুর্বল, খুব বেশী ভুলে ভরা। বলা হয়, তাঁর লিখিত জিনিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। পরে শুধু স্মরণ শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্মরণ শক্তিও ছিল খুবই খারাপ। পূর্বোদ্ধৃত জাবির বর্ণিত যে হাদীসে তা ওয়াজিব নয় বলা হয়েছে, তার সনদ উত্তম ইবনে লেহ্ইয়াতা বর্ণিত হাদীসের সনদ অপেক্ষা। যদি সনদের দিক দিয়ে দুটি হাদীসকে সমান ধরা হয়, তাহলে বড়জোর, দুটির মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলা যায়। ফলে দুটিই প্রত্যাহার যোগ্য। পরে অবশিষ্ট থেকে যায় তালহা ও ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদীস। এ দুটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কোন প্রশ্নকারী যদি বলেন, হাজ্জাজ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, জাবির সূত্রে বর্ণিত যে হাদীসে ওয়াজিব নয় বলা হয়েছে, সেটি ইবনে লেহইয়া, আতা, জাবির সূত্রে উমরা ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসের বিরোধী নয়। কেননা হাজ্জাজের হাদীসে আসল কথা বলা হয়েছে। আর ইবনে লেহইয়া বর্ণিত হাদীস তা থেকেই নকল করা। আর যখন দুটি হাদীস এমন হবে যে, একটি নিষেধকারী— না সূচক আর অপরটি প্রমাণকারী— হ্যাঁ সূচক তখন প্রমাণকারী হাদীস-ই উত্তম ও অগ্রাধিকার লাভকারী হবে। অনুরূপভাবে একটি হাদীস যদি ওয়াজিব প্রমাণকারী হয় এবং অপরটি ওয়াজিব নয় প্রমাণকারী হয়, তাহলেও প্রথমটিই টিকবে, দ্বিতীয়টি নয়। কেননা যা ওয়াজিব, তার অর্থ, তা তরক করা নিষিদ্ধ। আর যা ওয়াজিব প্রমাণকারী নয়, তা নিষিদ্ধ নয়। আর নিষিদ্ধের খবর মুবাহকারীর খবরের তুলনায় উত্তম।

এর জওয়াবে বলা যাবে, তা এ কারণে ওয়াজিব হবে না যে, ইবনে লেহইয়া বর্ণিত উমরা ওয়াজিব প্রমাণকারী হাদীস যদি প্রমাণিত হতো, তাহলে তা নফল হিসেবে প্রচারিত হতো তা সাধারণ্যের প্রয়োজন বলে। আর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার কথা যারা জানে, তারা সকলেই তা

জেনে নিত। কেননা তা হজ্জের মতই ওয়াজিব। যাকে হজ্জ করতে বলা হয়েছে, তাকে উমরা করতেও বলা হয়েছে। যার অবস্থা এইরূপ, তার 'খবরে ওয়াহিদ' হিসেবে বর্ণিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া তার সনদেও দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষভাবে তার বিপরীত হাদীসও রয়েছে। উপরন্তু একথা তো জানা আছে যে, দুটি হাদীসই একই ব্যক্তি থেকে এসেছে। তাই ওয়াজিব হওয়ার হাদীস যদি তার নিষেধকারী হাদীসের পরবর্তীতে হয়ে থাকে, তাহলে জাবির (রা) তা তাঁর বর্ণনায় অবশ্যই বলে দিতেন। বলতেন, নবী করীম (স) উমরাকে পূর্বে নফল বলেছিলেন। কিন্তু পরে বলেছেন, তা ওয়াজিব। কেননা তিনি দুটি হাদীস-ই জানেন এবং কোন্‌টি কবে বলেছেন, তা-ও তাঁর জানা আছে। এমতাবস্থায় তিনি তারিখের উল্লেখ না করে কখনও তা নফল বলবেন আর কখনও বলবেন ওয়াজিব— এমনটা হতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এই দুটি হাদীস পরস্পর বিরোধী হিসেবেই এসেছে। এমতাবস্থায় প্রমাণকারী ও নিষেধকারী হাদীসদ্বয় এভাবে বিবেচিত হবে যে, দুটি বর্ণনা দুই দৃষ্টিকোণে বর্ণিত হয়েছে। সামুরাতা বর্ণিত হাদীসে فَاعْتَمِرُوْا 'তোমরা উমরা কর" কথাটি মুস্তাহাব হিসেবে বলা হয়েছে। পূর্বে একথার দলীলসমূহ আমরা উল্লেখ করেছি। আর ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে যা বলেছেন, তাতে নামায ও অন্যান্য কাজের উল্লেখের পর বলা হয়েছে ঃ তোমরা হজ্জ করবে, উমরা করবে। এ-ও নফল হিসেবে। আর নফল কাজও তো ইসলামেরই কাজ। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভার্থে যা-ই করা হবে, তা তো ইসলামী শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত। একটি হাদীসে তো বলা হয়েছে— ইসলামের প্রায় সত্তরটি চারিত্রিক কাজ আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা।

সবি ইবনে মা'বাদ যে হযরত উমর (রা)-কে বলেছেন, হজ্জ ও উমরাকে আমি ফরয হিসেবেই পেয়েছি এবং তিনি তা শুনে চুপ রয়েছেন, কোন প্রতিবাদ করেন নি, তার কারণ এই যে, তিনি বলেছিলেন, এ দুটি আমার উপর ফরয, সব মানুষের ফরয তাতো বলেন নি। তাই তার বাহ্যিক অর্থের দাবি এই হতে পারে যে, সে দুটির হয়ত মানত ছিল তাঁর। ফলে সে দুটি ব্যক্তিগতভাবে তার জন্যে ফরয ছিল, তা-ও এই মানতের কারণে। উপরন্তু তিনি হয়ত আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপই কথাটি বলেছিলেন। তাতে সেই ব্যাখ্যার সুযোগ আছে। ফলে হযরত উমর (রা) তার প্রতিবাদ করেন নি। কেননা তার জন্যে সেই অর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। এটা ঠিক এই রকম, যেন একজন নিজস্বভাবে বলল যে, উমরা (আমার উপর) ওয়াজিব। তাই তার প্রতিবাদ করার কিছু থাকে না। কেননা ইজতিহাদ করে এই কথা বলা খুবই সঙ্গত। কিন্তু নবী করীম (স) এক ব্যক্তির পিতার হজ্জ ও উমরা করা সংক্রান্তে প্রশ্নের জবাবে বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা কর, তাতে কিন্তু সে দুটির ওয়াজিব ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এই কথাটিই কোন কাজ ওয়াজিব করার ধরনে বলা হয়নি। কেননা পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করা মূলতই পুত্রের কর্তব্য নয়। উমরা করাও নয়। উমরা ওয়াজিব— একথা প্রমাণের জন্যে কেউ কেউ দলীল হিসেবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ (الحج) 'এবং তোমরা ভালো ভালো কাজ কর'-এর উল্লেখ করেছেন। কেননা এই কথাটি দ্বারা বাহ্যত সমস্ত ভালো ও সওয়াবের কাজ করাই ফরয হয়ে যায়। একথা কয়েকটি কারণে অগ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য।

একটি হচ্ছে, উমরা ওয়াজিব ও ভালো— একথা প্রমাণ করা প্রথম প্রয়োজন। কেননা যে লোক ওয়াজিব মনে করে না, তার পক্ষে সেটিকে ওয়াজিব মনে করে করা জায়েয নয়। সেই

বিশ্বাস নিয়ে তা করলে তা নিশ্চয়ই ভালো কাজ মনে করা যাবে না। যেমন কেউ নফল নামায পড়ে মনে করল, এটা ফরয। দ্বিতীয়ত, 'তোমরা ভালো কাজ কর' কথাটি অস্পষ্ট। কোন কাজকে ওয়াজিব করতে হলে এরূপ অস্পষ্ট কথা বলা বাঞ্ছনীয় হয় না। কেননা এর মধ্যে নামায, যাকাত ও রোযা— এসব কাজও গণ্য হয়ে পড়ে। অথচ এসব কয়টি কাজই সামষ্টিকভাবে ফরয। আর যা অস্পষ্ট শব্দে বলা হবে, তার হুকুমটা নির্দিষ্ট করার জন্যে আর একটা দলীল দরকার হয়। আর তৃতীয় কারণ এই যে, الْخَيْرَ। আলিফ ও লাম মিলিয়ে যে শব্দটি, তা জাতীয় পর্যায়ের অর্থবোধক। তার اسْتِغْرَاق। সম্ভব নয়। ফলে তাতে একটা সাধারণ কাজও শামিল হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি বলে شَرِبْتُ الْمَاءَ। 'আমি পানি পান করেছি' وَتَزَوَّجْتُ النِّسَاءَ। 'আর মেয়েলোক বিয়ে করেছি'— এই রকমের কথা হয়ে যায়। কাজেই একটা খুবই নগণ্য জিনিসও শামিল হয়ে গেলে শব্দের তাৎপর্য তাতেই রক্ষিত হয়ে যায়। উপরন্তু আমরা জানি যে, যে শব্দ কিছু জিনিস শামিল করে এবং তাতেই শব্দের দাবি পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে সমগ্রকে আয়ত্ত করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আল্লাহ্‌র কথাটি 'তোমরা কতক ভালো কাজ কর' অর্থের ধারক হয়ে যায়। কাজেই আদেশটার বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্যে একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

উমরা ওয়াজিব মনে করেন, এমন কেউ কেউ বলেছেন, আমরা এমন কোন নফল কাজ পাই না, যার মূলটা ফরয নয়। তাই উমরা যদি নফল হয়ে, তাহলে তার মূলটা ফরয হতে হবে। তাহলে বলতে হবে যে, উমরা হচ্ছে তওয়াফ ও সাঈ'। আর তার মূল ফরয রয়েছে।

যদি বলা হয়, তওয়াফ ও সাঈ' উমরা ছাড়া অন্য কোথাও স্বতন্ত্রভাবে ফরয পাওয়া যায় না। তা ফরযের অধীন অবশ্য পাওয়া যায়।

জবাবে বলা হবে, কাবা ঘরের শুধু তওয়াফ করাও নফল ইবাদত। যদিও স্বতন্ত্রভাবে তার মূল ফরযে নেই। উমরাও নফল হিসেবে করা যাবে যখন তওয়াফ ও সাঈ' করা হবে। যদিও তার মূল ফরযে নেই। ইমাম শাফেয়ী দলীল পেশ করে বলেছেন, হজ্জ ও উমরা যখন একসাথে করা যায়, তখন বোঝা গেল যে, উমরা ফরয। কেননা যদি তা নফল হতো তাহলে তার সংক্রান্ত কাজ হজ্জের সঙ্গে একসাথে করা কখনই জায়েয হতে পারত না। যেমন দুই নামায একসাথে পড়া যায় না যার একটা ফরয আর অন্যটা নফল। তা চার রাক'আত ফরযের সাথে একত্রিত করা যায় না।

আবূ বকর বলেছেন, এই গোটা বিতর্কটাই অর্থহীন। তাতে উমরা ওয়াজিব হওয়ার কথাটি বাতিল হয়ে যায়। কেননা বলা যাবে, এ দুটি যখন একত্রিত করে করা যায়, অথচ দুটি ফরয নামাযে করা যায় না, তা থেকে প্রমাণিত হল যে, তা ফরয নয়। চার রাক'আতের মধ্যে জমা করার যে কথা বলা হয়েছে, তাতে চার রাক'আতই একটি নামায। যেমন একটি হজ্জে তার সমস্ত রুকন শামিল রয়েছে। যেমন একটি তওয়াফ, তাতে সাতবারের তওয়াফ শামিল রয়েছে। তা সত্ত্বেও তা তার মূলের উপর বিমণ্ডিত। কেননা যদি প্রথমে উমরা করা হয়, তারপরে ফরয হজ্জ করা হয়, আর এ দুটি মিলিয়ে উমরা, তাহলে উমরা নফল হয়ে যাবে, আর হজ্জ ফরয হিসেবে আদায় হবে। এতে করে ফরয ও নফল একসাথে করা সহীহ হলো এই হজ্জ ও উমরায়। এতে সে দলীল চূর্ণ হয়ে গেল, যা হজ্জকে ওয়াজিব হিসেবে জমা করা জায়েয প্রমাণের জন্যে পেশ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী এই দলীলও দিয়েছেন যে, উমরার জন্যেও

যেমন হজ্জের মতই মীকাত রক্ষা করতে হয়, তাতে বোঝা যায় যে, উমরাও ফরয। তখন বলা যাবে, কেউ যখন ফরয উমরা সম্পন্ন করল, পরে সে তার বাড়িতে ফিরে গেল, পরে আবার উমরার জন্যে ফিরে এলো। তখন তার 'মীকাত' হজ্জের মতই পালনীয় হবে। অথচ তা নফল। অতএব মীকাত রক্ষার শর্ত উমরাকে ওয়াজিব বা ফরয প্রমাণ করে না। নফল হজ্জেও 'মীকাত' রক্ষা করতে হয় ফরয হজ্জের মতই। তাই বলে নফল হজ্জ তো আর ফরয হজ্জ হয়ে যাবে না। তিনি 'কারেন' হজ্জকারীর পক্ষে জন্তু যবেহ্ করা ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু তার ভিত্তিতে উমরাকে ওয়াজিব প্রমাণ করতে চান নি। তবে দলীল-প্রমাণ ছাড়া-ই একটা দাবি করেছেন। তা সত্ত্বেও তা ক্ষুণ্ন ও চূর্ণ। কেননা কেউ যদি ফরয হজ্জ ও নফল উমরাকে পর পর 'কারেন' করে, তাহলে তাকেও জন্তু যবেহ্ করতে হয়। অনুরূপভাবে এ দুটিকে একত্রে নফল হিসেবে করা হলে তবে জন্তু যবেহ্ করতে হবে।

আল্লাহ্র কথা

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -

যদি তোমরা (হজ্জ যাত্রীরা) পথে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যে কুরবানী সহজভাবে করা সম্ভব তাই করবে।

কাসাঈ, আবূ উবায়দাতা ও অধিক সংখ্যক ভাষাভাষী বলেছেন ঃ الاحصار। অর্থ, নিষিদ্ধ রোগের দরুন কিংবা খরচের সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। আর حصر হচ্ছে শত্রুর আবরোধ। বলা হয় أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ— রোগ তাকে আটকে দিয়েছে। وَحَصَرَهُ الْعَدُوُّ — 'শত্রু তাকে অবরুদ্ধ করেছে।' ফরা'র মত হচ্ছে, এ দুটির প্রত্যেকটি কথা অপরটির স্থানে বলা যেতে পারে। কিন্তু আবুল আব্বাস আল-মুবাররদ ও হজ্জাজ তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছেন। তারা দুজন বলেছেন, অর্থের দিক দিয়ে এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিপরীত। রোগের ক্ষেত্রে حَصَرَهُ বলা যাবে না, শত্রুর ক্ষেত্রেও أَحْصَرَهُ বলা যাবে না। তারা দুজন বলেছেন, এটি লোকদের এই কথার মতই যে, কাউকে আটক করা হলে বলা হয় حَبَسَهُ এবং أَحْبَسَهُ যখন তাকে আটকের জন্যে পেশ করা হয়। قَتَلَهُ তার উপর হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। আর أَقْتَلَهُ অর্থ, তাকে হত্যার জন্যে পেশ করা হয়েছে। قَبَرَهُ অর্থ, তাকে কবরে দাফন করা হয়েছে। আর أَقْبَرَهُ অর্থ, তাকে কবরে দাফন করার জন্যে পেশ করা হয়েছে। حَصَرَهُ -এর অর্থও অনুরূপ, তাকে আটক করা হয়েছে। তার উপর আটক কার্য ঘটানো হয়েছে। আর أَحْصَرَهُ অর্থ, তাকে অবরুদ্ধ করার জন্যে পেশ করা হয়েছে। ইবনে আবূ নুজাইহ আতা ইবনে আব্বাস সূত্রে বলেছেন ঃ لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ— শত্রুর অবরোধই আসল অবরোধ, আর আল্লাহ যাকে আটক করেছেন কোন ভাঙ্গচুর বা রোগ দ্বারা, তাকে "حَصْرٌ" বলা যায় না। ইবনে আব্বাস জানিয়েছেন যে, الحصر। শব্দটি বিশেষভাবে শত্রুর কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়। রোগকে الحصر। বলা যায় না। এই কথা— যেমন আমরা বলেছি— ভাষাবিদদের অনুকূল কথা নয়। এমন লোক আছে, যারা ধারণা করে যে, এ থেকে বোঝা যায় যে, রোগীর পক্ষে হালাল বা মুক্ত হওয়া জায়েয নয়। সে محصر পরিবেষ্টিত হয়েছে, তা-ও বলা যাবে না। লোকেরা যা ধারণা করেছে, তার পক্ষের কোন প্রমাণ তাতে নেই। কেননা তাতে নামের অর্থ বলা হয়েছে। কিন্তু তার যে হুকুম সে বিষয়ে কোন খবর দেয়া

হয়নি। অতএব জেনে রাখ, احصار শব্দটি রোগ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। আর حصر ব্যবহৃত হয় শত্রু পরিবেষ্টনের অর্থ বোঝাবার জন্যে। পরিবেষ্টিত হজ্জ যাত্রীদের সম্পর্কে আগেরকালের মনীষীদের তিন পর্যায়ের কথা রয়েছে। ইবনে মাসঊদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, শত্রু ও রোগ— দুটিই সমান। জন্তু যবেহ করবে এবং ইহ্রামে যখন জন্তু যবেহ করা হবে, তখন ইহ্রাম শেষ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, সওরী তাই বলেছেন। আর দ্বিতীয়, ইবনে উমরের কথা, রোগী হালাল হবে না, পরিবেষ্টিত হবে কেবল শত্রু দ্বারা। মালিক, লাইস ও শাফেয়ীরও এই কথা। আর তৃতীয়— ইবনুয যুবায়র, উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র-এর কথা হল, রোগ ও শত্রু দুটিই সমান। তওয়াফ না করা পর্যন্ত হালাল হবে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের ফিকাহ্বিদগণের মতের কোন আনুকূল্য তাদের আছে বলে আমরা জানি না।

আবূ বকর বলেছেন, আভিধানিকদের উপরোদ্ধৃত কথার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, احصار নামটি বিশেষভাবে রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -

যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যে কুরবানীই সহজ হয়, তাই করবে।

বুঝতে হবে— শব্দটি তার আসল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা হচ্ছে রোগ। আর তাৎপর্যগতভাবে শত্রু এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

যদি বলা হয়, ফরা' থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি উভয় ক্ষেত্রে احصار শব্দটির ব্যবহার সঙ্গত বলে মনে করেন।

জবাবে বলা হবে, তা সঠিক হলেও আয়াতটি থেকে তা রোগের ক্ষেত্রেও প্রয়োগীয় প্রমাণিত হওয়া স্থির থাকবে। কেননা তা রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়াটা প্রতিরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ হয়নি। শত্রুর ক্ষেত্রে ব্যবহারের তিনি অনুমতি আছে বলে জানিয়েছেন। শব্দটির ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রে সঙ্গত হলে সে দুটির ব্যাপারে তা সাধারণ অর্থবোধক হবে। রোগী ও শত্রু পরিবেষ্টিত উভয়ই বোঝা যাবে।

যদি বলা হয়, উক্ত আয়াতটি যে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন অবস্থায় নাযিল হয়েছিল— এ বিষয়ে হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। নবী করীম (স) ও তাঁর আসহাবগণ মক্কা যেতে শত্রুগণ কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করে এখানেই ইহ্রাম খুলে ফেলতে আদেশ করেছিলেন। বোঝা গেল, আয়াতটির প্রয়োগ শুধু শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ার ব্যাপারেই হবে।

জবাবে বলা যাবে, শত্রুর পরিবেষ্টনই হচ্ছে আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণ। পরে الحصر। উল্লেখ থেকে ফিরিয়ে বিশেষভাবে রোগ দ্বারা পরিবেষ্টন হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। বোঝা গেল, রোগের হুকুমে ফায়দা দেয়ার উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। যেন শব্দটি তার বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। নবী করীম (স) তাঁর আসহাবগণকে যখন ইহ্রাম ভাঙ্গতে বললেন এবং নিজেও ভাঙ্গলেন, তখন বোঝা গেল যে, তাৎপর্যগতভাবে তা শত্রুপরিবেষ্টন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, শব্দের দিক দিয়ে নয়। ফলে আয়াতটি থেকে উভয় ক্ষেত্রেই পথ-নির্দেশ পাওয়া গেল।

আল্লাহ যদি কেবলমাত্র শত্রু পরিবেষ্টনই বুঝতে চাইতেন, রোগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার কথা আদৌ থাকত না, তাহলে তিনি বিশেষভাবে সেজন্যে নির্দিষ্ট শব্দই ব্যবহার করতেন, অন্যটা করতেন না। তা সত্ত্বেও শব্দের অর্থ যদি সেই দুটিই হয়, তা হলে তার নাযিল হওয়ার কারণ তার হুকুমকে এককভাবে একটা ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো না। বরং কারণ ছাড়াই সাধারণ অর্থবোধকতাই গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। হাদীস দ্বারা এই কথাটি বোঝা যায়, হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুসাদ্দদ ইয়াহ্ইয়া, হাজ্জাজ আস-সওয়াফ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ কাসীর, ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ আমি হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারীকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ مَنْ كُسِرَ اَوْعَرِجَ فَقَدْ حَلَّ যে ভাঙ্গচুর হল কিংবা উর্ধ্বে চড়াই হল, সে হালাল হয়ে গেল, পরবর্তী বছর হজ্জ আদায় করা তার কর্তব্য।

ইকরামা বললেন, আমি ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা দুজনই বললেন, সত্য কথা। 'সে হালাল হয়েছে' কথাটির অর্থ, তার জন্যে হালাল হওয়া— ইহ্রাম খুলে ফেলা— জায়েয। যেমন বলা হয় حَلَّتِ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ 'স্ত্রীলোকটি স্বামীর জন্যে হালাল হল' অর্থাৎ স্বামীর পক্ষে তাকে বিয়ে করা হালাল হল।

যদি বলা হয়, হাম্মাদ ও ইবনে যায়দ আইয়ুব, ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'যে লোক পথে পরিবেষ্টিত হবে, সে তার কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেবে। সে জন্তু যখন তার যবেহ হওয়ার স্থানে পৌঁছে যাবে, তখন সে ইহরাম খুলে ফেলবে। আর পরবর্তী বছর তার হজ্জ করা কর্তব্য হবে।' আল্লাহ 'কিসাস' তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। আর শত্রু পক্ষ তাকে এক হজ্জের স্থলে আর একটি হজ্জ ও একটি ইহরামের পরিবর্তে আর একটি ইহরাম বাঁধতে বাধ্য করল। এই কথা যিনি বলেছেন, তাঁর ধারণা হল, ইকরামা যদি এই হাদীসটি জানতেন, তা হলে তিনি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলতেন না। বলতেন, ইহরাম ভেঙ্গে ফেলতে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে।

এই মতের লোক মস্ত ভুল করেছেন, যখন حَلَّ কথা পড়ে ধারণা করেছেন যে, শুধু পরিবেষ্টিত হওয়ায়ই হালাল হওয়া সম্পাদিত হয়ে যাবে শুধুমাত্র পরিবেষ্টনের ফলে। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। তার অর্থ শুধু এতটুকু যে, তার পক্ষে হালাল হয়ে যাওয়া সঙ্গত হবে। যেমন পূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছি। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে হালাল হওয়া জায়েয, কেননা আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত তার পৌঁছা সম্ভবপর হচ্ছে না। যাঁরা আমাদের বিরোধী মত পোষণ করেন, তাঁরাও এ ব্যাপারে একমত যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে নফল হজ্জ করতে যেতে নিষেধ করে ইহরাম বাঁধার পর, তা হলে তখনই তার 'হালাল' হওয়া— ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয। সে যেন পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। যদিও শত্রুর দ্বারা নয় (স্বামীর দ্বারা)। অনুরূপভাবে যদি ঋণের কারণে বন্দী হয়, কিংবা অন্য কোন কারণে, ফলে কাবা ঘর পর্যন্ত তার পৌঁছা সম্ভব না হয়, সে-ও 'পরিবেষ্টিত' গণ্য হবে। রোগী সম্পর্কেও এই কথা। এ থেকে এও বোঝা যায় যে, যত ফরয কাজ শত্রু বা রোগের দরুন বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে করতে পারবে না, সে সবের হুকুম বিভিন্ন নয়। ভয়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ইশারা-ইঙ্গিতে নামায পড়া, বসে নামায পড়া দাঁড়াতে অক্ষম হলে— সম্পূর্ণ জায়েয। রোগীর জন্যেও তা জায়েয। অনুরূপভাবে রোগের কারণে কাবা ঘর পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব হলে তার হুকুম

ভিন্নতর কিছু নয়। তা শত্রুর ভয়েও হতে পারে, কিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারটিরও সেই রকম। ভয়প্রাপ্ত বা রোগী হলে তার জন্যেও তাই করা জায়েয। পানি পাওয়া না গেলে কিংবা রোগের কারণে পানি ব্যবহার করতে না পারলে তার পক্ষে তায়াম্মুম করা জায়েয। জিহাদের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ না পেলে জিহাদ থেকে বিরত থাকা অথবা রোগী হলে ফরয আদায়ের দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত হবে। ইহরাম বাঁধার পর হজ্জ করতে যেতে না পারলেও তা-ই হুকুম। তার হালাল হয়ে যাওয়া জায়েয। এসব ক্ষেত্রেই মূল কারণ হচ্ছে, কাজটা করতে না পারা।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ যখন বলেছেন, 'তোমরা পরিবেষ্টিত হলে কুরবানীর সহজ পন্থা গ্রহণীয়।' তারপরই বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْبِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ -

তোমাদের মধ্যে কেউ রোগী হলে কিংবা তার মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হলে তাকে রোযা বা সাদ্কা 'ফিদিয়া' (বিনিময়) দিতে হবে।

কথাটি দুটি দিক দিয়ে একথা বোঝায় যে, احصار শব্দের ব্যবহার করে এখানে রোগীর কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা সম্বোধনের শুরুতেই যখন রোগীর কথা আছে, তখন আবার নতুন করে সেই রোগীর কথা বলার কোন অর্থ হয় না। আর দ্বিতীয় কারণ, তা-ই যদি বক্তব্য হতো, তাহলে তদ্দরুন জন্তু যবেহ করা জরুরী হতো, 'ফিদিয়া' দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিত না।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ

وَلَاتَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ -

তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না কুরবানীর জন্তুর তার যবেহর স্থলে পৌঁছার পূর্বে।

এখানে احصار পরিবেষ্টন সত্ত্বেও হালাল হতে নিষেধ করা হয়েছে যবেহর জন্তুর তার যথাস্থানে পৌঁছার পূর্বে। অর্থাৎ হারাম এলাকায় তা যবেহ করা। এতে যবেহর জন্তুর তার যথার্থ স্থানে পৌঁছার পূর্বে রোগীর হুকুম কার্যকর করতে নিষেধ করেছে। তার জন্যে মাথা মুণ্ডন জায়েয কারেছে, সেই সাথে ফিদিয়া ওয়াজিব করা হয়েছে। আরও একটি কারণ আছে। সব রোগ-ই তো আর রোগীকে কাবা পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দেয় না। নবী করীম (স) কাব ইবনে উজরাতাকে বলেছিলেন, তোমার মাথার তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও জড়তাই কি তোমাকে কষ্ট দেয় ? বললেন, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ আয়াতটি নাযিল করলেন। কিন্তু তার মাথার তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও জড়তা কাবা ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে বাধা দিচ্ছিল না। তখন আল্লাহ্ তাকে মাথা মুণ্ডনের ও ফিদিয়া দানের অনুমতি ও আদেশ দিলেন। আয়াতে উল্লিখিত রোগের ব্যাপারটিও তাই। তার রোগ হয়ত احصار করেনি। তা সত্ত্বেও রোগকে 'প্রতিবন্ধক' বানিয়েছেন। কেননা তদ্দরুন কাবা পর্যন্ত তাকে পৌঁছতে দিচ্ছিল না। ফলে আয়াতে রোগের উল্লেখ এভাবে নেই যে, তার কারণে احصار হবে। আর অপর একটি কারণ হল আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضً 'তোমাদের মধ্যে যে লোক রোগী হবে' কথাটি সম্বোধনের শুরু পর্যায়ে গণ্য হতে পারে। যেমন احصار সংক্রান্ত হুকুম সেই দিকে ফিরে এসেছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'এবং তোমরা আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর।' এর সাথে যোগ করেই বলেছেন ঃ তোমরা যদি পরিবেষ্টিত হয়ে

পড়' পরিবেষ্টিত হওয়ার পর লোকেরা কি করবে তা বলে দেয়া হল। এর পর-পরই বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে'। অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া হে লোকেরা .... এতে احصار-এর পূর্বে যারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের কথাও বলে দেয়া হল। যেমন احصار। অবস্থায় করণীয় বলে দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে 'তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে' কথাটিতে এমন প্রমাণ নেই যদ্দারা বোঝা যেতে পারে, রোগ احصار। এর কারণ হতে পারে না।

যদি বলা হয়, আয়াতের ধারাবাহিকথায় যখন বলা হল ঃ

فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ -

পরে তোমরা নিরাপত্তা পেয়ে গেলে যে লোক উমরা থেকে হজ্জ পর্যন্ত তামাত্তু করবে ...।

বোঝা গেল, উক্ত আয়াতে শত্রু কর্তৃক ভীত ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে। কেননা নিরাপত্তার বিপরীত তো 'ভয়'ই হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, ভীতকারী রোগের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভের কথা বলা হয়েছে মনে করার পথে বাধা কোথায়? সেটা কেবল শত্রু কর্তৃকই হয়, এমন কথা মনে করছ কি কারণে? তা রোগের কারণেও তো হতে পারে। ভয় ও নিরাময়তা বা নিরাপত্তা দুটোই তাতে হতে পারে। উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র থেকে فَاِذَا اَمِنْتُمْ আয়াতাংশের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ, যখন তুমি নিরাপদে এসে যাবে তোমার ভাঙ্গচুর থেকে, তোমার ব্যথা থেকে, তখন তোমার আল্লাহ্‌র ঘরে পৌঁছা কর্তব্য।

যদি বলা হয়, শত্রু ও রোগের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত ব্যক্তি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর না হলেও পেছনে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু রোগী উভয় দিকেই অপারগ।

জবাবে বলা যাবে, এই কারণেই পরিবেষ্টন ও যেতে অক্ষমতায় দুটি জিনিসকেই কারণ ধরা বাঞ্ছনীয়। পিছনে ফিরে যাওয়া যার পক্ষে সম্ভব, রোগী সেদিক দিয়ে অধিক অক্ষম— ভয়ের কারণে সামনে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়লে। এ-ও বলা যেতে পারে যে, শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হলে যে পরিবেষ্টন হয়, তার পক্ষে যদি পিছনে যাওয়াও সম্ভব না হয়, না সামনে যাওয়া, তখন কি ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয হবে না ফিকাহবিদদের কোনরূপ মতদ্বৈধতা ছাড়াই? দুটির মধ্যে পার্থক্য করার মূল 'ইল্লাত' বা কারণটাই তো চূর্ণ হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যে স্ত্রী ইহরাম বেঁধেছে, তখন তার স্বামী হজ্জে যেতে নিষেধ করেছে, আর যে বন্দী হয়েছে, এ দুজন অভিন্নভাবেই পরিবেষ্টিত। এ দুজনের পক্ষেই হালাল হওয়া জায়েয। সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ও পিছনে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তারা দুজনই সমান। কেননা তারা দুজন-ই হজ্জে যেতে নিষেধপ্রাপ্ত দুটি কারণে। ইমাম শাফেয়ী ধারণা করেছেন, রোগী ও ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আল্লাহ যুদ্ধে ভয় প্রাপ্তের জন্যে একটি বাহিনীর নিটক আশ্রয় গ্রহণকে জায়েয করেছেন। তখন সে ভয় থেকে রেহাই পেয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে আসবে। অনুরূপভাবে রোগীর পক্ষে জিহাদ তরক করা মূলতই জায়েয।

বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ -

(التوبه ٩١)

দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোক— আর যারা জিহাদে শরীক হওয়ার প্রয়োজনীয় সম্বল পায় না, তারা পিছনে থেকে গেলে কোন দোষ হবে না।

এ আয়াত অনুযায়ী রোগীকে প্রশস্ততর রুখসত দেয়া হয়েছে ভীতীর জন্যে দেয়া রুখসতের তুলনায়। কেননা ভীত ব্যক্তিকে যুদ্ধে শরীক হওয়া রুখসত দেয়ার মতো কোন ওযর গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু রোগী মাযুররূপে গণ্য। ভীত ব্যক্তির ওযর হলে সে কোন বাহিনীর বেষ্টনীতে আশ্রয় নিতে পারে; কিন্তু যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে মৌলিকভাবে তাকে রেহাই দেয়া যেতে পারে না। তাই রোগী ব্যক্তি হালাল হওয়ার ব্যাপারে ওযর অধিক গ্রহণীয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ 'তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্র জন্যে সম্পূর্ণ কর'। পরে বলেছেন, ভীত পরিবেষ্টিত ব্যক্তির সম্পর্কে যা বলার তা। তাই হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার ফরয দূর হতে পারে কেবল ভীত ব্যক্তির থেকে। তখন তাকেও বলা হবে যা বলা হয়েছে 'হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্র জন্যে পূর্ণ কর'। এইখানেই বলা হয়েছে ঃ 'যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়।' এই কথাটি ভীত ও অ-ভীত— সবারই জন্যে সাধারণভাবে বলা। অতএব কোন দলীল ছাড়া এই দায়িত্ব থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কিন্তু কেবল ভীত ব্যক্তির জন্যে তা বিশেষীকরণ ও অন্যকে তা থেকে বাদ দেয়ার কি দলীল থাকতে পারে ? স্ত্রী ইহ্রাম বাধলে ও স্বামী তাকে হজ্জে যেতে নিষেধ করলে তার জন্যে হালাল হওয়া জায়েয বলার সব দলীল চূর্ণ হয়ে গেল। সে তো ভীতও নয়। বন্দী ব্যক্তিও সেই রকম, সে হত্যার ভয় করে না। আল-মুজানী বলেছেন, শত্রুর কারণে ভয় পাওয়া ব্যক্তির জন্যে ইহ্রাম খোলার অনুমতি একটা রুখসত। সেটা অপর কোন জিনিস সদৃশ নয়। যেমন দুপায়ের মোজার উপর তা ধোয়ার পরিবর্তে 'মসেহ' করার অনুমতি একটি বিশেষ ব্যাপার। দুই দাস্তানার সাথে তার কোন সাদৃশ্য নেই। তাহলে তাকে বলা যাবে যে, তা যদি রুখসত হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য রুখসতের উপর তা 'কিয়াস' করা সমীচীন হবে না। নবী করীম (স) যখন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা 'ইস্তিনজা' জায়েয হওয়ার রুখসত দিয়েছেন, তখন টুকরা কাপড় ও বাঁশ-কাঠ দ্বারা ইস্তিনজা করাকে তার উপর 'কিয়াস' করা ও তাকেও জায়েয বলা সঠিক হতে পারে না। কষ্টদায়ক রোগের দরুন মাথা মুণ্ডন করা যখন রুখসত, তাকে শরীরের অন্য কোথাও কষ্টদায়ক রোগের সাথে তার সাদৃশ্য খোঁজ করা ঠিক হবে না, বলা যাবে না যে, তার দরুনও মাথা মুণ্ডন ও ফিদিয়া দেয়া মুবাহ। বন্দী ভীত ব্যক্তির সাথে তার সাদৃশ্য হওয়াও জরুরী নয়। ইহ্রাম বেধে হজ্জে যেতে প্রস্তুত স্ত্রীকে স্বামী নিষেধ করলে তার সাথেও সাদৃশ্য হতে পারে না। আরও যে যে জিনিসের আমরা উল্লেখ করেছি, তাকে 'কারণ' বানানোও যুক্তিহীন।

আবূ বকর বলেছেন, হজ্জ ও উমরা— উভয় ক্ষেত্রেই احصار। অভিন্ন। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন-এর মত হচ্ছে, احصار। কেবল হজ্জের ক্ষেত্রেই গণ্য হবে, উমরার ক্ষেত্রে নয়। কেননা উমরা তো কোন বিশেষ সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট নয়, কোন একটা সময় হতেই হবে— অন্য সময় হবে না— এমন তো নয়। তা যে-কোন সময় করা যেতে পারে। তা হারানোর কোন ভয় নেই। মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) হুদায়বিয়ার বছর উমরার ইহ্রাম বাধা ছিলেন। তিনি তওয়াফ করা ছাড়াই সে ইহ্রাম খুলে ফেলেছিলেন। যদিও পরবর্তী বছর যিলক্বদ মাসে তার 'কাযা' করেছিলেন। তার নামকরণ হয়েছিল 'উমরাতুল কাযা'।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ -

তোমরা আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।

তারপরে বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যবেহ্ জন্তু যা-ই সহজলভ্য, তা যবেহ্ কর।

এই নির্দেশ হজ্জ ও উমরা দুটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেবল একটির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা অন্যটিকে বাদ দিয়ে জায়েয হতে পারে না। কেননা তা হলে কোন শব্দকে দলীল ছাড়াই বিশেষীকরণ করা হবে। আল্লাহ্র কথা ঃ 'যে জন্তু সহজলভ্য হবে— এ বিষয়ে আবূ বকর বলেছেন, আগেরকালের ফিকাহবিদগণ নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর (রা) দুজনই বলেছেন, এই জন্তু কেবল উট ও গরু হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ছাগলও হতে পারে। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ কুরবানীর জন্তু তিন প্রকারের; উট, গুরু ও ছাগল। ইবনে শাবরামাতাও এই কথাই বলেছেন। ইবনে শাবরামাতা আরও বলেছেন, البدن বলা হয় এক ধরনের উটকে বিশেষভাবে। হানাফী মাযহাবের আলিম ও শাফেয়ী বলেছেন, উট ও গরু। বয়সের ব্যাপারে বিভিন্ন মত। হানাফী মাযহাবের আলিম ও শাফেয়ী বলেছেন, উট, গরু ও ছাগলের দুই বা ততোধিক বছর কম বয়সের কোন জন্তু দিয়ে কুরবানী হয় না। যুবক বয়সের ছাগলও হতে পারে। মালিক বলেছেন, দুই বা ততোধিক বছরের কম বয়সের জন্তু দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে না। আওজায়ী বলেছেন, পুরুষ উটও কুরবানী করা যেতে পারে। উট ও গরু যুবক বয়সের হতে হবে। এর প্রত্যেকটি সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাতে পারে।

আবূ বকর বলেছেন, الهدى কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ। তার অর্থ এমন জন্তু, যা আল্লাহ্র ঘরের দিকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করার জন্যে পাঠানো হয়, সেই জন্তু। সেটিকে সাদকাও বলা যায়, তা সাদকা করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় বলে, যদিও সেটিকে আল্লাহ্র ঘরের দিকে পাঠানো হবে না। নবী করীম (স) বলেছেন, জুমআর নামাযে যে লোক সকাল সকাল যাবে, সে যেন একটি উট কুরবানীর করল। তার পরে যে যাবে সে যেন একটি গরু যবেহ করল। তার পরে যে যাবে সে যেন একটি ছাগল যবেহ্ করল। তার পরে যে যাবে সে যেন একটি মুরগী যবেহ্ করল। তারপরে যে যাবে সে যেন একটি ডিম দিল। এ হাদীসে ডিম ও মুরগীকে কুরবানীর প্রাণী গণ্য করা হয়েছে, যদিও তা ঠিক আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পৌছানোর ইচ্ছা করেনি। তা সাদ্কা করার কিংবা তদ্দারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করল। এই কারণে হানাফী ফিকাহবিদরা বলেছেন, যদি কেউ বলে, আল্লাহ্র জন্যে আমার উপর কর্তব্য হচ্ছে, আমার এই কাপড় দিয়ে দেয়া কিংবা এই ঘর দান করা, তার কর্তব্য হবে তা সাদ্কা করে দেয়া। ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উট, গরু ও ছাগল— এই তিন প্রকারের জন্তু ছাড়া অন্য কিছু কুরবানী হতে পারে না। فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ বলে কুরআনে এই জন্তুগুলির কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে যে মতপার্থক্য আছে, তার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে ছাগলও এর মধ্যে গণ্য। কেননা ছাগলকে 'হাদয়িয়ে' বলা হয়। هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'কাবায় পৌছে যাওয়া জন্তু'-এর অর্থে কোন মতপার্থক্য

নেই যে, ছাগল এর মধ্যে গণ্য। হজ্জের ইহ্‌রাম বাধার পর শিকার করার বিকল্প হিসেবে তা কুরবানী করা যেতে পারে। ইবরাহীম আসওয়াদ আয়েশা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) একবার ছাগল কুরবানী করেছেন। আমাশ আবূ সুফিয়ান জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর কুরবানীর মধ্যে গলায় দড়ি বাঁধা ছাগলও ছিল।

যদি বলা হয়, ছাগল কুরবানী করার ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা সহীহ্ নয়। কেননা কাসিম তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ছাগলকে فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর মধ্যে গণ্য মনে করেন না।

জবাবে বলা যাবে, তার অর্থ হচ্ছে, ছাগল পাঠালে তার কারণে ইহ্‌রামকারী হবে না। উট ও গরুর কুরবানী পাঠালে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে, যখন তার নিয়ত করা হবে ও জন্তু সেই উদ্দেশ্যে বাঁধা হবে। দুই বছরের ব্যাপারটি পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে আবূ বুরদাতা ইবনে নায়ার-এর কিস্‌সায় বর্ণিত হয়েছে, যখন সে ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করল, তখন নবী করীম (স) তাকে আবার কুরবানী করার আদেশ দিলেন। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট ছাগলের চাইতেও ভালো উন্নতমানের 'ছাগল' (معز) আছে, তার গোশ্‌তও ভালো। তখন নবী করীম (স) বললেন, তা তোমার একার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। তোমার পর অন্য কারোর পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে না। এতে ছাগল কুরবানী করতে নিষেধ হয়েছে বলা যায়। কেননা এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যদিও الجدع - ضان থেকে— করতে অনুমতি দিয়েছেন। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে الجدع من الضان। কুরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন যদি সেটি এক বছর ছাড়িয়ে আরও কয়েক মাস হবে বয়সের দিক দিয়ে। شرح المختصر গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফরয বা ওয়াজিব কুরবানীর জন্তুতে শরীক হওয়ার জায়েয হওয়া সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, উট ও গরু-গাভী সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। ইমাম মালিক বলেছেন তা নফল কুরবানীতে জায়েয, ওয়াজিব কুরবানীতে নয়। জাবির নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হুদায়বিয়ার দিন উট ও গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। তা ছিল ওয়াজিব। কেননা তা احصار-এর কারণে দেয়া হয়েছিল। নতুবা নফল বা ওয়াজিব কুরবানীতে সাতজনের পক্ষ থেকে দেয়ার ব্যাপারে একমত হতেন না। কেননা তাঁরা সকল দিক দিয়েই তা জায়েয মনে করেন, তাতে কোন মতপার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌র কথা فما استيسر من الهدى -এর বাহ্যিক অর্থে তা-ই মনে হয়। অতএব কোন কোন জন্তু যে সেভাবে কুরবানী করা জায়েয হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রতিরুদ্ধ— পরিবেষ্টিত হাজী কোথায় কুরবানী করবে

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ -

এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কুরবানীর জন্তু তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাবে।

এ আয়াতে বলা محله তার নির্দিষ্ট স্থান কোনটি সে বিষয়ে আগের কালের মনীষিগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (রা), আতা, তায়ূস মুজাহিদ, আল-হাসান, ইবনে সিরীন প্রমুখ বলেছে, সে স্থানটি হারাম। হানাফী ফিকাহবিদগণ ও সওরী এই কথাকেই স্বীকার করেছেন। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, সে স্থান সেইখানেই যেখানে তারা পরিবেষ্টিত— প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। সেখানেই তারা জন্তু যবেহ করে ইহরাম খুলে ফেলবে। প্রথমোক্ত কথাটির পক্ষের দলীল হচ্ছে, 'মহল' দুইটি জিনিসের নাম। হয় তার অর্থ সময় কিংবা হতে পারে, তার অর্থ স্থান। আরবী ভাষায় محل الدين বলা হয়। তার অর্থ, যে সময় ঋণ ফেরত চাওয়া হবে সেই সময়। নবী করীম (স) সাবাগাতা বিনতেজ যুবায়রকে বলেছিলেন, 'তুমি হজ্জে শর্ত কর বলে, আমার 'মহল' (স্থান) হচ্ছে যেখানে আমাকে আটক করা হয়েছে।' এতে একটি স্থান বোঝানো হয়েছে মহল বলে। যখন এ শব্দটি দুটি জিনিস বোঝায়, আর উমরায় احصار-এর জন্তু সকলের নিকট নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট নয়, আর তা-ই আয়াতের বক্তব্য— তার অর্থ স্থান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বোঝা গেল, হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিরুদ্ধ হওয়ার স্থান ছাড়া অন্য স্থানে কুরবানীর জন্তু না পৌঁছে যাবে। কেননা প্রতিরুদ্ধ হওয়ার স্থানই যদি তার জন্যে নির্দিষ্ট 'মহল' হয়, তা হলে احصار হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জন্তুর তা 'মহল'-এ পৌঁছে গেছে মনে করতে হয়। কিন্তু আয়াতে বলা চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থানে পৌঁছার কথাটি বাতিল হয়ে যায়। তাই বুঝতে হবে যে, এ 'মহল' বলতে 'হারাম' বুঝিয়েছে। কেননা احصار-এর স্থানটিই যদি তার মহল না হয়ে থাকে, তা হলে 'হারাম'ই তার 'মহল' বোঝাতে হবে। পরিবেষ্টিত প্রতিরুদ্ধ হওয়ার স্থানটিকেই 'মহল' মনে করলে আয়াতের ফায়দাটাই বাতিল হয়ে যায়। তার তাৎপর্যও প্রত্যাহৃত হয়।

وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ .... لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ -

তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্তু হালাল করা হয়েছে, তবে যা তোমাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয় .... তোমাদের জন্যে তাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহু ফায়দা আছে। পরে তার 'মহল' হচ্ছে কাবার দিকে। (সূরা হজ্জ ঃ ৩০ ও ৩৩)

'মহল' সম্পর্কে আমাদের কথার দলীল উপরোদ্ধৃত আয়াতে রয়েছে। তা দুটি দিক দিয়ে। একটি— সকল প্রকার কুরবানীর জন্তুর ক্ষেত্রেই তা নির্বিশেষ। আর দ্বিতীয়— তাতে 'মহল'-এর অর্থ বলা হয়েছে, যদিও তা পূর্বের কথা 'حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ' 'যতক্ষণ না কুরবানীর জন্তু তার মহল-এ পৌঁছে যায় ...'এর মধ্যে অস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল। আল্লাহ্ নিজেই যখন মহল নির্দিষ্ট করেছেন কাবা ঘর, তখন অন্য কোন স্থান 'মহল' রূপ নির্দিষ্ট করার কারোর অধিকার থাকতে পারে না। শিকার করার গুনাহের প্রতিকার স্বরূপ বলা হয়েছে ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'কাবায় পৌঁছে যাওয়া কুরবানীর জন্তু'— এই কথাটিও তা সমর্থন করে। এসব আয়াতে কুরবানীর জন্তুর পরিচিতি স্বরূপ বলা হয়েছে, তা কাবায় পৌঁছে যাবে। তাই যে জন্তু কাবায় পৌঁছেনি, তা জায়েয হবে না। জিহার ও হত্যার দণ্ড হিসেবে বলা হয়েছে ঃ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ পর পর দুই মাস রোযা থাকা। এতে দুট মাস পর পর হওয়ার শর্ত করা

হয়েছে। তা এভাবেই আদায় করতে হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ 'মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে।' এই শর্ত সম্পন্ন ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কিছু করলে জায়েয হবে না। আমাদের হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ সকল প্রকারের কুরবানীর ব্যাপারেই এই কথা বলেছেন, যা যবেহ করা হবে, তা হারাম ছাড়া অন্য কোথাও যবেহ করা হলে তা জায়েয হবে না। احصار -এর উল্লেখের পর কথার ধারাবাহিকতায় যা বলা হয়েছে, তা থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে অথবা যার মাথায় কষ্টের কারণ থাকবে, সে সিয়াম বা সাদ্‌কা বা কুরবানী দেবে ফিদিয়া স্বরূপ।

এতে পরিবেষ্টিত হাজীকে জন্তু যবেহ করতে বলা হয়েছে। এবং কুরবানীর জন্তু যবেহ না করা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তার যবেহ যদি হালাল অবস্থায় মাথার কষ্টের লোকের পক্ষে احصار -এর কারণে জায়েয হয়, আর তা করে হালাল হয়ে যায়, কষ্টের ফিদিয়া দেয়া থেকে বেঁচে যায়, তাহলে তা থেকে বোঝা যাবে যে, হালাল হওয়ার স্থানটা কুরবানীর জন্তু যবেহ করার স্থান নয়।

যদি বলা হয়, এই কথা প্রযোজ্য কেবল তার ক্ষেত্রে, যে احصار -এর জন্তু যবেহ করার জন্যে পায় না।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, এটা সঙ্গত যে, তার সম্বোধনটা হবে তার ব্যাপারে, যে যবেহর জন্তু পায় না। কেননা তাকে তো রোযা রাখা, সাদকা দেয়া বা কুরবানী করা— এর যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ তিনটির যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দেয়া তখনই তাৎপর্যবহ হতে পারে, যদি সে সেটা পেতে পারে। কেননা যেটা পাওয়া যায় আর যেটা পাওয়া যায় না, এর মধ্যে ইখতিয়ার দেয়ার কোন অর্থ হয় না। তাই প্রমাণিত হল যে, কুরবানীর পশুর পৌঁছার স্থান হচ্ছে হারাম। তা অন্য স্থানে পৌঁছলে কাজ হবে না। যেখানে পরিবেষ্টন হয়েছে, সেখানে যবেহ করলেও কাজ হবে না।

একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যায়, ইহ্‌রাম বাধা অবস্থায় শিকার করলে তার জন্তু যবেহ করার স্থান হচ্ছে হারাম। অন্যত্র করলে দায়িত্বপূর্ণ হবে না। তাই সর্বপ্রকারের জন্তু যবেহর কাজ— যা ইহ্‌রামের কারণে ওয়াজিব হয়েছে— সেখানেই হতে হবে। এ দুটোর মধ্যে সমন্বয়কারী তাৎপর্য হচ্ছে— ইহ্‌রামের কারণে তা ওয়াজিব হওয়া।

যদি বলা হয়, আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُمْ فَانْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ - (الفتح : ٢٥)

ওরা তো সেই লোক, যারা কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি এবং কুরবানীর উটগুলোকেও কুরবানীর স্থানে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত করেছে ...।

এ আয়াতটি হুদায়বিয়ার ব্যাপার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এতে প্রমাণ রয়েছে যে, নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ হারামের বাইরেই তাঁদের কুরবানীর জন্তুগুলোকে যবেহ করেছিলেন। তা না হলে তা তার আসল স্থানেই পৌঁছে যেত।

জবাবে বলা যাবে, এ থেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর জন্তুর যবেহ হওয়ার স্থানই হল 'হারাম'। পরিবেষ্টিত হওয়ার স্থানই যদি তার যবেহ হওয়ার প্রকৃত স্থান হতো, তা বলা হতো না যে ঃ وَالْهَدْيَ مَعْكُمْ فَانْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ 'কুরবানীর জন্তুকে তার আসল স্থানে যেতে দেয়া হয়নি।' তাদেরকে যখন জানিয়ে দেয়া হল যে, তারা কুরবানীর জন্তুও তার আসল স্থানে যেতে দেবে না, তখন বোঝা গেল, যেখানে তাঁরা ইহরাম খুলেছিলেন সেটাই তার আসল স্থান ছিল না। আলোচ্য বিষয়ে এইটিই প্রথম দলীল হতে পারে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবিগণ যদি ইহরাম খোলার জন্যে জন্তুগুলো যবেহ না করতেন, তা হলে জন্তুগুলোকে তার স্থানে যেতে দেয়া হয়নি— একথা বলার কি অর্থ হতে পারে?

জবাবে বলা যাবে, যখন প্রথমে সামান্য বাধা পাওয়া গেল, তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, তারা জন্তুগুলোকে যেতেই দেবে না। কিন্তু তার অর্থ তো এই নয় যে, এই বাধা চিরদিনই থাকবে। কেউ যদি কারোর হক দিতে অস্বীকার করে তা হলেই বলা যাবে যে, সে তার হক দিতে প্রস্তুত নয়। যেমন বলা যায়, তাকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সে চিরদিনই আটক থাকবে— এমন তো মনে করা যায় না। মুশরিকরা শুরুতেই যখন কুরবানীর জন্তুর হারামে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত করল, তখনই এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তারা তা হারামে পৌঁছতেই দেবে না। এই কথা তখন বলাও যেত। যদিও পরে তারা বাধা তুলে নিয়েছিল। আয়াতে মুশরিকদের পরিচয় স্বরূপ বলা হয়েছে যে, ওরা মুসলমানদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দিয়েছে। যদিও পরবর্তী বছর কুরবানীর জন্তু হারামে যেতে দিয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

قَالُوْا يَاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ -

ওরা বলল, হে আমাদের পিতা, আমাদেরকে মেপে শস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে।

হ্যাঁ, একটা সময় হযরত ইউসুফের ভাইদেরকে শস্য দিতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তা একটা সময়ের জন্যে মাত্র। পরবর্তীতে সে নিষেধ তুলে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে মক্কার মুশরিকরা এক সময়ে— শুরুতেই— কুরবানীর জন্তু হারামে পাঠাতে বা নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর তা যেতে দেয়া হয় এবং হারাম এলাকায়ই তা যবেহও করা হয়। বলা হয়েছে, নবী করীম (স) পরবর্তী বছর উমরা করতে এসে কাবার তওয়াফের পরই তাঁর নিয়ে আসা জন্তু যবেহ করার জন্যে পাঠিয়ে দেন। প্রথমবারে যখন নিষেধ করেছিল, তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছিলেন ঃ

وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ -

কুরবানীর জন্তু তার যবেহ স্থানে যেতে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

তার কারণ এই যে, প্রথমবারে কুরবানীর জন্তু তার যবেহর স্থানে যেতে দেয়া হয়নি, ঠিক সেই সময়টিকে চিহ্নিত করাই ছিল এই কথার তাৎপর্য। এ-ও সম্ভব যে, এ কথার দ্বারা সেই স্থান বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যেখানে যবেহর জন্তু যবেহ হওয়া পছন্দনীয়। আর তা হচ্ছে 'মারওয়া' কিংবা মিনা। সেখানে যেতে না দেয়ায়ই আল্লাহ্ উক্ত কথাটি বলেছিলেন।

মিস্ওয়ার ইবনে মাখরিমা ও মারওয়ান ইবনুল হিকাম উল্লেখ করেছেন, হুদায়বিয়া বলতে যে বিস্তীর্ণ এলাকা বোঝায়, তার কিছু অংশ হারামের মধ্যে পড়েছে আর কিছু অংশ বাইরে।

রাসূলে করীম (স)-এর অবস্থান হারাম-এর বাইরে থাকলেও তাঁর নামাযের স্থান ছিল হারাম এলাকার মধ্যে। যখন হারাম এলাকায় নামায পড়া সম্ভব হচ্ছিল, তখন যবেহ্ও হারাম এলাকার মধ্যে করা সম্ভবপর ছিল। বর্ণিত হয়েছে, নাজিয়াতা ইবনে জুনদুব আল-আসলামী (রা) নবী করীম (স)-কে বললেন ঃ 'আপনি আমার সাথে পশুগুলো পাঠিয়ে দিন। আমি সেগুলোকে মরুভূমি ও পার্বত্য পথে নিয়ে মক্কায়ই যবেহ্ করে দেব।' তা-ই তিনি করেছিলেন। সম্ভবত সব জন্তু নয়, কিছু সংখ্যক জন্তু তাঁকে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। আর অবশিষ্টগুলো হুদায়বিয়ার হারাম এলাকার মধ্যেই যবেহ্ করে দেন।

পরিবেষ্টিত কুরবানীর পশু যবেহ্ করার সময়

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ— তখন যা কিছু কুরবানী করা সহজ ও সম্ভব হয় ......। কুরবানীর পরই ইহ্রাম খুলে ফেলা ও হালাল হওয়া মুবাহ— এ ব্যাপারে মনীষিগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। উমরার জন্তু যবেহ করার কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। যখনই এবং যে কোন সময় ইচ্ছা হবে, যবেহ করা যাবে এবং যবেহ করেই ইহ্রাম খুলে ফেলবে। নবী করীম (স) এবং তাঁর আসহাবগণ হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁরা উমরার জন্যে ইহ্রাম বাধা অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁরা কুরবানীর জন্তু যবেহ্ করেই হালাল হয়ে গিয়েছিলেন। এ ঘটনা জিলকদ মাসের। কিন্তু হজ্জযাত্রীদের যবেহ্র জন্তু যদি পরিবেষ্টিত ও প্রতিরুদ্ধ হয়ে পড়ে তাহলে সে জন্তুর যবেহ করার সময়ের ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, তা যখন ইচ্ছা যবেহ করা যেতে পারে। আর কুরবানীর দিনের পূর্বেই হালাল হয়ে যেতে পারে। আবূ ইউসূফ, সওরী ও মুহাম্মাদ বলেছেন, কুরবানীর দিনের পূর্বে যবেহ করা যাবে না। কুরআনের আয়াত ঃ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -এর বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে তা অনির্দিষ্টভাবে যে-কোন সময়ে যবেহ করা যেতে পারে। যদি কোন সময় বিশেষীকৃত করা হয়, তাহলে কুরআনের সাধারণভাবে সম্পন্ন শব্দকে বিশেষীকৃত করা হয়। কিন্তু তা কোন দলীল ছাড়া জায়েয হতে পারে না।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ই যখন বলেছেন ঃ 'কুরবানীর পশু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না।' আর 'মহল' এমন নাম, যা সময় নির্দিষ্টকরণ বোঝায়। তাই তার জন্যে সময় নির্দিষ্ট হতে হবে।

জবাবে বলা যাবে, আমরা পূর্বেই বলেছি, 'মহল' একটি স্থান বোঝায়। যদিও তা সময়ের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, 'মহল' বলে স্থান বোঝানো হয়েছে। তাই পশু যখন হারামে পৌঁছে যাবে ও যবেহ্ করা হবে, তখনই তা জায়েয হবে উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে। এক্ষণে সময়ের শর্ত করা হলে তাতে বৃদ্ধি সৃষ্টি করা হবে। কেননা তার অধিকাংশ অবস্থাই এই হয় যে, নাম দুটিকেই একসাথে শামিল করে নেয়। তাই তা দুটির যেটি পাওয়া যাবে, সেটিতেই তা করা জায়েয হবে। কেননা যথাস্থানে জন্তুর পৌঁছে যাওয়াই ইহরামের শেষ মুহূর্ত। অথচ তা হারামেই যবেহ করা হয়েছে। আর যখন বলা হয়েছে ঃ 'কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার ব্যাপারে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে'; আর এই স্থান বা 'মহল'টা হারাম ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পরে ঠিক এই কিসসাটাই বিবৃত হয়েছে ঃ حَتَّى يَبْلُغَ

الْهَدْيُ مَحِلَّهُ। 'কুরবানীর জন্তু যতক্ষণ তার স্থানে পৌছে না যাবে।' এই দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 'মহল' বলতেও সেই হারাম-ই বুঝতে হবে।

এই জন্তু যবেহ করার জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই— এ কথার একটি প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্র কথা ঃ যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হও, তাহলে 'যে পশু যবেহ্ করা সহজ ও সম্ভব হবে' থেকে উমরা ও হজ্জের প্রসঙ্গই বোঝা যায়, যা পালন করতে শুরু করা হয়েছে, সে জন্যে যাত্রা শুরু করা হয়েছে। আর তার কথাই 'এবং তোমরা আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর' অংশে বলা হয়েছে। হজ্জের জন্যে যে পশু, তা-ই উমরার জন্যেও। সব ফিকাহবিদই একমত যে, তাতে উমরার জন্যে কোন সময় নির্ধারিত হয় নি। হজ্জের ব্যাপারও তাই। কেননা শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। আল্লাহ্র কথা ঃ 'কুরবানীর জন্তু যতক্ষণে তার স্থানে পৌঁছে না যাবে' থেকেও তা-ই বোঝা যায়। উমরার স্থান তো হারামই। কোন নির্দিষ্ট সময় নয়। তাই বুঝতে হবে যে, আয়াতে সেই হারাম-এর কথাই বলা হয়েছে। অতএব হারামে তা যে-কোন সময় যবেহ করা জায়েয— উমরার যে-কোন সময়ে। হজ্জের ক্ষেত্রেও তাই। আর সাধারণ অর্থবোধক শব্দের কারণে উমরাও তাতে শামিল। কেবল হজ্জের জন্যে তা শর্তযুক্ত করা জায়েয হতে পারে না। কেননা তা একটি শব্দের কারণে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে। ব্যবহৃত শব্দ সময় ও স্থান দুটিই যখন বোঝায়, তখন তার একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি বুঝতে চাওয়া জায়েয হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ। 'চোর পুরুষ ও চোর স্ত্রী'— আয়াতের দৃষ্টিতে কোন চোরকে দশ দিরহাম চুরি ও অপর কোন চোরকে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরির অপরাধে দায়ী করা জায়েয হতে পারে না। হাদীস থেকেও এই কথা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হাজ্জাজ ইবনে আমর আল আনসারী নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, যার ভাঙ-চুর বা আমন্ত্রিত ও দমিত হবে, সে ইহ্রাম খুলে ফেলবে। পরবর্তী বছরই হজ্জ করা তার কর্তব্য হবে। তার অর্থ, তার ইহরাম খুলে ফেলা জায়েয। সাবাগাতা বিনতুষ যুবায়র বর্ণিত হাদীসও সেই কথাই প্রমাণ করে। তাতে নবী করীম (স) বলেছেন, তুমি শর্ত কর এবং বল যে, আমার মহল হচ্ছে সেটি, যেখানে আমাকে আটক করা হয়েছে। তার অর্থ, তাকে জানিয়ে দেয়া হল যে, সেটিই তার স্থান। তা এই মৌল নীতির ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, ইহরাম যা করতে বলে, তা শর্তের কারণে নিষিদ্ধ হবে না। তাছাড়া মহল-ও সময়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নয়। বিবেচনা করলে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, যে উমরা পূর্ণ করা যায় নি বলে হালাল হতে হয়েছে, তাতে জন্তু যবেহ করার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখনই তা করা হবে, জায়েয হবে। এই জন্তু যবেহও তাই। যখন পরিবেষ্টনের কারণে ওয়াজিব হবে, তা ওয়াজিব হবে সময় অনির্দিষ্টভাবে। কেননা তা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে ইহরাম খুলে ফেলার ঘটনা ঘটবে। যেমন পূর্ণ করতে না পারা উমরার ব্যাপার।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ 'এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না।' হজ্জযাত্রী বা উমরার জন্যে যাত্রী উভয়ের জন্যেই মাথা মুণ্ডন না করার এই নির্দেশ। কেননা এর পূর্ববর্তী আয়াত হচ্ছে ঃ 'এবং তোমরা সম্পূর্ণ কর হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্র জন্যে।' আমাদের কারোর অপর কারোর মাথা মুণ্ডন করে দেয়াও নিষিদ্ধ হয়েছে এবং সকলের নিজের মাথা মুণ্ডন করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ দুটি সম্ভাব্যকেই শামিল করে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ এবং 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না।' এ আয়াত

আমাদের প্রত্যেককে আত্মহত্যা করতে এবং প্রত্যেককে অপর প্রত্যেককে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই বোঝা গেল, ইহরাম বাধা লোকের পক্ষে অপর কারোর মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ। তা করলেই তার দণ্ড দেয়া জরুরী হবে। এ-ও বোঝা যায় যে, কেরান ও তামাত্তু হজ্জে মাথা মুণ্ডনের পূর্বেই কুরবানীর জন্তু যবেহ করতে হবে। কেননা যাদের একই সময় মাথা মুণ্ডন ও কুরবানী যবেহ করতে হবে, তাদের সকলের জন্যেই উক্ত কথা। তাই কুরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বে যে লোক মাথা মুণ্ডন করবে, তাকেই দণ্ড স্বরূপ একটা পশু যবেহ করতে হবে। কেননা সে পশু যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে সময়ের বরখেলাফ কাজ করেছে।

পরিবেষ্টিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন এ বিষয়ে যে, তাকে মাথা মুণ্ডন করতে হবে, কি হবে না। আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ বলেছেন, না, তাকে মাথা মুণ্ডন করতে হবে না। আবূ ইউসূফের দুটি কথার একটি হচ্ছে, তাকে মাথা মুণ্ডন করতে হবে। মাথা মুণ্ডন না করলে অবশ্য তার কোন অপরাধ হবে না। তাঁর থেকে পাওয়া অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, মাথা মুণ্ডন করা একান্তই জরুরী। স্ত্রীলোক তার স্বামীর অনুমতি না হলেও নফল উমরা বা হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধতে পারবে, ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই ইহরাম বাঁধতে পারবে— এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। অবশ্য স্বামী ও মনিবের পক্ষে স্ত্রী ও ক্রীতদাসকে মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা ছাড়াই ইহরাম ভাঙ্গানোর অধিকার আছে। আর তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ইহরাম ভঙ্গকারী সুগন্ধি ব্যবহার করিয়ে বা ভাল পোশাক পরিধান করিয়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে, পরিবেষ্টিত হওয়া ব্যক্তির জন্যে ইহরাম ভাঙ্গতে মাথা মুণ্ডন ওয়াজিব নয়। কেননা এ দুজনই পরিবেষ্টিত যেন। মাথা মুণ্ডন ছাড়াই যে লোক তাদেরকে হালাল হতে বাধ্য করবে সে তাদের উপর জোর-জবরদস্তিমূলক কাজ করেছে'। যদি মাথা মণ্ডন ওয়াজিবও হয়, তাহলে তা সম্ভব ক্রীতদাসের মাথা মুণ্ডন করিয়ে আর মেয়েলোকটির চুল কাটিয়ে। উপরন্তু মাথা মুণ্ডন তো হজ্জের অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে গণ্য। যাবতীয় অনুষ্ঠান যথাযথ পালনের এক পর্যায়ে তা করতেই হয়। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় প্রমাণিত নয়। তবে কোন দলীল ছাড়া তাকে হজ্জের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে প্রমাণ করা জায়েয হবে না। কেননা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাথা মুণ্ডন মূলত হজ্জের অনুষ্ঠানমালার অন্তর্ভুক্ত নয়। ক্রীতদাস ও স্ত্রীলোকটির ক্ষেত্রেও এই একই 'ইল্লাত' কিয়াস করা যেতে পারে যে, মনিব ও স্বামী উভয়ের জন্যে ক্রীতদাস ও স্ত্রীকে হালাল হতে বাধ্য করা জায়েয মাথা মুণ্ডন ও চুল কাটা ছাড়াই। যেসব অনুষ্ঠানের মধ্যে চুল কাটা বা মাথা মুণ্ডন বিন্যস্ত তা সব না করলে। সব পরিবেষ্টিত লোকের জন্যেই এই ইল্লাতের দরুন মাথা মুণ্ডন ছাড়াই হালাল করানো জায়েয রয়েছে। নবী করীম (স)-এর বলা একটি কথা থেকেও তা-ই বোঝা যায়। হুদায়বিয়ার উমরা সম্পন্ন করতে পারার পূর্বেই উমরা ত্যাগ করে মাথার চুড়া ভেঙ্গে ফেলতে ও চিরুণী চালাতে আদেশ করলেন এবং উমরা ত্যাগ করে গোসল করতে ও হজ্জের তাহলীল বলতে বললেন। কিন্তু তখন তাঁকে না মাথা মুন্ডন করতে ও না চুল কাটতে আদেশ করলেন। অথচ তখন উমরার সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণই রয়ে গিয়েছিল। এ থেকে বোঝা গেল যে, অনুষ্ঠানাবলী পালন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইহরাম খুলে ফেলা যার জন্যে জায়েয, তাকে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হতে হবে—. এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তাতে এই দলীল-ও রয়েছে যে, মাথা মুণ্ডন অনুষ্ঠানমালা পূর্ণ করার শেষ পর্যায়ে করার কাজ। অনুষ্ঠানমালার সমস্ত কাজ-ই এমনিভাবে পরস্পর সুবিন্যস্ত হয়ে আছে। ইমাম মুহাম্মাদ এ পর্যায়ে যুক্তি পেশ করেছেন এই বলে যে, অনুষ্ঠানমালার সব কাজই যখন পড়ে গেছে, তখন মাথা মুণ্ডনও করার প্রয়োজন থাকবে। আর এ-ও সম্ভব যে, ইহরাম শেষ করার জন্যে মাথা

মুণ্ডনও পড়ে যাবে। তাঁর এই কথায় দুই দিকের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি, হয়ত তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি যে, মাথা মুণ্ডন অনুষ্ঠানাবলীর শেষ কাজ। তাই অনুষ্ঠানাবলীর কোন কাজই যখন করা যায় নি, তখন মাথা মুণ্ডন যখন ওয়াজিব, তখন তা অনুষ্ঠানের একটি অংশ। অথচ পরিবেষ্টিত ব্যক্তির পক্ষে কোন অনুষ্ঠান পালনের যখন সুযোগ নেই, তখন মাথা মুণ্ডনের কাজটা না করাই সমীচীন।

যদি বলা হয়, অনুষ্ঠানাবলী পড়ে গেছে তো শুধু এই কারণে যে, তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মাথা মুণ্ডন সম্ভব নয়— এমন কথা তো বলা যায় না। অতএব তা তার করা উচিত।

জবাবে বলা যাবে, কথাটি ভুল। কেননা পরিবেষ্টিত ব্যক্তির পক্ষে যদি মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণ সম্ভব হতো, সে প্রস্তর নিক্ষেপের কাজটা করতে পারত, কিন্তু কাবার নিকট পৌঁছা সম্ভব না হতো, আরাফাতের ময়াদানে অবস্থানও অসম্ভব হতো, তাহলে মুযদালিফায় অবস্থান তার জন্যে বাধ্যতামূলক হতো না। পাথরও নিক্ষেপ করতে হতো না— যদিও তা করা সম্ভবপর ছিল। কেননা তাতে অনুষ্ঠানাবলীর শেষে বিন্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মাথা মুণ্ডন যখন অন্যান্য কাজের শেষে করণীয়, তার পূর্বে তা করণীয় নয়, তাহলে তা পড়ে যাওয়া— ও করা কর্তব্য— না-হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যেমন আপত্তি তোলা হয়েছে এ কথায় যে, যে কাজ করা সম্ভব তা কেন করা হবে না ? হ্যাঁ, তা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তা বাধ্যতামূলক হবে না, যখন সে পরিবেষ্টিত অবস্থায় পড়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসূফের মতের পক্ষে যদি কেউ এই যুক্তি দেখায় যে, আল্লাহ্‌র কথাঃ 'কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করবে না'— এতে নিষেধের অবসানের জন্যে কুরবানীর জন্তুর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া আবশ্যক। লক্ষ্যস্থল তো তার পূর্বের স্থানের বিপরীত। ফলে মোট কথাটি দাঁড়াবে ঃ 'তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছে না যাবে,' যখন তা পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা মাথা মুণ্ডন কর। এতে মাথা মুণ্ডন করা ওয়াজিব হয়ে দাড়ায়।

জবাবে বলা যাবে, একথাটি সঠিক নয়। কেননা মুবাহ হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিপরীত অবস্থা। ওয়াজিব হওয়াও নিষিদ্ধ হওয়ার বিপরীত। দুই বিপরীতের কোন একটির দিকে তাকে ফিরানো ওয়াজিব হবে না এবং তা অপরটির অপেক্ষা উত্তমও হবে না। তা হল মুবাহ হওয়া। উপরন্তু, নিষেধ উঠে গেলে তার বিপরীতটা ওয়াজিব হিসেবে করা ওয়াজিব হয় না। নিষেধ নিঃশেষ হয়ে গেলে জিনিসটি পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় অবশিষ্ট হয়ে থাকাই কাম্য। ফলে ইহরাম বাঁধার পূর্বে যেরূপ ছিল সেই রূপই হয়ে যাবে। অতঃপর ইচ্ছা হলে মাথা মুণ্ডন করবে, না হয় করবে না। জুমআর নামাযের কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধও চলে যাবে। হালাল হওয়ার পর শিকার করার নিষেধও চলে যাবে। কিন্তু তাই বলে অতঃপর ক্রয়-বিক্রয় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে— এমন কথা নয়। আসলে ক্রয়-বিক্রয় ও শিকার করা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া তো আর লক্ষ্য নয়। মূলত সে দুটি কাজ মুবাহ। শুধু জুম'আ ও হজ্জের ইহরামের কারণে তা নিষিদ্ধ হয়েছিল। আবূ ইউসূফ নবী করীম (স)-এর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারেন। তিনি বলেছিলেন, তিনবার رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ 'আল্লাহ মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন।' যারা চুল কাটে তাদের জন্যে মাত্র একবার দো'আ করেছেন। হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়া কালে উমরায় তা বলা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা গেল যে, তা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাবলীর একটি। যখন তা একটি অনুষ্ঠান, তখন তা করা ওয়াজিব। পরিবেষ্টিত নয় যারা, তারা হজ্জের অনুষ্ঠানমালার শেষ পর্যায়ে তা করে। আর এইরূপ জবাব

দেন যে, নবী করীম (স) ও সাহাবিগণের পক্ষে আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করার পূর্বেই হালাল হওয়া ও মাথা মুণ্ডন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল, পরে নবী করীম (স) যখন তাঁদেরকে ইহরাম খুলে ফেলে হালাল হতে বললেন, তখন তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেন এই আশায় যে, হয়ত তাদের পক্ষে কাবায় পৌছা সম্ভব হবে। তখন পুনরায় তাঁদেরকে হালাল হতে বলা হল। পরে নবী করীম (স) নিজেই অগ্রসর হয়ে তাঁর কুরবানীর জন্তু যবেহ করে দিলেন এবং তাঁর দেখাদেখি সঙ্গীগণও তাই করলেন এবং কেউ মাথা মুন্ডন করলেন, কেউ চুল কাটলেন। তখন নবী করীম (স) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্যে রাসূলের পূর্ণ মাত্রায় অনুসরণের জন্যে ও দ্রুত আদেশ পালনের জন্যে দো'আ করলেন। তখন বলা হল, হে রাসূল! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্যে তিনবার দো'আ করলেন। আর চুল কর্তনকারীদের জন্যে মাত্র একবার দো'আ করলেন—এর কারণ কি? তখন জবাবে নবী করীম (স) বললেন ঃ ওরা কোন সংশয় প্রকশ করেনি। তার অর্থ, তারা সংশয় প্রকাশ করেনি এ ব্যাপারে যে, মাথা মুণ্ডন চুল কাটার তুলনায় অধিক উত্তম বলে তারা জেনে শুনেই তার সওয়াবটা পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। অন্যরা সেইমতো সওয়াব পাওয়ার যোগ্য হয়নি।

যদি বলা হয়, অবস্থা যেরূপই হোক, রাসূল (স) তো তাদেরকে মাথা মুণ্ডন করারই আদেশ করেছিলেন। তাঁর এই আদেশ পালন করা ছিল ওয়াজিব। তিনি যে মুণ্ডনকারী ও চুল কর্তনকারী উভয়ের জন্যে দো'আ করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাজটা মূলত হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানমালার মধ্যে গণ্য। আর কাবায় পৌছার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করতে তাঁরা অ-রাজী ছিলেন বলে যা বলেছি— যদিও নবী করীম (স) তা করতে আদেশ করেছিলেন— তা দলীলের পরিপন্থী কিছু নয়। তা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তা নিশ্চয়ই একটি জরুরী কাজ। এ কথা বলা হয় যে, মিসওয়ার ইবনে মাখরিমা ও মারওয়ান উবনুল হিকাম হুদায়বিয়া সংক্রান্ত কাহিনী বর্ণনায় যে কথা বলেছিলেন, তাতে নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ احلوا وانحروا 'তোমরা হালাল হয়ে যাও এবং জন্তু যবেহ কর।' কোন কোন বর্ণনায় মাথা মুণ্ডনের কথাও এসেছে। অতএব আমরা দুটো শব্দকেই রাখব এবং বলব, যা করেই ইহ্রাম খোলা হবে, তাতেই ইহ্রাম খুলে হালাল হওয়া হবে। কেননা নবী করীম (স) এই কথাটিতে শুধু হালাল হতে বলেছেন। আর 'মাথা মুণ্ডন কর' বলে থাকলে তা এই হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই বলা। ঠিক যে মাথা মুণ্ডনই করতে হবে, অন্য কিছু করলে হালাল হওয়া যাবে না, এমন কথা নয়। হালাল হলেই তারা সওয়াব পাওয়ার যোগ্য হবে। কেননা তাতেই রাসূলের আদেশ পালন হয়ে যাবে। তবে চুল কাটার তুলনায় মাথা মুণ্ডন করা উত্তম এজন্যে যে, তাতে রাসূলের অনুসরণে চূড়ান্ত মাত্রার চেষ্টা বোঝায়।

হজ্জের ইহরাম খোলার পর পরিবেষ্টিত ব্যক্তির কুরবানীর জন্তু নিয়ে কি করা উচিত

প্রতিরুদ্ধ পরিবেষ্টিত মক্কা যাত্রীর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাসমূহ বলার পর ইরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ –

তবে তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে, সে যেন সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী দেয় .....।

আগের কালের ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহ্‌বিদগণ হজ্জের পথে পরিবেষ্টিত হাজীদের ব্যাপারে তারা যখন কুরবানী করে হালাল হয়ে যাবে— তখন করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন মত দিয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস থেকে এবং মুজাহিদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, দুজনেই বলেছে, তাকে উমরা ও হজ্জ— দুটিই আবার করতে হবে। হজ্জের মাসসমূহে দুটো যদি এক সাথেই করা হয়, তা হলে তাকে একটি জন্তু যবেহ্ করতে হবে। সে হবে তামাত্তু হজ্জকারী, আর হজ্জের মাসসমূহে দুটো এক সাথে না করলে তাকে জন্তু যবেহ্ করতে হবে না। আল-কামা, আল-হাসান, ইবরাহীম, সালিম, কাসিম ও মুহাম্মাদ ইবনে সিরীনও উক্ত মতই সমর্থন করেছেন, আর হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণও তাই বলেছেন। আইয়ূব ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ কিসাসের হুকুম দিয়েছেন অথবা শত্রু তোমা থেকে এক হজ্জ থেকে আর এক হজ্জ পর্যন্ত ও এক উমরা থেকে আর এক উমরা পর্যন্ত নিয়ে নেবে। শবী বলেছেন, তাকে এক হজ্জ করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা তার হজ্জ ও উমরা— দুটো করাই ওয়াজিব বলেছেন। যখন হালাল হবে, তখন একটা পশু যবেহ্ করতে হবে তাকে। পরে সেই বছর আর হজ্জ করে নি। সে যদি কুরবানীর আগেই তার ইহ্‌রাম খুলে ফেলে, পরে পরিবেষ্টন শেষ হয়ে যায়, তার পরে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে ও সেই বছরই হজ্জ করবে, যে বারে উমরা করে নি। তা এজন্যে যে, এই উমরা তো তা-ই যা পূর্বের বারে করা যায় নি। কেননা যে লোক হজ্জ হারিয়ে ফেলবে তার কর্তব্য হচ্ছে উমরা করে হালাল হয়ে যাওয়া। সে যদি হারানো হজ্জ করতে পারে, তাহলে পরে তাকে হারানো উমরা করতে হবে। একটি জন্তুও যবেহ্ করতে হবে। যা পরিবেষ্টনের কারণে অ-কৃত রয়ে গেছে, হালাল হওয়ার জন্যেই তা করতে হবে। হারানোর কারণে যে উমরা করণীয় ছিল, এটা তার স্থলাভিষিক্ত হবে না। কেননা মৌলিকভাবে এমন উমরা নেই, যার বিকল্প হবে পশু যবেহ্ করা। যেমন, কেউ যদি উমরার মানত করে, তার বিকল্প হিসেবে জন্তু যবেহ করা যাবে না। ওযর অবস্থায়ও না, সম্ভাব্যের অবস্থায়ও নয়। অনুরূপভাবে যে লোক উমরাকে ফরয বানাবে, তার বিকল্প উমরাকে বানানো যায় না কোন অবস্থাতেই। হারানো বা করতে না পারার দরুন উমরার আমল বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে জন্তু যবেহ তারও বিকল্প হতে পারে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, জন্তু যবেহ্ শুধু ইহ্‌রাম ভাঙ্গার জন্যে— হালাল হওয়ার জন্যে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এ থেকে তার বোঝা যায় যে, করতে না-পারার দরুন যে উমরা বাধ্যতামূলক হয়, তা করতে না-পারার পূর্বে করা জায়েয নয়। কেননা তা সময় হয়নি, কারণও ঘটেনি। পরিবেষ্টনের জন্তু যবেহ করা জায়েয এবং হারানোর পূর্বে তদ্দারা হালালও হওয়া যায়। এ ব্যাপারে আমাদের হানাফীদের এবং বিরোধীদের পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল, জন্তু যবেহ শুধু হালাল হওয়ার জন্যে, তা উমরার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নয়। ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর পক্ষেও পরিবেষ্টনের জন্তু যবেহ্ করাকে করতে না-পারার দরুন ওয়াজিব হওয়া উমরার বিকল্প বলা সম্ভব হয়নি। কেননা তাঁরা দুজনই বলেছেন, যে লোক হজ্জ করতে পারেনি, তাকে হজ্জও করতে না-পারা উমরা দুটিই করতে হবে। আর সেই সাথে কুরবানীও। তাঁদের মতে পরিবেষ্টিত হাজীর কুরবানী— যা হজ্জ করতে না পারার দরুন বাধ্যতামূলক হয়— উমরার বিকল্প হতে পারে না। করতে না-পারার পর-ও তা তার স্থলাভিষিক্ত হয় না।

যদি বলা হয়, কুরবানীর দিনের আগেই উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর মাত্‌য়ার তিনটি রোযা রাখা তোমার মতে জায়েয, তা কুরবানীর বিকল্প, আর মূল কুরবানীও। তা কুরবানীর দিনের আগে যবেহ করা জায়েয হবে না।

জবাবে বলা যাবে, তা জায়েয হয় মাত'আর কারণের দরুন। সে কারণ হচ্ছে উমরা। ফলে কুরবানী করার সময়ের পূর্বে কিছু রোযা রাখা জায়েয হবে। কিন্তু পরিবেষ্টিত হাজীর ক্ষেত্রে উমরা বাধ্যতামূলক হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যায়নি। কেননা তাঁর কারণ হচ্ছে কুরবানীর দিন ফজর উদয় হওয়া আরাফায় অবস্থান গ্রহণের পূর্বে। এই কারণে জন্তু যবেহ করা সেই উমরার স্থলাভিষিক্ত হবে না, যা করা যায়নি বলে বাধ্যতামূলক হয়েছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জন্তু যবেহ করা সেই উমরার স্থলাভিষিক্ত নয় যা করতে না পারার দরুন বাধ্যতামূলক হয়েছে। তবে তা উমরাকারীর জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। সে তো করতে না পারার ভয় পায় না। কেননা সে উমরার সময় নির্দিষ্ট নয়, যে-কোন সময়ই করা যেতে পারে। তা থেকে বোঝা গেল, এই জন্তু যবেহ উমরা করতে না পারার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তা তো হালাল হওয়ার কাজটি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত হয়েছে। তার দলীল হচ্ছে, কে করতে না পারার ভয় করে, কে ভয় করে না— এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি পশু যবেহ করার বাধ্যবাধকতার দিক দিয়ে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স)-এর হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি ব্যাহত হল বা যার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া হল, সে হালাল হয়ে গেল এবং তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। এতে উমরার কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদি হজ্জের সঙ্গে উমরা করাও জরুরী হতো তাহলে এ হাদীসে তার উল্লেখ নিশ্চয়ই করা হতো। যেমন হজ্জ কাযা করার আবশ্যিকতা বলা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, এ হাদীসে পশু যবেহ্‌ করার কথাও তো বলা হয়নি। অথচ পশু যবেহ করা ছাড়া হালাল হওয়া জায়েয নয়। এ হাদীসটিতে নবী করীম (স) রোগের কারণে পরিবেষ্টিত হাজীর কর্তব্য বলতে চেয়েছেন এবং যার কাযা করে হালাল হওয়া কর্তব্য তার উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদুবনে যুবায়র বর্ণিত হাদীসে এতদূর গিয়েছে যে, যে লোক হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা নেবে আল্লাহ্‌র পরিবেষ্টিত ব্যক্তির করণীয় বলার পর বলেছেন, একথা দ্বারা সেই উমরার কথা বলতে চেয়েছেন, হজ্জের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়ার কারণে যা করা ওয়াজিব হয়েছিল— যখন উমরা থেকে হজ্জ পর্যন্ত একসাথে করবে। কেননা এই হজ্জের ইহরাম থেকে হজ্জের মাসসমূহে হালাল হয়েছিল। তাকে তার বিনিময় অবশ্যই দিতে হবে। পরিবেষ্টিত হাজী সম্পর্কে ইবনে আব্বাস থেকে আর একটি বর্ণনা এসেছে। সেটি আবদুর রাযযাক, সওরী, ইবনে আবূ নজাইহ, আতা ও মুজাহিদ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, শত্রুর আটকই গণনার যোগ্য। যদি আটককৃত হয় আর তার সাথে কুরবানীর জন্তু না থাকে, তাহলে সেখানেই হালাল হয়ে যাবে, তার সাথে কুরবানীর জন্তু থাকলে তার দ্বারা হালাল হবে। কিন্তু কুরবানীর জন্তু যবেহ না করে হালাল হবে না। তাকে হজ্জ করতে হবে না। উমরাও নয়। অবশ্য আতা এই বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছেন একটি বর্ণনার ভিত্তিতে। সেটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর ইবনে জুরাইজ আমর ইবনে দীনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ শত্রু যাকে পরিবেষ্টিত করেছে তাকে হজ্জ করতে হবে না, কুরবানী দেয়াই তার জন্যে যথেষ্ট। উমরাও করতে হবে না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি আতার নিকট এই হাদীসটি উল্লেখ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি শুনেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে পরিবেষ্টিত ব্যক্তির কুরবানী করা কর্তব্য নয়, তার এই পরিবেষ্টনের দরুন যা করতে পারল না, তার কাযা করাও জরুরী নয়? বললেন, না, আমি শুনিনি। তিনি এ হাদীসটিকে অস্বীকার করলেন। বস্তুত এ হাদীসটি গ্রহণ অযোগ্য— কুরআনেরও খেলাফ। নবী করীম (স)-এর মুতাওয়াতির বর্ণনা ধারায় বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَانْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ -

তোমরা যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যা কুরবানী করা সহজ, তাই করবে। তবে কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার আগে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যা কুরবানী করা সহজ তাই করবে' দুটির যে কোন একটি দিক দিয়ে গ্রহণীয়! একটি— যে কুরবানী তার জন্যে সহজ তাই করবে। দ্বিতীয়— সে যে কুরবানীর জন্তু পাঠাতে পারে তাই পাঠাবে। এ কথার দাবি হচ্ছে, পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে— সে যখনই হালাল হতে চাইবে— কুরবানী করবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ 'কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না।' এরূপ অবস্থায় কুরবানী না করেই হালাল হওয়া সঙ্গত, এমন কথা একজন কি করে বলতে পারে ? অথচ কুরআনের আয়াতই তা ফরয করেছে এবং নবী করীম (স) হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে সঙ্গীদেরকে কুরবানী করে হালাল হয়ে যাবার আদেশ করেছিলেন।

পরিবেষ্টিত হজ্জযাত্রী যদি হালাল না হয় এবং হজ্জ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাবা ঘরে পৌঁছায়, তাহলে সে কি করবে, এ পর্যায়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। হানাফী ফিকাহবিদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তার উমরা করে হালাল হয়ে যাওয়া উচিত। সেই ইহরাম দ্বারাই হজ্জ কার্য সম্পন্ন করা তার জন্যে সহীহ হবে না। ইমাম মালিক বলেছেন, পরবর্তী বছর হজ্জ করা পর্যন্ত তার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থেকে যাওয়া জায়েয হবে। নতুবা উমরা করে হালাল হতে চাইলেও তাতে আপত্তি নেই।

তার এই ইহরামের থেকে একবার হজ্জ হারানোর পর পরবর্তী হজ্জ করা জায়েয নয়, তার দলীল হচ্ছে, উমরা করে তার হালাল হয়ে যাওয়া সর্বসম্মত মত। তার বর্তমান ইহরাম যদি এরকমের হয়ে গিয়ে না থাকত যে, তদ্দ্বারা পরবর্তী হজ্জ করা যাবে না, তাহলে তা খুলে ফেলে হালাল হয়ে যাওয়া কখনই জায়েয হতে পারত না। প্রথম বছরই তার পক্ষে হজ্জ করা সম্ভব হলে তো সে তা করত, তা না করে হালাল হয়ে যাওয়া তার পক্ষে কখনই জায়েয হতো না। আর এতেই দলীল রয়েছে এ কথার যে, তার বর্তমান ইহরাম এমন হয়ে গেছে যে, তা নিয়ে পরবর্তী হজ্জ কিছুতেই করা যেতে পারে না। উপরন্তু হজ্জ নষ্ট হয়ে যাওয়া বা নষ্ট করে দেয়া তো বাতিল হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র এই কথার দ্বারা ঃ 'এবং তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র জন্যে সম্পূর্ণ কর।'

এ থেকে জানা গেল যে, ইহরাম শেষ করে হালাল হওয়া যখন তার জন্যে জায়েয, তখন এ অবস্থায় উমরার কার্যাবলী করাই তার কর্তব্য, হজ্জের কার্যাবলী নয়। কেননা হজ্জের কার্যাবলী করা সম্ভব হওয়ার পর উমরা করে হালাল হওয়ার কারণে তার হজ্জকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। এই অবস্থা হয়েছিল শুধুমাত্র সেই বছর, যে বছর রাসূলে করীম (স) হজ্জ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ও তা করেওছিলেন। পরে তা মনসূখ হয়ে যায়। হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ

مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأَضْرِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ -

নবী করীম (স)-এর যুগে দুটি মাত্‌য়া চালু ছিল। আমি সে দুটি থেকে নিষেধ করছি। তার উপর চালু করছি মেয়েলোকের মাত্‌য়া ও হজ্জের মাত্‌য়া।

হযরত উমর (রা) 'হজ্জের মাত্‌য়া' বলে তা ভেঙ্গে যাওয়াই বুঝিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে যে নবী করীম (স) বিদায় হজ্জে তাঁর সাহাবিগণকে আদশে করেছিলেন।

যে লোক নফল হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পরিবেষ্টিত হয়েছে, সে কি করবে— এই ক্ষেত্রেও ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মতে দিয়েছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাকে কাযা করতে হবে, পরিবেষ্টন রোগের কারণে হোক কিংবা শক্র কর্তৃক হোক— তাতে কোন পার্থক্য হবে না আর এ দুটো থেকেই যদি কুরবানীর দ্বারা হালাল হয়ে থাকে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী রোগের কারণে পরিবেষ্টিত হওয়াকে গণ্য করেন না। তাঁরা দুজনই বলেছেন, শক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে, তার পরে হালাল হয়ে থাকলে হজ্জ ও উমরা— কোনটাই তাকে কাযা করতে হবে না। তবে কাযা করা ওয়াজি, বরং ফরয, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর।

এই আদেশকে ফরয প্রমাণ করে হজ্জ বা উমরা শুরু করলে তা সম্পূর্ণ করার একান্তই কর্তব্য। শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার কারণে হজ্জ ও মানত দুটো বাধ্যবাধকথার দিক দিয়ে সমান হয়ে গেছে। অতএব তা সম্পূর্ণ না করে মাঝখানেই তা ত্যাগ করা হলে তা কাযা করা বাধ্যতামূলক হবে। তা করতে মাযুর ছিল কি ছিল না, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা যা একবার ফরয হয়েছে, তা ওযরের কারণে পরিত্যক্ত হতে পারে না। নষ্ট হয়ে গেলে তা কাযা করা ফরয, এ বিষয়ে যখন সব ফিকাহবিদ একমত, তখন পরিবেষ্টিত হওয়ার দরুন অসম্পূর্ণ থেকে গেলে তা-ও অবশ্যই কাযা করতে হবে।

এই কথাটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী বর্ণনা করেছেন ঃ 'যে বাধাপ্রাপ্ত হবে বা যাকে থামিয়ে দেয়া হবে, সে হালাল হয়ে গেল। পরবর্তী বছর তাকে হজ্জ করতে হবে।' এতে ফরয হজ্জ ও নফল হজ্জের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

উপরন্তু যে লোক ইহরামের কর্তব্যসমূহ পরিহার করবে, সে হুকুমের বাধ্যবাধকথা পরিহার করায় সে মাযুর ছিল কি ছিল না— এতে পার্থক্য নেই। তার দলীল হচ্ছে, আল্লাহ্ মাথার কষ্টদায়ক রোগের দরুন মাথা মুণ্ডনকারীর ওযর কবুল করেছেন; কিন্তু তাকে ফিদিয়া দেয়ার বাধ্যবাধকথা থেকে রেহাই দেন নি। সে ফরয ইহরামে ছিল কি নফল ইহরামে— তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, দুটিই সমান ও অভিন্ন। অনুরূপভাবে ফরয হজ্জে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি সম্পর্কিত হুকুম যা নফল হজ্জে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি সংক্রান্ত হুকুম কাযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে তা স্ত্রী-সঙ্গমের কারণে বিনষ্ট হওয়া ও পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে তা ত্যাগ করা সম্পূর্ণ সমান ও অভিন্ন হওয়া কর্তব্য। ইহরাম বাধা থাকা অবস্থায় কোন অপরাধ করে বসলে তার কাফফারা দেয়া ওয়াজিব, মাযুর হোক কি অ-মাযুর। পরিবেষ্টিত হলে কাযা করা ওয়াজিব, মাযুর হলেও। এ বিষয়ে সকলেই একমত, এ ব্যাপারেও যে, রোগীকেও তো কাযা করতে হবে, যদি সে হজ্জ হারিয়ে ফেলে। হারাতো সে মাযুর হলেও। কোন ওযর ছাড়াই হারাবার ইচ্ছা করলেও তা কাযা করা বাধ্যতামূলক।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, ইহরাম বেধে কাজ শুরু করার পর যা করণীয় হয়, তাতে মাযুর ও অ-মাযুর উভয়ই সমান। সে তো পরিবেষ্টিত অবস্থায় রয়েছে। অতএব কাযা করার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহৃত হতে পারে না।

হযরত আয়েশার ঘটনা থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। তিনি বিদায় হজ্জের সময় ঋতুবতী হল। তিনি ছিলেন উমরার জন্যে ইহরাম বাঁধা। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বললেন, তোমার মাথার চূড়া ভেঙ্গে ফেল, চুলে চিরুনী কর এবং হজ্জের তাহলীল কর, উমরা ত্যাগ কর। পরে হজ্জ সমাপ্ত করার পর আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে তাকে দিয়ে উমরা করানোর আদেশ করলেন। তিনি তানয়ীম থেকে তাঁকে উমরা করালেন। বললেন— এটাই তোমার উমরা শুরু করার স্থান। ওযরের কারণে যে উমরা তিনি করতে পারে নি, তা-ই কাযা করার আদেশ করলেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ইহরাম থেকে বের হতে যে লোক মাযুর, কাযা করা তাঁর কর্তব্য থেকে যায়, তা প্রত্যাহৃত হয় না। এ-ও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) ও তাঁর সঙ্গীগণ যখন হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হল, তখন তাঁরা উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তী বছর তার কাযা করেন। এই জন্যে তার নামকরণ হয় ঃ عُمْرَةُ الْقَضَا 'কাযা উমরা'। যদি তা আদায় না করতেন, তাহলে তা শুরু করার পর বাধ্যতামূলক হতো না, কাযা করা ওয়াজিব হতো না এবং তার নামও 'উমরাতুল কাযা' রাখা হতো না। আর তাহলে নতুন করে উমরা করার নিয়ত করতে হতো। আর হালাল হওয়ার পর কাযা করা বাধ্যতামূলক হওয়ার এটাই দলীল।

যে পরিবেষ্টিত হাজী কুরবানীর জন্তু পায় না

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যে কুরবানী করা সহজ হবে, তা-ই করবে।

যে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি কুরবানী করার জন্তু পায় না, সে কি করবে— এ বিষয়ে মনীষিগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। হানাফী ফিকাহবিদরা বলেছেন, যতক্ষণ কুরবানীর জন্তু পাবে না ও তা যবেহ করবে না, ততক্ষণ হালাল হবে না। আতা বলেছেন, সে দশটি রোযা রাখবে, তারপরে হালাল হবে। যেমন তামাত্তুকারীকে কুরবানীর জন্তু না পেলে করতে হয়। এই পর্যায়ে ইমাম শাফেয়ীর দুটি কথা। একটি— কুরবানী না দিয়ে সে হালাল হতেই পারবে না। আর দ্বিতীয়টি— কোন কিছু করতে না পারলে সে হালাল হয়ে যাবে তাৎক্ষণিকভাবে। আর পরে সে একটি জন্তু যবেহ করবে যখন তা করতে সক্ষম হবে। এ-ও বলা হয়েছে যে, কোন কিছু করতে সক্ষম না হলে তার করার কিছু নেই। যে হয় খাবার খাওয়াবে, কিংবা রোযা রাখবে।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথার স্বপক্ষে ইমাম মুহাম্মাদ দলীল এনেছেন এই যে, মাত্য়ার কুরবানী তো দলীলসিদ্ধ ও সমর্থিত। তামাত্তুকারীর জন্যেও হুকুম রয়েছে, যাতে কুরবানী করতে হবে কিংবা রোযা রাখতে হবে, যদি কুরবানীর জন্তু না পায়। আর অকাট্য দলীল সিদ্ধ বিষয়াবলীর একটির উপর অপরটি কিয়াস করা যেতে পারে না। আর একটি দিক হচ্ছে কিয়াস করে কাফফারা প্রমাণ করা যায় না। পরিবেষ্টিত ব্যক্তির জন্যে পশু যবেহ করার কথা যখন বলাই হয়েছে, তখন কিয়াস করে অন্য কিছু প্রমাণ করতে চেষ্টা করা উচিত হতে পারে না। কেননা তা তো অপরাধের কাফফারা হিসেবে পশু যবেহ করার ব্যাপার। কেননা কিয়াস করে কাফফারা প্রমাণ করতে যাওয়া নিষিদ্ধ। উপরন্তু তাতে ঠিক যেটি দলীল ভিত্তিক সেটি পরিহার করা হয়। কেননা আল্লাহ্ তো বলেছেন ঃ 'কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার আগে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না'। তাই কুরবানীর জন্তুর তার স্থানে পৌঁছার পূর্বেই মাথা মুণ্ডন করা যারা মুবাহ্ বলে, তারা কুরআনের অকাট্য দলীলের বিরোধিতা করে। আর কিয়াসের সাহায্যে অকাট্য দলীল পরিহার করা কখনই জায়েয হতে পারে না।

মক্কাবাসীদের পরিবেষ্টিত হওয়া

মক্কার অধিবাসীদের পরিবেষ্টিত হওয়ার ব্যাপার অন্য কোন দিক দিয়ে ঘটতে পারে না, কেবল আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করার পথে বাধাগ্রস্ত হলেই পরিবেষ্টিত হওয়ার ব্যাপার ঘটতে পারে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তাদের পক্ষে কাবা ঘর পর্যন্ত পৌছা যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে পরিবেষ্টিত হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেননা হয় তারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, না হয় উমরার। যদি তারা উমরাকারী হয়, তাহলে তারা উমরা করবে। আর উমরা তো শুধু কাবা ঘরের তওয়াফ ও সাঈ' মাত্র। আর সে কাজ থেকে পরিবেষ্টিত হওয়ার কোন প্রশ্ন হতে পারে না। আর যদি হজ্জের জন্যে ইহরাম বেঁধে থাকে, তা হলে সে আরাফাতের ময়দানে যেতে বিলম্ব করতে পারে শেষ সময় পর্যন্ত, যদি পরিবেষ্টিত নাও হয়, তবু। যদি আরাফাতে অবস্থানের সময় হারিয়ে ফেলে তা হলে সে হজ্জ-ই হারিয়ে ফেলল বলতে হবে। তখন সে খালি সময়ে উমরাটা করে নেবে। তখন সে উমরাকারী হয়ে যাবে, পরিবেষ্টিত হওয়ার প্রশ্ন হবে না।

ইহরাম বাঁধার পর মাথায় কষ্ট বা কোন রোগ হওয়া

আল্লাহ বলেছেন ঃ কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না। তা ছাড়া তোমাদের কেউ যদি রোগী হয়..... ইহরাম বাধা পরিবেষ্টিত হওয়া বা না-হওয়া লোকদের মধ্যে কেউ রোগী হলে বা কারোর মাথায় কোনরূপ কষ্ট হলে সে রোযা রেখে ফিদিয়া দেবে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, পরিবেষ্টিত ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করবে না, তা করা তার জন্যে জায়েয নয়। আর সে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্টদায়ক কিছু থাকে এবং সে কারণে সে মাথা মুণ্ডন করে, তা হলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। সে যদি অ-পরিবেষ্টিতও হয়, তবু সে সেই পরিবেষ্টিত ব্যক্তির অবস্থায় আছে বলে মনে করতে হবে, যার জন্তু এখনও তার স্থানে পৌঁছায়নি। এ থেকে বোঝা গেল, পরিবেষ্টিত ও অ-পরিবেষ্টিত— সকলেই এ দিক দিয়ে অভিন্ন যে, ইহরামে তার মাথা মুণ্ডন জায়েয নয়। জায়েয হবে একটি শর্তে, যা ইতিপূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আর আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا 'তোমাদের মধ্যে যে-লোক রোগী হবে........' এ আয়াতে সেই রোগের কথা বলা হয়েছে, যাতে পোশাক পরা বা ইহরাম নষ্টকারী কোন কাজ করার প্রয়োজন হয়। তা হলে সে তা করতে পারবে কষ্ট দূর করার জন্যে। তবে তাকে সেজন্যে ফিদিয়া দিতে হবে। 'অথবা তার মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যাপার হলে ....' আয়াতাংশ-ও সেই কথাই বলেছে। ইহরাম নষ্টকারী কোন জিনিস ব্যবহার করা জরুরী হয়ে পড়ে যে রোগে— যেমন মাথা মুণ্ডন করা বা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলা। তবে রোগ যদি এমন হয় যে, তদ্দরুন মাথা মুণ্ডন জরুরী হয় না, ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজও করতে হয় না, তা হলে এরূপ অবস্থায় সে যেন সুস্থ ব্যক্তির মত, যার জন্যে ইহরাম বিনষ্টকারী কোন কিছু করা নিষিদ্ধ। কাব ইবনে ইজরাতা থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) হুদায়বিয়ার বছর তাকে পেলেন এমন অবস্থায় যে, তার মাথার উকুন তার মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার মাথার এই জঞ্জাল তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে ফিদিয়া দিতে আদেশ করলেন। বোঝা গেল, উকুনের আধিক্যই তার মাথার কষ্টের কারণ ছিল। আয়াতে ঠিক এই

কথাই বলা হয়েছে। তার মাথায় কোন দূষিত ক্ষত থাকলে তা বেঁধে রাখা বা ঢেকে রাখার প্রয়োজন হলে তা করা যাবে, তবে সেজন্যে ফিদিয়া দিতে হবে। অন্যান্য রোগের বেলায়ও তাই। তাতে কাপড় পরার প্রয়োজন হলে তা পরবে মুবাহ হিসেবে। তবে ফিদিয়া দিতে হবে। কেননা আল্লাহ এ সবের মধ্যে কোন একটিকে বিশেষীকৃত করেন নি। এ সব ব্যাপারে কুরআনের সাধারণ হুকুম রয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ রোগী হলে কিংবা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু থাকলে' কথাটি মাথা মুণ্ডন সম্পর্কে। মাথা মুণ্ডন করা হলে রোযা রেখে তার ফিদিয়া দেবে।

জবাবে বলা যাবে, মাথা মুণ্ডন করার কাথা উল্লিখিত হয়নি। যদিও তা-ই বলার আসল উদ্দেশ্য। তেমনি পোশাক পরা ও মাথা ঢেকে রাখা— এর কোনটাই উল্লেখ করা হয়নি। অথচ তার অনুমতি দেয়াই উদ্দেশ্য। কেননা তাতে কোন ওযরের দরুন নিষিদ্ধ কাজের অনুমতি দান-ই আসল লক্ষ্য। অনুরূপভাবে যদি রোগী না হয়; কিন্তু তার দেহে কষ্টদায়ক কিছু থাকে, যার কারণে মাথা মুণ্ডন করার দরকার হয়ে পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে মাথার ব্যাপারে তো ফিদিয়া দিতে হবে। কেননা সব কিছুতে তাই বোধগম্য হয়। আর তা হচ্ছে, ইহরামে নিষিদ্ধ কাজ করা মুবাহ হওয়া ওযরের কারণে। আল্লাহ কথা ঃ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ 'রোযা রেখে ফিদিয়া দেবে', নবী করীম (স) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি তিনদিনের রোযা রেখেছিলেন। কাব ইবনে আজরাতা বর্ণিত হাদীসে তা উদ্ধৃত হয়েছে। আগেরকালের ও একালের বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের কথা-ও তাই। তবে হাসান ও ইকরামা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মাত্'আর রোযার মত দশ দিনের রোযা রাখতে হবে। কাব বর্ণিত হাদীসে সাদকার পরিমাণেরও উল্লেখ হয়েছে। মোটকথা— এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে একটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' আহমদ ইবনে সহল ইবনে আইয়ুব, সহল ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে আবূ জায়দ, তাঁর পিতা, আবদুর রহমান ইবনুল ইসবাহানী, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কাব ইবনে আজরাতা তাঁকে বলেছেন যে, তিনি নবী করীম (স)-এর সাথে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁর মাথা ও দাড়িতে উকুন পাওয়া গিয়েছিল। নবী করীম (স) তা জানতে পেরে একজন হাজ্জাম ডাকলেন। সে তার মাথা মুণ্ডন করে দিল। বললেন, আমরা কি কুরবানী করতে পারব ? বললেন, না, তা বোধ হয় পারবে না। তখন তিনি তাঁকে তিনটি রোযা রাখতে, না হয় ছয়জন মিসকীন— প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা' পরিমাণ খাদ্য দিতে বললেন। তখন আল্লাহ নাযিল করেছিলেন ঃ

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ -

অতঃপর ফিদিয়া হিসেবে হয়ত রোযা রাখবে, না হয় সাদকা দেবে, না হয় কুরবানী দেবে।

সাধারণভাবে সব মুসলমানের জন্যেই এই হুকুম। সালিহ ইবনে আবূ মরিয়াম, মুজাহিদ কাব ইবনে আজরাতা সূত্রেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। দাউদ ইবনে আবূ হিন্দু, আমের কাব ইবনে আজরাতা সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ তিন সা' করে 'তামার' (উন্নতমানের খেজুর) সাদকা দেবে। প্রত্যেক দুজন মিসকীনকে এক সা' পরিমাণ। আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনে আহমাদ, আবদুল আজীজ ইবনে দাউদ, হাম্মাদ ইবনে

সালমাতা, দাঊদ ইবনে আবূ হিন্দ, শবী, আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা, কাব ইবনে আজরাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁকে বলেছেন ঃ

اُنْسُكْ نَسِيْكَةً اَوْصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْاَطْعِمْ ثَلاَثَةَ اَصْعٍ مِنْ طَعَامٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ -

ছোটখাটো একটা কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ; কিংবা ছয়জন মিসকীনকে তিন সা' খাদ্য খাওয়াও।

পূর্বোক্ত হাদীসে তিন সা' 'তামার' ছয়জন মিসকীনকে দিতে বলা হয়েছে। অপর এক হাদীসে ছয় সা' বলা হয়েছে। এটাই গ্রহণীয়। কেননা এতে বেশী পরিমাণের কথা বলা হয়েছে।

তাছাড়া তিন সা' ছয়জন মিসকীনকে ভাগ করে দেয়ার কথাটির তাৎপর্য হতে পারে, তাতে যবের কথা বলা হয়েছে। এটাই বাহ্যত মনে হয়। জনগণের অভ্যাস যব খাওয়া, এটাই ব্যাপকভাবে পরিচিত। এভাবে তা থেকে বোঝা গেল যে, 'তামার' হলে ছয় সা' আর যব হলে তিন সা' দিতে হবে। আর যে মিসকীনদের মধ্যে তা বন্টন করার কথা তাদের সংখ্যা ছয়। এতো কোন মতপার্থক্য নেই।

কুরবানীর কথাটি কাব ইবনে আজরাতা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন, ছোটখাটো একটা কুরবানী করতে। অপর হাদীসে ছাগল কুরবানীর কথা রয়েছে। ছোট খাটো কুরবানী যে ছাগল দ্বারা হয়, তাতে সব ফিকাহবিদ একমত। সেটা উট বা গরুও হতে পারে। এ তিনটির যে-কোন একটি দেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। আয়াতের বক্তব্যও তাই। তবে কোন দলীল যদি অন্য কিছু প্রমাণ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

জন্তু যবেহ করা বা সাদকা দেয়ার ব্যাপারটির স্থান সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। যদিও রোযা কোন বিশেষ স্থানে বিশেষীকৃত নয়, এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে। রোযা যেখানে ইচ্ছা রাখতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, জন্তু যবেহ করতে হবে মক্কায়। রোযা ও সাদকা যেখানে ইচ্ছা। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, জন্তু যবেহ, সাদকা দান কিংবা রোযা রাখা— এ তিনটি যে কোন স্থানে করা যেতে পারে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সাদকা দান ও জন্তু যবেহ মক্কায় করতে হবে। রোযা যেখানে ইচ্ছা রাখবে। কুরআনের কথা ঃ 'ফিদিয়া দিতে হবে রোযা রেখে; কিংবা সাদকা দিয়ে; অথবা কুরবানী করে' ও সাধারণভাবে পালনীয়। যেখানে ইচ্ছা করা যেতে পারে। কোন বিশেষ স্থানের সাথে তা বিশেষীকৃত নয়। অবশ্য অপর কোন আয়াতে হারামে করার বিশেষীতকরণের হুকুম থাকলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্র কথা হচ্ছে ঃ

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى -

একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেখানে তোমাদের জন্যে বিপুল ফায়দা রয়েছে।(সূরা হজ্জ ঃ ৩৩)

অর্থাৎ সেসব জন্তু-জানোয়ার, যার উল্লেখ পূর্বে হয়েছে। পরে বলেছেন ঃ

ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

অতঃপর তার স্থান প্রাচীনতম (কাবা) ঘর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৩)

এই কথাটি সকল জন্তু-জনোয়ার— যেগুলোকে আল্লাহ্র ঘরের দিকে কুরবানীর জন্যে পাঠানো হবে— এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আয়াতটির এই অর্থের সাধারণত্বের কারণে তাঁর নৈকট্য লাভে নিবেদিত সব পশুই হারামের জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা অন্যত্র যবেহ করলে কাজ হবে না। আল্লাহ্র কথা, 'কাবায় পৌছা কুরবানীর জন্তু' থেকেও তা-ই বোঝা যায়। এটা হচ্ছে শিকার করার অপরাধের প্রতিকার। অতএব কুরবানীর জন্তুর পরিচিতিই হল কাবায় পৌঁছে যাওয়া। তা না হলে হবে না। উপরন্তু তা যখন যবেহ হবে, তখন তা ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে অবশ্যই। তা হারামের সাথে বিশেষভাবে চিহ্নিত হতে হবে। যেমন শিকারের প্রতিকারের যবেহ এবং মাত্য়ার জন্যে কুরবানীর জন্তু।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) কাব ইবনে আজরাতাকে বললেন, একটা ছাগল যবেহ কর, কিন্তু সেজন্যে কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করলেন না। কাজেই পশু যবেহর জন্যে কোন স্থানই বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত নয়।

জবাবে বলা যাবে, কাব ইবনে আজরাতার পশু যবেহ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল হুদায়বিয়ায়। হুদায়বিয়ার একাংশ হারামের মধ্যে, অপর অংশ তার বাইরে। কাজেই সেখানে বলা উক্ত কথায় কোন স্থানকে নির্দিষ্ট না করলেও অসুবিধা ছিল না। কেননা কাব তো জানতেনই যে, ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট যবেহ অবশ্যই হারামে করতে হবে। নবী করীম (স)-এর সাহাবিগণ পূর্ব থেকেই জানতেন যে, কুরবানী হারামেই হয়ে থাকে, হতে হবে। কেননা স্বয়ং নবী করীম (স) সেখানে যবেহ করার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক জন্তু আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে সাদকা দান ও রোযা রাখার এ রকমটা নয়। তা যে কোন স্থানে করা যেতে পারে। সেজন্যে কোন স্থানকেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব সে দুটি কাজকে হারামেই করতে হবে, এরূপ শর্ত করার কোন অধিকার আমাদের নেই। কেননা কুরআনে যা নিঃশর্ত, তাকে নিঃশর্ত রাখা এবং যা শর্তাধীন তাকে শর্তাধীন রাখাই বান্দাদের কর্তব্য। আর মূলতই সাদকার জন্যে কোন স্থানকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তা আসলেই এমন নয় যে, তা কোন বিশেষ স্থান ছাড়া অন্যত্র করা যাবে না। সাদকা সম্পর্কে এ কথাই যখন চূড়ান্ত তখন তা কোন বিশেষ স্থানে হতে হবে, এমন শর্ত করা যাবে না। এটা মৌলনীতির পরিপন্থী। তার বাইরে অবস্থিত।

যদি বলা হয়, সাদকাও অবশ্যই হারামেই দান করা বাঞ্ছনীয়। কেননা হারামের মিসকীনদের তো হক্ আছে যেমন যবেহকৃত জন্তুতে হক রয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, তার জায়েয হওয়াটার সাথে হারামের কোন সম্পর্ক নেই। মিসকীনদের হক এর কারণেও নয়। কেননা জন্তু যদি হারামে যবেহ করা হয়, তারপরে সেখান থেকে সেটি বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হারাম ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়, তাহলে জায়েয হবে। তা সত্ত্বেও তার সাথে হারামের মিসকীনদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই অন্যদের অপেক্ষা। কেননা তাদেরই যদি হক্ হবে, তাহলে তারা তার দাবি করতে পারবে। তাদের যখন সে দাবি নেই, তখন সহজেই বোঝা যায় যে, তা তাদের হক-এর ব্যাপার নয়। আসলে তা একমাত্র আল্লাহর হক-এর ব্যাপার। তিনিই তা বাধ্যতামূলক করেছেন মিসকীনদের জন্য। তাদের জন্যই তা দান করতে বলেছেন। তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। যেমন যাকাত ও অন্যান্য সাদকার সব কাজ। কিন্তু তার কোনটাই কোন একটি স্থানের জন্যে বিশেষীকৃত করা

হয়নি। উপরন্তু সেখানে রক্তপাত যখন আল্লাহ্‌র নৈকট্যের কারণ হবে না, তখন তাকে বিশেষভাবে হারামের সাথে জড়িত করা জরুরী নয়। যেমন রোযা রাখার ব্যাপারে।

এ ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহ্‌বিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাসান, আতা, ইবরাহীম প্রমুখ বলেছেন, কেননা অপরাধের দরুন যে জন্তু যবেহ, তা মক্কাতেই হতে হবে। আর রোযা রাখা ও সাদকা দেয়ার কাজ যেখানেই ইচ্ছা করা যাবে। মুজাহিদ বলেছেন, ফিদিয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা দিতে পার। তায়ূস বলেছেন, কুরবানী ও সাদকা মক্কায় করতে হবে। রোযা যেখানে ইচ্ছা রাখা যাবে। বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা) হুসায়ন (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি উট যবেহ করেছিলেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে। তখন তিনি নিজে ইহ্‌রামে ছিলেন। তিনি তাঁর মাথা মুণ্ডনের আদেশ করলেন। তখন উটটি যবেহ্ করার আদেশ করলেন এবং বন্টন করে দিলেন। তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, হারাম ছাড়া অন্যত্র যবেহ করাকে তিনি জায়েয মনে করেন। কেননা হতে পারে— তিনি গোশত সাদকা করে দিয়েছেন এবং আমাদের মতে তা জায়েয।

হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ -

যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে ....

আবূ বকর বলেছেন, এই 'তামাত্তু'র মধ্যে দুটি তাৎপর্য নিহিত আছে। তার একটি হল হালাল হওয়া— ইহ্‌রাম খুলে ফেলা এবং স্ত্রীদের নিকট ফায়দা গ্রহণ। আর দ্বিতীয়টি হল হজ্জের মাসসমূহে উমরাকে হজ্জ পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া। তার অর্থ, সে দুটোরই আনুকূল্য গ্রহণ। সে জন্যে দুটি সফর গ্রহণ না করা। তা এ জন্যে যে, জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা করা জানতো না। বরং তীব্রভাবে তা অস্বীকার করত, বিরোধিতা করত। ইবনে আব্বাস ও তায়ূস থেকে বর্ণনা এসেছে, সেকালের আরবদের নিকট এটা ছিল অত্যন্ত বড় পাপ ও অপরাধের কাজ। আর এই কারণেই নবী করীম (স) তাদের অভ্যাস অনুযায়ী উমরার দ্বারাই হালাল হতে বলেছিলেন, তখন ফিরে গিয়েছিলেন।

আবদুল বাকী ইবনে কানে হাসান ইবনুল মুসান্না, আফফান উহায়ব, আবদুল্লাহ ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আরবরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা করাকে সর্বাধিক খারাপ কাজ মনে করত। মুহররম মাসকে তারা সফর মাস বানিয়ে নিত। বলত, পেছন দিক যখন বেঁচে গেল, চিহ্ন মুছে গেল এবং সফর মাস অতীত হয়ে গেল, তখন উমরাকারীর জন্যে উমরা হালাল হল। নবী করীম (স) সে মাসের চতুর্থ দিনের অতি ভোরবেলা হজ্জের ধ্বনি সহকারে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে হালাল হতে আদেশ করলেন। তখন তাদের নিকট এই ব্যাপারটি অত্যন্ত বড় হয়ে দেখা দিল। তারা বলল ঃ হে রাসূল, এটা কি রকমের হালাল হওয়া? বললেন, সর্বপ্রকারেই হালাল। বোঝা গেল, হজ্জের মাত্‌য়া এই দুটি অর্থকেই শামিল করে। হালাল হয়ে স্ত্রী সম্ভোগ মুবাহ হওয়াও তার মধ্যে রয়েছে। হজ্জের মাসসমূহে উমরা ও হজ্জ একাত্রিত করার ফায়দা গ্রহণ এবং একই সফরে দুটি কাজই করা জাহিলিয়াতের লোকেরা হালাল মনে করত না। প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা সফর

অবলম্বন করত। উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত 'তামাত্তু' করার মূলে রয়েছে হজ্জের মাসে দুটিই একই সফরে সম্পন্ন করা এবং এভাবে করে দুটিরই সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হওয়া। বোঝা গেল, বেশি ফায়দা ও মর্যাদা-ফযীলত পাওয়ার সুযোগ হয় যে-লোক দুটিই একসাথে পর পর করবে।

'মাত্য়া' চার প্রকারের। একটা হচ্ছে 'কারেন'। হজ্জের মাসে উমরার জন্যে ইহ্‌রাম বেঁধে সেই বছরই একই সফরে হজ্জের কাজটা করা— যে লোক মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়, তার জন্যে করা ভালো। আর যে মনে করে যে, পরিবেষ্টিত ব্যক্তি হালাল হবে না; বরং আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছার অপেক্ষায় থাকবে, হজ্জ করার পর হালাল হবে। হজ্জ না করতে পারলে উমরার কাজ করবে। আর উমরা করে হজ্জ ভেঙ্গে দেবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে লোকই উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা গ্রহণ করবে, তার জন্যে 'কুরবানীর যে জন্তু সহজ তাই যবেহ করবে' এই কথার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ইবনে মাসঊদ (রা) ও আল-কামা বলেছেন, অর্থাৎ হাজী যদি পরিবেষ্টিত হয়, তাহলে সে কুরবানী করে ইহ্‌রাম খুলবে; তাকে উমরা ও একটি হজ্জ কাযা করতে হবে। কেননা সে এ দুটিরই ফায়দা গ্রহণ করেছে। হজ্জের মাসসমূহে সে দুটিই একসাথে করেছে একই সফরে। তাকে আর একটি পশু যবেহ করতে হবে এই তামাত্তুর জন্যে। হজ্জের মাসসমূহে উমরা করলে ও তার পর পরিবারবর্গের নিকট ফিরে এলে, পরে সেই বছরই হজ্জ করলে তাকে পশু যবেহ করতে হবে না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেছেন, সফর দুটি ও একটি কুরবানী অথবা কুরবানী দুটি আর সফর একটি। দুটি সফর ও একটি কুরবানী বলে বোঝানো হয়েছে, এই পরিবেষ্টিত ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহে হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার পর উমরা করলেও তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে এলে পরে পুনরায় গিয়ে সেই বছরই হজ্জ করলে তাকে একটি কুরবানী করতে হবে। সেটা পরিবেষ্টনের কুরবানী। তা এজন্যে যে, সে তা দুটি সফরে করেছে। অথবা দুইটি কুরবানী ও একটি সফর হবে। অর্থাৎ হজ্জের মাসসমূহে উমরা করে সে তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে এল না। তাহলে তাকে তামাত্তুর কুরবানী করতে হবে প্রথম কুরবানী পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে। এই কারণে দুটি কুরবানী হয়ে যাবে আর সফর হবে একটি। ইবনে আব্বাসের একটি কথা ইবনে জুরাইজ আতা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস পরিবেষ্টন ও বাঁধাহীন সফর সংক্রান্ত দুটি আয়াতকে একত্রিত করতে বলতেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথা, 'যে লোক উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা গ্রহণ করবে' আয়াতকে। আতা বলেছেন, 'মাত্য়াতুন' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে হজ্জের মাসসমূহে উমরা করেছে। স্ত্রীর যৌনসুখ সম্ভোগ করবে এজন্যে এ নামকরণ হয়নি। এই কারণে ইবনে আব্বাসের মাযহাব হল, আয়তটিতে দুটি ব্যাপারই সমন্বিত। পরিবেষ্টিত লোকেরা যখন উমরার সাথে হজ্জ কাযা করার উচ্ছা করবে— যে উমরা করতে না পারার দরুন হারিয়ে গিয়েছিল বলে তা করা বাধ্যতামূলক হয়েছিল। আর অপরিবেষ্টিত লোকদের মধ্যে যারা উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা পেতে চায়, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদের মতে তারা পরিবেষ্টিত লোকদের সাথে এক কাতারে যুক্ত হবে না। বুঝতে হবে, তাদের সম্পর্কেই কথা বলা হয়েছে। তাতে হারানোর কারণে উমরা ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা পাওয়া যাবে। এই হুকুমও দেয়া যাবে যে, হারানো হজ্জ হজ্জের মাসের একই সফরে কাযা করার সঙ্গে উমরাকে একত্রিত করলে তাকে একটা জন্তু যবেহ করতে হবে। যদি দুই সফরে করা হয়, তাহলে পশু যবেহ করতে হবে না। এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদের মাযহাব ইবনে আব্বাসের

কথার পরিপন্থী নয়। তবে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আয়াতটিতে পরিবেষ্টিত ও অপরিবেষ্টিত উভয় সম্পর্কে সাধারণভাবেই কথা বলা হয়েছে। তাতে বিশেষভাবে পরিবেষ্টিত লোকেরা সংশ্লিষ্ট, যেমন ইবনে মাসউদ উল্লেখ করেছেন। আর অ-পরিবেষ্টিত লোকেরাও তাতে শামিল এ হিসেবে যে, তাদের জন্যে 'তামাত্তু' জায়েয। তারা যখন তামাত্তু করবে, তখন তারাও এর মধ্যে পড়বে। ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ আয়াতটির কথার ধরন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট পরিবেষ্টিত লোকদের জন্যে। যদিও অ-পরিবেষ্টিত লোকেরা যখন 'তামাত্তু' করবে, তখন তাদের মধ্যেই পড়ে যাবে। আর 'কারেন' হচ্ছে, হজ্জের মাসসমূহে যে উমরা করবে, সেই বছরই একই সফরে যে হজ্জ-ও করবে। তারা দুজনই তামাত্তুকারী দুই দিক দিয়ে। একটি দিক, সে দুটিকে একই সফরে একত্রিত করার সুবিধা পেয়েছে। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, দুটিকে একত্রিত করার ফযীলত লাভ । এ থেকে বোঝা যায়, তা ইফরাদ-এর তুলনায় উত্তম। 'ইফরাদে' প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা সফর করতে হয় কিংবা দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পার্থক্য সহকারে পালন করা হয়। তাতে উমরা করা হয় হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্য সময়ে।

নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ থেকে এই 'মাত্য়া' পর্যায়ে বহু কয়টি বর্ণনা এসেছে। সে সব বর্ণনার বাহ্যিক দিক দিয়ে তার মুবাহ হওয়া পর্যায়ে ভিন্নমত হয়েছে। 'মাত্য়া' অর্জিত হয়ে গেলে মতপার্থক্যটা হবে তার সর্বোত্তম হওয়া পর্যায়ে, নিষেধের পর্যায়ে নয়। মুবাহ হওয়ার পর্যায়েও নয়। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আবূ যর আল-গিফারী (রা) দহাক ইবনে কায়স থেকে এ বিষয়ে নিষেধ বাণী বর্ণিত হয়েছে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনুল ইয়ামন আল-মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, ইবনে আবূ মরিয়ম, মালিক ইবনে আসান, ইবনে শিহাব, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে নওফল, সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ও দহাক ইবনে কায়স সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করার বছর বলেছেন— তাঁরা দুজন উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত 'তামাত্তু' করার আলোচনায় দহাক বলেছেন, আল্লাহ্‌র আদেশ যারা ভুলে যায়নি তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সাদ বলেছেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বললে। দহাক বললেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব তা করতে নিষেধ করেছেন। সাদ বললেন, রাসূলে করীম (স) নিজে তা করেছেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে থেকে তাই করেছি।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামন, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, শুবা কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি জরীর ইবনে কুশায়বকে একথা বলতে শুনেছেন যে, তিনি হযরত উসমানকে এই 'মাত্য়া' গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) তা করতে আদেশ করতেন। পরে আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনাদের দুজনার মধ্যে একটা খারাপ জিনিস ঢুকে পড়েছে। আপনি 'মাত্য়া' গ্রহণ করতে আদেশ করেন। আর হযরত উসমান (রা) তা করতে নিষেধ করেন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, না, আমাদের দুজনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক আছে। বরং আমাদের দুজনের জন্যেই কল্যাণ এখানে যে, আমরা দুজন এই একই দ্বীনের অনুসরণকারী।

হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তা করতে ঠিক নিষেধ করেন নি। তিনি বরং ইখতিয়ার আছে বলেছেন। তার কয়েকটি অর্থ, একটি ফযীলত। যেন হজ্জটা তার জন্যে জানা ও পরিচিত মাসে সম্পন্ন হয়। আর উমরা অন্য যে কোন সময়ে করা হয়। আর দ্বিতীয়, আমি তো আল্লাহ্‌র ঘরে বেশি বেশি আবাদ হওয়া ভালোবাসি, পছন্দ করি। অন্যান্য মাসসমূহে তার

যিয়ারতকারী লোক বেশি বেশি আসুক, তাই চাই। আর তৃতীয়— তিনি মনে করেন, হারামবাসীদের নিকট বেশি লোক আসার দরুন তাদের সুবিধা বিপুল হোক।

এই কথা হাদীসের বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত হয়। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুয়াদ্দিব, আবুল ফযল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামন আল-মুয়াদ্দিব, আবূ উবায়দ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ, উবায়দুল্লাহ্ নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন ঃ

اَنْ تَفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِيْ غَيْرِ اَشْهُرِ الْحَجِّ اَتَمَّ الْحَجَّ اَحَدُكُمْ وَاَتَمَّ لِعُمْرَتِهِ -

তোমরা যদি হজ্জ ও উমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কর, তাহলে তোমরা উমরা করবে হজ্জের মাসসমূহ বাদ দিয়ে অন্য সময়ে। তাহলে তোমাদের হজ্জ পূর্ণ হবে, আর উমরাও সে নিজের জন্যে সম্পূর্ণ করে নেবে।

আবূ উবায়দ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ লাইস, উকাইল, ইবনে শিহাব, সালিম, আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হযরত উমর (রা) বলতেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র জন্যে সম্পূর্ণ কর।' বলেছেনঃ 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাসে সম্পন্ন হয়।' অতএব হজ্জের মাসসমূহকে শুধুমাত্র হজ্জের জন্যে একান্ত করে রাখ। আর সে কয়টি মাস বাদ দিয়ে অন্য সময়ে তোমরা উমরা করবে।'

তার কারণ হচ্ছে, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করলে কুরবানী করতে হবে, অন্যথায় তার উমরা সম্পূর্ণ হবে না। আর হজ্জের মাস ছাড়া অন্য সময়ে যারা উমরা করবে, তার উমরা সম্পূর্ণ হবে। তখন কুরবানী করা হবে নফল, ওয়াজিব নয়। এই হাদীসে দুটির মধ্যে পার্থক্য করার ইখতিয়ারের দিকটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

আবূ উবায়দ বলেছেন, আবূ মুআবিয়া হিশাম, উরওয়াতা, তাঁর পিতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করাকে হযরত উমর অপছন্দ করেছেন শুধু এজন্যে যে, হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্যান্য সময় আল্লাহ্‌র ঘর জনহীন হয়ে না পড়ে। এ হাদীসে আর একটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল হজ্জ ও উমরা দুটি ভিন্ন ভিন্নভাবে করা ও এক সঙ্গে না করা।

আবূ উবায়দ আরও বলেছেন, হুশায়ম, আবূ বশর, ইউসূফ ইবনে মাহিক সূত্রে বলেছেন, হযরত উমর 'মাত্‌য়া' নিষিদ্ধ করেছেন মক্কাবাসীদের অবস্থানের জন্যে যেন বছরে দুইটি মওসুম হয়। মক্কাবাসীরা এ দুটি মওসুম ছাড়া বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এ হাদীস অনুযায়ী তিনি এ নীতি গ্রহণ করেছিলেন শুধু মক্কাবাসীদের ফায়দা ও কল্যাণের জন্যে। হযরত উমর থেকে অন্য সময় 'মাত্‌য়া' গ্রহণের সংবাদ জানা গেছে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইয়ামন, আবূ উবায়দ, আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী, সুফিয়ান, সালমা ইবনে কুহায়ল, তায়ূস ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, হযরত উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি যদি উমরা করি, তার পর উমরা করি, তার পর উমরা করি, তার পর হজ্জ করি, তা হলে আমি অবশ্যই মাত্‌য়া গ্রহণ করব। এ হাদীসে তাঁর 'মাত্‌য়া' গ্রহণের খবর রয়েছে।

এ থেকে প্রমাণিত হল, মাত্‌য়ার ব্যাপারে তার সম্পর্কে যে সব বর্ণনা এসেছে তা এক মক্কাবাসীদের জন্যে কল্যাণ গ্রহণ স্বরূপ ছিল না, অন্য বার আল্লাহ্‌র ঘরের জন্যে ছিল না। এ দুটির প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র ও এককভাবে করার উত্তম হওয়ার ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে অথবা কেরান, কিংবা 'তামাত্তু'। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, 'কেরান' হজ্জ উত্তম। তার পরে 'তামাত্তু' হজ্জ এবং তার পরে 'ইফরাদ' হজ্জ আলাদা-আলাদাভাবে করা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইফরাদ হজ্জ উত্তম। কেরান ও তামাত্তু দুটিও ভালো। উবায়দুল্লাহ নাফে ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, শওয়াল অথবা যিলকদ কিংবা যিলহজ্জ প্রভৃতি যে মাসে উমরা করলে আমার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয়, তা আমার নিকট অধিক প্রিয় সেই মাসে উমরা করার তুলনায়, যে মাসে উমরা করলে আমার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয় না।

কায়স ইবনে মুসলিম তারিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসঊদ (রা)-কে একজন মেয়েলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে তার হজ্জের সাথে উমরা একত্র করে পালন করার ইচ্ছা করেছে। জবাবে তিনি বললেন ঃ শোন, আল্লাহ্‌ বলেছেন, হজ্জ-এর মাসসমূহ জ্ঞাত। আমি মনে করি, হজ্জের মাসসমূহ সম্পর্কেই এই কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি ইফরাদ হজ্জকে তামাত্তু ও কেরান হজ্জের তুলনায় উত্তম মনে করতেন। হতে পারে, তার এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে সে সব মাসের কথা বলা, যাতে হজ্জ ও উমরা একসাথে করা সহীহ্‌। আলী কররামাল্লাহু অজহাহু বলেছেন, উমরা সম্পূর্ণ হতে পারে, 'তুমি তোমার ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধবে।' এ থেকে বোঝা যায়, তামাত্তু ও কেরান হজ্জের কথাই বলেছেন, যা উমরা দিয়ে শুরু হয় নিজের ঘর থেকে ইহরাম বেঁধে খালেসভাবে, তার সাথে হজ্জকে মেলাবে না। বলেছেন, কেননা নিজের ঘর পরিবার থেকে যদি ইহরাম বাঁধে তা হলে তা নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী হয়ে যাবে। কেননা নবী করীম (স) তো মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা প্রত্যাহারযোগ্য। কেননা হযরত আলী (রা)-র এই কথাটা বর্ণিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ হয়, যদি তুমি দুটির জন্যেই তোমার ঘর থেকে ইহরাম বেঁধে বের হও। নিজের ঘর থেকে দুটির জন্যেই ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে এটি একটি অকাট্য দলীল। এ কাজকে সুন্নাতের পরিপন্থী বলা নেহায়েত একটি ধারণা মাত্র। কেননা মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছা যে করবে, তাকে ইহরাম না বেঁধে কাবার নিকটে যেতে নিষেধ করা হয়েছে রাসূলের সুন্নাতে। মীকাত-এর আগেই ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্যই নেই।

বর্ণিত হয়েছে আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন, আমরা আম্মারকে বের করে আনলাম। আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন আবূ যর-এর নিকটে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি অবিন্যস্ত আলুথালু চুল মুণ্ডন করেছ এবং ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেছ? তবে উমরা তোমাদের বাসস্থান থেকেই।

আবূ উবায়দ এ কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসেরই আলোকে। আবূ যর (রা) বলতে চেয়েছেন যে, নিজের ঘর-পরিবার থেকে উমরা সূচিত হওয়াই উত্তম। হযরত আলী (রা) এই উমরাকেই সম্পূর্ণ উমরা বলেছেন। বলেছেন, তোমার নিজের পরিবারবর্গের বাসস্থান থেকে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলেই ইহরাম সম্পূর্ণ হয়। নবী করীম (স)

থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি হজ্জ ও উমরার কেরান করেছেন। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, আবূ মুআবিয়া, আমাশ আবূ ওয়েল সবি ইবনে মাবাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সবি ইবনে মাবাদ খ্রীস্টান ছিলেন। পরে ইসলাম কবুল করেছেন। পরে তিনি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁকে বলা হল যে, তুমি হজ্জ থেকেই জিহাদ শুরু কর। পরে তিনি আবূ মূসা আল-আশআরীর কাছে এলেন। তিনি তাকে হজ্জ ও উমরার জন্যে একসাথে ইহ্‌রাম বাঁধতে বললেন। তিনি তাই করলেন। যখন তিনি দুটিরই ধ্বনি দিতেছিলেন, তখন সেখানে জায়দ ইবনে সুহান ও সালমান ইবনে রবীআতা উপস্থিত হল। তাঁদের একজন বললেন, এই ব্যক্তি তার উটের অপেক্ষা অধিক পথহারা— গুমরাহ। সবি এই কথা শুনতে পান। কথাটি তার উপর ভারী হয়ে দাঁড়ায়। পরে তিনি যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল, উমর বললেন, ওরা কিছুই বলছিল না। তোমাকে তোমার নবীর সুন্নাতের কথাই বলা হয়েছে।

আবূ উবায়দ বলেছেন, ইবনে আবূ জায়দ, হাজ্জাজ ইবনে আরতাদ, হাসান ইবনে সাঈদ ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আবূ তালহা আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলে করীম (স) হজ্জ ও উমরা এক সাথে করেছেন।

বলেছেন, আবূ উবায়দ হাজ্জাজ ইবনে শুবা, হুমায়দ ইবনে হিলাল, মতরফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শুখাইর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইমরান ইবনুল হুসায়ন বলেছেন, নবী করীম (স) হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। পরে তিনি তা করতে নিষেধ করেননি এবং এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে চলে যান। কুরআনেও তা হারাম করা হয়নি।

বলেছেন, আবূ উবায়দ হুশাইম, হুমাইদ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আব্বাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি, রাসূলে করীম (স)-কে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পড়তে আমি শুনেছি।

বকর বলেছেন, ইবনে উমর (রা)-কে আমি এই হাদীস শুনিয়েছি। তিনি বললেন, না তিনি কেবল মাত্র হজ্জের তালবিয়া পড়েছেন। বকর বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে ইবনে উমরের কথা বলেছি। তিনি বললেন, আমাদের বালকরাই আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। আমি তো রাসূল (স)-কে হজ্জ ও উমরার 'তালবিয়া' একত্রে করতে শুনেছি।

আবূ বকর বলেছেন, হতে পারে, ইবনে উমর রাসূলে করীম (স)-কে শুধু হজ্জের তালবিয়া করতে শুনেছেন। আর হযরত আনাস অপর এক সময়ে হজ্জ ও উমরার এক সাথে তালবিয়া করতে শুনেছেন। তা ছিল কারেন হজ্জ। আর কারেন হজ্জকারীর পক্ষে একবার উমরা ও হজ্জের তালবিয়া করা ও অপর বার শুধু হজ্জের তালবিয়া করা জায়েয। ইবনে উমরের হাদীসে আনাস বর্ণিত হাদীসের বিপরীত কিছু নেই। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (স) চারবার উমরা করেছেন। তার মধ্যে একবার বিদায় হজ্জ-এর সময়ে। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে কাসীর ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি তখন 'আকীক' উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। আমার নিকট বিগত রাতে আমার রব্ব-এর নিকট থেকে একজন আগমনকারী এসে বলেছেন, এই মুবারক উপত্যকায় তুমি নামায পড় এবং হজ্জ ও উমরার কথা বল। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'উমরা হজ্জের মধ্যে'। হযরত জাবির প্রমুখ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স)-তাঁর সাহাবীগণকে তাদের হজ্জকে উমরা বানাতে আদেশ

করেছেন। বলেছেন, আমার যে কাজ পিছনে করেছি, তা যদি আগে করতাম, তাহলে কুরবানীর জন্তু কখনই চালাতাম না, তাকে উমরা বানাতাম। হযরত আলী (রা)—কে বলেছেন, আপনি এখন কিসের ধ্বনি দিলেন ? বললেন, যেমন নবী করীম (স) ধ্বনি দিয়েছেন, তেমনি ধ্বনি আমিও দিয়েছি। পরে বলেছেন, আমি কুরবানীর জন্তু চালিয়ে দিয়েছি। কুরবানীর দিন পর্যন্ত আমি হালাল হব না। তাঁর এই কুরবানী যদি তামাত্তু ও কেরান-এর কুরবানী না হতো, তাহলে তিনি হালাল হওয়া থেকে বিরত থাকতেন না। কেননা নফল কুরবানীর জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, যে কোন সময়ই তা যবেহ করা যায় কুরবানীর দিনের আগে।

এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স) কারেন হজ্জ করেছিলেন। তিনি 'ইফরাদ' হজ্জ করেছেন বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা একথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তার কয়েকটি দিক রয়েছে। প্রথম, যেসব হাদীসের বর্ণনায় 'কেরান' হজ্জের উল্লেখ এসেছে, তা খুব প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত নয়। দ্বিতীয়, 'ইফরাদ' হজ্জের বর্ণনাকারী অধিক সংখ্যক এমন, যারা রাসূল (স)-কে শুধু হজ্জ-এর তালবিয়া পড়তে শুনেছেন বলে দাবি করেছেন। এই কথা তাঁর 'কারেন' হজ্জকারী হওয়ার পরিপন্থী নয়। আর তৃতীয়, বর্ণনার দিক দিয়ে এ দুটির বর্ণনা সমান মানের হলেও এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, বেশী লোকের বর্ণনা উত্তম হবে। আর আমরা যা বলেছি, তাতে যখন প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) 'কেরান' হজ্জকারী ছিলেন। আর নবী করীম (স)-তো বলেই দিয়েছেন ঃ خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ 'তোমাদের হজ্জ কুরবানীর নিয়মাদি আমার নিকট থেকে নাও' তখন রাসূলে করীম (স)-কে অনুসরণ ও অনুকরণ করাই সর্বোত্তম— সব চাইতে ভালো, তাতে আর সন্দেহ কি, তাঁর এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর করা কাজটা ঠিক সেইভাবে সেই কাজ করাটাই তো অধিক ভালো। আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। আরও বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

নবী করীম (স) নিজে তো শুধু সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ভালো কাজসমূহই করেছেন। এতেই দলীল রয়েছে একথার যে, 'কেরান' হজ্জ তামাত্তু ও ইফরাদ হজ্জের অপেক্ষা অনেক ভালো। তাতে কুরবানীর বাড়তি ব্যবস্থাও রয়েছে। কেননা 'কেরান' হজ্জে যে পশু যবেহ করতে হয়, আমাদের মতে তা কুরবানীরই পশু যবেহ। তাতে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। তার গোশত খাওয়া যায়, যেমন কুরাবনীর গোশত। তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ - ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

তোমরা সে কুরবানীর জন্তুর গোশত নিজেরা খাও, সর্বহারা ফকীর-গরীবকে খাওয়াও। পরে তারা যেন তাদের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে, তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং কাবা ঘরের তওয়াফ করে। (সূরা হজ্জ ঃ ২৮-২৯)

এসব সুবিন্যস্ত হতে পারে কেবল মাত্র কেরান ও তামাত্তু হজ্জের কুরবানীতে। আল্লাহ্র কথা যে লোক উমরা থেকে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা লাভ করবে, এতেও তারই দলীল রয়েছে। আমরা

বলেছি তামাত্তু হজ্জের একটা নাম হতে পারে। কেননা তাতে হজ্জ ও উমরা একত্রে করার দরুন একটা ফায়দা অবশ্যই পাওয়া যায়। তাতে একটা বিশেষ ফযিলত রয়েছে। তাতে দুটি কাজ করার সুবিধা পাওয়া যায় একই সফরে, আর একটা সফরে না গিয়েও। আর তা হচ্ছে, দুটি এক সাথে করা। তাই আয়াতটির তাৎপর্যে এই দুটি অর্থ-ই নিহিত থাকতে পারে। তাতে 'কেরান' ও 'তামাত্তু' দুটিই শামিল হয় দুটি দিক দিয়ে। একটি— দুটি একত্রে করার ফযিলত। আর দ্বিতীয়— দ্বিতীয় একটা সফর না করেই দুটি একত্রে করার সুবিধা। এই 'মাত্য়া' বিশেষভাবে এই হজ্জের জন্যে নির্দিষ্ট। তা-ও অবশ্যই সেই লোকদের জন্যে যারা মসজিদুল হারামে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকা বাসিন্দা নয়। কেননা আল্লাহ্ই বলে দিয়েছেন ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِىْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

এই সুবিধা ও ফযিলত কেবল তাদের জন্যে যাদের পরিবার মসজিদে হারামে উপস্থিত নেই।

যাদের বাসস্থান মীকাতসমূহে ও মক্কার কাছাকাছি, তাদের জন্যে তামাত্তু ও কেরান হজ্জ নয়। এটাই হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদদের কথা। কাজেই তারা যদি 'কেরান' বা 'তামাত্তু' হজ্জ করে, তবে তারা ভুল করবে, তাদেরকে সেজন্যে একটা পশু যবেহ করতে হবে। কিন্তু তার গোশত খেতে পারবে না। কেননা তা মাত্য়ার পশু যবেহ নয়। তা হচ্ছে অপরাধের দণ্ড হিসেবে পশু যবেহ। যেসব লোক উক্ত এলাকাসমূহের বাসিন্দা তাদের জন্যে 'মাত্য়া' নেই। নেই উপরোক্ত আয়াতের কারণে। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا التَّمَتُّعُ رُخْصَةٌ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

তামাত্তু কেবলমাত্র তাদের জন্যে বিধিবদ্ধ যাদের পরিবারবর্গ মসজিদে হারামে উপস্থিত নেই।

অন্যরা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে যার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামে উপস্থিত নেই, তামাত্তু হজ্জ করলে তাকে পশু যবেহ করতে হবে না। তাদের জন্যে কুরবানী ছাড়াই তামাত্তু হজ্জ করা জায়েয। কিন্তু আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ তাদের উক্ত কথার বিপরীত প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'এটা করা তাদের জন্যে জায়েয যাদের পরিবার মসজিদে হারামে উপস্থিত নয় অর্থাৎ 'মাত্য়া' তাদের জন্যে। কুরবানীর জন্তুর কথা নয়। যদি তা হতো তাহলে তা-ই বলা হতো।

যদি বলা হয়, তার অর্থ হতে পারে, যাদের পরিবার মসজিদে হারামে উপস্থি নেই, তা তাদের জন্যে। কেননা মূল ভাষায় لام কে على অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ -

তাদের জন্যে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে অত্যন্ত খারাপ স্থান। (সূরা রা'দ ঃ ২৫)

এই 'তাদের জন্যে' অর্থ তাদের উপর ধার্য।

জবাবে বলা যাবে, কোন শব্দকে তার আসল অর্থ থেকে সরিয়ে নেয়া এবং তার পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। কোন দলীলের ভিত্তিতে তা করা হলে ভিন্ন কথা।

এ ধরনের প্রতিটি শব্দ বা অক্ষরের একটা প্রকৃত অর্থ আছে, যার জন্যে সে শব্দটি বানানো হয়েছে। কাজেই لم কে على অর্থে গ্রহণ করা তার আসল অর্থটিকেই নষ্ট করে দেয়ার শামিল। কোন দলীল ছাড়া এরূপ করা জায়েয হতে পারে না। তাছাড়া তামাত্তু সারা দুনিয়ার মানুষের সকলের জন্যেই সঙ্গত, সকলেরই তা করার অধিকার আছে। কেননা এটা আল্লাহ্র দেয়া হালকা ব্যবস্থা— বোঝা হালকাকরণ এবং প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা-আলাদা সফর গ্রহণের কষ্ট লাঘবকরণ। একটি সফরে দুটো কাজই করার সুবিধা দান। তা সকল ক্ষেত্রে, সব ব্যাপারে। কেননা তা করতে নিষেধ করা হলে তার পরিণতিতে কঠিন কষ্ট ও ক্ষতির উদ্রেক করা হবে। অথচ মক্কাবাসীদের কোন কষ্ট নেই, নেই কোন ক্ষতি যদি তারা হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্য মাসে উমরা করে।

এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, 'তামাত্তু' নামটি দাবি করে হজ্জ ও উমরা এক সফরে করতে পারার সুবিধা লাভ, উমরার জন্যে স্বতন্ত্র সফর অবলম্বনের বাধ্যবাধকথা প্রত্যাহার। এই ব্যাখ্যাই মনীষিগণ দিয়েছেন। যেমন কেউ যদি মানত করে আল্লাহ্র ঘর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়ার, তখন যদি সে যানবাহনে চড়ে যায়, তাহলে তাকে একটা পশু যবেহ করতে হবে। কেননা সে যানবাহন ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই যবেহকৃত জন্তুর গোশত খাওয়া যাবে না। অথচ মাত্য়ার জন্যে যবেহ করা জন্তুর গোশত খাওয়া য়ায়। এইদক দিয়ে দুটির মধ্যকার পার্থক্য আমাদের পূর্বে উল্লেখ করা দিকের সামঞ্জস্যশীল হওয়া নিষেধ করে না। তায়ূস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মক্কাবাসীদের জন্যে 'মাত্য়া' নেই— তারা তামাত্তু হজ্জ করতে পারবে না। যদি তারা তা করে এবং হজ্জও করে ফেলে, তাহলে তাদের উপর তা-ই ধার্য হবে যা অন্যান্য লোকের উপর ধার্য হবে। অন্য কথায় তাদেরকে কুরবানী করতে হবে। এ কুরবানীটা হবে অপরাধের দণ্ড স্বরূপ। ইবাদতের কুরবানী নয়। প্রাচীন কালীন মনীষিগণ ও পরবর্তীকালের আলিমগণ একমত হয়ে বলেছেন, তামাত্তুকারী হবে এভাবে যে, হজ্জের মাসসমূহে উমরা করবে ও সেই বছরই হজ্জও করবে। এই বছরই যদি উমরা করে ও হজ্জ না করে, হজ্জ করে তার পরবর্তী বছর, তাহলে সে তামাত্তুকারী হল না। তাকে কুরবানীও দিতে হল না।

যে লোক হজ্জের মাসসমূহে উমরা করল, পরে সে তার ঘরে ফিরে এল, পরে সেই বছরই হজ্জও করল, এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ লোক বলেছেন, সে তামাত্তু হজ্জকারী হবে না। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা, তায়ূস, মুজাহিদ, ইবরাহীম, আল-হাসানের দুটি কথার একটিতে উক্ত মত দিয়েছেন। হানাফী ও সাধারণ ফিকাহবিদগণও এই মত প্রকাশ করেছেন। আশ্ আস আল-হাসানের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহে যে-লোক উমরা করল, পরে সেই বছরই হজ্জও করল, সে তামাত্তু হজ্জকারী হবে। সে নিজ ঘরে ফিরে আসুক, আর নাই-ই আসুক।

কিন্তু প্রথম কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয় এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের জন্যে 'মাত্য়া'র ব্যবস্থা করেন নি। তা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেছেন দুনিয়ার অন্যান্য সব মানুষের জন্যে। আর তার অর্থ হচ্ছে, উমরা করার পর হালাল হয়ে নিজ নিজ পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান। অবশ্য যারা তাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যাবে, এটা কেবল তাদেরই জন্যে। তাহলে-ই না উমরার পর তাদের পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভবপর। যদি তারা না যায়, তাহলে তারাও মক্কাবাসীদেরই মত হয়ে যাবে। উপরন্তু তামাত্তুকারীদের জন্যে আল্লাহ জন্তু যবেহ করা বাধ্যতামূলক করেছেন। কেননা তারা

দুটি সফরের পরিবর্তে একটি সফরের সুযোগ পাচ্ছে। হ্যাঁ, দুটি কাজের জন্যে দুটি সফরের পরিবর্তে একই সফরে যদি দুটি কাজ-ই সম্পন্ন করে, তা হলে জন্তু যবেহ অপর কোন জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হবে না। তখন জন্তু যবেহ করা ওয়াজিব হবে না।

যে লোক উমরা করে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে আসবে না, বরং সে মক্কায় না থেকে তার বাইরে— এমনকি 'মীকাত' ছাড়িয়েও বাইরে চলে যায়, তার সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, সেই বছরই যদি সে হজ্জ করে, তা হলে সে তামাত্তু হজ্জকারী হবে। কেননা সে উমরা করার পর তার পরিবারবর্গের সাথে মিলিত হয়নি। ফলে তার অবস্থা এই হবে যে, সে যেন মক্কারই একজন। ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণিত হয়েছে, সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা এক্ষণে তার মীকাত হবে তার নিজের দেশের লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট মীকাত। তার ও মক্কাবাসীদের মধ্যে মীকাতই পার্থক্যকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যেন তার পরিবারবর্গের নিকটই ফিরে গেছে, মনে করতে হবে।

কিন্তু প্রথমোক্ত কথাটিই সহীহ্। তার কারণসমূহ পূর্বেই আমরা বলেছি।

যে লোক রমযান মাসে নতুন করে উমরা করবে এবং শওয়াল মাসে কিংবা তার পূর্বেই মক্কায় প্রবেশ করবে, এই রূপ অবস্থায় কাতাদাহ্ ইবনে ইয়াজের এই কথা বর্ণনা করেছেন যে, তার উমরা সেই মাসেই গণ্য হবে, যে মাসে সে 'লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। আল-হাসান ও আল-হিকাম বলেছেন, তার উমরা সেই মাসের গণ্য হবে, যে মাসে সে হালাল হবে। ইবরাহীম নখয়ীরও এই মত বর্ণিত হয়েছে। আতা ও তায়ূস বলেছেন, তার উমরা সেই মাসের গণ্য হবে, যে মাসে সে হারাম শরীফে প্রবেশ করেছে। হাসান ও ইবরাহীম থেকে অপর একটি বর্ণনা এসেছে, তাতে তারা দুজন বলেছেন, তার উমরা সেই মাসে গণ্য হবে যে মাসে সে আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করেছে। মুজাহিদেরও এই মত। হানাফী ফিকাহবিদগণও তাই বলেছেন। তার তওয়াফই গণ্য হবে। যদি বেশীর ভাগ তওয়াফ সে রমযান মাসেই করে ফেলে তা হলে সে তামাত্তুকারী হবে না। যদি বেশীর ভাগ তওয়াফ শওয়াল মাসে করে, তবে সে মাতাত্তুকারী হবে। তা এজন্যে যে, তাদের মূল কথা হল, বেশির ভাগ কাজ তাতে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রতিরোধ পর্যায়ে সমগ্র কাজের স্থলাভিষিক্ত। তার উমরা যদি রমযান মাসেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তা হলে সে হজ্জ ও উমরাকে হজ্জের মাসসমূহে একত্রিত করল না। ইহরাম তখনও টিকে থাকলে তার কোন মূল্য নেই। যেমন যদি সে উমরার জন্যে ইহরাম বাঁধে, পরে তা ভঙ্গ করে, পরে সে তা থেকে হালাল হয়ে যায়, পরে সেই বছরই সে হজ্জ করে, তা হলে সে তামাত্তু হজ্জকারী হবে না। কেননা তার উমরা হজ্জের মাসসমূহে হয়নি। যদিও তার দুটি ইহরাম হজ্জের মাসসমূহে হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি 'কেরান' করে, পরে সে তার উমরার তওয়াফ করার পূর্বেই আরাফাতে অবস্থান করে, তা হলে সে তামাত্তু-হজ্জকারী হবে না। হজ্জের মাসসমূহে তার দুটি ইহরাম একত্রিত হওয়া হিসেবে গণ্য হবে না। হজ্জের উমরার কাজ সম্পন্ন করা হলে সেটাই গণ্য হবে। এটা তারই মতো কথা, যে বলেছে তার উমরা সে মাসেই গণ্য হবে, যে মাসে সে 'লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করেছে, এই কথার কোন তাৎপর্য নেই। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, ইহরাম বাঁধার পর কাজ করা না হলে তা গণ্য করা হবে না।

মসজিদে হারামে উপস্থিত লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত

আবূ বকর বলেছেন, মনীষিগণ এই পর্যায়ে চারটি দিক দিয়ে মতের বিভিন্নতা প্রকাশ

করেছেন। আতা ও মকহুল বলেছেন, নির্দিষ্ট মীকাত থেকে মক্কা পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারাই হচ্ছে মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক। হানাফী ফিকাহবিদগণও এই মত দিয়েছেন। তবে তাঁরা বলেছেন, মীকাতের স্থানের লোকেরাও এই পর্যায়ে গণ্য। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক বলে হারাম-এর মধ্যের লোকদের বুঝিয়েছে। আল-হাসান, তায়ূস, নাফে ও আবদুর রহমান আল-আরাজ বলেছেন, মক্কার অধিবাসীরাই এই পর্যায়ে গণ্য। ইমাম মালিক ইবনে আনাসও এই কথাই বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যেসব লোক দুই রাত্রিরও কম সময় সেখানে থাকে, তারাই এই অভিধায় অভিহিত। তারা এক্ষণে মীকাতের অতি নিকটবর্তী। যারা এর বাইরে তাদের উপর 'মাতয়া' ধার্য হবে।

আবূ বকর বলেছেন, মীকাত এলাকার অধিবাসীরাই যখন এতে গণ্য তখন যারা ভেতরের দিকে মক্কা পর্যন্তের লোক, তারা ইহরাম না বেঁধেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে। তারা মক্কাবাসীরূপে গণ্য। তার দলীল হচ্ছে, যারা মক্কা থেকে বের হয়, কিন্তু মীকাত অতিক্রম করে বাইরে যায় না, তাদের জন্যে প্রত্যাবর্তন করা ও ইহরাম ছাড়া-ই মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয। কেননা তারা মীকাতের ভেতরে চলাফেরা করেছে। আর যারা মীকাতের ভেতরে চলাফেরা করে, তারা যেন ঠিক মক্কার ভেতরে চলাফেরা করে। তারা মক্কার অধিবাসী বলে অবশ্যই গণ্য হবে 'মাত্য়ার' ব্যাপারে। হারাম ও তার নিকটবর্তী এলাকার অধিবাসীরা 'মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক' হিসেবেই গণ্য হবে। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –

(মুশরিকদের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কোন প্রতিশ্রুতি কি করে হতে পারে) সেই লোকদের ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের নিকট সন্ধি চুক্তি করেছিলে? (সূরা তওবা ঃ ৭)

মক্কাবাসীরা তাদের মধ্যে গণ্য নয়। কেননা তারা তো মক্কা জয় হওয়ার সময় ইসলাম কবুল করেছিল। আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়েছিল হযরত আবূ বকর (রা) যখন আমীরে হজ্জ হয়ে এসেছিলেন। ওরা হচ্ছে বনু মুদলিয, বনুদ দিয়ল। ওদের ঘর-বাড়ি মক্কার বাইরে হারাম এলাকার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। হারামের কাছাকাছি এলাকার লোকেরাও।

যদি বলা হয়, যুল-হুলায়ফার অধিবাসীরা 'মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক' গণ্য হতে পারে কিভাবে, ওরা দশ রাতের সফরের দূরত্বে অবস্থিত।

জবাবে বলা যাবে, তারা প্রত্যক্ষভাবে 'মসজিদে হারামে উপস্থিত লোক' না হলেও তারা তাদের মধ্যেই গণ্য হবে এবং ইহরাম ছাড়াই তারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। এদিক দিয়েও যে, তারা যখনই ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করবে, তখন তারা নিজেদের ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধবে, যেমন মক্কাবাসীরা তাই করে। তা থেকে বোঝা গেল, উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, যারা মসজিদে হারামে উপস্থিত এবং যারা তাদের মধ্যে গণ্য।

কুরবানীর উট ও গরু সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ –

পরন্তু এই কুরবানীর জন্তুগুলোর স্থান সেই প্রাচীন ঘরের নিকটেই অবস্থিত। (হজ্জ ঃ ৩৩)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مِنًى مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَكَّةَ مَنْحَرٌ -

মিনা কুরবানী করার স্থান, মক্কার ঘাঁটি— ফাঁক-কোন্‌গুলোও কুরবানী করার স্থান।

বোঝা গেল, আল্লাহ্‌র ঘরের উল্লেখ করে এ আয়াতে মক্কার নিকটবর্তী এলাকা বুঝিয়েছেন, যদিও তা মক্কার বাইরে পড়ে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ -

এবং মসজিদে হারাম— যা আমরা লোকজনের জন্যে বানিয়েছি— তা সেখানে অবস্থানকারী ও বাইরে থেকে আসা লোক— সকলেই সমান, অভিন্ন। (সূরা হজ্জ ঃ ২৫)

এতে মূল মক্কা ও তার আশেপাশের লোকেরা শামিল। এই দুটি মাত্‌য়ারই হুকুম আমরা এখানে বর্ণনা করেছি। আর তা হচ্ছে কেরান ও তামাত্তু আর তৃতীয় মাত্‌য়া আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ও উরওয়া ইবনুয যুবায়র-এর কথানুযায়ী— হাজীর একাকী কোন রোগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়া কিংবা কোন কারণ যদি তাকে আটক করে। তখন সে কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেবে ও উমরা পালন করবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জ করার তামাত্তু গ্রহণ করবে ও তখন হজ্জ করবে। এই লোকই হজ্জ পর্যন্ত উমরা দ্বারা তামাত্তু গ্রহণ করবে। তাঁর মাযহাব হল, পরিবেষ্টিত ব্যক্তি হালাল হবে না, ইহরাম কে রক্ষা করবে তার পক্ষ থেকে কুরবানীর দিন পশু যবেহ না হওয়া পর্যন্ত সেদিন মাথা মুণ্ডন করবে, তার ইহরামকে বাঁচিয়ে রাখবে, মক্কায় উপস্থিত হবে। পরে হজ্জ থেকে হালাল হবে উমরা পালনের মাধ্যমে। কিন্তু এই কথা আল্লাহ্‌র এ কথার পরিপন্থী ঃ

এবং তোমরা পূর্ণ কর হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌র জন্যে। কিন্তু তোমরা যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তাহলে যে-কুরবানী করা সম্ভব তাই করবে।

পরে বলা হয়েছে ঃ 'এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত।

এখানে হজ্জ ও উমরার মধ্যে পার্থক করা হয়নি। উভয় ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডন দ্বারা হালাল হয়ে যেতে পারে। উমরা থেকে হালাল হওয়ার এই মাথা মুণ্ডন হজ্জের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়ার জন্যেও হবে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ হুদায়বিয়ায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে তাঁরা মাথা মুণ্ডন করেছেন, তিনি নিজে হালাল হয়েছেন ও লোকদেরকে তা করতে আদেশ করেছেন। তা সত্ত্বেও উমরা করতে না পারার ফলে তার যে কার্যক্রম, তা ঠিক উমরা নয়। তা উমরা সংক্রান্ত কার্যক্রম মাত্র। তা হজ্জের ইহ্‌রাম সহকারে করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন ঃ

যে লোক উমরা থেকে হজ্জ পর্যন্ত তামাত্তু করবে।

হজ্জ হারিয়ে যে লোক উমরার কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এখানে তার কথা বলা হয়নি। তিনি এ-ও বলেছেন ঃ 'যে লোক হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে, তাকে সেই কুরবানী করতে হবে, যা করা তার পক্ষে সহজ।' তাকে কুরবানীর পশু পাঠাতে হবে মাত্র। যেন তদ্দারা কুরবানীর দিন মাথা মুণ্ডন করে হালাল হতে পারে। তারপরে হজ্জ করুক, কি না-ই করুক।

দশ বছর পরে যদি হজ্জ করে, তার পূর্বে না করে, তবুও কুরবানী করার এই কর্তব্য অপরিবর্তিত থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল, আয়াতে যে তামাত্তুকারীর কথা বলা হয়েছে, তা সেই জিনিস নয় যার কথা ইবনুয যুবায়র বলেছেন। কেননা আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা সে পর্যায়ের নয়। উমরার, হজ্জের ও জন্তু যবেহর কার্যক্রমের কারণে কুরবানীর জন্তুই তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এ যবেহটা প্রয়োজনীয় হয়েছে পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে। উমরার পর হজ্জের সাথে তা সংশ্লিষ্ট নয়। এই মাত্য়া স্ত্রীর নিকট যাওয়াও হালাল করে দেয়। তবে তা সেইভাবে, যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। তা হল, হজ্জের মাসে উমরা হজ্জ একত্রে করা।

আর চতুর্থ 'মাত্য়া' হচ্ছে, কুরবানীর দিনের পূর্বে আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করলে হাজীর হজ্জ ভেঙ্গে যাওয়া। ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতীত এই কথা অপর কোন সাহাবী বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামান, আবূ উবায়দ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, ইবনে জুরাইজ, আতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

لَايَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اَحَدٌ اِلَّا اَحَلَّ -

যে কেউ কাবার তওয়াফ করবে, সে হালাল হয়ে যাবে।

বললেন, আমি বললাম, তা তো শুধু মা'রূফ— পরিচিত কাজ-কর্মের পর। বললেন, ইবনে আব্বাস তা পূর্বে ও পরে উভয় ক্ষেত্রের জন্যেই বলেছেন। বললেন, আমি প্রশ্ন করলাম, তা তিনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন ? বললেন, বিদায় হজ্জে রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত আদেশ থেকেই পাওয়া গেছে। তিনি সাহাবীগণকে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র এই কথাটি থেকেও তা জানা যায় ঃ

'পরে তার স্থান হচ্ছে প্রাচীনতম ঘর— কাবার নিকট।'

আবূ উবায়দ বলেছেন, আমার নিকট হাজ্জাজ শুবা, কাতাদাতা আবূ হাস্সান আল আরাজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ

مَاهٰذِهِ الْفُتْيَا الَّتِىْ قَدْشَعَّبْتَ النَّاسَ -

এসব কি ফতোয়া দেয়া হচ্ছে, যদ্দ্বারা আপনি লোকদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন ফতোয়া দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে লোক কাবা ঘরের তওয়াফ করেছে, সে হালাল হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন ঃ এটা তো তোমাদের নবী করীম (স)-এর সুন্নাত। তাতে তোমরা যতই অসন্তুষ্ট হও না কেন ?

আবূ বকর বলেছেন, বিদায় হজ্জে নবী করীম (স) এবং সাহাবীগণের কাজ সম্পর্কে বহু সংখ্যক মুতাওয়াতির বর্ণনা পাওয়া গেছে। হজ্জ ভেঙ্গে গেছে, অথচ তাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল না। ফলে নবী করীম (স) হালাল হননি। পরে বলেছেন, আমি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দিয়েছি এবং কুরবানীর দিন পর্যন্ত আমি হালাল হবো না। পরে তিনি সাহাবীগণকে আদেশ করলেন, অতঃপর তারা 'তরবিয়ার' দিন হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন, যখন তারা মিনায় চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। এটা দুটি মাত্য়ার একটি, যার কথা উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছিলেন এই ভাষায় ঃ

রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে দুটি 'মাত্য়া' ছিল। আমি সে দুটো নিষেধ করছি। আমি তদস্থলে হজ্জের 'মাত্য়া' ও স্ত্রীদের 'মাত্য়া' স্থাপন করছি।

তারিখ ইবনে শিহাব আবূ মূসা (রা) থেকে হযরত উমর (রা)-এর এই 'মাত্য়া' গ্রহণ করতে নিষেধ করার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন, আমি বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন; স্ত্রীদের ব্যাপারে আপনি এই যে মাতয়ার কথা নতুন করে বলেছেন, এটা কি ? বললেন, আমরা তো আল্লাহ্র কিতাব থেকে দলীল গ্রহণ করি। আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরাকে পূর্ণ কর।' আর রাসূলের সুন্নাত থেকেও দলীল গ্রহণ করি। কেননা নবী করীম (স) কুরবানী না করে হালাল হন নি। এই বলে হযরত উমর জানালেন যে, এই মাত্য়া মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্র 'তোমরা আল্লাহ্র জন্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর' কথার দ্বারা। তাঁর এই কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন দ্বারা সুন্নাত মনসূখ হতে পারে।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এই কাজটি কেবলমাত্র তাঁদের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, নয়ীম, আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, হরস ইবনে বিলাল, ইবনুল হরস তাঁর পিতা বিলাল ইবনুল হরস আল মুজানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

'আমি বললাম, হে রাসূল! হজ্জ বিনষ্ট হওয়া কি শুধু আমাদের ব্যাপার, না আমাদের পরবর্তীদেরও ব্যাপার ? বললেন, না, বরং এটা বিশেষভাবে আমাদের ব্যাপার। হযরত আবূ যর (রা) বলেছেন, উমরার কারণে হজ্জ ভেঙ্গে যাওয়া কেবলমাত্র রাসূল (স)-এর সাহাবীগণের ব্যাপার। তিনি আলী, উসমান ও সাহাবীদের একটি দলের নিকট থেকে নবী করীম (স)-এর পরও হজ্জ ভেঙ্গে যাওয়ার কথা অস্বীকার করার বর্ণনা এসেছে। হযরত উমর (রা) বললেন, রাসূলের যমানায় দুটি উমরা ছিল। সাহাবীগণ তা জানতেন, তাঁরা এ-ও জানতেন যে, তা মনসূখ হয়ে গেছে। তাঁরা যদি তা না-ই জানতেন, তাহলে তাঁরা তার নিষেধের কথা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত বলে স্বীকার করতেন না। সাহাবীদের জানা যে, তার মনসূখ হওয়া প্রমাণিত নয়, তা এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। হযরত জাবির (রা) থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরাকা ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, হে রাসূল! আমাদের এই উমরা কি শুধু আমাদের এই বছরের, না চিরদিনের জন্যে? বললেন, তা চিরদিনের জন্যে, উমরা হজ্জের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে। এ হাদীসে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যে উমরার কারণে তাঁরা হজ্জ নষ্ট করেছেন তা শুধু সেই অবস্থার জন্যে। তার আর কখনও হবে না। তাঁর কথা ঃ উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে কিয়ামত পর্যন্তকার জন্যে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, ইয়াহইয়া ইবনে জাফর, ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা-জাবির নবী করীম (স) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ উবায়দ বলেছেন, তাঁর কথা উমরা কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে— এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি— উমরা হজ্জের মধ্যে দাখিল হয়ে যাওয়া তা সোজাসুজি ভেঙ্গে যাওয়া, নষ্ট হওয়া। আর তা হচ্ছে, ব্যক্তি হজ্জের জন্যে তালবিয়া বলবে। পরে উমরা করে তা থেকে হালাল হয়ে যাবে কাবার তওয়াফ করার দ্বারা। আর দ্বিতীয়টি, হজ্জের মধ্যে উমরার দাখিল হয়ে যাওয়ার অর্থ মাত্য়া। আর তা হচ্ছে, ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহে আলাদাভাবে উমরা করবে। পরে তা থেকে সেই বছরই হজ্জ করে হালাল হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ দুটি জিনিসই পরস্পর মিশ্রিত, শব্দ দ্বারা নয়। তার বাহ্যিক দাবি হচ্ছে, হজ্জ হল উমরার স্থলাভিষিক্ত আর উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট। তাই যে লোক হজ্জ করল, তার উমরাও আদায় হয়ে গেল। যেমন বলা হয়, এক দশ-এর মধ্যে শামিল। অর্থাৎ দশ হলে আর এক-এর প্রয়োজন থাকে না। দশ-এর মধ্যেই এক শামিল রয়েছে। অতএব তা নতুন করে পালন করার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তার উল্লেখেরও প্রয়োজন হয় না। নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীগণকে যে আদেশ করেছিলেন হালাল হয়ে যাওয়ার জন্যে, তার আর একটি অর্থ বলা হয়েছে। সেটি উমর ইবনে যার মুজাহিদ থেকে নবী করীম (স)-এর হালাল হয়ে যাওয়া পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তার শেষে বলেছে, আমি মুজাহিদকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কি হজ্জ ফরয করেছিলেন এবং ইহরাম বেঁধে তালবিয়া বলতে তাদেরকে আদেশ করেছিলেন ? কিংবা তাঁদেরকে কিসের আদেশ করা হবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ তোমরা তেমনি তালবিয়া বল, যেমন নবী করীম (স) করছেন ? এবং তাদের কি আদেশ দেয়া হবে, সেজন্যে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। আলী ও আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা) প্রত্যেকেই বলেছেন ঃ আমরা নবী করীম (স)-এর মতই ইহরাম বেঁধে তালবিয়া বলছিলাম। নবী করীম (স) শুরু থেকেই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর এই কথা থেকেই তা বোঝা যায় ঃ 'আমি আমার ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে গেলে কখনই পেছনে ফিরতাম না। কুরবানীর জন্তু পাঠাতাম না এবং সেটিকে নিশ্চয়ই উমরা বানাতাম অর্থাৎ তিনি যেন বের হয়েছেন, কি কাজের আদেশ করা হয় তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সাহাবীগণকে তিনি সেই কাজেরই আদেশ করলেন। তাঁর এই কথাটি তার অকাট্য প্রমাণ— বলেছেন ঃ 'আমার রব্ব-এর নিকট থেকে এই পবিত্র উপত্যকায় আমার নিকট একজন আগমনকারী এসেছেন'। সেটি ছিল আকীক উপত্যকা। পরে বলেছেন ঃ এই পবিত্র উপত্যকায় নামায পড় এবং বল ঃ 'হজ্জ উমরার মধ্যে।' এ থেকে বোঝা গেল, রাসূলে করীম (স) বের হয়েছিলেন কি তাঁকে আদেশ করা হয় তার অপেক্ষায় ছিলেন। পরে যখন উপত্যকায় উপনীত হল, তখন ঃ حَجَّةٌ فِى عُمْرَةٍ -এর ধ্বনি দেয়ার জন্যে আদেশ করলেন। পরে তাঁর সাহাবীগণ ইহরাম বেঁধে হজ্জের তালবিয়ার ধ্বনি দিতে শুরু করলেন। তার এই ইহরাম সহীহ ছিল না। তা ছিল স্থগিত, যেমন আলী ও আবূ মূসা (রা)-এর ইহরাম স্থগিত ছিল। এই সময় ওহী নাযিল হয় এবং মাত্'আর জন্যে তাঁরা আদিষ্ট হন। আদেশ করা হয় কাবার তওয়াফ করার ও হালাল হয়ে যাওয়ার জন্যে এবং উমরার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্যে। আর তাঁরা ইহরাম বাঁধবেন, যেমন কোন জিনিসের ইহরাম বাঁধার আদেশ করা হয় অথচ তার নাম বলা হয় না। কেননা সেটাকে উমরা বানাতে চাইলে তা পারে। যদিও তাকে হজ্জের নামকরণ করা হয়নি সহীহ নামকরণরূপে। কেননা তাদেরকে নবী করীম (স)-এর আদেশের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। ফলে সেই সাহাবীদের জন্যে তা ছিল একটা বিশেষ ব্যবস্থা। তাঁরা ইহরাম বেঁধেছিলেন হজ্জের। কিন্তু এই ইহরামকে তার জন্যে নির্দিষ্ট করা সহীহ ছিল না। তখন তাঁরা ঠিক এমন হল, যেন কোন কিছু দিয়ে ইহরাম বেঁধেছেন কিন্তু ঠিক নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুর নিয়ত তাঁরা করেন নি। কেননা তখন তো তাঁরা ও অন্যান্য সব লোককে রাসূলে করীম (স) কি আদেশ করেন তার জন্যে অপেক্ষা করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। তবে যাঁরা নির্দিষ্টভাবে কিছুর জন্যে ইহরাম বাঁধে, তবে তা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য, তাকে অন্য কোন দিকে ঘুরিয়ে দেয়া জায়েয নয়।

নবী করীম (স) কোন্ অবস্থায় হজ্জ ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করেছেন, এই কথা বহু লোকই অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে যায়দ ইবনে হারুনের বর্ণনা। তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাতিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বের হলাম বিভিন্ন প্রকারের লোক হিসেবে। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ মুফরাদ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন। কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন। কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের নিয়তে ইহ্রাম বাঁধলেন। যিনি মুফরাদ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, তিনি তা থেকে হালাল হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি হজ্জের অনুষ্ঠানমালা পূর্ণভাবে পালন করলেন। যিনি উমরার জন্যে ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, তিনি আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ' করলেন। অতঃপর তিনি ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত হজ্জও করলেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, মালিক ইবনে আনাস, আবুল আসওয়াদ, উরওয়াতা, আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বের হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ হজ্জের নিয়ত ও তালবিয়া করলেন, কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের, কেউ শুধু উমরার তালবিয়া করলেন। আর নবী করীম (স) ইহ্রাম বাঁধলেন হজ্জের। যিনি উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, তিনি কাবার তওয়াফ ও সাঈ' করে হালাল হয়ে গেলেন। যিনি হজ্জ বা হজ্জ ও উমরা দুটিরই ইহ্রাম বাঁধলেন, তিনি কুরবানীর দিন পর্যন্ত হালাল হলেন না।

বলেছেন, আবূ উবায়দাতা আবদুর রহমান, মালিক, আবুল আসওয়াদ, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা নবী করীম (স)-এর ইহ্রাম ও তালবিয়া সম্পর্কে কিছু বলেন নি।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে এর বিপরীত কথাও বর্ণিত হয়েছে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, ইয়াযীদ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান কন্যা উমরাতা তাঁকে জানিয়েছে যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা যিলকদ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমাদের লক্ষ্য হজ্জ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমরা যখন নিকটবর্তী হলাম, তখন নবী করীম (স) আদেশ করলেন ঃ যার নিকট কুরবানীর জন্তু নেই, সে যেন শুধু উমরা করে। তখন যার যার নিকট কুরবানীর জন্তু ছিল, তাদের ছাড়া আর সকলেই হালাল হয়ে গেলেন।

বলেছেন, আবূ উবায়দ ইবনে সালিহ্, লাইস, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, উমরাতা, আয়েশাতা (রা) নবী করীম (স) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে কিছু অতিরিক্ত কথা বলা হয়েছে। তা হল, ইয়াহইয়া বলেছেন, আমি পরে এই কথা কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, হাদীসটি যথার্থভাবেই তোমার নিকট এসেছে। নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীগণকে হজ্জ ভাঙ্গতে আদেশ করেছেন এবং হযরত উমর (রা) সাহাবীদের উপস্থিতিতে বলেছেন, রাসূলের সময়ে দুটি মাত্য়া ছিল। আমি সে দুটি করতে নিষেধ করছি। তার পরিবর্তে স্ত্রীর মাত্য়া ও হজ্জের মাত্য়া প্রতিস্থাপিত করছি। এ পর্যায়ে যত হাদীস এসেছে মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে, তার সহীহ রূপ হচ্ছে এই সব। তিনি এসব মাত্য়াই

বুঝিয়েছেন। তাদের কারোর পক্ষ থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়নি। ভিন্ন মতও পাওয়া যায়নি কারোর থেকে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ পরস্পর বিপরীত হলে তা এমনভাবে প্রত্যাহৃত হতো, যেন এ ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে কিছুই বর্ণিত হয়নি। থেকে যায় অন্যান্য হাদীসসমূহ, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (স) তাঁর সাহাবীগণকে হজ্জ ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করেছেন। সে সব হাদীস পরস্পর বিপরীত নয় এবং তা মনসূখ হয়ে যাবে আল্লাহ্র এই কথা দ্বারা এবং তোমরা আল্লাহ্র ওয়াস্তে হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ কর— যেমন হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর 'যে জন্তু কুরবানী করা সহজ হবে'— আল্লাহ্র এই কথাটি পর্যায়ে আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতে যে কুরবানীর জন্তুর কথা বলা হয়েছে, তা ঠিক সেই কুরবানীর জন্তুর মতই যা পরিবেষ্টিত হলে যবেহ করতে হয়। আর আমরা বলেছি যে, এই কুরবানীর ক্ষুদ্রতম জন্তু হচ্ছে ছাগল। আর ইচ্ছা করলে গরু কিংবা উট-ও কুরবানী করা যায়। তা হলে খুবই উত্তম হয়। আর এই জন্তু কুরবানীর দিনই মাত্র যবেহ করা যায়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

আর (কুরবানীর পর পর) যখন জন্তুটির পিঠগুলো জমিনের উপর স্থিত ও স্থির হয়ে যায়, তখন থেকে নিজেরাও খাও, আর তাদেরকেও খাওয়া, যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ বসে রয়েছে আর তাদেরকেও, যারা এসে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে। এই জন্তুগুলোকে আমরা তোমাদের জন্যে এ ভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও অধীন বানিয়ে রেখেছি, যেন তোমরা শোকর আদায় কর। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৬)

বলেছেন ঃ

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -

পরে তারা যেন তাদের (দেহের) ময়লা-আবর্জনা পরিচ্ছন্ন করে এবং তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে। আর প্রাচীনতম কাবা ঘরখানির যেন তওয়াফ করে। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৬)

দেহের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও দূরীভূত করা এবং তওয়াফে যিয়ারত করার কাজ কুরবানীর আগে তো কখনই হয় না। এ সব কাজ যখন জন্তু যবেহ করার উপর বিন্যস্ত, বোঝা গেল যে, সেটি কেরান ও তামাত্তুর কুরবানীর জন্তু। কেননা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সকল প্রকারের কুরবানীর জন্তুর উপর এ সব কাজ বিন্যাস হয় না। তাতে তার ইখতিয়ার রয়েছে, যখন-ইচ্ছা তা কুরবানী করতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মাত্য়ার কুরবানী কুরবানীর দিনের পূর্বে চলবে না। নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও সেই কথা-ই বোঝায় ঃ 'আমি যদি আমার কোন কাজে এগিয়ে যাই, তা হলে আমি পিছিয়ে যাই না, যতক্ষণে আমি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দেব ও সেটিকে উমরা বানিয়ে দেব।' নবী করীম (স) নিজে কারেন হজ্জ করেছিলেন এবং কুরবানীর জন্তু মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যদি তাঁর কাজে অগ্রসর হয়ে যান, তা হলে তিনি যে জন্তু পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার পেছনে

ফিরিয়ে আনবেন না। মাত্য়ার জন্তু কুরবানীর দিনের আগে যবেহ করা যদি জায়েয হতো তা হলে তিনি তা অবশ্যই যবেহ করতেন ও হালাল হয়ে যেতেন। যেমন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে আদেশ করেছিলেন। আর যা তিনি হারিয়েছেন, তা তিনি ফিরিয়ে পেতেন না। হযরত আলী (রা) যখন বললেন যে, আমি নবী করীম (স)-এর মতই ইহরাম বেঁধেছি, তখন তিনি তাকে বললেন ঃ

আমি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দিয়েছি এবং কুরবানীর দিন পর্যন্ত আমি হালাল হব না।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ خُذُوْا عَنِّىْ مَنَا سِكَكُمْ

তোমরা তোমাদের হজ্জ-কুরবানীর নিয়ম-কানুন আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর।

নবী করীম (স) তো কুরবানীর দিন জন্তু যবেহ করেছেন। অতএব তাঁর অনুসরণ করাই কর্তব্য। সেই সময়ের আগে তা করা জায়েয নয়।

তামাত্তু'র রোযা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ -

যে লোক কুরবানী দিতে পারবে না, সে হজ্জের সময়ই তিনটি রোযা রাখবে এবং অবশিষ্ট সাতটি রাখবে যখন তোমরা বাড়িতে ফিরে আসবে।

আবূ বকর বলেছেন, 'হজ্জে তিনটি রোযা'— এ কথার তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেটা 'তরবিয়াতে'র দিনের একদিন আগে, 'তরবিয়াতে'র দিন এবং আরাফার দিন। আর হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর (রা) বলেছেন, যেদিন হজ্জের ইহরাম বাঁধবে সেদিন থেকে আরাফার দিন পর্যন্ত। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, এ দিন-কয়টির রোযা রাখবে না ইহরাম না বেঁধে (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার পর রাখবে) আতা বলেছেন, ইচ্ছা করলে এই দিন-কয়টির রোযা রাখতে পারে হালাল অবস্থার দশ দিনে। তায়ূসেরও এই মত। এ দুজনই বলেছেন, উমরা করার আগে এই দিন কয়টির রোযা রাখবে না। আতা বলেছেন, পরবর্তী দশ দিনে এই দিন কয়টির রোযা বিলম্বিত করা যাবে। কেননা কুরবানীর জন্তু পাওয়া সহজ হবে কিনা, তা তখন পর্যন্ত জানা নাও যেতে পারে।

আবূ বকর বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায়, তাঁরা দুজন এ সবকে মুস্তাহাব মনে করেন। ওয়াজিব মনে করেন না। আমাদের মতে যেমন, পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ার কাজটি নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। কেননা শেষ পর্যন্ত পানি পাওয়া তো যেতে পারে। আলী (রা), আতা ও তায়ূস-এর মত হচ্ছে, দশ দিনের মধ্যে এই দিন কয়টির রোযা রাখা জায়েয হালাল অবস্থায় হোক, কি ইহরাম অবস্থায়। কেননা তাঁরা এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করেন নি। হানাফী ফিকাহবিদগণ উমরার ইহরাম বাঁধার পর এই দিন কয়টির রোযা রাখা জায়েয মনে করেন। তার পূর্বে তা জায়েয মনে করেন না। তা এ কারণে যে, উমরার ইহরামই হচ্ছে 'তামাত্তু' হজ্জের কারণ। আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ -

যে লোক উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত তামাত্তুর ফায়দা গ্রহণ করবে........

তাই যখন কারণ পাওয়া যাবে, তখন ওয়াজিব হওয়ার সময়ের আগে তা করা জায়েয হবে। যেমন নিসাব পূর্ণ হলে আগেভাগেই যাকাত দিয়ে দেয়া জায়েয। আর যখন পাওয়া গেলে হত্যার কাফফারাও আগে ভাগেই দেয়া জায়েয। কারণ পাওয়ার দরুন ওয়াজিব হওয়ার সময়ের পূর্বেই তা আগেভাগে করা জায়েয এজন্যেও যে, আমরা জানি হজ্জ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই কুরবানী করা ওয়াজিব হয়। আর হজ্জ পূর্ণ হয় আরাফাতে অবস্থান সম্পূর্ণ হলেই। তার পূর্বে কোন বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়, হজ্জ বিনষ্টও হয়ে যেতে পারে। আর তা যদি হয়, তাহলে কুরবানী করা ওয়াজিব হবে না তার প্রতি। তা যদি হয়— আর সকলেরই মতে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তিন দিনের রোযা রাখা সকলেরই নিকট জায়েয— যদিও হজ্জের ইহরাম বাঁধলেই তা ওয়াজিব হয়ে যায় না। কেননা কুরবানীর সম্পর্ক হচ্ছে হজ্জ ও উমরা এক সাথে সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে। কাজেই কারণ— অর্থাৎ উমরা পালন— পাওয়া গেলে তার পরই তা জায়েয। আর হজ্জের ইহরাম ও উমরার ইহরামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যদি তা হজ্জের ইহরামের পর করা হয়। কেননা তা কারণ পাওয়া যাওয়ার দরুনই। আর তা উমরার ইহরাম বাঁধার পরই পাওয়া গেছে।

যদি বলা হয়, তুমি যা বলতে তা-ই যদি জায়েয হওয়ার কারণ হয়, তাহলে অবশিষ্ট সাতটি রোযা রাখাও অবশ্যই জায়েয হবে। কেননা কারণ তো পাওয়াই গেছে।

জবাবে বলা যাবে, উমরার ইহরামের পর তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কথার ভিত্তিতে তা যদি বাধ্যতামূলকই হয়, তাহলে হজ্জের ইহরামের পর তার অনুমতি দানও অনুরূপভাবে বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। কেননা হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তিন দিনের রোযা রাখাকে তুমি জায়েয মনে করছ আর বাকী সাতটি রাখা জায়েয মনে করছ না।

যদি বলা হয়, রোযা যখন কুরবানীর বিকল্প, আর জন্তু যাবেহ করার কুরবানীর দিনের পূর্বে জায়েয নয়, তাহলে রোযা রাখা কি করে জায়েয হতে পারে?

জবাবে বলা যাবে, কুরবানীর দিনের পূর্বে রোযা রাখা জায়েয— এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। অথচ কুরবানীর দিনের পূর্বে জন্তু যবেহ করা হাদীসে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে প্রমাণিতভাবে। এ দুটির একটি সর্বসম্মতভাবেই প্রমাণিত। প্রমাণিত আল্লাহ্র এই কথার দ্বারা ঃ

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ -

হজ্জের মধ্যেই তিনটি দিনের রোযা রাখতে হবে।

আর দ্বিতীয়টি প্রমাণিত সুন্নাত দ্বারা। ফলে যুক্তির ভিত্তিতে তার উপর আপত্তি তোলার কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

উপরন্তু রোযা হচ্ছে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার ব্যাপার। দুটি জিনিস তার জন্যে অপেক্ষমান। একটি হচ্ছে হজ্জের মাসসমূহে উমরা ও হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। আর দ্বিতীয় হচ্ছে হালাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কুরবানীর জন্তু না পাওয়া। এ দুটি দিকই যদি পাওয়া যায়, তাহলে মাত্য়ার রোযা রাখা জায়েয ও সহীহ। আর এর দুটির কোন একটিও না-পাওয়া গেলে মাত্য়ার রোযা হওয়া বাতিল হয়ে যাবে, তা হবে নফল। আর কুরবানীর জন্তুর উপর অপর কতিপয় কাজ বিন্যস্ত। যেমন মাথা মুণ্ডন, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারকরণ ও যিয়ারতের তওয়াফ করা। এই কারণেই সে জন্যে কুরবানীর দিনটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যে লোক কুরবানীর জন্তু পাবে না, সে হজ্জের সময়েই তিনটি রোযা রাখবে।' কাজেই তা হজ্জের আগে করা জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, 'হজ্জের সময়ে তিন দিনের রোযা রাখার ব্যাপারটি দুটির একটি অর্থ অবশ্যই হবে। হয় তদ্দ্বারা সে সব কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা হবে, যা হজ্জের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। নবী করীম (স) আরাফাতের অবস্থানকেই হজ্জ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'আরাফাতই হচ্ছে হজ্জ।'

অথবা তা থেকে বোঝানো হয়েছে হজ্জের ইহরামের মধ্যে কিংবা হজ্জের মাসসমূহে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُومٰتٌ 'হজ্জের মাসসমূহ জানা পরিচিত' হজ্জ সংক্রান্ত কার্যক্রম বোঝানো হয়নি নিশ্চয়ই, যা করা না হলে হজ্জ সহীহ্ হতে পারে না। কেননা তা আরাফাতের দিন সূর্যের পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ার পরই হয়। তাতে তিনদিনের রোযা রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। তা সত্ত্বেও আরাফাতের দিনের পূর্বেই রোযা রেখে ফেলা জায়েয হওয়ার কোন মতপার্থক্য নেই। তাই এদিকটি বাতিল হয়ে গেল। অবশিষ্ট থাকল সম্ভাব্যতার দিনগুলো হজ্জের ইহরামে কিংবা হজ্জের মাসসমূহে। ব্যত্যত তা করা জায়েয হতে পারে দুটির যে কোন একটি আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল পাওয়া গেলেই। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'হজ্জ তিন দিনের রোযা' কথাটি পর্যায়ে জানা আছে যে, তার কারণ পাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে তার জায়েয হওয়া। তার ওয়াজিব হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। উমরার ইহরাম বাঁধার সময় এই তাৎপর্য যখন উপস্থিত, তখন তা যথেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তা আয়াতের বিপরীত কিছু হবে না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ –

যে লোক ভুল করে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার কর্তব্য হবে একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করা। (সূরা নিসা ঃ ৯২)

হত্যার আগেই ক্রীতদাস মুক্ত করা জায়েয হওয়া নিষেধ করে না; কেননা তখন কঠিন আঘাত রয়েছে, যার পরিণতিতে মৃত্যু অনিবার্য। তেমনি এই কথাটি ঃ

لَازَكٰوةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ –

একটি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন মালের উপর যাকাত ধার্য হয় না।

তাই বলে যাকাতের কারণ— নিসাব পূর্ণ হয়ে গেলে একটি বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত দিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং তা জায়েয। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র 'হজ্জে তিনটি দিনের রোযা' কথাটি আগে-ভাগে রাখা নিষিদ্ধ করে না, যদি তার কারণটা পাওয়া যায়, যার দরুন তা করা হজ্জের মধ্যেই জায়েয।

যদি বলা হয়, যার বদলে কোন কাজ করা হবে সেই জিনিসের সময়ের আগে তার বদল পেতে পারি না। রোযা হচ্ছে কুরবানীর বিকল্প, কুরবানীর আগে রোযা রাখা তাই জায়েয হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, এটা আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন । কেননা নাযিল হওয়া অকাট্য দলীলই কুরবানীর পূর্বে আগে-ভাগেই রোযা রাখাকে জায়েয করে দিয়েছে। তা ছাড়া যার বদলে যেটি, সেটি তার বদলের পূর্বে সম্পূর্ণ তো পাচ্ছি না। তাই কুরবানীর সময়ের পূর্বেই কয়েকটি রোযা

রাখা জায়েয হতে পারে আর তা-ই হচ্ছে দশটি রোযার মধ্যে তিনটি রোযা। আর তার অবশিষ্ট সাতটি রোযা কুরবানীর আগে রাখা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'সাতটি রাখবে যখন তোমরা (বাড়িতে) ফিরে যাবে।' মোট রোযা থেকে কেবল ততটা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যা করে কুরবানীর দিন কুরবানী করতে না পারার দুরুন হালাল হওয়া যাবে।

উপরন্তু রোযা হচ্ছে কুরবানীর বিকল্প। আর উমরার কুরবানী উমরার ইহ্রাম বাঁধার পরই ওয়াজিব হতে পারে। আর তার সাথে তামাত্তুর হুকুম সম্পর্কিত হয় জন্তু যবেহ করার সময় পর্যন্ত হালাল হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে তার বদলে রোযা জায়েয এ হিসেবে যে, মাত্য়ার কুরবানী দেয়া সহীহ। এ থেকে তার মাত্য়ার পক্ষ থেকে হওয়া সহীহ্ প্রমাণিত হয়। যখনই মাত্য়ার কুরবানী পাঠিয়ে দেয়া হবে, পরে ইহ্রামের নিয়তে বের হবে, সে ইহ্রামধারী হবে তার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে। তা থেকে মাত্য়ার জন্তু চালিয়ে দেয়া সহীহ প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে কুরবানী দিতে না পারলে তার বিকল্প রোযা রাখা সহীহ্ হয়।

যদি বলা হয়, উমরার ইহ্রাম বাঁধার আগেই কুরবানী করা সহীহ্। কিন্তু সেই অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, মাত্য়ার ইহ্রামের পূর্বে করা হলে তার সাতে মাত্য়ার হুকুম জড়িত হবে না। তার দলীল এই যে, এই অবস্থায় ইহ্রামের হুকুমে তার কোন প্রভাব পড়ে না। তার হওয়া না-হওয়া উভয়ই সমান। তাই উমরার ইহ্রামের পূর্বে রোযা রাখা সহীহ্ হবে না। উমরার ইহ্রাম বাঁধা হলে তার জন্যে কুরবানীর হুকুম প্রমাণিত হবে হালাল হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে। এই জন্যেই সে অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয হবে। যেমন মাত্য়ার কুরবানী দেয়া সহীহ্ হয়। হজ্জের ইহ্রামের আগে রোযা রাখা জায়েয হওয়ার কথাও প্রমাণিত হয়। কেননা তামাত্তু হজ্জকারীর পক্ষে তরবিয়ার দিন হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা সুন্নাত। নবী করীম (স)-তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে তা-ই করার আদেশ করেছিলেন যখন তারা তাঁদের ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গিয়েছিলেন উমরা করে। আর তা হয় এজন্যে যে, তার পূর্বেই রোযা রাখা হয়ে গেছে।

তামাত্তু হজ্জকারী কুরবানীর আগে রোযা না রাখলে ......

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ -

যে লোক কুরবানীর জন্তু যোগড়া করতে পারেনি, সে হজ্জের সময়ই তিনটি রোযা রাখবে।

যে লোক কুরবানী দিতে পারেনি এবং কুরবানীর দিনের আগে তিন দিনের রোযাও রাখেনি, তার ব্যাপারে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবরাহীম ও তায়ূস বলেছেন, কুরবানী তাকে করতেই হবে, কুরবানী ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তার কাজ হবে না। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদও এই কথাই বলেছেন। ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) বলেছেন, সে মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোযা রাখবে। ইমাম মালিকেরও এই কথা। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ তা শরীকের দিনগুলোর পর সে রোযা রাখবে। ঈমাম শাফেয়ী এই মত গ্রহণ করেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, রোযা ইফতারের দিন— ঈদুল ফিতরের দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা নবী করীম (স)-এর কথার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তা প্রমাণিত হয়েছে মুতাওয়াতির ও সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সমূহের বর্ণনায়। ফিকাহবিদগণ এসব বর্ণনাকে একমত হয়েই কাজে লাগিয়েছেন। কাজেই এই দিনগুলোতে রোযা রাখা কারোর জন্যেই জায়েয নয়। তবে (মাত্‌য়ার রোযা রাখা যেতে পারে), ফরয রোযা নয়, নফল রোযাও নয়। এই সব রোযা সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মাত্‌য়ার রোযা রাখাও জায়েয হবে না। আর সকল ফিকাহবিদই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, কুরবানীর দিন রোযা রাখা জায়েয নয়। আর সেটি হজ্জের দিনসমূহের মধ্যেই গণ্য। অতএব তা নিষিদ্ধ দিনগুলোর শামিল। মিনায় অবস্থানকারী দিনগুলোতে রোযা রাখাও জায়েয নয়। রমযান মাসের কাযা রোযা রাখাও এই সময় নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহই বলে দিয়েছেন, রমযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'তা রাখতে হবে অন্যান্য দিনে।' এসব হাদীসে যে নিষেধ উল্লিখিত হয়েছে, তা আয়াতের সাধারণত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্য সময়ে সে কাযা আদায় করতে বলে। তামাত্তুর রোযাও এই নিষেধের আওতার মধ্যে পড়া অবশ্যম্ভাবী। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হজ্জে তিনটি দিনের রোযা' এই দিনগুলো বাদ দিয়ে অন্য সময়ই রাখতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আরও কথা এই যে, 'হজ্জে তিনটি দিনের রোযা' বলা হয়েছে, কিন্তু এই তিন দিনের রোযা তো হজ্জের মধ্যের ব্যাপার নয়। কেননা হজ্জ তো এ সময় নিঃশেষ হয়ে গেছে যখন সে রোযাগুলো রাখা জায়েয ছিল না।

যদি বলা হয়, যখন বলা হয়েছে ঃ 'হজ্জে তিন দিনের রোযা' এবং এই দিনগুলো হজ্জের দিন— কাজেই এই দিনগুলোতেই রোযা রাখা জায়েয হওয়া উচিত।

জবাবে বলা যাবে— না, তা ওয়াজিব নয়। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি— এই দিন গুলোতে নবী করীম (স) রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তা এক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী এবং বিশেষভাবে নির্দিষ্টকারী। যেমন করে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তা আদায় করার সময় অন্যান্য দিন' দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এই দিনগুলোতে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়— হজ্জের দিনগুলোতে যদি রোযা রাখা জায়েয হতো, তাহলে কুরবানীর দিন রোযা রাখা অধিক বেশি করে জায়েয হতো। কেননা এই দিনগুলোর মধ্যে সেই দিনটিই হজ্জের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার জন্যে অধিকভাবে নির্দিষ্ট। তৃতীয় এই যে, নবী করীম (স) আরাফাতে অবস্থানের দিনটিকে 'হজ্জ হচ্ছে আরাফা' বলে হজ্জের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব 'হজ্জে তিন দিনের রোযা' কথটির দাবি হচ্ছে তার সেদিন হবে আরাফাতে অবস্থানের দিন। আর চতুর্থ হচ্ছে, বর্ণিত হয়েছে ঃ বড় হজ্জের দিন হচ্ছে আরাফাতে অবস্থানের দিন। আর কুরবানীর দিনও সেজন্যে নির্দিষ্ট। আর ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরবানীর দিন রোযা রাখা যাবে না। যদিও সেটিও হজ্জের দিন। রোযা রাখা নিষিদ্ধ দিনগুলোর মধ্যে হজ্জের দিন নাম করে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই সেদিন রোযা না-রাখা অধিকভাবে নিষিদ্ধ হবে, এটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু কুরবানীর পশু যবেহ করার দিনের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা হল হজ্জের অনুগামী দিনগুলো। আর তা হচ্ছে প্রস্তর নিক্ষেপণের দিন কয়টি। এইদিন কয়টি হজ্জের দিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দিন কয়টিতে রোযা রাখলে তাতে হজ্জে রোযা রাখা হয় না। মিনার দিনগুলোর পরে তিন দিনের রোযা রাখা হানাফী ফিকাহবিদগণ জায়েয মনে করেন নি। কেননা

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যা কুরবানী করা সহজ হবে।' যে লোক তা করতে পারবে না, সে হজ্জে তিন দিন রোযা রাখবে।' এতে মূল ফরয করা হয়েছে কুরবানী করা। তাকে রোযায় রূপান্তরিত করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে। কিন্তু তা-ও শেষ হয়ে গেছে। তাই শেষকালে কুরবানী করার ওয়াজিবটাই থেকে গেল। যেমন তাঁর কথা ঃ 'পর পর দুই মাস রোযা রাখতে হবে' এবং তাঁর কথা ঃ 'একটি মুমিন ক্রীতদাস মুক্তকরণ'— এই শর্তের ভিত্তিতেই তা কাফফারার বিকল্প হতে পারে।

যদি বলা হয়, তাতে বেশীর পক্ষে করণীয় হচ্ছে কাজটা একটা সময়ে করে ফেলা। তা সেই সময়টাতে করতে না পারলে তা প্রত্যাহৃত হয়ে যায় না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ 'নামায কায়েম কর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে'। এবং 'সংরক্ষণ কর নামাযসমূহ, বিশেষ করে মধ্যম নামায।' এবং তাঁর কথা ঃ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ 'ফজরের কুরআন পাঠ।' এই ধরনের আরও অন্যান্য কথা, যাতে ফরযসমূহকে সময়ের সাথে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এসব ফরয হারিয়ে গেলে তা প্রত্যাহৃত হয়ে যায় না। এ পর্যায়ের জবাব দুটি। একটি— সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রতিটি ফরয সেই সময় চলে গেলে ফরযও শেষ হয়ে যায়। অপর একটি ফরয ধার্য হওয়ার জন্যে আর একটি দলীলের প্রয়োজন। কেননা এই দ্বিতীয় সময়ে যা ফরয করা হয়েছে, তা প্রথম সময়ে ফরয হতো না যদি নবী করীম (স)-এর এই কথাটি পাওয়া না যেত ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَاذَكَرَهَا -

যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে নামায না পড়ে কিংবা তা পড়তে ভুলে যায়, তাহলে পরে যখনই স্মরণ হবে, তা পড়ে নেবে।

এই কথাটি না বলা হলে নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর তা পড়া ফরয হতো না। অনুরূপভাবে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'না-রাখা রোযা রাখার সময় অন্যান্য দিনে।' রোযা রমযান মাসে রাখতে না পারলে তার কাযা করা যখন ফরয, আর এই তিন দিনের রোযা রাখা যখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের শর্তাধীন (যে, তা হজ্জের দিনে করতে হবে), তখন তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে রাখতে না পারলে তার কাযা করা ও তদস্থলে অন্য রোযা রাখা কেবলমাত্র 'তাওকীফ' (আল্লাহ্র নির্ধারণ) দ্বারাই বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য হতে পারে।

দ্বিতীয়, তিন দিনের রোযা কুরবানীর বিকল্প বানানো হয়েছে যখন কুরবানী করা যাচ্ছে না তখন। তার এই শর্তটি জরুরী। রোযাকে কুরবানীর বিকল্প বানানো কেবল এই পরিচিতি সহকারেই সম্ভব। যেমন তায়াম্মুম পানির দ্বারা অযূ করার বিকল্প। তা মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা করা জায়েয হবে না। মাটি না পেলে সে স্থানে অন্য কিছু প্রতিস্থাপন— ছাতু, আটা ইত্যাদি— কখনই জায়েয হতে পারে না। অনুরূপভাবে রোযাকে যখন কুরবানীর বিকল্প বানানো হয়েছে তা একটি বিশেষ ধরনের রাখার জন্যে, তখন তার স্থানে অন্য কোন রোযাকে সেই বিশেষ ধরনকে বাদ দিয়ে প্রতিস্থাপন জায়েয হতে পারে না। না-পড়তে পারা নামাযসমূহের ব্যাপার সে রকম নয়। কেননা তা যথাসময়ে পড়া না হলে তার কাযা করাকে আমরা বিকল্প হিসেবে দাঁড় করিনি। তা-ও ফরয। তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা না হলে পরবর্তী সময়ে তা আদায় করা ফরয ও বাধ্যতামূলক।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা 'জিহার'-এর রোযা স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে রাখার শর্ত করেছেন। যদি স্পর্শ করে, তাহলে তা আযাদকরণে রূপান্তরিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে এই দিনগুলোর রোযাও। যদিও তা হজ্জে রাখার শর্ত করা হয়েছে। তা তখন রাখতে না পারলে তা প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে না এবং কুরবানীর দিকে যাওয়া— রোযা না রেখে কুরবানী করা— জরুরী হবে না।

জবাবে বলা যাবে, প্রথম কথা 'জিহার'-এর রোযা স্পর্শের পূর্বে হওয়ার শর্তের অধীন। স্পর্শ করার নিষেধ তার পূর্বে স্থিরকৃত এবং তার পরও। অতএব যে ধরনটার সাথে বিকল্প কাজকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তা উপস্থিত। অতএব তা জায়েয হবে। আর যে হজ্জের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তার বিকল্প রোযা রাখাকে, তা এক্ষণে অনুপস্থিত। কেননা হজ্জ তো করা যায় নি। অতএব রোযা রাখার কাজটিও সেই সাথে হারিয়ে যাবে। উপরন্তু তার বাহ্যিক অর্থ স্পর্শের পূর্বে হওয়ার কারণে প্রত্যাহৃত হওয়ার দাবি করে। আয়াত ছাড়া অন্য কোন দলীল না দাঁড়ালে আমরা তা কখনই জায়েয মনে করতাম না। অনেক লোকই এমন আছেন যাঁরা স্পর্শ করার পর কাফফারা দেয়া ওয়াজিব মনে করেন না। সম্ভবত তায়ূসের এই মত। কিন্তু নবী করীম (স) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্পর্শ করার পর কাফ্‌ফারা দেয়ার আগে জিহারের দরুন স্ত্রী-সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন।

মাত্‌য়ার রোযা রাখা শুরু করার পর কুরবানীর জন্তু পাওয়া গেলে

মাত্‌য়ার রোযা রাখা শুরু করে দেয়া কিংবা হালাল হওয়ার পূর্বেই রোযা রেখে ফেলার পর যদি কুরবানীর জন্তু পায়, তাহলে তখন তার কি করা উচিত— এ পর্যায়ে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তখন তার কুরবানী করাই কর্তব্য। কুরবানী ছাড়া তার জন্যে অন্য কিছু করা জায়েয হবে না। ইবরাহীম নখয়ী এই মত দিয়েছেন। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, রোযা শুরু করে দেয়ার পর কুরবানীর পশু পেলে তখনও রোযা রাখাই যথেষ্ট ও জায়েয হবে। কুরবানী করা তার জন্যে ওয়াজিব হবে না। আল-হাসান শাবীও এই মত প্রকাশ করেছেন। আতা বলেছেন, একটি রোযা রাখার পরও যদি কুরবানী করার সামর্থ্য হয় তা হলে তখন কুরবানী করবে। আর তিনটি রোযা রাখার পর কুরবানী করার সামর্থ্য হলে তখন আর কুরবানী করতে হবে না। অবশিষ্ট সাতটি রোযা পরে রাখতে হবে।

প্রথমোক্ত কথার সত্যতার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

যে লোক হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা লাভ করবে, অতঃপর যে কুরবানী তার জন্যে সহজলব্ধ হবে সে তা-ই দেবে। যে তা করতে পারবে না সে হজ্জেই তিনটি রোযা রাখবে।

বোঝা গেল, কুরবানী করা ফরয যতক্ষণ পর্যন্ত হালাল হয়ে না যায় কিংবা কুরবানীর দিনগুলো গত হয়ে না যায়, যা মাথা মুণ্ডনের জন্যে সুন্নাত ও নিয়মবদ্ধ। তাই যখনই তা পাওয়া যাবে, তখনই কুরবানী দেয়া তার কর্তব্য। তখন তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে।

আর একথা জানা-ই আছে যে, কুরবানী করা হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত। কেননা কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পূর্বে হালাল হওয়া জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ -

এবং তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ কুরবানীর জন্তু তার স্থানে পৌঁছে না যায়।

তাই হালাল হওয়ার আগেই যদি জন্তু পাওয়া যায়, তাহলে কুরবানী করা তার কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে তার রোযা রাখা শুরু করার পূর্বে ও পরের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি।

এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, কুরবানী করা হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'জন্তুর পিঠ যখন স্থির হবে, তখন তোমরা তা থেকে নিজেরা খাও এবং নিঃস্ব পথিককে খাওয়াও। অতঃপর তারা যেন তাদের দেহের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও দূর করে এবং তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে।'

এতে কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পর ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। ব্যাপার যখন তাই, তখন হালাল হওয়ার ঘটনায় সংঘটিত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাই এক ব্যক্তি যদি রোযা রাখে আর তারপর কুরবানীর পশু পায়, তার রাখা রোযা নষ্ট হবে না, কুরবানী করাও তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা তখন সেই অবস্থা বর্তমান যার জন্যে কুরবানী করার শর্ত করা হয়েছে। আর তা না পাওয়ার দরুনই তার বিকল্পের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। যেমন তায়াম্মুমকারী। নামায শেষ করার পর পানি পেলে, ন্যাংটা ব্যক্তি কাপড় পেলে তাকে যেমন অযূ করতে হয় ও কাপড় পরতে হয়। জিহারকারী যদি রোযা রেখে শেষ করে পরে ক্রীতদাস পায় মুক্ত করার জন্যে। কেননা তার উপর যে ফরয ছিল তা তো আদায় করেছে, সে ফরয মুক্ত হয়েছে। কাজেই যা করা হয়েছে, তার হুকুম ভেঙ্গে যাবে না। তবে এসব কাজ সম্পূর্ণ শেষ করার পূর্বে হলে বিকল্পের ব্যাপারটা বিবেচনা সাপেক্ষ। যদি শেষ করে অবসর নিয়ে ফেলে, তাহলে তা বিকল্প হিসেবেই আদায় হয়ে যাবে। মূলে যেটা ফরয ছিল, সেটা আদায় হয়ে গেল। সম্পূর্ণ শেষ করার পূর্বে মূলটা পাওয়া গেল— যেটা শর্ত— বিকল্পের হুকুম ভেঙ্গে যাবে এবং আসল ফরযের দিকে ফিরে যেতে হবে। যেমন নামায শুরু করার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত তার অপেক্ষায় থাকতে হবে। কেননা শেষটা যে জিনিসের দ্বারা নষ্ট হয়, তার প্রথমটা সেই জিনিসের দ্বারাই নষ্ট হয়। কাজেই তায়াম্মুম করে নামায শুরু করার পর তার হুকুমটা প্রতীক্ষিত ও বিবেচনা সাপেক্ষ হয়ে যায়। 'জিহার'-এর রোযার ব্যাপারটিও তাই। যখন তা রাখা শুরু করা হবে, তখন তা রক্ষা করা ও সে জন্যে অপেক্ষা করা জরুরী হবে। কেননা তাতে যদি একটা রোযা ভঙ্গ হয়, তাহলে তার সবটাই ভেঙ্গে যায় এবং আসল ফরযের দিকে ফিরে আসতে হয়। অনুরূপভাবে রোযা রাখা অবস্থায় যদি ক্রীতদাস পাওয়া যায়, তাহলে এই 'জিহারে'র রোযা ভেঙ্গে আসল ফরযের দিকে আসতে হবে। যেমন নামাযের জন্যে পানি নাই বলে তায়াম্মুম করেছে, এখনও নামায শুরু করেনি, এই সময় পানি পেয়ে গেল, তখন তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। কেননা তায়াম্মুম করা হয়েছিল পানি না পাওয়ার দরুন— শর্ত ছিল পানি না পাওয়া। তার দ্বারাই ফরয আদায় করতে চাওয়া হয়েছিল। ভিন্ন মতের কোন কোন লোক ধারণা করেছে যে, জিহার-এর রোযা শুরু করে দিলেই তার ফরয— ক্রীতদাস মুক্ত করার ফরয— প্রত্যাহৃত হয়ে গেল। কেননা যে কাজ করা হচ্ছিল তা সহীহ ছিল। তায়াম্মুম করে যে লোক নামায শুরু করে দিয়েছে, তারও নামাযের জন্যে অযূ করার ফরয আদায় হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে তামাত্তুর রোযা শুরু করে দিয়ে থাকলে কুরবানী করার ফরয আদায় হয়ে গেছে। কেননা যা করা হয়েছে তার অংশ সহীহ হয়েছে। আর এ ধরনের ব্যাপারে অংশ সহীহ হলে আসলের ফরয আদায় হয়ে যায়। অবশ্য নামায শুরু করার পূর্বে তায়াম্মুমকারীর অবস্থা সেরূপ নয়। কেননা নামাযের জন্যে তায়াম্মুম আসল ফরয ছিল না। নামাযের জন্যে তা পানি না পাওয়ার দরুন ফরয ধরা হয়েছে। তাই নামায শুরু করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম

বাতিল হয়ে যাবে। তায়াম্মুম করে নামায শুরু করা এবং জিহার-এর রোযা পালন শুরু করা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, এ পর্যায়ে এই যা বলা হয়েছে, তা কঠিন পার্থক্যের ব্যাপার, বাহ্যিক বিপর্যয়ের ব্যাপার। কেননা মাত্য়ার রোযা শুরু করা হলেই ফরয প্রত্যাহৃত হয়ে যায় না— জিহার-এর রোযা শুরু করলেও। নামায-ও তাই। বরং এইসব শুরু করার অপর একটি হুকুমের উপর নির্ভরশীল। তার দলীল হচ্ছে, অবশিষ্ট নামায নষ্ট হয়ে গেলে আগের অংশ-ও নষ্ট হয়ে যাবে। জিহার-এর অবশিষ্ট রোযা নষ্ট হয়ে গেলে আগে যা রাখা হয়েছে, তা-ও নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মাত্য়ার রোযা রাখা শুরু করে দিলে, পরে তার প্রথম দিনটাই নষ্ট হয়ে গেলে তা সব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি কুরবানীর জন্তু পেয়ে যায় তাহলে তার রোযা রাখা জায়েয হাবে না— এটাতে সকলেই একমত।

কাজেই বিকল্পের কৃত অংশ সহীহ হলে আসল ফরয প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা ভুল। কেননা তার সহীহ হওয়ার হুকুম তো হয়নি। বরং শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার হুকুমই বহাল রয়েছে। আসল ফরযের ব্যতিক্রম সহ যদি তা সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখনই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। তাই তা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি আসল ফরয পালনের ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেই ব্যতিক্রম বা বিকল্প বাতিল হয়ে যাবে এবং আসল ফরযের দিকে ফিরে আসতে হবে। আর তায়াম্মুমকারীর জন্যে নামায শুরু করার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে হুকুম দেয়া হয়েছে, তা নামায শুরু করার পরও বহাল থাকতে হবে। কেননা নামাযের যতটা অংশ পড়া হয়েছে, তা নামায সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা পর্যায়ে পড়ে থাকবে। কাজেই তার নামায শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত পানি পাওয়ার অপেক্ষার হুকুমটা তার শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বহাল থাকবে। এছাড়া অন্যান্য যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে— যেমন তামাত্তুর রোযা ও জিহার-এর রোযা প্রভৃতি— এসব ক্ষেত্রে একই নীতি চলবে। ফিকাহবিদগণ সকলেই বলেছেন, অল্প বয়স্কা স্ত্রী যদি সঙ্গম কৃতা হয় আর তার স্বামী তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে কয়েক মাস। তালাকের পূর্বে কিংবা তার পরে— হায়য না হওয়া সে মাসগুলোর হায়য-এ রূপান্তরিত হওয়ার তার হুকুম ভিন্নতর কিছু হবে না। 'মোজা'র উপর মসেহকারীর মসেহ করার সময় শেষ হয়ে গেলে— তা তার নামাযে থাকা অবস্থায় হোক, কি তার পূর্বে— এ ব্যাপারেও ফিকাহবিদগণ এই কথা বলেছে। নামায নিষিদ্ধ হওয়ার ও দুই পা ধৌত করা জরুরীর ব্যাপারে শুরু ও বাকী থাকা— এ দুই অবস্থার ব্যাপারে হুকুম অভিন্ন হবে। হায়য-এর রোগিনীর 'ইস্তিহাযা' যদি শেষ হয়ে যায়— তা তার নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায় হোক কিংবা নামায শুরু করার পূর্বে হোক— উভয় অবস্থায়ই তার নামায নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সমান নীতি হবে। তবে নামাযের জন্যে নতুন করে তাহারাত গ্রহণ করা হলে ভিন্ন কথা। ইমাম শাফেয়ী এই কথা বলেছেন।

ইমাম মালিকের কোন কোন সঙ্গী উল্লেখ করেছেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে 'রিজয়ী' তালাক দেয়, পরে সে মরে যায়, তাহলে সে স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা স্বামীর মৃত্যু সঙ্ঘটিত হওয়ার সময় সে তার স্ত্রী হিসেবেই গণ্য ছিল। এক ব্যক্তি, তার বিয়ের অধীন ছিল একটি ক্রীতদাসী এবং সে তাকে তালাক দিল। তাহলে তাকে ক্রীতদাসীর জন্যে নির্দিষ্ট 'ইদ্দত' পালন করতে হবে। ইদ্দত পালন রত অবস্থায় সে যদি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে তার ইদ্দতটা স্বাধীনা স্ত্রীর ইদ্দতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে না, যদিও তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী ছিল। কেননা সেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যার দরুন ইদ্দত পালন জরুরী হতে পারে। যেমন পূর্ববর্তী মাসলায় স্বামীর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। এই

মৃত্যু তো স্ত্রীকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করে। এই কারণে অল্প বয়স্কা মেয়ের হায়য হতে শুরু করলে তার 'ইদ্দত' পরিবর্তিত হবে না। কেননা এখানে ইদ্দত পালন ফরয হওয়ার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি। তা হচ্ছে হায়য হওয়া।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 'আর সাতটি রোযা রাখতে হবে যখন তোমরা বাড়িতে ফিরে যাবে।' আতা থেকে বর্ণিত হয়েছে— তিনি বলেছেন, ইচ্ছা করলে এই সাতটি রোযা মক্কায় থেকেও রাখা যেতে পারে। আর চাইলে পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে রাখতে পারে। আল-হাসান বলেছেন, পথের মধ্যেও এ রোযা রাখা যেতে পারে। আর চাইলে পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে রাখবে। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যুবায়রও তাই বলেছেন। ইবনে উমর ও শাবী বলেছেন, পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে রোযা কয়টি রাখবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ إِذَا رَجَعْتُمْ 'যখন তোমরা ফিরে যাবে' বলে হতে পারে মিনা থেকে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, হতে পারে, পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই দুই প্রত্যাবর্তনের মধ্যে প্রথমটি থেকে গণ্য হবে। তার তা হল 'মিনা' থেকে প্রত্যাবর্তন করা। তার প্রমাণ এই যে, 'আইয়্যামে তাশ্রীকের রোযা রাখতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর সাতটি রোযা রাখতে আদেশ করেছেন। অতএব নিষেধের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থাৎ আইয়্যামে তাশ্রীক শেষ হওয়ার পরবর্তী সময় রোযা রাখা মুবাহ্ বলে এই সময়টার কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা উত্তম।

আল্লাহ্র কথা ঃ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 'এই হচ্ছে পূর্ণ দশ।' আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যায়ে অনেক দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। তা পূর্ণ কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে সওয়াব পাওয়ার কাজ হিসেবে। তা এ জন্যে যে, সাতটি রোযা রাখার আগেই কুরবানীর দিন পর্যন্ত। তিনটি রোযা রেখে হালাল হওয়ার ব্যাপারে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যে কেউ ধারণা করতে পারে যে, তিনটি রোযাই বুঝি পূর্ণ মাত্রায় সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যে কেউ ধারণা করতে পারে যে, তিনটি রোযাই বুঝি পূর্ণ মাত্রার সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দশটি রোযা পূর্ণত্ব সহকারে সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত। তবে ইহরাম ভাঙ্গা জায়েয হওয়া তিনটি রোযা রাখার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তাতে অবশিষ্ট সাতটি রোযা রাখার জন্যে উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে বিরাট ফায়দা রয়েছে। কুরবানীর সওয়াব পূর্ণ করার জন্যে বাড়িতে ফিরে এসে সে সাতটি রোযা পূর্ণ করার আদেশ করা হয়েছে। তাতে ইখতিয়ার দানের সম্ভাবতা দূর করা হয়েছে বলেও মত প্রকাশ করা হয়েছে। মূল কুরআন واو (এবং) অক্ষরের অর্থ হবে او — অথবা। আরবী ভাষায় অনেক স্থানেই তা হয়ে থাকে। কিন্তু শেষে বলা 'এই দুশটিই পূর্ণ' কথা দ্বারা সেই সম্ভাব্যতা দূর করা হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, মূল কথার উপর গুরুত্ব আরোপের জন্যেই তা বলা হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী একটিকে কয়েক প্রকারের ব্যাখ্যা দানের একটি ব্যখ্যারূপে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা প্রথম বয়ান। কিন্তু অপর কোন মনীষী একটি 'বয়ান'-এর মধ্যে কোন একটি বলেন নি। কেননা আল্লাহ্ কথা ঃ 'তিন ও সাত'-এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে

না। তাতে কারোর উপর কোন সমস্যাও দেখা দেয় না। তাই বলতে হবে, যিনি একটিকে 'এক প্রকারের বয়ান' বলেছেন, তিনি মূল ব্যাপারে গাফিল রয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাস'। আবূ বকর বলেছেন, 'হজ্জের মাসসমূহ' পর্যায়ে আগের কালের ফিকাহ্‌বিদগণ নানা কথা বলেছেন। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) এবং আল-হাসান, আতা ও মুজাহিদ বলেছেন, শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ-এর দশ দিন হচ্ছে হজ্জের মাস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ-এর দশ দিন হচ্ছে হজ্জের মাস। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) অপর একটি বর্ণনায় এরূপ কথাই বলেছেন। আতা ও মুজাহিদ থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। লোকেরা বলেছেন, এ সব কথার মধ্যে বাহ্যত সামান্য পার্থক্য দেখে প্রকৃতপক্ষে মৌলিক কোন মতপার্থক্য নয়। যিনি যিলহজ্জ মাসের উল্লেখ করেছেন, তার অর্থ সে মাসের কিছু অংশের কথা মনে করা অসম্ভব নয়। কেননা হজ্জ তো যিলহজ্জ মাসের প্রথমার্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। গোটা মাস তো আর হজ্জে অতিবাহিত হয় না। মিনার দিনগুলোর পর হজ্জের 'মানাসিক'— অনুষ্ঠানমালার আর কিছুই বাকী থাকে না। কেউ কেউ বলেছেন, যিলহজ্জ বলে গোটা মাসও মনে করা যেতে পারে। তার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, এগুলোই যখন হজ্জের মাস, তখন এগুলোকে বাদ দিয়ে অন্য সময়ে উমরা করা খুবই পছন্দনীয়। যেমন হযরত উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজ্জের এসব মাস ছাড়া অন্য সময়ে উমরা করা তাঁরা খুবই পছন্দ করতেন। এসব কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আল-হাসান ইবনে আবূ মালিক ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন যে, শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের দশ দিনই হচ্ছে হজ্জের জানা ও নির্দিষ্ট মাস। কেননা যে-লোক কুরবানীর দিনের ফজর উদয় হওয়ার সময় পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করতে পারেনি, সে হজ্জ হারিয়ে ফেলেছে। আর اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ বলে পূর্ণ দুই মাস ও এক মাসের কিছু অংশ মনে করায় ভাষাবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এটা সম্পূর্ণ বৈধ কথা। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন, মিনার দিনগুলো হচ্ছে মাত্র তিন দিন। আর সে তিন দিনও হয় দুই দিন পূর্ণ ও এক দিনের কিছু সময় নিয়ে। লোকেরা বলে ঃ 'আমি অমুক বছর হজ্জ করেছি।' অথচ সারা বছর তো দূরের কথা, হজ্জে বছরের মাত্র কিছু অংশই ব্যয় হয়েছে। 'আমি অমুকের সাথে অমুক বছর দেখা করেছি' বললে গোটা বছরই তো আর বোঝায় না। তার কোন এক সময়ে সাক্ষাৎ হওয়ার কথাই বোঝায় মাত্র। 'অমুকের সাথে জুমা'আর দিন কথা বলেছি' বললেও দিনের কিছু সময়ই বোঝায় মাত্র। কোন কাজ যখন কথিত গোটা সময়কে লাগায় না, তখন এরূপ কথার তাৎপর্য তা-ই হয়ে থাকে।

আবূ বকর বলেছেন, যিনি বলেছেন, হজ্জের মাস হচ্ছে শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ— তাঁর এই বলার আর একটি কারণ আছে। তা হল কথা বলার প্রচলিত ধরন। জানা মাসসমূহের অর্থে দুটি ভিন্ন ভিন্ন কথা শামিল রয়েছে। তা হল জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা মাসসমূহকে এদিক-ওদিক নাড়িয়ে সরিয়ে দিত। সফর মাসকে তারা মুহররম মাস বানাত। আর মুহররম মাসকে তারা হালাল মাস মনে করে নিত। তা তারা করত তাদের সম্মুখবর্তী যুদ্ধের জন্যে সুবিধা করে নেয়ার উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা উক্ত কথাটি দ্বারা এই نسى হারাম মাসকে এদিক-ওদিক নাড়িয়ে সরিয়ে দেয়ার বদ-অভ্যাসকে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং হজ্জের সময়কে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই ভিত্তিতে, যা আসমান জমিনের প্রথম সৃষ্টিকালে স্থাপিত হয়েছিল। যেমন নবী করীম (স) বিদায় হজ্জের দিন বলেছেন ঃ

اَلَا اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ شَوَّالٌ وَذُوا الْقَعْدَةِ وَذُوا الْحَجَّةِ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ -

জেনে রাখো, কাল-স্রোত ঘুরে ঘুরে আসমান-জমিনের প্রথম সৃষ্টির দিনের অবস্থায় ফিরে এসেছে। বছর হয় বারো মাসে। তন্মধ্যে চারটি মাস ঃ শওয়াল যুলকাদা, যিলহজ্জ ও রজব— যা দুই জমাদি ও শাবান মাসের মধ্যে অবস্থিত— হারাম মাস।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ অর্থাৎ এই প্রমাণিত ঘোষিত মাস কয়টিতে হজ্জের কার্যসমূহ সম্পন্ন হয়। জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা যেমন মাসগুলোকে অদল-বদল করে দিত। হজ্জের মাস কখনও আগে নিয়ে আসত, কখনও পিছনে নিয়ে যেত, সে কাজকে অগ্রাহ্য করেছেন। হজ্জের সময়টা তাদের নিকট হজ্জের মাসসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তার মধ্যে এই তিনটি মাসই তারা শান্তি ও নিরাপত্তার তথা যুদ্ধহীন মাস মনে করত। এই সময়ই তারা আসা-যাওয়া করত। তাই আল্লাহ্ এই মাস কয়টির উল্লেখ করে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হজ্জের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্থির ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। এ কথা বলে তাকে রদ-বদল করতে ও অন্য কোন মাসকে হজ্জের মাসরূপ নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে আরও একটি কারণ জানা যায়। তা হল আল্লাহ্ যখন হজ্জ পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণের কথা فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ বলেছেন, তাতে রুখসত দিয়েছেন এবং এসব মাসেই উমরা করা নিষিদ্ধ বলে যে ধারণা পোষণ করত, তা বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'হজ্জ সুনির্দিষ্ট ও জানা মাসসমূহে করতে হবে।' এ কথা বলে এই ফায়দাটা করে দিয়েছেন যে, যেসব মাসে উমরা করে হজ্জ পর্যন্ত ফায়দা লাভ করা যায় এবং তার হুকুমটা প্রমাণিত, তা হচ্ছে এই মাস কয়টি। অন্য সময় যে লোক উমরা করবে এবং পরে হজ্জ করবে, সে উমরার এই তামাত্তু ফায়দাটা পাবে না।

হজ্জের নির্দিষ্ট মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা

আবূ বকর বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধা জায়েয কিনা, এ পর্যায়ে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ নানা কথা বলেছেন। মাকসাম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হজ্জের সুন্নাত (তরীকা) হল হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের জন্যে ইহরাম না বাঁধা। আর আবূ যুবায়র হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন, হজ্জের মাসসমূহের আগে যেন কেউ হজ্জের জন্যে ইহরাম না বাঁধে। তায়ূস, আতা, মুজাহিদ, আমর ইবনে মায়মুন ও ইকরামা এই কথাই বলেছেন। আতা বলেছেন, যে লোক হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে, সে যেন সে ইহরামকে উমরার জন্যে নির্দিষ্ট করে। হযরত আলী (রা) 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে হজ্জ ও উমরাকে সম্পূর্ণ কর' আল্লাহ্‌র এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার অর্থ তুমি সে দুটির জন্যে তোমার পরিবারে ছোট্ট ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধাবে। ইহরামকারীর ঘর ও মক্কার মধ্যকার দূরত্ব খুব বেশি কি নিকটবর্তী— এই দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। এ থেকে বোঝা গেল, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাধা তাঁর মতে সম্পূর্ণ জায়েয। মাকসাম ইবনে

আব্বাস (রা) থেকে মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম না বাঁধা সুন্নাত তরীকা বলে যে বর্ণনাটিতে উল্লেখ করেছেন বাহ্যত তা থেকে মনে হয় যে, তিনি এ পর্যায়ে সুনিশ্চিত ও চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা বলেন নি, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধাই যাবে না— এমন কথা নয়।

ইবরাহীম নখয়ী ও আবূ নয়ীম থেকে হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধা জায়েয বলে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের হানাফী ফিকাহ্‌বিদ সকলেরই এক মত। মালিক, সওরী ও লাইস ইবনে সাঈদও এই মত দিয়েছেন। আল-হাসান ইবনে সালিহ ইবনে হাই বলেছেন, হজ্জের মাসসূহের আগেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধলে সেটিকে উমরার ইহরাম বানাতে হবে। পরে সেটিকে উমরার জন্যে বানাবার পূর্বেই হজ্জের মাস এসে গেলে সে হজ্জে চলে যাবে এবং তা যাওয়াই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। আওজায়ী বলেছেন, সেটিকে উমরার ইহরাম বানাতে হবে। শাফেয়ী বলেছেন, সেটি দ্বারা উমরা করা যাবে মাত্র।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ লোকেরা তোমাকে চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, 'বল ঃ তা জনগণের জন্যে সময় ও হজ্জ-এর নির্ধারক' এর ব্যাখ্যা পর্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা তা জায়েয হওয়ার দলীল ও প্রমাণ বলেছি। 'সব চাঁদ হজ্জের সময় নির্ধারক' কথাটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে। যখন জানা গেল যে, চাঁদসমূহ হজ্জের কার্যাবলীর সময় নির্ধারক নয়, তখন ব্যবহৃত শব্দের অর্থ হবে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। ফলে চাঁদের সব মাসেই হজ্জ জায়েয হওয়া উচিত। কোন কোন মাসে হজ্জ, আর কোন কোন মাসে নয়, এরূপ নির্ধারক জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা থেকে সব চাঁদেরই সাধারণভাবে লোকদের জন্যে সময়ের নির্ধারক হওয়ার তাৎপর্য বোঝায়, কোন কোন চান্দ্রমাসকে বাদ দিয়ে অপর কোন চান্দ্রমাসে তা হওয়ার কথা বলার ইচ্ছা বোঝায় না। তাতে সমস্ত মানুষের জন্যে সময়ের নির্ধারক হওয়ার কথা শামিল রয়েছে। তাই তাকে শুধু সেই মাসসমূহের মধ্যে সীমিত করা দরকার, যখন হজ্জ জায়েয। যদিও ব্যবহৃত শব্দে ওদুটোই শামিল রয়েছে।

যদি বলা হয়, চাঁদগুলোকে হজ্জের সময় নির্ধারক বলা হয়েছে, আর হজ্জ মূলত এমন সব কাজ, যে জন্যে ইহরাম বাঁধা প্রয়োজন। আর শুধু ইহরামই তো হজ্জ নয়। তাই তার দ্বারা আসল হজ্জ-ই বোঝাতে হবে। তাহলে চাঁদগুলো হজ্জের সময় নির্ধারণ করবে শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসগুলোকে। কেননা এই কয়টি মাসেই হজ্জ সংক্রান্ত কার্যাবলী সহীহ্ হয়। কেননা হজ্জের নির্দিষ্ট মাসগুলোর পূর্বেই তওয়াফ ও সাঈ' করা হলে তা সকলের মতে সহীহ্ হবে না। কাজেই হজ্জ শব্দটি তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

জবাবে বলা যাবে, এই কথাটি ভুল। কেননা তাতে মূলতই শব্দের হুকুমটা প্রত্যাহৃত হয়ে যেতে হয়। তা এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'লোকেরা তোমাকে চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা জনগণের এবং হজ্জের সময় নির্ধারক'-এর তাৎপর্য অনুযায়ী চাঁদসমূহের নিজেরই হজ্জের সময় নির্ধারক হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়। আর হজ্জের তিনটি ফরয ইহরাম বাঁধা, আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ এবং তওয়াফে যিয়ারত। এ কথা জানা-ই আছে যে, চাঁদসমূহ আরাফাতের অবস্থান ও তওয়াফে যিয়ারতের সময় নির্ধারক নয়। কেননা এ দুটো কাজ চাঁদের হিসেবে হয় না। ফলে চাঁদ সময় নির্ধারক হয় শুধু ইহরাম বাঁধার জন্যে, অন্যান্য ফরয কাজের জন্যে নয়। কথাটিকে যদি আমরা তোমার বক্তব্য অনুযায়ী গ্রহণ করি তাহলে তো কোন একটির জন্যেও চাঁদ সময় নির্ধারক হয় না। তাহলে মূল আয়াত থেকে নতুন চাঁদসমূহ

শব্দটিকেই বাদ দিতে হয়। তার কোন ফায়াদাই থাকে না। কিন্তু তা তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

যদি বলা হয়, যদি আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ নতুন চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, চাঁদ তার জন্যে সময় নির্ধারক।

জবাবে বলা যাবে, তুমি যা ধারণা করেছ, ব্যাপারটা তা নয়। কেননা নতুন চাঁদের একটা সময় আছে, যা সবাইর জানা (পূর্বে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে) সেই সময়টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে 'হিলাল' বা নতুন চাঁদ বলা হয় না। আরাফাতে অবস্থানের সময় চাঁদ যে আকার ধারণ করে, তাতে তখন তাকে 'হিলাল' বলা যায় না। অথচ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'হিলাল'কে হজ্জের সময় নির্ধারক বলেছেন। অথচ তুমি 'হিলাল'কে নয় চাঁদকে সময় নির্ধারক বানাচ্ছ। তাতে ব্যবহৃত শব্দের যথার্থ অর্থ বাদ দিতে হয়। শব্দটি যা বোঝায়, তা তুমি গ্রহণ করছ না। ভেবে দেখ, কোন মাসের 'হিলাল'কে যদি ঋণ শোধের সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহলে 'হিলাল' নিজেই সময় ঘোষণা করবে দাবির অধিকার প্রমাণের জন্যে এবং তা আদায় করে দেয়া ওয়াজিব বলার জন্যে। সেই সময়ের পরের কোন সময় নির্ধারণ করবে না। 'হিলাল'-এর হিসেব অনুযায়ী যদি 'ইজারা' ঠিক করা হয়, তাহলে তাতে হিলাল বা নতুন চাঁদ দেখাই তাতে গণ্য হবে। ব্যবহৃত শব্দ থেকে তা-ই বোঝা যায়। কোন সমঝদার ব্যক্তির পক্ষে তা বোঝা কঠিন নয়।

তবে তার কথা ঃ হজ্জ এমন কাজের নাম যার জন্যে ইহরাম বাঁধা জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু ইহরামকে হজ্জ বলা হয় না, যখন তা কারণ হবে যেসব কাজের। কাজেই সে সব কাজের হুকুম নতুন চাঁদ অনুযায়ীই দেয়া হবে। তাই আমরা যেমন বললাম, কিতাবের প্রথম অংশের নাম অন্য কিছু দিয়ে রাখা অসমীচীন হবে না, যদি তা-ই তার কারণ হয় কিংবা হয় পার্শ্ববর্তী, অতএব ইহরামকে হজ্জ নাম রাখা এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে সহীহ হবে। উপরন্তু ইহরামকে উহ্য ধরলে গোটা ভাষা এই দাঁড়ায় قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَلْاِحْرَامِ الْحَجِّ 'বল, নতুন চাঁদগুলো জনগণের ও হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় নির্ধারক।' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ। 'জনগণকে জিজ্ঞাসা কর।' এখানে 'অধিবাসী' শব্দ উহ্য রয়েছে, মূল কথাটি হবে ঃ 'জনপদের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা কর'। আর একটি আয়াত ঃ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى -এর যা অর্থ, তা প্রণিধানযোগ্য। সেই অর্থই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে 'হিলাল' নতুন চাঁদসমূহকে হজ্জের সময় নির্ধারক বানানোর ব্যাপারে শব্দের হুকুমটা সহীহভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া 'হজ্জ' শব্দের আভিধানিক অর্থ القصد। ইচ্ছা করা, সংকল্প গ্রহণ করা। যদিও শরীয়াতের পরিভাষায় কতগুলো কাজ এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। তবুও তাকে হজ্জ বলাই সহীহ। অতএব ইহরামকে হজ্জ বলা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কেননা সংকল্প গ্রহণের পর যে কাজটি করার হুকুম তা হচ্ছে ইহরাম বাঁধা। ইহরাম বাঁধার পূর্বে এই সংকল্পের সাথে অন্য কোন হুকুম সম্পর্কিত হয় না। এই কারণে ইহরামকে 'হজ্জ' নামকরণ খুবই সঙ্গত। কেননা তা-ই হজ্জ পর্যায়ের প্রথম কাজ। অতএব আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'লোকেরা তোমার নিকট হিলালসমূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তা লোকদের কাজের ও হজ্জের সময় নির্ধারক ইহরামকেও শামিল করে নিয়েছে।' ইহরাম ছাড়া আর যত কাজ আছে, তা-ও সব মানাসিক-এর অন্তর্ভূত। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, হজ্জের কার্যাবলী যখন আমরা বিভিন্ন নির্দিষ্ট

সময়ে বিশেষীকৃত করে দেই, তা হলে মোটামুটিভাবে সবটাই বিশেষীকৃত করা হয়। অবশিষ্ট থেকে যায় ইহরাম সম্পর্কীয় শব্দের হুকুমটা। অভিধানে 'হজ্জ' শব্দের অর্থ সংকল্প গ্রহণ। অর্থাৎ হজ্জের সংকল্প গ্রহণ করা যেন তার পরিমাণটা জানা যায়। এই সংকল্পের সাথে অন্যান্য যে সব কাজ সংশিষ্ট তা ওয়াজিব হয় না। শরীয়াতে হজ্জ নামটা সেই কার্যাবলী ছাড়া বোঝা যায় না। অথচ তাতে সংকল্পের গুরুত্ব থাকে না। ভেঙ্গে দেখ صَوْمٌ শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ হল, তা বিরত থাকার নাম। অথচ শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার আরও কতগুলো অর্থ রয়েছে। তা সত্ত্বেও রোযার সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সেই বিরত থাকাটা সর্বত্রই গণ্য। ইতিকাফও তেমনি। তার শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার আরও অর্থ আছে। সেই সাথে 'অবস্থান' অবশ্যই রয়েছে। তবে এই নামটা রাখার আসল যে উদ্দেশ্য তা অবশ্যই গণ্য হবে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার সাথে অন্যান্য যত অর্থই মিলিত করা হোক-না-কেন, সেই অবস্থানের ভাব না থাকলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে এই নামের হুকুমটা প্রমাণিত হয় না।

হজ্জ-ও তেমনি। আভিধানিক অর্থে তা সংকল্প গ্রহণ। পরে এই সংকল্প গ্রহণের সাথে ইহরামকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তার পূর্বে আর কিছুর হুকুম নেই। কাজেই ইহরামকে এই নামে অভিহিত করা খুবই সঙ্গত। যেমন তওয়াফ ও আরাফাতে অবস্থানকেও এই নামে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য মানাসিককেও হজ্জই বলা হয়। ফলে এই সাধারণ তাৎপর্যের দিক দিয়ে 'নতুন চাঁদসমূহ' সম্পূর্ণই ইহরাম-এর সময় নির্ধারক হওয়াটা খুবই বাস্তব। আর এই সাধারণত্বই হজ্জের সমস্ত কার্যক্রমকে শামিল করে। সে কাজসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের সাথে চিহ্নিত করার আর একটি দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাসে সম্পন্ন হয়।' মাসসমূহ সম্পর্কে আগের কালের ফিকাহবিদদের কথা ও মতামত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেউ বলেছেন শওয়াল, যিলকাদাহ ও যিলহাজ্জা'র দশ দিন। অন্যরা বলেছেন সওয়াল, যিলকাদা ও যিলহাজ্জা। তাঁদের সকলের ঐকমত্যে একথা জানা গেল যে, কুরবানীর দিনটি হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে গণ্য। কাজেই আল্লাহ্র কথা 'জানা মাসসমূহ'-এর সাধারণত্বের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কুরবানীর দিনও হজ্জের ইহ্রাম থাকা জায়েয। আর কুরবানীর দিন যখন তা পারা যায়, তখন সারা বছর ইহরাম রাখা অবশ্যই জায়েয হবে। কেননা কুরবানীর— জন্তু যবেহ করার দিন ইহরাম রাখা ও বছরের অন্যান্য সব সময় ইহরাম রাখা জায়েয হওয়ার মধ্যে কেউ-ই কোনরূপ পার্থক্য করেনি।

যদি বলা হয়, যিনি যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের কথা বলেছেন, তিনি দশ দিন বলে দশ রাত্রি বোঝাতে চেয়েছেন। কুরবানীর দিনটি তাতে ধরা হয়নি। কেননা কুরবানীর দিনের ফজর উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বছরের হজ্জ নিঃশেষ হয়ে যায়।

জবাবে বলা যাবে, দশ দিনের কথা বলে যদি দশ রাত্রি বুঝিয়ে থাকেনও, তবে দশ রাত্রির সাথে জড়িত দিনগুলোও তার মধ্যে গণ্য হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্র কথা ঃ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا 'তিনটি রাত সমান সমান।' আসলে তিন দিনই বলতে চাওয়া হয়েছে। ঠিক এই ব্যাপারে উল্লেখ প্রসঙ্গে অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا -

তিন দিন কথা বলবে না, শুধু ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا -

তোমাদের মধ্যে যেসব লোক মরে যায় এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, সেই স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিবাহের ব্যাপারে অপেক্ষমান থাকবে।

এ হচ্ছে চার মাস ও দশ দিনের কথা। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব, আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'বড় হজ্জের দিন হল কুরবানীর দিন, পশু কুরবানীর দিন, পশু কুরবানী করার দিন। পশু যবেহ করার দিন বড় হজ্জের দিন হবে।' কিন্তু তা হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে হবে না, তা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হজ্জ জানা মাসসমূহ'-এর বাহ্যিক দাবি হচ্ছে তিনটি সম্পূর্ণ মাস হওয়া।' তার থেকে কিছু কম হওয়া উচিত নয় দলীল ছাড়া। দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, পশু কুরবানী করার দিনটি হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে গণ্য। আর তাতে আল্লাহ্ ইহরাম বাঁধাকে মুবাহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথা 'হজ্জ কতিপয় জানা মাসে'-এর মাধ্যমে। কাজেই ইহরামের সূচনা সেই সময় অবশ্যই সহীহ্ হবে। তখন যদি তা সহীহ্ হয়, তাহলে বছরে সবদিনই তা সহীহ্ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে ও সর্ব সম্মতভাবে। এই আয়াতটিতেই হজ্জের মাসসমূহ শুরু হওয়ার পূর্বেই ইহরাম বাঁধা জায়েয হওয়ার আরও একটি দলীল রয়েছে। তা হচ্ছে কথার পরবর্তী অংশ ঃ

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ -

অতঃপর যে লোক এই মাসগুলোতে হজ্জ ফরয করে নেবে ....

অর্থাৎ হজ্জ করা ফরয মনে করে নেবে। এই হজ্জ ফরয করে নিলেই হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করার দায়িত্ব আসে। আর ফরয পালনের জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। কাজের জন্যে এই সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। কেননা এখানে যে ফরয-এর কথা বলা হয়েছে, তা অবশ্যই সে হজ্জ ছাড়া অন্য কিছু হবে যাকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর ব্যাপার যখন তাই, তা হলে সময় নির্দিষ্ট হবে 'মানাসিক' সংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্যে এবং অ-নির্দিষ্ট সময়ের ফরয দ্বারা তাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধা অবশ্যই সহীহ্ হবে। এই হজ্জই মানাসিক-এর সব কাজ ওয়াজিব করে দেয়। এই যা বলা হল, তার ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই মানতের হজ্জ শুরু করা সহীহ্ হবে। তাহলে তার জন্যে শর্তকৃত সময়ে হজ্জ করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হবে, যদিও তা তার পূর্বেই ওয়াজিব হয়ে আছে। যদি কেউ মানত মানে এই বলে যে, 'আগামীকাল আল্লাহ্‌র জন্যে রোযা রাখা আমার জন্যে কর্তব্য', তাহলে আগামীকালের রোযা তার উপস্থিতির আগেই এই সময় ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে একথা বলাও জায়েয যে, যে লোক হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের জন্যে ইহরাম বেঁধেছে, তা-ই হজ্জের মাসে হজ্জ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। যদিও তার ফরয হওয়া ও তার জন্যে ইহরাম বাঁধা শুরু করা অন্য সময়ে হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জ ফরয করে

নেবে—হজ্জের নিয়ত করবে'-এর অর্থ, সেই মাসসমূহের পূর্বে কিংবা তার পূর্বে হজ্জের কাজ ফরয করে নেবে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ সমস্ত ফরয দুটি সময়ের মধ্যে শামিল করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَرَا دَالْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ -

যে লোক হজ্জ করার ইচ্ছা করে সে যেন খুব তাড়াতাড়ি করে।

তাড়াতাড়ি করা অর্থ ইহরাম বাঁধা ও তৎসংক্রান্ত কার্যাবলী করা। তবে যেসব কাজ তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে না করার দলীল রয়েছে, সে সব কাজের কথা আলাদা।

সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গের উল্লেখে যে কথাটি বলা হয়েছে, তা-ও সেই কথা প্রমাণ করে। কথাটি হচ্ছে ঃ هُنَّ لِاَهْلِهِنَّ 'ওগুলোর যারা অধিকারী তাদের জন্যে।' وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ 'এবং তাদের জন্যেও যারা সে সবের অধিকারীদের ছাড়াই সে সবের উপর দিয়ে চলে গেছে সেই লোকদের মধ্য থেকে, যারা হজ্জ ও উমরা করার ইচ্ছা করেছে।' এই সাধারণ নীতি যে-কোন সময়ে হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধাকে জায়েয করে দিয়েছে বছরের যে-কোন সময়ে।

একটু চিন্তা-বিবেচনা করলেও বোঝা যাবে, কুরবানীর দিন প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে হজ্জের ইহরাম তার পূর্ণত্ব সহকারে অবশিষ্ট থাকে, এ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। হজ্জের মাসসমূহ আসার পূর্বেই হজ্জের জন্যে ইহরাম বাঁধা যদি জায়েয না হতো, তাহলে যে সময়ে ইহরাম শুরু করা সহীহ নয় সেই সময় পর্যন্ত ইহরাম তার পূর্ণত্ব সহকারে টিকে থাকা সম্ভব হতো না। আর কুরবানীর দিন প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম টিকে থাকার প্রমাণ করে যে, তা শুরু করাও জায়েয। কেননা হজ্জের মানাসিক এমন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, তাকে তার অগ্রে নিয়ে আসা কিছুতেই জায়েয নয়। কুরবানীর দিনটি যদি ইহরামের সময় না হয়, তাহলে তখন ইহরাম টিকে থাকা কখনই জায়েয হতে পারে না। যেমন জুম'আর নামায একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাকে সেই সময়ের পূর্বে নিয়ে আসা জায়েয হতে পারে না। জুম'আ শুরু করার পর সেই সময়ে টিকে থাকা যখন তা শুরু করা সহীহ্ নয়— জায়েয হতে পারে না। যথা, জুম'আ শুরু করা, পরে তা শেষ করার পূর্বেই আসরের সময় শুরু হয়ে যাওয়া— তাতে জুমআ বাতিল হয়ে যাবে এবং সময় চলে যাওয়ার পর তার হুকুমটা টিকে থাকবে না। সেই সময়ে তা শুরু করাও সহীহ হবে না। ইহরামের হজ্জও তেমনি। যদি তা হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তার শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার পূর্ণত্ব সহ বাকী থাকা কখনই সহীহ্ হবে না। যেমন আমাদের বিপরীত মত পোষণকারীদের মতে তার শুরু করা সহীহ নয়। কিন্তু আমরা বলব, পশু যবেহ করার দিনও ইহরাম টিকে থাকা যদি সহীহ হয়, তাহলে সে দিন ইহরাম শুরু করাও সহীহ হবে।

এই কথা এদিক দিয়েও সহীহ প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের ইহরাম এমন সময়ও জায়েয, যখন তার সংক্রান্ত কার্যাবলী বিলম্বিত হবে এবং সেগুলোর সেই সময়ে সজ্ঘটিত হওয়া সহীহ হবে না। অতএব হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসা জায়েয হবে অবশ্যই। যেমন তার সংক্রান্ত কাজগুলো সেই সময়ে করা সহীহ হবে। কেননা তা যে কাজগুলোকে জরুরী

করে, তা থেকে বিলম্বিত। উপরন্তু ইহ্রাম বাঁধা যদি কোন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতো, তাহলে তার সাথে তার কার্যাবলীর ওয়াজিব হওয়ার কারণ ও মিলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাকে তার থেকে বিলম্বিত হওয়া জায়েয হতো না।

এর আর একটা প্রমাণ হচ্ছে, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, তামাত্তু হজ্জকারী একই সফরে উমরা ও হজ্জের কার্যাবলী একত্রিত ও সমন্বিত করে— অবশ্য তা যাদের পরিবারবর্গ মসজিদে হারামে উপস্থিত নয়, তাদের জন্যে উমরার ইহ্রাম হজ্জের মাসসমূহে কিংবা তার পূর্বে হতে পারে। তামাত্তু হজ্জকারীর জন্যে দেয়া হুকুমের এটাই দাবি। অনুরূপভাবে হজ্জের ইহ্রাম হজ্জের মাসসমূহে কিংবা তার পূর্বে হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ দুটির মধ্যে সমন্বয়কারী অর্থ হচ্ছে, দুটি ইহ্রাম যে সব কাজকে ওয়াজিব করে তার প্রত্যেকটির হুকুম সংশ্লিষ্ট হচ্ছে হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে সঙ্ঘটিত হওয়ার সাথে। ফলে দুটো ইহ্রামই সমান হওয়া জরুরী যেমন বলেছি সেই দিক দিয়ে। যেমন সে দুটি কার্যাবলী হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে হওয়া সমান হয়ে যায়।

যারা হজ্জের মাসসমূহের আগে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা জায়েয মনে করেন না, তাদের দলীল হচ্ছে اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ এর বাহ্যিক অর্থ। অথচ আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা জায়েয এবং তার দলীলও দিয়েছি। তা সত্ত্বেও 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাসে' কথাটির হুকুম একটা ইঙ্গিতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাকে বাদ দিয়ে কথা বলা যেতে পারে না। আর তা হচ্ছে, একথা জানা-ই আছে যে, হজ্জ বহু কয়টি মাসে হয় না। কেননা হজ্জ তো হল হাজীর কাজ। আর মাসসমূহ হল আল্লাহ্র কাজ, আল্লাহ্র সৃষ্টি। আর আল্লাহ্র কাজ কখনই বান্দার কাজ হতে পারে না। অতএব প্রমাণিত হল যে, এখানে একটি ইঙ্গিত উহ্য আছে। হতে পারে সে ইঙ্গিতমূলক কথাটি এই হবে যে, 'হজ্জের কাজ জানা মাসসমূহে হবে।' আর তাহলে তাতে হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে তার ইহ্রাম বাঁধা জায়েয না হওয়ার মতো কোন কিছুই নেই। বরং তা থেকে এই ফায়দা লাভ করা যায় যে, হজ্জের কাজগুলো এই মাসসমূহে হবে। আর ইহ্রামও সেই সময়ে জায়েয। সে সময়ে ইহ্রাম জায়েয হলে অন্য সময়ে ইহ্রাম জায়েয হবে না— এমন কোন কথা নেই।

যদি বলা হয়, হজ্জের ইহ্রাম সংক্রান্ত আদেশ কিংবা তার কার্যাবলী এর মধ্যেই শামিল রয়েছে। অতএব অন্য সময়ে তা করা জায়েয হবে না।

জবাবে বলা যাবে, একথা ভুল। কেননা ব্যবহৃত শব্দের আদেশের কোন দলীল নেই। বরং তাতে তার জায়েয হওয়ারই দলীল রয়েছে। তার ওয়াজিব করার কোন দলীল শব্দে নেই। ব্যাপার যখন এই, তখন এই সব মাসে হজ্জের ইহ্রাম ও তার সংক্রান্ত কার্যাবলী জায়েয হওয়ারই বরং অনেক দলীল রয়েছে। আর অন্য সময়ে তা না-জায়েয হওয়ার কোন দলীল নেই।

যদি বলা হয়, সারা বছরই যখন ইহ্রাম বাঁধা জায়েয, তখন তার জন্যে কোন মাসকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার কোন অর্থ নেই। এই মত সময় নির্ধারণের ফায়দা বিনষ্ট করে দেয়।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। বরং তাতে বহু ফায়দা নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, হজ্জের কার্যাবলী এই মাসসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। আমরা পূর্বে বলেছি, হজ্জের মাসসমূহের আগেই যদি তওয়াফ ও সাঈ' সম্পন্ন করে, তাহলে তা হজ্জের জন্যে গণ্য হবে না।

তা পুনরায় করতে হবে। আর একটি ফায়দা এই যে, তামাত্তুর হুকুম হজ্জের সাথে উমরার কাজের সাথে সম্পর্কিত এই মাসসমূহে। এমন কি, হজ্জের মাসসমূহের আগেই যদি উমরার তওয়াফ সম্পন্ন করা হয়, আর সেই বছরই হজ্জ করে, তাহলে সে তামাত্তু হজ্জকারী হতে পারবে না। এজন্যে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে 'কেরান' হজ্জ করবে ও হজ্জের মাসসমূহ আসার আগেই মক্কায় প্রবেশ করবে ও উমরার তওয়াফ ও সাঈ' করে ফেলে এবং কেরান-এর উপরই চলতে থাকে, তাহলে সে তামাত্তু হজ্জকারী হল না। কেরান হজ্জের পশু যবেহ করাও তার জন্যে কর্তব্য হবে না। আয়াতটি এই ফায়দা দিয়ে যে, এই মাসগুলোর সাথেই তামাত্তুর হুকুম জড়িত যখন হজ্জ ও উমরাকে তাতে একত্রিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র কথা ঃ 'হজ্জ জানা মাসসমূহে' হজ্জকে যদি এই মাসসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়, অন্যান্য মাসকে শামিল না করে, তাহলে ইহরাম ছাড়াই হজ্জের কাজ কর্মের দিকে ফিরে যাওয়া কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাতে আল্লাহ্র একথাটির সাধারণ তাৎপর্য রক্ষা পায় ঃ 'লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তা লোকদের ও হজ্জের জন্যে সময় নির্ধারক।' এতে জানা গেল যে, সব নতুন চাঁদেই ইহরাম বাঁধা জায়েয। তার অর্থ যদি ইহরাম ধরা হয়, তাহলে 'তা জনগণের ও হজ্জের জন্যে সময় নির্ধারক' কথাটির সাধারণত্ব ব্যাহত হয়ে যায়। আর 'হজ্জ জানা মাসসমূহ'-এর তাৎপর্যকে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও আমরা তার ব্যবহারকারী হবো না। কেননা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নতুন চাঁদসমূহকে হজ্জের সময় নির্ধারক বানিয়েছেন। আমরা যখনই তাকে হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে সীমিত করে দেব, তখন তার হুকুম নতুন চাঁদসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকবে না। সম্পর্কিত হয়ে যাবে তার পরিবর্তে অন্যান্য সময়ের সাথে, যেমন আরাফাতের দিনটি অবস্থান গ্রহণের জন্যে, আর কুরবানীর দিনটি তওয়াফ ও পাথর নিক্ষেপের জন্যে। ইহরাম ও তার কার্যাবলীর কথা মনে করা জায়েয হবে না। কার্যাবলীর কথা মনে করা হলেই ইহরাম নিষিদ্ধ হবে। কেননা একটি শব্দে দুটিরই ইচ্ছা গ্রহণ নিষিদ্ধ। তার কারণ হল সে দুটির একটি স্বতঃই লক্ষ্যভূত। তা হল 'মানাসিক'-এর কার্যাবলী। আর দ্বিতীয়টি হল তার কারণ। এই নামকরণ পরোক্ষ পন্থায়। অতএব দুটিরই একই শব্দে ইচ্ছা গ্রহণ জায়েয নয়। যে হজ্জ করল, কিন্তু আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করল না, তার সম্পর্কে বলা যাবে যে, সে হজ্জ-ই করেনি। আর অবস্থান গ্রহণ করলে তাকে হাজী নামে অভিহিত করা চলবে। উপরন্তু আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ 'হজ্জ কয়েকটি মাসে সম্পন্ন করতে হয়,' আর নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'আরাফা-ই হচ্ছে হজ্জ, তখন বুঝতে হবে, এই কথাটি কুরআনে বলা হজ্জের পরিচিতি। বুঝতে হবে الحج। -এর প্রথম আলিফ ও লাম অক্ষরদ্বয় পরিচিতিমূলক। এক্ষণে আয়াতের মোট কথাটি দাঁড়ায় এই ঃ 'হজ্জ যা আরাফাতে অবস্থানের মাধ্যমে হয়, কয়েকটি জানা মাসে সম্পন্ন করণীয়। মাসসমূহ বলার ফায়দা আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। ইহরাম বাঁধার সময় বুঝবার উদ্দেশ্য হলে তা মাসসমূহে মুস্তাহাব হিসেবে ব্যবহার করাই কর্তব্য। আর 'জনগণের ও হজ্জের জন্যে' কথাটি জায়েয বোঝাবার জন্যে। এভাবেই দুটি শব্দের প্রত্যেকটিরই ফায়দা পূর্ণভাবে পাওয়া যায় এবং তার হুকুমের অংশও।

যদি বলা হয়, উক্ত কথা বলে ইহরাম বোঝানোর ইচ্ছা হয়ে থাকলে তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে তা করা জায়েয হবে না। তখন কথাটি 'নামায কায়েম কর সূর্য পশ্চিমদিকে

ঢলে পড়লে'-এর মত হয়ে যাবে। অথবা 'নামায কায়েম কর দিনের দুই দিকে' এর মত। এইরূপ আরও যে সব আয়াত রয়েছে, সে সব আয়াতের মত, যাতে ইবাদতের জন্যে সময় নির্ধারিত করা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, 'হজ্জ কয়েকটি জানা মাসে করণীয়' আল্লাহ্র এ কথাটিতে হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই। কেননা এটা আদেশ সূচক কথা নয়। তাতে একটা ইঙ্গিত রয়েছে, তা প্রমাণের জন্যে একটা ভিন্ন দলীলের প্রয়োজন। কেননা হতে পারে, এই মাসসমূহে হজ্জ জায়েয হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এ-ও হতে পারে যে, তদ্দারা হজ্জের ফযিলত বলা হয়েছে। অতএব শব্দের বাহ্যিক অর্থে সময় নির্ধারণের কোন অর্থ যে নেই, তা নিঃসন্দেহে। এই কারণে 'মাসসমূহ' বলার দ্বারা ইহ্রামের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ওয়াজিবকরণ হিসেবে, এর দলীল বলাও সহীহ হবে না। আর নামায তো আল্লাহ তা'আলা সময় নির্ধারণ সহকারেই ফরয করেছেন এমন শব্দ দ্বারা, যাতে সেই সময়েই তা আদায় করা ফরয হয়ে যায় কোনরূপ শোবা সন্দেহ ছাড়াই। যেমন বলেছেন ঃ أقم الصلوة لدلوك الشمس 'সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হলে নামায কায়েম কর।' এরূপ আরও আয়াতে নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে।

আরও একটি কারণ আছে। আমরা মেনে নিয়েছি যে, সেটি ইহরাম বাঁধার সময়। তখন নামায তার উপর বাধ্যতামূলক হয় না নামাযের ইহরাম তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে নিয়ে আসার দিক দিয়ে। তা জায়েয নয় এ হিসেবে যে, তার ফরযসমূহ ও রুকন সমূহ ইহরামের সাথে মিলে গিয়েছে। তার সমস্ত ফরয তার তাহরীমা বাঁধা থেকে বিলম্বিত করে করা জায়েয নয়। এই কারণে তার তাহরীমা বাঁধার হুকুম সমস্ত কাজের হুকুম হয়ে যায়। এমন সময়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধা জায়েয হওয়ার কোন মতপার্থক্য নেই, যার পরে বিলম্বিত হবে তার সমস্ত কাজ। তার একটি ফরযও ইহরামের পরে পরে করা জায়েয নয়। এই কারণে হজ্জ ও নামায দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হয়ে গেছে।

অপর একটি দিক দিয়েও আলোচনা করতে হবে। তা হল ইহরামের কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন তার বাধ্যবাধকতার সহীহ হওয়া নিষিদ্ধ করে না। আর নামায নিষিদ্ধ হওয়ায় নামায শুরু করা সহীহ হওয়াকে নিষেধ করে। তার দলীল হচ্ছে, যে লোক বিনা অযূ অবস্থায় নামাযের তাহরীমা বাঁধবে অথবা অ-কিবলার দিকে ফিরে তাহরীমা বাঁধবে— ইচ্ছা করে কিংবা সম্পূর্ণ ন্যাংটা অবস্থায়— অথচ তার কাপড় আছে, তার নামায শুরু করাই জায়েয নয়। তেমনি হজ্জের ইহরাম বাঁধল স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশা করা অবস্থায় অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ পরা অবস্থায়, তার ইহরাম তো সঙ্ঘটিত হবে, তার হুকুম-ও তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে তা নষ্ট করে এমন কাজের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও। তাই হজ্জের ইহরাম সংক্রান্ত হুকুম-আহকামকে নামাযের সাথে তুলনা করা সঙ্গত হবে না।

আর একটি কারণ এই যে, নামাযের কোন কোন ফরয তরক করলে তাকে নষ্ট করে দেবে। যেমন অযূ না থাকা, কথা বলা, চলাফেরা করা ইত্যাদি। কিন্তু ইহরামের কোন কোন ফরয তরক হলে ইহরাম নষ্ট হয় না। কেননা সুগন্ধি ব্যবহার করলে বা ভালো পোশাক পরলে কিংবা

শিকার করলে ইহরাম ভেঙ্গে যায় না। যদিও এই সব কাজ না করাই ইহরামের ফরয। হজ্জের কোন কোন ফরয তো এমন যা হজ্জের মাসসমূহ শেষ হয়ে যাওয়ার পর করতে হয়। আর কোন কোন ফরয তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই করতে হয়। কিন্তু নামাযের কোন ফরযই এমন নয়, যা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় অতীত হয়ে যাওয়ার পর করতে হয়। কাযা করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কাজেই নামায ইহরাম সম্পর্কিত মাসলা ঠিক করতে ভিত্তি হতে পারে না। তবে আসল মাসলায় তাকে দলীল বানানো যেতে পারে। তা এ ভাবে যে, হজ্জের কোন কোন ফরয এমন যা হজ্জের মাসসমূহ অতীত হয়ে যাওয়ার পর করা হয়, তা-ই হয় তার আসল সময়। তেমনি তার জন্যে ইহরাম হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে করা জায়েয। তা-ই হবে তার জন্যে আসল সময়। কেননা তা হজ্জের মাসসমূহের আগে করা জায়েয না হলে তার কোন ফরয পেছনে বিলম্বিত করে করা জায়েয হতো না ঠিক নামাযের মতই।

যদি বলা হয়, এ বিষয়ে যখন সকলেই একমত যে, যে লোক হজ্জ করতে পারল না, তার তখনকার ইহরাম দিয়ে পরবর্তী বছরের হজ্জ করা তার জন্যে জায়েয নয়। তার হালাল হয়ে যাওয়া উচিত উমরা করে। তখন বোঝা গেল যে, হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্য সময় হজ্জের জন্যে করা ইহরাম উমরা করা ওয়াজিব বানিয়ে দেয়। সেই ইহরাম দ্বারা হজ্জ করা জায়েয নয়।

জবাবে বলা হবে, হজ্জের মাসসমূহের পর-ও তার ইহরাম পুরাপুরিভাবে টিকে থাকা জায়েয। আর তা হচ্ছে কুরবানীর দিন প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে। এমনকি ইমাম শাফেয়ী (রা) ধারণা করেছেন যে, কুরবানীর দিন যদি স্ত্রী-সঙ্গম করে, তাহলে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। পূর্বে আমরা দলীল দিয়ে বলেছি যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা জায়েয। কেননা তাঁর মতে কুরবানীর দিনটি হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। সে দিনও ইহরাম তার পূর্ণত্ব সহকারে বাকী থাকতে পারে। এর দুটি তাৎপর্য রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করার সুযোগ না থাকা। যা সে উল্লেখ করেছে তা নিয়ে আপত্তির কারণ হল— হজ্জের মাসসমূহের আগেই হজ্জের জন্যে সহীহ্ ইহরাম পেয়ে যাওয়া সঙ্গত। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য হল, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের ইহরাম শুরু করা জায়েয বোঝায়। কেননা সে সময় পূর্বের ইহরাম টিকে থাকা সঙ্গত, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত বলেছি। ইমাম শাফেয়ী যে বলেছেন যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের ইহরাম যে বাঁধবে, সে কার্যত উমরার জন্যে ইহরাম বেঁধেছে বুঝতে হবে। এই কথাটি বাহ্যিকভাবেই বিপর্যস্ত। কেননা হয় ইহরামের হজ্জ সে নিজের উপর যা চাপিয়ে নিয়েছে, তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে, অথবা বাধ্যতামূলক হবে না। যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে সে ইহরাম বাঁধেনির মতো হয়ে যাবে। অথবা সেই নামাযীর মতো হবে যে যুহরের সময় আসার আগেই যুহরের নামাযের তাহরীমা বেঁধেছে। তাতে তার জন্যে বাধ্যতামূলক কিছু থাকে না। সে তা শুরুই করেনি। না অন্য কিছুতে সে প্রবেশ করছে। তার জন্যে হজ্জ বাধ্যতামূলক হলে হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের ইহরাম আদায় করা তার জন্যে জায়েয হবে। আর ইহরাম বাঁধা যখন সহীহ্ হবে, তাতে থেকে যাওয়াই তার পক্ষে সম্ভব হবে। উমরা করে তা থেকে হালাল হওয়া তার জন্যে জায়েয হবে না।

যদি বলা হয়, সে তো সেই ব্যক্তির মত, যে হজ্জ হারিয়েছে। কাজেই উমরা করার মাধ্যমে হালাল হওয়াই তার কর্তব্য।

জবাবে বলা যাবে, তা ঠিক উমরা নয়। উমরার কাজ-কর্ম, যা করে হজ্জের ইহরাম থেকে তাকে হালাল হতে হবে। যেমন মক্কায় থেকেও যে হজ্জ করতে পারে না— হারিয়ে ফেলে, তাকে হালাল হওয়ার জন্যে আদেশ করা হয়নি তার জন্যে উমরার যে কাজ করা জরুরী করে দেয়া হয়েছে তার জন্যে। কেননা মক্কার লোকের জন্যে উমরার সময়ও সে হালাল। সে হালাল হওয়ার জন্যে উমরা শুরু করার ইচ্ছা করলেও। এ থেকে বোঝা গেল, হজ্জ হারিয়ে সে যা করবে তা উমরা নয়, তা উমরার কাজ মাত্র। তা করেই সে হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। হজ্জ হারালেও হজ্জের ইহরাম টিকে থাকবে। উপরন্তু যে হজ্জ হারাবে, হজ্জের ইহরাম তার জন্যে বাধ্যতামূলক। সে উমরার কাজ করে তা থেকে হালাল হওয়ার মুখাপেক্ষী হয়েছে মাত্র। তাহলে ইমাম শাফেয়ী কি বলেন যে, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই হজ্জের ইহরামকারীর জন্যে হজ্জ বাধ্যতামূলক ? উমরার কাজ করে সে হালাল হয়ে যাবে ? এবং হজ্জ কাযা করা তার কর্তব্য হবে? তাঁর মতে সে যদি হজ্জের ইহরামকারী না হয়, তাহলে এ অবস্থায় দুটি জিনিস তার জন্যে প্রয়োজন। একটি তাকে উমরা করতে হয়, অথচ সে তা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নেয়নি। তার নিয়তও করেনি। আর দ্বিতীয়— সে হয়ে গেছে সেই ব্যক্তির মতো, যে ইহরাম বাঁধার পর হজ্জ করতে পারেনি। যদিও এটার ইহরাম সে কখনই বাঁধেনি। ফলে উমরা তার জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে গেল, যার কোন কারণই নেই। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِىٍٔ مَّانَوٰى -

কাজসমূহ নিয়ত অনুযায়ী গৃহীত হয়। যে লোক যে নিয়ত করবে সে তা-ই পাবে।

তাই যখন কেউ ইহরাম বেঁধে হজ্জের নিয়ত করল, তার তা-ই হওয়া উচিত যার নিয়ত সে করেছে রাসূলে করীম (স)-এর কথানুযায়ী। সে তো হজ্জের নিয়ত করেছে। তার হজ্জ করাই উচিত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ -

যে লোক এই মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে ...

আবূ বকর বলেছেন, এই আয়াতাংশের মূল বক্তব্য সম্পর্কে আগের কালের মনীষিগণের বিভিন্ন কথা রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা), আল-হাসান ও কাতাদাতা বলেছেন, এর অর্থ যে-লোক ইহরাম বাঁধল। শরীক আবূ ইসহাক, ইবনে আব্বাস সূত্রে বলেছেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হল ঃ যে লোক 'তালবিয়া' বলবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর (রা) ইবরাহীম নখয়ী, তায়ূস, মুজাহিদ ও আতাও তাই বলেছেন। উমরাতা আয়েশা (রা) সূত্রে বলেছেনঃ যে লোক ধ্বনি দিল ও লাব্বাইকা বলল, তার ইহরামই গণ্য হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতাংশের যিনি অর্থ করেছেন ঃ 'যে ইহ্রাম করেছে' তিনি তালবিয়া বলা ছাড়া ইহ্রাম জায়েয মনে করেন— সে কথা বোঝায় না। কেননা হতে পারে তিনি বলেছেন ঃ যে লোক ইহ্রাম বেঁধেছে আর ইহ্রামের শর্ত হচ্ছে, 'তালবিয়া' বলা। অতএব বলা যায়, তালবিয়া বলা বা অনুরূপ কাজ কুরবানীর জন্তুর গলায় রশি বাঁধা, তাকে চালিয়ে দেয়া প্রভৃতি ধরনের কাজ না করে ইহ্রাম শুরু করা জায়েয, তা আগে কালের মনীষীদের মধ্যে কেউ-ই বলেন নি। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ তালবিয়া বলা, কুরবানীর জন্তুর গলায় রশি বাঁধা ও সেটি চালনা করা ছাড়া ইহ্রাম শুরু করা জায়েয মনে করেন নি। তার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। ফুরাদ ইবনে আবূ নুহ নাফে, ইবনে উমর, আবূ মুলায়কা আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা) তখন চিন্তা ভারাক্রান্ত অবস্থায় পড়েছিলেন। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে ? জবাবে বললেন, হয়নি কিছুই। আমি আমার উমরা পুরা করেছি। কিন্তু হজ্জ আমাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। নবী করীম (স) বললেন ঃ 'এ এমন একটা ব্যাপার, যা আল্লাহ্ আমাদের কন্যাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন। অতএব তুমি হজ্জ কর এবং বল তা-ই, যা মুসলমানরা তাদের হজ্জে বলে থাকে।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, 'তালবিয়া' বলা ওয়াজিব। কেননা মুসলমানরা ইহ্রাম বাঁধার পর তালবিয়া বলে। নবী করীম (স)-এর এই নির্দেশ ওয়াজিব প্রমাণ করে। নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও পালন করা কর্তব্য ঃ "তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের 'মানাসিক' হজ্জ সংক্রান্ত কার্যাবলী বুঝে নাও।" তালবিয়া এই মানাসিক-এরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজে ইহ্রাম বাঁধার পর 'তালবিয়া' বলেছেন। নবী করীম (স)-এর আরও একটি কথা রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমার নিকট জিবরাঈল এসে বলেছেন ঃ

مُرْ اُمَّتَكَ يَرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَاِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ -

আপনি আপনার উম্মতকে উচ্চস্বরে তালবিয়া বলতে আদেশ করুন। কেননা তালবিয়া হজ্জের অঙ্গীভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এর মধ্যে দুটি তাৎপর্য রয়েছে ঃ তালবিয়া বলা এবং তা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা। তবে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত হয়ে বলেছেন ঃ তালবিয়া উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা ওয়াজিব নয়। তবে 'তালবিয়া' বলার হুকুম অবশ্যই পালনীয়।

এ থেকে বোঝা যায়, হজ্জ ও উমরায় একই তাহরীমায় বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কাজ সম্পন্ন করতে হয়। ফলে তা 'নামায' সদৃশ হয়ে গেছে। কেননা তাতে একই তাহরীমায় বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কাজ করতে হয়। নামায শুরু করতে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয়। হজ্জ ও উমরা শুরু করতেও তেমনি তালবিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র যিকির করতে হয়। কিংবা তদস্থলে অন্য যা কিছু বলা হয়। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, যখন পশুর গলায় দড়ি লাগানো হবে ও সেটি চালিয়ে দেয়া হবে ইহ্রাম বাঁধার নিয়ত করে, তখনই সে ইহ্রাম বাঁধল, মনে করা যাবে। হযরত জাবির (রা)-এর দুই পুত্র তাঁদের পিতার মাধ্যমে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ اَحْرَمَ -

যে লোক পশুর গলায় দড়ি বাঁধল, সে ইহ্‌রাম বাঁধল।

এ ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহ্‌বিদগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ হ্যাঁ, পশুর গলায় দড়ি বাঁধলে বোঝা যাবে, সে ইহ্‌রাম বেঁধেছে। হযরত আলী, কায়স ইবনে সাদ, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা), তায়ূস, আতা, মুজাহিদ, শবী, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, জাবির ইবনে জায়দ, সাঈদ ইবনে যুবায়র ও ইবরাহীম থেকেও এরূপ বর্ণনাই পাওয়া গেছে। এই কাজটা হল, ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করার পর পশুর গলায় দড়ি লাগালো ও তাকে চালিয়ে দেয়া। ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ত না করলে যে ইহ্‌রামকারী হওয়া যায় না, এ ব্যাপারে কোন মতবৈষম্যের অবকাশ নেই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ اِنِّىْ قَلَّدْتُ الْهَدْىَ فَلَا اَحِلُّ اِلَى يَوْمِ النَّحْرِ 'আমি কুরবানীর জন্তুর গলায় রশি বেঁধেছি। অতএব আমি পশু যবেহ বা কুরবানী করার দিন পর্যন্ত হালাল হবো না।' এই বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরবানীর পশুর গলায় দড়ি বাঁধা ও সেটিকে চালিয়ে দেয়া তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার পথে বাঁধা ছিল। বোঝা গেল, ইহ্‌রাম বাঁধার ব্যাপারে এই কাজের একটা গুরুত্ব রয়েছে। তা তালবিয়া বলার স্থলাভিষিক্ত ইহ্‌রাম শুরু করার ব্যাপারে। যেমন তা বাঁধা ছিল হালাল হওয়ার পথে। শুধু পশুর গলায় দড়ি বাঁধাই যে ইহ্‌রাম ওয়াজিব করে দেয় না, তার দলীল হচ্ছে, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (স) তাঁর কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিতেন এবং দাঁড়িয়ে থাকতেন। তখনও তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধা হয়নি। হযরত আয়েশা (রা)-ও বলেছেন, 'যে তালবিয়া বলেনি সে ইহ্‌রাম বাঁধেনি অর্থাৎ যে লোক তার জন্তু পাঠিয়ে দেয়নি ও তার সঙ্গে বের হয়ে যায়নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ -

হজ্জে স্ত্রী-সঙ্গম নেই, ফিসক-ফুজুরী-শরীয়াত লঙ্ঘনমূলক কাজ বা ঝগড়া-ঝাটি প্রভৃতি কাজের কোন অবকাশ নেই।

আগের কালের মনীষিগণ رفث শব্দের মর্ম বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ তার অর্থ الجماع। স্ত্রী-সঙ্গম। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া গেছে। তাঁর একথাও জানা গেছে ঃ التعريض بالنسا 'স্ত্রীলোকদের সাথে যৌনতামূলক ইশারা-ইঙ্গিত।' ইবনুয যুবায়রও তাই বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) এই কথা বলেছেন ঃ 'রফস' হচ্ছে সঙ্গমের উল্লেখ সহকারে স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাওয়া। আতা বলেছেন ঃ 'রফস' অর্থ স্ত্রী সঙ্গম; কিংবা তার চাইতে কিছুটা কম লজ্জাকর কথাবার্তা। আমর ইবনে দীনার বলেছেন ঃ সঙ্গম বা তার চাইতে কম কাজ স্ত্রীদের সঙ্গে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ বলা হয়েছে 'রফস' শব্দের আসল অর্থ লজ্জাজনক কথাবার্তা বলা ও স্ত্রী অঙ্গে সঙ্গম করা। হাত দ্বারা সঙ্গমের ইঙ্গিত দেয়া; তা-ই যখন হবে, তখন হজ্জে 'রফস' নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থে এসব কিছুই শামিল মনে করতে হবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এ আয়াত দ্বারা যৌন সঙ্গমকেই বোঝানো হয়েছে। বোঝা যায়, যুক্তির দিক দিয়েও 'রফস' অর্থ নির্লজ্জতা। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَيَرْفُثْ وَلاَيَجْهَلْ فَانْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ انِّىْ صَائِمٌ -

তোমাদের কারোর রোযার দিন হলে সে সঙ্গম করবে না। জাহিলী কাজ করবে না। তার উপর জাহিলী কাজ করা হলে সে বলবে ঃ আমি রোযাদার।

লজ্জাকর কথাবার্তাও তার মধ্যে শামিল। 'রফস' শব্দের অর্থ যদি ইহরামে স্ত্রীদের উল্লেখ সহকারে সঙ্গমের ইশারা-ইঙ্গিত হয়, তাহলে স্পর্শ করা, হাত দিয়ে ধরা ও সঙ্গম অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا -

এবং তোমরা পিতা-মাতার জন্যে 'উহ্' বলো না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না।

এ থেকে গালাগাল ও মারপিট করার নিষেধও বোঝা গেছে। আল্লাহ রোযার প্রসঙ্গেও 'রফস' শব্দের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ نِسَائِكُمْ -

রোযার রাত্রিতে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন ও সঙ্গম তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

এ কথা দ্বারা যে স্ত্রী-সঙ্গম হালাল করার কথা বলা হয়েছে, এতে কোনই মতপার্থক্য নেই। তার কম যা কিছু তাও মুবাহ করা হয়েছে। আর হজ্জে এই সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইশারা-ইঙ্গিত এবং স্পর্শকরণ থেকে উপরের দিকে— সঙ্গম পর্যন্ত সবই এই নিষেধের আওতাভুক্ত। কেননা অল্প কাজ নিষিদ্ধ হলে সেই জাতীয় বেশি কাজও অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। বেশি পরিমাণ মুবাহ হলে কম পরিমাণও মুবাহ হবে। এটাই স্বাভাবিক। মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ থেকে বর্ণিত— বলেছেন, আমরা হজ্জ করার জন্যে রওয়ানা হলাম। পরে আমরা 'রুয়াইসা'য় পৌঁছলাম। সেখানে এক শায়খকে দেখলাম, তার নাম আবূ হরম। তিনি বললেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি لِلْمُحْرِمِ مِنْ اِمْرَأَتِهِ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْجِمَاعُ 'ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ছাড়া আর সব কাজ-ই করতে পারে'— এ কথা শুনার পর আমাদের হজ্জযাত্রীদের মধ্যের একজন তার স্ত্রীর নিকট যেতে আগ্রহী হল, তাকে চুম্বন করল। পরে আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। সেখানে আতাকে এই কথার উল্লেখ করে মাসলা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন— আল্লাহ লোকটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সে মুসলমানদের যাতায়াত পথে বসে গুমরাহীর ফিতনার সৃষ্টি করছে। পরে আরও বললেন, যে লোক ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছে, সে যেন একটা পশু যবেহ করে (কাফফারা দেয়)। এই শায়খ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। সে যে মত প্রকাশ করেছে, গোটা মুসলিম উম্মত তার বিপরীত মতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যে লোক স্ত্রীকে চুম্বন করবে, তাকে একটি পশু যবেহ করতে হবে। আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর (রা), আল-হাসান, আতা, ইকরামা, ইবরাহীম, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও সাঈদ ইবনে যুবায়র এ সকল ফিকহবিদ উক্ত মতই প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণেরও মত তাই। যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল

যে, ইহরাম অবস্থায় সঙ্গমের উল্লেখসহ স্ত্রীর নিকট যাবে, ইশারা ইঙ্গিত করবে ও স্পর্শ করবে— এই সব কাজই সঙ্গমের প্রাক্কালীন শৃঙ্গা, সঙ্গমের উদ্বোধক, এই সবই ইহরামকারীর জন্যে নিষিদ্ধ। এই দলীলের ভিত্তিতে সুগন্ধি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। তা-ও ঠিক এই অর্থেই। হাদীসেও তাই বলা হয়েছে।

তারপর الْفُسُوْقُ-এর তাৎপর্য। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, 'ফুসুক' অর্থ গালমন্দ বলা। جدال অর্থ তিক্ততা, কুতর্ক। ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'জিদাল' বলা হয় তোমার সঙ্গী-সাথীর সাথে তোমার ঝাগড়া-বিবাদ করাকে, যার দ্বারা তুমি তাকে ক্রুদ্ধ করে দেবে। আর 'ফুসুক' অর্থ গুনাহ, নাফরমানী। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, হজ্জে কোন ঝাগড়া-ফাসাদ করা যাবে না। আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন হজ্জের মাসসমূহ। অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই, কোন মতপার্থক্যও নেই।

আবূ বকর বলেছেন, আগেরকালের মনীষিগণের যে সব মত ও মন্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, হতে পারে, তা-ই আল্লাহ্‌র বক্তব্য। তাহলে ইহরামকারী হজ্জের মাসসমূহে গালমন্দ বলা ও ঝাগড়া-ফাসাদ করা থেকে বিরত থাকবে। ফিসক-ফুজুরী ও নাফরমানী ও সর্বপ্রকারের গুনাহের কাজ থেকেও বিরত থাকবে। ফলে বুঝতে হবে, আয়াতটি মুখ ও বাকশক্তি ও সঙ্গম-অঙ্গকে এসব নিষিদ্ধ কাজ— ফিসক-ফুজুরী ও নাফরমানী থেকে বিরত ও পবিত্র রাখবে। যদিও এসব কাজ ইহরাম বাঁধার পূর্বেও নিষিদ্ধই রয়েছে। তাই ইহরামের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলা তাগিদ সহকারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন অকাট্য দলীল দিয়ে। আর ইহরাম অবস্থায় নাফরমানী ও গুনাহের কাজ নিশ্চয়ই অতি বড় অপরাধ। তার কঠিন শাস্তি হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। যেমন রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের রোযার দিন হলে কেউ 'রফস' করবে না, জিহালত করবে না। তার উপর যদি জিহালত করা হয়, তাহলে সে বলবে ঃ আমি একজন রোযাদার। বর্ণিত হয়েছে, ফযল ইবনুল আব্বাস (রা) রাসূলে করীম (স)-এর জন্তুযানে সহ-আরোহী ছিলেন মুয্দালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত। পথে মেয়েলোক দেখতে পেতেন। তিনি তাদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপও করতেন। রাসূলে করীম (স) তাঁর মুখমণ্ডল বার বার সে দিক থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন নিজের হাতে। বললেন, আজকের দিন যে লোক নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়, চক্ষুন্দ্রিয়কে সংযত রাখতে পারবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ কাজ অন্যদিনেও নিষিদ্ধ, তা তো জানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই দিনটির মর্যাদা ও সম্মানকে বড় করে তোলার জন্যে বিশেষভাবে সেদিন তা নিষিদ্ধ। নাফরমানী, ফিসক-ফুজুরী, ঝাগড়া-বিবাদ ও স্ত্রী-সঙ্গম এসবই নিষিদ্ধ— আয়াত থেকে তা-ই স্পষ্ট হয়। তার কিছু ইহরাম নিষিদ্ধ করেছে কিংবা ইহরামে তা নিষিদ্ধ, অন্য সময়ও তা নিষিদ্ধ। কেননা আয়াতে সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় তা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ইহরামের সম্মানের জন্যে।

মাসউদ, মনসূর, আবূ হাজিম, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجِعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -

যে লোক হজ্জ করল, কিন্তু তাতে 'রফস' করল না, ফিস্ক-ফুজুরী করল না, সে তার মায়ের তাকে প্রসব করার দিনের মত সব পাপমুক্ত হয়ে যাবে।

এ হাদীস ঠিক আয়াতের কথাটাই বলে দিচ্ছে। তাই এজন্যে যে, আল্লাহ্ যখন হজ্জে গুনাহ-নাফরমানী ও ফিসক-ফুজুরী করতে নিষেধ করলেন, তার মধ্যে একথাও শামিল রয়েছে, তাকে এসব কাজ থেকে তওবা করার আদেশ করা হয়েছে। বারবার গুনাহ করাই 'ফুসুক' ও নাফরমানী। এইজন্যে আল্লাহ চান যে, হাজী নতুন করে ফিসক-ফুজুরী ও গুনাহ্-খাতা থেকে তওবা করবে। যে নাম তার প্রথম জন্ম মুহূর্তের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়— যেমন নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ 'হজ্জে ঝগড়া-বিবাদ বা মারামারি নেই।' সঙ্গী-সাথীদের তিক্ততার সৃষ্টি করা ও তাদেরকে ক্ষুণ্ন-অসন্তুষ্ট-ক্রুদ্ধ করাও এর মধ্যে শামিল এবং নিষিদ্ধ। হজ্জের সময় এসব নিষিদ্ধ করা হয়েছে এজন্যে যে, জাহিলিয়াতের যামানায় তাই হতো। এক্ষণে একটি সময়ে স্থিরকৃত হয়েছে এবং 'নসী'— হজ্জের মাস অদল-বদল করার নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। জাহিলিয়াতের যুগে তাই করা হতো। এটাই হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটির অর্থ ঃ 'জেনে রাখো, কালস্রোত আবর্তিত হতে হতে আসমান-জমিনের প্রথম সৃষ্টি রূপের মতোই স্থিত হয়েছে।' অর্থাৎ হজ্জ বর্তমানে সেই সময়ই করা হচ্ছে, যে সময়টা আল্লাহ তার জন্যে প্রথমেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। নবী করীম (স)-এর হজ্জ সেইভাবেই হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'হজ্জে রফস' ফুসুক ও জিদাল নয়, বাহ্যত একটি খবর। কিন্তু মূলত তা নিষেধের ফরমান। এসব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে একথা বলে, নেতিবাচক শব্দ দ্বারা তা উচ্চারিত হয়েছে। এসব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ -

মায়েরা তাদের সন্তানদের দুগ্ধ দেবে এবং নিজেদেরকে বিরত রাখবে।

(সূরা বাকারা ঃ ২৩৩ ও ২৩৪)

এই ধরনের আরও অনেক আয়াতে কথাটি সংবাদ আকারে বলা হলেও মূলত তা আদেশ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى -

এবং পাথেয় গ্রহণ কর। কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

মুজাহিদ ও শা'বী থেকে বর্ণিত, ইয়ামেনের কিছু লোক পাথেয় না নিয়েই হজ্জ করতে রওয়ানা হয়ে যেত। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন ঃ পাথেয় বলতে বোঝায় শুষ্ক খাবার ও জয়তুন তেল। বলা হয়েছে, এক শ্রেণীর লোক তাদের পাথেয় দূরে নিক্ষেপ করে দিত এবং 'ভরসাকারী' নাম ধারণ করত। যখন তাদেরকে বলা হয়, খাবার-দাবার জিনিস পাথেয় হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের বোঝা লোকদের উপর চাপিয়ে দিও না। কারোর মতে তার অর্থ— নেক আমলকে পাথেয় বানাও। কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতে দুটি পাথেয়র কথাই শামিল রয়েছে। একটি হচ্ছে খাবার জিনিসের পাথেয় আর অপরটি তাকওয়া। কাজেই এই দুটি পাথেয়ই অচল মনে করা

আবশ্যক। কেননা দুটির কোন একটি বিশেষীকৃত করা হয়নি। হজ্জে নেক আমলের পাথেয় গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কেননা তা খুব বেশি বেশি করে সংগ্রহ করার অধিক যোগ্য জিনিস। তাতে নেক আমল করা আমল করা হলে তার সওয়াব দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি পাওয়া যাবে। অপরদিকে ফিসক-ফুজুরী ও নাফরমানীর কার্যাবলীও পরিত্যক্ত থাকবে। যদিও তা সকল সময়ই পরিত্যাজ্য। তবে ইহরাম বাঁধার পর এই নিষেধ অত্যন্ত তীব্র ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ইহরামের সম্মান-মর্যাদা রক্ষার জন্যে এবং একথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে যে, ইহরাম বাঁধার পর ওসব কাজ করা অত্যন্ত বড় গুনাহ। ফলে পাথেয় হিসেবে দুধরনের পাথেয় গ্রহণেরই আদেশ এক সাথে করা হল— খাদ্য এবং তাক্‌ওয়ার পাথেয়। পরে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাক্‌ওয়ার পাথেয় উভয় পাথেয়র মধ্যে অধিক উত্তম। কেননা তার ফায়দাটা স্থায়ী ও চিরন্তন সওয়াব। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা হজ্জে তাওয়াক্কুলকারী হয়ে পাথেয় ছাড়াই রওয়ানা হয়, তাদের হজ্জ বাতিল, পরিত্যাজ্য। বিশেষত তা আল্লাহ্‌র কথারও পরিপন্থী। হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য থাকতে হবে। আর পাথেয় এবং যানবাহনও সে পাথেয়র মধ্যে গণ্য। আল্লাহ্ যাকে হজ্জ করতে বলেছেন, তাকে এই সামর্থ্য সহ হজ্জে যেতে বলেছেন। এই কথাই নবী করীম (স) বলেছেন, যখন তাঁর নিকট استطاعة। —সামর্থ্য বলতে কি বোঝায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ هِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ 'তা হচ্ছে পাথেয় ও যানবাহন'।

হজ্জে ব্যবসায়

কুরআন মজীদে হজ্জ ও সেজন্যে পাথের গ্রহণের কথা বলার পর-পরই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ -

তোমাদের উপর কোন গুনাহ চাপবে না, যদি তোমরা তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে 'ফযল' বা অনুগ্রহ পেতে চাও।

অর্থাৎ আয়াতের প্রথমাংশে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তারা হজ্জের জন্যে পাথেয় গ্রহণের আদেশ প্রাপ্ত। আর উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশে তাদের জন্যেই হজ্জের সফরে ব্যবসায় করা মুবাহ ঘোষণা করেযছন। আবূ ইউসূফ আলা ইবনুস সায়েব আবূ আমামাতাগ্রসূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমি মক্কায় যাওয়ার জন্যে উট ভাস্থায় দিই। তাতে কি আমার হজ্জ হয়ে যাবে ? তিনি বললেন ঃ তুমি তালবিয়া বল না ? আরাফাতে অবস্থান কর না ? প্রস্তর নিক্ষেপ কর না ? বললাম, 'হ্যাঁ, তা সবই করি। তখন তিনি বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে ঠিক তোমার এই প্রশ্নের মতই প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু তিনি তখনই কোন জবাব দেন নি। পরে যখন এই আয়াত ঃ 'তোমাদের উপর কোন গুনাহ চাপবে না যদি তোমরা তোমাদের রব্ব-এর নিকট ফযল চাও' নাযিল হল। তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরাও হাজী।' আমর ইবনে দীনার বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যুল-মাজায ও উক্কায নামে জাহিলিয়াতের যুগে লোকদের দুটি ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের যুগে লোকেরা কেন্দ্র দুটি পরিত্যাগ করে। পরে এই আয়াতটি নাযিল হলে বোঝা গেল, হজ্জের মৌসুমে ব্যবসায় করা নিষিদ্ধ নয়। সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি নিজেকে কিছু লোকের নিকট মজুরীর বিনিময়ে নিযুক্ত করেছি, আমি তাদের খিদমত করি, তারা আমাকে নিয়ে হজ্জ

করে। তাতে কি আমার হজ্জ হয়ে যাবে ? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এরা সেই লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا 'ওরা যা উপার্জন করে তার অংশ ওরা পাবে।' তাবেয়ীন সমাজের বহু সংখ্যক লোক থেকেও এরূপ বর্ণনাই এসেছে। তাঁদের মধ্যে আল-হাসান, আতা, মুজাহিদ ও কাতাদাতা উল্লেখযোগ্য। একথার বিপরীত কোন বর্ণনার কথা আমরা জানি না। সুফিয়ান সওরী আবদুল করীম সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। একজন বেদুঈন বলেছিল, আমি আমার উট ভাড়ায় দিই। আমিও হজ্জ করতে ইচ্ছুক থাকি। আমার জন্যে এ হজ্জটি যথেষ্ট হবে না ? বললেন— না, কোন মতেই না। কিন্তু এটা বিরল মত। জমহুর ফিকাহবিদদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্র কুরআনের বাহ্যিক অর্থের সাথেও সঙ্গতিহীন। আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেন, হজ্জে আল্লাহ্র নিকট থেকে 'ফযল' চাইলে কোন দোষ হবে না। এ তো হাজীদের সম্পর্কেই কথা। কথার শুরুটাও তাদেরই জন্যে। যে সব আয়াত হজ্জে ব্যবসায় মুবাহ করে তার সব কয়টির বাহ্যিক অর্থও তাই। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

অন্যান্য বহু লোকই দুনিয়ায় চলাচল করে আল্লাহ্র ফযল সন্ধান করে। (মুয়যাম্মিল ঃ ২০)

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ -

এবং লোকদের মধ্যে সাধারণ অনুমতি দিয়ে দাও হজ্জ সম্পর্কে। তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসবে। (সূরা হজ্জ ঃ ২৭)

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ .. 'যেন তারা প্রত্যক্ষ করে তাদের জন্যে মুনাফাসমূহ'। (হজ্জ ঃ ২৮)

এই 'মুনাফা' বলতে বিশেষ কোন ধরনের মুনাফার কথা বলা হয়নি। তা সাধারণ এবং সকল প্রকারের মুনাফা তার অন্তর্ভুক্ত। তাতে যেমন দুনিয়ার মুনাফা রয়েছে, তেমনি পরকালীন মুনাফাও।

আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন'। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

হজ্জের সময় এই ব্যবসায় বাণিজ্য হালাল নয়, তা তো বলা হয়নি। এই সব কিছু থেকেই প্রমাণিত হয়, হজ্জ ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ করে না। এই কারণে নবী করীম (স)-এর সময় থেকেই বর্তমান সময় পর্যন্ত মিনায় অবস্থানকালে ও মক্কায় যাবার সময় হজ্জের দিনগুলোতে ব্যবসায় জায়েয করেছেন।

আরাফাতে অবস্থান

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -

তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে, তখন মাশয়ারিল হারামের নিকট আল্লাহ্র যিকির করবে।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথা থেকে বোঝা গেছে যে, আরাফাতে অবস্থান হজ্জের মানাসিকের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যত এমন কোন দলীল এ আয়াতে নেই, যদ্দারা বোঝা যাবে যে, আরাফাতে অবস্থান হজ্জের ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কথার শুরুতে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ -

অতঃপর তোমরা চলতে শুরু কর সেই স্থান থেকে, যেখান থেকে জনগণ চলা শুরু করেছে।

এ আদেশ আরাফাতে অবস্থান ও সেখানে থাকাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। কেননা রওয়ানা হওয়ার আদেশ পালন ওয়াজিব। রওয়ানা হওয়া ফরয হলে সেখানে অবস্থান করাও ফরয হবে, যেন সেখান থেকে রওয়ানা হওয়া যায়। সেখানে অবস্থান না করলে সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার আদেশ পালন করা যায় না।

অবশ্য 'অতঃপর তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে' আল্লাহ্র এই কথাটির তাৎপর্যে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস (রা), আতা, আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাতা ও সদ্দীর এই মত বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে আরাফাত থেকে রওয়ানা। এ আদেশ এজন্যে যে, কুরায়শ ও তাদের ধর্মমতের অনুসারী লোকেরা যাদেরকে 'হামস' বলা হতো— মুযদালিফায় অবস্থান করত। আর অন্যান্য সমস্ত আরব আরাফাতে অবস্থান করত। ইসলামের যুগে আল্লাহ তা'আলা এই আদেশ নাযিল করেন। তখন নবী করীম (স) কুরায়শ ও তাদের মতাবলম্বীদেরকে আরাফাতে পৌঁছার ও সেখানে জনগণের সাথে অবস্থান করার আদেশ করলেন এবং পরে এখান থেকেই জনগণের সাথে সাথে রওয়ানা হতে বললেন। দহাকের এই মত বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে মুযদালিফায় অবস্থান করার আদেশ করা হয়েছে এবং ইবরাহীম (আ) যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন সেখান থেকেই রওয়ানা হতে বলেছিলেন কুরায়শদেরকেও। এই মতও এসেছে যে, লোকেরা 'রওয়ানা করেছে' বলে আসলে একলা ইবরাহীম (আ)-কেই বুঝিয়েছেন। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ 'তারা যাদেরকে লোকেরা বলেছিল।' এই লোকেরা বলেও একজন লোকেই বুঝিয়েছেন। কেননা ইবরাহীম (আ) যখন অনুসৃত ইমাম ছিলেন তখনই তাঁকে 'উম্মত' বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বিপুল জনগোষ্ঠী সম্পন্ন উম্মতের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। এই উম্মতই তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করে। কাজেই 'লোকেরা' শব্দ একজন ব্যক্তির ব্যাপারেও প্রয়োগ করা চলে, লক্ষ্য সেই এক ব্যক্তি।

তবে প্রথমোক্ত তাৎপর্যটাই অধিক সহীহ। কেননা আগেরকালের মনীষীরা এতেই একমত। দহাক এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে কোন বিতর্কে নামতে রাজী নন, তাঁর মতটি একান্তই বিরল।

আয়াতে 'লোকেরা' বলা হয়েছে এবং কুরায়শদের রওয়ানা হতে আদেশ করা হয়েছে যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়। কেননা তারাই ছিল বেশির ভাগ লোক, সংখ্যায় কুরায়শ ও তাদের অনুসারী লোক ছিল কম। এজন্যেই 'লোকেরা সেখান থেকে রওয়ানা হল'— বলা হয়েছে।

যদি বলা হয়, "তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হও" কেন বলা হল, তার পরে পরে বলা হল, 'পরে তোমরা সেখান থেকে রওয়ানা হও, যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়।' এখানে পরম্পরা বিন্যাস তো অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। আমরা জানলাম যে, এই রওয়ানা হওয়াটা আরাফাত থেকে রওয়ানা হওয়ার পরবর্তী কাজ। এর পরবর্তী রওয়ানা হওয়াটা তো হয়

মুযদালিফা থেকে— যাকে 'মাশয়ারিল হারাম' বলা হয়েছে। কাজেই প্রথম রওয়ানা হওয়াটা আরাফাত থেকে রওয়ানা বুঝতে হবে। কেননা আরাফাত থেকে রওয়ানা হওয়ার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। কাজেই এখানে পুনরায় তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'অতঃপর তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকের রওয়ানা হয়' কথার শুরুর সাথে সম্পর্কিত, যেখানে হজ্জ করার আদেশ করা হয়েছে ও তার মানাসিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সেই সংক্রান্ত কাজকর্মের কথা বলা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে, 'কুরায়শ বংশের হজ্জ করার আদেশপ্রাপ্ত হে লোকেরা'.... এ কথা পূর্বে আমরা যে বলেছি, 'তোমরা রওয়ানা হও, যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়।' ফলে তা এই আদেশ প্রাপ্ত লোকদের প্রতি সম্বোধনের সাথে সম্পর্কশীল হবে। এই কথাটি ঠিক তেমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْٓ اَحْسَنَ -

পরে আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম যা মঙ্গলজনক নীতি গ্রহণকারী মানুষের প্রতি ছিল নিয়ামতের পূর্ণতা বিধায়ক। (সূরা আন'আম ঃ ১৫৪)

এর অর্থ হল, পূর্বে তোমাদেরকে যা যা বলেছি, তার পরে তোমাদেরকে এই খবরও দিয়েছি যে, মূসাকে আমরা এমন একখানি কিতাব দিয়েছি, যা পুরামাত্রায় উত্তম নীতি বাহক। এখানে ثُمَّ অর্থ واو অর্থাৎ এবংও হতে পারে। তাহলে মোট কথাটি দাঁড়ায় এইঃ 'তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 'পরে, তারা সেই লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল, যারা এনেছে।' ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَفْعَلُوْنَ পরে অর্থাৎ 'আল্লাহ্ সাক্ষী তোমাদের কাজকর্মের উপর।' ভাষাগতভাবে এটা প্রচলিত। তা ছাড়া আগেরকালের ফিকাহবিদগণ থেকেও সেই বর্ণনা এসেছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেটাকে বাদ দিয়ে অন্যদিকে ফিরে যাওয়া জায়েয হতো না।

তুমি বলেছ, 'তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হও'-এর মধ্যে আরাফাত-এর উল্লেখ রয়েছে। তাই পরে তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে-এর মধ্যে আবার আরাফাতের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কথাটি ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে' কথাটিতে আরাফাতে অবস্থান ফরয হওয়ার কোন দলীল নেই। বরং 'পরে তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে', এটি আদেশ। যে কুরায়শরা আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করে না, তাদের জন্যেই এই আদেশ। তাতে আরাফাতের অবস্থান ফরয প্রমাণিত হয়, যা 'যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা হলে' কথাটি শামিল করেনি। কেননা 'তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হলে' কথাটি আরাফাতে অবস্থান ফরয করে না। তা সত্ত্বেও যদিও 'তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হলে' কথাটিই শুধু বলা হতো, তাহলে কেউ ধারণা করতে পারে যে, তা সম্বোধন তাদের জন্যে যারা আরাফাতে অবস্থান করে। যারা সেখানে অবস্থান করে না, তাদের জন্যে এই সম্বোধন নয়। ফলে যারা আরাফাতে অবস্থান করে না তাদের সকলের জন্যেই মুযদালিফায় অবস্থান করার আদেশ হয়েছে, আরাফাতে নয়। লোকদের এই ধারণা বাতিল করে দেয়া হয়েছে এই কথাটি বলে ঃ 'অতঃপর তোমরা রওয়ানা হও, যেখান থেকে সব মানুষ রওয়ানা হয়।'

তা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, আরাফাতে অবস্থান না করলে তার হজ্জই হবে না। এই কথা নবী করীম (স)-এর কথা ও কাজ উভয় থেকেই প্রমাণিত। বুকায়র ইবনে আতা আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদ-দেয়লী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, হজ্জ কি ভাবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَلْحَجُّ يَوْمَ عَرْفَةَ، مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ اَوْ يَوْمَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ -

হজ্জ হচ্ছে আরাফার দিন। যে লোক একত্রিত হওয়ার রাত্রে ভোরের আগে আরাফাতে আসবে অথবা আসবে একত্রিত হওয়ার দিন, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

শ'বী, উরওয়াতা ইবনে মদরস তাঈ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন, মুযদালিফায় যে লোক আমাদের সঙ্গে এই নামায পড়বে এবং আমাদের সাথে এই অবস্থান স্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে, তার পূর্বে এক রাত বা এক দিন সে আরাফাতে অবস্থান করল, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হল এবং তা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলল। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, উবনুয যুবায়র ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِذَا وَقَفَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ -

ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে থেকে যে আরাফাতে অবস্থান করল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। যে লোক এক রাত্রি আরাফাতে অবস্থান করল না, তার ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তাদের সকলেই বলেছেন, দিনের বেলা অবস্থান করলেও হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সেখান থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে রওয়ানা হলে— চলে গেলে তাকে একটি পশু যবেহ করতে হবে। এটা হানাফীদের মত। অবশ্য ইমামের পূর্বে ফিরে না যাওয়া শর্ত। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, পরবর্তী রাত্রির ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত যদি ফিরে না যায়, তা হলে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর সঙ্গীরা মনে করেছেন, ইমাম মালিক একথা বলেছেন এজন্যে যে, তাঁর মাযহাবে দিনের বেলা নয়— রাত্রি বেলা আরাফাতে অবস্থান করা ফরয। দিনের বেলা অবস্থান করা ফরয নয়। তা বড়জোর মসনূন।

ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণিত, যে লোক আরাফাত থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে চলে যাবে, তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমোক্ত কথাটির সত্যতার দলীল হচ্ছে, উরওয়াতা ইবনে মদরস বর্ণিত হাদীসে উক্ত রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ যে লোক তার পূর্বে রাত্রে বা দিনে আরাফা থেকে রওয়ানা হয়ে গেল, তার হজ্জ পূর্ণ হবে। এরপর সে তার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করবে। এতে হজ্জ সহীহ হওয়ার ও তার সম্পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে দুইটি সময়ের যে-কোন একটি সময়ে অবস্থান করলেই হবে রাতে বা দিনে। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা প্রমাণ করে ঃ 'তোমরা রওয়ানা হও যেখান থেকে লোকেরা রওয়ানা হয়েছে,' এতে আরাফাত থেকে রওয়ানা হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। ফলে কথাটি এই দাঁড়ায় ঃ 'তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা হও'....... এতে রাত বা দিনকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তাতে কোন সময়েরও উল্লেখ করা হয়নি। অতএব তা যে-কোন সময়ের অবস্থানকেই জায়েয করে দিয়েছে। বিবেচনা করলেও তা-ই প্রমাণিত হয়। আমরা হজ্জের সব মানাসিক-এর সূচনা দিনের বেলায়ই দেখতে পাই। পরে আনুসঙ্গিকভাবে

অবশ্য রাত্র এসে যায়। কেবল রাত্রেই তা হতে হবে এমন কথাও নেই। রাত্র ছাড়া অন্য সময় করলে তা সহীহ হবে না, তা-ও বোঝা যায় না। কাজেই যিনি রাত্রিকালে অবস্থান করা ফরয বলেছেন, তা শরীয়াতের মৌল নীতি পরিপন্থী। যিয়ারত, তওয়াফ, মুযদালিফায় অবস্থান, প্রস্তর নিক্ষেপ, পশু যবেহ করা ও মাথা মুণ্ডন করা সবই দিনের বেলায় করা হয়। যে কাজ রাত্রে করা হয়, তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময় বিলম্বিত করে দিনের আনুসঙ্গিক কাজ হিসেবে। কাজেই এই হুকুমটা আরাফাতে অবস্থানের জন্যেই মনে করতে হবে।

তাছাড়া মুসলিম উম্মত সম্মিলিতভাবেই বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স)-এর দিনের বেলায় আরাফাতে অবস্থানের কথা। তা আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। বোঝা গেল, আরাফাতে অবস্থান দিনের বেলায়ই হতে হবে। সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হচ্ছে সূর্যাস্তের পর। কাজেই অবস্থানের সময়ও রওয়ানা হওয়ার সময় অভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই রাত্রটা অবস্থান করা ফরয হতে পারে না। তাছাড়া এ নামই দেয়া হয়েছে 'আরাফাতের দিন'। এ নাম নবী করীম (স) থেকে বহু সংখ্যক হাদীসের মাধ্যমে। 'আল্লাহ এই আরাফাতের দিন ফেরেশতাদের সাথে আত্মগৌরব প্রকাশ করেন,' 'আরাফার দিনের রোযা এক বছরের রোযার সওয়াব দেয়' প্রভৃতি ধরনের কথাও হাদীসে এসেছে। এই কারণে মুসলিম উম্মত আরাফাতে অবস্থানের জন্যে দিনের বেলাকে ফরয হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। রাত্রিবেলা আরাফাতের অবস্থান হতে পারে তার, যে দিনের বেলার অবস্থান হারিয়েছে। বিবেচ্য এই যে, যখন বলা হয় জুমআর দিন, কুরবানীর দিন বা ঈদুল ফিতরের দিন, তখন বোঝাই যায়, সংশ্লিষ্ট কাজ এই দিনগুলোতেই সম্পন্ন করতে হবে। এ কারণেই দিনের উল্লেখ করা হয়েছে, রাত্রের কথা বলা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আরাফাতের অবস্থান দিনের বেলায়ই করতে হবে। রাত্রিবেলা তা করা যেতে পারে কাযা স্বরূপ। যে দিনের বেলায় পারেনি, সে রাত্রিবেলায় অবস্থান করে তার কাযা আদায় করবে। যেমন প্রস্তর নিক্ষেপের কাজ রাত্রিবেলা করা হয় দিনের বেলায় করতে না পারার কারণে। তওয়াফ, পশু যবেহ ও মাথা মুণ্ডনের ব্যাপারটিও তেমনি।

আরাফাতের বিশাল ময়দানে কোথায় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে, সে বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। যুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

كُلُّ عَرَفَاتَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مَحَسِّرٍ -

আরাফাতের সকল স্থানই অবস্থান স্থান। তবে আরেনা থেকে উঠে যাও। মুযদালিফারও সব স্থানই অবস্থান স্থান। তবে মুহাস্‌সর উপত্যকা থেকে উঠে যাও।

জাবির (রা) রাসূলে করীম (স)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'সমস্ত আরাফাতই অবস্থান স্থান। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 'আরেনা উপত্যকা থেকে উপরে উঠে যাও। মিম্বর তার প্রবাহ স্থান থেকে সরে। তার উপরে যা আছে তা-ও অবস্থান স্থান। নবী করীম (স) সূর্য অস্ত যাওয়ার পরই আরাফাত ত্যাগ করে চলে গেছেন, এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। বর্ণিত হয়েছে যে, জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা সূর্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে আরাফাত ত্যাগ করত। তখন সূর্য যেন তাদের মুখমণ্ডলে লোকদের পাগড়ী হয়ে দাঁড়াত। আর তারা মুযদালিফা ত্যাগ করত সূর্য উদয় হওয়ার পর। কিন্তু নবী করীম (স) এসব ক্ষেত্রে আগের নিয়মের বিপরীত নিয়ম চালু করেছেন। তিনি আরাফাত ত্যাগ

করেছেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর-পরই। আর মুযদালিফা থেকে চলে গেছেন ফজর উদয় হওয়ার আগেই। সালমাতা ইবনে কুহায়ল হাসানুল আরনী ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) আরাফাতের দিনে জনগণকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিয়েছেন। বলেছেন ঃ 'হে মানুষ! ঘোড়া বাধ্য করায় এবং উট ধ্বংস করায় কোন পূণ্য নেই। বরং উত্তম সুন্দর ভ্রমণই কাম্য। তোমরা দুর্বলকে কষ্টে ফেলবে না, কোন মুসলিমকে পীড়ন করবে না।

হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতা উসামা ইবনে জায়দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে চলতে শুরু করতাম আরাফাত ত্যাগ করা কালে। তবে যখন চলার জন্যে পথ উন্মুক্ত পাওয়া যেত।

একত্রতা সহকারে অবস্থান গ্রহণ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -

তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে, তখন মুযদালিফায় এসে আল্লাহ্‌র যিকির করবে।

'মাশয়ারিল হারাম' বলে মুযদালিফাকে বুঝিয়েছেন, তা-ই সে স্থানের নাম। এ বিষয়ে মনীষিগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এই যিকির অর্থ মাগরিব ও এশার নামায একত্র করে মুযদালিফায় পড়তে হবে। আর وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ 'এবং তাঁর যিকির কর যেমন তোমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে'। এই 'যিকির' হচ্ছে তা, যা মুযদালিফায় সকালের দিকে একত্রে করা হয়। দুটি যিকির এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। নামাযকে যে যিকির বলা হয় তা কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا -

যে লোক নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকবে বা তা পড়তে ভুলে যাবে, তা যেন সে পড়ে যখন তার কথা স্মরণ হবে।

এর পর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেছেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -

তুমি নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্যে।

এ আয়াতে নামাযকে 'যিকির' নাম দেয়া হয়েছে। এই কারণে শুরুতে উদ্ধৃত আয়াতে দাবি হচ্ছে মাগরিবের নামায বিলম্বিত করা ও মুযদালিফায় এশার নামাযের সাথে এক সাথে পড়া। উসামা ইবনে জায়দ (রা) রাসূলের সাথে সহ-আরোহী হয়ে আরাফাত থেকে মুযাদালিফায় এসেছেন। মুযদালিফার পথে তিনি রাসূলকে বললেন ঃ নামায ? তিনি বললেন, নামায তোমার সম্মুখে। পরে মুযদালিফায় পৌঁছার পর মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়লেন।

নবী করীম (স) মাগরিব ও এশার নামায মুযদালিফায় একত্রে পড়েছেন, তা বহু মুতাওয়াতির হাদীস থেকে প্রমাণিত।

মুযাদালিফায় পৌঁছার পূর্বেই যে লোক মাগরিব পড়ে নিল, তার সম্পর্কে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা রয়েছে। আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ বলেছেন, তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে না। আবূ

ইউসূফ বলেছেন, তা-ই যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যখন তোমরা আরাফাত থেকে রওয়ানা দেবে তখন মুযদালিফায় আল্লাহ্‌র যিকির করবে'— এই যিকির-এর অর্থ যদি হয় নামায তাহলে মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বে নামায পড়া যেতে পারে না। নবী করীম (স)-এর পূর্বোদ্ধৃত কথা ঃ 'নামায তোমার সামনে' থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। তার এই অর্থ গ্রহণ উত্তম, অবস্থানকালে দুই নামায একত্রে পড়াই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্‌র 'এবং তাঁর যিকির কর যেমন তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন' কথাটিও প্রমাণ করে যে, মুযদালিফায় অবস্থানকালে দুই নামায একত্রে পড়ার কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে দুটি যিকির-এর কথাটি আমরা নামায অর্থে গ্রহণ করব। তাহলে দুটি যিকিরকেই যথাযথ মূল্য ও গুরুত্ব দেয়া হবে এবং তাতে পুনরুক্তির দোষ থেকেও বাঁচা যাবে। উপরন্তু 'অতঃপর তোমরা মাশ্‌য়ারিল হারামের নিকট আল্লাহ্‌র যিকির কর' আল্লাহ্‌র এই আদেশটি পালন ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তবে দুই নামায একত্রে পড়া সকলের মতে ওয়াজিব নয়। মাগরিব নামায একত্র করে পড়ার কথা যখন ধরা হবে, তখন তার দাবি কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার উপরই বর্তিবে। অতএব সেই অর্থেই তা গ্রহণ করা কর্তব্য।

মুযাদালিফায় অবস্থান গ্রহণ পর্যায়ে মনীষিগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। তা ফরয কিংবা ফরয নয়, এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কিছু লোক বলেছে, এটা হজ্জের একটি ফরয। যে তা করতে পারবে না, তার হজ্জ হবে না। সে ঠিক আরাফাতে অবস্থান হারানোর মতই হয়ে যাবে। জমহুর আলিমগণ বলেছেন, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মুযদালিফায় অবস্থান না করার দরুন তার হজ্জ বিনষ্ট হয়নি। তার দলীল হচ্ছে, মুযদালিফায় অবস্থান ফরয নয়। যেমন নবী করীম (স) থেকে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদদেয়লী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, আরাফাই হচ্ছে হজ্জ। ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে যে লোক সেখানে অবস্থান করবে, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। অপর কোন কোন হাদীসের ভাষা হচ্ছে ঃ مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ 'যে লোক আরাফা পেল, সে হজ্জ-ও পেয়ে গেল।' وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ 'আর যে লোক আরাফা হারাল, সে হজ্জ-ও হারাল।' এ হাদীসের আলোকে হজ্জ সহীহ হওয়ার হুকুম দেয়া যায় আরাফাতে অবস্থান পাওয়া গেলেই। তবে দুই নামায একত্রে পড়ার যে অবস্থান— তা হজ্জ সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত করা হয়নি। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণ হয়। লোকেরা সে হাদীসটি এই বলে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) তাঁর পরিবারবর্গের দুর্বল স্বাস্থ্যের— কোন কোন হাদীসে দুর্বল লোকদের সাথে মুযদালিফার রাত্রে সাক্ষাৎ করে বলেছেন, তোমরা সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত আকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপের কাজ করবে না। মুযদালিফায় অবস্থান যদি ফরয হতো তাহলে তিনি দুর্বলতার কারণে তা তরক করার রুখসত কখনই দিতেন না। যেমন দুর্বলতার কারণে আরাফাতে অবস্থান তরক করার কোন রুখসত দেন নি। কেননা তারা সেখানে রাত্রিবেলা অবস্থান করছিল, তা-ই ছিল সেখানে অবস্থানের সময়। সালিম ইবনে উমর মুযদালিফা থেকে দুর্বল লোকদেরকে আগে ভাগে পাঠাবার হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী। তিনি তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে আগে ভাগে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। তারা রাত্রে মাশয়ারিল হারামে অবস্থান করত। সেখানে তাদের পক্ষে যে যিকির সম্ভব হতো তাই তারা করত। পরে সেখান থেকে তারা রওয়ানা হয়ে যেত। বলা হয়েছে, মুযদালিফায় অবস্থানের সময় হচ্ছে ফজর উদয় হওয়ার পর। লোকেরা নবী করীম (স)-এর সেখানে ফজর উদয় হওয়ার পর অবস্থান করেছেন বলে

বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে সেখানে অবস্থান গ্রহণের আদেশ করেন নি, যখন তাদেরকে রাত্রি বেলায় তরান্বিত করেছেন। সেটাই যদি সেখানে অবস্থানের সময় হতো তা হলে তিনি তাঁদেরকে সেজন্যে আদেশ করতেন। সে অবস্থান ত্যাগ করার অনুমতি দিতেন না। কেননা তা তারা কোনরূপ ওযর ছাড়াই করতে পারত। ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনা থেকে যা জানা যায়, তা তো তাঁর কাজের বর্ণনা। তাও নবী করীম (স) থেকে পাওয়া যায়নি, ইবনে উমর একথাও বলেন নি যে, এটাই অবস্থানের সময়। এটা ছিল মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ। মিনাতে পৌছার পূর্বে যে যিকির করার কথা বলা হয়েছে, তা বলা যায় অবস্থানের সময় ফজর উদয় হওয়ার পর পর্যন্ত। 'মানাসিক' পর্যায়ের সমস্ত কাজের সময় হিসেবে আমরা দিনের উল্লেখ পেয়েছি। রাত তার সাথে যুক্ত হয় আনুসঙ্গিক হিসেবে— যেমন পূর্বে বলেছি। মুযদালিফায় অবস্থান যারা ফরয বলেন, তাঁরা এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে দলীল বানিয়েছেন ঃ তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে, তখন মাশয়ারিল হারামে আল্লাহ্র যিকির করবে। হ্যাঁ, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে তা ফরযই হয়। তারা মতরস ইবনে তরীক কর্তৃক শ'বী উরওয়াতা ইবনে মুদরস সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকেও দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে— রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا وَالْاِمَامُ وَاقِفٌ فَوَقَفَ مَعَ الْاِمَامِ ثُمَّ اَفَاضَ مَعَ النَّاسِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلَا حَجَّ لَهُ -

যে লোক মাগরিব-এশা একত্রে পড়ল, ইমাম ও অবস্থান গ্রহণকারী হল সে ইমামের সাথে অবস্থান করল, পরে সেখান থেকে লোকজনের সাথে রওয়ানা হয়ে গেল, সে নিঃসন্দেহে হজ্জ পেল। যে তা পেল না, তার হজ্জ হল না।

ইয়ালা ইবনে উবাইদের সুফিয়ান বুকাইর ইবনে আতা আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদদেয়লী সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসও তাদের দলীল। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتَ، فَاَقْبَلَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَسَئَلُوْهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ وَمَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ -

আমি রাসূলে করীম (স)-কে আরাফাতে অবস্থান করতে দেখেছি। তখন নজদের কিছু লোক তাঁর নিকট এসে হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ হজ্জ তো আরাফায় অবস্থান। আর যে লোক সকাল বেলার আগেই মাগরিব-এশা একত্রে পড়তে পারল (মুযদালিফায় অবস্থান করে) সে হজ্জ পেল।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যিকির কর মাশয়ারে হারামের নিকট' এতে তাদের কথার কোন দলীল নেই। কেননা এতে যিকির করার হুকুম করা হয়েছে। কিন্তু সকলেই একমত যে, সেখানে যিকির ফরয নয়। তা না করলে হজ্জের কোন ক্ষতি লোকসান হবে না। আর এ আয়াতে মুযদালিফায় অবস্থান করারও কোন আদেশ নেই। ফলে একে দলীল রূপে পেশ করা চলে না।

তা সত্ত্বেও আমরা বলেছি যে, এই 'যিকির' বলতে সেখানে মাগরিব নামায পড়া বুঝিয়েছেন। মুতরাফ ইবনে তরীকের শবী সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি মুতরাফ ছাড়া আরও পাঁচজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যাকারিয়া ইবনে আবূ জাবেদা, আবদুল্লাহ ইবনে আবুস সফর ও সাইয়ার প্রমুখ। তাঁরা শবী— উরওয়াতা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ صَلّٰى مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هٰذَا الْمَوْقِفَ وَاَفَاضَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَرَفَةَ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ -

যে লোক আমাদের সাথে এই নামায পড়ল ও এই অবস্থান স্থানে অবস্থান করল এবং তার পূর্বে রাত্রে বা দিনে আরাফাত থেকে রওয়ানা হয়ে গেল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল, সে তার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করবে।

তাঁদের কেউই উল্লেখ করেননি তার হজ্জ হয়নি বলে রাসূল (স) বলেছেন। তা সত্ত্বেও ফিকাহ্‌বিদগণ একমত হয়ে বলেছেন, সেখানে (মুযদালিফায়) নামায না পড়ায় হজ্জ নষ্ট হবে না। নবী করীম (স)-ই তা বলেছেন। অবস্থানের ব্যাপারটিও তাই। তার কথা 'তাঁর নজ্জ নেই'-এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, তিনি হজ্জের ফযিলত না হওয়ার কথা বলেছেন। হজ্জই হবে না, এমন কথা তিনি বোঝাতে চান নি। যেমন রাসূল (স) বলেছেনঃ

لَاوَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

অযূ করার সময় বিসমিল্লাহ না বললে অযূ হবে না।

হযরত উমর (রা) বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদীস পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, 'তার হজ্জ হবে না' অর্থাৎ হজ্জের ফযিলত হবে না। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদ দেয়লীর নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর সুফিয়ান— বুকাইর ইবনে আতা— আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলেছেন ঃ

مَنْ وَقَفَ قَبْلَ اَنْ يَّطْلِعَ الْفَجْرُ فَقَدْتَمَّ حَجُّه -

যে লোক ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে অবস্থান করল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

বোঝা গেল, এ অবস্থান বলতে আরাফাতের অবস্থান বুঝিয়েছেন এবং তা হজ্জ সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে শর্ত। যে সব বর্ণনাকারী ফজরের পূর্বে একত্রিত করে মাগরিব-এশা পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের ধারণা ভুল। আর আসলেও তা ভুল না হয়ে যায় না। বহু মানুষ সেখানে ফজর উদয় হওয়ার পরে নবী করীম (স)-এর অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর থেকে এমন বর্ণনা আসেনি, যাতে তিনি সেখানে রাত্রিকালে অবস্থান করতে আদেশ করেছেন বলে উল্লেখ হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে সব সহীহ বর্ণনায় ঃ 'যে লোক আমাদের সাথে নামায পড়ল, পরে এই অবস্থান স্থানে, আমাদের সাথে অবস্থান করল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেছে' এবং আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামারের সব বর্ণনা— যাতে তিনি বলেছেন ঃ 'যে লোক আরাফা পেল, সে হজ্জ পেয়ে গেল, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল' এবং 'যে আরাফা হারাল, সে হজ্জ-ও হারাল' এই সব বাক্য সম্বলিত বর্ণনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ সবের প্রেক্ষিতে মুযদালিফায় অবস্থানকে

যাঁরা হজ্জের জন্যে শর্ত করেন, তাঁদের কথা অস্বীকৃত হয়ে যায়। সম্ভবত আসম্ ও ইবনে উলিয়াতাই এই ধরনের কথা বলেছেন।

যুক্তির দিক দিয়ে তাঁরা এই দলীল দিয়েছেন যে, হজ্জে দুটি অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। আমরা তার একটি অবস্থানের ফরয হওয়া একমত হয়েছে মেনে নিয়েছি। তা হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান। তাই অপর অবস্থানটিও ফরয হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ দুটির উল্লেখ কুরআন মজীদে করেছেন। যেমন তিনি রুকূ ও সিজদার উল্লেখ করেছেন। নামাযে এই দুটিই ফরয। তাকে বলা যাবে, এ দুটিই যখন কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে, তখন এই দুটি ফরয, এরূপ বলা ভুল। কেননা তাতে এই নীতি গ্রহণ করতে হয় যে, কুরআনে যে জিনিসেরই উল্লেখ হয়েছে, তা অবশ্যই ফরয হবে। কিন্তু একথাটি সত্যের বিপরীত। তাছাড়া আল্লাহ অবস্থান করার কথা তো বলেন নি, বলেছেন ঃ মাশয়ারিল হারামে আল্লাহ্র যিকির-এর কথা। আর যিকির সকলের মতে ফরযও নয়। তাহলে অবস্থান ফরয হবে কি করে ? কাজেই এই যুক্তির ভিত্তিতে মুযদালিফায় অবস্থান প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে আরাফাতে অবস্থান ফরয, এর উপর কিয়াস করে মুযদালিফায় অবস্থান ফরয হবে— এই কথা বলা হলে এই কিয়াসের ইল্লাত সহীহ হওয়ার দলীল আবশ্যক। কিন্তু সে রকম কোন দলীল নেই।

তাকে এ-ও বলা যাবে যে, নবী করীম (স) মক্কায় পৌছে তওয়াফ ও সাঈ' করেছিলেন। পরে কুরবানীর দিনও তওয়াফ করেছিলেন। আবার তওয়াফ করেছিলেন, তা করার জন্যে আদেশও করেছিলেন। তাহলে এই সব কয়টি তওয়াফের হুকুম একই হবে এবং সবই ফরয হবে ? এর কোনটি ফরয আর কোনটি অ-ফরয অর্থাৎ মুস্তাহাবও তো হতে পারে। আর তা যখন হতে পারে, তখন মাযদালিফায় অবস্থানটাও তেমনি হতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। এক কথায় কোন অবস্থান— যেমন আরাফাতে ফরয এবং কোনটি মুস্তাহাব— যেমন মুযদালিফায়-মুস্তাহাব হওয়া খুবই সম্ভব।

আল্লাহ্র কথা

فَاذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ -

তোমরা যখন তোমাদের হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন সম্পূর্ণ করে ফেলবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকির কর, যেমন করে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাকে স্মরণ কর।

'মানাসিক কাযা করা' অর্থ সব কাজ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا -

যখন তোমরা নামায পূর্ণ মাত্রায় আদায় করে ফেলবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকির কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও বসে বসে। (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

অপর আয়াত ঃ

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ -

যখন নামায সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়।

(সূরা জুম'আ ঃ ১০)

রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ

فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا –

যা তোমরা পেলে তাতে নামায পড়, আর যা হারালে তা কাযা কর।

অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় আদায় কর।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির কর তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে যেমন করে তোমরা স্মরণ কর।' এর দুটি ব্যাখ্যা বলা হয়েছে। একটি— সমস্ত মানাসিকের জন্যে নির্দিষ্ট যিকিরসমূহ করা। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ –

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তোমরা তাদেরকে তালাক দেবে তাদের ইদ্দত পালন হিসেবে এবং সে ইদ্দত তোমরা গণনা করবে।

তালাক দেয়ার আগের জন্যে এই নির্দেশ। যেমন বলা হয় ঃ যখন হজ্জ করবে তখন গোসল কর এবং যখন নামায পড়বে, তখন অযূ কর।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ –

যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর।

অর্থাৎ অযূ কর। এটাও নামাযের আগে করণীয় কাজ। এই আদেশটাও সেই ধরনেরই ঃ তোমরা যখন তোমাদের মানাসিক আদায় করতে যাবে তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির কর।

হতে পারে মসনূন যিকিরসমূহ করার আদেশ করা হয়েছে, যা আরাফাত ও মুযদালিফায় এবং পাথর নিক্ষেপ ও তওয়াফের সময়ে করার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এ-ও বলা হয়েছে যে, জাহিলিয়াতের লোকেরা মানাসিক আদায় করার সময় দাঁড়িয়ে বাপ-দাদার কীর্তিকলাপ ও গৌরবময় কার্যাবলীর স্মরণ ও উল্লেখ করত। আল্লাহ্ সে সবের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র যিকির করার, তাঁর নিয়ামতের শোকর করার ও তাঁর তারীফ-প্রশংসা করার আদেশ করেছেন। তাই নবী করীম (স) আরাফাতের ভাষণে বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالْاٰبَاءِ، اَلنَّاسُ مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ اِلَّا بِالتَّقْوٰى –

আল্লাহ্ তোমাদের উপর থেকে জাহিলিয়াতের যুগের গৌরব, অহংকার ও বাপ-দাদার বড়ত্ব প্রকাশের নিয়ম দূর করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম থেকে আর আদম মাটি দিয়ে তৈরী। কোন আরবের শ্রেষ্টত্বের মর্যাদা নেই অনারবের উপর— তবে তাকওয়ার কারণে যা আছে।

এই কথা বলার পর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ –

হে জনগণ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দল, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি শুধু তোমাদের পারস্পরিক পরিচিতির জন্যে। তবে তোমাদের আল্লাহ্‌র নিকট সবচাইতে বেশী সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন। (সূরা হুজরাত ঃ ১৩)

এই গোটা আয়াতই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরা যেমন তাদের বাপ-দাদাদের নিয়ে গৌরব-অহংকার করত, তার প্রতিবাদ ও পরিবর্তন সাধনের জন্যেই আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা এসেছে।

মিনায় অবস্থানের দিনগুলো ও সেখান থেকে চলে যাওয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ -

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির কর সেই গণনা করা দিন কয়টিতে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে দুই দিনে কাজ শেষ করবে, তার কোন গুনাহ্ হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, সুফিয়ান ও শুবা বুকাইর ইবনে আতা— আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদ-দেয়লী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَيَّامُ مِنًى ثَلٰثَةٌ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ -

মিনায় অবস্থানের দিন হচ্ছে তিনটি। তা-ই আইয়ামে তাশরীক। যে লোক শীঘ্র চলে যাবে, তার কোন গুনাহ হবে না, আর যে বিলম্ব করবে তার-ও কোন গুনাহ হবে না।

মনীষিগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি উপরোক্ত আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা। এ বিষয়েও তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই যে, এই গুনাহকৃত দিন বলতে তাশরীকের দিন কয়টি বুঝিয়েছেন। আলী, উমর, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকেও সেই কথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনে আবূ লায়লা মিনহাল-জুর আলী সূত্রে একটু ভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই গণনাকৃত দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন এবং তার পরের দুই দিন। তাতে তুমি যা-ই চাও যবেহ করতে পার। বলা হয়েছে, এটা একটা ভুল ধারণা। সহীহ কথা হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তা জ্ঞানের আওতাভুক্ত। কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থ তাকে অস্বীকার করে। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যে লোক তাড়াহুড়া করবে, দুই দিনে, তার কোন গুনাহ হবে না।' এই দুই দিন প্রস্তর নিক্ষেপের জন্যে নির্দিষ্ট। (কুরবানীর দিনের মধ্যে গণ্য নয়।) তা আইয়ামের তাশরীকেই করা হয়।

আর 'জ্ঞানের আওতাভুক্ত' পর্যায়ে হযরত আলী ও ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ জ্ঞানের আওতাভুক্ত বলতে বোঝানো হয়েছে কুরবানীর দিন ও তার পরের দুই দিন। এই তিন দিনে তুমি যা চাও যবেহ্ কর। ইবনে উমর বলেছেন, গোণা দিনগুলো হচ্ছে আইয়্যামে তাশরীক। সাঈদ ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, জানা দিন হচ্ছে

দশ, আর গোণা দিন হচ্ছে আইয়্যামে তাশরীক। আর গোণা দিন বলতে কুরবানী দেয়ার দিন, আর তার পরে তিন দিন তাশরীকের। আবদুল্লাহ ইবনে মূসা ইমারাতা ইবনে যাকওয়ান-মুজাহিদ ইবনে আব্বাস (রা)-সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ গোণা দিনগুলো হচ্ছে দশ দিন, আর জানা দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন কয়টি।

তাঁর কথা ঃ গোণা দিন দশ দিন, এটা যে ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন বিশেষজ্ঞই সে কথা বলেন নি। তা কুরআনেরও বিপরীত। আল্লাহ তো বলেছেন ঃ 'যে লোকই দুই দিনেই তাড়াহুড়া করে যাবে, তাতে তার কোন গুনাহ হবে না।' দশ দিনের তিন দিন বাদ দিয়ে দুই দিনের সাথে সম্পর্কিত কোন হুকুম নেই। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, জানা দিনসমূহ দশ আর গোণা দিনসমূহ তাশরীকের দিন। তাবেয়ীনের জমহুরের এই কথা। হাসান, মুজাহিদ, আতা, দহাক ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে ইবরাহীম এ পর্যায়ে উল্লেখ্য।

আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, জানা দিন বলতে দশ দিন, আর গোণা দিনসমূহ হচ্ছে তাশরীকের দিনগুলো। তাহাভী তাঁর শায়খ আহমাদ ইবনে আবূ ইমরান-বাশর ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, আবূল আব্বাস তূসী আবূ ইউসূফকে 'জানা দিনগুলো' অর্থ কি তার প্রশ্ন করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠির জবাবে ইমাম আবূ ইউসূফ লিখেছিলেন ঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলের সাহাবীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। হযরত আলী ও ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তা হচ্ছে কুরবানীর দিন কয়টি। আমার মত-ও তাই। কেননা আল্লাহ তার পরই বলেছেন ঃ

عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ –

আমরা কুরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যে, লোকেরা আল্লাহ্‌র কথা উচ্চরণ করে সেই জন্তুর উপর যা তিনি তাদেরকে রিযিক স্বরূপ দিয়েছেন। (সূরা হজ্জ ঃ ২৮, ৩৪)

আমাদের শায়খ আবুল হাসান আল-কারখী আহমাদুল কারী, মুহাম্মদ আবূ হানীফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ المعلومات। জানা দিনসমূহ হচ্ছে দশ। আর মুহাম্মাদের মতে তা হচ্ছে কুরবানীর তিন দিন— ঈদুল আযহার দিন ও তার পর দুই দিন।

আবূ বকর বলেছেন, আহমাদুল কারীর মুহাম্মাদ থেকে এবং বাশার ইবনুল ওয়ালীদের আবূ ইউসূফ থেকে পাওয়া বর্ণনা হচ্ছে, জানা দিন কুরবানীর দিন ও তার পর দুই দিন। ইমাম আবূ হানীফা যে বলেছেন, জানা দিন হচ্ছে দশ দিন, আর গোণা দিন হচ্ছে আইয়্যাম তাশ্‌রীক। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মশহুর কথা এটিই। আর আল্লাহ্‌র কথাঃ 'যেসব জন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে রিযিক হিসেবে দিয়েছেন ....' এতে কুরবানীর দিন কয়টি হওয়ার কোন দলীল নেই। কেননা এটা জন্তু-জানোয়ারকে রিযিক হিসেবে দেয়ার কথাই হয়ত আল্লাহ বলেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ –

এবং যেন তোমরা আল্লাহ্‌র তাকবীর বল যেমন করে তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

অর্থাৎ যে জন্যে তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। এ-ও হতে পারে যে, তা বলে দশ দিনই বুঝিয়েছেন। কেননা কুরবানীর দিনও এরই মধ্যে রয়েছে। পশু যবেহ এই দিনেই হয়। বছরের বারবার আবর্তনের কারণে বহুদিন হয়ে যায়।

ভাষাভাষীরা বলেছেন— গোণা দিন ও জানা দিন ভিন্ন ভিন্ন। শব্দ থেকেই বোঝা যায় যে, সংখ্যার দিক দিয়ে তা ভিন্ন ভিন্ন। কেননা 'গোণা দিন' বলায় বোঝা যায়, তার সংখ্যা অল্প। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ -

সামান্যতম মূল্যে কয়েক মদ্রার বিনিময়ে (বিক্রয় করে দিল)। (সূরা ইউসুফ ঃ ২০)

عدد বা সংখ্যার বিশ্লেষণ দেয়া হয় পরিমাণে কম বোঝাবার জন্যে। কেননা তা বহুত্বের বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় ঃ কম ও বিপুল। ফলে معدوداتসংখ্যা কৃত বা গোণার অর্থই হয়, তা কম علومات জানার তুলনায়। এই জানা মাস দশটি। মনীষিগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মিনায় অবস্থানের দিন তিনটি। কুরবানীর দিন ও তার পরবর্তী দুই দিন। হাজীর জন্যে সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, দ্বিতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ হয়ে গেলে চলে যেতে পারে। আর তৃতীয় দিন পর্যন্ত যাওয়াকে বিলম্বিত-ও করতে পারে। এই তৃতীয় দিনেও হাজী প্রস্তর নিক্ষেপ করে। তারপরে সেখান থেকে চলে যাবে। দ্বিতীয় দিন সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত-ও যে হাজী মিনা ত্যাগ করে গেল না, তার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। হযরত উমর, ইবনে উমর, জাবির ইবনে জায়দ (রা), আলহান ও ইবরাহীম বলেছে, দ্বিতীয় দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে চলে না গিয়ে থাকলে তৃতীয় দিনে প্রস্তর নিক্ষেপ না করে মিনা ত্যাগ করতে পারবে না। হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, দ্বিতীয় দিনে যুহর পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ হয়ে গেলে হাজী মিনা ত্যাগ করে যেতে পারে। কিন্তু মিনাতে যদি আসর নামাযের সময় হয়ে যায়, তাহলে তাকে তৃতীয় দিন পর্যন্ত থাকতে হবে, তার পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে পারবে না। হানাফী ফিকাহবিদদের মত হচ্ছে, সূর্যের অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যদি মিনা ত্যাগ করে না যায়, তাহলে তৃতীয় দিনে পাথর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তার মিনা ত্যাগ করে চলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্যে তার কর্তব্য হচ্ছে তৃতীয় দিন সকাল পর্যন্ত মিনাতে অবস্থান করা। আর তখনই তার উচিত তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপের কাজ করা। তা না করা তার জন্যে জায়েয হবে না। তৃতীয় দিনও মিনায় অবস্থান করা সত্ত্বেও পাথর নিক্ষেপ না করে মিনা ত্যাগ করা যে জায়েয নয়, এই বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতবিরোধের কথা আমাদের জানা নেই। তাঁরা শুধু বলেছেন, মিনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু থাকার কারণেই তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ তার কর্তব্য হবে না। দ্বিতীয় দিন শেষে যে রাত তার হুকুম হচ্ছে তা সেই দিনের অধীন ও অনুসারী হবে। তার পরের দিনের যে হুকুম তা সে রাত্রির জন্যে হবে না। বিবেচ্য হচ্ছে, প্রথম দিন দিনের বেলা পাথর নিক্ষেপ না করলে বা করতে না পারলে তা পরবর্তী রাত্রে সম্পন্ন করবে। তা হলে তা তার সময় ছাড়িয়ে বিলম্বে করা হল, বলা হবে না। কেননা নবী করীম (স) রাখালদের জন্যে রাত্রিবেলা পাথর নিক্ষেপের রুখসত দিয়েছেন। ফলে রাত্রের হুকুম তাই, যা তার পূর্ববর্তী দিনের হুকুম। সে রাত্রের হুকুম তা হবে না, যা তার পরবর্তী দিনের হুকুম। এই কারণে তাঁরা বলেছেন, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মিনায় অবস্থান তার দিনের বেলার অবস্থানের পর্যায়ে গণ্য। যদি তৃতীয় দিনের সকাল পর্যন্ত মিনায় থেকে যায়, তা হলে সে দিন প্রস্তর নিক্ষেপ করা তার কর্তব্য হবে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। ইমাম আবূ হানীফা তৃতীয় দিনে সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্বেই পাথর নিক্ষেপ জায়েয বলেছেন, কেননা পাথর নিক্ষেপ বাধ্যতামূলক হওয়ার সময়টা যথারীতি হয়ে গেছে। এই কথা সহীহ। তার দলীল উপরে বর্ণিত হয়েছে। কেননা একটা কাজের কর্তব্য হওয়ার সময় হবে অথচ তা করা তখন সহীহ হবে না, তা হতে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمِ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى –

যদি কেউ তাড়াহুড়া করতে গিয়ে দুই দিনেই ফিরে যায়, তা হলে তার কোন গুনাহ্ হবে না। আর যদি কেউ খাওয়া বিলম্বিত করে তা হলেও তার কোন দোষ হবে না— অবশ্য তা তার জন্যে, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছেন।

এ আয়াতের তাফসীরের দুটি দিক তোলা হয়েছে। একটি— সে যে তার কবুলকৃত হজ্জ দ্বারা তার দোষ-ত্রুটি ও গুনাহ্ ক্ষালন করেছে, এ জন্যে তার কোন গুনাহ্ হবে না। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। অনুরূপ বর্ণনা একটি হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجِعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ –

যে লোক হজ্জ করল, কিন্তু রফস করল না, ফিসক-ফুজুরীও করল না, সে যেন তার মায়ের সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে গেল।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এই তাড়াহুড়া করার কারণে তার কোন গুনাহ্ হবে না। আল-হাসান প্রমুখ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। বলেছেন ঃ مَتَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ 'যে বিলম্ব করবে তারও কোন গুনাহ্ হবে না।' কেননা বিলম্ব করা তার জন্যে মুবাহ্। আল্লাহ্‌র কথা ঃ لِمَنِ اتَّقٰى 'তার জন্যে,' যে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে। এর অর্থ এই হতে পারে, ইহরামে নিষিদ্ধ কাজ থেকে যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে দূরে থাকল। তার দলীল হচ্ছে ঃ 'রফস নেই, ফিসক-ফুজুরী নেই, ঝগড়া-ফাসাদ নেই হজ্জে'। যদি এই তাকওয়া অবলম্বিত না হয়, তা হলে তার জন্যে সওয়াবের ওয়াদা নেই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِىْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا –

এমন লোকও আছে, যার কথা বৈষয়িক জীবনে তোমাকে খুশী করে দেবে।

আবূ বকর বলেছেন, কারোর বাহ্যিক কথায় প্রতারিত হওয়ার ব্যাপারে এ আয়াতে সাবধান করা হয়েছে। কেননা বাহ্যিক কথা বেশ মিষ্টি হয়ে থাকে। যা প্রকাশমান তার অন্তর্নিহিত মূল ব্যাপার বুঝবার জন্যে চেষ্টা করার তাগিদ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিছু কিছু লোক আছে যারা মুখে এমন কথা প্রকাশ করে যার বাহ্যিক রূপ তোমাকে খুশী করে দেবে।

وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِهِ –

এবং তাদের দিলে যে কথা গোপন আছে তাতে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী বানায়।

এটা আসলে মুনাফিকদের পরিচিতি। যেমন অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ – اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً –

ওরা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। হ্যাঁ, আল্লাহ্ জানেন যে আপনি তাঁর রাসূল। সেই সাথে আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা চরম মিথ্যাবাদী। ওরা ওদের কিরা-কসম ঢালস্বরূপ বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা মুনাফিকূন ঃ ১)

এ-ও আল্লাহ্র কথা ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ط وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

ওদের প্রতি যদি তুমি তাকাও তাহলে ওদের অবয়ব তোমাকে বিস্মিত করে দেবে। আর ওরা কথা বললে তুমি ওদের কথায় মগ্ন হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তাঁর নবীকে ওদের মনের গোপন গহনে নিহিত কথা-বার্তা সম্পর্কে আগে ভাগে জানিয়ে দিলেন, যেন ওদের কথার বাহ্যিক আকর্ষণে তিনি ধোঁকায় না পড়ে যান। আর এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে আমাদের জন্যে উপদেশ লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন। যেন আমরা লোকদের বাহ্যিক কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ি। কেননা তাদের মনের ক্রোধ-শত্রুতা মনের মধ্যেই গোপন রয়ে যায়, প্রকাশ হতে দেয় না। দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে মুনাফিকদের ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ করা হয়েছে এ আয়াতে। কাজেই দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে মানুষকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে এই নীতি অবলম্বন করা অবশ্যক যে, আমরা শুধু বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হয়ে থাকব না, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনাও করব। এতে এই বিষয়েরও দলীল রয়েছে যে, যাকে বিচার কার্যে ফতোয়া দেয়া, ইমামতি করা বা সাক্ষ্য দানের জন্যে নিযুক্ত করা হবে, তার নির্দেশ হওয়াটা অবশ্যই দেখতে হবে। এসব ও এই ধরনের কাজে যাকেই দায়িত্বশীল বানানো হবে, তাদের বাহ্যিক কথাবার্তা গ্রহণ করা যাবে না। তাকে প্রশ্ন করতে হবে, তাদের অনুপস্থিতিতেই খবরাখবর গ্রহণ ও তার উপর আলোচনা পর্যালোচনা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সামাজিক ব্যাপারাদির দায়িত্বশীল বানাবার বেলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন ও অসতর্কতা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তার পরই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ -

আর যখন তারা দায়িত্ব লাভ করে (কিংবা পেছনে চলে যায়), তখন তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং ফসল ও বংশ ধ্বংস করতে চেষ্টা চালায়।

এ আয়াতে প্রসঙ্গত تَوَلَّى শব্দটির কারণে আমাদের এই শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয়েছে যে, বিভিন্ন দিক দিয়ে বিবেচনা বিচার করে না দেখে কারোর বাহ্যিক কথাবার্তা ও বেশ-বাস দেখে তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়।

আল্লাহ বলেছেন ঃ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ 'এবং সে অত্যন্ত বেশী ঝগড়াটে।'

অর্থাৎ ঝগড়াঝাটিতে তার মুখ চলে খুব বেশী ধারাল হয়ে। বলেছেন ঃ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 'আর আল্লাহ বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা আদৌ পছন্দ করেন না।' এ আয়াতাংশে জবরীয়া ফিরকার মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে, তাকে বাতিল করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, তা তিনি চান-ও না। এবং যার ইচ্ছা করে, তিনি তা পছন্দও করেন না। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ফাসাদ পছন্দ করেন না। আর সেই কারণেই

তিনি ফাসাদ করেনও না। কেননা তিনি যদি তা করতেন, তাহলে তিনি তার ইচ্ছুক হতেন, তা পছন্দও করতেন। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ –

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করতে ইচ্ছুক নন।

একথা বলে তিনি নিজের থেকে জুলুমের কাজটিকে অস্বীকার করলেন। কেননা তিনি যদি তা করতেন, তাহলে তার ইচ্ছুক হতেন। তিনি যা চান না, যার ইচ্ছুক নন, তা তিনি করবেন, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, কোন কাজ হওয়ার জন্যে তাঁর পছন্দই হচ্ছে তার সেজন্যে ইচ্ছার প্রকাশ। তিনি কোন কাজের হওয়াটা পছন্দ করবেন, অথচ তা হবে না, এটা হতেই পারে না। আর হওয়াটা অপছন্দ করলে তো কথাই নেই। তা পরস্পর-বিরোধিতা। তাই কোন কাজের ইচ্ছা করেন, অথচ তা অপছন্দ করেন। তাহলে এরূপ কথাই ম্সত্য ও অসংবদ্ধ। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

যে সব লোক পছন্দ করে যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা প্রসারিত ও বিস্তৃত হোক, তাদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা নূর ঃ ১৯)

এর অর্থ যারা তা চায়। বোঝা গেল, পছন্দ করার অর্থ ইচ্ছা করা। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَحَبَّ لَكُمْ ثَلَاثًا وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا اَحَبَّ لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تُنَاصِحُوْا مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَالْقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ –

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে তিনটি কাজ পছন্দ করেছেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেছেন। তিনি পছন্দ করেছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে একবিন্দু জিনিস শরীক করবে না এবং যাকে তোমাদের সামষ্টিক ব্যাপারদির দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, তার কল্যাণ কামনা ও তাতে নসীহত করবে এবং বাজে কথা বলে বেড়ানো, বেশি বেশি প্রশ্ন করা এবং ধন-মাল বিনষ্ট করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

এ হাদীসে অপছন্দ করাকে পছন্দ করা ও ভালবাসার বিপরীত দাঁড় করানো হয়েছে। তাই বুঝতে হবে, যার তিনি ইচ্ছা করবেন, তা তিনি পছন্দও করেন এবং অনুরূপভাবে যা তিনি অপছন্দ করেন, তার ইচ্ছা তিনি করেন না। কেননা অপছন্দ করাটা ইচ্ছা করার বিপরীত। তাই অপছন্দ করা যখন ইচ্ছ করা ও পছন্দ করার পরিপন্থী সাব্যস্ত হলো, তখন বোঝা গেল, এ দুটিই সমান।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ 'অতএব জেনে নাও যে, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞানী"।

العزيز অর্থ প্রতিরোধক, প্রতিরোধে সক্ষম। কিন্তু তিনি প্রতিরোধ করেন না العزة শব্দের আসল অর্থ বিরত থাকা। আরবী কথা ঃ أرض عزاز জমিন শক্ত, দুর্ভেদ্য, অনমনীয়। আর الحكيم শব্দটি গুণবাচক। আল্লাহ্ সম্পর্কে তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি জ্ঞানবান। তা বোঝাতে চাইলে বলা সঙ্গত হবে যে, তিনি চিরন্তনভাবে সুবিজ্ঞানী। আর দ্বিতীয় অর্থ, সুদৃঢ় নিখুঁত কার্য সম্পাদনকারী। তা বোঝাতে চাইলে বলা যাবে না যে, তিনি চিরদিনই 'হাকীম'। যেমন বলা যায় না, তিনি সর্ব সময় কাজকারী। এ গুণটা তাঁর একান্ত নিজস্ব, স্বতঃই এই গুণে গুণান্বিত। বোঝা গেল, তিনি জুলুম করেন না, নির্বুদ্ধিতা দেখান না। খারাপ বীভৎস কাজও করেন না, তার ইচ্ছাও করেন না। কেননা যে তার ইচ্ছা করবে, সে 'হাকীম' হতে পারে না, এটা সব বিবেক-বুদ্ধিমান মানুষের নিকটই স্বীকৃত। আর এভাবেই জবরীয়া আকীদার বাতুলতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ কথা ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰئِكَةُ -

এই সমস্ত মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়েত দেয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে, তাহলে তারা কি এখনও এই অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ্ মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন?

এটি 'মুতাশাবিহ' আয়াত। অতএব এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে 'মুহকাম' আয়াতের দিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে তারই আদেশ করেছেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ - فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

সেই মহান আল্লাহ্ই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তাতে মুহকাম আয়াত সমূহ রয়েছে— তা-ই কিতাবের মূল। আর অন্যান্য সব মুতাশাবিহ্ আয়াত। যাদের দিলে বক্রতা রয়েছে তারা এই মুতাশাবিহ্ আয়াতের পেছনে পড়ে থাকে (তারই অনুসরণ করে)।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭)

মুতাশাবিহ আয়াত-এর শব্দের হাকীকত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহ্র নিয়ে আসা। এ-ও হতে পারে যে, আল্লাহ্র নির্দেশ বুঝিয়েছে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ -

ওরা কি এই অপেক্ষায় বসে আছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতা আসবে কিংবা আসবেন তোমার রব্ব অথবা তোমার রব্ব-এর কোন কোন আয়াত নিয়ে আসবে?

(সূরা আন'আম ঃ ১৫৮)

এই সবই মুতাশাবিহ আয়াত। যেমন 'অথবা তোমার রব্ব আসবেন।' কেননা আল্লাহ্র আসা, কিছু নিয়ে আসা বা যাওয়া, স্থানান্তর হওয়া, সরে পড়া— এই সব কথা অকল্পনীয়। এ সব তো অবয়বধারীদের পরিচিতি। নতুনত্ব বোঝায় অথচ 'মুহকাম' আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 'তাঁর মত কোন জিনিস নেই।' ইবরাহীম (আ) তারকা নক্ষত্রসমূহের চলাচল ও স্থানান্তর প্রত্যক্ষ করে বুঝেছিলেন, এসব পরে সৃষ্টি হওয়া জিনিস। তাঁর সময়ের জনগণের সম্মুখে যুক্তি পেশ করে বলেছিলেন যে, এর কোনটিই স্রষ্টা বা আল্লাহ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ -

এ হচ্ছে আমার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। আমি এই প্রমাণ ইবরাহীমকে দিয়ে তার জনগণের সম্মুখে পেশ করেছি। (সূরা আন'আম ঃ ৮৩)

অর্থাৎ তারকা-নক্ষত্রসমূহ পরে সৃষ্ট অবয়ব। আল্লাহ এসব থেকে উর্ধ্বে মহান সর্বপ্রকারের সাদৃশ্য থেকে।

যদি বলা হয়, তাহলে 'আল্লাহ বা তোমার রব্ব এসেছেন' এইরূপ কথা বলা কি জায়েয ? এই অর্থে যে, তাঁর কিতাব এসেছে বা তাঁর রাসূল এসেছে কিংবা এই ধরনের অন্য কোন কথা?

জবাবে বলা যাবে, এসব কথা অপ্রত্যক্ষ مجاز আর অপ্রত্যক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখানে, যেখানে আসল প্রত্যক্ষ অর্থ বোঝাবার দলীল থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا -

সেই জনপদকে জিজ্ঞাসা কর, যেখানে আমরা ছিলাম। (সূরা ইউসুফ ঃ ৮২)

আসলে এ আয়াতে জনপদ নয়, জনপদের অধিবাসীদেরই বুঝিয়েছেন। বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -

যে সব লোক আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় .....। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৭)

'আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়' অর্থ, আল্লাহ্‌র ওলী, বন্ধু, সাহায্যকারী, নেক বান্দাদের কষ্ট দেয়। কেননা আগেই বলেছি, অপ্রত্যক্ষ শব্দ সেখানেই ব্যবহৃত হয় যেখানে প্রত্যক্ষ অর্থ বোঝাবার দলীল সেখানে থাকবে। অথবা যা শুনলে শ্রোতার পক্ষে প্রকৃত বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ -

এবং আল্লাহ্‌র নিকটই পরিণত হয় সমস্ত ব্যাপার।

এর দুটি দিক রয়েছে। একটি এই যে, যাবতীয় ব্যাপারই মানুষের করায়ত্ত হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন থাকে। পরে আল্লাহ অনেক ব্যাপার মানুষের কর্তৃত্ব ও পরিচালনাধীন করেছেন। কিন্তু পরকালে যাবতীয় ব্যাপার নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন হয়ে যাবে, মানুষের হাতে কিছুই থাকবে না। এইদিক দিয়ে 'যাবতীয় ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট পরিণত হবে' বলা খুবই সঙ্গত। আর দ্বিতীয় তাৎপর্যটি পাওয়া যাবে এ আয়াতের আলোকে ঃ اَلَاۤ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ 'জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যাবে সব ব্যাপার'। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ কিছুর মালিক হবে না। এটা নয় যে, তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল এখন হয়েছে, বরং কোন সময়ই তার উপর প্রকৃত কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ছিল-ই না।

অপর আয়াতের কথা ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ -

সমস্ত মানুষ অভিন্ন একই উম্মত ছিল। পরে আল্লাহ নবীগণকে পাঠিয়েছেন।

এ আয়াতের তাৎপর্যে বলা হয়েছে, সমস্ত মানুষ কুফরের ভিত্তিশীল এক উম্মত ছিল। যদিও তাদের ধর্মমত বিভিন্ন ছিল। তাদের মধ্যে মুসলিম থাকাও সম্ভব। তবে তারা নিজেরা খুবই কম সংখ্যক ছিল। উম্মত বলতে জামা'আতও বোঝাতে পারে। কেননা উভয়ের মধ্যে বিপুল জনগোষ্ঠী হওয়ার তাৎপর্য রয়েছে। কাতাদাতা ও দহাক বলেছেন, বরং তারা সবই সত্য দ্বীনের উপর এক ও অভিন্ন ছিল। পরে তাদের মধ্যে পার্থক্য ও দলাদলির সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ -

পরে আল্লাহ্ তার অনুমতিক্রমে হেদায়েত করলেন ঈমানদার লোকদেরকে এ জন্যে যে, তাদের মধ্যে 'হক' নিয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে তায়ুস তাঁর পিতা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، بَيْدَ اَنَّ كُلَّ اُمَّةٍ اُوْتُوا الْكِتٰبَ قَبْلَنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللّٰهُ، لَهٗ وَلِلْيَهُوْدِ غَدًا وَلِلنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ -

আমরা সর্বশেষের লোক হলেও কিয়ামতের দিন সকলের আগে-ভাগে থাকব। তবে অন্যান্য সব উম্মতকে আমল-নামা আমাদের পূর্বে দেয়া হবে। আর আমাদেরকে দেয়া হবে তাদের পরে। তাই তাদের এইদিন হচ্ছে তা-ই যে দিনের ব্যাপারে তারা পরস্পর মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছিল। তাই আল্লাহ্ আমাদেরকে এই দিনের (শুক্রবারের) হেদায়েত করেছেন আর ইয়াহুদীদের জন্যে পরের দিন আর খ্রীস্টানদের জন্যে তার পরের দিন।

আমাশ আবূ সালিহ্, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও নবী করীম (স)-এর অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। তবে সে বর্ণনায় হেদায়েত দানের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে শুক্রবার আমাদের জন্যে, পরের দিন ইয়াহুদীদের জন্যে এবং তার পরের দিন খ্রীস্টানদের জন্যে, এ দুটি হাদীসেই মতপার্থক্যের দিন হিসেবে যে দিনটির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে জুম'আর দিন। তবে হাদীসের সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা সমস্ত হক-ই বোঝায়, যার হেদায়েত আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের দিয়েছেন। তার মধ্যে জুম'আর দিন একটি জিনিস।

অর্থ ব্যয় কার জন্যে সর্বপ্রথম করা হবে

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ -

হে নবী! লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তারা ব্যয় করবে ? তুমি বলে দাও, যে সম্পদই তোমরা ব্যয় কর না কেন, তা করবে পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের জন্যে।

মূল প্রশ্নটি ছিল ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে। কিন্তু জবাবটা এসেছে কম-বেশী সম্পর্কে এবং সেই সাথে কাদের জন্যে ব্যয় করা হবে সেই পর্যায়ের। জবাবের প্রথম কথা ঃ ধন-মাল যা-ই খচর কর না কেন। এতে পরিমাণ সম্পর্কিত ধারণা দেয়া হয়েছে। তাতে কম বা বেশি পরিমাণ বোঝায়। অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণ কম-ও হতে পারে, বেশীও হতে পারে। কুরআনের শব্দ خَيْرٌ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে সর্বপ্রকারের ব্যয়কেই শামিল করে। কার জন্যে ব্যয় করা হবে তা-ও বলে দেয়া হয়েছে ঃ 'পিতা-মাতা ও নিকটবর্তী লোকদের জন্যে। এ ছাড়া আরও যার যার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তারাও তার মধ্যে গণ্য। এরাই হচ্ছে অন্যদের অপেক্ষা ব্যক্তির ব্যয়ের অংশ পাওয়ার বেশি অধিকারী। এদের তুলনায় অন্যরা নৈকট্য ও দারিদ্রের দিক দিয়ে অধিক অধিকার সম্পন্ন নয়। কি পরিমাণ ব্যয় করতে হবে সে বিষয় অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ - قُلِ الْعَفْوَ -

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি পরিমাণ ব্যয় করবে ? বল, আল-'আফ্ও'

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছে, আল-'আফও' বলতে বোঝায়, তোমার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করার পর যা উদ্বৃত থাকবে তা। কাতাদাতা বলেছেন ঃ العَفْوَ الفَضْلُ 'আফ্ও' অর্থ অতিরিক্ত, বাড়তি। এই আয়াতে তাই বলা হয়েছে, ব্যক্তির নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করার পর যা অতিরিক্তি ও বাড়তি হবে, তা-ই ব্যয় করতে হবে। এই তাৎপর্যই পাওয়া গেছে রাসূলে করীম (স)-এর কথা থেকেও। তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى -

সর্বোত্তম দান হচ্ছে যা সাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা থেকে করা হবে।

অপর হাদীসের শব্দ হল ঃ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ -

সর্বোত্তম দান হল যা সাচ্ছন্দ্যকে অবশিষ্ট রাখে এবং শুরু কর তোমার পরিবার বর্গ থেকে যাদের জন্যে ব্যয় করা তোমার দায়িত্ব।

এই কথা কুরআনের ঃ 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে ? বল আল-আফ্ও' কথাটির সাথে সামঞ্জস্যশীল। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের ব্যয় শুরু করার ব্যাপারে নিকটবর্তিতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে ব্যয় করতে হবে তার জন্যে যে অন্যদের তুলনায় বেশি নিকটবর্তী, তার পরে যে বেশি নিকটবর্তী। একটি হাদীস ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبُوكَ وَأُخْتُكَ وَأَخُوكَ وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ -

উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহিতার) হাতের তুলনায় অধিক উত্তম। তুমি ব্যয় শুরু কর

তোমার পরিবারবর্গ থেকে। যেমন তোমার মা, তোমার পিতা, তোমার বোন, তোমার ভাই। অতঃপর প্রথম নিকটবর্তী, তার পরে অধিক নিকটবর্তী থেকে।

সালাবাতা ইবনে জহদম ও তারিকও নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনাটি আয়াতের বক্তব্যকেই ব্যাখ্যা করেছে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ বল তুমি যে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের জন্যে।' এর অর্থ বেশি নিকটবর্তীকে আগে দিতে হবে, তার পরে বেশি নিকটবর্তী যে হবে, তাকে দিতে হবে।

হাসান বসরী থেকে বর্ণনা এসেছে, যাকাত ও নফল দান সর্বত্রই আল্লাহ্‌র হুকুম বহাল রয়েছে। কোন হুকুমই মনসূখ হয়ে যায়নি। সুদ্দী বলেছেন, যাকাত ফরয হওয়ার পর নফল ব্যয় সংক্রান্ত আদেশসমূহ মনসূখ হয়ে গেছে। আবূ বকর বলেছেন, না, সাধারণভাবে ফরয ও নফল ব্যয় সংক্রান্ত সব হুকুমই বহাল আছে। ফরয ব্যয় অর্থাৎ যাকাত দানের ব্যাপার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি নিম্ন পর্যন্ত-এর জন্যে উল্লেখ করা হয়নি। তবে নফল ব্যয় সকলেরই জন্যে সাধারণ। যাকাত ফরয থাকা অবস্থায় আমরা যখন দুটিকেই ব্যবহার করতে পারব, তখন কোনটির হুকুম মনসূখ হয়েছে বলা সহীহ্‌ হতে পারে না। সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে এই কথা। সেই সমস্ত আয়াতকে এক সাথে কাজে লাগানো সম্ভব হলে— কোনটিকে মনসূখ মনে না করেই— আমাদের তা-ই করতে হবে এবং কোনটিকে মনসূখ বলে হুকুম লাগানো জায়েয হবে না। পিতা-মাতা ও নিকটবর্তী লোক যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে তাদের জন্যে ব্যয় করার কথা বলাই উদ্দেশ্য। আর তা সম্ভব যদি ব্যক্তি সচ্ছল ও ধনশালী হয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বল ঃ আল-আফ্‌ও' বলছে যে, তাদের জন্যে ব্যয় করা ফরয হবে যা প্রয়োজনাতিরিক্ত থাকবে, তা থেকে। সে নিজেই যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে, তার উপার্জন থেকে যদি কিছুই না বাঁচে তাহলে ব্যয় করা তার জন্যে ফরয নয়।

আয়াতটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, কম বা বেশী ব্যয় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সওয়াব পাওয়ার অধিকার জন্যে— যদি সে ব্যয় দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই লক্ষ্য হবে। তাতে নফল সাদকা ও ফরযসমূহ শামিল রয়েছে। দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌র কথা থেকেই প্রথমে অধিক নিকটবর্তী, তার পরের অধিক নিকটবর্তী— এই অনুসরণ করাই উত্তম। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'পিতা-মাতার জন্যে এবং নিকটবর্তীদের জন্যে' থেকে জানা যায়। নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র বক্তব্যকে নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ

ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ -

ব্যয় করা শুরু কর তোমার পরিবারবর্গ— তোমার মা, তোমার বাপ, তোমার বোন, তোমার ভাই, তোমার নিকটবর্তী, তার পরে তোমার নিকটবর্তী থেকে।

আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের জন্যে ব্যয় করা ফরয।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তো মিসকীন, নিঃস্ব পথিক ও আয়াতে উল্লিখিত সব লোকের জন্যে ব্যয় করাই কি ব্যধ্যতামূলক ?

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তা-ই বোঝায়। তবে তাদের মধ্য থেকে কতককে আমরা বিশেষীকৃত করে নিয়েছি নিকটবর্তীদের মধ্যে যাদের জন্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা জরুরী। তার প্রমাণ হচ্ছে, তারা যাকাত ও নফল ব্যয়ের মধ্যে শামিল।

আবদুল বাকী ইবনে কানে,মায়ায ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মদ ইবনে বকর, সুফিয়ান, মুজাহিম ইবনে জুফর, মুজাহিদ, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

دِيْنَارٌ اَعْطَيْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدِيْنَارٌ اَعْطَيْتَهُ مِسْكِيْنًا، وَدِيْنَارٌ اَعْطَيْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ، فَاِنَّ الدِّيْنَارَ الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا -

একটি দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) তুমি আল্লাহ্র পথে দিলে, একটি দীনার তুমি মিসকীনকে দিলে, একটি দীনার তুমি দাসমুক্তিতে ব্যয় করলে, একটি দীনার তুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করলে। জেনে রাখবে, এর মধ্যে যে দীনারটি তুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করলে, সুফল প্রাপ্তির দিক দিয়ে সব কয়টির তুলনায় সেটিই অনেক বড়।

এই হাদীসটি নবী করীম (স) থেকে 'মরফু' অর্থাৎ স্বয়ং তাঁর কথা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সেটির সনদ আবদুল বাকী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল মেরওয়াজী, আসিম ইবনে আলী, আল মাসউদ, মুজাহিম ইবনে জুফর, মুজাহিদ, আবূ হুরায়রা নবী করীম (স) থেকে।

আবদুল বাকী মুয়ায ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মদ ইবনে কাসীর, শুবা, আদী ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়দ, ইবনে মাসউদ নবী করীম (স) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا اَنْفَقَ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً -

মুসলিম ব্যক্তি যখন তার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় করে, তখন তা তার দিক দিয়ে সাদকা হয়ে যায়।

এইসব হাদীস-ই আল্লাহ্র 'প্রশ্ন করে কি ব্যয় করবে বল ঃ 'আল-আফ্ও' কথার সাথে সামস্যশীল হয়ে যায়।

এর তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস কাতাদাতা আল ফযল, আল-গনী আল-হাসান, আতা আল অসত উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ তা অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি খরচ থেকে মুক্ত হতে হবে। মুহাজিদ বলেছেন, উক্ত কথা দ্বারা ফরয সাদকার কথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, 'আল-আফ্ও' বলতে যখন বোঝায় যা অতিরিক্ত তা, তখন তার অর্থ ফরয যাকাত-ও হতে পারে। কেননা যাকাত ফরয হয় প্রয়োজন পরিমাণের বাড়তির উপর । তা দেয়ার পর-ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত থাকে। সমস্ত ফরয ওয়াজিব সাদকাও ঠিক এই রূপই। নফল সাদকাও তার অর্থ হতে পারে। ফলে নিজের জন্যে ব্যয়, পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয়, নিকটবর্তী তার পরের নিকটবর্তীর জন্যে ব্যয়— এই সবই এর মধ্যে শামিল। এর পরও যা অবশিষ্ট থাকবে, তা আত্মীয়দের জন্যে ব্যয় করতে হবে। ফকীর-দরিদ্রদের জন্যে সাদকায়ে ফিত্র ও অন্যান্য সব সাদকা ফরয নয়, এ কথার দলীল হিসেবে বলা হয়, আল্লাহ্ তো আমাদেরকে 'আল-আফ্ও' থেকে ব্যয় করতে আদেশ করেছেন, যা সাচ্ছন্দ্যের অতিরিক্ত হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ -

তোমাদের জন্যে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের নিকট অসহ্য।

এই কথাটি যুদ্ধ করা ফরয করে দিয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের প্রতি লিখে দেয়া হয়েছে'-এর অর্থ ফরয করা হয়েছে। যেমন 'তোমাদের প্রতি সিয়াম লিখে দেয়া হয়েছে' কথাটির অর্থ সিয়াম ফরয করা হয়েছে। পরন্তু আয়াতে বলা 'যুদ্ধ' হয় সেই যুদ্ধ বোঝাচ্ছে যার কথা সকলেরই মনে রয়েছে। অথচ মনের গহনে নিহিত সে যুদ্ধ বোঝাবে না। কেননা শব্দের উপর 'আলিফ' ও 'লাম' কখনও জাতীয় জিনিস বোঝায়, কখনও মনের মধ্যে থাকা জিনিস বোঝায়। লোকেরা যে যুদ্ধ জানে ও চিনে তা-ই যদি বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে কথার তাৎপর্য সেদিকে হবে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً -

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর সর্বাত্মকভাবে, যেমন করে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সর্বাত্মকভাবে। (সূরা তওবা ঃ ৩৬)

আর তার কথা ঃ

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ -

তোমরা ওদের বিরুদ্ধে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ না করছে। তারা যদি সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)

অর্থ যদি তা-ই হয়, তাহলে তাতে একটি বিশেষ পরিচিতির যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করলে আমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করব। এরূপ অবস্থায় কথাটি মনে রক্ষিত বিষয় সম্পর্কিত হয়ে যায়। তা বারবার বলা হয়েছে বলে তার হুকুমটা জানা গেছে তাগিদ সহকারে। আর মনে রক্ষিত সেই যুদ্ধ না বোঝালে তা নিঃসন্দেহে অস্পষ্ট কথা, যার ব্যাখ্যা একান্ত প্রয়োজন। তা নাযিল হওয়ার সময়কার অবস্থা জানা আছে, আল্লাহ আমাদেরকে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেন নি। তাই এই আদেশটিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। আর যে আদেশকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যাবে না, তা-ই অস্পষ্ট, তার ব্যাখ্যা আবশ্যক। তাই জিহাদ ফরয পর্যায়ে মনীষিগণের বিভিন্ন বক্তব্য আমরা পরবর্তীতে উল্লেখ করব।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই (যে অবস্থায়ই) তোমরা তাদেরকে পাবে। (সূরা তওবা ঃ ৫)

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা সে আলোচনা পেশ করব।

আল্লাহ্র কথা وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ 'অথচ তা তোমাদের জন্যে অসহনীয়।' এর অর্থ, ঘৃণ্য, অপছন্দনীয় তোমাদের নিকট। এতে 'মসদার'কে 'মফউল'-এর স্থানে দাঁড় করা হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيْهِ - قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌبِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

তোমাকে লোকেরা হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, এ মাসে যুদ্ধ করা বড় ব্যাপার। তাতে আল্লাহ্র পথে চলাকে বাধাগ্রস্ত করা হয় এবং আল্লাহ্র প্রতি কুফর করা হয় এবং মসজিদের হারাম .....।

এ আয়াত হারাম মাসে যুদ্ধকে হারাম করে দিয়েছে। এ-আয়াতটিও সেই কথাই বলে ঃ

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ -

হারাম মাসের বদলে হারাম মাস। আর হুরমাতসমূহ সমান-সমান। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৪)

এবং আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ -

মাসসমূহের সংখ্যা আসমান-জমিন সৃষ্টির দিনই নির্দিষ্ট হয়েছে বারো, তন্মধ্য থেকে চারটি হারাম মাস। এটি সুদৃঢ় দ্বীনি বিধান। অতএব তোমরা এই মাস কয়টিতে নিজেদের উপর জুলুম করো না। (সূরা তওবা ঃ ৩৬)

জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ, লাইস ইবনে সা'দ, আবূ যুবায়র, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) হারাম মাসে যুদ্ধ করতেন না। তবে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হলে আবশ্যই করতেন। তা যখন সম্মুখে আসত, তিনি যুদ্ধ করতেন যতক্ষণ না শেষ হয়ে যায়।

যুদ্ধ মনসূখ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। কিছু লোক বলেছেন, তা মনসূখ হয়নি, তার হুকুম বহাল রয়েছে। আতা ইবনে রিবাহ এই মত দিয়েছেন। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আবূ উবায়দ হাজ্জাজ ইবনে জুরাইজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আতাকে বললাম, ওদের কি হয়েছে ? হারাম মাসে যুদ্ধ করা তো ওদের জন্যে জায়েয ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও হারাম মাস শুরু হওয়ার পর-ও তারা যুদ্ধ করছে ? বললেন, পরে তিনি হলফ করে বললেন, 'হ্যাঁ, হারাম শরীফে লোকদের যুদ্ধ করা হালাল কখনই নয়, হারাম মাসেও নয়। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধেই যদি যুদ্ধ শুরু করা হয়, তাহলে তারা অবশ্যই যুদ্ধ করবে।' বললেন, যুদ্ধের হুকুম মনসূখ হয়নি, আয়াতও নয়।

সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বর্ণনা করেছেন, হারাম মাসেও যুদ্ধ করা জায়েয। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদেরও এই মত। প্রথমটি মনসূখ এই আয়াত দ্বারা ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

মুশরিকদের হত্যা কর তাদের যেখানেই তোমরা পাবে। (সূরা তওবা ঃ ৫)

এই আয়াত দ্বারাও ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

তোমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়। (সূরা তওবা ঃ ২৯)

কেননা এদুটি আয়াত হারাম মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধকারী আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। এই বিষয়ে যারা প্রশ্ন করেছে, তারা কারা, এ পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। আল-হাসান প্রমুখ বলেছেন, কাফিররাই রাসূল (স)-কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। মুসলমানরা হারাম মাসে যুদ্ধ করা হালাল করে নিয়েছে, এই দোষ ধরেই তারা তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। অন্যরা বলেছেন, মুসলমানরাই এই প্রশ্ন করেছিল। এই হুকুমটা কিভাবে দেয়া হল তা জানা ও বোঝার উদ্দেশ্যে। এ-ও বলা হয়েছে যে, তা একটি কারণের ভিত্তিতে নাযিল হয়েছিল। আর সে কারণ ছিল ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ, আমর ইবনুল হাজরমীকে মুশরিক থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল। তখন কাফিররা চিৎকার করে বলেছিল, মুহাম্মাদ (স) হারাম মাসে হত্যাকাণ্ড ঘটানোকে হালাল করে নিয়েছে। অথচ জাহিলিয়াতের লোকেরা এসব মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলে বিশ্বাস করত। তাই আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হারাম মাসে যুদ্ধ তখনও নিষিদ্ধ আছে। তবে মুশরিকরা কুফর-এর উপর অবিচল থেকেও হারাম মাসে যুদ্ধ বা রক্তপাতকে ভয়ানক কাজ মনে করে পারস্পরিক বৈপরীত্যের নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় হারাম। মসজিদে হারাম থেকে মুসলমানদের বহিষ্কারকরণও বড় গুনাহ। ওরা তো মুমিন, তাই মসজিদে হারামে যাওয়ার অধিকারী কাফিরদের অপেক্ষা ওরাই বেশি। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

আল্লাহ্‌র ও পরকালের প্রতি ঈমানদাররাই আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ আবাদ করে।

(সূরা তওবা ঃ ১৮)

আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কুফর এবং মসজিদে হারামের অসম্মান— আল্লাহ তো মসজিদ বানিয়েছেন সেখানে মুমিনরা কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে এই জন্যে; কিন্তু ওরা সে মসজিদে হারামকে মূর্তি দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে সেখানে যেতে বাধা দিচ্ছে। এই আচরণ মসজিদে হারামের প্রতি কুফরের ব্যবহার এবং মুমিনদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃতকরণও তাই। কেননা তারা কাফিরদের অপেক্ষা সেখানে যাওয়ার বেশি অধিকারী। আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিররা এত সব অপরাধ করেও মুসলমানদের দোষ ধরে একজন মুশরিককে হারাম মাসে হত্যা করার জন্যে, এ তো বড়ই হাস্যকর ব্যাপার।

মদ হারাম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا -

লোকেরা তোমাকে মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, ও দুটিতে বড় গুনাহ্, অবশ্য লোকদের জন্যে বিপুল ফায়দাও আছে। তবে ওদুটির ফায়দার তুলনায় ও দুটির গুনাহ অনেক বড়।

এ আয়াত মদ্য হারাম হওয়ার দাবি করে। তা হারাম ঘোষণার জন্যে অপর কোন আয়াত নাযিল না হলেও এটাই যথেষ্ট ছিল। নিষিদ্ধকরণের অপর কোন আয়াতের প্রয়োজন ছিল না। কেননা এতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ 'বল ও দুটিতে বড় গুনাহ্ রয়েছে।' সব গুনাহ্ই তো হারাম। কেননা অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ -

বল, আমার রব্ব হারাম করেছে সব নির্লজ্জতা— প্রকাশমান বা গোপন এবং গুনাহ্।

এ আয়াত জানিছে দিয়েছে যে, الاثم বা গুনাহ সবই হারাম। শুধু সংবাদ জানিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তা গুনাহ বলেই কথা শেষ করা হয়নি। বরং ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে তা অতি বড়। তার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এটা তাগিদ। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ 'লোকদের জন্যে বহু ফায়দা'— এতে বোঝায় না যে, মদ্য মুবাহ। কেননা ফায়দা বলতে বৈষয়িক ফায়দা বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, সব হারাম জিনিসেই ফায়দা আছে বটে। এই জন্যেই তো মানুষ তা করে। ফায়দা না থাকলে তো কেউই করত না। তবে সে মুনাফা বা ফায়াদার মধ্যে যে ক্ষতি নিহিত রয়েছে, তা করলে যে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে অনিবার্যভাবে, তা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। এ আয়াতে যে মুনাফার কথা রয়েছে, তাতে তা মুবাহ্, তা বোঝায় না। বরং এই ফায়দা বা মুনাফার কথা বলার পরও পরবর্তী কথা হিসেবে বলা হয়েছে ঃ 'সে দুটির গুনাহ্ সে দুটির ফায়দা ও মুনাফার তুলনায় অনেক বড়।' অর্থাৎ এ দুটি কাজের পরিণামে যে আযাব ভোগ করতে হবে, তা উপস্থিত ফায়দা ও মুনাফার তুলনায় অনেক ভয়াবহ। অতএব তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

মদ্য সম্পর্কে আরও একটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তা এই ঃ

لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

তোমরা নামাযের নিকটেও যেও না মদ্য পানে মাতাল হওয়া অবস্থায়। বরং এমন সুস্থভাবে যাবে যেন তোমরা কি বল তা জানতে পার। (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াতে সরাসরিভাবে মাদক দ্রব্য হারাম বলা হয়নি। তবে প্রকারান্তরে তা-ই বলা হয়েছে। কেননা নামায তো ফরয এবং তা নির্দিষ্ট সময়ে পড়ার জন্যে আমরা আদিষ্ট। তাই

তার প্রতিবন্ধক যা হবে, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। অতএব নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ হলে নেশাগ্রস্ত হওয়া নিষিদ্ধ হবে অনিবার্যভাবে। মদ্য পান নামায তরক করার অবস্থার সৃষ্টি করে। অতএব তা নিষিদ্ধ। কেননা যে কাজ ফরয আদায়ের প্রতিবন্ধক, সে কাজ অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে।

মদ্য নিষিদ্ধকরণ পর্যায়ে চূড়ান্ত আয়াত হচ্ছে আর একটি যার কোনরূপ বিপরীত ব্যাখ্যা দেয়া চলে না। তা হচ্ছে ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ –

নিঃসন্দেহে মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান এবং ভাগ্য জানার জন্যে তীর ব্যবহার শয়তানী কাজের নাপাকী। অতএব তোমরা তার প্রত্যেকটি পরিহার কর। (সূরা মায়িদা ঃ ৯০)

এ আয়াতের শেষ বাক্য হচ্ছে ঃ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ 'তাহলে তোমরা কি বিরত হবে ?'

এ আয়াতে মদ্য সম্পর্কে কয়েকটি দিক দিয়ে কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে, তা শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। এরূপ কথা কেবলমাত্র হারাম ও নিষিদ্ধ জিনিস সম্পর্কেই বলা যেতে পারে। পরে এই কথাটিকে বলিষ্ট করা হয়েছে, 'অতএব তোমরা তা পরিহার কর' বলে। এ একটি কঠোর আদেশ, তার কারণে মদ্য অবশ্যই পরিহার করতে হবে। তার পরে প্রশ্নবোধক ভাষায় বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা কি বিরত থাকবে ? এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাক।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, 'ও দুটিতে বড় গুনাহ রয়েছে' কথাটিতে কম পরিমাণ হারাম হওয়ার দলীল নেই। কেননা আয়াতের কথার আলোকে বলা যায়, নেশাগ্রস্ততা, নামায তরক হওয়া, পারস্পরিক উত্তেজনা ও মারামারি ইত্যাদিই গুনাহ্। এগুলোতে গুনাহ্ হলে আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বেশি পরিমাণই হারাম হতে পারে। কিন্তু কম পরিমাণ পান করলে তা হয় না বলে তা হারামও না হওয়া উচিত ?

জবাবে বলা যাবে, 'ও দুটিতে বড় গুনাহ' কথাটিতে একটি ইঙ্গিত উহ্য আছে। আর তা হচ্ছে, তা পান করা। কেননা মদ্য জিনিসটি তো আল্লাহ্র সৃষ্টি, তাতে গুনাহ্ নেই। গুনাহ্ হবে আমাদের কাজের দরুন। 'পান' যখন উহ্য, তাহলে তার অর্থ হবে, তা পান করা গুনাহ্। আর জুয়া খেলার কাজটাও বড় গুনাহ্। তাহলে তাকে কম পরিমাণ পানও গুনাহের আওতায় পড়ে যেমন পড়ে তার বেশি পরিমাণ পান করা। 'মদ্য হারাম' এ কথার অর্থ মদ্য পান হারাম। তার দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ। অতএব এতেই প্রমাণিত হয় যে, তার কম ও বেশী উভয় পরিমাণই হারাম।

এই পর্যায়ে বর্ণিত হাদীস জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী কর্তৃক বর্ণিত। তাঁর সূত্র হচ্ছে, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামান, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুআবিয়াতা ইবনে সালিহ, আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস। হাদীসটি, 'লোকেরা তোমাকে মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, ও দুটিতে বড় গুনাহ রয়েছে' এই আয়াত সম্পর্কে। বলেছেন الميسر। অর্থ জুয়া। জাহিলিয়াতের যুগের ব্যক্তি মদ্যপান করে তার পরিবারবর্গ ও ধন-মালের জন্যে বিপদ টেনে আনত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

তোমরা নামাযের নিকটেও যাবে না নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা জানবে। (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নামাযের সময় কাছাকাছি থাকলে লোকেরা মদ্যপান করত না। এশার নামায হয়ে গেলে তখন পান করত। এই সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান মদ্যপান করে পরস্পর রক্তারক্তি করল এবং পরস্পরে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিমূলক কথাবার্তা বলল। তখন শেষ পর্যায়ে নাযিল হল ঃ

মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য জানার জন্যে তীরের ব্যবহার শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। অতএব তোমরা তা পরিহার কর।

'মায়সির' অর্থ জুয়া, الانصاب অর্থ মূর্তি দেবতা ও তাদের উদ্দেশ্যে পশু বলিদানের স্থান। আর الازلام অর্থ তীর, তার সাহায্যে তারা ভাগ্য জানতে চেষ্টা করত।

বলেছেন, আবূ উবায়দ আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, সুফিয়ান, আবূ ইসহাক, আবূ মাইসারাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ 'হে আমাদের আল্লাহ! মদ্য সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট কথা জানিয়ে দাও।' তখন নাযিল হল ঃ 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটেও যাবে না .....' তার পরে তিনি আবার বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! মদ্য সম্পর্কে আমাদেরকে আরও স্পষ্ট কথা বলে দাও।' তখন নাযিল হল 'বল, ও দুটিতে বড় গুনাহ্ রয়েছে এবং জনগণের জন্যে কিছু ফায়দাও। তবে সে দুটির ফায়দার তুলনায় সে দুটির গুনাহ্ অনেক বড়।' তখন আবার দো'আ করে আরও স্পষ্ট কথা বলার দাবি জানালেন। তখন নাযিল হল ঃ

মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য জানার জন্যে তীর ব্যবহার শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। অতএব তোমরা এর প্রত্যেকটি পরিহার কর।

আর শেষে নাযিল হল ঃ 'তাহলে তোমরা কি তা থেকে বিরত থাকবে?' তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ

اِنْتَهَيْنَا اِنَّهَا تُذْهِبُ الْمَالَ وَتُذْهِبُ الْعَقْلَ -

হ্যাঁ আমরা বিরত থাকলাম। মদ্য তো যেমন ধন-মাল বিনষ্ট করে, তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধিকেও বিলুপ্ত করে।

বলেছেন, আবূ উবায়দ হুসাইম, মুগীরা, আবূ রুজাইন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সূরা আল বাকারার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর এবং সূরা আন-নিসার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি মদ্যপান করলাম, অন্যান্য লোক-ও নামাযের সময় হওয়ার আগে মদ্যপান করত। নামায উপস্থিত হলেই তা ত্যাগ করত। পরে সূরা আল-মায়িদার আয়াত নাযিল হয়, যাতে প্রশ্ন করা হয়; 'তোমরা কি বিরত হবে? তখন লোকেরা তা থেকে বিরত হয়। পরে তারা আর কখনই তা পান করেনি।

কোন কোন লোক মনে করে ঃ 'বল, তাতে বড় গুনাহ্, লোকদের বহু ফায়াদও আছে' কথাটি দ্বারা মদ্য পান পূর্ণমাত্রায় হারাম করা হয়নি। কেননা যদি তদ্দ্বারা হারাম-ই করা হতো, তাহলে লোকদেরকে এর পর-ও তা পান করার সুযোগ নবী করীম (স) দিতেন না। হযরত উমর (রা)-ও বারবার আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কথা জানবার জন্যে প্রার্থনা করতেন না। কিন্তু আমাদের মতে ব্যাপার তা নয়। কেননা আল্লাহ্‌র 'লোকদের জন্যে মুনাফা' কথাটি থেকে তা মুবাহ মনে করেছে, সে ফায়দা গ্রহণ নিষিদ্ধ নয় মনে করেছে। কেননা গুনাহ তো হয় বিশেষ একটা অবস্থায়, অন্য সময় হয় না। তারা একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আয়াতের মূল বক্তব্যকে পাশ কাটাতে চেয়েছে, 'হারাম করা হলে অতঃপর তা পান করার সুযোগ নবী করীম (স) দিতেন না' বলা হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ নয়। কেননা নবী করীম (স) মদ্যপান সম্পর্কে জানতেন এবং তা জানার পর লোকদেরকে তা করতে দিয়েছেন, তা প্রমাণিত নয়। হযরত উমর (রা) মদ্য সম্পর্কে ঘোষণা পাওয়ার জন্যে দো'আ করেছিলেন এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরও। কেননা প্রাথমিক দুটি আয়াতে ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব ছিল ও সুযোগ ছিল। যদিও তাতে হারাম হওয়ার দিকটি কম স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঘোষণা চেয়েছিলেন এজন্যে যে, অতঃপর যেন ভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দেয়ার কোন অবকাশ না থাকে। তাই তখন আল্লাহ শেষ আয়াতটি নাযিল করেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ 'মদ্য ও জুয়া শয়তানী কাজের অপবিত্রতা ....।

মদ্যপান ইসলামের প্রাথমিক কালে নিষিদ্ধ হয় নি, তখন তা মুবাহ ছিল, মুসলমানরা মদীনায়ও তা পান করতেন, তা ক্রয়-বিক্রয় করতেন, নবী করীম (স) তা জানতেন, তিনি বাধা দেন নি, চলতে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তা হারাম হয়ে যায়। তাই লোকেরা বলছেন যে, তা নিরংকুশভাবে হারাম হয়ে গেছে এই সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াত দ্বারাও বলা হয়েছে ঃ 'মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও তীর বানিয়ে ভাগ্য জানা— এসবই শয়তানী কাজের অপবিত্রতা, অতএব তা পরিহার কর।' শেষে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ঃ 'তোমরা কি বিরত হবে ?' অবশ্য তার পূর্বেও কোন কোন অবস্থায় তা হারাম ছিল। সে অবস্থা হয়েছে নামাযের সময়। 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না' বলে নিষেধ করা হয়েছিল। তার কোন মুনাফা বা ফায়দা গ্রহণ তখন মুবাহ ছিল, আর কোন কোনটি নিষিদ্ধ ছিল। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে; 'বল, তাতে বড় গুনাহ এবং লোকদের কিছু ফায়দাও আছে,' আর সবশেষে 'অতএব তা পরিহার কর' বলে চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়েছে। 'তোমরা কি বিরত থাকবে' কথাটিও এই পর্যায়ের।

প্রসঙ্গত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটির বাহ্যিক হুকুমের ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি।

অবশ্য প্রশ্ন উঠেছে, পানীয়সমূহের মধ্যে 'খামর' বা মদ্য কোনটাকে বলা হয় ? ফিকাহবিদদের মধ্যের বিরাট সংখ্যকের কথা হচ্ছে 'খামর' প্রকৃতপক্ষে আঙ্গুরের রস দিয়ে বানানো পানীয়কে বলা হয়। মদীনার লোকদের মধ্য থেকে অনেকে এবং ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন ঃ

انَّ كُلَّ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ مِنَ الْاَشْرِبَةِ فَهُوَ خَمْرٌ –

যে পানীয়ের বেশী পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে, তা-ই 'খামর'।

'খামর' বিশেষভাবে আঙ্গুরের রস থেকে বানানো পানীয়ের নাম, অন্য কিছুকে 'খামর' বলা যায় না। অন্য কিছুকে 'খামর' বলা হলেও তা প্রকৃত নাম নয়, আরোপিত নাম। পরোক্ষভাবে তার সাথে সাদৃশ্য আছে বলেই তা বলা হয়। এই কথার দলীল হচ্ছে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স)-এর নিকট নেশাগ্রস্ত বা মাতাল এ

ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি 'খামর' পান করেছ ? লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 'খামর' হারাম ঘোষণা করেছেন, সেই সময় থেকে আমি তা কখনই পান করিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি পান করেছ ? বলল, 'খালীতাইন' الْخَلِيطَيْنِ পান করেছি। তখন নবী করীম (স) 'খালীতাইন' হারাম ঘোষণা করলেন।

বোঝা গেল, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মাদক দ্রব্যটির নাম 'খামর' বললেন না। তা নবী করীম (স)-এর সামনেই ঘটল। নবী করীম (স) এই 'মাদকের' খামর-এর পরিবর্তে খালীতাইন' নামকরণকে অস্বীকার করলেন না। যদি আভিধানিক বা শরীয়াতের দিক দিয়ে তার নাম 'খামর' বলত, তাহলে নবী করীম (স) তা বহাল রাখতে দিতেন না। কেননা যে জিনিসের সাথে নিষেধ যুক্ত, সেই জিনিসের নাম বললে সে নিষেধটাও তার সাথে যুক্ত করা হতো। আর একথা তো জানা-ই যে, নবী করীম (স) কোন মুবাহ জিনিসকে নিষিদ্ধ বললে তা তিনি বহাল থাকতে দিতেন না। তেমনি নিষিদ্ধ জিনিসকে মুবাহ বললেও তার প্রতিবাদ অবশ্যই করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সব মাদক পানীয়কেই 'খামর' বলা যাবে না, তা শুধু আঙ্গুরের রস দিয়ে বানানো পানীয়কেই 'খামর' বলা যাবে। কেননা 'খালীতাইন' কে যখন 'খামর' বলা যায় না, যদিও তাতে পুরামাত্রায় মাদকতা বর্তমান। বোঝা যাচ্ছে 'খামর' নামটি কেবলমাত্র সেই আঙ্গুর রস দিয়ে বানানো পানীয়কেই বলা যাবে। একটি হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-উলায়ী, আল-আব্বাস ইবনে বাক্কার, আবদুর রহমান ইবনে বশাইর, আল-আতফানী, আবূ ইসহাক, আল-হারিস আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বিদায় হজ্জের বছর পানীয় দ্রব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। জবাবে বললেন ঃ

حَرَامٌ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ -

আসল খামর তো হারাম। আর প্রত্যেক মাদকতাপূর্ণ পানীয়ও হারাম।

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-উলায়ী, শুরাইব ইবনে ওয়াকিদ, কায়স, কতন-মুনযির, মুহাম্মাদ ইবনুল হানফীয়া আলী (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল বাকী হুসায়ন ইবনে ইসহাক, আইয়াস ইবনুল ওয়ালীদ, আলী ইবনে আব্বাস,' সাঈদ ইবনে আম্মার, আল-হারিস ইবনুন নু'মান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে রাসূলে করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

اَلْخَمْرُ بِعَيْنِهَا حَرَامٌ وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ -

আসল 'খামর' হারাম। আর প্রত্যেক মাদক পানীয়ও হারাম।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ কথার বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে 'মরফূ' হিসেবেও বর্ণনা এসেছে।

এই হাদীসের কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে। একটি, 'খামর' নামটি প্রকৃত মদের জন্যে নির্দিষ্ট, অন্য কোন মাদক পানীয়কেও 'খামর' বলা যাবে না। এই নামকরণে কোন মতপার্থক্য নেই। এমনকি আঙ্গুরের অপর কোন রসকেও 'খামর' বলা যাবে না। অন্যান্য পানীয়কেও এই নামে অভিহিত করা চলবে না। কেননা পরের কথা হচ্ছে ঃ 'সব পানীয়ের মাদক'ও হারাম। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে পানীয়ই মাদক, তা-ই হারাম। অন্যথায় 'খামর' ছাড়া আলাদা করে বলা

হতো না যে, সব পানীয়ের মাদক হারাম। হারাম দুটিই, তবু দুটির মধ্যে হারাম হওয়ার দিক দিয়ে পার্থক্য করা হয়েছে। এ-ও বোঝা যায় যে, 'খামর' হারামকরণের হুকুমটা তারই মধ্যে সীমিত। অপর কোন জিনিসে তা সংক্রামিত হবে না, কিয়াস করেও অন্য কোন মাদককে 'খামর' বলা যাবে না। তার ভিত্তিতে দলীলও দেয়া যেতে পারে না। কেননা হারাম হওয়ার হুকুমটা লটকানো হয়েছে আসল খামর-এর সাথে, অপর কোন মাদক পানীয়ের উপর নয়। এই কারণে তার উপর কিয়াস করে অপর কিছু পানীয়কে হারাম বলা যাবে না। কেননা প্রত্যেক আসল জিনিসের উপরই কিয়াস করা চলে। তাই যে জিনিসের উপর হুকুম প্রতিষ্টিত, সেই হুকুমটা তার পর্যন্তই সীমিত নয়। কেবল সেটাই হারাম, অন্যটা হারাম হতে পারে না, তা-ও নয়। বরং হুকুমটা তার কোন গুণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যে গুণটি অন্য কোন জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহলে হুকুমটা যেই গুণের অধীন, সেই গুণের সাথে চলবে। যেখানে সেই গুণ পাওয়া যাবে, হুকুমটা সেই জিনিসের উপরও প্রযোজ্য হতে পারবে। কেননা ইল্লাত সেখানেও রয়েছে, যার কারণে তা হারাম।

সব রকমের মাদক পানীয়কে 'খামর' নাম শামিল করে না। এর দলীল রাসূলে করীম (স)-এর কথা। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে তাঁর কথা হচ্ছে ঃ

اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ -

'খামর' খেজুর ও আঙ্গুর— এই দুইটি বৃক্ষ থেকে পাওয়া যায়।

তা থেকে বোঝা গেল, 'খামর' জাতীয় পর্যায়ের নাম, তার উপর আলিফ ও লাম রয়েছে বলে। ফলে এই নামে যা-ই বোঝাবে তার সবটিকেই তা শামিল করবে। তা হলে সর্বপ্রকারের পানীয়কেই এই নামে অভিহিত করা চলবে। তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। বোঝা গেল, এই দুইটি গাছ ছাড়া অন্যান্য গাছ থেকে যা বের হবে তার নাম 'খামর' হবে না। এই দুটি গাছ থেকে যা কিছু বের হয়, তা সব-ই কি 'খামর' নামে অভিহিত হবে কিংবা নয় ? সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ দুটি গাছ থেকে যা-ই বের হয় তার সব কিছুকেই 'খামর' নামে অভিহিত করা যায় না। কেননা নিংড়ানো রস, ঘন মিষ্ট রস دبس এবং ভিনেগার প্রভৃতি বহু কিছুই এ দুটি গাছ থেকে পাওয়া যায়; কিন্তু এর কোনটিকেই 'খামর' বলা হয় না। তাহলে বোঝা গেল, এসব ছাড়া আর যা এ দুটি গাছ থেকে পাওয়া যায়, তাকেই 'খামর' বলা হয়। কিন্তু অন্যান্যগুলোর উল্লেখ হাদীসে নেই। তাই আমরা দলীল হিসেবে এ দুটি গাছ থেকে পাওয়া এই পর্যায়ের জিনিসকে বিশেষ 'খামর' নামকরণ ধরে নিলাম। কাজেই এ দুটি গাছ থেকে যা বের হয়, তার সবকিছুকেই 'খামর' নাম রেখে হারাম মনে করার কোন দলীল পাওয়া যেতে পারে না। এ দুটি গাছ থেকে যা যা বের হয়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'খামর'। অপর আয়াতে যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ -

ও দুটি থেকে মুক্তা ও মুঙ্গা বের হয়।

দুটির বক্তব্য অভিন্ন। হয় বক্তব্য এই হবে যে, ওদুটি বৃক্ষ থেকেই 'খামর' বের হয়, অথবা এর একটি থেকে বের হয়। যদি দুটি থেকেই 'খামর' বের হওয়া বক্তব্য হয়, তাহলে ব্যবহৃত শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ দুটি গাছ থেকে প্রথম যে পানীয় বের করা হয়, তা-ই 'খামর' নামে অবিহিত। কেননা একথা যখন জানা গেছে যে, 'ওদুটি বৃক্ষ থেকে'-এর অর্থ প্রত্যেকটি

কিছু কিছু অংশ' বোঝা যাবে না। কেননা তার কোন অংশের 'খামর' হওয়া সম্ভব নয়। বোঝা গেল, দুটি বৃক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে পানীয় বের হয় তা-ই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কেননা আরবী من শব্দটি কয়েকটি অর্থ দেয়। কোনখানে অংশ বোঝায়, আর কোনখানে 'সূচনা' বোঝায়। যেমন বলা হয় ঃ আমি কূফা থেকে বের হয়েছি। অর্থাৎ কূফা থেকে আমার যাত্রা শুরু। বলা হয়, 'অমুকের নিকট থেকে আসা চিঠি'। অর্থাৎ চিঠির যাত্রা অমুক থেকে হয়েছে। এই ধরনের আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে من-এর। এখানে من অর্থ সূচনা বা শুরু হওয়া। অর্থাৎ ও দুটি বৃক্ষ থেকে প্রথম যা বের হয় তাই। আর তাতে যে রস নিংড়ানো হয়, খেজুর গাছ থেকে যে গাঢ়-শুষ্ক জিনিস প্রবাহিত হয় তা। এই কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কিরা করে বলল, সে এই খেজুর গাছ থেকে কিছু খাবে না, তার এই কথা প্রযোজ্য হবে তা কাঁচা খেজুর, শুষ্ক খেজুর تمر ও গাঢ় শুষ্ক প্রবহমান রস প্রভৃতির উপর। কেননা তারা শব্দটি من সূচনা অর্থে গ্রহণ করেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, সর্বপ্রকারের পানীয়কে 'খামর' বলা যায় না। এই পর্যায়ে আমরা এ পর্যন্ত যা যা বলেছি, তার যথার্থতা একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এসেছে। তিনি বলেছেন ঃ

لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ مِنْهَا شَيْءٌ -

যেদিন 'খামর' হারাম ঘোষিত হয়েছিল, সেদিন তার কোন জিনিস মদীনায় ছিল না।

ইবনে উমর (রা) একজন ভাষাবিদ ব্যক্তি। একথাও জানা যে, মদীনায় সেদিন যেমন মাদক দ্রব্য ছিল, তেমনি 'তামার' থেকে বানানো বহু প্রকারের 'নবীয' পানীয় ছিল। কেননা তা-ই ছিল তাদের পানীয়। এই কারণে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, 'খামর' হারাম ঘোষিত হল আর মানুষরা সে সময়ে যা পান করত (তা-ও হারাম ঘোষিত হল)। তবে কাঁচা খেজুর (Dates) ও 'তামার' হারাম ঘোষিত হয়নি। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, আমি আমার ফুফু (আনসার বংশের লোক)-কে পান করাচ্ছিলাম যখন 'খামর' হারাম ঘোষিত হল। তখনকার সময়ে লোকদের পানীয়র নাম ছিল 'আল-ফযীহ'। লোকেরা যখন হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনতে পেল, তখন তারা সেইসবকে প্রবাহিত করে দিল।

ইবনে উমর (রা) যখন মদীনায় পানীয় হিসেবে প্রচলিত সর্ব প্রকারের পানীয় থেকে 'খামর' কে আলাদা করে চিহ্নিত করলেন, অন্য পানীয়কে 'খামর' বলা যায় না বলে জানালেন, বোঝা গেল, তাঁর মতে 'খামর' হচ্ছে আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী পানীয়। তা ছাড়া অন্যান্য পানীয় এই নামে অভিহিত নয়। এ-ও বোঝা যায় যে, তদানীন্তন আরবরা 'খামর'কে سبيئة 'সাবিয়াতুন' বলত। 'তামার' খেজুর থেকে বানানো সকল প্রকারের পানীয়কেই তারা 'খামর' বলতো না। কেননা তা বিদেশ থেকে আমদানী করা হতো।

এই পর্যায়ে আমরা রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের কথা ও ভাষাভাষীদের ব্যবহার থেকে যা কিছু এখানে উল্লেখ করলাম, তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, 'খমর' একটা বিশেষ নাম, তা কেবল আঙ্গুরের রসকেই বোঝায়। অন্য পানীয় বোঝায় না। আমরা মদীনাবাসীদের অভ্যাস সম্পর্কেও জানতে পেরেছি যে, তারা সাধারণভাবে 'তামার' ও 'বাসার' (কাচাঁ খেজুর) থেকে গৃহীত পানীয় খেতেই অভ্যস্ত ছিল। আরও সাধারণ ব্যবহারে ছিল 'খামর'। বিশেষভাবে 'খামর'-এর ব্যাপারটি বিরল ছিল এই জন্যে যে, তা তাদের নিকট খুব বেশি ছিল না। সব সাহাবীই যখন বুঝতে পারলেন যে, তৈরী করা সব মাদকই হারাম,

তখন তা ছাড়া অন্যান্য পানীয়র ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মত হয়ে যায়। হযরত উমর, আবদুল্লাহ, আবূ যর প্রমুখ বড় বড় সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'নবীয' পানও সাংঘাতিক ব্যাপার, তাবেয়ীন ও তাঁদের পরবর্তী সব মনীষী ও ফিকাহবিদগণ এসব পানীয়কে হারাম করা হয়েছে বলে জানতেন না। এগুলোকে তারা 'খামর' নামেও অভিহিত করতেন না। বরং এগুলোকে 'খামর' বলতে নিষেধ করতেন। এর দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি এই যে, এসবকে 'খামর' নামে অভিহিত করা যায় না। 'খামর' শব্দ এগুলোকে শামিলও করে না। কেননা 'খামর' পানকারীর নিন্দা করতে তাঁরা সকলেই একমত। আর তার সবটাই হারাম ও নিষিদ্ধ। আর দ্বিতীয় এই যে, 'নবীয' হারাম নয়। কেননা তা যদি হারাম হতো, তাহলে সেকথা তাঁরা সকলেই জানতেন, যেমন 'খামর'-এর হারাম হওয়ার কথা তারা সকলেই জানেন। কেননা সেগুলোর হারাম হওয়ার কথা জানা 'খামর'-এর হারাম হওয়ার কথার তুলনায় অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। কেননা সেগুলো সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল অন্য সবের তুলনায়। আর যে হুকুমটা সাধারণ প্রচলিত বিষয়ে, তার বর্ণনা 'মুতাওয়াতির' ভাবে হওয়া জরুরী, যেন নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় ও সেই অনুযায়ী কাজ হয়।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'খামর' হারাম হওয়ার দ্বারা এসবের হারাম হওয়ার কথা বোঝা যায় না। যাঁরা মনে করেন, যেসব পানীয় মাদক, তা সবই 'খামর', তাঁদের দলীল হচ্ছে ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীস। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ 'সব মাদকই খামর।' শাবী নুমান ইবনে বশীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ اَشْيَاءَ : التَّمْرُ وَالْعِنَبُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ -

'খামর' পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরী হয় ঃ তামার, শুকনা খেজুর, আঙ্গুর, যব, বার্লি ও মধু।

উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। উমর (রা) থেকে এ বর্ণনাও এসেছে ঃ

اَلْخَمْرُ مَاخَمَرَ الْعَقْلَ যে জিনিস বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তা-ই 'খামর'।

তায়ূস ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ كُلُّ مُخْمِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ সব মাদক-ই খামর। আর সব মাদকই হারাম। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, বলেছেন, আমি লোকদেরকে আবূ তালহার ঘরে খামর পান করাচ্ছিলাম, যখন তা হারাম ঘোষিত হল। আর এই সময়ে আমাদের খামর ছিল শুধু আল-ফযীহ। লোকেরা যখন 'খামর' হারাম হওয়ার ঘোষণা শুনতে পেলেন, পাত্রসমূহ থেকে পানীয় ঢেলে ফেলে দিলেন, প্রবাহিত করলেন এবং পাত্রসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন। তাঁরা বললেন, নবী করীম (স) এ সব পানীয়কে 'খামর' নাম দিয়েছেন। উমর ও আনাস (রা)-ও তাই করেছেন। আনসারগণ 'খামর' হারাম করে দেয়ায় বুঝেছেন 'আল-ফযীহও' হারাম করা হয়েছে। তা হচ্ছে কাঁচা খেজুরের তরল পদার্থ। এই কারণে তাঁরা তা প্রবাহিত করে দেন। পাত্রসমূহও ভেঙ্গে ফেলেন। এই নামকরণ অভিধানের দিক দিয়ে এ সব পানীয় সম্পর্কে সঠিক প্রয়োগ হবে, না হয় হবে শরীয়াতের দৃষ্টিতে। দুটির যেটিই হোক, তার দলীলের অকাট্যতা প্রমাণিত নাম করণও সঠিক ও যথার্থ। এ থেকে প্রমাণিত হল, যে পানীয়র বেশি পরিমাণ মাদক, তা-ই 'খামর' এবং তা-ই হারাম। আল্লাহ নিজেই স্পষ্ট শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এই হারামের কথা ঘোষণা করেছেন।

এ সব কথার জবাব এই যে, নামসমূহ দুই প্রকারের। এক প্রকারের নাম যা একটি

জিনিসের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই জিনিসের নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে। তার তাৎপর্যের প্রকাশ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে পারোক্ষভাবে রাখা। প্রথম প্রকারের নাম যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহৃত হবে যখন তা বোঝাবার প্রমাণ উপস্থিত থাকবে। প্রথম প্রকার নামের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا -

আল্লাহ্ চাহেন তোমাদের প্রতি তিনি 'তওবা' করবেন এবং যারা নফসের খাহিশ অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা পুরামাত্রায় (ইসলামের বিপরীত দিকে) ঝুঁকে পড়বে।

(সূরা নিসা ঃ ২৭)

এ আয়াতে 'ইরাদা' প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকারের নামের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ -

তারা দুইজন সেখানে একটা প্রাচীর দেখতে পেল, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। (সূরা কাহাফ ঃ ৭৭)

এ আয়াতে 'ইচ্ছা' বা 'ইরাদা' শব্দটির প্রকৃত ব্যবহার হয়নি, হয়েছে পরোক্ষ ব্যবহার। আর اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 'খামর' ও জুয়া— এখানে 'খামর' শব্দের ব্যবহার প্রকৃত অর্থে— অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنِّیْ اَرَانِیْ اَعْصِرُ خَمْرًا -

আমি আমাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি 'খামর' নিংড়াচ্ছি। (সূরা ইউসূফ ঃ ৩৬)

এ আয়াতে 'খামর' নামটি পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আঙ্গুর নিংড়ানো হয়, 'খামর' নয়। এ রকমেরই কথা ঃ

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -

হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে এই জনপদের জালিম অধিবাসীদের থেকে বের করে নাও। (সূরা নিসা ঃ ৭৫)

এ আয়াতে الْقَرْيَة 'জনপদ' প্রকৃত নাম। নির্মাণ ভিত্তির কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এই কথাটি ঃ

وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِیْ كُنَّا فِيْهَا -

আমরা যে জনপদে ছিলাম সেই জনপদকে জিজ্ঞাসা কর। (সূরা ইউসূফ ঃ ৮২)

এখানে পরোক্ষ অর্থ সামনে রাখা হয়েছে। কেননা এতে 'জনপদ' শব্দটি ঠিক যা বোঝার জন্যে তৈরী করা হয়েছে, তা বোঝানো হয়নি। বরং 'জনপদ' বলতে জনপদের অধিবাসীদের বুঝিয়েছেন। প্রকৃত অর্থ পরোক্ষ অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যে নাম সেই নামের জিনিসটির সাথে বাধ্যতামূলক, কখনই তা থেকে সরে যায় না, তা তার প্রকৃত নাম। আর যে নাম তার

জিনিসটি থেকে কখনও সরে যেতে পারে, তা পরোক্ষ নাম। যেমন যদি বলা হয়, প্রাচীরের তো 'ইচ্ছা' বলতে কিছু থাকে না, তাহলে সত্য কথাই বলা হবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ কিছুই চান না বা মানুষের ইচ্ছা বলতে কিছুই নেই, তাহলে তার এই কথাটি বাতিল। অনুরূপভাবে বলা যায়, নিংড়ানো জিনিস 'খামর' নয়। কিন্তু আঙ্গুর নিংড়ানো রস থেকে তৈরী জিনিস 'খামর' নয় বলা যথার্থ নয়। এর দৃষ্টান্ত ভাষায় ও শরীয়াতে অসংখ্য রয়েছে। শরীয়াতী নাম পরোক্ষ নাম হিসেবে তার আসল পরিধি অতিক্রম করে যায় না। আমরা যখন দেখছি যে, 'খামর' নামটি অন্যান্য সর্বপ্রকারের পানীয়র ব্যাপারে অ-প্রয়োগীয়, আঙ্গুরের পানি দিয়ে তৈরী জিনিসও অনুরূপ, আমরা জানতে পারলাম যে, তা প্রকৃতপক্ষে 'খামর' নয়।

'খামর' নামটি অন্যান্য সব পানীয়র জন্যে ব্যবহার না করার দলীল হচ্ছে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর নিকট একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি 'খামর' পান করেছ? লোকটি বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যেদিন তা হারাম করেছেন, তার পর কখনই তা আমি পান করিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি পান করেছ ? বলল, আমি 'খালীতাঈন' পান করেছি।' তখন নবী করীম (স) 'খালীতাঈন' পান করাকে হারাম ঘোষণা করলেন। বোঝা গেল, লোকটি 'খালীতাঈন'কে 'খামর' নামে অভিহিত করেনি। রাসূলে করীম (স)ও তা মেনে নিলেন ও বহাল রাখলেন। বোঝা গেল, 'খালীতাঈন' 'খামর' নয়। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, 'খামর হারাম করা হয়েছে; কিন্তু সেদিন মদীনায় খামর এর কিছুই বর্তমান ছিল না। বোঝা গেল, খেজুর 'তামার'-থেকে তৈরী পানীয়কে 'খামর' বলা হয় না। যদিও 'খামর' হারাম করার দিন তা বিপুল পরিমাণে মদীনায় ছিল। নবী করীম (স)-এর কথা থেকেও তাই বোঝা যায়। বলেছেন, الْخَمْرُ مِنْ هَتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ 'খামর' হয় এই দুটি বৃক্ষ থেকে। সনদের দিক দিয়ে এই হাদীসটি অত্যন্ত সহীহ এই পর্যায়ে বর্ণিত সব হাদীসের তুলনায়। যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'খামর' পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরী হয়'— এর চাইতেও সে হাদীসটি বেশি সহীহ। অতএব এ দুটি ছাড়া অন্যান্যভাবে যে পানীয় তৈরী হয়, তাকে খামর বলা যাবে না। কেননা রাসূলের কথা ঃ 'খামর' এই দুটি গাছ থেকে' জাতীয় পর্যায়ের নাম। এই নামে যেটাকে বোঝায়, তা সবই এর মধ্যে গণ্য। উক্ত হাদীসটি এ হাদীসের বিপরীত। এটির তুলনায় সে হাদীসটি অধিক সহীহও।

এ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, 'খামরকে যে হালাল মনে করবে, সে কাফির। আর তাছাড়া অন্যান্য পানীয়কে হালাল মনে করলে তাকে 'ফাসিক' নামে অভিহিত করা যাবে না। তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে কি করে ? তাহলে বোঝা গেল, তা প্রকৃতপক্ষে খামর নয়। এ-ও বোঝা গেল যে, এসব পানীয়র সিরকা খামর-এর সিরকা নয়। খামর-এর সিরকা আঙ্গুরের পানিয়র তৈরী— হালাল। অন্যান্য সব পানীয়কে খামর বলা যাবে না— এটা যখন প্রমাণিত হল, তখন প্রমাণিত হয় না যে, সেই অন্যান্য পানীয়কে 'খামর' বলা প্রকৃত অর্থে নয়। কোন অবস্থায় তাকে 'খামর' বলা হলেও তা শুধু সাদৃশ্যের কারণে মাত্র এবং তাতে মাদকতা পাওয়া গেলেই বলা যাবে। তাই 'খামর' হারাম করা হলে সেগুলোও সেই সঙ্গেই হারাম হয়ে গেল— বলা চলবে না। কেননা পরোক্ষভাবে নামকরণ প্রকৃত নামকরণে শামিল হতে পারে না। অতএব রাসূলের কথা ঃ পাঁচটি জিনিস থেকে 'খামর' হয় কেবল তখনই বলা যাবে, যদি তাতে মাদকতা পাওয়া যায়। কেবল সেই অবস্থায়ই তাকেও 'খামর' নামে অভিহিত করা যাবে।

কেননা তা মাদকতার সৃষ্টি করে খামর-এর কাজই করেছে এবং তা পান করলে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। হযরত উমর (রা)-এর কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাদকতার উদ্ভব হলেই তাকে 'খামর' নামে অভিহিত করা যায়। কথাটি হচ্ছে ঃ 'খামর তো তা-ই যা বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে।' অল্প পরিমাণ 'নবীয' বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না। ফলে তা বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্নকারী হল না। আর এসব পানীয়র বেশি পরিমাণ মাদক হলেও তার কম পরিমাণ মাদক হয় না। আমাদের কথা থেকে যখন প্রমাণিত হল যে, এসব পানীয়কে 'খামর' বলা প্রকৃত অর্থে নয়, পরোক্ষ অর্থে, তখন এ শব্দটি সেজন্যে যখন তখন ব্যবহার করা যাবে না। হ্যাঁ, তার কোন দলীল পাওয়া গেলেই তবে ব্যবহার করা চলবে। অতএব 'খামর' হারাম হওয়ার আওতায় স্বতঃই তা-ও হারাম হয়ে যাবে না। নবী করীম (স) আবূ তালহার অশ্বটির একটা নামকরণ করেছিলেন, বলেছিলেন ঃ আমি ওটিকে একটা সাগরবত পেয়েছি। অশ্বকে সাগর বলা তখন হয়, যখন সেটিকে অতীব উত্তম, লম্বা পা ফেলে চলা অবস্থায় পাওয়া যাবে। কিন্তু 'সাগর' বললেই সেই উত্তম ঘোড়া বোঝাবে না। নুমান ইবনুল মুনযির-এর কবিতার ছত্র ঃ

فَانَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوْكُ كَوَاكِبُ -

আপনি সূর্য, আর আপনার অধীন বাদশাহরা হচ্ছে তারকা সমতুল্য।

সূর্য তার নাম ছিল না। তারকাও নাম ছিল না বাদশাহদের। এই আলোকে বলা যায়, 'খামর' নামটি অন্যান্য পানীয় সম্পর্কে ব্যবহার করা যাবে না। তা বিশেষভাবে আঙ্গুরের পানি বা রস বোঝায়, যা থেকে প্রকৃত খামর তৈরী হয়। অন্যান্য পানীয়কে খামর বলা হলে তা পরোক্ষভাবে বলা প্রকৃতভাবে বলা নয়।

জুয়া হারাম

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ -

লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে খামর ও জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলে দিন ও দুটিতে বিরাট গুনাহ্ রয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতটি জুয়াকে হারাম ঘোষণা করছে। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ ইতিপূর্বেই আমরা করেছি। বলা যায় الميسر 'আল-মাইসির' নামটি আসলে অভিধানের দৃষ্টিতে খণ্ড-বিখণ্ডিতকরণ। যে জিনিসকেই তুমি খণ্ড-বিখণ্ডিত করলে, সেটিকেই তুমি সহজ করে নিলে, যে লোক সব কিছুকে জায়েয বলে, তাকে الياسر বলা যায়। অর্থাৎ সে সহজতাগামী। কেননা সেই কাটছাঁটকে জায়েয করে। আর الْيَسْرُ হচ্ছে মূলত কর্তন, খণ্ডকরণ। আরবরা উট যবেহ করে টুকরা টুকরা করত। বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করত এবং প্রত্যেক ভাগের উপর তীর দ্বারা জুয়া খেলত। এটাই ছিল তাদের সাধারণ অভ্যাস। যার নামে তীর বের হয়ে আসত, তার উপর লিখিত নামটি তারা লক্ষ্য করত। তখন সেই ভাগটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে করে দিত। তা-ই ছিল তীরসমূহের বিভিন্ন নাম রাখার দাবি। এই পটভূমিতেই সর্বপ্রকারের জুয়া খেলাকে

'মাইসির' বলা হতে লাগল। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাতা, মুআবিয়া ইবনে সালিহ্, আতা, তায়ূস ও মুজাহিদ বলেছেন, الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ। 'মাইসির' অর্থ 'কিমার' জুয়া (Gambling)। আতা, তায়ূস ও মুজাহিদ বলেছেন, বাচ্চাদের ফুটবল খেলাও এই পর্যায়ে গণ্য। আলী ইবনে জায়দ, কাসিম, আবূ উমামাতা, আবূ মূসা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْكِعَابَ الْمَوْسُومَةَ الَّتِي يَزْجُرُ بِهَا زَجْرًا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ –

তোমরা এই সব সুচিহ্নিত বল খেলা পরিহার কর, যাতে কঠিনভাবে বিরত ও আটকিয়ে রাখা হয়। আসলে তা জুয়া পর্যায়ে গণ্য।

সাঈদ ইবনে আবূ হিন্দু আবূ মূসার সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ –

যে লোক পাশা (বা দাবা) খেলবে, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।

হাম্মাদ ইবনে সালমাতা কাতাদাতা, হাল্লাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তিকে তিনি বললেন, তুমি যদি এত এত ডিম খেতে পার, তাহলে তোমাকে এই এই দেয়া হবে। পরে তারা দুজনই হযরত আলী (রা)-এর নিকট গেলেন। বললেন, এটা জুয়া এবং তা জায়েয নয়।

জুয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। বাজি ধরাও জুয়া খেলার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ الْمُخَاطَرُ قِمَارٌ — বাজি ধরা জুয়া। জাহিলিয়াতের লোকেরা ধন-মাল ও স্ত্রীর উপরও বাজি ধরত। তা মুবাহ্ ছিল। শেষ পর্যন্ত তা হারাম ঘোষিত হয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরেছিলেন, যখন কুরআনের, সূরা 'আর-রুম' নাযিল হয়েছিল। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বলেছিলেন বাজির মূল্য বাড়িয়ে দাও এবং মেয়াদও বৃদ্ধি কর। পরে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় জুয়া হারাম হওয়ার দরুন। অবশ্য তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কারোরই কোন দ্বিমত নেই। তবে এই পর্যায়ের কোন কোন কাজের রুখসতও আছে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু উট বা বল্লম নিক্ষেপণের প্রতিযোগিতায় বাজি ধরা, যাতে একজনই বিজয়ী হতে পারে। অন্যরা সেখানে বিজয়ী হতে পারে না। যদি শর্ত করা হয় যে, দুজনের মধ্যে যে বিজয়ী হবে, সে বাজির শর্ত পাবে, তারপর যে বিজয়ী হবে, তাকে দেয়া হবে। এরূপ বাজি বাতিল। এই দুজনের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে দাখিল করা হলে এবং বিজয়ী হলে সে পাবে। বিজয়ী না হলে পাবে না। এটা জায়েয। এই তৃতীয় যে ব্যক্তি দাখিল হল, নবী করীম (স) তাকে হালালকারী বলেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ –

অল্প লোকের উট বা বল্লম চালনা ছাড়া প্রতিযোগিতা জায়েয নেই।

ইবনে উমর (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ঘোড়ার প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। কেবলমাত্র ঘোড়ার প্রতিযোগিতা এইজন্যে যে, তাতে ঘোড়ার দেহ চালনা হয়, দৌড়ানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আর তাতে শত্রু পক্ষের উপর শক্তি ও দাপট প্রদর্শন করা সম্ভব হয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ -

এবং শত্রুদের মুকাবিলায় তোমরা যত শক্তিই দেখাতে পার তার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

তীর চালনাই এই কথার লক্ষ্য। وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ 'এবং সদা সজ্জিত বাঁধা ঘোড়া প্রস্তুত রাখ।' এই কথাটি ঘোড়ার প্রতিযোগিতা করানো জায়েয প্রমাণ করে। কেননা তাতে শত্রুর মুকাবিলায় শক্তির প্রদর্শন হয়। তীর নিক্ষেপণ প্রতিযোগিতায়ও তাই হয়।

আল্লাহ্ জুয়া হারাম করেছেন। এর ফলে ক্রীতদাসদের মধ্যে কুরয়া ফেলে যে রোগী, তাকে মুক্ত করার প্রক্রিয়ায় জুয়া রয়েছে বলে তা-ও হারাম হয়ে গেছে। তাতে কাউকে হক্ দেয়া হয়, কাউকে বঞ্চিত করা হয়। জুয়ার সবচাইতে খারাপ দিক এটাই। সম্পদ বণ্টনে কুরয়া ব্যবহার সেরূপ নয়। কেননা তাতে শরীক প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ভাগ পুরামাত্রায় পেয়ে যায়। তাতে কাউকে বঞ্চিত করা হয় না।

ইয়াতীমের ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ -

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ইয়াতীমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে? তুমি বলে দাও, যে ধরনের কাজ-কর্মে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা করাই উত্তম। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং তাদের খরচপত্র ও থাকা-খাওয়া একত্রিত রাখ, তবে তাতে কোন দোষ হবে না। তারা তো তোমাদের ভাই-বন্ধুই বটে।

আবূ বকর বলেছেন, ইয়াতীম হচ্ছে সে, যে তার বাপ-মার একজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মা মরে গেছে ও বাপ জীবিত থাকলে তখনও তাকে ইয়াতীম বলা যাবে। আর মা বেঁচে থাকলে ও পিতা মরে গেলে তখনও সে ইয়াতীম হয়। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের দিক দিয়ে ব্যাপক হচ্ছে, পিতা মরে গেলে বালক-বালিকা ইয়াতীম হয়, মা বেঁচে থাকলেও। বাপ জীবিত থাকলে ও মা মরে গেলেও বালক-বালিকাদেরকে কখনও কখনও ইয়াতীম বলা হয়। তখনও ইয়াতীম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বলে দেয়া সব হুকুম-আহকাম প্রয়োগ করা যাবে। তবে প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে, অল্প বয়সের বাল-বালিকারা পিতৃহারা হলেই তাদেরকে ইয়াতীম বলা হবে। তাদের পূর্ণবয়স্কতা লাভ করার পর তাদেরকে ইয়াতীম বলা হবে না। বলা হলেও তা হবে পরোক্ষ অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। কেননা তারা ইয়াতীম ছিল, তা খুব বেশি দিনের কথা নয়। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে ইয়াতীম বলার দলীল হল, যে মেয়েলোক স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাকেও يَتِيْمَةٌ 'ইয়াতীম' বলা হয়, পূর্ণবয়স্কা হলে, ছোট বয়সের হলেও। 'রাবীআ'কেও ইয়াতীম বলা হয় তাঁর পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। তাকে বলা হয় دُرَّةٌ يَتِيْمَةٌ কেননা সে বিচ্ছিন্ন। তার কোন নযীর নেই। আবুল আব্বাস আস-সাফ ফাহ্‌র স্তুতিতে লিখিত কিতাবের নাম دُرَّةٌ يَتِيْمَةٌ খারিজীদের বিভিন্ন মত ও মাযহাবকেও 'আল-ইয়াতীমাতু' বলা হয়।

বিচ্ছিন্ন, একক ও নিঃসঙ্গ হওয়ারই নাম 'ইয়াতীম' হওয়া। সেই কারণে ছোট হোক বড় হোক, পিতা-মাতার একজনকে হারালেই তাকে ইয়াতীম বলা যাবে। কিন্তু এই শব্দের প্রকৃত

ও যথার্থ প্রয়োগ হয় ছোট বয়সে পিতা হারালে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইয়ামন, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুআবিয়াতা ইবনে সালিহ, আলী ইবেন আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ যখন নাযিল করলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا -

যারা ইয়াতীমদের ধন-মাল জুলুম করে খায়, তারা তাদের পেটে আগুন ভরে এবং তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামে যাবে। (সূরা নিসা ঃ ১০)

তখনই ইয়াতীমের লালন-পালনকারী মুসলমানরা তাদের সাথে খানাপিনা ও থাকাকে একত্রিত রাখা দূষণীয় মনে করেছিলেন। তখন তারা তাদের ব্যাপারে কি করবেন, এই বিষয়ে নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল হয়। সে আয়াতটির শেষে রয়েছে ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ, 'আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে কষ্টের মধ্যে, সংকীর্ণতার মধ্যে ফেলে দিতেন। কিন্তু তিনি তা চাননি। তিনি বরং তোমাদের কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত ও সহজ করে দিয়েছেন।' বলেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

যে লোক সচ্ছল হবে সে যেন পবিত্রতা রক্ষা করে। আর যে লোক গরীব হবে, সে যেন প্রচলিত ভালো নিয়ম অনুযায়ী খায়। (সূরা নিসা ঃ ৬)

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اِبْتَغُوْا بِأَمْوَالِ الْيَتَامٰى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ -

তোমরা ইয়াতীমদের ধন-মাল এমনভাবে ব্যবহার কর, যেন যাকাত তা খেয়ে না ফেলে।

হাদীসটি হযরত উমর (রা) থেকে 'মওকুফ' হিসেবে বর্ণিত, তাছাড়া হযরত উমর আয়েশা ইবনে উমর (রা) এবং শুরাইহ্ ও তাবেয়ীনের বিপুল সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা ইয়াতীমের ধন-মাল মুনাফার অংশীদারিত্বে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছেন। তা নিয়ে তাঁরা ব্যবসায়ও করেছেন।

উপরোদ্ধৃত আয়াত বহু কয়টি আইন-বিধান সমন্বিত। একটি হচ্ছে اصلاح لهم خير 'তাদের কল্যাণমূলক কাজই ভালো।' ইয়াতীমদের ধন-মাল ও তাদের লালন-পালনকারীদের ধন-মাল সংমিশ্রিত করা জায়েয প্রমাণ করে। ক্রয়-বিক্রয়মূলক কাজ দ্বারা তাতে হস্তক্ষেপ করা জায়েয প্রমাণ করে। অবশ্য যদি তা তাদের ও তাদের ধন-মালের জন্যে কল্যাণকর হয়। সে ধন-মাল মুনাফার ভাগের শর্তে ব্যবসায়েও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। ইয়াতীমের অভিভাবক নিজেও তার ধন-মাল নিয়ে ব্যবসায় করতে পারে। নিত্য নতুন সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে আইন-বিধান জানার জন্যে ইজতিহাদ করা জায়েয, তা-ও এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কেননা আয়াতে যে কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, তা জানার জন্যে তো ইজতিহাদ করতেই

হবে। চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে গেলে সর্বাধিক শক্তিশালী ধারণার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আর তা-ই হচ্ছে ইজতিহাদ। এটাও জায়েয যে, অভিভাবক নিজেই নিজের জন্যে ইয়াতীমের ধন-মাল থেকে কিছু ক্রয় করবে, যদি তা ইয়াতীমের পক্ষে কল্যাণকর হয়। আর তা তখন জায়েয হবে যখন ইয়াতীম যে মাল দিচ্ছে, তার সর্বাধিক মূল্য সে গ্রহণ করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফার মত। অভিভাবক নিজের মাল থেকেও ইয়াতীমের জন্যে বিক্রয় করতে পারবে। কেননা তা-ও তার জন্যে কল্যাণকর।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অভিভাবক ইয়াতীমের বিয়ের ব্যবস্থাও করবে যদি তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। এটা আমাদের মত। তবে তা হতে হবে তার জন্যে সামস্যশীল বংশের সাথে। যার বংশের সাথে তার বংশের সামঞ্জস্য হবে না, তার সাথে নয়। যদি কারোর জন্যে অসিয়ত করা থাকে, তাহলে শুধু এই অসিয়তের কারণে বিয়ে দেয়ার কর্তৃত্ব লাভ করা যায় না। তবে বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে বিচারকর্তা— শাসক-ই ইয়াতীমের বিয়ের ব্যবস্থা করবে এবং কল্যাণের দৃষ্টিতে তার ধন-মালের উপর হস্তক্ষেপ করবে। এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইয়াতীমকে দ্বীন ও সুনীতি-সুসংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দান করবে, যা তার জন্যে কল্যাণকর হবে। সেজন্যে প্রয়োজন হলে ইজারা দানের কাজও করবে। শিক্ষককে মজুরী দিয়ে নিযুক্ত করবে, যেন সে তাকে কাজকর্মের শিক্ষাদান করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত করবে। কেননা এই শিক্ষা ইয়াতীমের জন্যে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর। এই কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, ইয়াতীম যদি রক্ত সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের লালন-পালনে থেকে থাকে, তাহলে সে তাকে শিক্ষা দানের জন্যে তার সম্পদ ব্যয় করতে পারবে।

ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, অভিভাবক নিজের ধন-মালও সেজন্যে ব্যয় করতে পারবে। তাঁরা এ-ও বলেছেন যে, ইয়াতীমকে কোন কিছু দান করা হলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা তাতেও ইয়াতীমেরই কল্যাণ নিহিত। আয়াতটির বাহ্যিক প্রকাশ থেকেই এই সব কথা জানা ও বোঝা যায়।

আয়াতে 'লোকেরা জিজ্ঞাসা করে'— এই লোকেরা হচ্ছে ইয়াতীমদের অভিভাবকগণ, যারা তাদের লালন-পালন-সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কোন মুহররম আত্মীয়ও এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কেননা ইয়াতীমকে রাখা, তার সংরক্ষণ করা ও তার লালন-পালন করার তার অধিকার রয়েছে। আর 'তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করাই অধিক ভালো কাজ' কথাটিতে তাদের ধন-মালের উপর কল্যাণের দৃষ্টিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার প্রমাণিত হয়। তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও এই পর্যায়েরই কাজ। তাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলা ও তাদেরকে সুশিক্ষা দান-ও তাই।

আল্লাহ্‌র ব্যবহৃত শব্দ "خَيْرٌ"-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি, আমরা যেসব দিকের উল্লেখ করেছি, সেই সব দিক দিয়ে ইয়াতীমের জন্যে কর্ম সম্পাদন করা। তাতে অভিভাবক যথেষ্ট সওয়াবের অধিকারী হবে। কেননা আল্লাহ্ নিজেই এই সব কাজকে "خَيْرٌ" বলেছেন। আর যা "خَيْرٌ" তার সওয়াব পাওয়া নিশ্চিত। সওয়াব পাওয়াটা যদিও আবশ্যিক নয়, তবে তার ওয়াদা করা হয়েছে। তা থেকে বোঝা গেল, ইয়াতীমের ধন-মাল দিয়ে ব্যবসায় ইত্যাদি করা অবশ্য কর্তব্য নয়। ইয়াতীমকে বিয়ে দেয়ার জন্যে জোর প্রয়োগ ও জবরদস্তি করারও কোন অধিকার অভিভাবকের নেই। কেননা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে তা বড় জোর মুস্তাহাব বলা যেতে পারে। উপদেশ দেয়া ও বোঝানোর অধিকার আছে বলে মনে হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ -

আর যদি তোমরা তাদের ধন-মালের সাথে তোমাদের ধন-মালের সংমিশ্রণ কর, তবে তারা তোমাদের ভাই মাত্র।

এতে এই সংমিশ্রণ করাকে মুবাহ বলা হয়েছে। তাদের ধন-মাল নিয়ে ব্যবসায় করা মুবাহ মাত্র। অভিভাবক ইয়াতীমের সাথে বৈবাহিক দিক দিয়েও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তার নিকট নিজের কন্যা বিয়ে দিতে পারে। কিংবা নিজের কোন পুত্রের সাথে লালিতা-পালিতা ইয়াতীম কন্যাকে বিয়েও দিতে পারে। এতেও ইয়াতীমের সাথে নিজের সংমিশ্রণই হতে পারে, নিজের পরিবারের লোকদের সাথেও সংমিশ্রণ হতে পারে। এই সব সংমিশ্রণই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আয়াতের শব্দ المخالطة থেকে যে এই সব সংমিশ্রণই বোঝায়, তার প্রমাণ হল আরবদের নিত্যকার কথা। তারা বলে فُلَانٌ خَلِيْطُ فُلَانٍ 'অমুক অমুকের সাথে সংমিশ্রিত'— কথাটি বলা হয়, যখন একজন অপর জনের সাথে শরীক হয়, যখন পরস্পর মিলিত কাজকর্ম করে, ক্রয়-বিক্রয় করে, লেন-দেন করে— শরীক না হয়েও। অনুরূপভাবে বলা হয় ঃ قَدْ اِخْتَلَطَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ 'অমুক অমুকের সাথে মিলে মিশে গেছে'— তা বলা হয় যখন পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সবই الخلطة শব্দ থেকে গৃহীত। তার অর্থ শরীক হওয়া অধিকার লাভের ক্ষেত্রে, তাতে পরস্পর কোন পার্থক্য বা তারমত্য ছাড়াই। এই সংমিশ্রণ জায়েয কল্যাণকর তার দৃষ্টিতে। তার দুটি দিক, একটি আয়াতে صلاح শব্দটি ইয়াতীম সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে শুরুতেই ব্যবহৃত হয়েছে। এটা অগ্রবর্তী শর্ত। আর দ্বিতীয়, পারস্পরিক সংমিশ্রণের কথা বলার পর আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ 'মুফসিদ'— ফাসাদকারী ও কল্যাণকারীর মধ্যকার পার্থক্য আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আয়াতটি যখন ইয়াতীমের মাল অভিভাবকের মালের সাথে সংমিশ্রিত করা জায়েয করেছে এমন পরিমাণে, যাতে নিশ্চিত হবে যে, ইয়াতীম তার মাল-ই খাচ্ছে, অন্যের মাল নয়। এ পর্যায়ে একটি হাদীস ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

লোকেরা বিদেশ ভ্রমণে বের হয়ে পরস্পর মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পাথেয় বের করে একত্রিত করে নেয় এবং তা থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করে। অথচ একত্রিত সব লোকের খাওয়ার পরিমাণ এক নয়। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ এই কাজকে মুবাহ করেছেন। ইয়াতীমের মালের সাথে অভিভাবকের মালের অনুরূপ সংমিশ্রণও আল্লাহ মুবাহ করেছেন। তাই পূর্ণ বয়স্ক সমঝদার লোকদের আত্মসন্তুষ্টির ভিত্তিতে উক্তরূপ সংমিশ্রণ ঘটানো অধিক মাত্রায় জায়েয হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কুরআনে উল্লিখিত 'কাহাফ'বাসীদের কাহিনী বর্ণনায় এরূপ সংমিশ্রণের উল্লেখ হয়েছে, বলা হয়েছে।

فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا -

অতপর তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর, সে উত্তম খাবার তালাস করে নিয়ে আসবে। (সূরা কাহাফ ঃ ১৯)

আয়াতে উল্লিখিত 'মুদ্রা' তাদের সকলের সম্মিলিত, সংমিশ্রিত। তা তাদের সকলেরই

সম্মিলিত মালিকানা। তাদের সকলের জন্যে খাবার একত্রে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে, যেন সকলেই একসাথে সে খাবার খেতে পারে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তোমরা তাদের সাথে সংমিশ্রণ কর, তাহলে তারা তো তোমাদের ভাই-ই' প্রমাণ করছে যে, লোকদের পারস্পরিক শরীক হওয়া ও মূলধন একত্রিত-সংমিশ্রিত করা জায়েয। তা দিয়ে যে কল্যাণমূলক কাজ তারা করতে সচেষ্ট হবে, তাতে তারা সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে। কেননা 'তারা তো তোমাদের ভাই' কথাটি তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে। ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ সাধন করা খুবই পছন্দনীয়— মুস্তাহাব কাজ। কেননা আল্লাহ্ অপর আয়াতে আরও স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ -

মুমিনরা পড়স্পরের ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত কর। (সূরা হুযুরাত ঃ ১০)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ

আল্লাহ্ বান্দার সাহায্যে থাকবেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইর কল্যাণে নিযুক্ত থাকবে।

এটা 'তারা তো তোমাদের ভাই' কথারই ব্যাখ্যা। এ থেকে মুস্তাহাবই বোঝায়, পথ দেখানো, উপদেশ দান বোঝায়। আর তার দরুন সওয়াবের অধিকারী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে কষ্টের ভিতর ফেলতেন, অর্থাৎ সংকীর্ণতার কষ্টে জর্জরিত করতেন। তাহলে ইয়াতীমের মাল ও খাদ্যের সাথে সংমিশ্রণ ও তাদের ধন-মালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয়া হতো না। বরং তাদের ধন-মাল থেকে তোমাদের ধন-মালকে সম্পূর্ণ আলাদা করে আদেশ করতেন। তাদের ধন-মালে হস্তক্ষেপ করাকে ওয়াজিব করে দিতেন। তাদের মাল দিয়ে ব্যবসায় করে মুনাফা অর্জনের আদেশ করতেন। কিন্তু না, এসব কাজকে তিনি ওয়াজিব ফরয করেন নি। তা মুবাহ করেছেন কল্যাণের দৃষ্টিতে এবং তাতে সওয়াব দেয়ার ওয়াদাও করেছেন। বাধ্যতামূলক করে দেন নি। তা করে দিলে তোমাদের জীবন সংকীর্ণ ও কর্তব্য বোঝার চাপে জর্জরিত হয়ে পড়ত।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাহলে তারা তো তোমাদের ভাই' বুঝিয়ে দেয় যে, মুমিনদের শিশুরাও মুমিনদের মধ্যে গণ্য আইনের দিক দিয়ে, কেননা আল্লাহ তাদেরকে আমাদের ভাই বলেছেন। বলেছেন 'মুমিনরা পরস্পরের ভাই।'

মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ -

মুশরিক মেয়েরা ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে না।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, মুআবিয়া ইবনে সালিহ, আবূ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমরা মুশরিক মেয়েদেরকে ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিয়ে

করবে না'— এই সাধারণ নিষেধ থেকে আহলি কিতাব, ইয়াহূদী, খ্রীস্টানদের বাদ দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে বলেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ -

...... এবং সুরক্ষিতা নারীদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্য থেকে— যখন তোমরা তাদের মহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনে তাদের সংরক্ষণকারী হয়ে স্বাধীন লালসা পূরণ ও গোপন বন্ধুত্বকারী হিসেবে নয়— বিয়ে করতে পার। সূরা মায়িদাহ ঃ ৫)

বিয়ে-নিষিদ্ধ মুশরিক নারীদের থেকে আহলি কিতাব নারীদের বিয়ে করা এ আয়াতে জায়েয ঘোষিত হয়েছে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, কিতাবী নারীদের ব্যাপারে এটা সাধারণ ও নির্বিশেষ অনুমতি।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, উবায়দুল্লাহ ইবনে নাফে ইবনে উমর (রা) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আহলি কিতাবের খাদ্য খাওয়ায় কোন দোষ মনে করেন না। তবে তাদের মেয়ে বিয়ে করাকে অপছন্দ করতেন। আবূ উবায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ, লাইস, নাফে, ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট ইয়াহূদী কিংবা নাসারা (খ্রীস্টান) মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে যখনই প্রশ্ন করা হতো, তখনই বলতেন ঃ আল্লাহ মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে হারাম করেছেন। আমি শিরক-এর তুলনায় বড় কোন পাপ আছে বলে জানি না। অথবা বলেছেন ঃ তুমি বলবে, তার রব্ব ঈসা; কিংবা আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যের একজন বান্দা— এর কোন্‌টা বড় কথা।

দেখা গেল, প্রথমোক্ত হাদীসে তিনি আহলি কিতাব মেয়ে বিয়ে করা অপছন্দ করেছেন, কিন্তু তা হারাম, একথা বলেন নি। আর দ্বিতীয় হাদীস তিনি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু কোন চূড়ান্ত কথা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বলেন নি। তবে জানিয়েছেন যে, খ্রীস্টানদের ধর্মমত শিরক। আবূ উবায়দ আলী ইবনে সাদ, আবুল সলীহ, মাইমুন ইবনে মেহরান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে বললাম ঃ আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে আহলি কিতাব লোকদের সাথে সব সময় সংমিশ্রণ ঘটে। এরূপ অবস্থায় আমরা কি ওদের মেয়েদের বিয়ে করতে পারি ? ওদের খাবার খেতে পারি ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি আমার সামনে হালাল হওয়ার আয়াত ও হারাম হওয়ার আয়াত দুটিই পাঠ করলেন। আমি বললাম, আপনি যে আয়াত পাঠ করলেন, তা আমরাও তো পড়ি। আপনি বলে দিন, আমরা ওদরে মেয়ে বিয়ে কবর কিনা, ওদের খাবার খাব কি না ? এর পরও তিনি সেই হালাল হওয়ার ও হারাম হওয়ার আয়াত পাঠ করলেন।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে উমর (রা) স্পষ্ট জবাব না দিয়ে শুধু মুবাহ হওয়ার ও নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত পাঠ করেই ক্ষান্ত থাকলেন, এর কারণ হচ্ছে, তিনি হুকুম তো জানতেন, কিন্তু হালাল বা হারাম— কোন একটির উপর তিনি নিশ্চিত ও ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি অপছন্দ করতেন বলে যে কথাটি বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু মাকরূহ বোঝায়, হারাম বোঝায় না। যেমন যুধ্যমান আহলি কিতাব লোকদের মেয়ে বিয়ে করাকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন। হারাম

মনে করতেন না। বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীন আহলি কিতাব মেয়েদের বিয়ে করাকে মুবাহ মনে করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ওয়াসেতী জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, সাঈদ ইবনে আবূ মরিয়ম, ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ূব ও নাফে ইবনে ইয়াযীদ, উমর মাওলা ইফরাতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনুস সায়িবকে বলতে শুনেছি যে, উসমান (রা) নায়েলা বিনতিল ফারাফিযা আল-কলবীয়া-কে বিয়ে করেছিলেন, সে ছিল খ্রীস্টান। তার পূর্বে তাঁর বিবাহ বন্ধনে মুসলিম মহিলা ছিলেন। নাফে ছাড়া উক্ত সনদে বলা হয়েছে যে, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ সিরিয়ায় এক ইয়াহূদী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। হুযায়ফা (রা)ও এক ইয়াহূদী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাকে ত্যাগ করার জন্যে হযরত হুযায়ফা (রা)-কে চিঠি লিখেছিলেন। জবাবে তিনি লিখেছিলেন ঃ ইয়াহূদী মেয়ে বিয়ে করা কি হারাম ? জবাবে খলীফাতুল মুসলিমীন লিখেছিলেন ঃ না, হারাম নয়, একথা ঠিক। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে, আপনি ওদের থেকে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। বহু সংখ্যক তাবেয়ীনও আহলি কিতাব মেয়ে বিয়ে সরা মুবাহ বলেছেন। আল হাসান, ইবরাহীম ও শবী প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য। সাহাবা ও তাবেয়ীনের কেউ তাদের বিয়ে করা হারাম বলেছেন বলে আমরা জানি না। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতেও তিনি তা হারাম মনে করতেন এমন কোন দলীল নেই। বড় জোর বলা যায়, তিনি মাকরূহ মনে করতেন। যেমন হযরত উমর (রা) হুযায়ফা (রা)-এর কিতাবী মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে অপছন্দের— মাকরূহ হওয়ার— কথাই প্রকাশ করেছেন, হারাম বলেন নি। তাছাড়া হযরত উসমান, তালহা ও হুযায়ফা (রা) সাহাবীগণ কিতাবী মেয়ে বিয়ে করেছেন। যদি তা হারাম হতো, তাহলে তা নিশ্চয়ই সাহাবীদের নিকট প্রকাশমান হতো। তাঁরা নিজেরাই তা করতেন না বা এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা জায়েয, এই ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত ছিল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ -

মুশরিক মেয়েলোক তোমরা বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করছে।

কিতাবী মেয়ে বিয়ে করাকে হারাম ঘোষণা করেনি। তা দুটি দিক দিয়ে বিবেচ্য। একটি এই যে, 'মুশরিক' বলতে সাধারণভাবে সব মূর্তিপূজারীও শামিল হয়। তাতে কিতাবী মেয়েলোক গণ্য হয় না। গণ্য হওয়ার কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা হতো। কুরআনের আয়াতঃ

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَاالْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ -

কাফির লোকেরা এবং মুশরিক লোকেরাও পছন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে কোন কল্যাণ নাযিল হোক। (সূরা বাকারাহ ঃ ১০৫)

বলেছেন ঃ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ -

আহ্লি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফির ছিল (তারা নিজেদের কুফর থেকে) বিরত ও বিচ্ছিন্ন হতে প্রস্তুত ছিল না। (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ১)

এ দুটি আয়াতেই আহলি কিতাব থেকে আলাদা করে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি নামের মাঝে واو ব্যবহৃত হওয়ায় দুটি পরস্পর বিপরীত— একটিতে অন্যটি শামিল নয়, প্রমাণিত হচ্ছে। আহলি কিতাবরা মুশরিক নয়, মুশরিকরা আহলি কিতাব নয়, এটাই স্পষ্ট হয়। হ্যাঁ, যদি উভয়কে একই পর্যায়ে গণ্য করার কোন দলীল পাওয়া যায়, তাহলে ভিন্ন কথা হবে। দুটি আয়াতেই আহলি কিতাব ও মুশরিক আলাদা-আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন এ আয়াতটিতে ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيكَالَ -

যে লোক আল্লাহ্র, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হবে ......।

এ আয়াতে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও স্বাতন্ত্র বোঝাবার উদ্দেশ্যে। জিবরাইল ও মীকাইল ফেরেশতার মধ্যে শামিল সত্ত্বেও তাঁদেরকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আহলি কিতাব ও মুশরিকদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। যার দরুন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুশরিকরা আহলি কিতাবের মধ্যে শামিল নয়, আহলি কিতাবরা গণ্য নয় মুশরিকদের মধ্যে। অতএব মুশরিকদের মধ্যে কেবল মুর্তিপূজারী মেয়ে বিয়ে করাই হারাম হবে।

আর দ্বিতীয় দিক এই যে, আহ্লি কিতাব ও মুশরিক নির্বিশেষে সকলেই যদি এই পর্যায়ে গণ্য হয়ে থাকত, তাহলে আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের সংরক্ষিত মেয়েরাও হালাল। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৫)

—এর মধ্যেই শামিল হয়ে যেত। এর কোন একটি আয়াত অপর কোন আয়াত দ্বারা মনসূখও হয়নি। দুটিই নিজ নিজ স্থানে বহাল এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই তা কাজে লাগানো সম্ভব।

যদি বলা হয়, এই শেষোক্ত আয়তটি দিয়ে সেসব আহলি কিতাব মেয়েদের বোঝানো হয়েছে যারা ইসলাম কবুল করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ -

আহলি কিতাবের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে এবং তোমাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে তা-ও বিশ্বাস করে।(সূরা আলে- ইমরান ঃ ১৯৯)

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ -

আহ্লি কিতাব লোকদের মধ্যে একটা সদা প্রস্তুত জনগোষ্ঠী রয়েছে, রাত্রি বেলা আল্লাহ্র আয়াত তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদাও করে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৩)

জবাবে বলা যাবে, এ একটা বাজে ধরনের কথা। এই কথাটি কথকের নির্বুদ্ধিতারই প্রমাণ করে। দলীল হিসেবে যে আয়াত দুটি পেশ করা হয়েছে, তা-ও দলীলরূপে গ্রহণীয় নয়। তা দুটি

দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি, এই নামটি সাধারণভাবে বলা হলে তাদের মধ্যকার কাফিরদেরকেও শামিল করে। যেমন এ দুটি আয়াত ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ -

কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের থেকে যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দেবে।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ -

আহলি কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে যার নিকট একটা বড় সম্পদ যদি তুমি আমানত রাখ, তাহলে সে তা তোমার নিকট যথাযথ ফিরিয়ে দেবে।

(সূরা আলে-ইমরানা ঃ ৭৫)

এই ধরনের আরও যেসব আয়াতে নিঃশর্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান উভয়ই শামিল। তা থেকে এ কথা বোঝা যায় না যে, আহলি কিতাব ছিল পরে ইসলাম কবুল করেছে তাদেরকেই বুঝিয়েছে। তা শুধু ঈমানের উল্লেখের কারণে বোঝা যায় মাত্র। লক্ষণীয় যে, তাদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম কবুল করেছে, আল্লাহ যখন কেবল তাদেরকেই বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানে তাদের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইসলাম কবুল করারও উল্লেখ করেছেন। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ওরা আহলি কিতাব ছিল, পরে ইসলাম কবুল করেছে। যেমন বলেছেন ঃ

لَيْسُوْا سَوَآءً ۭ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ -

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

কিন্তু সমস্ত আহলি কিতাব একই ধরনের লোক নয়। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা সত্য সঠিক পথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে ....।

আর আহলি কিতাবের মধ্যে এমন লোক-ও আছে, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। (সূরা আলে- ইমরান ঃ ১১৩ ও ১১৯)

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, আয়াতে المؤمنت। মুমিন মেয়েদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এই মুমিন মহিলাদের মধ্যে তারাও শামিল যারা আহলি কিতাব ছিল, পরে ইসলাম কবুল করেছে। আর তারাও এদের মধ্যে গণ্য যারা আসলেই ঈমানদার ছিল। কেননা তিনি বলেছেনঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

ঈমানদার মেয়েদের মধ্যে যারা সংরক্ষিত এবং তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে যারা সুরক্ষিত ...। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৫)

তাহলে প্রথম যে মুমিন সংরক্ষিত মহিলাদের কথা বলা হয়েছে, তাতে আহলি কিতাবেব সংরক্ষিতা মেয়েরা কি করে শামিল হতে পারে? শামিল হলে তাদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করা প্রয়োজন কি ছিল?

উক্ত কথার লোকেরা অনেক সময় দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করে থাকেন। হাদীসটি আলী ইবনে আবূ তালহা থেকে বর্ণিত। বলেছেন, কাব ইবনে মালিক (রা) আহলি

কিতাবের একটি মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। বললেন ঃ انها لاتحصنك না, সে তোমার পবিত্রতা সংরক্ষিত করতে পারবে না।

রাসূলের এই নিষেধ কিতাবী মেয়ে বিয়ে করা বিপর্যয়ের কারণ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। বলা যেতে পারে যে, এই হাদীস সূত্রের দিক দিয়ে منقطع বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত। এরূপ হাদীস নিয়ে কুরআনের স্পষ্ট প্রকাশ্য ঘোষণার উপর আপত্তি তোলা বা ভিন্ন মত প্রমাণ করতে চেষ্টা করা চলে না। কেননা কুরআন তো সে কথাকে নাকচ করে দিয়েছে। আর তাতে কোন বিশেষীকরণ নেই। যদি তা প্রমাণিতও হয়, তাহলেও হতে পারে তা শুধু মাকরূহ, যেমন হযরত উমর (রা)-এর কথায়ও সেই মাকরূহই বলা যায়। তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে হারাম বলে নিষেধ করেন নি, তিনি মাকরূহ মনে করেন, এই হিসেবেই নিষেধ করেছিলেন। তাছাড়া রাসূলের কথা ঃ 'সে তোমার পবিত্রতা রক্ষা করবে না' لاتحصنك যদি প্রমাণিতও হয়, তবু তাতে বিয়ে জায়েয নয়, প্রমাণিত হয় না। কেননা হতে পারে, মেয়েটি নাবালেগ ছিল। আর নাবালেগা তাঁর পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে না, কথাটি তো সত্য। ক্রীতদাসীও তাই। তবে এ দুটি ক্রীতদাসী ও অল্প বয়স্কা— মেয়ে বিয়ে করা যে জায়েয, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মুসলমানদের সাথে যে আহলি কিতাবরা যুদ্ধরত, তাদের মেয়ে বিয়ে করা পর্যায়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল ওয়াসেতী, জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, উব্বাদ ইবনুল আওয়াম, সুফিয়ান ইবনে হুসায়ন, হিকাম, মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

لَاتَحِلُّ نِسَاءُ اَهْلِ الْكِتَابِ اِذَا كَانُوا حَرْبًا -

আহলি কিতাব যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে তাহলে তাদের মেয়েদের বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়।

এই কথা বলার পর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

হে মুসলমান, তোমরা যুদ্ধ কর সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়। (সূরা তওবা ঃ ২৯)

...... শেষ শব্দ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ 'তারা ছোট'।

আল-হিকাম বলেছেন; আমি এই ঘটনা ইবরাহীম নখয়ীকে বললাম। তিনি তা শুনে বিস্মিত হলেন।

আবূ বকর বলেছেন, সম্ভবত ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত কথা বলেছেন মাকরূহ মনে করে। হানাফী ফিকাহবিদগণও তা মাকরূহ মনে করেন, তবে হারাম মনে করেন না।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও আহলি কিতাবের মধ্য থেকে মুসলমানদের সাথে যুধ্যমান লোকদের মেয়েদের বিয়ে করা মাকরূহ মনে করতেন।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের মধ্যে সুরক্ষিত মেয়েরা ....।

এতে যুধ্যমান ও অ-যুধ্যমান আহলি কিতাব মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যিম্মীরাও এদের মধ্যে শামিল। কোন দলীল ছাড়া কাউকে বিশেষীকৃত করা জায়েয নয়।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা' কথাটির সাথে বিয়ে জায়েয হওয়া না-হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। বিয়ে নষ্ট হওয়ারও কোন কারণ নেই। যুদ্ধ ফরয হওয়াটা যদি তাদের বিয়ে সহীহ না হওয়ার কোন কারণ হতো, তাহলে খাওয়ারিজদের মেয়ে বিয়ে করাও জায়েয হতো না, বিদ্রোহী লোকদের মেয়ে বিয়ে করাও সহীহ হতো না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ -

তোমরা বিদ্রোহী ফিরকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র দিকে নমনীয় হয়ে ফিরে আসে। (সূরা হুযরাত ঃ ৯)

বোঝা গেল, যুদ্ধ করা ফরয হলেই তাদের মেয়ে বিয়ে করা সহীহ হবে না— এমন কথা নেই। তবে আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ যে তা মাকরূহ মনে করেছেন, তার কারণ আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْأَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ -

আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার জনগোষ্ঠীকে সেই লোকদের প্রতি বন্ধুত্ব সম্পন্ন পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা ও বিরুদ্ধতা করে,— তারা তার বাপ-দাদা, পুত্র -সন্তান, ভাই বা বংশের লোক-ই হোক-না-কোন। (সূরা মুযাদিলাহ ঃ ২২)

বিয়ে প্রেম ভালবাসা পোষণকে ফরয করে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً -

এবং তিনি তোমাদের— স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার সৃষ্টি করে দিয়েছে। (সূরা রূম ঃ ২১)

তাই যখন জানা গেল যে, বিয়ে প্রেম-ভালোবাসার উদ্রেককারী এবং তা কর্তব্য, এইজন্যে যুধ্যমান আহলি কিতাবের মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন তাঁরা এই বিয়েকে মাকরূহ মনে করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বন্ধুত্ব পোষণ করে সেই লোকদের প্রতি, যারা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা করে' এ পর্যায়ে আহলি কিতাবই গণ্য। যিম্মী অমুসলিমরা গণ্য নয়। কেননা حاد শব্দটি حد থেকে উদ্ভূত। ওরা حد-এর মধ্যে রয়েছে। আমরাও حد-এর মধ্যেই আছি। বিভক্তি ও বিভাজনও অনুরূপ কথা। অর্থাৎ তারা এক ভাগে, আমরা আর এক ভাগে। আর এটাই আহলি কিতাবের পরিচিতি। যিম্মীদের নয়। এই কারণে তারা এই বিষয়কে মাকরূহ বলেছেন।

আর একটি দিক হল, এই বিয়ের ফলে যে সন্তান জন্মিবে, তা দারুল হরবে জন্মিবে। দারুল হরবের শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবধারা ও চরিত্র তারা অবশ্যই গ্রহণ করবে। তা নিশ্চয়ই ইসলাম সম্মত

হবে না। এই কারণেই সে বিয়েকে মাকরূহ মনে করা হয়েছে। এই বিয়ে নিষেধকরণের মূল কারণও এই। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْمُشْرِكِيْنَ -

মুশরিকদের প্রভাবাধীন বসবাসকারী মুসলিম ব্যক্তির দায়িত্ব থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

তিনিও বলেছেন ঃ 'মুশরিকদের সাথে বসবাসকারী মুসলিমের কোন দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না।'

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার জনগোষ্ঠীকে তুমি সেই লোকদের প্রতি বন্ধুত্বশীল পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোণষ করে যে বিশেষভাবে নিশ্চিতকারী এই কথার ঃ তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্তদের সুরক্ষিত মেয়েগণ— একথা তো তুমি অস্বীকার কর না ? এই কথাটি কেবলমাত্র যিম্মী মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যুধ্যমান মেয়েদের সম্পর্কে নয়।

জবাবে বলা যাবে, প্রথমোক্ত আয়াতটি বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পোষণ করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু নিছক বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে এ আয়াত কিছুই বলছে না। যদিও বিয়ে বন্ধুত্ব ভালোবাসার কারণ হয়। কিন্তু শুধু বিয়েটাই তো আর বন্ধুত্ব ভালোবাসার নাম নয়। তবে তা-ই যে শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব-ভালোবাসার সৃষ্টি করে, তা-ও নিঃসন্দেহ। এই কারণে মনীষীরা ওদের ছাড়া অন্য মেয়ে বিয়ে করাকে অধিক পছন্দ করেছেন, ওদের বিয়ে করা মাকরূহ ঘোষিত হয়েছে।

যদি বলা হয়, মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করার পর-পরই বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ 'ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে।' বোঝা যায় যে, ঠিক এই কারণেই ওদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। ঠিক এই কারণই নিহিত রয়েছে আহলি কিতাব, যিম্মী ও যুধ্যমান লোকদের মেয়ে বিয়ে করার ক্ষেত্রে সমানভাবে। তাই এই কারণেই ওদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম ঘোষিত হয়েছে।

এর জবাবে বলা যাবে, একথা জানা আছে যে, মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করার আসল কারণ ঠিক এটাই নয়। কেননা যদি তা-ই হতো, তাহলে তাদেরকে বিয়ে করা কোন অবস্থায়ই হালাল হওয়া উচিত ছিল না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা মুবাহ ছিল, যদিও পরে তাদের বিয়ে করা হারাম ঘোষিত হয়। তখনও তারা জাহান্নামের দিকে আমাদেরকে ডেকে নেয়ার কাজটা করছিল। বোঝা গেল, ওদের বিয়ে করা হারাম হওয়ার মৌল কারণ এটাই নয়। হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রীও কাফির ছিল, অথচ তারা দুইজন আল্লাহ্‌র দুই বরগজীদাহ নবীর স্ত্রী ছিল। আল্লাহ নিজেই তাদের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ -

আল্লাহ্ কাফিরদের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন নূহ ও লূত-এর স্ত্রীদের কথা। ওরা দুজন আমাদের দুই নেক বান্দার স্ত্রী ছিল। পরে তারা দুইজনের সাথে খিয়ানত করেছে। কিন্তু তারা দুজন তাদেরকে আল্লাহ্র ফয়সালা থেকে রক্ষা করতে পারেনি একবিন্দুও। বলা হয়েছে, তোমরা দুজন জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ কর।

(সূরা তাহ্রীম ঃ ১০)

দেখা গেল— দুজনের স্ত্রীরা কাফির, তা সত্ত্বেও তাদের সাথে নবীদ্বয়ের বিয়ে সঠিক রূপেই আল্লাহ্ মেনে নিয়েছেন। বোঝা গেল, কুফর বিয়ে সহীহ না হওয়ার আসল কারণ নয়। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা হারাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছেন যে, 'ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে।' বাহ্যত মুশরিক মেয়ে বিয়ে করা বাতিল হওয়ার এটাই কারণ বলে মনে হয়। এরূপ তাৎপর্যই শরয়ী ইল্লাতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। তাই যে নামের সাথে হুকুমটা সম্পর্কিত, তাতে কোন তাগিদ নেই। অতএব তার বিশেষীকৃতকরণ সঙ্গত যেমন নামের বিশেষীকরণ। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'এবং কিতাব পাওয়া লোকদের সংরক্ষিতা মেয়েলোক'— নামের সাথে সম্পর্কিত হারামকরণকে এর সাথে বিশেষীকরণ করা সম্ভব ও বৈধ। তাহলে 'শরয়ী ইল্লাত' হিসেবে যে তাৎপর্য পেশ করা হয়েছে তার উপর হুকুমটিকে বিশেষীকরণ করা যেতে পারে। তার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্র কথা ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ -

শয়তান তো শুধু মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শক্রতা ও হিংসা-বিদ্বেষের উদ্রেক করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত করতে। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৯১)

মদ্যপানের ফলে যে নিষিদ্ধ ব্যাপারাদি ঘটে, সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে মূল আয়াতে এবং তাকেই ইল্লাতের স্থানে বসানো হয়েছে। কিন্তু তার কার্যে তাকে রাজী করা কর্তব্য নয়। কেননা যদি তা-ই হতো তাহলে তো সকল প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদী, লেন-দেনের চুক্তিই হারাম হয়ে যেত এইজন্যে যে, শয়তান এই সবের মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের মধ্যে শক্রতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট রয়েছে। শয়তান এগুলোর সাহায্যে আমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির থেকে বিরত রাখতে চাইতে পারে। তাই যেসবের মধ্যে এই তাৎপর্য রয়েছে, সেই সবকে গণ্য করা যখন জরুরী নয়; বরং যে জিনিসটির উল্লেখ করা হয়েছে, হুকুমটাকে কেবল সেই জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা এবং অন্য কোন কিছু তার মধ্যে শামিল না করাই উদ্দেশ্য। যেসব শরয়ী কারণ বা ইল্লাতের ব্যাপারে অকাট্য দলীল এসেছে, সেই সবের হুকুমও সেইরূপই হবে। শরয়ী ইল্লাতসমূহ বিশেষীকরণের ক্ষেত্রে এভাবেই যুক্তি পেশ করা হয়। অতএব যেমন বলেছি, বিয়ে হারাম হওয়ার হুকুমটি কেবলমাত্র মুশরিক মেয়েদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যদেরকে তার মধ্যে শামিল করা যাবে না। ওরা জাহান্নামের দিকে আমাদেরকে ডাকে। এটা বলা হয়েছে মুশরিক নারী বিয়ে করা নিষেধের উপর তাগিদ বোঝাবার জন্যে। অতএব এই নিষেধ অন্য কাউকে আওতার মধ্যে আনবে না। কেননা শিরক ও জাহান্নামের দিকে ডাক ওদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। তা কিতাবী মেয়েলোকদের মধ্যে অনুপস্থিত। এ কথাও বলা হয়েছে যে, আরবের যুধ্যমান মুশরিকদের মধ্যে ছিল আল্লাহ্র

রাসূলের এবং মুমিনদের জন্যে। তাই তাদেরকে বিয়ে করা থেকে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যেন তাদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি কারণ হয়ে দাঁড়াতে না পারে। কেননা তাহলে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে পড়তে পারে। তবে এই নিষেধ যিম্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার কারণ হবে না, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তো কোন প্রশ্ন নেই। এই কারণ যদি কিতাবী যুধ্যমান মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেখা দেয়, তাহলে নিষেধের মৌলিক কারণ থাকার দরুন তাদেরকে বিয়ে করাও নিষিদ্ধ হবে। কাজেই এই হুকুমের কারণে কার্যের দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোন উপায় নেই।

আল্লাহ্‌ কথা ঃ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরীক মেয়ের তুলনায় অনেক ভালো।

মুমিন ক্রীতদাসী বিয়ে করা জায়েয প্রমাণ করে স্বাধীনা বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায়ও। কেননা আল্লাহ্‌ স্বাধীনা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করার পরিবর্তে ক্রীতদাসী মুমিন মেয়ে বিয়ে করার আদেশ করেছেন ঈমানদার লোকদেরকে। যে লোক স্বাধীনা মুশরিক মেয়ে বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী, সে স্বাধীনা মুসলিম মহিলাও বিয়ে করতে পারে। কেননা বিয়ের মহরানার পরিমাণে এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবস্থা যখন এই, তখন 'মুশরিক মেয়ে তোমাদের খুব বেশী পছন্দ হলেও ঈমানদার ক্রীতদাসী অনেক ভালো'—আল্লাহ্‌র এই কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। মুশরিক মেয়ে বিয়ে না করে মুমিন ক্রীতদাসী বিয়ে করার উৎসাহ দান কেবল তখনই সহীহ্‌ হতে পারে, যদি সে মুসলিম স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ্যের অধিকারী হয়। আয়াতে একথা শামিল হয়েছে যে, স্বাধীনা মেয়ে বিয়ে করা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্রীতদাসী মুমিন মেয়ে বিয়ে করা জায়েয। অপর দিক দিয়ে একথাও বোঝা যায় যে, সামর্থ্যবান ও সামর্থ্যহীন নির্বিশেষে মুশরিক নারী বিয়ে করা মুসলমানদের জন্যে সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ। ধনী ও গরীব সমান। এই কথার পরই বলা হয়েছে ঃ মুশরিক মেয়ে অপেক্ষা মুমিন ক্রীতদাসী অধিক উত্তম। কাজেই তাকে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাকে ক্রীতদাসী বিয়ে করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তা-ও ধনী-গরীব সকলের জন্যেই সমান। উভয়ের জন্যেই ক্রীতদাসী মেয়ে বিয়ে করা জায়েয।

হায়য

আল্লাহ্‌র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ -

হে নবী, আপনাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে 'হায়য' (রজঃস্রাব) সম্পর্কে। আপনি বলে দিন, তা এক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা। অতএব তোমরা তখন এই হায়য অবস্থায়— স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক।

الْمَحِيْض কখনও মূল হায়য-এর নাম, হায়য-এর স্থানের নাম-ও হতে পারে। যেমন আরবীতে الْمَقِيْل শয়ন-বিশ্রামের স্থান, الْبَيْت রাত যাপনের স্থান বলা হয়। কিন্তু শব্দটির ব্যবহারে এখানে এমন ভাব রয়েছে, যার দরুন বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে الْمَحِيْض অর্থ হায়য। কেননা প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে هُوَ اَذًى তা অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা।' এটা

মূল হায়য-এরই পরিচিতি, হায়য-এর স্থানের বর্ণনা নয়। লোকদের প্রশ্ন ছিল মূলত হায়য-এর হুকুম সম্পর্কে এবং এই অবস্থায় তাদের করণীয় কি, সে সম্পর্কে। কেননা তখন মদীনার প্রতিবেশী ইয়াহূদী সমাজে এরূপ অবস্থায় তাদের স্ত্রীদের সম্পূর্ণ 'রয়কট' করা হতো। তাদের সাথে একসাথে পানাহার করা হতো না, একত্রে মাখামাখিও করা হতো না, একত্রে উঠা-বসাও করা হতো না। তা-ই লোকেরা জানতে চেয়েছিল, এরূপ অবস্থায় ইসলামের হুকুমটা কি? আল্লাহ্ জবাবে তাদেরকে বলতে বলেছেন ঃ هُوَ اَذًى 'তা অপবিত্র, ময়লা'। তার এই বিবরণ দেয়ার ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে, এরূপ হলে স্ত্রীকে পরিহার করতে হবে। কেননা তারা আগে থেকেই জানতো যে, অপবিত্রতা ও ময়লা আবর্জনা অবশ্যই পাশ কাটাতে ও এড়িয়ে যেতে হবে। তাই এখানে এমন একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা অর্থ দাঁড়ায়, তা এড়িয়ে চলার নির্দেশ। এ-ও বোঝা যায় যে, الاذى শব্দটি ময়লা অপবিত্রতা বোঝার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নবী করীম (স)-এর একটি কথা এর প্রমাণ। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اَصَابَ نَعْلَ اَحَدِ كُمْ اَذًى فَلْيُمْسَحْهَا بِالْاَرْضِ وَالْيُصَلِّ فِيْهَا فَاِنَّهُ لَهَا طُهُوْرٌ -

তোমাদের কারোর জুতায় ময়লা লাগলে জুতাটি মাটির সাথে ঘসবে ও ময়লা মাটিতে পৌঁছে দেবে। কেননা এটাই তার পবিত্রতা।

এ হাদীসে ময়লা-অপবিত্রতাকে اذى বলা হয়েছে। তাছাড়া যখন জানাই আছে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বল, তা ময়লা-অপবিত্রতা' এর অর্থ শুধু জানিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য, নয়, শুধু জানলেই কোন ফায়দা হয় না বলে, বরং তার অপবিত্রতার কথা জানিয়ে দেয়া এবং তা এড়িয়ে চলতে বাধ্য করাই এর আসল উদ্দেশ্য। তবে সব الاذى-ই অপবিত্র নয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ -

বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। অথচ বৃষ্টি নাপাক জিনিস নয়। (সূরা নিসা ঃ ১০২)

বলেছেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا -

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বে কিতাবপ্রাপ্ত ও শির্‌ককারী লোকদের থেকে অনেক কষ্ট পাবে।

পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে الاذى শব্দটি নাপাকি বোঝায়, তা আবর্জনা ও ময়লার অর্থ দেয়। তা এমন যে, তা এড়িয়ে চলা একান্তই কর্তব্য বিবেচিত হয়। কেননা তা-ই করতে বলা হয়েছে, প্রশ্নকারীরা এই করণীয় জানবার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করেছিল।

হায়য হয় যে স্ত্রীর, তার কোমরের উপর এলাকা থেকে স্বাদ আস্বাধন জায়েয— এই বিষয়ে ফিকাহবিদগণ একমত। অতঃপর আর কি পরিহার করতে হবে, এই প্রশ্নের তাঁরা বিভিন্ন

জবাবে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে توقيف এসেছে যা হযরত আয়েশা ও মায়মুনা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে, নবী করীম (স) তাঁর স্ত্রীদের সাথে মুবাশিরাত করতেন যখন তারা 'হায়য' অবস্থায় ছিল এবং তা করতেন পরিধেয় বস্ত্রের উপর থেকে। এ বিষয়েও সকলে একমত যে, স্ত্রী অঙ্গকে এগিয়ে যেতে হবে। পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নদেশ থেকে সুখ লাভ পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। অবশ্য তা রক্তের চিহ্ন থেকে সরে থাকার পরবর্তী ব্যাপার।

হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমাতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি স্ত্রী অঙ্গ বাদ দিয়েই তাদের সাথে সঙ্গম করতেন। সওরী ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও তাই বলেছেন। বলেছেন, রক্তের স্থানকে অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে। আল-হাসান, শবী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও দহাক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, পরিধেয়র উপর থেকে যতটা সুখ পাওয়া সম্ভব ততটা। আবূ হানাফী, আবূ ইউসূফ, আওজায়ী, মালিক ও শাফেয়ীরও এই কথা ।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ -

তোমরা হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের পরিহার কর এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটেও যাবে না।

আয়াতটি দুটি দিক দিয়ে বস্ত্র নিম্ন অংশ নিষেধ বোঝাচ্ছে। একটি— আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমারা হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের পরিহার কর।' অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্রের নিচের অংশ ও উপরের অংশ পরিধান করা বাধ্যতামূলক হওয়ার দাবি করে। উপর থেকে সুখ লাভ সম্পর্কে তারা সকলে একমত। আমরা মেনে নিলাম, এটাই আয়াতের ইঙ্গিত। তা বাদে অপরাপর অংশ থেকে সুখ লাভ পর্যায়েই নিষেধ দাঁড়িয়ে আছে।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, আল্লাহ্র কথা وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ 'এবং তোমরা তাদের নিকটেও যাবে না।' প্রথমোক্ত শব্দ থেকে বোঝা যায়, তাই এই কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে। মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তা থেকে কিছুই বিশেষীকৃত করা যাবে না। তবে যদি কোনটির দলীল পাওয়া যায়, তবে ভিন্ন কথা।

হাদীসও এই কথাটি-ই বোঝায়। তাই ইয়াযীদ, ইবনে আবূ উনায়সা, আবূ ইসহাক, উমাইর মাওলা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইরাকের কিছু লোক 'হায়য' সম্পন্না স্ত্রীরা কি হালাল সে বিষয়ে হযরত উমর (রা)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বললেন, আমি নবী করীম (স)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ

لَكَ مِنْهَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَيْسَ لَكَ مِنْهَا مَاتَحْتَهُ -

'ইজার'— পরিধেয় বস্ত্রের উপর থেকে তোমার সুখলাভের অধিকার আছে। তার নিচ থেকে সুখলাভের তোমার কোন অধিকার নেই।

শায়বানী আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ, তাঁর পিতা, আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের নবী বেগমদের কোনজন হায়য সম্পন্না হলে নবী করীম (স) তার হায়য এর উথলিয়ে উঠা অবস্থায় শক্ত করে পরিধেয় বস্ত্র বাঁধতে বলতেন। তারপর 'মুবাশিরাত' 'কোলাকুলি' করতেন। এভাবে তোমাদের প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন পূরণ করে নিতে পারে,

যেমন নবী করীম (স) তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতেন। শায়বানী আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, মায়মুনা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা প্রচার করেছেন, পরিধে বস্ত্রের নিচের এলাকা থেকে সুখ লাভ মুবাহ। এই মত যারা পোষণ করেন, তাঁরা হাম্মাদ ইবনে সালমাতা বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি সাবিত আনাস সূত্রে বর্ণিত। বলা হয়েছে, ইয়াহুদীরা হায়য সম্পন্না স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিত। তাদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়াও করত না। তাদের সাথে ঘরে একত্রিত হতো না। তখন এ বিষয়ে নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন। তিনি এ প্রেক্ষিতে বলেছেন, তোমরা তাদেরকে নিয়ে ঘরে একত্রে বাস কর এবং যৌন সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই তাদের সাথে কর। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁকে বলেছেন ঃ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ 'আমাকে স্বাদ আস্বাদনের ব্যবস্থা কর।' তিনি বললেন, আমার হায়য চলছে। বললেন, তোমার হায়য তো তোমার হাতে নয়।'

মনীষীরা বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায়, হায়য দেহের প্রত্যেকটি অংশে লেগে থাকে না ও সেগুলো নিষিদ্ধ হয়ে স্পর্শ অযোগ্য হয়ে যায় না। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার তেমনি চলবে, যেমন 'হায়য' হওয়ার আগে পবিত্র অবস্থায় হতো।

সুখ লাভ জায়েয এ বিষয়ে এবং পরিধেয় বস্ত্রের নিচে থেকে সুখ লাভ জায়েয, এই পর্যায়ে যে জবাবে দেয়া হয়েছে, সেই পর্যায়ে হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসে যা বলা হয়েছে, তাতে আয়াতটির নাযিল হওয়ার কারণের উল্লেখ রয়েছে। ইয়াহুদীরা যা করত, তা-ও এক্ষেত্রে সামনে রাখতে হবে। তাতে তাদের বিরোধিতা করারই নির্দেশ রয়েছে। আমরা হায়য সম্পন্ন স্ত্রীদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করে দেব না। তাদের সাথে উঠা-বসা ছাড়তে হবে না। রাসূলের কথা 'যৌন-সঙ্গম ছাড়া আর যা চাও, কর' থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রী অঙ্গ ছাড়া অন্যত্র সঙ্গমও করা যাবে। কেননা ও এক প্রকারের সঙ্গম। হযরত উমর (রা) বর্ণিত হাদীস— পূর্বে যার উল্লেখ করেছি— শেষের দিকে বলা এবং তা-ই এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। তার প্রমাণ এই যে, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আয়াতটির নাযিল হওয়া সংক্রান্ত অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর উমর (রা) বর্ণিত হাদীস তার পরে বলা কথা। কেননা তাতে আয়াতটির নাযিল হওয়ার অবস্থা বলা হয়নি। তাতে প্রশ্ন করা হয়েছে, স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার সাথে কি আচরণ হালাল— সেই বিষয়ে আর তা নিঃসন্দেহে আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের পরবর্তী ব্যাপার। তা দুদিক দিয়ে বিবেচ্য। একটি, তাতে কি ব্যবহার হালাল, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়নি। অথচ হায়যধারী স্ত্রীর নিকটে যাওয়া হারাম— একথা আগেই বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় এই যে, তার পেছনে আয়াতটির নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হতো, তাহলে হযরত আনাস নবী করীম (স) থেকে যা-ই বর্ণনা করেছেন, তাই যথেষ্ট ছিল। তাতে তিনি বলেছেন, 'যৌন-সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই করতে পার।' এতে প্রমাণ রয়েছে এই কথার যে, উমর (রা)-এর প্রশ্ন ছিল তার পর। অপর দিক দিয়ে বিবেচ্য উমর বর্ণিত হাদীস ও আনাস বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে হযরত উমর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমাল করতে হবে। কেননা তাতে স্ত্রী অঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যৌন কর্ম করা নিষিদ্ধ হয়েছে। অথচ আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে তা মুবাহ বলা হয়েছে। আর একই বিষয়ে মুবাহ ও নিষিদ্ধ— এই দুরকমের কথা আসলে নিষিদ্ধটা মেনে নিতে হবে। অপর দিক দিয়ে হযরত উমর (রা)-এর মনীষা বাহ্যত কুরআনকে সমর্থন দিচ্ছে। আর তা হচ্ছে এই আয়াত ঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ -

তোমরা স্ত্রীদের বিচ্ছিন্ন কর এবং তাদের পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটেও যাবে না।

আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস তাকে বিশেষীকৃত করে। আর যে হাদীস কুরআনের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন হবে তা-ই উত্তম সেই বিশেষীকৃতকরণ থেকে। আর একটি দিক হল, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস مجمل অস্পষ্ট, সাধারণ। কোন নির্দিষ্ট স্থান মুবাহ্ হওয়ার কোন কথা তাতে নেই। আর উমর (রা) বর্ণিত হাদীস পরিধেয় বস্ত্রের উপর থেকে বা নিচ থেকে সুখ লাভের ব্যাপারে ব্যাখ্যাদানকারী।

হায়য-এর তাৎপর্য ও তার পরিমাণ

আবূ বকর বলেছেন, হায়য রক্তের একটা পরিমাণের নাম। তার সাথে শরীয়াতের হুকুমের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন নামায পড়া হারাম হওয়া, রোযা রাখা হারাম হওয়া, যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া, ইদ্দত শেষ হওয়া, মসজিদে প্রবেশ না করা, কুরআন গ্রন্থ স্পর্শ না করা, কুরআন পাঠ না করা, মেয়ের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া। রক্তস্রাবের সঙ্গে এসব বিষয়ের হুকুম ওতপ্রোত সম্পর্কিত। তাই হায়যের পরিমাণের প্রশ্ন উঠেছে যে, কতটা পরিমাণ রক্তস্রাব হলে হায়য বলা যাবে। এসব সংক্রান্ত হুকুম তার সাথে সম্পর্কিত না হলে তাকে 'হায়য' বলা যাবে না। লক্ষণীয় যে, যার হায়য হয়, সে কতিপয় দিন রক্তস্রাব হতে দেখে। সেই দিনগুলো শেষ হয়ে গেলে একই অবস্থায় ফিরে আসে। তাহলে এই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যে রক্তস্রাব হল তাকে 'হায়য' বলা হবে। কেননা এই কয়দিনে রক্তস্রাব হওয়ার কারণে শরীয়াতের অনেক বিষয়ের হুকুম তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেছে। তার দিনগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী ব্যাপারের সাথেও অনুরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। রক্তস্রাব থাকা সত্ত্বেও তার সাথে এই হুকুমসমূহের সম্পর্ক না হলে তার 'হায়য' হয়েছে বলা যাবে না।

গর্ভবতী সম্পর্কেও আমরা বলব, তার হায়য হয় না। তা সত্ত্বেও সে কখনও কখনও রক্তস্রাব হতে দেখতে পারে। কিন্তু সে রক্তস্রাবের সাথে উপরে উল্লেখ করা বিষয়াদির হুকুমের সম্পর্ক হয় না। তাকে হায়য বলা যাবে না। সে হায়য-এর রোগে আক্রান্ত মনে করতে হবে। অনেক সময় দীর্ঘকাল ধরেও সে রক্ত দেখতে পায়। কিন্তু তা তো হায়য নয়। যদি রক্তটা ঠিক হায়য-এর রক্তের মতই হবে। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে রক্ত দেখলে তবেই তা হায়য মনে করা যাবে। তাহলে 'হায়য' হচ্ছে সেই রক্তের রক্তস্রাবের নাম, যার সাথে শরীয়াতের উক্ত সব বিষয়ের সম্পর্ক জড়িত হবে, যদি তার একটা পরিমাণ পাওয়া যায়। নামায পড়া, রোযা রাখা, যৌন সঙ্গম করা এবং হায়য অবস্থায় আর যা যা পরিহার করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে হায়য ও নিফাস (সন্তান প্রসবজনিত রক্তস্রাব) অভিন্ন। দুটি দিক দিয়েই এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হয়। একটি, হায়য-এর সময়কাল ঠিক তা-ই নয়, যা নিফাস এর সময়কাল। আর দ্বিতীয়, নিফাস ইদ্দত শেষ হওয়া না হওয়ার কোন ভূমিকা রাখে না। মেয়ের বালেগা হওয়ার ব্যাপারেও নয়।

আবুল হাসান 'হায়য'-এর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই বলে যে, তা সেই রক্ত, যা স্ত্রীর জরায়ু থেকে নির্গত হয়। তা প্রথমত হলে বোঝা যাবে যে, মেয়ে পূর্ণ বয়স্কা হয়েছে। পরে স্ত্রীলোক সময় সময় একটা মেয়াদকাল এই রক্তস্রাবের সম্মুখীন হবে। আমাদের মতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, পূর্বে বয়স বা স্বপ্নদোষ, কিংবা যৌন সঙ্গমে বীর্যপাত ইত্যাদি দ্বারা যদি মেয়ে পূর্ণ বয়স্কা হয়েছে বলে প্রমাণিত না-হয়, তাহলে প্রথম বারের এই মেয়াদী রক্তস্রাবে সে বালেগা

হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। পূর্বে যদি ওসবের দ্বারা তার পূর্ণবয়স্কতা প্রমাণিত হয়ে থাকে, তারপরে রক্তস্রাব দেখে, তাহলে বুঝতে হবে, তার হায়য, যদি তা হায়য-এর নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে দেখে যদিও তার পূর্বে তদ্দ্বারা সে বালেগা না-ও হয়ে থাকে।

হায়য-এর সময়কাল কত ? ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, হায়য-এর কম সে-কম মিয়াদ হচ্ছে তিন দিন। আর বেশির পক্ষে দশ দিন। সুফিয়ান সওরীও এই মত দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের এটাই প্রসিদ্ধ মত। আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, রক্তস্রাব যদি দুই দিন বা তৃতীয় দিনের বেশি সময় থাকে, তাহলে তা হায়য। ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবূ হানীফার কথা প্রায় এক।

ইমাম মালিক বলেছেন, কম মিয়াদের সময় নির্দিষ্ট নয়। বেশি সময়ও অনির্দিষ্ট।

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মনে করেন, হায়য-এর বেশির পক্ষে সময়কাল হচ্ছে পনের দিন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে ফারিস, হারুন ইবনে সুলায়মান আল জাজার, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী সূত্রে এই বর্ণনা এনেছেন।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ এক দিন ও এক রাত্রি। আর বেশির মিয়াদ পনের দিন। আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ইবনে হাম্মাদ ইবনে সালামাতা, আলী ইবনে সাবিত, মুহাম্মাদ ইবনে জায়দ, সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হায়য তেরো দিন পর্যন্ত চলতে পারে। তার বেশি হলে তা হবে 'ইস্তাহাযা'। (হায়যী রোগ)। আতা বলেছেন, পনের দিনের বেশি কাল রক্তস্রাব হলে তা হবে 'ইস্তাহাযা'। আবূ হানীফা আতার মতকেই গ্রহণ করেছিলেন, বলেছিলেন, হায়য-এর কমপক্ষে এক দিন ও এক রাত্রি মিয়াদ, বেশীর পক্ষে পনের দিন। পরে একথা প্রত্যাহার করে সেই মত গ্রহণ করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

কম-সে-কম মিয়াদ তিন দিন এবং বেশীর পক্ষে দশ দিন— এই মত যাঁদের, তাঁদের দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি কাসিম আবূ ইমামা— তার সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ -

হায়য-এর কম মিয়াদ তিন দিন। আর বেশির পক্ষে দশ দিন।

এই হাদীসটি সহীহ বলে তা অগ্রাহ্য করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এরই সমর্থক হচ্ছে উসমান ইবনে আবুল আস, আস্‌সাকাফী ও আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত হাদীস। তাঁরা দুজনই বলেছেন, হায়য তিন দিন। আবার চার দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত। এর বেশি হলে তা 'ইস্তাহাযা'। এ হাদীস থেকে তা-ই বোঝা যায়, যা আমরা বলেছি দুটি দিক দিয়ে। একটি সাহাবীগণের বিপুল সংখ্যকের নিকট যখন কোন কথা প্রকাশিত হয়, খ্যাতি লাভ করে, তার বিপরীত মতের কাউকে পাওয়া না যায়, তখন সেই মতে ইজমা হয়ে যায়। তা পরবর্তীদের জন্যে অকাট্য দলীল হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত দুজন সাহাবী থেকে আমাদের কথিত কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গীদের কেউ-ই তার বিপরীত মত দেন নি। ফলে তার অকাট্যতা প্রমাণিত হল। আর দ্বিতীয়, এই পরিমাণ-ই আল্লাহ্‌র 'হক' ও নিছক ইবাদত। তার প্রমাণ হয় توقيف পদ্ধতিতে কিংবা সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে। যেমন ফরয নামাযের রাক'আত সংখ্যা, রমযানের সিয়াম, দণ্ডের পরিমাণ, উটের যাকাত পরিমাণ। 'হায়য ও তুহর'-এর মিয়াদ পরিমাণ, মহরানা

পরিমাণ, যা বিয়ের বন্ধনে জরুরী শর্ত, নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ বসার সময় পরিমাণ। এই সবই আমাদের মতে تَوْقِيْفِى আল্লাহ নির্ধারিত। কিয়াসের পন্থায় তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

যদি বলা হয়, মেয়েদের সাধারণ অভ্যাসের ভিত্তিতে হায়য-এর মিয়াদকাল নির্ধারণ নিষিদ্ধ নয়, তা হলে তা করতে দোষ কোথায়? উপরন্তু রাসূলে করীম (স) হুমনাতা বিনতে জাহাশ (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

تَحِيْضِىْ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ سِتًّا اَوْسَبْعًا كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ -

আল্লাহ্‌র জ্ঞানে তোমার হায়য হয় ছয়, সাত, যেমন মেয়েদের প্রত্যেক মাসেই হায়য হয়ে থাকে।

এই কথা দ্বারা মেয়েদের সাধারণ অভ্যাসকে স্বীকার করা হয়েছে। তা ছয়ও হতে পারে, সাতও হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে তিনি দিন কম-সে-কম ও দশ দিন বেশির পক্ষে মিয়াদের কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁদের কথা সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে যথার্থ বিবেচিত হতে পারে।

এর জবাবে বলা যাবে, আমাদের ও আমাদের বিপরীত মতের লোকদের মাঝে কথা হচ্ছে এমন কম-সে-কম মিয়াদ পর্যায়ে, যার চাইতে বেশি হওয়া সম্ভব নয়। আর সকলেই উল্লিখিত সংখ্যায় সম্পূর্ণ একমত। আর হুমনা (রা)-এর ব্যাপারে তো ছয় কিংবা সাত-এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নয়। সময়ের মিয়াদ নির্ধারণে তা গণ্য নয়। ফলে তা দলীল হিসেবে পেশ হতে পারে না মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে। রাসূলে করীম (স) হুমনা (রা)-কে বলেছিলেন ঃ 'তোমার হায়য আল্লাহ্‌র জানা মতে ছয় কিংবা সাত, যেমন মেয়েরা প্রতিমাসেই হায়য-এর সম্মুখীন হয়ে থাকে।' তা আমাদের প্রাথমিক দলীল হতে পারে আমাদের কথার সত্যতার। তার পূর্বে বিবেচ্য রাসূলের কথা ঃ 'যেমন করে মেয়েরা প্রতিমাসে হায়য সম্পন্না হয়' সমস্ত নারী জাতি সম্পর্কিত কথা। সমস্ত নারী জাতি সম্পর্কেই এই কথা বলা যেতে পারে। আর তা-ই তার চাইতে কম সময়কাল ধরে মেয়েদের হায়য সম্পন্না থাকাকে অস্বীকার করে। 'হায়য' তিন দিনের হতে পারে— এই কথায় যদি ইজমার দলীল কায়েম না হতো, তাহলে ছয় কিংবা সাতের কম মিয়াদের হায়য ধরা কারোর পক্ষেই জায়েয হতো না। এ অবস্থায় তিন দিনের হায়য হওয়া পর্যায়ে যখন ঐকমত্য পাওয়া গেল, তখন আমরা হাদীসের সাধারণত্ব থেকে বিশেষীকরণ করে নিলাম। তাই হাদীসের প্রবণতার সাথে সঙ্গতি রেখে তিন দিনের কম মিয়াদের হায়য হতে পারে, একথা আমরা অস্বীকার করলাম। হায়য-এর বেশির মিয়াদ সম্পর্কেও এই দলীল গ্রহণীয়।

একটি হাদীস থেকেও এই কথা প্রমাণিত হয়। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

مَارَاَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبَ لِعُقُوْلِ ذَوِى الْاَلْبَابِ مِنْهُنَّ فَقِيْلَ مَانُقْصَانُ دِيْنِهِنَّ فَقَالَ تَمْكُثُ اِحْدَهُنَّ الْاَيَّامَ وَاللَّيَالِىْ لَا تُصَلِّىْ -

বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীনের দিক দিয়ে কম মাত্রার (মেয়ে) লোকদেরকে তাদের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান লোকদের বিবেক-বুদ্ধির উপর বিজয়ী আর দেখতে পাইনি। জিজ্ঞাসা করা হল

তাদের দ্বীনের দিক দিয়ে ত্রুটিটা কি ? বললেন, ওদের এক-একজন বহু দিন ও রাত্রি এমন অতিবাহিত করে যখন সে নামায পড়ে না।

বোঝা গেল, হায়য-এর মেয়াদটা অবশ্যই এমন হতে হবে, যার বিষয় কয়েক দিন ও কয়েক রাত্রি বলা যেতে পারবে। এই দিক দিয়ে কম-সে-কম হয় তিন দিন এবং অধিকাংশ হয় দশ দিন।

আমাশ-এর-হুবায়ব ইবনে আবূ সাবিত, উরওয়াতা আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। তিনি ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

اجْتَنِبِى الصَّلاَةَ اَيَّامَ مَحِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَتَوَضَّائِى لِكُلِّ صَلاَةٍ -

তোমার হায়য-এর দিনগুলোতে তুমি নামায পরিহার কর। পরে গোসল কর এবং প্রতি নামাযের জন্যে অযূ কর।

আল-হিকাম আবূ জাফর-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সওদা (রা) নবী করীম (স)-কে বললেন, আমার 'ইস্তাহাযা' হয়েছে। তখন তিনি তাঁকে তাঁর হায়য-এর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (নামায-রোযা থেকে) বিরত থাকতে বললেন। যখন সে মিয়াদ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন করে অযূ করে নামায পড়বে। ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) বর্ণিত হাদীসের এ ভাষাও এসেছে ঃ

دَعِى الصَّلاَةَ بَعْدَ الْاَيَّامِ الَّتِى كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِى -

তোমার হায়য যতদিন থাকবে, সেই কয়টি দিন নামায ছেড়ে দেবে, তার পর গোসল করবে।

উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ একটি মেয়েলোক রাসূলে করীম (স)-কে প্রশ্ন করল, তার রক্তস্রাব হয়ে চলেছে, তখন সে কি করবে ? বললেন, মাসে যে কয়দিন ও রাত্রি তুমি হায়য-এ অভ্যস্ত, সেই সময়টা অপেক্ষা করবে ও নামায ত্যাগ করবে মাসের সেই কয়দিন। তার পরে গোসল করে নামায পড়বে। শরীক আবুল ইয়াকযান, আদী ইবনে সাবিত, তাঁর পিতা, তাঁর দাদার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ اَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْسِلُ وَتَتَوَضَّاءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ -

হায়য-এর রোগিনী তার হায়যের দিনগুলো নামায ত্যাগ করবে। পরে গোসল করবে ও প্রতি নামাযের জন্যে নতুন করে অযূ করবে।

এই হাদীসেরই কোন কোন সূত্রের বর্ণনার ভাষা হল ঃ তার কুরোর দিনগুলোর নামায ছেড়ে দেবে। নবী করীম (স) ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) আর উম্মে সালমা (রা) যে মেয়েলোকটির বর্ণনা করেছেন, তাদেরকে নবী করীম (স) তাদের হায়যের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিতে বলেছিলেন তাদের হায়যের পরিমাণ জিজ্ঞাসা না করেই। এসব বর্ণনার ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়েছে যে, হায়যের মিয়াদ অবশ্যই তা হতে হবে, যার উপর 'কয়েক দিন' শব্দটির প্রয়োগ বৈধ হতে পারে। আর তা হচ্ছে তিন থেকে দশ। যদিও হায়য তিন দিনের কম সময়ের-ও হয়ে থাকে। অন্যথায় নবী করীম (স) 'কয়েক দিন' ও 'কয়েক রাত্রি' বলতেন না। আদী ইবনে সাবিত (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'যার ইস্তাহাযা' হয়েছে, সে তার হায়যের দিন কয়টি

নামায ত্যাগ করবে। আর তা-ই হচ্ছে সাধারণভাবে সব মেয়েলোকের জন্যে ব্যবহৃত শব্দ। আর أيام 'কয়েক দিন' কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ব্যবহৃত হলে তার কম-সে-কম সময় তিন দিন-ই হয়ে থাকে, আর বেশির মিয়াদ হয়ে থাকে দশ। অতএব তার একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকা আবশ্যক। যাকে أيام 'কয়েক দিন' বলা যাবে। তাই তার সংখ্যা সেটাই হবে, যার উল্লেখ নবী করীম (স) করেছেন ।

এর আরও একটি দিক আছে। সেই সময়টা যখন সম্মুখে আসবে যাকে 'কয়েক দিন' বলা যাবে, তখন কোন সীমিত সংখ্যা তাকে শামিল করবে না। যেমন লোকেরা বলে ঃ أيام الستة। 'ছয় দিন' তখন বিশেষভাবে না তিন বলা যাবে, না দশ। আল্লাহ্র কথা ঃ أيام معدودا 'সখ্যাবদ্ধ দিন কয়টি' বা গোণা দিন কয়টি। তখন তিন থেকে দশ-এর মধ্যের কোন সংখ্যাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্বের লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।

কাজেই শ্রোতাদের নিকট যে সময়টার পরিচিতি সুনির্দিষ্ট, তার দিকে যখন সম্পর্কিত করা হবে, তখন তাকে তিন থেকে দশ-এর মধ্যবর্তী কোন কিছুর সাথে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। রাসূলের কথা ঃ তার হায়যের দিন কয়টি নামায ত্যাগ করবে। তার কুরুর দিন কয়টি তার দিনের সংখ্যাকে শ্রোতাদের নিকট অগ্রবর্তী হয়ে যায়নি। অতএব দিন কয়টির উল্লেখ সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে, কোন সংখ্যা বিশেষভাবে নির্ধারণ ব্যতীতই। অতএব তা ব্যবহৃত হবে এই সংখ্যার দিক দিয়ে, যা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয় তার উপর। আর তা হচ্ছে তিন থেকে দশ। তা এরূপ এইজন্যে যে, ايام 'কয়েক দিন' ব্যবহার করে একটা অস্পষ্ট সময়ই বোঝাতে চাওয়া হয় অনেক সময়। যেমন কয়েক রাত্রি বললে অনির্দিষ্ট সময় বোঝায়। তা বলে রাত্রির কৃষ্ণতা বোঝানো হয় না। ايام বলে সময়ের পরিচিতি যখন অগ্রবর্তী হবে, তখন 'কয়েক দিন'-এর উল্লেখ এক অস্পষ্ট সময় বোঝাবার জন্যেই হবে। যা বলার উদ্দেশ্য কোন সংখ্যা নয়।

মোটকথা ايام 'কয়েকটি দিন' নামটির দুটি তাৎপর্য। যখন তার পরিচিতি যাতে নির্দিষ্ট হবে, তার সাথে সম্পর্ক দেখানো হলে, তখন তার অর্থ হবে সময়। আর যা শুরুকৃত হুকুম হবে, তাকে ধারণ করতে হবে সেই জিনিসের উপর যার সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন সহীহ্ হবে। তখন তার অর্থ হবে সুনির্দিষ্ট এবং তিন থেকে দশ।

এর আরও একটি কারণ রয়েছে। তা হল আরবদের ভাষায় এটাই বোঝা যায় যে, ايام 'কয়েকটি দিন' নামটি যখন কোন সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত হবে, তখন সে সংখ্যা কেবল তিন থেকে দশ পর্যন্তই হতে পারে। এই সংখ্যাটি 'কয়েক দিন'-এর নামটি থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না। কেননা তুমি যখন বলবে, এগার, 'কয়েকটি দিন' বললে না, তখন বলবে 'এগার দিন'। অনুরূপভাবে যখন সাধারণভাবে 'মাসের দিনগুলো' বলা হবে তখন বলবে 'ত্রিশ'। তার সাথে 'কয়েক দিন' নামটা শোভন হবে না। তাই বলবে ত্রিশ দিন কিন্তু 'কয়েক দিন' নামটি একটা সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত হবে, তখন তা কেবল তিন থেকে দশ পর্যন্তই বোঝাবে। তাই আমরা জানতে পারলাম যে, এটা প্রকৃত প্রয়োগ ও প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ। এটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। তবে সেজন্যে কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। কেননা তা পরোক্ষ

(مجاز) প্রয়োগ। তা থেকে 'কয়েক দিন' নামটি বাদ দেয়া অসঙ্গত নয়। আর তা হচ্ছে, তার সংখ্যা যখন নির্দিষ্ট করা হবে, 'কয়েক দিন' তার সাথে সম্পর্কিত হবে।

যদি বলা হয়, যখন বলা হল, 'তুমি নামায ছেড়ে দাও তোমার কুরূর দিন কয়টিতে' এতে 'কয়েক দিন' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর কুরূর কম-সে-কম মিয়াদ তিন— এটা বহু বচনে। এর কম-সে-কম হচ্ছে তিন প্রত্যেক দিনই কুরূর হয়ে গেল।

জবাবে বলা যাবে, রাসূলের কথা اَيَّامِ اَقْرَائِكَ বলে আসলে একটি হায়য-এর দিনগুলোই বলতে চাওয়া হয়েছে। তার প্রমাণ এই যে, যার হায়যের অভ্যাস হচ্ছে তিন থেকে দশ পর্যন্ত সময়, তার কথাই বলা হয়েছে। একথা জানা আছে যে, এ ধরনের কথার অর্থই হয় এক হায়য। অনুরূপভাবে, যার সেরূপ অভ্যাস নেই, তার-ও। তার পরবর্তী কথা ঃ 'পরে তুমি গোসল কর এবং প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযূ কর'টিও তাই বোঝায়। এ-ও জানা আছে যে, তাঁর বক্তব্য আসলে প্রতিটি হায়য-এর গত হয়ে যাওয়া। বোঝা গেল, اَيَّامِ اَقْرَائِكَ বলে আসলে 'এক হায়য-এর কয়েক দিন'ই বুঝিয়েছেন। আমাদের পূর্বে উল্লেখকৃত আ'মাশ বর্ণিত হাদীসে اَيَّامَ مَحِيْضِكَ 'তোমার হায়য-এর দিন কয়টি' বলা হয়েছে। আর অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে اَيَّامِ حَيْضِكَ— 'তোমার হায়য-এর দিন কয়টি।' বলেছেন, যে কয়দিন হায়য-এর কারণে বসে থাকে, সেই কয়দিন ও রাত্রির নামায ছেড়ে দিতে হবে। আর দ্বীনের দিক দিয়ে তাদের কমতি হচ্ছে, তাদের এক-একজন কয়েক দিন ও রাত্রি নামায পড়ে না। এসব হাদীসে اقرا বা কুরূর উল্লেখ হয়নি। উল্লেখ করা হয়েছে হায়য-এর। অতএব হায়যকে কয়েকদিনের মনে করতে হবে। আর যে সময়ের উপর ايام 'কয়েক দিন' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে না, তা হায়য হবে না। কেননা নবী করীম (স) হায়য-এর ব্যাপারে সমস্ত নারীকুলের করণীয় বলে দেবার ইচ্ছা করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে শুজা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ বুকাইর, ইসরাইল, উসমান ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ মুলাইকা, ফাতিমা বিনতে আবূ জুহায়শ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ফাতিমা তাঁর নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছেন ঃ

مُرِىْ فَاطِمَةَ فَلْتَمْسِكْ كُلَّ شَهْرٍ عَدَدَ اَيَّامِ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ -

তুমি ফাতিমাকে বলে দাও, সে যেন প্রতি মাসে তার হায়য-এর দিনগুলোর সংখ্যানুযায়ী নামায থেকে বিরত থাকে। পরে গোসল করে।

এ হাদীসে اقرا 'কুরূ' বলা হলেও আসলে বোঝানো হয়েছে হায়য— প্রতি মাসে। কেননা রাসূলে করীম (স) তো তা-ই বলেছেন। অপর এক হাদীসে জানানো হয়েছে যে, মেয়েদের অভ্যাস হচ্ছে প্রতি মাসে এক হায়য কাল অতিবাহিত করা। রাসূলে করীম (স) হুমনা (রা)-কে বলেছিলেন ঃ তোমার হায়য আল্লাহ্র ইলমে ছয় কিংবা সাত, যেমন মেয়েরা প্রতি মাসে হায়য সম্পন্না হয়ে থাকে।

যদি বলা হয়, এক হায়যকে বহু বচনে اقرا 'কয়েকটি কুরূ' বলা যায় কি ভাবে। অথচ একটি বোঝাতে হলে এখানে এক বচনের শব্দ قرء ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল? যখন বহু বচনে বলা হয়েছে, তখন বহু কয়টি 'কুরূ' বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে করতে হবে।

এর জবাবে বলা যাবে, কুরূ' হচ্ছে হায়য-এর রক্তের নাম। তখন এক হায়যকেই বহু বচনে اقرا বলা অসঙ্গত নয়, যখন সে রক্তের বহু অংশ সামনে রেখে কথা বলা হবে। যেমন 'চরিত্রের কাপড়' বলা হয় প্রতিটি খণ্ডকে সামনে রেখে। একটি জামাকেও বহু খণ্ডের দৃষ্টিতে বহু বচনে বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে একটি হায়য-এর রক্তের বহু অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখে اقرا বহু বচনে বলা যেতে পারে।

যদি বলা হয়, ايام 'কয়েক দিন' কথাটি দ্বারা দুই দিনও বোঝানো যেতে পারে, তাহলে হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ দুই দিন নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

জবাবে বলা যাবে, 'দুই দিন' বোঝাবার জন্যে ايام 'কয়েক দিন' বলাটা প্রকৃত অর্থে নয়, পরোক্ষ অর্থে। প্রকৃত অর্থ— তিন ও ততোধিক। শব্দটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণই বাঞ্ছনীয়, পরোক্ষ অর্থের পরিবর্তে। তাহলেই প্রয়োজনে তাকে পরোক্ষ অর্থের দিকে ফেরানো যায়। আর একটি দলীল হচ্ছে, হায়য-এর কম-সে-কম ও বেশির মিয়াদ নির্ধারণ যখন 'কিয়াস' পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়, তার পন্থা হচ্ছে توقيف কিংবা মনীষীদের ঐকমত্য— যেমন পূর্বে বলেছি, তখন সকলেই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তার অর্থ তিন দিনের হায়য, দশ-ও তেমনি। তিন-এর কম সময়ে তাঁরা একমত নন। একমত নন দশ দিনের বেশিতে। তাই সর্বসম্মত মত হিসেবেই আমরা তিন দিন ঠিক করেছি। যেখানে তাঁদের মতপার্থক্য, সেটি আমরা গ্রহণ করিনি। কেননা তা 'তওকীফ' বা ঐকমত্য, কোন দিক দিয়েই তা কর্তব্য নয়।

যদি বলা হয়, সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, হায়য শুরু হলেই প্রথম রক্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গেই নামায ছেড়ে দিতে হবে। তা যদি একদিন ও এক রাত্রি মাত্র দেখা যায়, তবুও। এ থেকে বোঝা গেল যে, একদিন ও একরাত্রির জন্যেও হায়য হতে পারে। যার মতে সেটা হায়য-এর রক্ত নয়, তাকে তার কথার দলীল দিতে হবে। কেননা উক্ত ঘটনার শুরুতেই হায়য মনে করা হয়েছিল। এক্ষণে কোন দলীল ব্যতিরেকে— যা তা ভাঙ্গতে বাধ্য করে— তা ভাঙ্গা চলবে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হায়য একদিন ও একরাত্রি কালেরও হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, নামাযের সময়ে রক্ত দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে নামায ছেড়ে দিতে হবে— এ বিষয়ে সকলেই একমত এবং এ থেকে হায়য-এর সময়কাল হতে পারে নামাযের সময়টা মাত্র। নামাযের সময়ে রক্ত দেখা গেলে নামায ছেড়ে দিতে হবে, এই কারণে শুধু নামাযের সময়টা তো আর হায়য-এর সময়কাল নির্ধারিত হতে পারে না। বলা যেতে পারে না যে, হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ নামাযের সময়টুকু। বরং সে রক্তের ব্যাপারে লক্ষ্য করতে অপেক্ষা করতে হবে হায়যের সময়কালটা দেখার জন্যে। কেননা তার পূর্ণতার সময়কাল বিভিন্ন হতে পারে। এক দিন এক রাত্রিও হতে পারে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ -

মেয়েদের গর্ভে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্যে হালাল নয়।

এ আয়াত অনুযায়ী গর্ভের কথা গোপন না করা কর্তব্য।

জবাবে বলা যাবে, এটা তো আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা মেয়ে লোকটির দেয়া খবর কবুল করা সম্পর্কিত কথা। সে তার গর্ভে আল্লাহ্র সৃষ্টি করার কথা যদি বলে

তাহলে আমরা তার কথাই মেনে নেব। কিন্তু তার দেখা দেয়া রক্ত হায়য-এর রক্ত কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি তার উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একটা হুকুম। এ হুকুমটা তো তার গর্ভে সৃষ্টি হয়নি। কাজেই তার কথাই এক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে। এ পর্যন্ত যা যা বলেছি, তার সব কথাই বাতিল প্রমাণ করে তার কথা, যে বলেছে যে, হায়য-এর কম-সে-কম সময়কাল হচ্ছে এক দিন এক রাত্রি। যারা হায়য-এর কম-সে-কম বা বেশির মিয়াদ নির্ধারণ করেন নি কিংবা যারা এই ব্যাপারটিকে নিছক মেয়েদের অভ্যাসের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের সকলের কথাই বাতিল— প্রত্যাহৃত। আর যাঁরা কম ও বেশি পরিমাণ নির্ধারণ করাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের কথাও বাতিল। যদি তা-ই হতো, তাহলে যদ্দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত হায়য চলছে বলতে হবে। তা হলে দুনিয়ার 'ইস্তাহাযা' হায়য-এর রোগ ও সে রোগে আক্রান্ত 'মুস্তাহাযা' বলতে কিছুই থাকতে না, কেউ-ই থাকত না। সব রকমের রক্তস্রাবকেই 'হায়য' মনে করতে হতো। কিন্তু হাদীস দ্বারা এই কথা বাতিল প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম উম্মতেরও ঐকমত্য রয়েছে সে ব্যাপারে। কেননা ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ নবী করীম (স)-কে বললেন ঃ আমার ইস্তাহাযা— হায়য-এর রোগ— হয়েছে। আমি তো পাক হতে পারব না। তাহলে ইসলামে আমার কোন অংশ থাকবে না বলে আমি ভয় পাচ্ছি। হুমনা (রা) সাত বৎসর পর্যন্ত ইস্তাহাযা রোগে আক্রান্ত হয়ে রয়েছেন। এই রূপ অবস্থায় শরীয়াতের বিধানদাতা বলেন নি যে, এই সবই 'হায়য'। বরং সে দুই জনকে জানিয়ে দিয়েছেন তার কতটা হায়য আর কতটা 'ইস্তাহাযা'। তা হলে একটা পরিমাণের সময় নির্দিষ্ট হবে হায়য-এর জন্যে আর সে পরিমাণ বলা হয়েছে ايام 'কয়কটি দিন' বলে। আর যে লোক হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ ও বেশি বেশি মিয়াদ নির্দিষ্ট করেন না তাঁকেও বলতে হবে, রক্তের সূচনা কাল যদ্দিন চলবে, সেটা হায়য হবে। যদি এক বছর কাল রক্তস্রাব চলে, তাহলে তার হায়য-অভ্যস্ত সময়-কাল কিছুই থাকে না। অথচ তার জরায়ুতে রক্ত থেকে যায়। তাই যে কথায় সকলেই একমত উক্ত অবস্থা তার পরিপন্থী।

যদি বলা হয়, হুকুমের দিক দিয়ে 'নিফাস' ও 'হায়য' অভিন্ন অবস্থা। তার সময়ের কোন কম-সে-কম সময়কাল জানা যেতে পারে না। হায়য-এর ও তাই।

জবাবে বলা যাবে, আমরা সর্বসম্মতিক্রমেই তাকে 'নিফাস' ঠিক করেছি। হায়যকে তার উপর আমরা কিয়াস করছি না। কেননা এ ক্ষেত্রে কিয়াস প্রমাণ করার কোন পন্থা নেই। অথচ কম সে-কম ও বেশি সময় প্রমাণকারী উভয় গোষ্ঠীই হায়য-এর রক্ত রূপে প্রমাণ করেছে। আর তার সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে একদিন এক রাত্রি। তার দলীল ঃ فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِىْ الْمَحِيْضِ 'তোমরা স্ত্রীদেরকে হায়য কালে পরিহার কর'— এই আয়াত। আর নবী করীম (স)-এর কথাঃ 'যখন হায়য হতে শুরু হবে, তখন নামায ছেড়ে দাও।' এর বাহ্যিক দিক কম ও বেশি মিয়াদ নির্ধারণে আবশ্যক বলে দাবি করে। কেননা শব্দে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। তাই যখন এক দিন ও এক রাত্রি কাল রক্তস্রাব দেখবে, বুঝতে হবে, তা উক্ত কথার আওতার মধ্যে পড়েছে। তখন বলা যাবে যে, ওটিকে 'হায়য' নির্ধারণ করতে হবে এবং এই সময়ে স্ত্রীকে আলাদা— সম্পর্কহীন রাখতে হবে। কেননা হায়য-এর অবস্থা ও তার তাৎপর্য ও পরিচিতি পর্যায়ে শব্দে কোন প্রমাণ নেই। যখন প্রমাণিত হল যে, তা হায়য, তখন তার ব্যাপারেই আয়াতের হুকুম প্রয়োগ করা হবে। আর তাতে যদি মতবৈষম্য হয়, তাহলে এ আয়াতে তার তাৎপর্যের কোন প্রমাণ হবে না। বিরুদ্ধ পক্ষের দাবি আলোচ্য বিষয়ে কোন দলীল হতে পারে না।

যদি বলা হয়, শরীয়াতের বিধানদাতা হায়য-এর রক্তের আলামত ও পরিচিত স্বরূপ যা বলেছেন, তাতে তার কোন সময়-পরিমাণ হিসাব করা কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ হায়য-এর রক্ত প্রখর দীপ্তি পূর্ণ কালো। তাই এই পরিচিতির রক্ত যখনই দেখা যাবে, তা অবশ্যই হায়য হবে।

জবাবে বলা যাবে, উক্ত পরিচিতি ছাড়াও যে হায়য-এর রক্ত হতে পারে, তাতে কোন মতপার্থক্য নেই। তা যখন তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যাবে, বুঝতে হবে, তা হায়য। কিংবা শুরুতেই যদি সেরূপ রক্ত দেখা যায় তাহলে তা-ও হায়য। অনেক সময় তার জন্যে নির্দিষ্ট দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর-ও তা দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় মনে করতে হবে, তার সময়ে যা, তা হায়য আর নির্দিষ্ট সময়ের পর যা, তা 'ইস্তাহাযা'। কাজেই নবী করীম (স) এই পরিচিতির রক্তকে হায়য-এর নাম ও তার দলীল রূপে চিহ্নিত করবেন, তা মনে করা যায় না। তা না হলেও তা পাওয়া যায় এবং তা পাওয়া গেলেও তা না হতে পারে। আমাদের মতে তার কারণ হচ্ছে স্ত্রীর নিজের আসল অবস্থা। তার হায়য সব সময়ই এই পরিচিতির হবে। তাই বিশেষভাবে সেই বিষয়ের হুকুমটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্য কিছুর হুকুম বলা হয়নি। অতএব সে অবস্থাকে অন্য কোন দিক দিয়ে গণ্য করা ঠিক হবে না।

যারা হায়য-এর সময়ের পরিমাণ এক দিন এক রাত্রি নির্দিষ্ট করেছেন, আর যারা তার সময়-পরিমাণ নির্ধারণের বিরোধী, তারা উভয়ই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এই আয়াতটি ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاَذَاى -

লোকেরা তোমাকে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তা ময়লা-আবর্জনা।

সময় নির্ধারণের বিরোধীরা বলেছেন, আয়াতে হায়যকে ময়লা-আবর্জনা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই যেখানেই এই ময়লা-আবর্জনা পাওয়া যাবে, তা অবশ্যই হায়য হবে। তাওকীফ-এর কোন গুরুত্ব হবে না। কেননা মূল আয়াতে তার কোন পরিমাণের উল্লেখ নেই। আর যারা এক দিন এক রাত্রি সময় নির্দিষ্ট করেছেন, তাঁরা বলেন, ময়লা-আবর্জনা এক দিন এক রাত্রি পাওয়া যায় বলে সেই সময়টা হায়য। তার কমেও। যা তার কম সময়ে হবে, তাকে বিশেষীকৃত করেছি একটি দলীল দ্বারা। অতএব শব্দের বাহ্যিক হুকুমটা একদিন-একরাত্রি কাল অবশিষ্ট থাকবে।

তাদেরকে বলা হবে, প্রথম হায়য প্রমাণিত হতে হবে, যেন এই পরিচিতিটা প্রমাণিত হয়। আর তা হচ্ছে তার ময়লা-আবর্জনা হওয়া। কেননা আল্লাহ 'হায়যকে ময়লা-আবর্জনা বলেছেন। ময়লা-আবর্জনাকে হায়য বলেন নি। আমরা নিজেরাও জানি যে, সব ময়লা-আবর্জনাই হায়য নয়, যদিও হায়য মাত্রই ময়লা-আবর্জনা। যেমন সব নাপাকিই হায়য নয়, যদিও হায়য মাত্রই নাপাকি। তাই হায়য আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হতে হবে। যেন তাকে ময়লা-আবর্জনা বলা যায়। এ-ও জানা যে, আল্লাহ যদি সব ময়লা-আবর্জনাকেই হায়য নামে অভিহিত করতে চাইতেনও; তবু তিনি এটা চাইতেন না যে, সব ময়লা-আবর্জনা হায়য গণ্য হবে। কেননা সর্বপ্রকারের ময়লা-আবর্জনাই হায়য নয়। তাই এক্ষণে প্রমাণিত হল যে, ময়লা-আবর্জনা ঘৃণ্য। কেননা তার পরিচয় পাওয়ার জন্যে দলীল আবশ্যক। দলীলের ভিত্তিতে আমরা যখন তা চিনতে পারব, তখন তার উপর হায়য-এর হুকুম প্রয়োগ করব। উপরন্তু ময়লা-আবর্জনা বহু অর্থ সম্পন্ন শব্দ। বহু জিনিসই তার আওতায় আসে। তা বিভিন্ন তাৎপর্য সমন্বিত। আর যেসব নামের অবস্থা এইরূপ, তা অবশ্যই সাধারণ অর্থবোধক হবে।

যারা হায়য-এর বেশির দিকের মিয়াদ পনের দিন বলেছেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনে কম মাত্রার অধিকারিণী (নারীদের)-কে বুদ্ধিমান লোকদের বিবেক-বুদ্ধির উপর বিজয়ী দেখিনি। তখন প্রশ্ন করা হয়েছে, ওদের দ্বীনের দিক দিয়ে কমের ব্যাপারটি কি ? তখন তিনি বলেছেন, ওদের এক-একজন বয়সের অর্ধেক সময়ই অবস্থান করে এমনভাবে যে, তখন সে নামায পড়ে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হায়য পনের দিনের হয়। আর তুহর হয় অবশিষ্ট পনের দিন। কেননা তুহর-এর তা-ই কম-সে-কম সময়। তাহলে হায়যই হচ্ছে বয়সের অর্ধেক কাল। হায়য যদি এর কম সময় কালের হয়, তাহলে মেয়েলোক তাদের অর্ধেক জীবন নামায পড়ে না, একথা সত্য হবে না। এরূপ অবস্থায় বলতে হবে, অর্ধেক বয়সের কথা বর্ণনায় আসেনি। এই বর্ণনাটি দুটি শব্দে এসেছে। একটিতে বলা হয়েছে شَطْرُ عُمْرِهَا 'তার জীবনের অর্ধভাগ'। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তাদের এক-একজন কয়েক দিন ও রাত্রি অবস্থান করে, নামায পড়ে না। نصف عمرها তার বয়সের অর্ধেক এই ভাষায় কোন বর্ণনায়ই আসেনি। আর شَطْرُ عُمْرِهَا কথাটি দ্বারা সোজাসুজি অর্ধেক বোঝা যায় না। তার অর্থ কিছু ভাগ, কতক। যেমন আল্লাহ্‌র কথা, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 'অতএব ফেরাও তোমার মুখ মসজিদের দিকে'।

এ কথাটিতে মসজিদে হারামের দিকটা বুঝিয়েছেন, যে দিকে তা অবস্থিত সেই দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। তার অর্ধেক বোঝাতে চাওয়া হয়নি। এই الشطر-এর পরিমাণটা রাসূলের কথার আলোকে বোঝা যায়। তিনি বলেছেন ঃ 'তাদের এক-একজন কয়েক দিন ও রাত্রি নামায না পড়ে থাকে। কাজেই شطر عمرها তার জীবনের এই পরিমাণটাই বুঝতে হবে, ও ছাড়া অন্য কিছু নয়। তা সত্ত্বেও, দুনিয়ায় এমন মেয়েলোক পাওয়া যায় না, যার সারা জীবনের অর্ধেক কাল ধরে হায়য হয়। কেননা তার বালেগা হওয়ার পূর্বে জীবনের যে সময়টা অতিবাহিত হয়েছে তা 'তুহর' কাল। এ সময় হায়য হয়নি। বালেগা হওয়ার পর তার জীবনের শেষ পর্যন্ত পনের দিন করে প্রতি মাসের হায়য হতে থাকলেও সেই সাথে পনের দিন 'তুহর' হতে থাকলে তবুও সমগ্র জীবনের অর্ধেক সময় হায়য হয়েছে বলা যাবে না। কাজেই যারা মনে করেন, জীবনের অর্ধেক সময় ধরে মেয়েলোকের হায়য হয়, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল প্রমাণিত হল।

তুহর-এর কম-সে-কম মিয়াদের পরিমাণে মতপার্থক্য

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন— তুহর এর কম-সে-কম সময়কাল পনের দিন। আতাও তা-ই বলেছেন। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, এ ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনাসমূহে কোন সময়কাল নির্ধারিত হয়নি। আবদুল মালিক ইবনে হুবায়ব থেকে পাওয়া একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তুহর পনের দিনের কমে হয় না। আওজায়ী বলেছেন, কখনও কখনও পনের দিনের কমেও 'তুহর' হয়ে থাকে, হতে পারে। সে ব্যাপারে মেয়েলোকের পূর্ববর্তী তুহর-এর পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা এসেছে, যদি জানা যায় যে, কোন মেয়েলোকের 'তুহর' পনের দিনের কম রয়েছে, তা হলে তার কথাই গ্রহণ করতে হবে। তাহাভী আবূ ইমরান ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, তুহর-এর কম-সে-কম

সময়কাল নয় দিন। দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিমাসে হায়য ও তুহ্‌র এর বিকল্প বানান। সাধারণত হায়য তুহর থেকে কম সময়ের জন্যে হয়। কাজেই হায়য-এর মিয়াদ পনের দিন হতে পারে না। দশ দিন হওয়াই উচিত। আর মাসের বাকী সময়টা 'তুহর' থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তা হচ্ছে উনিশ দিন। কেননা মাস অনেক সময় উনত্রিশ দিনেও হয়। সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছি যে, তুহর-এর মিয়াদ তের দিন। তার কম-সে-কম মেয়াদ যে পনের দিন, তার দলীল হচ্ছে, হায়য-এর বেশির পক্ষের সময়-কাল হচ্ছে দশ দিন, অথচ আল্লাহ্ যখন প্রত্যেক মাসের বিকল্প বানিয়েছেন এক তুহর ও এক হায়য, তখন তুহর-এর মেয়াদ তার তুলনায় বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা নবী করীম (স) হুমনা (রা)-কে বলেছিলন ঃ আল্লাহ্‌র ইলমে তোমার হায়য ছয় কিংবা সাত হয়। যেমন মেয়েরা প্রতিমাসে হায়য দেখে থাকে। এতে ছয় কিংবা সাত হায়য-এর মিয়াদ বোঝায়। আর প্রতি মাসে তুহর-ও রয়েছে। বোঝা গেল, এটা সাধারণভাবে সব মেয়েলোকেরই ব্যাপার, যতক্ষণ পর্যন্ত পনের দিনের দলীল না পাওয়া যাবে, না পাওয়া যাবে দশ দিনের দলীল, তের দিনের দলীল। তাহলে তা সঠিকভাবে 'তুহর' হবে না। তাছাড়া হায়য থেকে তুহ্‌র হলে নামায বাধ্যতামূলক হয়। এটা ঠিক সফরের পর এক স্থানে স্থিত হওয়ার মত। আর আমাদের মতে এক স্থানে স্থিত হওয়ার কম-সে-কম সময় হচ্ছে পনের দিন, তার বেশির দিকে কোন সময়সীমা নেই। কাজেই হায়য থেকে তুহর-ও অনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একথাও মনে রাখতে হবে যে, তুহর-এর সময়-কাল 'তাওকীফ'-এর মাধ্যমে নির্ধারিত, কিংবা সর্বসম্মতভাবে। আগের দিনের ফিকাহবিদদের ঐকমত্য হচ্ছে, পনের দিন তুহর থাকবে সহীহভাবে। তার কমে নানা মত রয়েছে। তাই আমরা সেই ঐকমত্যকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি। তার কম সময়ে তুহর হয় বলে আমরা মনে করি না। কেননা তাতে 'তওকীফ' নেই, নেই ঐকমত্য। ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম উনিশ দিনের তুহর-এর মিয়াদ ঠিক করেছেন বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা কয়েকটি কারণে বিনষ্ট হয়ে যায়। একটি— আগের কালের ফিকাহবিদদের ঐকমত্য, যা পূর্বেই হয়েছে। তাতে তুহর পনের দিনের হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা একমত। এতএব তার বিপরীত হওয়া উচিত নয়। তার পূর্বে তাঁরা তিনটি দিক দিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। আতা বলেছেন— পনের দিন। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন— তের দিন। ইমাম মালিকের কোন কোন বর্ণনায় পনের দিন বলা হয়েছে। আর কোনটিতে দশ দিন বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কেউ উনিশ দিন বলেন নি। তা এদিক দিয়ে বিনষ্ট হয় যে, তা একটা সময়-পরিমাণ নির্দিষ্ট প্রমাণ করেছে 'তওকীফ' ছাড়াই। ঐকমত্যও নেই। কিন্তু তা সঠিক কথা নয়। এসব ব্যাপারে তা অগ্রহণযোগ্য। তাদের যে দলীলের উল্লেখ পূর্বে করেছি, তা-ও অর্থহীন। কেননা জানা আছে, আল্লাহ্ একটি মাসে হায়য ও তুহর-এর স্থানে যা দাঁড় করেছেন, তখন হায়য ও তুহর হবে না এমন কথা নয়। মাসের চেয়ে কম সময়ে। কেননা তার হায়য যদি তিন দিনের হয়, তাহলে এক মাসের কম সময়ে হায়য ও তুহ্‌র— দুটিই হল। আর এক মাসের কম সময়ে হায়য ও তুহর দুটিই হওয়ার দরুন এক মাসকে হায়য ও তুহর বর্জিত বানিয়েছেন— তার কোন প্রমাণ নেই। দশ দিনের কমেও হায়য হতে পারে। ফলে একটি মাসের কম সময়ে হায়য ও তুহ্‌র পূর্ণ হয়ে গেল। তিন মাসের কম সময়ে হায়য দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল। যদিও তার ইদ্দত মাস হিসেবে তিন মাসের কম সময়ে পূর্ণ হওয়া জায়েয নয়, তবু দশ দিনে হায়য পূর্ণ হওয়ার পর তুহরকাল কম হওয়া নিষিদ্ধ নয়, তাহলে মোট সময় উনিশ দিনের কম হয়ে যায়। এই যা বললাম, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যার উল্লেখ

করা হয়েছে তা উনিশ দিনে কম-সে-কম তুহর সীমাবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক হওয়ার কোন দলীল নয়। তা থেকে বোঝা যায় যে, তুহ্র কখনও কখনও এই পরিমাণের হতে পারে, তাতে এই দলীল নেই যে, তা তার চাইতে কম মিয়াদের হতে পারে না।

হায়য অবস্থায় দেখা দেয়া তুহ্রে পার্থক্য

হানাফী ফিকাহবিদগণ সকলেই বলেছেন, যদি কারোর একদিন হায়য-এর রক্ত আসে, আবার একদিন তুহ্র হয়, তাহলে তাকে অবিচ্ছিন্ন রক্তস্রাবই মনে করতে হবে। আবূ ইউসূফও এভাবেই বলেছেন, পনের দিনের কমে দুই বারের রক্তের মাঝে যদি তুহর দেখা দেয়, তবে তা অব্যাহত স্রাবই মনে করতে হবে। মুহাম্মাদ বলেছেন, দুই রক্তের মাঝে তুহর যদি তিন দিনের কম সময় থাকে, তাহলে তা ধারাবাহিক রক্তস্রাবই বুঝতে হবে। আর যদি তিন দিন বা দশ দিনের বেশী সময়ের হয়, তাহলে দুই রক্ত ও মধ্যবর্তী তুহরকে দেখতে হবে। তুহর যদিও দুটির বেশী সময় ধরে থাকে, তাহলে দুই রক্তের মাঝে পার্থক্য করতে হবে। যদি সমান-সমান বা কম সময়ের হয়, তাহলে তাকে ধারাবাহিক রক্তস্রাব মনে করতে হবে। আর তুহর যদি দুই রক্তস্রাবের বেশি সময় ধরে হয় তাহলেও দুটির মাঝে পার্থক্য করা হবে, দুটিকে স্বতন্ত্র রক্তস্রাব মনে করতে হবে। যদি প্রথমটা তিন দিনের হয়, তাহলে তা হায়য। অনুরূপভাবে প্রথমটা তিন দিনের না হলে আর দ্বিতীয়টা তিন দিনের হল, তাহলে দ্বিতীয়টি হায়য ধরতে হবে। দুটির কোন একটিও যদি তিন দিনের না হয়, তাহলে দুটির কোনটিই হায়য মনে করা যাবে না।

ইমাম মালিক বলেছেন, যদি একদিন রক্ত আসে ও একদিন তুহ্র হয়, কিংবা দুই দিন তুহর হয়, পরে রক্ত দেখে, তাহলে তুহর -এর দিনগুলো অর্থহীন, তাকে হায়য-এর দিন মনে করতে হবে একটিকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে। তা অব্যাহত থাকলে হায়য-এর দিনগুলোর উপর এই তিনদিন প্রাধান্য পাবে। এই প্রাধান্য পাওয়া দিনগুলোর মধ্যেও তুহর দেখা গেলে, তাকে বেহুদা মনে করতে হবে, তাতে তিন দিনের প্রাধান্যের রক্ত বোঝা যাবে। আর তুহর-এর দিনগুলোতে নামায-রোযা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী মিলনও হতে পারবে। আর রক্তের দিনগুলো পরস্পর যোগ করে একই হায়য ধরতে হবে। তখন তালাকের ইদ্দত তুহ্র-এর দিন হিসেবে গণনা করা হবে না। আর তার হায়য-এর দিনগুলোর পর তিন দিনের প্রাধান্য হলে প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন করে অযূ করতে ও প্রত্যেক দিন গোসল করতে হবে, যদি তুহরের দিনগুলো তার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা হয়। গোসল করার আদেশ করা হয়েছে এজন্যে যে, রক্তস্রাব আবার শুরু হয়নি তা তো সে জানে না।

রুবাই, ইমাম শাফেয়ী থেকেও এরূপ কথাই বলেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, হায়যে রক্ত অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে সব সময় দেখা যায় না। হায়যের রোগিনী সম্পর্কেও এই কথা। সে রক্ত কোন সময় দেখে, কখনও তা সম্পূর্ণ বন্ধ দেখা যায়। আর রক্ত প্রবাহ কিছু সময়ের জন্যে বন্ধ থাকলে হায়যকাল শেষ হয়েছে বলা যাবে না এই তুহ্র দেখা যাওয়ার সময়ে এবং এই ধরনের সময়ে রক্ত বন্ধ থাকলে। এই গোটা সময়ই অ-বিচ্ছিন্ন রক্ত প্রবাহ মনে করতে হবে। সব ফিকাহবিদই একথা বলেছেন। দুই রক্তের মাঝে দেখা দেয়া তুহর মূলত সহীহ তুহর নয়। এটা সর্বসম্মত কথা। কেননা সঠিক তুহ্র একদিন বা দুই দিন কেউ-ই বলবে না। কেউ বলেনি যে, দুই হায়য এর মধ্যবর্তী তুহর দশ দিনের কমে হয়। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত কথা বলে এসেছি। উপরন্তু দুইবারের রক্তের মাঝখানে একদিন

বা দুই দিনের তুহর দেখা দিলে নামায রোযা ফরয হয়ে দাঁড়ালে দুইবারের প্রত্যেক বারে পূর্ণমাত্রার হায়য ধরা কর্তব্য হয়ে পড়ে। আর সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যের দিক দিয়ে এতটুকু পরিমাণের তুহর ধর্তব্য হয় না। দুটির প্রতিটি আলাদাভাবে পূর্ণমাত্রার হায়যও ধরা যায় না। কাজেই তার হুকুমটা এই সময়ে প্রত্যাহার করতে হবে ও পূর্ব ও পরবর্তী রক্তের সাথে তাকে যোগ করতে হবে অব্যাহত রক্তের ন্যায় মনে করে।

হায়যের দিনগুলোতে রক্তের বর্ণ হরিৎ কিংবা ময়লাযুক্ত হলে কি বোঝা যাবে সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা পাওয়া গেছে। উম্মে আতীয়া আনসারীয়া বলেছেন, গোসল করার পর হরিৎ বা ময়লা বর্ণের রক্ত দেখা দিলে আমরা তাকে কিছুই গণ্য করতাম না। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, হায়যের দিনগুলোর মধ্যে হরিৎ বর্ণের রক্ত দেখা দিলেও তাকে হায়যই মনে করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক, লাইস, আবদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান ও শাফেয়ী এদের মধ্যে উল্লেখ্য।

ময়লাযুক্ত রক্তের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা উঠেছে। এই মাত্র যাঁদের নামের উল্লেখ করলাম তাঁরা সকলেই বলেছেন, হায়যের দিনগুলোতে তা হলে সেটা হায়যই গণ্য হবে, তার পূর্বে কোন রক্ত দেখা না গেলেও। আবূ ইউসূফ বলেছেন, রক্তের সূচনা হওয়ার পর ময়লাযুক্ত রক্ত দেখা গেলে তবেই তা হায়য গণ্য হবে নতুবা নয়। হযরত আয়েশা ও আসমা— হযরত আবূ বকর (রা)-এর তনয়া বলেছেন, হায়য সম্পন্না নারী দিনের আলোর মত স্পষ্ট শুভ্রতা না দেখা পর্যন্ত নামায পড়বে না। রক্ত-প্রবাহ শুরুর পর ময়লাযুক্ত রক্ত দেখা গেলে তা হায়যই হবে। রক্তের প্রবাহ শুরু হওয়ার পর তা দেখা গেলে বুঝতে হবে, রক্তের বিভিন্ন অংশের সংমিশ্রণ হওয়ায় ওরূপ হয়েছে।

কাজেই তার হুকুম হায়যের হুকুমই হবে, যদি তা হায়যের দিনগুলোতে পাওয়া যায়। তার পূর্বে রক্তস্রাব শুরু না হলেও ক্ষতি নেই। হায়যের রক্তস্রাবের অভ্যাসগত সময়টাই প্রমাণ করছে যে, রক্তের অংশগুলোর শ্বেত বর্ণের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কারণেই এরূপ হয়েছে। এ ব্যাপারে সময়ের প্রভাব রয়েছে। তার প্রমাণ এই, যে মেয়েলোকটি হায়যের দিনগুলোতেই এই ময়লাযুক্ত রক্ত দেখেছে এবং তার পরও। অতএব হায়যের দিনগুলোতে সে যা দেখেছে তা হায়য-ই হবে। আর তার পরে যা দেখেছে তা হায়য হবে না। আর সময়ই হচ্ছে তা হায়য হওয়ার বড় নিদর্শন। অনুরূপভাবে সময়ই দলীল হবে এই কথার যে, ময়লাযুক্ত হওয়াটা হায়যের রক্তের বিভিন্ন অংশের সংমিশ্রণের কারণে হয়েছে এবং তা হায়য ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েলোক যখন রক্তস্রাব দেখে ও তা চলতে থাকে, তখন শুরুর হায়য কখন, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী সব ফিকাহবিদই বলেছেন, তার দশ দিন হায়য ধরতে হবে। আর তার পরবর্তী দিনগুলো মাসের শেষ পর্যন্ত 'ইস্তাহাযা' ধরতে হবে। তাতে তার হায়য হবে দশ দিনের আর তুহর হবে বিশ দিনের। মৌলনীতিতে কোন মতপার্থক্যের উল্লেখ হয়নি। বশর ইবনুল ওলীদ ইমাম আবূ ইউসূফের এই মতের উল্লেখ করেছেন যে, হায়যের কম-সে-কম মিয়াদ তিন দিন ধরে, তার পরে নামায পড়তে শুরু করবে। আর স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে দশ দিন ধরবে। দশ দিনের পর ছাড়া রোযা কাযা করা শুরু করবে না। এভাবে রমযানের দশ দিন রোযা থাকবে। তার সাত দিন কাযা করবে। ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, মেয়েদের সমান দিনগুলোতে সে বসে থাকবে। ইমাম মালিক বলেছেন, এরূপ অবস্থায় মেয়েরা সাধারণত যে দিনগুলোতে বসে থাকে, তাই সে-ও বসে থাকবে। তার পরে সে 'হায়যের রোগিনী' মনে

করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তার হায়য-এর কম-সে-কম মিয়াদ হচ্ছে এক দিন এক রাত্রি। প্রথমোক্ত কথাটির সহীহ্ হওয়ার দলীল হচ্ছে সকলের ঐকমত্য এ ব্যাপারে যে, সেই নারী হায়যের পার্থক্য পূর্ণ বেশি দিনে নামায না পড়ার জন্যে আদিষ্ট। ফলে এই দিনগুলোতে সে হায়য অবস্থায় আছে মনে করতে হবে। এরূপ অবস্থা হায়যের হতে পারে। তাই পূর্ণ দশ দিন হায়য ধরতে হবে, এই সময়টার সেই হুকুম-ই কার্যকর হবে। তার বিপরীত তার কোন অভ্যাস নেই, তা-ই প্রমাণিত হবে। লক্ষণীয়, সকলেই বলেছেন, দশ দিনের আগেই যদি রক্তস্রাব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা হলে সেই সব কয়টা দিনই হায়য ধরতে হবে। তাতে প্রমাণিত হল যে, দশ দিনের জন্যে হায়যের হুকুমই বহাল থাকবে। কোন দলীল ব্যতীত এর কম ধরা জায়েয হবে না। উপরন্তু কম-সে-কম মিয়াদের অতিরিক্ত সন্দেহ পূর্ণ হলে— অধিক সময়ের উপরও বেশি হলে শুধু সন্দেহের কারণে তার হায়য হওয়ার হুকুমটা ক্ষুণ্ন হওয়া উচিত হবে না। নবী করীম (স) মাসের উনত্রিশ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে ত্রিশ দিন পুরা করার আদেশ করেছেন রোযা রাখা বা ভাঙ্গার ব্যাপারে। বলেছেন ঃ فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِيْنَ 'উনত্রিশ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার দরুন নতুন চাঁদ দেখা না গেলে ত্রিশ দিন পূর্ণ গণনা কর।' কেননা মাসের শুরুটা যদি নিশ্চিত হয়, তা হলে তার শেষ হওয়াটা সন্দেহপূর্ণ হওয়া উচিত নয়।

যদি বলা হয় যে, মেয়েলোকের দশ দিনের কমের হায়যের অভ্যাস, তা যদি ছাড়িয়ে গিয়েও রক্তস্রাব চলে, তা হলে তার অভ্যাসের দিকেই ফিরে যেতে হবে। শুরুতেই হায়যের হুকুমে বেশি হওয়াটা তার দিনগুলো গণ্যকরণে প্রতিবন্ধক হবে না, অনুরূপভাবে যে মেয়েলোক তার অভ্যাসের দিনগুলোর শুরুতেই নামায না-পড়ার জন্যে আদিষ্ট হবে—যদিও তা তিন দিনের কম হয়। তিন দিনের কম সময়ে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমরা বলব, সে যা দেখেছে, তা হায়য নয়। তিন দিন পূর্ণ হলেই তা হায়য হবে।

জবাবে বলা যাবে, যার হায়যের দিনগুলো জানা-শুনা-পরিচিত, বাড়তি দিনের হুকুম সেখানে গণ্য ও বিবেচিত হবে দশ দিনে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّارَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا -

হায়যের রোগিনী তার কুরুর দিনগুলোর নামায ছেড়ে দেবে।

এ থেকে বোঝা গেল যে, বেশি দিনের ব্যাপারটি অবশ্য বিবেচিত হবে। কেননা আমাদের জানা আছে, তার দিনগুলো জ্ঞাত-পরিচিত। আর সূচনা পর্বের পূর্বে তার কোন দিন ছিল না যা গণ্য হওয়া আবশ্যক। তাই দশ দিনে তার রক্ত দেখতে পাওয়া বিবেচনার বাইরে থাকবে। বরং আমাদের মতে দশ দিনের সূচনা পর্বে সে যা দেখেছে, তা অভ্যাসের মতই। তা সংখ্যা গণনায় তার দিন ও সময় হয়ে যাবে। অবস্থা যখন এরূপ হবে, তখন দশ দিনের সূচনা পর্বে সে যে রক্ত দেখেছে, তা গণ্য হওয়া জায়েয হবে না। বরং তাকে হায়য বলে ধরে নেয়াই কর্তব্য হবে। কেননা হায়য তো এই রূপই হয়ে থাকে। আর যে নারী তার নির্দিষ্ট দিনগুলোর শুরুতে রক্ত দেখেছে, আর নামায রোযা ত্যাগ করার জন্যে সে আদিষ্ট বলে আমরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি, যা তিন দিনের কমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তা তার হায়য হওয়ার আওতার বাইরে গণ্য হবে। কেননা তা শুরুতেই বিবেচিত হয়েছে। আমরা জানি যে, হায়যের একটা কম-সে-কম মিয়াদ আছে। তার কম হলে তা সেই হায়য হবে না, যে রক্ত সে দেখেছে। এই কারণে তা বিবেচনার মধ্যে

আসবে। তিন দিন তার রক্ত দেখার পর সূচনা পর্ব গণ্য হওয়া আবশ্যকীয় নয়। তাই সমগ্র দশ দিনই হায়য হবে, তার কমে সীমাবদ্ধ করার আবশ্যকতার কোন প্রমাণ না হওয়ার কারণে।

তবে ইমাম আবূ ইউসূফ তাকে তার অবস্থায় ধরেছেন যার হায়য পাঁচ কিংবা ছয় দিন হয়। ষষ্ঠ দিনে সে সন্দেহে পতিত হবে। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, কমে সে নামায পড়বে। মীরাস ও এক তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারও তাই। বেশি দিনে স্বামীর ব্যাপার সতর্কতার সাথে গ্রহণ করবে।

আবূ বকর বলেছেন— এটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত নয় এই দিক দিয়ে যে, তার দিনগুলো জানা ছিল। পাঁচ দিনের দৃঢ় বিশ্বাস হলে, ষষ্ঠ দিনে সন্দেহ হয়। এই কারণে নামায-রোযায় আমরা সতর্কতা গ্রহণ করেছি। স্বামীর ব্যাপারেও সতর্কতা গ্রহণ করেছি। সন্দেহের সাথে তাকে আমরা মুবাহ বলিনি। আর যার হায়য প্রথম হয়েছে, তার হিসেবেও গণ্য করার কোন দিন নেই। সে যে রক্ত দেখেছে— যা ঠিক হায়যের মতই হয়— তা হায়য মনে করতে হবে। তাকে কম-সে-কম হায়যের মিয়াদ ধরার কোন অর্থই হয় না। কেননা তার এমন কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, যা তাকে আবশ্যকীয় বানাবে। এই দিক দিয়েও এই কথাটি নষ্ট হয়ে যায় যে, তার হায়যের কম-সে-কম মিয়াদ কিছু নেই। ফলে তা ও যা তার উপর বেশি হয়েছে তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ওটাকে সেই দিকে ফিরিয়ে নেয়া কর্তব্য হওয়ার দিক দিয়ে। কাজেই এরূপ অবস্থায় বেশির মিয়াদটা গণ্য করাই আবশ্যক। কেননা বেশির ভাগে হায়য হওয়া নিশ্চিত হয়। সে হুকুম ভঙ্গ হওয়ার কোন দলীল নেই। ইমাম আবূ হানীফার মতই যে সত্য তার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা ও অল্প বয়সের মেয়ের ইদ্দতকাল তিনমাস নির্ধারিত করেছেন হায়যের বিকল্প হিসেবে। প্রত্যেকটি তুহর ও হায়যের স্থানে একটি মাস ধরেছেন। তা থেকে বোঝা গেল যে, রক্তস্রাব অব্যাহত থাকলে এবং তার অভ্যাসগত সময়কাল কিছু না থাকলে তার এক হায়যও এক তুহর পূর্ণ করে ধরা কর্তব্য হবে। আর জানা আছে যে, তুহর-এর বেশি সময়ের কোন সীমা জানা নেই। যদিও হায়যের বেশির পক্ষের মিয়াদ পরিমাণ জানা আছে। তাই হায়যের বেশির ভাগের মিয়াদ পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তুহর। কেননা মাসের অবশিষ্ট দিনে তুহর-এর সময় পরিমাণ গণ্য হওয়া অন্যের তুলনায় অধিক উত্তম নয়। কাজেই মাসের অবশিষ্ট সময় কালের তুহর গণ্য হবে তা, যা হায়যের অধিক দিন মিয়াদের অবশিষ্ট থাকবে। লক্ষণীয় যে হায়য দশ দিনের কম সময়ে হলে তুহরে যা কম পড়েছে তা বাড়তি ধরতে বাধ্য হবে। আর তুহরের বৃদ্ধি পাঁচ দিন কিংবা ছয় দিন হবে, তাও নয়। তাই হায়যের বেশির পক্ষের দিনগুলোই গণ্য হওয়া আবশ্যক। মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোকে তুহ্র মনে করতে হবে। আর এই প্রথম হায়য হওয়া মেয়েটির জন্যে এক মাসে হায়য ও তুহর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। রাসূলে করীম (স) হুমনা (রা)-কে বলেছিলেনঃ 'তুমি আল্লাহ্‌র জানামতে ছয় কিংবা সাত দিন হায়য অবস্থায় থাকবে, যেমন মেয়েলোকেরা প্রতি মাসে হায়য সম্পন্না হয়ে থাকে।' তিনি একথা বলে জানিয়ে দিলেন যে, মেয়েদের প্রতি মাসের অভ্যাস হচ্ছে একটি হায়য ও একটি তুহর হওয়া।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) যেমন বলেছেন, তার জন্যেও ছয় কিংবা সাত দিন ধার্য করা হল না কেন?

জবাবে বলা যাবে, আমরা তা বলিনি কয়েকটি কারণে। একটি আমরা কোন মনীষী সম্পর্কেই জানি না যে, তিনি প্রথম হায়য হওয়া মেয়ে সম্পর্কে এরূপ কথা বলেছেন। দ্বিতীয়—

যাঁকে একথাটি বলা হয়েছিল, তাঁর অভ্যাস যদি ছয় বা সাত দিনের হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে অন্য কোন হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। অতএব আমরা হাদীসকে দলীল বানিয়ে যা বলেছি, তা সহীহ্। কেননা আমরা তো হায়য ও তুহ্রকে এক মাসের মধ্যে অভ্যস্ত-পরিচিত পরিবেশের মধ্যে প্রমাণ করতে চেয়েছি। যাঁরা বলেছেন যে, সাধারণ নারীকুলের হায়যের মতই সে-ও বসে থাকবে, তাদের এই কথার কোন তাৎপর্য নেই। কেননা নবী করীম (রা) হায়যের রোগিণী ও অন্যান্য সাধারণ নারীকুলের ন্যায় বসে থাকুক, তা চান নি। তিনি মাত্র একজনকেই তাদের অভ্যাসের দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই বলেছিলেন, সে যেন মেয়েদের কুরুর দিনগুলোতে বসে থাকে এবং অন্যকে আদেশ করেছেন, আল্লাহ্র ইলমে ছয় কিংবা সাত দিন বসে থাকতে। অপর একজনকে আদেশ করেছেন, সে যেন প্রতি নামাযের জন্যে একবার গোসল করে। তাদের কাউকেই অন্যান্য মেয়েদের অভ্যাসের দিন পর্যন্ত বসে থাকতে বলেন নি। কেননা সাধারণ মেয়েদের ও অপরিচিতা ভিন্ন মেয়েদের এবং তাদের থেকে কম বয়সের ও বেশি বয়সের মেয়েরা তো অভিন্ন— সমান। আবার বয়সের দিক দিয়ে সমান হয়েও হায়যের ব্যাপারে তাদের অভ্যাস বিভিন্ন হতে পারে। অতএব তাদের মেয়েলোকদের অন্যদের অপেক্ষা কোন বিশেষত্ব নেই।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ - فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ -

এবং তোমরা স্ত্রীদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের নিকট যাবে।

মনীষী বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রক্তস্রাব বন্ধ বা বিচ্ছিন্ন হলেই স্ত্রী সঙ্গম মুবাহ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাঁরা হায়যের কম-সে-কম বা বেশির মিয়াদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। কেউ বলেছেন, হায়যের কম-সে-কম ও বেশীর মিয়াদে গোসল করার পূর্বে স্ত্রী সঙ্গম করা জায়েয নয়, গোসলের পরই তা জায়েয হবে। শাফেয়ী মাযহাবের এই মত। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, রক্তস্রাব বন্ধ হলে ও তার দিন-কাল দশের কম হলে তা-ও হায়য অবস্থা মনে করতে হবে যতক্ষণ না গোসল করছে। অবশ্য পানি পাওয়া গেলে তবে। কিংবা তার নামাযের সময় অর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেলে তবে। এ দুটির কোন একটি হলে হায়যের আওতার বাইরে গেল মনে করা যাবে। তখন তার স্বামীর জন্যে তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে। আর সেটি শেষ হায়য হলে তার ইদ্দতও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তার অভ্যস্ত দিন যদি দশ দিন হয়, তাহলে এই দশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেই হায়য অবস্থার অবসান হয়ে যাবে। তখন তার অবস্থা হবে অপবিত্র মেয়েলোকের মত স্বামীর সঙ্গম করা মুবাহ হওয়া, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া ইত্যাদির দিকদিয়ে।

হায়যের অভ্যস্ত দিনগুলোর শেষ হওয়া ও রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসলের পূর্বে সর্বাবস্থায়ই তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয— এই মত যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের দলীল হচ্ছেঃ

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ -

তোমরা তাদের নিকটে যাবে না, যতক্ষণ তারা পবিত্র না হচ্ছে।

আল্লাহ্র এই কথাটি এ আয়াতে একটা সময়সীমা দেয়া হয়েছে, যার পরের অবস্থা পূর্বের বিপরীত হবে। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর তার সাথে সঙ্গম করা সাধারণভাবেই মুবাহ। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 'ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।'

এবং

وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ -

এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র ফায়সালার দিকে ফিরে আসছে। (সূরা হুযারত ঃ ৯)

এভাবে কতগুলো শেষ সময়ের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে ভিন্নরূপ হবে। আল্লাহ্র কথা ঃ حَتّٰى يَطْهُرْنَ কথাটিও ঠিক এইরূপ। يَطْهُرْنَ পড়া হলে অর্থ হবে শুধু রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। একে يَطَّهَّرْنَ -ও পড়া হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন। তাতেও সেই অর্থই হয়। যেমন পূর্বোল্লিখিত পাঠের হয়। তাতেও অর্থ দাঁড়াবে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। কেননা রক্ত বন্ধ হওয়ার কথা বোঝাবার জন্যে উক্ত শব্দের দুরকমের পাঠই সিদ্ধ।

গোসল করার পূর্বে সর্বাবস্থায়ই স্ত্রী-সঙ্গম করা নিষিদ্ধ বলে যাঁরা মত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে ঃ

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ -

পরে যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের নিকটে যাও, যেমন আসতে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।

এ আয়াতে স্ত্রী-সঙ্গম মুবাহ হওয়ার ক্ষেত্রে দুই শর্তের উল্লেখ হয়েছে। একটি রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া আর দ্বিতীয় গোসল করা। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ কথাটি গোসল না করা পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না। এই কথাটি ঠিক তেমন, যেমন বলা হয় ঃ 'তুমি জায়দকে কিছুই দেবে না, যতক্ষণ না সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে।' যখন সে সেখানে প্রবেশ করবে ও বসবে, তখন তুমি তাকে একটি দীনার দেবে। এই কথা থেকে বোঝা যায়, একটি দীনার পাওয়ার অধিকার হওয়া নির্ভর করে ঘরে প্রবেশ করা ও বসা—এই সবের উপর। যেমন কুরআনের আয়াত ঃ

وَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا -

সে স্বামীর জন্যে তিন তালাক দেয়া স্ত্রী পরে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অপর একজন স্বামী বিয়ে (গ্রহণ) করবে। পরে সে তাকে তালাক দেবে। তারপরে এই দুজনের পুনরায় বিবাহিত হওয়ায় তাদের দুজনার কোন দোষ হবে না।

তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করা হালাল হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত করা হয়েছে। এই আলোচ্য আয়াতটিতেও তেমনি দুটি শর্ত করা হয়েছে স্ত্রী-সঙ্গম মুবাহ হওয়ার জন্যে। তা দুটি— তুহর, যা রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া দ্বারা সম্পূর্ণ হয় ও গোসল করা।

আবূ বকর বলেছেন— আল্লাহ্র কথা ঃ حَتّٰى يَطْهُرْنَ-এর অর্থ শুধু রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। এর মধ্যে গোসল করার কথা নেই। কেননা হায়য অবস্থায় গোসল করলেও তো সে পাক হবে না। কাজেই আয়াতাংশের অর্থ শুধু পাক-পবিত্র হওয়া, গোসল করা তার মধ্যে গণ্য নয়। আর রক্তস্রাব বন্ধ হলেই সে হায়য-এর আওতার বাইরে বেরিয়ে গেল। তবে আয়াতাংশ যদি পড়া হয় حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ তাহলে তাতে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে গোসল করার কথাটাও শামিল বুঝতে হবে। তবে আয়তাংশটির প্রথম পাঠ 'মুহকাম' আর দ্বিতীয় পাঠ 'মুতাশাবিহ্'। তবে 'মুতাশাবিহ'র হুকুমটা 'মুহকাম' হুকুমেই পরিণত হবে। তাহলে একইভাবে দুটি পাঠেরই তাৎপর্য সমন্বিত হবে। আর উভয় তাৎপর্যের দাবি হচ্ছে— রক্ত বন্ধ হলেই যৌন সঙ্গম মুবাহ হবে। কেননা রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার অর্থ-ই হল হায়যের আওতার বাইরে চলে যাওয়া। তবে আল্লাহ্র فَاِذَا تَطَهَّرْنَ 'তারা যখন পবিত্র হবে' কথাটির ভাব-তাৎপর্য পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দ্বিতীয় পাঠের মতই। তাতেও দুটি তাৎপর্য সমন্বিত হলে কথাটি এই দাঁড়ায় ঃ 'তোমরা তাদের নিকটে যাবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হবে। যখন তারা পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের নিকট যাও।' এতে কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক হল— সুদৃঢ় হল। যেমন এই কথাটি ঃ 'তাকে দেবে না যতক্ষণ না ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে। যখন প্রবেশ করবে, তখন দেবে।' চরম কাজটির উপর তাগিদ বোঝা যাবে। যদিও তার হুকুমটা পূর্বের কথার বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আর যখন তার ভাব-তাৎপর্য ব্যাপক হবে সেই দিক দিয়ে, যে দিকের উল্লেখ করেছি এবং চরম লক্ষ্যটাকে তার প্রকৃত অবস্থার উপর ধারণ করা কর্তব্য হবে, তখন বাহ্যিক পাঠেরই দাবি হবে রক্তস্রাব বন্ধ হতেই— যার কারণে সে হায়যের আওতার বাইরে যেতে পারে— তার সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হয়ে যাবে।

অপর দিক দিয়ে তাতে আর কটি সম্ভাবনা রয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহ্র কথা ঃ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ এর অর্থ শামিল হবে। তাদের পক্ষে যখন পানি বা তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্র হওয়া সম্ভব হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ 'সূর্য যখন ডুবে যাবে, তখনই রোযাদার ইফতার করবে।' তার অর্থ, তার ইফতার করা হালাল হবে। যেমন, যে ভাঙ্গল কিংবা উপরে উঠল, সে হালাল হল। তার উপর পরবর্তী বছর হজ্জ করা হালাল হবে। অর্থাৎ তার পক্ষে হালাল হওয়া জায়েয হয়ে গেল। কিংবা তালাকপ্রাপ্তাকে বলা হয়— সে যদি তার ইদ্দতকাল শেষ করে, তাহলে সে স্বামীদের জন্যে হালাল হল। অর্থাৎ সে স্বামী গ্রহণ করতে পারে, বিয়ে করতে পারে। এই তাৎপর্যই রয়েছে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথায়, যা তিনি ফাতিমা বিনতে কায়সকে বলেছিলেন ঃ 'যখন তুমি হালাল হবে, তখন আমাকে জানাবে।' এই সম্ভাবনা যখন রয়েছে, তখন চরম পর্যায়টা তার পরে তার সাথে সঙ্গম করার বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ 'পরে সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামী গ্রহণ করবে।' কেননা এ আয়াতে চরম পর্যায়টা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ এবং তার সাথে তার সঙ্গমই তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম স্বামীকে বিয়ে করার হারামত্ব দূর করে দেয়। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সঙ্গম হওয়া শর্ত। তার কাছ থেকে তালাক প্রাপ্তির আগেই তার সাথে সঙ্গম কার্য দ্বারা হারামত্ব দূর হয়ে গেল অর্থাৎ শর্ত পূরণ হয়ে গেল। তিনি তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সঙ্গমের পর তার তালাক দান শর্ত নয়। ইমাম শাফেয়ী তাঁর মতের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে যে আয়াতের উল্লেখ করেছেন, তাতে তাঁর পক্ষের কোন দলীল নেই। তাঁর বিপরীত মতের লোকদের কথাও তাতে অস্বীকৃত হয়নি।

তবে আমাদের মাযহাবের দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যবহৃত হয়েছে সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে তার প্রকৃত তাৎপর্যের উপর ধারণ করার জন্যে, সেই উভয় অবস্থাতেই, যে দুটিতে সে দুটির প্রয়োগ সম্ভব। তাই আমরা বলব, তাঁর কথা ঃ يَطْهُرْنَ তার প্রকৃত অর্থেই ব্যহৃত। যার হায়যের অভ্যস্ত দিন হবে দশ, তার এই দশ দিন অতিবাহিত হতেই তার স্বামীর পক্ষে তার সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হবে। আর তাঁর কথা يَطْهُرْنَ এবং কথা فَإِذَا تَطَهَّرْنَ দুটিরই তাৎপর্যে গোসল রয়েছে। যদি তার হায়যের অভ্যস্ত দিন দশের কম হয় এবং নামাযের সময় অতীত না হয়ে থাকে। কেননা এ ব্যাপারে দলীল পাওয়া গেছে যে, নামাযের সময় অতিবাহিত হলে তার সাথে সঙ্গম করা মুবাহ হবে সেই ব্যাখ্যাসহ, যা আমরা পরে বলছি। তাতে দুটি ক্রিয়ার একটিও পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং প্রকৃত অর্থেই দুটি ব্যবহৃত হয়েছে, উভয় অবস্থাতেই।

যদি বলা হয়, দুই রকমের পাঠকে দুটি স্বতন্ত্র আয়াত মনে করা হবে না কেন, যা একই অবস্থায় এক সাথে ব্যবহৃত হবে?

জবাবে বলা হবে, দুটি পাঠকে দুটি আয়াত মনে করা হলে— যেমন বলেছি— তা উত্তম হবে এই দিক দিয়ে যে, যদি দুটি আয়াতই হতো, যার একটির দাবি হতো সঙ্গম মুবাহ হওয়ার জন্যে রক্তের শেষটুকুও বন্ধ হওয়া। আর অপরটির চরম পর্যায়ে দাবি হবে গোসল করা, তাহলে দুটিকে দুই অবস্থায় প্রয়োগ করা কর্তব্য হয়ে পড়ত। তাতে দুটির প্রত্যেকটিই তার প্রকৃত অর্থে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতো। যার দাবি হচ্ছে চরম পর্যায়ের হুকুম। আর তা সম্ভব হতো কেবল তখন দুটিই ব্যবহৃত হতো দুই অবস্থায় যেমন বলেছি সেই ভাবে। বিপরীত মতের লোক যেমন বলছে সেই অর্থে যদি আমরা সে দুটিকে ব্যবহার করতাম, তা হলে দুটি চরম পর্যায়ের একটিকে প্রত্যাহার করতে হতো। কেননা সে বলে যে, তারা যদিও পাক হয়েছে, রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, তবু গোসল না করা পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে না। আমরা যদি তাকে সূচনাকালীন দলীল বানাই তা হলে তা ব্যাপক ও যথেষ্ট হবে। আমাদের ফিকাহবিদগণ তা গণ্য করেছেন তার ব্যাপারে যার অভ্যস্ত হায়য-কাল দশ দিনের কম।

এই সময়ের মধ্যে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। তবুও পুনরায় তা শুরু হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। তা হলে তা হায়য গণ্য হবে। কেননা মেয়েরা যে তুহর দেখে তার প্রত্যেকটাই প্রকৃত তুহর নয়। যার হায়য চলতে থাকে, সে-ও কখনও রক্তস্রাব হতে দেখে, কখনও দেখে তা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই যখন রক্তস্রাব বন্ধ থাকল, তখনও হায়য চলছে, হায়য শেষ হয়ে গেছে— এমন কথা বলা যেতে পারে না। এজন্যে তাঁরা বলেছেন, রক্ত বন্ধ হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্যভাবে বলা যাবে দুটি জিনিসের কোন একটি হলে। হয় গোসল করা হলে, তাহলে তখন হায়য নেই, মনে করা যাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং নামায পড়া মুবাহ হলে। এ দুটি হায়য অবস্থার পরিপন্থী। কিংবা নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে। তা হলে তখন নামাযের ফরয বাধ্যতামূলক হবে। আর ফরয নামায বাধ্যতামূলক হওয়া হায়য অবস্থা বর্তমান থাকার পরিপন্থী। যার হায়য চলছে তার উপর নামাযের ফরয ধার্য হওয়া জায়েয নয়। তাই হায়য অবস্থা যখন শেষ হয়ে গেল এবং তুহর অবস্থা এসে গেল, শুধু গোসল করাই বাকী, তখন যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। যেমন না-পাক অবস্থায় থাকা স্ত্রী স্বামীর জন্যে জায়েয। সঙ্গমও হতে পারে। সাহাবীগণ থেকেও ইদ্দত শেষ হওয়ার জন্যে গোসল করার গুরুত্ব পর্যায়ে বর্ণনা এসেছে। ঈসা আল-খাইয়্যাত-শবী সূত্রে তের জন সাহাবী থেকে বর্ণনা এসেছে। তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ বকর, উমর, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ব্যক্তি তার স্ত্রীর

উপর বেশি হকদার তার তৃতীয় হায়য থেকে গোসল না করা পর্যন্তও। হযরত আলী, উবাদাতা ইবনুস সামিত, আবুদ-দারদা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

তবে তার হায়যের অভ্যস্ত দিন যদি দশ হয়, তাহলে আমাদের মতে দশ দিনের পরও হায়য আছে বলা জায়েয নয়। তাই দশ দিনের পর তা নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে মনে করা উচিত হবে। হায়য শেষ হয়ে গেলে হায়যের হুকুম তো আর থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তো কেবল সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম নিষিদ্ধ করেছেন, যার হায়য হচ্ছে। কাজেই হায়যের হুকুম উঠে যাওয়ার ও হায়য শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী-সঙ্গম নিষিদ্ধ থাকতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ –

তোমরা স্ত্রীদেরকে হায়য অবস্থায় বিচ্ছিন্ন কর এবং পাক না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট যেও না।

আলোচ্য অবস্থায় স্ত্রী তো পাক হয়ে গেছে। সে তার নির্দিষ্ট সময়-কাল অতিক্রম করেছে, যদি সে ইদ্দত পালন রত থেকে থাকে। এখন সে সব পাক নারীদের মতই। গোসল করা জরুরী হলেও তা সঙ্গম করা জায়েয হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধক হবে না।

যদি বলা হয় দশ দিনের কমে যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে গোসল ওয়াজিব হবে। গোসল বাধ্যতামূলক হওয়া হায়য অবস্থার পরিপন্থী। কেননা যার হায়য হয় তার উপর গোসল বাধ্যতামূলক হওয়া জায়েয নয়। যেমন নামায ফরয হওয়া বাধ্যতামূলক হওয়া প্রসঙ্গে তুমি বলেছ।

তাকে জবাবে বলা হবে, হায়য যখন গোসল ওয়াজিব করে, তখন তার বাধ্যতামূলক হওয়ার পরিপন্থী নয় তার হুকুমের তার স্থিতির। লক্ষণীয়, নামাযের তাহরীমা ওয়াজিব করে সালাম ফেরানো। তার শেষ পর্যন্ত পৌছার বাধ্যতামূলক হওয়া তার হুকুম বহাল থাকার পরিপন্থী নয়। তেমনি ইহরাম বাঁধলে শেষে মাথা মুণ্ডন করতে হয়। কিন্তু তার আবশ্যকীয় হওয়াটা তার ইহরাম স্থিতিশীল হওয়ার পরিপন্থী নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মুণ্ডন কার্য না করেছে। গোসলও তেমনি। তা হায়য হওয়ার পর জরুরী। তা শেষ কাজ, মেয়েদের হায়যের পর পবিত্র হওয়ার জন্যে তা আবশ্যকীয়। তার বাধ্যতামূলক হওয়ায় হায়যের হুকুমের বিপরীত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حَتَّى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ –

যতক্ষণ তারা পবিত্র না হচ্ছে, পরে তারা যখন পবিত্র হবে....

এর মধ্যে গোসলের কথাও আছে। তাই এই কথাটি এ কথার মত হয়ে গেল ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا –

তোমরা যদি না-পাক হয়ে থাক, তাহলে পবিত্র হও।

এ থেকে বোঝা যায়, হায়য নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর নারীর গোসল করা কর্তব্য। নবী করীম (স) থেকেও তা বর্ণিত এবং মুসলিম উম্মাহ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ –

তারা যখন পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাদের নিকট আস তেমনিভাবে, যেমন আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র এই কথাটি নিষিদ্ধ ও মুবাহ্ হওয়ার মাঝে সাধারণ। তা ওয়াজিব হিসেবে নয়। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ -

যখন নামায সম্পূর্ণ আদায় হয়ে যাবে, তখন তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়। (জুম'আ ঃ ১০)

এবং

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا -

তোমরা যখন হালাল হয়ে যাবে, তখন তোমরা শিকার কর (শিকার করতে পার)।

(সূরা মায়িদা ঃ ২)

এসব হুকুম পরবর্তী কাজটাকে মুবাহ্ প্রমাণ করে মাত্র। নিষিদ্ধ থাকার পর তা মুবাহ্ করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ -

যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাতা, রুবাই ইবনে আনাস এর অর্থ বলেছেন, যৌনাঙ্গে সঙ্গম করতে বলা হয়েছে। শুরুতেই হায়যের কারণে স্ত্রীদের সাথে মিলন না করার আদেশের পর এই আদেশ মিলন করার অনুমতি মাত্র। এর আগে বলা হয়েছিল ঃ 'অতএব তোমরা স্ত্রীদেরকে হায়য অবস্থায় ত্যাগ কর।' সুদ্দী ও দহাক বলেছেন, তুহর অবস্থায়, হায়য অবস্থায় নয়। ইবনুল হানফীয়া বলেছেন, বিয়ে করে, যিনাকার হিসেবে নয়।

আবূ বকর বলেছেন— আল্লাহ এই সব কথাই বলতে চেয়েছেন, কেননা এই সবগুলোই হচ্ছে আল্লাহ্‌র আদেশ। আয়াতে এই সব অর্থই শামিল রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন, ভালোবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের।

আতা থেকে বর্ণিত, পানি দ্বারা নামাযের জন্যে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের কথা বলা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, গুনাহ থেকে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের কথা বলা হয়েছে। আবূ বকর বলেছেন, পানি দ্বারা পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে এই কথা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা এর পূর্বের আয়াতে 'তাহারাত'-এর কথা বলা হয়েছে। অতএব আয়াতে নামাযের জন্যে পানি দ্বারা তাহারাত গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। 'তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের নিকট যাও' আয়াতে। অতএব 'আল্লাহ্ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন' আয়াতে প্রশংসা করা হয়েছে তাদের, যারা নামাযের জন্যে পানির দ্বারা পবিত্রতা গ্রহন করে। তাদের প্রশংসায় আল্লাহ্ এ-ও বলেছেন ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

ওখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অবলম্বনকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ্ও ভালোবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করেছেন এজন্যে যে, তারা পানি দ্বারা 'ইস্তিন্‌জা' করত।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

نِسَاءُ كُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে ক্ষেত। অতএব তোমাদের ক্ষেতে আস যেদিক দিয়েই তোমরা ইচ্ছা কর।

'আল-হারস' মানে ক্ষেত। আর ক্ষেত হচ্ছে চাষাবাদের স্থান। ইঙ্গিতে এই স্থানের কথা বলা হয়েছে যৌন সঙ্গমের স্থান হিসেবে। স্ত্রীদেরকে ক্ষেত বলা হয়েছে। কেননা তারাই হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের কেন্দ্র স্থান। আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ 'তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেমন করে তোমরা চাও।' এই কথা সঙ্গমকে মুবাহ করে দিয়েছে, যা স্ত্রী-অঙ্গে হয়। কেননা আসলে 'চাষের' জায়গা সেটাই।

নারীদের পায়খানার পথে সঙ্গম করা সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। হানাফী ফিকাবিদগণ বলেছেন, তা হারাম। খুব তীব্র ও কঠোর ভাষায় তা নিষেধ করেছেন। সওরী ও শাফেয়ীও তাই বলেছেন আল মুজানীর বর্ণনা মতে। তাহাভী বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে আবদুল হিকাম বলেছেন, তিনি ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছেন— এই কাজের হারাম বা হালাল হওয়া পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে সহীহ্ কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে কিয়াস বলে, তা হালাল হবে। আসবাগ ইবনুল ফারজ ইবনুল কাসিম সূত্রে ইমাম মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন ঃ

مَا اَدْرَكْتُ اَحَدً اَقْتَدِىْ فِىْ دِيْنِىْ يَشُكُّ فِيْهِ اَنَّهُ حَلَالٌ -

দ্বীনি ব্যাপারাদিতে অনুসরণ করা হয় এমন কোন ব্যক্তিকে তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি পাইনি।

অর্থাৎ স্ত্রীর পায়খানা অঙ্গে যৌনকর্ম করা তাঁর মতে নিঃসন্দেহে হালাল। এর পরই তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেছেন ঃ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত বিশেষ। অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেমন ইচ্ছা।'

বললেন, এর চাইতে অধিক স্পষ্ট কথা আর কি হতে পারে। আমি তো এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করি না। ইবনুল কাসিম বলেছেন, আমি মালিক ইবনে আনাসকে বললাম, মিসরে আমাদের নিকট লাইস্ ইবনে সা'দ রয়েছেন। তিনি হারিস ইবনে ইয়াকুব, আবূল হুবাব সাঈদ ইবনে ইয়াসার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে বললাম ঃ আমি ক্রীতদাসীদের সাথে 'তাহমীধ' করি, এ বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি বললেন ঃ 'তাহমীধ' কি? তখন আমি পেছনাঙ্গের উল্লেখ করলাম। বললেন, আর তা কোন মুসলমান করে?

এই কথা শুনে ইমাম মালিক বললেন, শুন, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান আবুল হুবাব সাঈদ ইবনে ইয়াসার থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনে উমর (রা)-কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ لاباس به। 'তাতে কোন দোষ নেই।'

ইবনুল কাসিম বললেন, এই সময় মজলিসের এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে আবদুল্লাহ, আপনি সালিম থেকে শুনে কথা বলছেন। তিনি তো বলেছেন, বান্দা মিথ্যা বলেছে কিংবা কাফির ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে আমার পিতা নাফের প্রসঙ্গে। যেমন মিথ্যা বলেছেন ইকরামা ইবনে আব্বাস সম্পর্কে। তখন মালিক বললেন, ইয়াযীদ ইবনে রূমানের কথা শোন, তিনি সালিম, তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তা করতেন।

আবূ বকর বলেছেন, সুলায়মান ইবনে বিলাল জায়দ ইবনে আসলাম ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে সঙ্গম করেছে। তাতে মনে মনে সে লজ্জিত ও দুঃখিত হয়। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে ক্ষেত, তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেমন ইচ্ছা।'

তবে জায়দ ইবনে আসলাম ইবনে উমর (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন— তা জানা যায়নি। ফযল ইবনে ফুয়ালাতা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, কাব ইবনে আল-কামাতা, আবুন-নদর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উমরের মুক্ত করা গোলামকে বললেন, লোকেরা খুব বেশি করে বলছে যে, আপনি ইবনে উমর-এর সনদে অনেক কথা বলেন। আপনি বলেন যে, তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তোমরা স্ত্রীদের পশ্চাদ্বারে যৌন কর্ম কর। নাফে বললেন, ওরা আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে যে, ইবনে উমর একদিন কুরআন পাঠকালে 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত' এই পর্যন্ত এসে বললেন হে নাফে, এই আয়াতটির ব্যাপারে তুমি কিছু জানো কি? বললাম, না। বললেন, আমরা— কুরায়শ বংশের লোকেরা— মেয়েলোক সংগ্রহ করতাম। আর আনসার বংশের মেয়েরা ইয়াহূদীদের সমাজ থেকে গ্রহণ করত। তারা তাদের নাপাক অবস্থায় ব্যবহৃত হতো। তখন আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করলেন। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এখানে বর্ণিত কারণটি ইবনে উমর (রা) থেকে জায়দ ইবনে আসলাম বর্ণিত, কারণ থেকে ভিন্নতর। কেননা নাফে এ কারণের ভিন্ন কথা বলেছেন। মায়মুন ইবনে মিহরানও বলেছেন এই কথা— অর্থাৎ স্ত্রীদের পশ্চাদ্দারে যৌন কর্ম হালাল হওয়ার কথা বলেছেন বয়োবৃদ্ধ হওয়ার ও বিবেক-বুদ্ধি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর।

আবূ বকর বলেছেন, ইমাম মালিকের মশহুর কথা হচ্ছে, তা মুবাহ। কিন্তু তার সঙ্গীরা— তিনি এমন কথা বলেছেন তা অস্বীকার করেন। কেননা এটা একটা হীন, নীচ, জঘন্য কাজ। কিন্তু তা যতই অস্বীকার করা হোক, তার চাইতে অনেক বেশি প্রখ্যাত। মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ, আবূ সুলায়মান আল-জাওজানী সূত্রে বলেছেন, আমি মালিক ইবনে আনাসের নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁকে পশ্চাদ্বারে যৌন কর্ম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। শুনে তিনি তাঁর হাত দিয়ে প্রশ্নকারীর মাথায় থাপ্পর মারলেন এবং বললেন, এখনই আমি এ থেকে গোসল করেছি। তাঁর থেকে ইবনুল কাসিমও এই রকমেরই বর্ণনা করেছেন।

শরীয়াতের গ্রন্থাবলীতে একথা উল্লিখিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরামী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এ কাজে কোন দোষ মনে করতেন না। তিনি আল্লাহর কথা ঃ

أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ - وَتَذَرُوْنَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ -

তোমরা সারা দুনিয়ার পুরুষ ছেলেদের নিকট যাও, আর তোমাদের রব্ব তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্যে যা সৃষ্টি করেছেন, তা পরিহার কর। (সূরা শু'আরা ঃ ১৬৫ ও ১৬৬)

এর অনুরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। অর্থাৎ তোমরা শাহওয়াত পোষণ কর। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ مَحَاشُ النِّسَاءِ حَرَامٌ 'স্ত্রীদের সাথে 'লেওয়াতাত' করা হারাম'। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) এ কাজকে ছোট 'লেওয়াতাত' নামে অভিহিত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ইবনে উমর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর থেকে কোন বর্ণনা আসেনি। তাহলে যা তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে বিরোধ ও পার্থক্য হয়ে পড়ত।

কুরআনের কথার বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীর যৌন অঙ্গে সঙ্গম করার মধ্যেই মুবাহ হওয়াটা সীমাবদ্ধ। কেননা ক্ষেত চাষের স্থান সেটাই। তবেই সন্তান উৎপাদন হওয়া সম্ভব হতে পারে। নবী করীম (স) থেকে সে কাজের হারাম হওয়া পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক কথা বর্ণিত হয়েছে। খুজায়মা ইবনে সাবিত, আবূ হুরায়রাতা ও আলী ইবনে তলক (রা)-সকলেই নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ لَاتَاتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ 'তোমরা স্ত্রীদের পশ্চাদ্বারে যাবে না।' আমর ইবনে শুয়ায়ব, তাঁর পিতা, তাঁর দাদা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এটা তো ছোট লেওয়াতাত (পুং মৈথুন) অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথেও এই কাজ করলে তা নিষিদ্ধ লেওয়াতাতই হয়ে যাবে।

হাম্মাদ ইবনে সালামাতা হাকীমুল আসরীম, আবূ তমীমা, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوِامْرَأَةً فِىْ دُبُرِ هَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ -

যে লোক হায়য হওয়া স্ত্রীর সাথে কিংবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করবে, সে মুহাম্মাদের প্রতি নাযিল হওয়া দ্বীনকে অস্বীকার করল।

ইবনে জুরাইজ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির যাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ইয়াহূদীরা মুসলমানদের বলে, যে লোক তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক দিয়ে যৌন কর্ম করবে, তার সন্তান টেরা চোখধারী হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস যেভাবেই তোমাদের ইচ্ছা হয়।' তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'সম্মুখ দিক দিয়ে পেছন দিক দিয়ে— যেদিক দিয়েই যৌনাঙ্গে সঙ্গম হতে পারে।' হাফসা বিনতে আবদুর রহমান উম্মে সালমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) একই প্রতিবন্ধকের মধ্যে বলেছে।

মুজাহিদ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন আয়াতের ব্যাখ্যায়। বলেছেন, আয়াতে বলা হয়েছে, সন্তান জন্মের স্থানে আসবে যেমন তুমি চাও। ইকরামা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى اِمْرَاَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا -

যে লোক স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করবে, তার প্রতি আল্লাহ্ তাকাবেন না।

ইবনে তায়ূস তাঁর পিতার সূত্রে উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সেই লোক সম্পর্কে, যে তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করে। তখন তিনি বলেছিলেন, এতো কুফর সম্পর্কে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। ইবনে উমর 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত' এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ যেমন করে তুমি চাও, যদি চাও তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে; কিংবা অ-বিচ্ছিন্নভাবে। আবূ হানীফা কাসীর রিয়াহুল আসম থেকে এই বর্ণনাটি করেছেন ইবনে উমর-এর কথা হিসেবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। এই মতটি আমাদের মতে ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর স্বাধীনা মহিলার ব্যাপারে তার অনুমতি সাপেক্ষে।

যেমন বলেছি, এরূপ বর্ণনা আমাদের হানাফী মাযহাবে গৃহীত। আবূ বকর, উমর, উসমান, ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস (রা)-ও অন্যান্যদের মত হিসেবে পাওয়া গেছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ - اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ -

আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষক, তবে তাদের স্ত্রীদের ও দক্ষিণ হস্তের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসীদের ছাড়া'। (সূরা মুমিনুন ঃ ৫৬)

আয়াতটি স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করা মুবাহ হওয়ার দাবি করে। কেননা এ আয়াতে নিঃশর্ত মুবাহ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হয়নি। বিশেষ করেও কিছু বলা হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ

فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ -

তোমরা তাদের নিকট আস যেমনভাবে আসবার জন্যে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন।

এরপরই আয়াতের ধারাবাহিকতায় বলেছেন ঃ

فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -

তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আস, যেমন করে তোমরা চাও।

এ থেকে স্পষ্ট হল যে, আদিষ্ট স্থান হচ্ছে ক্ষেতের স্থান যেখানে সন্তান উৎপাদনই হতে পারে। নিষেধের পর নিছক নিঃশর্ত যৌনকর্ম করার আদেশ করা হয়নি। এ যৌন কর্ম হতে হবে ক্ষেতে— সন্তান উৎপাদনের স্থানে। যৌনকর্ম কেবল এই স্থানেই সীমিত। অন্য কোন স্থানে যেতে আদেশ করা হয়নি। আর তা-ই ফায়সালাকারী হচ্ছে اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ তবে তাদের স্ত্রীদের ও ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গের সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠে না। যেমন হায়য হওয়া স্ত্রীর সাথে নিষিদ্ধের আয়াতটি বিচারক ও সিদ্ধান্তকারী ছিল 'তবে তাদের নিজেদের স্ত্রীদের উপর' এই আয়াতাংশের উপর। অতএব এই আয়াতটি বিন্যস্ত হায়য সম্পর্কিত আয়াতের উপর। হায়যধারী স্ত্রীর সাথে যৌনকর্ম নিষেধের যুক্তি হচ্ছে هواذى তা ময়লা-আবর্জনা। অর্থাৎ হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যৌনকর্ম নিষিদ্ধ হয় যে ময়লা আবর্জনা থাকার কারণে। তা মলিনতা, অপবিত্রতা। আর তা-ই সন্তান হওয়ার স্থান ছাড়া অন্যত্র

যৌনকর্ম নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। কেননা সেখানেও ময়লা-আবর্জনা রয়েছে। তাই এটাই সন্তান হওয়ার স্থান ছাড়া অন্যত্র যৌনকর্ম নিষিদ্ধ হওয়ার আসল কারণ।

যে লোক তা মুবাহ মনে করেন, তিনি এর জবাবে বলেছেন, মুস্তাহাযা— হায়য — রোগিণীর সাথে যৌনকর্ম করা ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জায়েয, যদিও সেখানে কষ্টদায়ক ময়লা-আবর্জনা রয়েছে। আর তা হচ্ছে 'ইস্তাহাযা'র রক্ত। তা নাপাক হায়যের রক্তের মতই অন্যান্য সব অপবিত্রতার মতই। তারা এই জবাবও দেন যে, ক্ষেতের স্থানেই চাষ বা যৌনকর্ম হবে বিশেষভাবে। যদিও এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, যৌন অঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যৌনকর্ম করা মুবাহ, যদিও সেটা সন্তান উৎপাদনের স্থান নয়। তা থেকে বোঝা গেল, যৌনকর্ম মুবাহ সন্তান উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

তাদেরকে এর জবাবে বলা হয়, আয়তটির বাহ্যত অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র যৌন অঙ্গেই যৌন কর্ম করা মুবাহ। আল্লাহ্ সেদিকেই নির্দেশ করেছেন এই কথা দ্বারা ঃ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ 'যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। কেননা এই কথাটিতে উক্ত কথার পরই বলা হয়েছে। 'ইজমার' দলীল না থাকলে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যত্র যৌন কর্ম করা কখনই জায়েয হতো না। কিন্তু আমরা তা মেনে নিচ্ছি এই দলীলের কারণেই। যে বিষয়ে দলীল পাওয়া যায় না সে বিষয়ে নিষেধের হুকুমটাই বহাল থাকল। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَاتَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لاَيْمَا نِكُمْ -

তোমরা তোমাদের কিরা-কসমের জন্যে আল্লাহকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না।

এ আয়াতের তাৎপর্যে দুটি দিকের কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে— তোমরা তাঁর নামের কিরা কসমকে নেক কাজ, তাকওয়া ও লোকদের মধ্যে কল্যাণ বিধানের পথে প্রতিবন্ধক বানাবে না। যখন কাউকে কোন কাজের কথা বলা হবে, তখনই সে বলবে, 'আমি তো হলফ করেছি।' তখন সে কিরা-হলফকে তার ও তার প্রতি নির্দেশিত কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক বানায়। কিংবা নেক-কাজ, তাকওয়া ও জনকল্যাণের ব্যাপারে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার পথে বাধা হিসেবে দাঁড় করায়। হলফকারী যদি সে কাজ না-করার হলফও করে থাকে, তাহলেও তা তার করা উচিত এবং তার কিরা-হলফকে বাদ দেয়া উচিত। মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবরাহীম, আল-হাসান ও তায়ূস থেকেও এই বর্ণনা এসেছে। আর তা এ আয়াতের দৃষ্টান্ত ঃ

وَلَايَاتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহ্র পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না ....।

(সূরা আন-নূর ঃ ২২)

আশয়াস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর ক্রোড়ে লালিত দুই ইয়াতীম সম্পর্কে হলফ করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে যারা খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়িয়েছে, তারাও ছিল দুইজন। তাদের একজন মাসতাহ। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক

হয়েছিরেন। তাঁর হলফ ছিল, তিনি সে দুজনের সাথে সেলায়ে রেহমীর সম্পর্ক রাখবেন না। তারা দুইজন তাঁর নিকট থেকে কোন মঙ্গল পাবে না। তখন উপরোদ্ধৃত আয়াত নাযিল হয়েছিল। তখন তিনি একজনকে কাপড় পরালেন ও অন্যজনকে ধারণ করলেন। হাদীসেও এর ব্যাখ্যা এসেছে।

আনাস ইবনে মালিক, আদী ইবনে হাতিম এবং আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছে ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ -

যে লোক কোন কিরার উপর হলফ করল, পরে সে তার বিপরীতটাকেই উত্তম ও কল্যাণময় দেখতে পেল, তখন যা উত্তম ও কল্যাণময় তা-ই তার করা কর্তব্য এবং কিরা-কসমের কাফফারা দিয়ে দেয়া কর্তব্য।

এই কথাগুলোই এ আয়াতের বক্তব্য ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের কিরা-কসমের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না', সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কেননা এই ব্যাখ্যানুযায়ী আয়াতটির তাৎপর্য এই হয় যে, কারোর কিরা-কসম যেন সর্বোত্তম ও সর্বাধিক কল্যাণময় কাজ করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। বরং সর্বোত্তম ও সর্বাধিক কল্যাণময় কাজ-ই করতে হবে, কিরা-কসমকে বাদ দিতে হবে।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, 'তোমাদের কিরা-কসমের লক্ষ্যস্থল' বলে খুব বেশি বেশি হলফ ও কিরা-কসম করার কথা বুঝিয়েছে এবং তা না করতে বলেছেন। তা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে এক দুঃসাহসিক কাজ। তাঁর নামকে হক ও বাতিল এবং ভালো-মন্দ সর্বস্থলে ব্যবহার করা। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র নামে হলফ কর এবং তাতে গুনাহের মধ্যে পড়া থেকে দূরে থাক।

হযরত আয়েশা (রা) থেকেও এরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। বলেছেন ঃ

مَنْ اَكْثَرَ ذِكْرَ شَيْءٍ فَقَدْ جَعَلَهُ عُرْضَةً -

যে লোক কোন জিনিসকে বেশি বেশি উল্লেখ করে, সে জিনিসকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

কথায় বলে ঃ 'অমুকে আমাকে নিন্দার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।' কবির কথা ঃ 'তুই আমাকে নিন্দা-মন্দ বলার লক্ষ্য বানাস না। আল্লাহ বেশি বেশি হলফকারীর নিন্দা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ -

তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য-অনুসরণ করবে না, যে খুব বেশি বেশি হলফ করে ও মূল্যহীন— হালকা লোক। (সূরা কলম ঃ ১০)

এর অর্থ, আল্লাহ্‌র নামকে সর্বক্ষেত্রে সামনে এনে তাকে ঢালরূপে ব্যবহার করো না, সে নামকে যত্রতত্র ব্যবহার করো না নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। হলফ করে করে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করো না। কিরা-কসম খুব বেশি বেশি করলে প্রকৃত নেক কাজ ও তাকওয়া থেকে দূরে যেতে বাধ্য হবে এবং গুনাহের খুব নিকটে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র

ব্যাপারে মনে দুঃসাহস বেড়ে যায়। তাই অর্থটা দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বেশি বেশি কিরা-কসম, হলফ করে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্র ব্যাপারে দুঃসাহস দেখাতে নিষেধ করেছেন, কেননা তার আশ্রয়ে তোমরা প্রকৃত নেক কাজ, তাকওয়া ও জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করতে পার। এই নীতি পরিহার করলে তোমরা অতীব আদর্শ মানুষ হতে পারবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

তোমরা হচ্ছ সর্বোত্তম জাতি, জনগণের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে গড়ে তোলা হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১০)

আয়াতটির দুটি অর্থ হতে পারে। সে অর্থ দুটি পরস্পর বিরোধী নয়। অতএব তার সেই দুটি অর্থই গ্রহণ করা আবশ্যক এবং তা এক সাথে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে তা কল্যাণকর হবে। হক ও বাতিল সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র নামে কিরা কসম করে তার অপমান করা নিষিদ্ধ বোঝাবে। আর সেই সাথে আল্লাহ্র নামে করা কিরা-কসমকে সকল প্রকার নেক ও কল্যাণময় কাজের পথে প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড় করানোর কু-অভ্যাসও খতম হয়ে যাবে। তাই বেশি বেশি কিরা-কসম না করাই কর্তব্য। আর যদি কখনও কেউ হলফ করেও, তবু তাকে যেন আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক, নেক ও তাকওয়া-কল্যাণের কাজের প্রতিবন্ধক হতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যে কোন কাজের হলফ করল, পরে সে তার বিপরীত কাজকে কল্যাণময় দেখল, তখন তার সেই কল্যাণময় কাজ করা ও হলফের কাফফারা দেয়াই কর্তব্য।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ -

তোমাদের বেহুদা, অর্থহীন কিরা-কসমের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা اللَّغْوُ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাই অবস্থা বিশেষে তার অর্থ-ও বিভিন্ন হবে। কথার প্রেক্ষিত অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থানে তার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً 'তুমি সেখানে অর্থহীন কথাবার্তা শুনতে পাবে না।' এখানে لاغية অর্থ নির্লজ্জতামূলক ও ঘৃণ্য কথাবার্তা لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَاتَاْثِيْمًا 'তারা সেখানে কোন অর্থহীন ও গুনাহের কথা শুনতে পাবে না।' এই অর্থেই বলা হয়েছে ঃ وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ 'এবং তারা যখনই কোন অর্থহীন কথা শুনেছে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' এখানে শব্দটির অর্থ হচ্ছে কুফর ও নির্লজ্জতামূলক কুৎসিত কথা। বলা হয়েছে ঃ والغوا فيه তাতে বকবক অর্থহীন আওয়াজ তোল, যার কোন ফায়দা নেই; যেন শ্রোতারা তা শুনা থেকে ভিন্ন দিকে লক্ষ্য দেয়। বলেছেন ঃ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا 'তারা যখন কোন বেহুদা কাজের স্থানে পৌছে যায়, তখন তারা মর্যাদা রক্ষা করে চলে যায়।' এখানে শব্দটির অর্থ বাতিল। যেমন বলা হয় ঃ لَغَا فِىْ كَلَامِهِ 'সে তার কথায় বড় আজেবাজে জিনিস নিয়ে আসে।' অর্থাৎ অর্থহীন ও তাৎপর্যশূন্য কথা বলে। لَغْوِ الْيَمِيْنِ -এর কয়েকটি অর্থ আগেরকালের মনীষীদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে

আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হলফ করে কোন বিষয়ে, সে দেখেও তাই, তাহলে সে এপর্যায়ে পড়বে না। মুজাহিদ ও ইবরাহীম থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ -

বরং তিনি পাকড়াও করবেন সেসব কিরা-কসম, যা দিয়ে তোমরা হলফকে সুদৃঢ় কর।

তুমি কোন্ জিনিসের হলফ করলে এবং তুমি তা জান। এই অর্থেই এ আয়াতাংশ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ 'তোমাদের হৃদয়সমূহ যা উপার্জন করেছে।'

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ লোকেরা বলে لا والله 'না, আল্লাহ্র কসম। بلى والله 'হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম' প্রভৃতি কথা নেহাত বেহুদাভাবে আল্লাহ্র নাম বলা।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে মরফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তেমনি অতীত কালের কোন বিষয়ে কসম করতেও নিষেধ করা হয়েছে, এটা হানাফীদের মত। আতা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ কেউ বলে— আল্লাহ্র কসম, আমি এরূপ করেছি। হাসান ও শবী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, কেউ যদি কোন হারাম কাজ করার জন্যে কসম করে, তাহলে তা না করলে আল্লাহ্ সেজন্যে পাকড়াও করবেন না। এই ব্যাখ্যা পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল সেই ব্যাখ্যার সাথে যা عرضة لايمانكم-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিরা-কসমের কারণে কোন মুবাহ্ কাজ থেকে বিরত থাকা বা কোন নিষিদ্ধ কাজে এগিয়ে যাওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

لَغْوٌ শব্দের এই সবগুলো অর্থই হতে পারে। আর এর পরই বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُ بِمَا كَسَبَتْ 'কিন্তু তিনি পাকড়াও করবেন, যা তোমাদের অন্তরসমূহ উপার্জন করেছে'। এর অর্থ তার অন্তর এই ক্ষেত্রে যে মিথ্যা ও অসত্যের উপর দৃঢ়তা গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্র এই পাকড়াও অবশ্যই পরকালীন আযাব হিসেবেই হবে। সে কিরা ভঙ্গ করে কাফফারা দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। কেননা এ কাফফারা অন্তরের উপার্জনের সাথে সম্পর্কহীন। কেননা এ কিরাকারীর অবস্থা ভালো ও মন্দ হওয়ার দিক দিয়ে সমান। ইচ্ছা করে করা বা ভুলবশত করাও এখানে পার্থক্যহীন। অতএব জানা গেল, এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে অতীত কাল সম্পর্কিত কিরার মূলে নিহিত উদ্দেশ্য দ্বারা সে যে আযাব পাওয়ার যোগ্য হবে তা। উদ্দেশ্যকারী বলেছে, কিরার বিপরীতটা মিথ্যা। অতএব তা 'বেহুদা' বা 'অর্থহীন' কথাই হবে, যদ্দারা মিথ্যার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য দেয়া যায় না। কেননা অতীতের ব্যাপারে ধারণা হয়, যে যেমন সে বিষয়ে 'হলফ' করেছে, তার নাম-ই রেখেছে لَغْوٌ —অর্থহীন, নিরর্থক। কাফফারা ওয়াজিব হওয়া ও আযাব পাওয়ার যোগ্য হওয়ার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক এই তাৎপর্যই হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তা এক ব্যক্তির 'না, আল্লাহ্র কসম'— 'হ্যাঁ আল্লাহ্র কসম' ধরনের কথা, যা সে কথার ধারাবাহিকতার মধ্যে বলে যায়। সে তো নিজেকে একজন সত্যবাদী ব্যক্তি বলেই মনে করে। ফলে তার এরূপ কথা নিতান্তই অর্থহীন— তাৎপর্যশূন্য হয়ে যায়। এর উপর শরীয়াতের কোন হুকুম কার্যকর হয় না। সাঈদ ইবনে যুবায়র যা বলেছেন, তা-ও এর অর্থ হতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি কোন হারাম বিষয়ে কিরা-কসম করল, এক্ষণে সে যদি তা না করে, তাহলে আল্লাহ্ সে জন্যে পাকড়াও করবেন না। অর্থাৎ পরকালীন আযাব হবে না, যদিও কিরা ভঙ্গ করার কারণে কাফফারা দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়ে।

মসরূক বলেছেন, যে যে কিরা-কসম পূর্ণ করা হবে না, তা নিরর্থক, তাতে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে না। এই কথাটি সাঈদ ইবনে যুবায়রের কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল। পূর্বে যা বলেছি, তা-ই উত্তম কথা। তবে পার্থক্য এই যে, সাঈদ কাফফারা দেয়া ওয়াজিব বলেন, আর মসরূক তা ওয়াজিব বলেন না— যদি তা ভঙ্গও করা হয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর একটি বর্ণনা এসেছে। তা হল, নিরর্থক কিরা-কসম হল তা, যাতে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হয় না। দহাক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ-ও বর্ণিত যে, নিরর্থক কিরা-কসম ভুলে যাওয়াই তা ভঙ্গ করা।

ঈলা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ -

যারা নিজেদের স্ত্রীদের থেকে 'ঈলা' করে, তাদের জন্যে চার মাস কাল অবস্থান ও অপেক্ষা করার নিধান রয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, 'ঈলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'হলফ' বা কিরা-কসম করা। আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ ايلا - يولى - الىء

এ হল আসল আভিধানিক অর্থ। আর শরীয়াতের পরিভাষায় বিশেষ অর্থ হল, যৌন সঙ্গম না করার হলফ করা, যার পরিণতিতে নির্দিষ্ট মিয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় আপনা-আপনি স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। এমন কি, যখন বলা হবে, অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করেছে, বোঝা যাবে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে।

কি করলে 'ঈলা'কারী হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে।

একটি— হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাসান ও আতার বর্ণনা হল, যদি কেউ 'হলফ করে বলে যে, স্ত্রী সন্তানকে যে স্তন দেয়— দুধ সেবন করায়, এই মিয়াদ কালে সে তার নিকটে যাবে না (তার সাথে যৌন-সঙ্গম করবে না), তাহলে সে ঈলাকারী হবে না। ইলাকারী হবে, যদি সে হলফ বা কিরা-কসম করে এই বলে যে, সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না ক্ষতি হওয়ার আশংকার কারণে।

দ্বিতীয়— ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত— স্ত্রী-সঙ্গমের প্রতিবন্ধক হবে যে কিরা-কসম, তা-ই ঈলা। সন্তুষ্টি বা ক্রোধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইবরাহীম, ইবনে সিরীন ও শবীও এই কথা বলেছেন।

তৃতীয়— সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত, এই ঈলা সঙ্গমকে কেন্দ্র করে হয়। যেমন, যদি হলফ করে, সে স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না, তা হলে সে ঈলাকারী হল। জাফর ইবনে বরকান ইয়াযীদ ইবনুল আসম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি একটি মেয়েলোককে বিয়ে করলাম। পরে আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তার গলায় কিছু একটা আছে। তখন বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি বের করেছি এবং তার সাথে আমি কথা বলব না। বললেন, চার মাস গত হওয়ার পূর্বে তোমাকে তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এই কথাটি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের কথার সাথে সঙ্গতিশীল। ইবনে উমর-এর কথার সাথেও সামঞ্জস্যশীল বোঝায় এই দিক দিয়ে যে, কোন

রূপ কিরা-কসম ছাড়া-ই স্ত্রীর সাথে নিঃসম্পর্ক থাকাও 'ঈলা'। আর চতুর্থ হচ্ছে, ইবনে উমর (রা)-এর কথা। বলেছেন, সে তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অতএব তা ঈলা। তাতে হলফ-এর উল্লেখ করা হয়নি। স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা ক্ষতির উদ্দেশ্যে তরক করার হলফ করা এবং কোনরূপ ক্ষতির উদ্দেশ্য ছাড়াই তার হলফ করার মধ্যে যাঁরা পার্থক্য করেছেন, তাঁদের মাযহাব হল, যৌন সঙ্গম স্ত্রীর হক পাওনা, সে তার দাবিও করতে পারে। স্বামীর অধিকার নেই স্ত্রীকে তা থেকে বিরত রাখার, কাজেই স্বামী যদি তার হক দিতে— তার সাথে সঙ্গম করা ত্যাগ করার হলফ করে, তাহলে 'ঈলা'কারী হবে। তা থাকবে তার হক পৌঁছানোর সময় পর্যন্ত। বিচ্ছিন্নতা থেকে মিলনের দিকে এলে। কেননা স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর কেবল দুটি কাজের অধিকার আছে ঃ হয় যথাযথভাবে তাকে স্ত্রী বানিয়ে রাখবে, নতুবা ভালোভাবে তাকে ছেড়ে দেবে। তবে যদি কল্যাণ কামনা করার উদ্দেশ্য থাকে স্ত্রী-সঙ্গম ত্যাগ করার মূলে, এজন্যে যে, সে শিশু সন্তানকে দুধদায়িনী আর তখন তার সাথে সঙ্গম না করার হলফ করে, যেন তার শিশুর ক্ষতি সাধিত না হয়, তা হলে এটা স্ত্রীর হক অস্বীকার করার জন্যে করা হয়নি এবং সে স্ত্রীকে যথাযথভাবে রাখছে না, তা-ও বলা যাবে না। অতএব তাকে ভালোভাবে ছেড়ে দেয়ার প্রশ্ন উঠবে না। আর তার কিরা-হলফের সাথে বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন জড়িত হবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

যদি সে কসম থেকে ফিরে যায়, তা হলে আল্লাহ্ তো বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান।

ক্ষতির উদ্দেশ্যকে যারা গণ্য করেন, তাঁরা এ আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। কেননা এ কথার দাবি হল, সে গুনাহগার হবে। পূর্ণ করা তাঁর ক্ষমার দাবি করে কিন্তু আমাদের মতে তা তাকে বিশেষীকৃতকরণের প্রমাণ করে না— যাঁর এই পরিচিতি তাকে। কেননা আয়াত তো সকলকেই শামিল করে। ক্ষতির ইচ্ছুক তো এই সকলের মধ্যেরই একজন। কাজেই হুকুমটা তার উপর বর্তিবে, অন্য কারোর উপর নয়। অনুগত ও না-ফরমান ব্যক্তির অবস্থা এ ক্ষেত্রে সমান। অর্থাৎ কসম-ভঙ্গ করলে সকলকেই কাফফারা দিতে হবে— দেয়া ওয়াজিব। মিয়াদ অতিবাহিত হলে তালাক দেয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও সকলে সমান। শক্ত করে বাঁধা সব কিরা-কসমই এরূপ। তাতে কে অনুগত আর কে অনুগত নয়— এর মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যেখানে কাফফারা ওয়াজিব হয়। তালাকের হুকুমও অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এ দুজনই সম্মিলিতভাবে কিরা-কসমের সাথে সম্পর্কিত। ক্ষতির উদ্দেশ্যে রিজয়ী তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে লওয়ার ব্যাপারটিও ভিন্নতর কিছু নয়। ঈলা-ও ঠিক তেমনি। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা আয়াত তো অনুগত ও অনুগত নয়— এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। সকলের ব্যাপারেই তা সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ।

কথা না বলার কিরা করে ক্ষতির উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছে— এরূপ কথা যিনি বলেছেন, তার কোন তাৎপর্য নেই। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ -

যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে।

এতে কেউ যদি স্ত্রী-সঙ্গম ত্যাগ করার ব্যাপারে কিরা-কসমকে গোপন রাখে, তাহলে তাতে

কোন মতপার্থক্য নেই। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ত্যাগ করার হলফকারী একজন 'ঈলা'কারী। কাজেই সঙ্গম ত্যাগ করার কথাটি আয়াতে নিহিত রয়েছে। এটা সকলেরই মত। আমরা তা এখানে প্রমাণিত করলাম। এ ছাড়া কথা বন্ধ করার হলফ করা ইত্যাদির আয়াতে লুকানো থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব তা লুকানো মনে করা যাবে না। এই যা বললাম, এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ

فَانْ فَاؤُ وافَانَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

যদি সে কসম থেকে ফিরে যায় তাহলে আল্লাহ তো মহা ক্ষমাকারী ও অতীব দয়াবান।

সকলেরই জানা যে, আয়াতে পুরা করার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। এ ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। বোঝা গেল 'যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে' কথাটিতে সঙ্গম না করার কথা গোপন আছে। অন্য কিছু নয়। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত— স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণ তালাককে আবশ্যকীয় বানায়। এই কথাটি বিরল। এর এই অর্থও হতে পারে ঃ যখন হলফ করল ও ঈলার মিয়াদকাল পর্যন্তকার জন্যে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তা সত্ত্বেও তা কুরআনের পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ তো বলেছেন ঃ 'যারা তাদের স্ত্রীদের থেকে 'ঈলা' করে'। আর 'ঈলা' করা মানে কিরা করা, যেমন পূর্বে বলেছি। স্ত্রীকে শুধু নিঃসম্পর্ক করে রাখলেই কিরা-কসম হয়ে যায় না। অতএব তার সাথে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপার সম্পর্কিত হয় না।

আশয়াস আল-হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনে মালিক-এর একজন স্ত্রী ছিল, তার চরিত্র ছিল খারাপ। ফলে তিনি পাঁচ মাস ছয় মাসকাল পর্যন্ত তাকে সম্পর্কহীন করে রাখতেন। পরে তাকে রুজু করতেন। এতে ঈলা হয় বলে তিনি মনে করতেন না।

আগের কালের ফিকাহবিদগণ এবং তাঁদের পর বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ যে সময়কালের হলফ করলে 'ঈলা' হয়, এই বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনে যুবায়র ও আতা বলেছেন, চার মাসের কম মিয়াদের হলফ করলে, পরে কার্যত তাকে চার মাসকাল নিঃসম্পর্ক করে রাখলে এই সময়ে তার সাথে সঙ্গম না করলে সে 'ঈলা'কারী হবে না। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ, মালিক, শাফেয়ী ও আওজায়ীও তাই বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবরাহীম আল-হিকাম, কাতাদাতা ও হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, সে ঈলাকারী হবে এবং চার মাসকাল নিঃসম্পর্ক করে রাখলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। ইবনে শাবরামাতা ও আল-হাসান ইবনে সালিহ-ও এই মতই দিয়েছেন। আল হাসান ইবনে সালিহ এ-ও বলেছেন, স্বামী যদি হলফ করে যে, সে এই ঘরের স্ত্রীর নিকটেও যাবে না, তাহলে সে ঈলাকারী হবে। অতঃপর সে যদি তাকে চার মাস কাল নিঃসম্পর্ক রাখে, তাহলে স্ত্রী ঈলার কারণে বায়েন তালাক হয়ে যাবে। মিয়াদ শেষ হওয়ার আগে সে যদি স্ত্রীর নিকটে যায়, তাহলে 'ঈলা' কেটে যাবে। যদি হলফ করে যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না, অথচ সেখানে তার স্ত্রী রয়েছে, আর সে কারণেই সে হলফ করেছে— তা হলে সে ঈলাকারী হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ -

যারা নিজেদের স্ত্রীদের থেকে ঈলা করে, তাদের জন্যে চারমাস অপেক্ষা করার বিধান রয়েছে।

'ঈলা' হল কিরা-কসম, পূর্বে যা বলেছি। তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কোন কিরা-কসম ছাড়া-ই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করায় ঈলার হুকুম হবে না। চার মাসের কম মিয়াদের হলফ করে থাকলেও কিরার মিয়াদ গত হলে চার মাসের মিয়াদের অবশিষ্ট সময়টা সঙ্গম ত্যাগকারী হলে— এ চার মাস তো কিরা-কসম ছাড়াই অপেক্ষা করা ও কিরা-কসম ছাড়াই সঙ্গম ত্যাগ করান, তাহলে বায়েন তালাক সঙ্ঘটিত হওয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তার কোন প্রভাব হবে না। আর চার মাসের কম হলেও বায়েন তালাক উপার্জিত হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে চার মাসের অপেক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কাজেই তাতে বিচ্ছিন্নতা কার্যকর হওয়ার সাথে সম্পর্কশীল কোন তাৎপর্য অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে হয়ে গেল, যেন সে কোন কিরা-কসম ছাড়াই সঙ্গম ত্যাগকারী। কাজেই তার সাথে ঈলার হুকুম জড়িত হবে না।

আল-হাসান ইবনে সালিহ্র কথা হল, এই ঘরে সে স্ত্রীর নিকট যাবে না বলে যদি হলফ করে, তাহলে সে ঈলাকারী হবে। এ কথার কোন তাৎপর্য নেই। কেননা ঈলা হচ্ছে স্ত্রীর ব্যাপারে কিরা-কসম যে, চার মাস কাল তার সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ থাকবে। সে কিরা ভঙ্গকারী হবে না— যেমন বলেছি। কিন্তু এই কিরা— এই মিয়াদকাল স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে নিষেধ করে না। কেননা সে কিরা ভঙ্গ করা ছাড়াও স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে পৌঁছা সম্ভব। সম্ভব সে ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘরে।

যে লোক চার মাসের হলফ করল, সে সমান এই ব্যক্তির বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, জুফর, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও সওরী বলেছেন, সে ঈলাকারী। অতঃপর মিয়াদের মধ্যে সে তার স্ত্রীর নিকটে না গেলে, আর ইতিমধ্যে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে এই ঈলার কারণেই। আতা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে ঈলার মিয়াদ ছিল এক কি দুই বছর। পরে কুরআনে আল্লাহ তার সময় নির্ধারণ করেছেন চার মাস। তাই যার ঈলা, এর কম সময়ে হবে, সে ঈলাকারী হবে না। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, চার মাসের হলফ করলে সে ঈলাকারী হবে না। তবে বেশি সময়ে করলে তবে ঈলা হবে।

আবূ বকর বলেছেন, কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই কথাকে নস্যাৎ করে দেয়। আয়াতটি এই ঃ 'যারা তাদের স্ত্রীদের থেকে ঈলা করে তাদের জন্যে চার মাসের অপেক্ষার বিধান আছে।' এই মিয়াদটা অপেক্ষা করার জন্যে নির্দিষ্ট। এর মধ্যে শর্ত পূরণ করতে হবে। এর বেশি অবস্থান কাল নেই। কিরা করে যে লোক স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা থেকে এই মিয়াদকাল বিরত থাকবে, সে ঈলার হুকুম হিসেবে তালাক উপার্জন করবে। চার মাসের হলফ ও তার বেশিকালের হলফের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই মিয়াদের অধিককাল অপেক্ষা করার কোন সুযোগ তার জন্যে নেই। তা সত্ত্বেও আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে, চার মাসের মিয়াদের হলফ হলেও সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। তার কম বা বেশি করলেও। কেননা হলফের কোন মিয়াদ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। তার চাইতে কম মিয়াদকে আমরা বিশেষীকৃত করেছি দলীলের বলে। তবে শব্দের হুকুম চার মাস কিংবা ততোধিক অবশিষ্ট থাকল।

যদি বলা হয়, যদি পূর্ণ চার মাসের হলফ করে, তার সাথে তালাকের সম্পর্কিত হওয়া সহীহ হবে না। কেননা তুমি তো তালাক সঙ্ঘটিত করছ তা গত হওয়ার পর। কিন্তু তখন ঈলা থাকে না।

জবাবে বলা হবে, তা নিষিদ্ধ হয়। কেননা মিয়াদের শেষ হয়ে যাওয়া যদি তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার কারণ হয় তাহলে তার সঙ্ঘটিত হওয়া অবস্থায় কিরা-কসমের অবস্থিতি গণ্য করা জরুরী নয়। এক বছর অতিবাহিত হওয়া যখন যাকাত ফরয হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে, তখন ওয়াজিব হওয়া অবস্থায় সেই বছরটির অবস্থিতি জরুরী নয়।

যে লোক তার স্ত্রীকে বলল ঃ তুমি যদি অমুকের সাথে কথা বল, তাহলে তুমি তালাক। তাহলে এটা একটা 'ইয়ামীন' কিরা হবে, যা শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। পরে সে তার সাথে কথা বললে সে তালাক হয়ে যাবে তাৎক্ষণিকভাবে। অথচ সেখানে কিরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ও বাতিল হয়ে গেছে। ঈলার মিয়াদ গত হওয়ার ব্যাপারটিও এরূপ। যখন তা তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার কারণ হবে; তখন তার সঙ্ঘটিত হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। অথচ কিরা তখন নেই।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'যদি সে কসম থেকে ফিরে যায়' আবূ বকর বলেছেন ঃ الفئ -এর আভিধানিক অর্থ কোন জিনিসের দিকে ফিরে যাওয়া— প্রত্যাবর্তন করা। এ আয়াতটিতেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ -

যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়পরতা সহকারে মুবাহ করে দাও। (সূরা হুযরাত ঃ ৯)

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন থেকে ফিরে না আসছে ন্যায়পরতার দিকে, যা আল্লাহ্র নির্দেশ। শব্দের বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে কোন জিনিসের দিকে ফিরে যাওয়া, তখন একজন হলফ করল, সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না— ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, তার পরে তাকে বলল, আমি তোমার দিকে ফিরে এলাম, অথচ সে কিরা করে স্ত্রীর শয্যাত্যাগ করার সংকল্প করেছিল, তা থেকে সে ফিরে এসেছে, তখন সে তার স্ত্রীর নিকটেই ফিরে এসেছে। সে সঙ্গমে সক্ষম হোক কিংবা অক্ষম হোক। শব্দের বাহ্যিক দাবি তো এই। তবে মনীষিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, স্ত্রী নিকট পৌঁছা সম্ভব হলে তখন ফিরে আসার ব্যাপারটি কার্যকর হবে সঙ্গম দ্বারা।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ঈলা করলে কিংবা ঈলাকারী ও তার স্ত্রীর মধ্যে চার মাসের পথের দূরত্ব হলে অথবা স্ত্রী যদি তালিযুক্ত হয় বা হয় স্বল্প বয়সী অথবা স্বামী হয় নপুংসক, তাহলে কি হবে, এই প্রশ্নে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হানাফীরা বলেছেন, সে যখন স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে মুখের কথার দ্বারা, ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, অক্ষমতাও দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে এটাই তার সহীহ্ ফিরে যাওয়া হবে। সময় শেষ হয়ে গেলেই তালাক ঘটে যাবে না। আর সে যদি হজ্জের ইহরাম বাঁধে এবং তারও হজ্জের মাঝে চার মাসের ব্যবধান থাকে, তখন তার স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তন হবে কেবলমাত্র সঙ্গম দ্বারা।

জুফর বলেছেন, তার প্রত্যাবর্তন হবে মুখের কথার দ্বারা। ইবনুল কাসিম বলেছেন, স্বামী ঈলা করেছে এমন সময় যখন স্ত্রী অল্প বয়স্কা, তার সাথে সঙ্গম করা যায় না, তাহলে স্বামী ঈলাকারী হল না, যতক্ষণ না সে পূর্ণ বয়স্কা হয়ে সঙ্গমযোগ্য হবে। তারপর চার মাসের সময় অতিবাহিত হওয়ার সময়কাল ধরে অপেক্ষা করতে হবে পূর্ণ বয়স্কা হওয়ার সময় থেকে। এটা ইবনুল কাসিমের মত। তবে তিনি তা মালিক থেকে বর্ণনা করেন নি। ইবনে অহব মালিকের এই মত বর্ণনা করেছেন, ঈলাকারী চারমাস মিয়াদ শেষ হওয়ার সময় যদি থেমে যায়, তারপরে

তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, সে তার নিকট পৌঁছল না মিয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত, তাহলে তার জন্যে স্ত্রীর নিকট যাওয়ার কোন পথ থাকল না, ফিরিয়েও আনতে পারবে না। তবে তার যদি কোন রোগের ওযর থাকে কিংবা সে বন্দী হয়ে গিয়ে থাকে বা এরূপ অন্য কোন ঘটনা ঘটে গেল, তাহলে স্ত্রীকে তার ফিরিয়ে আনাটা কার্যকর হল। যদি তার মিয়াদ শেষ হয়ে যায়, তার পরে সে তাকে বিয়ে করে, তখন যদি চার মাসের মিয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখনও সে থেকে থাকবে।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক বলেছেন, মালিক বলেছেন, চার মাস গত হলে তখন সে যদি রোগাক্রান্ত থাকে বা বন্দী থাকে, সে পূর্ণ মাত্রায় নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না। কেননা যা করার সাধ্য নেই, তা করার দায়িত্ব-ও নেই। মালিক বলেছেন, চার মাস অতীত হওয়ার পর সে যদি গায়েব হয়ে থাকে, তখন সে চাইলে তার কিরার কাফফারা দেবে এবং তার উপর থেকে ঈলা চলে যাবে। ইসমাঈল বলেছেন, এ ক্ষেত্রে একথা বলেছেন এজন্যে যে, তাঁর মতে কিরা ভঙ্গ করার আগেও কাফফারা দেয়া জায়েয। যদিও তা কেবল কিরা ভঙ্গ করার পরই শোভন হয়। আশজায়ী সওরীর মত বলেছেন, ঈলাকারীর রোগ, বার্ধক্য বা আটকে পড়া ধরনের কোন ওযর হয় কিংবা স্ত্রী হায়যে থাকে, অথবা নিফাসে থাকে, তখন সে মুখের কথার দ্বারা কসম থেকে ফিরে যাবে। বলবে, আমি তোমার নিকট ফিরে এলাম। এটা তার জন্যে যথেষ্ট হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ্-রও এই মত। আওজায়ী বলেছেন, কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে, তার পর সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, বাস করে চলে যায়, তাহলে সে রোগী বা বিদেশ যাত্রী হিসেবে সঙ্গম ছাড়াই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সাক্ষী বানাবে। কেননা সে সঙ্গম করতে পারছে না। তাহলেও তার স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তন হয়ে যাবে। তখন সে তার কসমের কাফফারা দেবে। স্ত্রী তার হয়ে যাবে। তেমনি স্ত্রী চার মাসের মধ্যে যদি সন্তান প্রসব করে কিংবা হায়য হয় অথবা সরকার তাকে তাড়িয়ে দেয়, তখনও সে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী বানাবে। তাহলে তার উপর ঈলা থাকবে না।

লাইস ইবনে সাঈদ বলেছেন, ঈলা করার পর স্বামী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে ও তার পর যদি চার মাস গত হয়ে যায়, তাহলে সে থেকে যাবে, যেমন একজন সুস্থ ব্যক্তি থেকে থাকে। অতঃপর সে স্ত্রীর নিকট ফিরে যায় কিংবা তালাক দেয়— যা-ই করুক। ভালো হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটিকে বিলম্বিত করবে না।

আল-মুজানী শাফেয়ীর মত হিসেবে বলেছেন, নপুংসক যদি ঈলা করে, তাহলে তার স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কাজটি মুখের কথার দ্বারা সম্পাদিত হবে। 'আল-ইমলা' কিতাবে বলা হয়েছে, নপুংসকের কোন ঈলা হয় না। বলেছেন, স্ত্রী যদি বালিকা হয় ও তার প্রতি ঈলা করা হয়, তাকে চার মাসকাল থেমে থাকতে হবে তার সাথে সঙ্গম করার অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পর। বন্দী স্বামী স্ত্রীর নিকট মৌখিক কথার দ্বারা ফিরে যাওয়ার কাজটি করবে। হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে থাকলেও সঙ্গম করা ছাড়া স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া কার্যকর হবে না। স্বামী ঈলা করল যখন স্ত্রী বাকেরা, পরে সে বলল, আমি তাকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম নই। তখন তার মিয়াদ হবে 'ইন্নীল'-এর মিয়াদ।

আবূ বকর বলেছেন, মিয়াদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন তাকে মুখের কথার দ্বারাই স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তনের কাজটি করতে হবে— এই কথার দলীল

হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি সে ফিরে আসে, তাহলে আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাকারী, অতীব দয়াবান।' মুখের কথার দ্বারাও প্রত্যাবর্তন হবে। কেননা একটি জিনিসের দিকে ফিরে যাওয়ার কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। তা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা থেকে বিরত থেকে মুখের কথার দ্বারাও হবে। কথার দ্বারা ফিরে এলে, বলল যে, আমি তোমার নিকট ফিরে এলাম, তাহলে সে মুখের কথার দ্বারা যে কাজ থেকে বিরত থাকার কিরা করেছিল, মুখের কথার দ্বারাই সে ফিরে এল তার বিপরীত কাজের দিকে,— না থেকে হ্যাঁ-র দিকে। বোঝা গেল, সাধারণত্বের ভাবধারা এখানে শামিল রয়েছে। তাছাড়া কার্যত সঙ্গম হতে না পারায় মুখের কথা তার স্থলাভিষিক্ত হল, বিরত থাকার দরুন যে বিচ্ছিন্নতা আসত, তা এল না। ইহ্‌রামের কারণে সঙ্গম হারাম হওয়ার ব্যাপার এবং হায়য— এ দুটো মূলত কোন ওযর নয়। ইহ্‌রাম ওযর নয়। কেননা স্বামী ইহ্‌রাম বাঁধলেও স্ত্রীর যৌন সঙ্গম পাওয়ার অধিকার প্রত্যাহৃত হতে পারে না। আর হায়য-নিফাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ঈলাকারীর জন্যে চার মাসের অপেক্ষা করার ব্যবস্থা দিয়েছেন। সেই সময় হায়য হচ্ছে এ কথা জানা সত্ত্বেও।

আগের কালের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, الفىء শব্দের অর্থ সঙ্গম— যখন করা সম্ভব। কাজেই স্ত্রী-সঙ্গম সম্ভব হওয়া কালে তার অনুরূপ অর্থ গ্রহণ জায়েয নয়। কোন সময় সঙ্গম হারাম হলে তার সম্ভাব্যতা বিনষ্ট হয় না। তখন অবস্থা এরূপ ধরতে হবে যেমন ইহ্‌রাম ও জিহার-এর সময় হয়। কেননা তখন অন্য কোন কারণে সঙ্গম অসম্ভব হয়ে পড়ে, কিন্তু তার কারণ অক্ষমতা বা ওযর নয়। তা ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গম পাওয়ার অধিকার যথারীতি বর্তমান থাকে। এ কথা দ্বারাও তা-ই প্রমাণিত হয় যে, যদি স্বামী স্ত্রীকে রায়েন তালাক দেয় খুলা'র কারণে, এ অবস্থায় যে, সে তার প্রতি ঈলা করেছে, তাহলে বাস্তবে ঘটানো হারাম করা হলেও কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া জায়েয হওয়ার কারণ নিশ্চিত হবে। তা সত্ত্বেও এই অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে, তাহলে বাতিল হয়ে যাবে।

যদি বলা হয়, মুখের কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট প্রত্যাবর্তন যদি কিরাকে প্রত্যাহার না করে, তাহলে তা স্থিত থাকবে। কথার দ্বারা ফিরে গেলে কিরা প্রত্যাহৃত হওয়ায় কোন প্রভাব রাখবে না।

জবাবে বলা যাবে, এটা জরুরী নয় এদিক দিয়ে যে, কিরা থেকে যাবে ও ঈলা বাতিল হবে তার সাথে তালাক সংশ্লিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, পরে বিয়ে অনুষ্ঠানের পর তার নিকট স্ত্রী ফিরে আসে, তাহলে কিরা অবশিষ্ট থাকবে। স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে সে কিরা ভঙ্গকারী হবে। এ জন্যে তার সাথে তালাক মিলিত হবে না, সঙ্গম না করলেও। তেমনি কোন ব্যক্তি সম্পর্কহীন কোন মেয়েলোককে বলে ঃ আল্লাহ্‌র নামে কসম, আমি তোমার নিকটে যাব না, তাহলে তাতে ঈলা হবে না। যদি পরে সে তাকে বিয়ে করে, তাহলে তখন সেই কিরাটা থেকে যাবে। তাই সে যদি তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। সে ঈলাকারী হবে না, যা তালাক ঘটাতে পারে। তাহলে কিরাও থাকবে না। আর সে কারণে তালাকও ঘটবে না। এরূপ অবস্থায় মুখের কথার দ্বারা তার নিকটে যাওয়া জায়েয হবে। তাহলে এই কিরার ফলে তালাক হওয়া নাকচ হয়ে যাবে। সঙ্গমের কারণে কিরা ভঙ্গের হুকুমটা অবশিষ্ট থাকবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ মুখের কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কাজটি সহীহ হওয়ার জন্যে সমস্ত মিয়াদকালে ওযর বর্তমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন। মিয়াদের মধ্যের কোন

এক সময়ে সঙ্গম সম্ভব হলে তখন স্ত্রীর নিকট যাওয়ার ব্যাপারটি সঙ্গমের মাধ্যমেই হতে হবে এ কারণে যে, কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কাজটি তাদের মতে সঙ্গমের স্থলাভিষিক্ত হিসেবেই হয়— যখন তা হয় না বা হতে পারে না। অন্যথায় মিয়াদ শেষ হলেই তালাক সঙ্ঘটিত হবে। কাজেই মিয়াদের মধ্যে যখনই সঙ্গম করার ক্ষমতা হবে, তখন কথার দ্বারা স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া বাতিল হয়ে যাবে। যেমন তায়াম্মুমকারী যখন তার তায়াম্মুমকে পানির দ্বারা তাহারাতের স্থলাভিষিক্ত বানাবে নামায মুবাহ্ হওয়ার ব্যাপারে, অর্থাৎ তার নামায শেষ করার পূর্বেই যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে ও তার আসল ফরয যে অযূ, সে দিকে ফিরে যেতে হবে, সে পানি নামাযের শুরুতে পাওয়া যাক, কি শেষে পাওয়া যাক। মিয়াদের মধ্যে সঙ্গমে সক্ষম হওয়াও এমনি ব্যাপার। মিয়াদের মধ্যে সঙ্গম সম্ভব হলে কথার দ্বারা ফিরে যাওয়া বাতিল হবে। মুহাম্মাদ বলেছেন, মেয়াদের মধ্যে ওযর থাকার দরুন কথার দ্বারা যদি ফিরে যায়, পরে মিয়াদ শেষ হয়ে যায়, ওযর বহাল থাকে, তাহলে ঈলার হুকুমটা বাতিল হয়ে যাবে। তখন তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত হবে, যে কোন সম্পর্কহীন মেয়েলোকের ব্যাপারে হলফ করল যে, তার নিকটে যাবে না। পরে সে তাকে বিয়ে করল, তখন তার কিরা অবশিষ্ট থাকবে। নিকটে ফিরে গেলে কিরা ভঙ্গ করা হবে। আর চার মাস পর্যন্ত সঙ্গম না করলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

যদি তারা তালাক দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তাহলে জানবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

আবূ বকর বলেছেন, স্ত্রীর নিকট ফিরে না গেলে সে অবস্থায় তালাকের সংকল্পবদ্ধতার অর্থ পর্যায়ে তিন ধরনের কথা পাওয়া গেছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তালাকের সংকল্প বাস্তবায়িত হবে চার মাস সময় শেষ হলে। ইবনে মাসউদ, জায়দ ইবনে সাবিত, উসমান ইবনে আফফান (রা)-ও এই কথাই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্ত্রী এক তালাক বায়েন হবে। আলী, ইবনে উমর ও আবুদ দারদা (রা) ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁদের থেকে বর্ণিত হয়েছে প্রাথমিক লোকদের মতই কথা। তাদের থেকে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, মিয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে থেমে যাবে। তখন সে হয় তার স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে, না হয় তাকে তালাক দেবে। আয়েশা ও আবূদ দারদা (রা)-ও তা-ই বলেছেন। তৃতীয় কথা হচ্ছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান, জুহরী, আতা ও তায়ূসের কথা। তাঁরা বলেছেন, চার মাস যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন স্ত্রী এক তালাক রিজয়ী হয়ে যাবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর অনুসারীদের মতকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার পূর্বেই যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহও এই মত গ্রহণ করেছেন। মালিক, লাইস ও শাফেয়ী আবুদ দারদা ও আয়েশা (রা)-র বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তা হল, মিয়াদ শেষ হওয়ার পর থেমে যাবে। অতঃপর হয় স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে, না হয় তালাক দেবে। তখন তালাক দিলে এক তালাক রিজয়ী হবে। মালিক বলেছেন, স্ত্রীকে তার ফিরিয়ে নেয়া সহীহ হবে কেবল তখন যদি সে তার সাথে মিয়াদের মধ্যে সঙ্গম করে। শাফেয়ী বলেছেন, মিয়াদ শেষ হওয়ার পর তা থেকে পবিত্র থাকলে তার পরে দাবি করা স্ত্রীর পক্ষে বৈধ হবে। সঙ্গমে একদিনের বেশি বিলম্ব করা যাবে না। আওজায়ী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব,

সালিম ও তাঁদের অনুসারীদের মত গ্রহণ করেছেন। সে মত হলো মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে স্ত্রী এক তালাক রিজয়ী হয়ে যাবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণ ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর অনুসারীদের মতকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার পূর্বেই যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রী এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহও এই মত গ্রহণ করেছেন। মালিক, লাইস ও শাফেয়ী আবুদ দারদা ও আয়েশা (রা)-র বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তা হল, মিয়াদ শেষ হওয়ার পর থেমে যাবে। অতঃপর হয় স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে, না হয় তালাক দেবে। তখন তালাক দিলে এক তালাক বিজয়ী হবে। মালিক বলেছেন, স্ত্রীকে তার ফিরিয়ে নেয়া সহীহ্ হবে কেবল তখন যদি সে তার সাথে মিয়াদের মধ্যে সঙ্গম করে। শাফেয়ী বলেছেন, মিয়াদ শেষ হওয়ার পর তা থেকে পবিত্র থাকলে তার পরে দাবি করা স্ত্রীর পক্ষে বৈধ হবে। সঙ্গমে একদিনের বেশি বিলম্ব করা যাবে না। আওজায়ী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সালিম ও তাঁদের অনুসারীদের মত গ্রহণ করেছেন। সে মত হল মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে স্ত্রী এক তালাক রিজয়ী হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তারা যদি তালাকের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে থাকে, তাহলে সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞাত'-এর অর্থের কয়টি সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার দিকগুলোই হচ্ছে আগের কালের ফিকাহবিদদের মতপার্থক্যের গোড়ার কথা। যদি সে সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে তাঁরা আয়াতের সে রূপ ব্যাখ্যা দিতেন না। কেননা শব্দে মূলত যে সম্ভাবনা আদপেই নেই, সেই সম্ভাবনা ব্যাখ্যায় নিয়ে আসা জায়েয নয়। আগের কালের ফিকাহবিদগণ তো ভাষাবিদ ও আলিম— বিজ্ঞ মনীষী ছিলেন। প্রতিটি শব্দে নিহিত সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। শব্দের বিভিন্ন অর্থ জানতেন। যার সম্ভাবনা শব্দে নেই, তা-ও তাঁরা জানতেন। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যখন তারা বিভিন্ন মত দিয়েছেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, বাস্তবিকই শব্দের মধ্যে সে সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য দিক দিয়েও বিবেচনা করতে হবে। এই মতপার্থক্য তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সর্বজনপরিচিত ছিল। কেউ তার প্রতিবাদ করেন নি, বিপরীত কথা বলেন নি। তাহলে এটা ইজমা হয়ে গেল। এটা ইজতিহাদের ব্যাপক ও প্রশস্ত ক্ষেত্রের লক্ষণ। এর যে কোন একটি অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ যখন প্রমাণিত হল, তখন এসব ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটির দিকে নজর দিতে আমরা বাধ্য হলাম। তাকেই আমরা প্রকৃত সত্যের সাথে অধিক সাদৃশ্য সম্পন্ন মনে করলাম। আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-কে পেলাম। তিনি বলেছেন, তালাকের দৃঢ় সংকল্প বলতে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার পূর্বে চার মাস নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বোঝায়। মিয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট ফিরে না যাওয়াকে তালাকের দৃঢ় সংকল্প বুঝিয়েছে। ফলে এটাই তার নাম হয়ে দাঁড়াল। কেননা উক্ত কথাটি হয় শরীয়াতের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে, না হয় ভাষাতত্ত্বের দিকে দিয়ে। দুটির যেটিই হোক, তা দলীল হিসেবে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত। তাই অর্থের সাধারণত্বকে গণ্য করা জরুরী। শরীয়াতের দেয়া নাম হলে তাকে توقيف মনে করতে হবে। অবস্থা যখন এই, অথচ আমরা জানি, ঈলাকারী সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথা দুটি। হয় ফিরে যাওয়া, না হয় তালাকের সংকল্প হওয়া। ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটি চার মাস মিয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে তা-ও নিঃশেষ হয়ে হারিয়ে যাবে। তখন স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে। কেননা তখনও ফিরে যাওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকলে মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেই তালাকের সংকল্প প্রমাণিত হতে পারত না। অপর দিক দিয়ে জানা আছে যে, দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপারটি মনের শক্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন্ বিষয়ে। লোকেরা বলে, আমি

এ বিষয়ে সংকল্প গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ মনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত হয়েছে তা করার। তা-ই যখন হল তখন মিয়াদ শেষ হওয়াটা উত্তমভাবে তালাকের সংকল্পের অর্থে গ্রহণ করা যাবে এবং তা থেমে থাকা অপেক্ষাও উত্তম। কেননা থেমে থাকার পরিণতি তালাক সজ্ঘটিত হওয়া কথার দ্বারা। হয় তা স্বামী ঘটাবে কিংবা কোন আদালত তা ঘটিয়ে দেবে, যে লোক থেমে থাকার কথা বলে তার কথানুযায়ী। আর তা যখন এমনি হবে, তা হবে মিয়াদ গত হওয়ার কারণে। কেননা মিয়াদের মধ্যে সে স্ত্রীর নিকট ফিরে যায়নি। আয়াতের দৃষ্টিতে এটাই উত্তম। কেননা আল্লাহ নতুন করে ঘটানোর কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি শুধু দৃঢ় সংকল্পের কথা বলেছেন। অতএব আয়াতে যা নেই, তা তার উপর বাড়িয়ে দেয়া তো জায়েয হতে পারে না।

আর একটা দিক হল আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে ঈলা করে তাদের জন্যে চার মাসের অপেক্ষার বিধান করেছেন। যদি এর মধ্যে তারা ফিরে আসে, তা হলে আল্লাহ মহা ক্ষমাকারী, অশেষ দয়াবান। আর তারা যদি তালাকেরই সংকল্প গ্রহণ করে থাকে, তা হলে আল্লাহ সর্বশ্রোতা— সর্বজ্ঞ। এই কথার দাবি দুটি জিনিসের যে কোন একটি। হয় স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া হবে, না হয় তালাকের সংকল্প হবে। তৃতীয় কোন উপায় নেই। স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কাজটি অবশ্যই ঘোষিত মিয়াদের মধ্যে হতে হবে। তার দলীল আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَاِنْ فَاءُوْ 'পরে যদি তারা ফিরে যায়।' 'ফা' অক্ষরটি পরবর্তী বোঝায়। আগের কথাটির পর-ই তা হতে হবে অর্থাৎ কিরা করার পরই স্ত্রীর নিকট ফিরে যেতে হবে। কেননা ফিরে যাওয়ার কথা কিরার পরই বলা হয়েছে। এই ফিরে যাওয়াটা তার জন্যে, যার জন্যে চার মাসের অপেক্ষা করার বিধান। ফিরে যাওয়াটা যখন মিয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পরে তা মিয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে শেষ হয়ে গেল, তাই তখনই তালাক ঘটে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেননা ফিরে যাওয়া বা তালাক ঘটে যাওয়া— এ দুটোকেই বন্ধ করা যেতে পারে না। এর একটা অবশ্যই ঘটতে হবে। ফিরে যাওয়াটা মিয়াদের মধ্যে হতে হবে, এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। মিয়াদের মধ্যে হলেই ফিরে যাওয়াটা সহীহ হবে। মিয়াদের যে হতে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, মতপার্থক্যও নেই। তা অন্য কিছুতে সীমাবদ্ধ নয়। আর মিয়াদ শেষ হবে ফিরে যাওয়া না হলেও। অতএব মিয়াদ শেষ হওয়ায় ফিরে যাওয়ার ফলে সুযোগ নষ্ট হওয়ার পর তালাক কার্যকর হবে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ যারা নিজেদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ঈলা করে, তাদের জন্যে চার মাসের অপেক্ষার মিয়াদ, যদি ফিরে আসে মিয়াদের মধ্যে অপেক্ষা শেষ। বোঝা গেল, ফিরে যাওয়া শর্ত অপেক্ষার পর ও মিয়াদ গত হওয়ার পর। তাই যখন ফিরে যাওয়া হল না, সে হককে ত্বরান্বিত করল, তাড়াহুড়া করা তার জন্যে নয়, যেমন মিয়াদী ঋণ দিতে তাড়াহুড়া করা।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্‌র বক্তব্য যদি ফিরে যাওয়া না হতো তা হলে সে মিয়াদের মধ্যে তা হওয়া সহীহ হতো না। এই ফিরে যাওয়ার পর ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা থাকে তার গত হওয়ার পর পর্যন্ত। এই মিয়াদের মধ্যে ফিরে যাওয়া সহীহ হবে, বোঝা যাবে, আয়াতে আল্লাহ সেই কথাই বলেছেন। এই কারণে সেই সঙ্গে তালাকের সংকল্প বাতিল হয়ে গেল।

তার পরে তোমার কথা, ফিরে যাওয়ার অর্থ মিয়াদের পরে। সেই সাথে তোমার কথা যে, ফিরে যাওয়াটা মিয়াদের মধ্যে সহীহ হবে, যেমন মিয়াদের পরে। তার সাথে তালাকের সংকল্প বাতিল হয়ে যাবে। এটা শব্দের বৈপরীত্য। তোমার কথা, মিয়াদের মধ্যের কথা। আর তোমার

কথা ঃ তা মিয়াদী ঋণ যখন তাড়াহুড়া করা হবে, তা তোমার থেকে বেশি হবে না সেই বৈপরীত্য থেকে। কেননা মিয়াদী ঋণ তাড়াহুড়া করলে বাধ্যতার হুকুমের বাইরে যায় না। তা না হলে বাকী বা মিয়াদী মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় কখনই সহীহ্ হতো না। কেননা মূল্যের উপর মালিকানা যদি ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে তার ভিত্তিতে বিক্রয়ের চুক্তি সহীহ্ হয় না। যদি বিক্রেতা বলে— আমি এই জিনিসটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, তা তোমার জন্যে চার মাস পরে বাধ্যতামূলক হবে, তা হলে এই বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর মিয়াদের উল্লেখ করায় মূল্যটা বিক্রেতার মালিকানাভুক্ত হওয়ার বাইরে যাবে না। আর যদি তরান্বিত করা হয় ও মিয়াদ প্রত্যাহার করে, তাহলে চুক্তিটা সঙ্ঘটিত হবে।

তবে ঈলায় স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা এর বিপরীত এ দিক দিয়ে যে, স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার সুযোগ হারালে তালাক অবশ্যই সঙ্ঘটিত হবে। আর মিয়াদের মধ্যে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়াই যখন লক্ষ্য, তখন তা সেই মিয়াদের মধ্যে হারালে তালাক হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এ বিষয়ে পূর্বে বলেছি। উপরন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র কথা 'তবে যদি তারা ফিরে যায়' বলে ঈলাকারীকেই বুঝিয়েছে, আয়াতের শুরুতেই যার কথা বলা হয়েছে। তার জন্যেই চারমাস কাল অপেক্ষা করার বিধান। বাহ্যত আয়াতে কিরা-কসমের পর-পরই স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে। আর একটি দলীল হল, আল্লাহ্‌র কথাঃ 'চার মাসের অপেক্ষা' ঠিক এই কথার মত ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ –

তিন তালাক প্রাপ্তরা নিজেদেরকে তিন কুরু পর্যন্ত (ইদ্দত পালনে) রত রাখবে।

(সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

এ আয়াত অনুযায়ী তিন কুরু অপেক্ষার মিয়াদ গত হওয়ার পর স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। অতএব ঈলার ক্ষেত্রেও অপেক্ষার ব্যাপারটি এরূপই হওয়া উচিত। তার কয়েকটি কারণ। একটি— আমরা যদি ঈলাকারীকে থামিয়ে দিই তাহলে অপেক্ষাটা চার মাসের বেশি কালের হয়ে যাবে। আর সেটা কুরআনের বিধানের বিপরীত। ঈলাকারী যদি তার স্ত্রী থেকে এক বা দুই বছর কাল অনুপস্থিত থাকে, স্ত্রী এই ব্যাপারটি নিয়ে মামলা দায়ের না করে, তার নিজের হক-ও দাবি না করে, তাহলে অপেক্ষাটা অপরিমিত— অ-নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কোন সময়ই নির্দিষ্ট হয়নি বলে বোঝা যাবে। কিন্তু তা কুরআনের বিপরীত। দ্বিতীয় কারণ, তালাকে তিন কুরু অপেক্ষায় মিয়াদ অতীত হয়ে গেলে যখন বায়েন তালাক ঘটে যাবে। ঈলাতেও সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই দুটিকে একত্রকারী তাৎপর্য হচ্ছে, দুই মিয়াদের প্রত্যেকটিতেই অপেক্ষার (تربص) উল্লেখ রয়েছে।

আর তৃতীয় দিক হচ্ছে, দুটি মিয়াদের প্রত্যেকটিই আল্লাহ্‌র কথার দিক দিয়ে অবশ্য পালনীয়। বায়েন তালাক ঘটে যাওয়ার হুকুমটি তার সাথে সম্পর্কিত হবে। মিয়াদ চলে যাওয়ার দরুন দুটির একটির সাথে যখন বায়েন তালাক হওয়া সম্পর্কিত হয়েছে, তখন দ্বিতীয়টিতেও অনুরূপ হওয়া আবশ্যক সে তাৎপর্যের কারণে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি বলা হয়, 'ইন্নীন'কে এক বছরের সময় দান সর্বসম্মতভাবে এক বছর গত হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেয়ার শামিল, যদি এক বছরে স্বামী তার নিকট না পৌঁছে। তাতে মিয়াদকাল

বৃদ্ধি করা জরুরী হবে না। ঈলার ক্ষেত্রে মিয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে থাকা জরুরী হলে তাতে মিয়াদকাল বৃদ্ধি করা জরুরী হয় না।

জবাবে বলা যাবে, কুরআন ও সুন্নাতে ইন্নীনের মিয়াদ নির্ধারণের কোন ব্যবস্থা নেই। তার হুকুমটা আগের লোকদের কথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যারা বলে এক বছরের মিয়াদ নির্দিষ্ট করা যাবে, তারা স্ত্রীকে ইখতিয়ার দিয়েছেন তার নিকট পৌঁছার পূর্বে মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে। মিয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তালাক ঘটে যাবে, সে মত তাঁদের নয়। ঈলার মিয়াদ কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। সেই সাথে ইখতিয়ার দানের কোন কথা বলা হয়নি। তাই কুরআনের উপর কিছু বৃদ্ধি করা কুরআনের হুকুমেরই বিপরীত। উপরন্তু ইন্নীনের মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে তার ইখতিয়ার দেয়া জরুরী, আর ঈলাকারীর মিয়াদ তোমার মতে স্ত্রীর ফিরে যাওয়াকে কর্তব্য করে দেয়। 'ইন্নীন' (নপুংসক) যদি বলে, আমি মিয়াদের পর স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করব, তাহলে তার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। স্ত্রীর সম্মতি হলে সে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে।

যদি বলা হয়, ঈলা যখন তালাকের কথা স্পষ্ট করে বলে না, সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত করে না। তাই বিপরীত মত অনুযায়ী বিচ্ছেদ না ঘটানোই বাঞ্ছনীয়, যতক্ষণ না সরকার বিচ্ছেদ ঘটায়। আর আমাদের মূলের দিক দিয়েও তা আমাদেরকে বাধ্য করে না। কেননা ঈলা হয়ত বিচ্ছেদের ইঙ্গিত করে, কেননা 'আমি তোমার নিকটেও যাব না' কথাটি ইঙ্গিতের তালাক-ই বোঝায়। তাছাড়া ব্যাপারটি যখন খুবই দুর্বল, অতএব ঈলার দ্বারা তালাক না ঘটানোই বাঞ্ছনীয়। তবে তার সাথে অপর কোন ব্যাপার সংযোগ করা হলে ভিন্ন কথা। আর তা হচ্ছে মিয়াদ চলে যাওয়া। কেননা এমন অনেক 'কেনায়া' ইঙ্গিত আছে, যাতে কেবল স্বামীর কথায় তালাক ঘটে না। অবশ্য অপর একটি তাৎপর্য তার সাথে যুক্ত করা হলে ভিন্ন কথা। আর তা হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে, 'আমি তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম।' আর 'তোমার ব্যাপার তোমার হাতে' এরূপ বললে তাতে তালাক হবে না। হ্যাঁ, স্ত্রী যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে হবে। এমনভাবেই ঈলা সম্পর্কে একথা বলা যে, তা তালাকের 'কেনায়া', তাহলে নিষিদ্ধ হবে না। তবে সর্ব প্রকারের কেনায়ার তুলনায় এর অবস্থা অধিক দুর্বল। কাজেই তাতে শব্দ দ্বারা— তার সাথে অপর একটি তাৎপর্য সংযুক্ত করা ব্যতীতই তালাক ঘটে যাবে না। আর 'লেয়ান' (لعان) -এর কোন প্রমাণ নেই 'কেনায়া'র তাৎপর্য পেশ করার ব্যাপারে। কেননা স্ত্রীকে স্বামীর ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা ও তাদের দুজনেরই পারস্পরিক লানত করা বায়েন তালাক বোঝাবার মত কোন কথা বোঝায় না কোন অবস্থাতেই। তাছাড়া লেয়ান ঈলার বিপরীত ব্যাপার। তা এভাবে যে, সে ব্যাপারে ফায়সালা কেবলমাত্র আদালতের মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু ঈলার হুকুমটা আদালত ছাড়াই প্রমাণিত হতে পারে। যেসব ব্যাপার বিচ্ছেদকরণের সাথে সম্পর্কিত, সেই দিক দিয়েই 'ইন্নীন'কেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে। কেননা মিয়াদ নির্ধারণের ব্যাপারটি আদালতের সাথে সম্পর্কিত। ঈলা আদালত ছাড়াই প্রমাণিত হয়।

যাঁরা থেমে থাকার কথা বলেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে এই আয়াত ঃ

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ –

তারা তালাকের সংকল্প করে থাকলে ... নিশ্চিত জানবে, আল্লাহ্‌র সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

আয়াতে যখন বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ, তখন বোঝা গেল, এখানে একটা কথা আছে যা শ্রুত, আর তা হচ্ছে তালাক।

আবূ বকর বলেছেন, একথা যে বলেছে, তার মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় এটা। কেননা আল্লাহ্র সর্বশ্রোতা বলে এখানে 'শ্রুত' কিছু থাকতে হবে— এমন কোন কথা নেই। কেননা আল্লাহ তো চিরকালই শ্রোতা। তখন-ও শ্রোতা যখন শ্রবণের কিছুই ছিল না বা থাকবে না। উপরন্তু আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ নিশ্চিত সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

অথচ সেখানে কোন কথা নেই শুনবার মত। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاثْبُتُوْا وَعَلَيْكُمُ الصَّمْتَ -

তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাত হওয়ার বাসনা পোষণ করো না। তবে যদি সাক্ষাত হয়েই যায়, তাহলে তোমরা দৃঢ়তা সহকারে স্থিত থাক। আর তোমাদের চুপ থাকা কর্তব্য।

এ-ও হতে পারে যে, এটা প্রাথমিক কথার দিকে ফিরে যাবে। আর তা হল 'যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি ঈলা করবে ....' আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, যা সে বলেছে তা আল্লাহ শুনেছেন, মণের মধ্যে যা গোপন রেখেছে, তা-ও তিনি জানেন। যার সংকল্প গ্রহণ করেছে তা-ও তাঁর অজানা নেই।

ঘোষিত মিয়াদ শেষ হলে বিচ্ছেদ সজ্ঘটিত হবে, তার এ-ও একটি প্রমাণ যে, যাঁরা থেমে থাকার কথা বলেন, তাঁরা সেখানে অনন্য এমন তাৎপর্য প্রমাণ করেন যা আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কেননা আয়াতটি তো শুধু দুটি জিনিসের যে কোন একটি দাবি করে ঃ হয় স্বামী স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে, না হয় তালাক সজ্ঘটিত হবে। এখানে স্ত্রীর দাবি করার উল্লেখ নেই, আদালতের পক্ষ থেকে স্বামীকে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া বা তালাক ঘটার উপর থামিয়ে দেয়ার কথাও তাতে নেই। কাজেই মূল আয়াতে যা নেই, তা তার সাথে জুড়ে দেয়া আমাদের জন্যে জায়েয হতে পারে না। যা তাতে নেই তা বাড়িয়ে দেয়ার অধিকারও আমাদের থাকতে পারে না। অথচ আমাদের বিপরীত মতের লোকদের কথাবার্তা আমাদেরকে তাই করতে বাধ্য করে। আয়াতের হুকুম যা জরুরী করে, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতেও আমাদেরকে বাধ্য করে না। কিন্তু আমাদের মত আয়াতের হুকুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে বলে কোন কিছু বৃদ্ধি করা ছাড়া। অতএব আমাদের মতই উত্তম।

এ-ও জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈলার ক্ষেত্রে এই হুকুমটিকে দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন স্ত্রীকে তার প্রাপ্য সঙ্গম অথবা বিচ্ছেদ তাকে পাইয়ে দেয়া যায়। এটাই এ আয়াতেরও বক্তব্য ঃ 'হয় প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে রাখা, না হয় ভালোয়-ভালোয় ছেড়ে দেয়া— চলে যেতে দেয়া'।

যে থেমে থাকার কথা বলেছে, সে বলেছে, স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট ফিরে না যায়, তাহলে উভয়ের মধ্যে তালাকের ফয়সালা দিতে হবে। তার যদি তালাক দেয়, তাহলে হয় তাকে বায়েন তালাক বানাতে হবে কিংবা রিজয়ী তালাক। যদি বায়েন তালাক বানানো হয়, কিন্তু সুস্পষ্ট তালাক তো কারোর মতেই বায়েন তালাক হয় না তিন-এর কমে। আর রিজয়ী বানালে সে ব্যাপারে স্ত্রীর কোন অংশ থাকে না। কেননা স্বামী যখনই চাইবে, স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

তাহলে স্ত্রী যেমন ছিল, তেমনি হয়ে যাবে। এ অবস্থায় তালাক বাধ্যতামূলক করার কোন তাৎপর্য থাকে না। তাতে স্ত্রী তার স্ত্রী-অঙ্গের মালিক বিবেচিত হয় না। তার বলে সে তার হক পর্যন্তও পৌঁছতে পারে না।

ইমাম মালিক-এর কথা হচ্ছে, ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রী-সঙ্গম করা না হলে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা সহীহ্ হবে না। এই কথাটি কয়েকটি কারণে কঠিন গণ্ডগোলের কথা। একটি কারণ, তিনি বলেছেন, সে যখন স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দেবে অথচ রিজয়ী তালাকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়াটা সে ছাড়া অপর কোন তাৎপর্যের উপর নির্ভরশীল হয় না।

দ্বিতীয়— স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হওয়ার পরই স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে, তা ছাড়া ফিরিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ যখন, তখন সে তালাক রিজয়ী হতে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেও ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা হবে না।

তৃতীয়— তার মতে তালাকের পর স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। আর তাহলে শুধু সঙ্গমেই ফিরিয়ে নেয়া সঙ্ঘটিত হয় না। তাহলে তার জন্যে স্ত্রী-সঙ্গম কি করে মুবাহ্ হতে পারে ?

যিনি বলেছেন, মুদ্দত শেষ হয়ে গেলে এক তালাক রিজয়ী সঙ্ঘটিত হবে— এ কথাটিও বাহ্যিকভাবেই বিপর্যয়পূর্ণ। তারও কয়েকটি কারণ। একটি, যেমন আগেই বলেছি আগের সেই আলোচনায়। আর দ্বিতীয়, কোনরূপ স্পষ্ট উক্তি ব্যতীত সঙ্ঘটিত সমস্ত বিচ্ছেদ বায়েন তালাক অনিবার্য করে তোলে। ইন্নীনকে বিচ্ছিন্নকরণ তার মধ্যে একটি। স্ত্রীর ইখতিয়ার ও স্বামীর মুর্তাদ হওয়া, দুজন অল্প বয়স্কের ইখতিয়ার। সেখানে তালাকের কথা যখন স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ নেই, তখন তা অবশ্যই বায়েন তালাক হবে।

যিম্মী ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের ঈলা সম্পর্কে মতপার্থক্য হয়েছে। হ"নাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যখন কেউ দাসী মুক্ত করার বা তালাক দেয়ার হলফ করবে এই বলে যে, সে তার স্ত্রীর নিকট যাবে না, তাহলে সে ঈলাকারী হল। যদি সাদকাডডদেয়ার বা হজ্জ করার হলফ করে, তাহলে সে ঈলাকারী হচ্ছে না। যদি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে হলফ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফার মতে সে ঈলাকারী হবে। কিন্তু আবূ ইপ্লসূফ ও মুহাম্মাদের মতে সে ঈলাকারী হবে না।

ইমাম মালিক বলেছেন, এর কোনটিতেই কেউ ঈলাকারী হবে না। আওজায়ী বলেছেন, যিম্মীর ঈলা সঠিক। এ ব্যাপারে তিনি কোন পার্থক্যের কথা বলেন নি। শাফেয়ী বলেছেন, ঈলা ধরনের কাজে যা-ই বাধ্যতামূলক হয়, তাতে মুসলিম ও যিম্মী নাগরিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আবূ বকর বলেছেন, যখন জানা আছে যে, ঈলার হুকুম প্রমাণিত হয় বাধ্যতামূলক হয় যে হক তার ভঙ্গের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে। এই দিক দিয়ে যিম্মীর ঈলা সঠিক ও কার্যকর, যখন তা মুক্তকরণ ও তালাক সহকারের হবে। কেননা তা তার কর্তব্য হয়ে পড়ে, যেমন মুসলিম ব্যক্তির জন্যে কর্তব্য হয়। আর সাদকা, রোযা ও হজ্জ— কিরা ভঙ্গ করলে বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা তা যদি তার নিজের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে

তদ্দ্বারা তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে না এবং এই নৈকট্য কার্যটি করাও তার পক্ষ থেকে সঠিক হবে না। কেননা তার নৈকট্য বলতে কিছু নেই। এই কারণে তার জন্যে যাকাত সাদাকাত— যা মুসলমানদের জন্যে তাদের ধন-মালে বাধ্যতামূলক— তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। এগুলো দুনিয়ার পালনীয় হুকুম-আহকাম। এই কারণে যিম্মী হজ্জ, উমরা, সাদকা, সিয়াম প্রভৃতির হলফ করলেই যিম্মী ঈলাকারী হয়ে যাবে না। কেননা সঙ্গমের কারণে এর কোনটাই তার জন্যে বাধ্যতামূলক হয় না। তখন তার অবস্থা এমন হয়, যেন সে কোন হলফই করেনি।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি ঈলা করে' আল্লাহ্‌র এই কথাটি মুসলিম, কাফির— সকলকেই শামিল করে। কিন্তু আমরা তাকে বিশেষীকৃত করে নিয়েছি, তর কারণও পূর্বে বলেছি। আল্লাহ্‌র নাম করে হলফ করলে ইমাম আবূ হানীফার মতে সে ঈলাকারী হয়। যদিও কাফফারা দেয়া তার জন্যে বাধতামূলক হয় না দুনিয়ার আইনে। কেননা আল্লাহ্‌র নাম লওয়াটা যেমন কাফিরের ব্যাপারে প্রযোজ্য, মুসলমানের ব্যাপারেও তাই। এই দলীলের ভিত্তিতে যে, যবেহ্ করা জন্তুর উপর কাফিরের আল্লাহ্‌র নাম লওয়ার দরুন তা খাওয়া মুবাহ হয়ে যায়, যেমন মুসলমানদেরও অনুরূপ যবেহ করার দরুন হয়। কাফির যদি যীশু মসীহ্‌র নাম লয়, তাহলে তা খাওয়া যাবে না। ফলে আল্লাহ্‌র নাম লওয়ার গুরুত্বটা প্রমাণিত হয় এবং যবেহ্ করা জন্তু খাওয়ার ব্যাপারে মুসলমানের মতই হয়ে যায়। ঈলা-ও তেমনি। কেননা সাথে দুটি হুকুম সংশ্লিষ্ট হয়। একটি কাফফারার হুকুম আর দ্বিতীয়টি তালাকের। ফলে তালাকের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র নাম লওয়ার হুকুম প্রমাণিত হল। কেউ কেউ মনে করে, আল্লাহ্‌র নামে হলফ না করলে ঈলা হয় না। দাস মুক্তকরণ, তালাক দান এবং সাদকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নামে হলফ করলেও ঈলা হয় না। কিন্তু এই কথাটি ভুল। কেননা ঈলা যখন হলফের ব্যাপার, আর কেউ যদি এসব বিষয়ে হলফ করে, স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত না হয়,— শুধু মুক্তকরণ বা তালাকে বা সাদকায়— যা বাধাতামূলক হয়। তাতে সে ঈলাকারী হবে। আল্লাহ্‌র নামে হলফ করলে যেমন হয়। কেননা শব্দের সাধারণ তাৎপর্য এই সবকেই শামিল করে। অতএব যে কোন জিনিসের জন্যে হলফ করলেই সে ঈলাকারী হবে।

উদ্ধৃত আয়াতটি কতিপয় হুকুম জানিয়ে দেয়। তন্মধ্যে একটি বিষয়ের দলীল হিসেবে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান উক্ত আয়াত পেশ করেছেন। বিষয়টি হল— কিরা ভঙ্গ করার পূর্বেই কাফফারা দেয়া জায়েয না হওয়া। বলেছেন, আল্লাহ যখন ঈলাকারীকে স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া বা তালাকের সংকল্প হওয়া-এর যে কোন একটি হুকুম গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন, তখন কিরা ভঙ্গের আগেই যদি কাফফারা দেয়া জায়েয হয়, তা হলে ঈলাই প্রত্যাহৃত হয়ে যায়, স্ত্রীর নিকট ফিরে যাওয়া ও তালাকের সংকল্প ছাড়াই। কেননা কিরা ভঙ্গ করলে সে কারণে কিছুই বাধ্যতামূলক হয় না। আর হলফকারীর জন্যে কিরা ভঙ্গের দরুন যখন কিছুই বাধ্যতামূলক হয় না, তখন কিরাকারী ঈলাকারী হতে পারে না। আর আগেই কাফফারা দেয়া জায়েয হলে ঈলার হুকুমটাই ফেলে দেয়া হয়— আল্লাহ যার উল্লেখ করেছেন তা ছাড়া-ই। কিন্তু তা আল্লাহ্‌র কিতাবের বিপরীত।

কুরূ সম্পর্কে সমালোচনা

আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

তালাক প্রাপ্তরা তিন কুরূ সময় ইদ্দত পালন করবে।

আগের কালের ফিকাহবিদগণ আয়াতে উল্লিখিত কুরূ (قروء) -এর তাৎপর্য কি সে বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী, উমর, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (রা) ও আবূ মুসা আল-আশআরী বলেছেন, আয়াতের কুরূ অর্থ হায়য। তাঁরা বলেছেন, তৃতীয় হায়য থেকে পবিত্রতার গোসল না করা পর্যন্ত স্বামীই তার স্ত্রীর উপর সবচাইতে বেশি অধিকার সম্পন্ন। অকী ঈসা-আল হাফিয, শবী মুহাম্মাদ (স)-এর তের জন সাহাবীর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে আবূ বকর, উমর, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে তাঁরা বলেছেন ঃ

اَلرَّجُلُ اَحَقُّ بِامْرَاَتِهٖ مَالَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ -

স্বামী তার স্ত্রীর উপর বেশি অধিকার সম্পন্ন যতক্ষণ না স্ত্রী তৃতীয় হায়য থেকে গোসল করছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়র ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবও এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে উমর, জায়দ ইবনে সাবিত ও আয়েশা (রা) বলেছেন, স্ত্রী যখন তৃতীয় হায়যে প্রবেশ করে, তখন স্বামীর জন্যে তার নিকট যাওয়ার আর কোন পথ থাকে না। আয়েশা (রা) বলেছেন, الاقراء অর্থ الاطهار— তুহর। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর একটি বর্ণনা এসেছে, বলেছেন, স্ত্রী যখন তৃতীয় হায়যে প্রবেশ করে, তখন তার উপর স্বামীর স্বামীত্বের কোন পথ থাকে না। স্বামীর জন্যে সে হালালও হয় না, যতক্ষণ না গোসল করছে। হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহবিদই একত্রিত হয়ে বলেছেন, কুরূ মানে হায়য। সওবী, আওজায়ী ও হাসান ইবনে সালিহ-ও এই মত গ্রহণ করেছেন। তবে হানাফী ফিকাহবিদগণ এ-ও বলেছেন যে, দশ দিনের কম তার মিয়াদ হলে তৃতীয় হায়য থেকে গোসল না করা পর্যন্ত তার ইদ্দত পূর্ণ হবে না। কিংবা নামাযের সময় গত হয়ে যাবে। এটা হাসান ইবনে সালিহর-ও কথা। তবে তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে ইয়াহূদী-খ্রীস্টান মুসলিম মেয়েদের মতই। কুরূ অর্থ হায়য যাঁরা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে হাসান ইবনে সালিহ ব্যতীত উক্তরূপ কথা আর কেউ বলেন নি। হানাফীরা বলেছেন, যিম্মী মেয়েলোকের তৃতীয় হায়যের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলেই তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। তাকে গোসল করতে হবে না। এই কথাটি অর্থ এই যে, রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যখনই গোসল করবে, তখন আমরা অন্য কোন জিনিসের অপেক্ষা করব না। ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, তৃতীয় হায়যের রক্তস্রাব বন্ধ হলে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। গোসলকে তিনি কোন গুরুত্ব দেন নি।

মালিক, শাফেয়ী বলেছেন, কুরূ অর্থ তুহর। তৃতীয় হায়য কালে যদি স্ত্রী খোঁচা প্রাপ্ত হয় তা হলে সে বায়েন তালাক হয়ে যাবে, ফিরিয়ে নেয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, আগের কালের ফিকাহবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, 'কুরূ'র শব্দের ব্যবহার দুটি অর্থে হতে পারে। একটি হায়য, অপরটি তুহর। তার দুটি কারণ। একটি, শব্দের মধ্যে এই তাৎপর্যের সম্ভাবনা না থাকলে আগেরকালের ফিকাহবিদগণ শব্দটির এই উভয় অর্থ বলতেন না। কেননা তাঁরা তো ভাষাবিদ, নামসমূহের তাৎপর্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত। আর কথার তাৎপর্য বলার ব্যাপারে তাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কাজেই তাদের এক ভাগ যখন হায়য অর্থ বলেছেন আর অপর ভাগ তুহর বলেছেন, তখন বোঝা গেল, শব্দটির এই দুটি অর্থই হতে পারে।

অন্যদিক দিয়ে এই পার্থক্যটা তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও সর্বজ্ঞাত ছিল। কোন পক্ষই অপর পক্ষের মতকে অগ্রাহ্য করেনি। সে পক্ষের কথার প্রতিবাদ করেনি। বরং এরূপ অর্থ বলাকে অনুমোদন দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল, মূল শব্দটিই এ দুটি অর্থের ধারক। তাতে ইজতিহাদের অনুমতি রয়েছে। পরন্তু এই নামটির তাৎপর্য ঘোষিত অর্থে প্রকৃত হবে, কিংবা হবে পরোক্ষ। অথবা একটি অর্থ প্রকৃত আর অপরটি অ-প্রকৃত, পরোক্ষ। মোটকথা قروء শব্দের অর্থে ভাষাভাষীরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভক্ত। এক পক্ষ বলেছে, তা সময়ের নাম। আবূ আমর (সালবের দাস) সালব সূত্রে এই কথার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে القرء শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি 'সময়' ছাড়া অতিরিক্ত কিছু বলেন নি।

আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ قَرَيْتُ الْمَاءَ فِى الْحَوْضِ ভাণ্ডারে পানি জমা হলে এই কথা বলা হয়। قَرَوْتُ الْاَرْضَ একটি জিনিসকে অপর একটি জিনিসের সাথে একত্রিত করলে এই কথাটি বলা হয়। বলা হয় ঃ مَاقَرَأَتِ النَّاقَةُ سَلَى قَطُّ অর্থাৎ উষ্ট্রীর জরায়ুতে কখনই সন্তান একত্রিত হয়নি। اَقْرَأَتِ النُّجُوم দিগন্তে তারকাসমূহ একত্রিত হলে তাই বলা হয়। বলা হয় اَقْرَأَتِ الْمَرْأَة মেয়েলোকটির হায়য হয়েছে। সে কুরূ সম্পন্না হয়েছে। আসমায়ী, ফরা ও কাসায়ী প্রমুখ প্রখ্যাত ভাষাবিদই এসব কথা বলেছেন। কারো কারো মত হচ্ছে, একটি জিনিস থেকে অপর একটি জিনিসের দিকে বের হয়ে আসাকেও কুরূ বলা হয়। এই কথাটির কোন প্রমাণ ভাষা থেকে দেয়া হয়নি। নির্ভরযোগ্য ভাষাবিদদের থেকেও তা প্রমাণিত নয়। যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণের উল্লেখ হয়েছে, তার কোনটিই এ অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অতএব তা প্রত্যাহৃত, প্রত্যাখ্যাত। পরে বলেন, কুরূর প্রকৃত অর্থ যদি 'সময়' হয়, তাহলে হায়য অর্থ হওয়াই অধিক উত্তম। কেননা সময় সময় হয় তার মধ্যে কিছু ঘটে এই কারণে। হায়য-ও একটা ঘটনা। আর 'তুহর' তো শুধু এই যে, তখন হায়য হচ্ছে না। তা নতুন করে ঘটে যাওয়া কিছু নয়। অতএব নাম হিসেবে 'হায়য'-ই সর্বোত্তম। যদিও তা মূলত মেলানো ও সংযোজনকরণ। তাই 'হায়য'-ই এজন্যে উত্তম। কেননা হায়য-এর রক্ত সংযোজিত মিলিত হয়, 'হায়য' অবস্থায় দেহের সমগ্র অংশ থেকে তা একত্রিত হয়। অতএব হায়য নামটাই অধিক শোভন।

যদি বলা হয়, রক্ত পরস্পর মিলিত ও একত্রিত হয় তুহর এর দিনগুলোতে। পরে তা হায়য-এর দিনগুলোতে প্রবাহিত হয়।

জবাবে বলা হবে, ঠিকই বলেছ। ব্যাপারও আসলে তাই। তার দলীল-ও প্রতিষ্ঠিত, যেমন পূর্বে বলেছি। কুরূ হল রক্তের নাম। তবে একথা সত্য যে, তুমি ধারণা করে নিয়েছ যে, তুহর

অবস্থায় তা রক্তের নাম। আমরা বলব, হায়য অবস্থায়ও রক্তের নাম তাই। কাজেই তুহর-এর নাম কুরু রাখার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। কেননা তুহর তো রক্ত নয়। রক্ত না থাকলেও তুহর হয় কখনও কখনও, আর রক্ত থাকলেও তুহ্‌র নাম হয় কখনও কখনও। কুরু রক্তের নাম, তুহর-এর নাম নয়। কিন্তু এই নামে তার নামকরণ হয় শুধু তার প্রকাশিত হবাব পর। কেননা এই অবস্থা ছাড়া তার উপর কোন হুকুম কার্যকর হয় না। তা সত্ত্বেও তুহর অবস্থায় রেহম-এ তার অবস্থিতি নিশ্চিত হয় না। ফলে তুহর অবস্থায় সেগুলো গতিশীল হয় না। 'কুরু' নামে তাকে অভিহিত করা চলে না। কেননা 'কুরু' এমন জিনিসের নাম যার সাথে হুকুম সম্পর্কিত হয়। কিন্তু তার প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে তার জন্যে কোন হুকুম নেই। তার অস্তিত্ব জানার পূর্বেও তা হয় না। তা ছাড়া 'তুহর' অবস্থায় রেহম-এ রক্তের একত্রিত হওয়া সম্পর্কে তুমি কেমন করে জানতে পার ? সেখানে যে রক্ত বন্দী হয়েছে, তা-ই বা জানাবে কি করে ? হায়য-এর সময় তা প্রবাহিত হবে, তা জানার কি উপায় আছে ?.... এসব কথা কিন্তু প্রমাণকারী দলীল ছাড়াই বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের বাহ্যিক কথা-ই তা রদ করে। আল্লাহ বলেছেন ঃ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ মাতৃ জরায়ুতে কি আছে, তা কেবল আল্লাহই জানেন। উক্ত আয়াতের মাধ্যমে রেহম-এ কি আছে তা জানার অগ্রাধিকারের নিজেই দাবি করেছেন। বান্দাদেরকে তিনি তা জানতে দেন নি। তাহলে তুহর অবস্থায় রক্ত জমা হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলার তোমার কি অধিকার আছে ? পরে হায়য-এর সময় তার প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কে তুমি কি বলতে পার ? যাঁরা বলেছেন, রক্ত সমস্ত দেহ থেকে একত্রিত হয় এবং হায়য-এর সময় তা প্রবাহিত হয়, তার পূর্বে নয়, এই কথাও তুমি অস্বীকার করতে পার না। তোমার অপেক্ষা তারাই অধিক সত্যের নিকটবর্তী। কেননা আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পেরেছি, তা এই সময় আছে। তার পূর্বের সময়ে তার থাকার বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। তাই অগ্রবর্তী সময়ে সে ব্যাপারে কোন হুকুম দেয়া যেতে পারে না। আমরা নাম হিসেবে দুটোতেই এটার ব্যবহারের কথা বলেছি। আভিধানিকভাবে এই নামটি প্রকৃতই যা শামিল করে তাও আমরা করেছি। তাই বুঝতে হবে যে, তা হায়য-এর নাম। 'তুহর'-এর নয়। এটা প্রকৃত অবস্থা। তার তুহর' অর্থ প্রকৃত নয়, পরোক্ষ ও ইঙ্গিতমূলক; কিংবা ধার করা অর্থ (ইস্তায়ারা)। আমরা আভিধানিক অর্থের যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণে উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি এবং শব্দের সম্ভাব্য প্রকৃত যে অর্থের উল্লেখ করেছি, তা যদি একথা প্রমাণে যথেষ্ট দলীল হয় যে, শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্দিষ্টভাবে হায়য, 'তুহর' নয়, তাহলে আমরা বলব, আমরা প্রকৃত মতের নাম পেয়েছি, যে জিনিসের নাম, তা থেকে তা কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না, আমরা পরোক্ষ অর্থের নামও পেয়েছি, যা কখনও কখনও তার জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, আবার কোন কোন সময় তা বাধ্যতামূলক হয়। আমরা কুরুর নাম পেলাম। তা হায়য থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না। কখনও কখনও তুহর থেকে বিচ্ছিন্ন পেয়েছি। কেননা হায়য-নিরাশ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধার তো তুহরই রয়েছে, না-বালেগার 'তুহর' ছাড়া আর কি ? অথচ এ দুজন 'কুরু' সম্পন্না নয়। এ থেকে আমরা জানলাম যে, দুই হায়য-এর মাঝখানের সময়ে যে 'তুহর' হয়, তাকে কুরু বলা হয় পরোক্ষ অর্থে। প্রকৃত অর্থে নয়। তুহর-কে হায়য বলা হয় তা হায়য-এর সন্নিহিত বলে। যেমন একটা জিনিসের নাম তার প্রতিবেশীর বা সন্নিহিত জিনিসের নামে রাখা হয়। এর একটা কারণ অবশ্যই আছে। যখন তা হায়য-এর সন্নিহিত তখন সেই নাম হবে। আর যখন তার সন্নিহিত নয়, তখন তা দিয়ে তার নাম রাখা

হবে না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, কুরু তুহর-এর পরোক্ষ নাম, আর হায়য-এর জন্যে প্রকৃত নাম।

কুরু শব্দের অর্থ হায়য, তুহর নয়— একথা প্রমাণ করে যে, শব্দটির দুই অর্থ-ই সম্ভবপর। মুসলিম একমত এই বিষয়ে যে, এ দুটির একটিই বোঝাবে। সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে দুটি অর্থই যদি সমান হয়, তাহলে হায়য অর্থ গ্রহণ অধিক উত্তম। কেননা নবী করীম (স)-এর ভাষায়ও হায়য অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে, তুহর অর্থ নয়। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا -

হায়য-রোগে আক্রান্ত নারী তার কুরুর দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেবে— পড়বে না।

ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শকে তিনি বলেছিলেন ঃ

فَاذَا اَقْبَلَ قُرْؤُكَ فَدَعِيْ الصَّلَاةَ، وَاِذَا اَدْبَرَ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ اِلَى الْقُرْءِ -

তোমার কুরু (হায়য) যখন এগিয়ে আসবে, তখন তুমি নামায ছেড়ে দেবে। আবার যখন পেছনে চলে যাবে, তখন গোসল করে এক কুরু থেকে পরবর্তী কুরু পর্যন্ত নামায পড়বে।

নবী করীম (স) ব্যবহৃত ভাষা থেকেই প্রমাণিত হল যে, কুরু অর্থ হায়য। এই প্রসঙ্গের আয়াতটির তাৎপর্যও এই অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে। কেননা কুরআন তো রাসূলে করীম (স)-এর ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি-ই তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শব্দসমূহের— যার বহু অর্থ হওয়া সম্ভব— ব্যাখ্যাকারী। তাঁর ব্যবহৃত ভাষায় কুরুর অর্থ 'তুহর' হয়নি। অতএব শব্দটির অর্থ 'হায়য' বলা 'তুহর' বলার তুলনায় অনেক বেশি উত্তম। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আল-বসরী বর্ণিত হাদীস তার প্রমাণ। তিনি আবূ দাউদ— মুহাম্মাদ ইবনে মাসউদ, আবূ আসিম, ইবনে জুরায়য, মুজাহিদ ইবনে আসলাম, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ -

ক্রীতদাসীর জন্যে মাত্র দুই তালাক। আর তার কুরু হচ্ছে দুই হায়য।

আবূ আসিম বলেছেন, মুজাহির, আল-কাসিম, আয়েশাতা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট অনুরূপ মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তার ইদ্দত দুই হায়য। আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে শাযান মুয়াল্লা, উমর ইবনে শবীব, আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা, আতীয়াতা ইবেন উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

تَطْلِقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ -

ক্রীতদাসীকে দুই তালাক দিতে হয়। আর তার ইদ্দত হচ্ছে দুই হায়য কাল।

ক্রীতদাসীর ইদ্দত দুই হায়য হওয়ার এটা অকাট্য দলীল। আর এটা আমাদের বিপরীত মতের লোকদের বিপরীত কথা। কেননা তারা মনে করে, ক্রীতদাসীর ইদ্দত তুহর, তারা তার জন্যে দুই হায়য সর্বাত্মকভাবে শামিল করে না। দাসীর ইদ্দত দুই হায়য, একথা যখন প্রমাণিত, তখন স্বাধীনা নারীর ইদ্দত অবশ্যই তিন হায়য হবে। আর এই দুটি হাদীস যদিও 'খবরে

ওয়াহিদ' ভাবেই বর্ণিত হয়েছে, মনীষিগণ এ দুটি হাদীসকেই কাজে লাগাবার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, স্বাধীনা রমণীর ইদ্দতের অর্ধেক দাসীর ইদ্দত। অতএব এর সঠিকত্ব অপরিহার্য।

আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) নবী করীম (স) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা-ও এই কথাই প্রমাণ করে। তাতে তিনি আওতাস যুদ্ধের বন্দিনীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

لَاتُوْطَا حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَلَا حَامِلٌ حَتّٰى تَسْتَبْرِىءَ بِحَيْضَةٍ -

গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত এবং হায়যধারী নারী এক হায়য দেখে স্বীয় পবিত্রতা প্রমাণ না করা পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করা যাবে না।

আর একথা জানা-ই আছে যে, ইদ্দতের ব্যবস্থাটা মূলত গর্ভের শূন্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে। নবী করীম (স) যখন দাসীর গর্ভশূন্যতা প্রমাণের জন্যে হায়য ঠিক করেছেন, তুহর নয়, বুঝতে হবে যে, ইদ্দত হায়য দ্বারাই পালিত হতে হবে, তুহর দ্বারা নয়। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটিই মূলত গর্ভশূন্যতা— জরায়ূতে সন্তান নেই প্রমাণের উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছে। যদিও নাবালেগা ও অতিবৃদ্ধার জন্যেও ইদ্দত জরুরী। আসলে গর্ভশূন্যতা প্রমাণ উদ্দেশ্য হলেও যে নারীর গর্ভ হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই— সেই অতিবৃদ্ধা ও অল্প বয়সের জন্যেও ইদ্দতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেন বালেগা হওয়ার নিকটে পৌঁছা ও বেশি বয়সের নারী— যার হায়য হওয়া অসম্ভব নয়— ও ইদ্দত থেকে বাদ পড়ে না যায়। এই সকলের জন্যেই ইদ্দতের বিধান সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ যেন গর্ভের ব্যাপারে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

আল্লাহ্‌র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ -

তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্য থেকে যেসব মেয়েলোক হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তা হলে তিন মাস কাল তাদের ইদ্দত পালনে বাধ্য কর। (সূরা তালাক ঃ ৪)

এ আয়াতে যে মেয়েলোকের হায়য হয় না, তাদের ক্ষেত্রে হায়য-এর স্থানে মাস দাঁড় করানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, আসল হচ্ছে হায়য। যেমন فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا 'পানি না পেলে তায়াম্মুম কর।' অর্থাৎ পানির অযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম। জানা গেল, এখানে পানির বদলে পবিত্র মাটিকে মূল করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা কুরুকে সংখ্যায় সীমিত করেছেন, ইদ্দতের জন্যে এই সংখ্যা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তিন কুরু। এ ক্ষেত্রে তুহর গণ্য করা হলে তা পূর্ণ করা কঠিন তার ক্ষেত্রে যাকে সুন্নাত নিয়মে তালাক দেয়া হয়েছে। সুন্নাতের নিয়মে তালাকের ইদ্দত সেই তুহর দিয়ে শুরু করতে হয় যে তুহর-এ স্ত্রী-সঙ্গম করা হয়নি। কাজেই এই যার অবস্থা, তার তালাক হবে এমন সময় যখন তুহর-এর কিছু সময় অতীত হয়ে গেছে। তার পরই সে ইদ্দত পালন করবে দুই তুহর কাল। এই দুই তুহ্‌র কাল তৃতীয় তুহর-এর কিছু অংশ নিয়েই তার ইদ্দত কাল হবে। তাতে তৃতীয় তুহর পূর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না, যদি সুন্নাত মুতাবিক তালাক দেয়া হয়। তাই আমরা জানলাম যে, এখানে হায়যই অনুসরণ করতে হবে, তাতে আয়াতে

নির্দিষ্ট করা সংখ্যা পূর্ণ করা সম্ভব। এই ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র এই কথার মতো নয়, যাতে বলা হয়েছে ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'হজ্জের সময় জানা কয়েকটি মাস'। এ থেকে দুই মাস ও তৃতীয় মাসের কিছু সময় বোঝানো হয়েছে। কেননা সংখ্যার দ্বারা তা সীমিত করা হয়নি। তা বহু বচনের শব্দে বলা হয়েছে। অথচ কুরু সংখ্যা দ্বারা সীমিত। তার কম সম্ভব নয়। যেমন তুমি বলবে, আমি তিন ব্যক্তিকে দেখেছি। আর তুমি মনে করে নেবে দুই ব্যক্তি। এটা সঙ্গত যে, তুমি বলবে ঃ আমি কয়েক জন লোককে দেখেছি, আর তোমার লক্ষ্য হবে দুই ব্যক্তি। উপরন্তু আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'হজ্জ জানা কয়েক মাসে।' তার অর্থ, হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জানা কয়েক মাসে সম্পন্ন করতে হবে। অথচ তোমার লক্ষ্য হবে তার কিছু অংশ। কেননা হজ্জ সংক্রান্ত কাজে মাসসমূহ গ্রাস করে না, তার কিছু অংশকে গ্রাস করে। তাতে সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার প্রমাণ হয় না। কিন্তু কুরুর সংখ্যা ইদ্দতের জন্যে পূর্ণ হওয়া একান্তই জরুরী। কাজেই কুরু যদি 'তুহর' হয়, তাহলেও আয়াতে উল্লিখিত সংখ্যা পূরণ করতে হবে। যেমন গোটা সময়কেই গ্রাস করে। তাতে তুহর-এর সমস্ত সময়ই ইদ্দত হবে তার সংখ্যা শেষ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু আয়াতে বলা সংখ্যার কমকে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তা হয় না। তাই হায়যই বুঝতে হবে। সুন্নাত তরীকার তালাকের ইদ্দত এ ভাবেই পূর্ণ করা সম্ভব। হায়যে নিরাশ ও অল্প বয়স্কা-নাবালেগার ইদ্দত দুই মাস ও তৃতীয় মাসের কিছু অংশ দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ — তাদের ইদ্দত হল তিন মাস। তেমনি তিন কুরুর কথা যখন বলা হয়েছে, তখন দুটি পূর্ণ ও তৃতীয়টির কিছু অংশ দিয়ে ইদ্দত পূর্ণ করা জায়েয হবে না।

যদি বলা হয়, কেউ যদি তার স্ত্রীকে তুহরে তালাক দেয়, তাহলে তার জন্যে পরবর্তী কুরু পূর্ণাঙ্গ থাকে।

জবাবে বলা হবে, তাতে তৃতীয় তুহর-এর কিছু অংশ দিয়ে তার ইদ্দত পূরণ হতে হয়, যখন তার একটা অংশ পূর্ণ কুরু হয়।

যদি বলা হয়, কুরু হচ্ছে হায়য থেকে বের হয়ে যাওয়া কিংবা তুহর থেকে হায়যে চলে আসা। তবে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, স্ত্রীর হায়য অবস্থায় যদি তাকে তালাক দেয়, তা হলে তার হায়য থেকে তুহ্‌র-এর দিকে কুরুর হিসেবে ইদ্দত পালনকারিণী হিসেবে বের হয়ে আসা সম্ভব হবে না। তাতে প্রমাণিত হল যে, তার হায়য থেকে তুহর-এর দিকে বের হয়ে আসাটা আসল লক্ষ্য নয়, তখন বাকী থাকে দ্বিতীয় দিকটি। আর তা হল তুহর থেকে হায়য-এর দিকে বের হয়ে আসা। এতে তিন কুরু পূর্ণভাবে ইদ্দত পালন সম্ভব, যদি তালাক হায়যে দেয়া হয়।

এর জবাবে বলা যাবে, যার কথা, কুরু হচ্ছে তুহর থেকে হায়য-এর দিকে বের হয়ে আসা, কিংবা হায়য থেকে তুহর-এর দিকে বের হয়ে আসা, তার এই কথা কয়েকটি কারণে অগ্রহণযোগ্য। একটি হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তারা নিজেদেরকে তিন কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালনের রত রাখাবে'-এর তাৎপর্য আগের কালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, কুরু হচ্ছে হায়য, অন্যরা বলেছেন, কুরু হচ্ছে তুহর। হায়য থেকে তুহর কিংবা তুহর থেকে হায়য-এর দিকে বের হয়ে আসা' তার অর্থ, এমন কথা কেউ বলেন নি। কাজেই এই কথাটি আগেরকালের ফিকাহবিদদের ইজমা বহির্ভূত। তাঁদের ইজমা এর বিপরীত কথায়

অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতএব তা প্রত্যাখ্যাত— প্রত্যাহৃত। অন্যদিক দিয়ে আসল অভিধানের দিক দিয়ে শব্দটির প্রকৃত অর্থেও মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁদের সে সব কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। তাঁদের কেউই শব্দটির হাকীকত বলেন নি, যা হায়য থেকে বের হওয়ার সম্ভাব্যতাকে জরুরী করে দেয়। ফলে এ দিক দিয়েও তা অগ্রহণযোগ্য। এ বিবেচনায়ও তা অগ্রহণযোগ্য যে, ভাষা বা অভিধানের দিক দিয়ে কোন একটি নামের যে অর্থ হওয়ার দাবি যে-ই করবে, তার কর্তব্য হবে সেই দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ করা। অথবা ভাষাভাষীদের কোন বর্ণনা। কিন্তু সে কথাটির সমর্থনে যদি অভিধান ও বর্ণনা কোন কিছুই পেশ করা না হয়, তাহলে তা প্রত্যাহৃত হবে। তা ছাড়া কুরু যদি তুমি যেমন বলেছ, স্থানান্তরিত হওয়ার নাম হয়, তাহলে বুঝতে হবে, প্রকৃতপক্ষে তার নাম ভিন্নভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, পরে তা আবার স্থানান্তরিত হয়েছে তুহর থেকে হায়য-এর দিকে। কেননা এ কথা তো জানাই আছে যে, সেটি আসলে মূল অভিধানে রাখা নাম নয়, তা অন্য থেকে নকল করা হয়েছে মাত্র। কোন প্রকারের স্থানান্তরকে যখন এই নামে চিহ্নিত করা হয়নি, বোঝা গেল, তা সেটির নাম নয়। তা-ই যদি হয়, তাহলে তার তুহর থেকে হায়য-এর দিকে স্থানান্তর গ্রহণই কুরু হবে, তার পরে হায়য থেকে তুহরে তার স্থানান্তর দ্বিতীয় কুরু হবে। পরে দ্বিতীয় তুহর থেকে হায়য-এর দিকে স্থানান্তর তৃতীয় কুরু হবে। এভাবে দ্বিতীয় হায়য-এ প্রবেশ করায় তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা হায়য কুরুর আসল নাম হায়য থেকে তুহর-এর দিকে স্থানান্তরের নয় তুহর থেকে হায়য-এর দিকে স্থানান্তর ছাড়া।

যদি বলা হয়, বাহ্যত তাই দাবি। তবে ইজমার দলীল তা নিষেধ করে। তাহলে জবাবে বলা যাবে, হায়য থেকে তুহর-এর দিকে স্থানান্তরই লক্ষ্য, একথা যে তোমাকে বলেছে, তা তো তুমি অস্বীকার করনি। তবে স্ত্রীকে যদি হায়যের মধ্যে তালাক দেয়া হয়, তাহলে হায়য থেকে তুহরে স্থানান্তর করে ইদ্দত পালন হবে না ইজমার দলীলের কারণে আর শব্দের হুকুমটা তার পরও হায়য থেকে তুহরে যাবতীয় স্থানান্তরে অবশিষ্ট থাকবে। তাই আমাদের আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্নতা যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন দুটির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেবে। ফলে দুটোই বাতিল হয়ে যাবে, অতএব তাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

যদি বলা হয়, তুহর থেকে হায়যে বের হয়ে আসাকে গণ্য করা হায়য থেকে তুহরে বের হয়ে আসাকে গণ্য করা অপেক্ষা অধিক উত্তম। কেননা তুহর থেকে হায়যে স্থানান্তর গর্ভ না থাকার প্রমাণ। কিন্তু হায়য থেকে তুহরে বের হয়ে আসা তার প্রমাণ নয়। কেননা স্ত্রীটির পক্ষে তার হায়যের শেষভাগে গর্ভবতী হওয়া অসম্ভব নয় বরং বৈধ। তাই তাকে তোমার কথাই বলা হবে যে, তার অবশিষ্ট হায়যকালে তার গর্ভবতী হওয়াটা বৈধ— এই কথাটাই ভুল। কেননা গর্ভবতী নারীর হায়য হয় না। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'বন্দিনী গর্ভবতীর সাথে সন্তান প্রসবের পূর্বে সঙ্গম করা যাবে না ও গর্ভহীনা নারী এক হায়য দ্বারা গর্ভের শূন্য প্রমাণ করার পূর্বেও তার সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ।' অর্থাৎ হায়য তার গর্ভশূন্যের প্রমাণ। বোঝা গেল, হায়য ও গর্ভ দুটি একসাথে হতে পারে না— গর্ভ হলে হায়য হবে না। হায়য হলে প্রমাণ হবে যে, তার গর্ভ নেই। হায়য অবস্থায় কোন নারী গর্ভবতী হয়ে পড়লে হায়য অনতিবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে। গর্ভের কারণে যদি রক্তের প্রবাহ হয়, তবে সেটা হায়য নয়। সেটাকে 'ইস্তিহাযা'র রক্ত বলা যেতে পারে। অবস্থা যখন তাই হবে, তখন হায়য থেকে তুহরের দিকে বের হয়ে আসাটা গর্ভহীনতার

প্রমাণ নয় বলে তুমি যা বলেছ, তা একটা ভুল কথা হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ। এবং তিনিই জানেন, জরায়ূতে কি আছে। বলেছেন ঃ عَالِمُ الْغَيْبِ 'গায়ব জানেন।' অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনিই জানেন, অন্য কেউ কিছু জানে না। অন্যরা শুধু ততটুকুই জানে, যতটা আল্লাহ তাদেরকে জানতে দেন, জানিয়ে দেন। সেই সাথে এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর কথাও রয়েছে, হায়য ও গর্ভ এক সময় হওয়াকে তিনি অসম্ভব বলেছেন। উপরে যে কথাটির উল্লেখ হয়েছে, তাতে বরং আমাদের কথার সঠিকত্বই প্রমাণ করে। কেননা ইদ্দত যদি কুরু দ্বারা পালিত হয়, তাহলে তাতে গর্ভশূন্যতা— পেটে গর্ভ নেই— প্রমাণিত হবে, তুহর তা প্রমাণ করে না। কেননা গর্ভই তুহ্‌র— হায়যহীনতা করে দেয়। কাজেই ইদ্দতের হিসাবে হায়যের হিসেবে হওয়া উচিত। তবে গর্ভশূন্যতা প্রমাণিত হবে। তুহ্‌র তা প্রমাণ করতে পারে না। কুরুতে ইদ্দতের হিসেব হলে গর্ভহীনতা প্রমাণিত হয়। আর রক্তস্রাব দেখতে পাওয়ার পর যদি গর্ভের সঞ্চার হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে ইদ্দত পালন হবে গর্ভ প্রসবের দ্বারা। বোঝা গেল, যেসব মেয়েলোকের হায়য হয়, তাদের ইদ্দত পালিত হবে গর্ভহীনতার দ্বারা। আর গর্ভশূন্যতা প্রমাণিত হবে, হায়য দ্বারা, তুহর দ্বারা নয়। তার দুটি কারণ। একটি হচ্ছে, অল্প বয়সের ও বয়োবৃদ্ধার ইদ্দত সঠিক তুহর। গর্ভহীনতার দ্বারা নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, তুহর গর্ভের সহচর। কাজেই গর্ভহীনতার প্রমাণ তার সহচর দ্বারা হতে পারে না। তা হতে পারে তার বিপরীত অবস্থার দ্বারা। আর তা হচ্ছে হায়য। আর তার দ্বারাই গর্ভহীনতা প্রমাণিত হবে। কাজেই ইদ্দত হায়য-এর হিসেবে পালিত হতে হবে। তুহর-এর হিসেবে নয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'অতএব তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের ইদ্দত পালনের সুবিধার্থে।' তুহরকে যারা গণ্য করেছেন, তাঁরা এই আয়াতাংশকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

হযরত উমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী করীম (স) হযরত উমর (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا اِنْ شَاءَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تَطْلُقَ بِهَا النِّسَاءُ -

তুমি তোমার পুত্রকে আদেশ কর, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে তাকে রেখে দেবে তার তুহর হওয়ার সময় পর্যন্ত। আর সেই সময় ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দেবে। এই হচ্ছে সেই ইদ্দত, যা সামনে নিয়ে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।

তা তুহরের ভিত্তিতে হবে, এ কথা দুভাবে প্রমাণিত হয়। একটি, তুহরের তালাক দেয়ার উল্লেখের পর তাঁর বলা কথা। কথাটি হল ঃ এ-ই হচ্ছে সেই ইদ্দত, যাকে সামনে রেখে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার জন্যে আল্লাহ আদেশ করেছেন। এটা তুহরের দিকে ইঙ্গিত, হায়যের দিকে নয়। বোঝা গেল, ইদ্দত তুহর হিসেবে পালিত হবে, হায়য হিসেবে নয়।

আর দ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ 'এবং তোমরা ইদ্দত গণনা কর।' তুহরে তালাক দেয়ার আদেশের পরই এই কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল অবশিষ্ট তুহরই গণনার বিষয়. যা

তালাকের পরে হবে। ফলে তাকে বলা যাবে, 'এটা সেই ইদ্দত যাকে সামনে রেখে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন' তোমার এই কথা— এতে 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয় অতীতকাল সম্পর্কে যেমন, ভবিষ্যতের জন্যেও তেমন।

যেমন রাসূলের কথা ঃ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ 'তোমরা রোযা রেখো তা (চাঁদ) দেখে।' অর্থাৎ অতীত দর্শন— চাঁদ দেখার কাজটা অতীতে হয়, রোযা রাখা হয় পরে, ভবিষ্যতে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ أَرَدَ الْآخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا -

যে লোক পরকাল চেয়েছে ও তার জন্যে তার উপযোগী চেষ্টা-সাধনা করেছে ....।

(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ১৯)

অর্থাৎ পরকাল। এখানে 'লাম' অক্ষরটি ভবিষ্যতের জন্যে ব্যবহৃত, যা বিলম্বে হবে। আরবরা বলে ঃ تَأَهَّبْ لِلشِّتَاءِ 'শীতের জন্যে প্রস্তুতি নাও।' শীত আসেনি, ভবিষ্যতে আসবে। তা এক ভবিষ্যতের সময় প্রস্তুতির সময় থেকে বিলম্বিত। শব্দটি অতীত ও ভবিষ্যৎ— উভয়ের ধারক। তা যখন ভবিষ্যৎ শামিল করবে, তখন তার অস্তিত্ব উল্লেখের পর পরই কোন পার্থক্য ছাড়াই হতে হবে, এমন দাবি নেই। আর তা যখন হবে, ইবনে উমরের জন্যে রাসূলের বলা যে কথায় অতীত হায়যের উল্লেখ রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ হায়যও জানা আছে,' যদিও তা উল্লিখিত নয়— সামনে পাচ্ছি। তখন বুঝতে হবে, তাতে অতীত হায়যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বোঝা গেল, ইদ্দত হায়য হিসেব হবে। ভবিষ্যতের হায়য বুঝিয়েছেন, তারও সম্ভাবনা আছে। কেননা তা নারীর অভ্যাস অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তুহরের হিসেব হায়যের তুলনায় উত্তম হতে পারে না। কেননা হায়য তো ভবিষ্যতে হবে, যদিও তা উল্লিখিত নয়। তবু তা বোঝাতে চাওয়া জায়েয, যখন তা জানা। যেমন তালাকের পর তুহর-এর উল্লেখ হয়নি। তার পূর্বের তুহর-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তুহরে তালাক দেয়া হয়ে থাকলে তালাকের পর তুহর হওয়ার কথা জানা-ই আছে। এটাই তো সাধারণ নিয়ম। তোমার মতে কথা ফিরিয়ে নেয়া জায়েয এবং শব্দ দ্বারা তা বোঝাতে চাওয়াও বৈধ। তা সত্ত্বেও তালাকের পরই হায়য হওয়া অসম্ভব নয় মাঝখানে কোন ব্যবধান ছাড়াই। এক্ষণে শব্দে এমন প্রমাণ নেই, যদ্দারা বোঝাবে যে, হায়য দ্বারা নয়, তুহর দ্বারাই ইদ্দতের হিসেব করতে হবে। তা সত্ত্বেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, স্ত্রীকে যদি তুহরের শেষের দিকে তালাক দেয়, পরে তালাকের পর-পরই হায়য হয়ে যায় কোন পার্থক্য ছাড়া-ই, তাহলে তার ইদ্দত পালন হায়যের হিসেবে হবে, তুহরের হিসেবে নয়। নবী করীম (স) ব্যবহৃত শব্দের এটাই দাবি। কেননা মূলে তালাকের পর হায়যের শাব্দিক উল্লেখ নেই। তুহরেরও নয়। তাই তালাকের পরই হায়য হলে সেই অনুযায়ীই ইদ্দত পালিত হবে। তালাকের পরও তা থেকে বিলম্বে তার হওয়ার মধ্যে কেউ কোন পার্থক্য করেনি। তাই হায়য অনুযায়ী ইদ্দত হওয়াই কর্তব্য, যাকে কুরু বলা হয়। তুহর দ্বারা নয়।

যদি বলা হয়, হাদীসে অতীতের হায়যের কথা বলা হয়েছে, এটা হতে পারে না। কেননা তালাকের পূর্বের হায়য ইদ্দতে গোণা যায় না।

এর জবাবে বলা যাবে, তালাকের পর যখন হায়য অনুযায়ী ইদ্দত পালন হবে, তখন তাকে

ইদ্দত বলা— ইদ্দতে গণনা করা জায়েয, যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ 'যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামী গ্রহণ করছে।' বিয়ে হওয়ার আগেই তাকে স্বামী বলা হয়েছে। এতে আমাদের বিপরীত মতের লোক বাধ্যতায় পড়ে যা আমাদেরকেও বাধ্য করে। কেননা নবী করীম (স) তো তুহর-এর উল্লেখ করেছেন। তুহরেই তালাক দেয়ার আদেশ করেছেন। কিন্তু তালাকের পরবর্তী তুহরের উল্লেখ করেন নি। তালাকের পূর্বের তুহরকে ইদ্দত বলেছেন। কেননা তোমার মতে তো সেই তুহরেই ইদ্দত পালিত হবে। তাহলে তালাকের পূর্বের হায়যকে ইদ্দত নামকরণকে তুমি অস্বীকার করনি। কেননা ইদ্দত সেই হায়য অনুযায়ীই পালিত হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ 'এবং ইদ্দত গণনা কর।' এই গণনা কেবল তুহরের হবে, হায়যের হবে না—তা নয়। কেননা সংখ্যা মাত্রের সাথে গণনা জড়িত।

যদি বলা হয়, তালাকের সাথে মিলিত হয় তুহর। ওদিকে আমাদের গণনা করতে আদেশ করা হয়েছে। কাজেই গণনার এই আদেশ সেই তুহর-এর দিকেই ফিরে যাবে। কেননা তুহর-এর পর পরই তাৎক্ষণিকভাবে গণনা করতে বলা হয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা ভুল। কেননা গণনার আদেশ সংখ্যা বিশিষ্ট কতিপয় জিনিসের দিকে ফিরতে পারে। একটি জিনিস— তার সাথে অন্য জিনিসের যুক্ত হওয়ার পূর্বে— তার গণনার কোন গুরুত্ব নেই। গণনা বাধতামূলক হওয়া ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে এমন জিনিসের সাথে সম্পর্কিত হবে। তা হচ্ছে কুরু। তালাকের সময়ে পরে বিলম্বে তা আসবে। তার পরে আসবে তুহর। তা হায়য থেকে উত্তম হবে না, যখন গণনার লক্ষ্য উভয়কেই শামিল করে ও একই ভাবে উভয়কেই জড়িত করে। এ কারণে একথা বলতে তুমি বাধ্য যে, তালাকের পরই স্ত্রীলোকটির হায়য হলে তার ইদ্দত হায়য অনুযায়ী হবে, সেই হায়যের গণনা তালাকের পরই হতে হবে। আর এ অবস্থায় তার সাথে হায়যই মিলিত হয়। অতএব তা-ই ইদ্দত হবে।

কোন কোন বিপরীত মতের লোক— যাঁরা কুরআনের বিধান বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন— বলেছেন আল্লাহ্র কথা ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'তাদের তালাক দাও তাদের ইদ্দতের জন্যে'— এর অর্থ তাদের ইদ্দতের মধ্যে।

কিন্তু একথা ঠিক নয়। কেননা 'লাম' অক্ষরটি 'পাত্র' বা 'ক্ষেত্র' বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত। তা কয়েকটি অর্থে ব্যহৃত হতে পারে। তার পাত্র বা ক্ষেত্র বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার-ও সম্ভাবনা আছে কিন্তু সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত 'লাম' পাঁচটি অর্থে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি মালিকত্ব বোঝায়। যেমন বলা হয় له مال তার মাল। আর একটি কাজের 'লাম'। যেমন বলা হয় لَهُ كَلَامٌ তার কাথা, وله حركة তার চলাফেরা, গতিবিধি। আর একটি لام العلة কারণের 'লাম'। যেমন বলা হয় ঃ قَامَ لِاَنَّ زَيْدًا جَاءَ সে দাঁড়িয়েছে। কেননা জায়দ এসেছে عطاه لانه 'সে তাকে দিয়েছে, কেননা সে তার নিকট চেয়েছে; আর একটি لام النسبة— সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে 'লাম'— যেমন বলা হয় ঃ لَهُ اَبٌ তার পিতা له اخ তার ভাই। আর একটি হচ্ছে لام الا ختصاص বিশেষ রূপে চিহ্নিত করার 'লাম'। যেমন لَهُ عِلْمٌ তার জ্ঞান, له ارادة তার ইচ্ছা। আর একটি হল لام الاستغاثة ফরিয়াদ করার 'লাম'। যেমন বলা হয়ঃ يَالَبَكْرٍ আর একটি لام كَيْ কারণ বলার 'লাম'। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا 'তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে

এবং তারা যেসব গুনাহ করতে ইচ্ছুক, তা করার সুযোগ তারা লাভ করবে।' আর একটি হল ঃ لام العاقبة—পরিণতির লাম। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا পরিণামে যেন সে তাদের শত্রু ও দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই 'লাম' এভাবে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দেয় এবং এই বিভিন্ন প্রকারের অর্থ বোঝাবার জন্যে তা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'পাত্র' বা ক্ষেত্র বোঝাবার জন্যে 'লাম'-এর ব্যবহার যা এই মতের লোকটি বলেছে, তা কোথাও নেই। তা এমনিতেও একটা বিপর্যয়কর কথা। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্যে তালাক দাও। এই অর্থ তাদের ইদ্দতের মধ্যে হলে ইদ্দত চলতে থাকা অবস্থায় তাতে তালাক দেয়ার প্রশ্ন উঠে। যেমন কেউ বলল ঃ 'তাকে রজব মাসের মধ্যে তালাক দাও' রজব মাসের কিছুদিন হওয়ার আগে তালাক দিলে এই হুকুম মতো কাজ হবে না। এ থেকেই উক্ত কথাটির অর্থহীনতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বরং একথার বৈপরীত্য বোঝায়। 'ইদ্দত গণনা কর'— আল্লাহ্র এই কথা দ্বারা বোঝায় না যে, তা তুহর-এর হতে হবে। সুন্নাত নিয়মের তালাকটা তুহরেই দিতে হয়। তুহরে স্ত্রী-সঙ্গমের পর তালাক দিলে তা সুন্নাতের বিপরীত হবে। ইদ্দত পালন হয় হায়যের ভিত্তিতে হবে, না হয় তুহরের ভিত্তিতে, এ ব্যাপারে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। কাজেই তুহর কালে সুন্নাত তালাক ঘটালে সে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তালাক দিলে তালাকের পরই ইদ্দত পালন শুরু করতে হবে। আর আমাদের তো ইদ্দত গণনা করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব গণনা করার বাধ্যবাধকতা ও সুন্নাত তালাকের সময়ের সাথে এ দিক দিয়ে কোন সম্পর্ক নেই যে, সেই অনুযায়ী তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে, অন্যটি অনুযায়ী করতে হবে না। ইরাকবাসীরা কুরুকে বাদ দিয়ে ভিন্নতর তাৎপর্য হিসেবে বলেছেন— গোসল করা কিংবা নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়া, অথচ আল্লাহ কুরু হিসেবে ইদ্দত পালন কর্তব্য করে দিয়েছেন, গোসল করা বা নামাযের সময় চলে যাওয়ার কথা কিছুই বলেন নি। বলতে হবে, আমরা কুরুকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে গণ্য করব কেন, অথচ আমাদের নিকট কুরুই হল ভিত্তি। কিন্তু আমরা হায়য নিঃশেষ হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পারিনি। তার গত হওয়ার হুকুমও দিতে পরি না দুটি তাৎপর্যের একটি ছাড়া— তার জন্যে যার অভ্যস্ত দিন দশের কম। তা হল গোসল করা ও নামায মুবাহ হওয়া। তাহলে সে পাক হয়ে যাবে সর্বসম্মতভাবে। হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ ও আগের দিনের বড় বড় মনীষীদের থেকে বর্ণনা পাওয়া গেছে এই মর্মে যে, গোসল করা বা নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে। তখন তার ফরয তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। কিন্তু নামাযের ফরযের হুকুম বাধ্যতামূলক হওয়া হায়যের হুকুম বহাল থাকার পরিপন্থী। এটা তৃতীয় হায়য গত হওয়া এবং তা থেকে তুহর হওয়া পর্যায়ের কথা। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই। আমরা বলেছি, স্ত্রীর অভ্যস্ত দিন যদি দশ হয়, তাহলে এই দশ দিন অতীত হওয়ার দরুনই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। গোসল করুক আর না-ই করুক— হায়য শেষ হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ জ্ঞান-লাভের জন্যে। কেননা আমাদের মতে তার হায়য দশের বেশি দিনের হবে না। কাজেই আমাদের উপর হায়যকে গণ্য করাকে যারা বাধ্যতামূলক করছে, তারা এ ব্যাপারে নিতান্তই অসতর্ক। কুরুকে তারা তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান বাদ দিয়ে অন্যত্র স্থাপন করছে।

আবূ বকর বলেছেন, এই বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র একখানি কিতাব লিখেছি। তাতে ও বিষয়ে অনেক বেশি কথা লিখেছি। এখানে যতটকু বলছি, তা-ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলা ইদ্দতের ব্যাপারে তিন কুরুর কথা বলেছেন। তা সীমাবদ্ধ কেবলমাত্র স্বাধীনা মেয়েলোকের ব্যাপারে, দাসীর জন্যে তা নয়, কেননা দাসীর ইদ্দত স্বাধীনা নারীর ইদ্দতের অর্ধেক, এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের কোন মতপার্থক্য নেই। আমরা আলী, উমর, উসমান, ইবনে উমর, জায়দ ইবনে সাবিত (রা) ও তাঁদের মধ্যের অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি এই মর্মে যে, দাসীর ইদ্দত স্বাধীনা রমণীর ইদ্দতের অর্ধেক। নবী করীম (স) থেকেও হাদীসের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি যে, দাসীর জন্যে দুই তালাক এবং তার ইদ্দত দুই হায়য। হাদীস ও ইজমা বুঝিয়েছে যে, ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তিন কুরু বলে আল্লাহ যা বলেছেন, তা স্বাধীনা মহিলাদের জন্যে, দাসীদের জন্যে নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ -

তাদের জন্যে হালাল হবে না— আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা গোপন করবে।

আমাশ আবদ্-দোহা, মসরুক, উবাই ইবনে কাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উবাই বলেছেন, এটা ছিল আমানতের ব্যাপার, স্ত্রীলোককে তার স্ত্রী-অঙ্গের আমানতদার বানানো হয়েছিল। নাফে ইবনে উমর থেকে উক্ত আয়াত পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, 'স্ত্রীদের জরায়ুতে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন' বলে হায়য ও গর্ভ বুঝিয়েছেন। ইকরামা বলেছেন, তা হায়য। আল-হিকাম মুজাহিদ ও ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, দুটি জিনিস বুঝিয়েছেন, তার একটি গর্ভ আর অপরটি হায়য। আলী থেকে বর্ণিত, তিনি একটি মেয়েলোককে এজন্যে হলফ করতে বলেছিলেন যে, তার হায়য পূর্ণ হয়নি। হযরত উসমানও এরই উপর ফায়সালা দিয়েছিলেন। আবূ বকর বলেছেন, 'গোপন করাকে ত্যাগ করা নসীহত করেছেন' থেকে বোঝা গেল, হায়য আছে কি নেই, এ ব্যাপারে নারীর নিজের কথাই চূড়ান্ত ধরতে হবে। গর্ভ সম্পর্কেও তাই। কেননা এসব-ই তার গর্ভে আল্লাহ্র সৃষ্টি। এ ব্যাপারে তার কথা-ই চূড়ান্ত মনে না করলে তা গোপন করা ত্যাগ করার জন্যে তাকে কখনই নসীহত করা হতো না। অতএব প্রমাণিত হল যে, মেয়েলোক যখন বলবে, আমার হায়য চলছে, তখন তার স্বামীর জন্যে তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে না। আবার সে-ই যখন বলবে যে, সে পাক হয়েছে, তখনই স্বামীর জন্যে সে হালাল হবে।

হানাফী ফিকাহবিদগণও তাই বলেছেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে বলবে, তুমি তালাক যদি তোমার হায়য হয়। জবাবে স্ত্রী বলল, আমার হায়য, তাহলে সে তালাক হয়ে যাবে। স্ত্রীর কথাই এখানে দলীল। এর ও অন্যান্য যাবতীয় শর্তের মধ্যে— যদি তার সাথে তালাককে সম্পর্কিত করা হয়, হানাফী ফিকাহবিদগণ পার্থক্য করেছেন। যেমন, স্বামী বলল, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, কিংবা বলল, যদি তুমি অমুকের সাথে কথা বল, তাহলে তুমি তালাক। ফিকাহবিদদের মতে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা যাবে না, যদি স্বামী তার সত্যতা স্বীকার না করে। তবে যদি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে গ্রহণ করা যাবে। হায়য ও তুহরে তার কথা সত্য মনে করতে হবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হায়য ও গর্ভ পর্যায়ে স্ত্রীর কথা কবুল করা আমাদের কর্তব্য করে দিয়েছেন। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া বিষয়েও। এ ব্যাপারটিই এমন যে, এতে স্ত্রীর বিশেষত্ব অগ্রগণ্য। কেননা সে নিজে ছাড়া অন্যরা এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারে না। অতএব তার কথাকেই দলীল গণ্য করা হয়েছে। হায়য পর্যায়ের সব হুকুম-আহকামের ব্যাপারই এইরূপ। তার কথাই গ্রহণীয়। তাঁরা এ-ও বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার হায়য হতে থাকলে আমার গোলাম মুক্ত। তখন স্ত্রী বলল, আমার হায়য চলছে। তাহলে তাকে সত্যবাদী মনে করা যাবে না। কেননা এখানে ব্যাপারটি স্ত্রী ছাড়া অন্য এক জনের সাথে সম্পর্কিত। তা হল দাসমুক্তির ব্যাপার। আল্লাহ্ তার কথাকে দলীল বানিয়েছেন হায়য-এর ব্যাপারে, যা কেবল তার-ই ব্যাপার, তা-ই ইদ্দত শেষ হওয়ার ব্যাপার, তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয বা না-জায়েয— নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপার। কিন্তু যে ব্যাপারটি একান্তভাবে তার-ই সাথে সম্পর্কিত নয়, সেখানে তার ব্যাপার অন্যান্য শর্তের মতই। তাই সেখানে তার সত্যতা স্বীকৃতব্য নয়— দলীল ছাড়া।

তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আলোচ্য আয়াতটি। যাকে যে বিষয়ের আমানতদার বানানো হয়েছে, তাকে তাকে সত্যবাদী স্বীকার করা। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا -

যার উপর হক ধার্য হচ্ছে সে বক্তব্য লেখার এবং তার রব্ব আল্লাহকে ভয় করবে, তাতে এক বিন্দু জিনিসও কম করবে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৮২)

কম করা ত্যাগ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল এ ব্যাপারে তার নিজের কথাই গ্রহণীয় হবে। এ ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণীয় না হলে তাকে কম না করতে উপদেশ দেয়া হত না। আর সে-ই যদি কম করে, তাহলে সে বিষয়ে তাকে সত্য বলে মানা যাবে না। আল্লাহ্‌র এ কথাটিও এই পর্যায়ের ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে লোক তা গোপন করবে, তার অন্তরটা পাপী। (সূরা বাকারা ২৮৩)

বোঝাগেল, সাক্ষী যদি সাক্ষ্য গোপন করে, কিংবা সত্য প্রকাশ করে, তাহলে যা সে গোপন করেছে কিংবা প্রকাশ করেছে, তাতে তার নিকটই ফিরে যেতে হবে। কেননা উপদেশটা তো তাকেই দেয়া হয়েছে সাক্ষ্য গোপন না করার। এ ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। এ ব্যাপারে মৌলনীতি হল, যাকেই কোন বিষয়ে আমানতদার বানানো হয়েছে, সে ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণীয়। যেমন যার নিকট কোন জিনিস গচ্ছিত রাখা হয়েছে, সে যদি বলে যে, আমানত রাখা জিনিস বিনষ্ট হয়ে গেছে; কিংবা বলে, আমি তো তা ফিরিয়ে দিয়েছি, তাহলে তার কথা গ্রহণীয় হবে। অথবা মুদারিবা ব্যবসায়ী, ইজারা তলবকারী, আর যত লোকই বিভিন্ন হক-হুকুকে আমানতদার বানানো হয়েছে। তাদের সকলের ব্যাপারেই এই কথা।

এজন্যেই আমরা বলেছি, আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ — 'হস্তগত করা রেহন'— এর পরই যোগ করে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ –

যদি তোমাদের কিছু লোক অপর কিছু লোককে বিশ্বাস করে, তাহলে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে তার উচিত তার আমানতটা ফিরিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ্কে ভয় করা, যিনি তার রব্ব। (সূরা বাকারা ২৮৩)

এ থেকে বোঝা গেল, রেহন আমানত নয়। কেননা তা যদি আমানত হতো, তাহলে 'আমানত' শব্দটি তার সাথে যোগ করা হতো না। কোন একটি জিনিস তার নিজের সাথে যোগ করা যায় না। অপর একটা জিনিসকে তার সাথে যোগ করা যায়।

কোন কোন লোক বলে, আল্লাহ্র কথা ঃ তাদের জন্যে হালাল নয় তাদের জরায়ুতে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা এই কথাটি নির্দিষ্ট গর্ভ বিষয়ে। হায়য গোপন করার কথা নয়। কেননা রক্তস্রাব। কেই হায়য বলা হয়। কিন্তু গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় হায়য হতে পারে না। কেননা হায়য বের হওয়া রক্তকে বলা হয়, গর্ভের ভেতরে থাকা অবস্থায় তাকে হায়য বলা হয় না। তাকে গণ্য বা হিসাব করারও কোন প্রশ্ন উঠে না। স্ত্রীকে তার আমানতদার বানানোরও কোন তাৎপর্য নেই।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথাই সহীহ। কেননা রক্ত জরায়ু থেকে বের না হওয়া ও প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে হায়য বলা হয় না— একথা নিশ্চিত। রেহম থেকে বের হওয়ার পরই তাকে হায়য বলা হয়। কিন্তু আয়াতটি আমাদের কথারই দলীল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা এই জন্যে যে, হায়য হওয়ার সময়টার ব্যাপার অবশ্যই তার কাছেই ফিরে যাবে। তার কথাকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা সব রক্তস্রাবই তো আর হায়য নয়। হায়য হওয়ার অন্য বহুবিধ কারণ রয়েছে। তার একটা সময় আছে, হায়য হওয়ার অভ্যাসের ব্যাপার আছে। জরায়ুতে গর্ভ নেই, একথা তার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আর এ সব ব্যাপার তার কাছ থেকেই জানা যাবে। তাই সে নিজেই যখন বলবে, আমার তিনটি হায়য হয়ে গেছে, আয়াতের দৃষ্টিতে তখন তার কথাই গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে, সে যখন বলবে, আমি রক্ত দেখিনি কিংবা বলবে, আমার ইদ্দত শেষ হয়নি, তখন তার কথাই মেনে নিতে হবে। তেমনি যদি বলে, আমার গর্ভ থেকে একটা ভ্রূণ পড়ে গেছে, সেটার সৃষ্টি স্পষ্ট ছিল, ফলে আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, তখনও তার কথাই মেনে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, হায়য সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতেই তাকে সত্যবাদী মানতে হবে। আর তা হল, হ্যাঁ, রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।

উক্ত আয়াতে একথার দলীলও রয়েছে যে, হায়য-এর ব্যাপারে রক্তের বর্ণ সম্পর্কহীন। কেননা রক্তের বর্ণের গুরুত্ব থাকলে কেবলমাত্র তার কথাই মেনে নেয়ার কথা নয়। কেননা বর্ণের ব্যাপারে তার নিজের ও অন্যান্যদের অবস্থা সমান। বোঝা গেল— হায়যের রক্ত বর্ণ দিয়ে পার্থক্যকৃত হয় না। ইস্তাহাযার রক্ত তা থেকে খুব একটা ভিন্নতর হয় না। এই দুটির পরিচিতিও অভিন্ন। কাজেই যে লোক রক্তের বর্ণ দ্বারা হায়যকে বিচার করে, তার মত বাতিল প্রমাণিত হল আয়াতের দলীল দ্বারাই। রক্তের বর্ণের ব্যাপারটি বাদ দিলে হায়য সম্পর্কিত জ্ঞান তো কেবল তার কাছ থেকেই পেতে হবে, যেমন পূর্বে বলেছি। হায়যের সময়; অভ্যাস ও পরিমাণ ইত্যাদি তার কাছ থেকে জানা ছাড়া উপায় নেই। তুহরের সময়ও তার নিকট থেকেই জানা যেতে পারে। কেননা সব রক্তই তো আর হায়য নয়। তাছাড়া পেটে সন্তানের 'সঞ্চার'

হওয়া। হলে তখনও রক্ত বের হতে থাকলে তাকে হায়যের রক্তস্রাব বলা যাবে না। গর্ভপাত হওয়ার ব্যাপারটিও তার কাছ থেকেই জানা যাবে, সে ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণ করতে হবে। কেননা সে বিষয়ে অন্যদের কিছুই জানা সম্ভব নয়। তার কাছ থেকে না শুনে এ বিষয়ে আমাদের কিছুই জানা থাকে না। এই কারণে এ বিষয়ে তার কথার এত গুরুত্ব।

হিশাম মুহাম্মাদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হায়য সম্পর্কিত ব্যাপারে নারীর নিজের কথাই গ্রহণীয়। বালেগা হওয়ার খবর তার নিকট থেকেই জানতে হবে। কেননা তা কেবল বয়সের হিসেবে হয় না, রক্তস্রাব হতে শুরু করলে হয়। এই কারণেই 'আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্যে হালাল নয়' বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ বলেছেন, কোন কিশোর বালক যদি বলে, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে, তাহলে তা সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে জানবে ও বুঝবে যে, স্বপ্নদোষ কাকে বলে, মানুষ পূর্ণ বয়স্ক হয় কখন কিভাবে। এখানে হায়য ও স্বপ্নদোষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। পার্থক্য এদিক দিয়ে যে, হায়য হওয়ার খবর তো মেয়ের কাছ থেকেই জানতে হবে, কেননা সে সময় ও অভ্যাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাতে এমন সব গোপন বিষয়ও থাকে, যা অন্য কারোর নিকট থেকে জানা যেতে পারে না। আয়াতটিও এ বিষয়ে মেয়েলোকটির কথা কবুল করার উপরই গুরুত্ব দেয়। কিন্তু 'ইহতিলাম' বা স্বপ্নদোষ এ পর্যায়ের জিনিস নয়। কেননা তাতে প্রচণ্ড বেগ ও যৌন উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাতের প্রয়োজন হয় না অন্যান্য কারণে। শুধু স্খলনই প্রধান। তাতে সময় ও অভ্যাসের কোন প্রশ্ন নেই। এই কারণেই এ বিষয়ে কেবল কিশোরের কথাকেই সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না। তাই এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করা ও সঠিকত্বকে নিঃসন্দেহে জানার প্রয়োজন রয়েছে। অন্য দিক দিয়ে হায়য ও ইস্তিহাযা— উভয়ের রক্তের বর্ণ যখন অভিন্ন, তখন যে লোক রক্ত পর্যবেক্ষণ করল তারই পক্ষে তাকে হায়য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কাজেই মেয়েলোকটির নিজের কথার দিকে ফিরে যেতে হবে। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সে-ই জানে, অন্যরা জানে না। পক্ষান্তরে 'ইহতিলাম' (স্বপ্নে বীর্যস্খলন) কোন পর্যবেক্ষকের চোখেই সন্দেহের সৃষ্টি করবে না। তা বোঝা যায়, জানা যায় কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই। এই কারণে কেবল কিশোরের কথার উপর নির্ভরশীল থাকি না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

যদি সে মেয়েলোকেরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে।

এই কথাটি গোপন করা সংক্রান্ত নিষেধের শর্ত নয়। কথাটি পূর্ব কথার তাগিদ হিসেবেই বলা হয়েছে। এটা ঈমানের অন্যতম শর্ত। অতএব সে মেয়েলোকদের কর্তব্য যে, তারা তাদের জরায়ুতে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে গোপন করবে না। এ ব্যাপারে ঈমানদার ও বেঈমান—উভয়ই এই নিষেধ পালনের ব্যাপারে সমান। এ কথাটি এ আয়াতটির মতই, বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

এবং সে দুজনের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র আইন কার্যকর করণে বাধাগ্রস্ত না করে যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে।

(সূরা আন-নূর ঃ ২)

মরিয়ামের কথা ঃ

انِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا -

আমি দয়াময় আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি তোমার থেকে বাঁচার জন্যে, যদি তুমি আল্লাহ ভীরু হয়ে থাক। (সূরা মরিয়া ঃ ১৮)

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْاۤ اِصْلَاحًا -

তাদের স্বামীরাই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকার সম্পন্ন এই ব্যাপারে, যদি তারা 'সুলাহ' করার ইচ্ছুক হয়ে থাকে।

এ আয়াত কয়টি বিভিন্ন শরীয়াতি বিধান ধারণ করে আছে। তার একটি হচ্ছে, তিন তালাকের কম দিলে স্বামীত্ব-স্ত্রীত্ব শেষ হয়ে যায় না। তা সম্পূর্ণ বাতিলও হয় না। এ আয়াতসমূহে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক বা দুই তালাক দেয়া হলেও স্বামীত্ব-স্ত্রীত্ব বজায় থাকে। কেননা এ ধরনের তালাক দেয়ার পর-ও তালাকদাতাকে স্বামী বলা হয়েছে। বোঝা গেল, এরূপ অবস্থায়ও মীরাসে অংশীদারিত্ব ও অন্যান্য বৈবাহিক আইন বিধান কার্যকর থাকবে। অবশ্য তা ইদ্দত পালন শেষ হওয়া পর্যন্ত। এ-ও বোঝা গেল যে, ইদ্দত পালন পর্যন্ত স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ আছে। কেননা বলা হয়েছে فِىْ ذٰلِكَ — 'এই সময়ের মধ্যে'। অর্থাৎ পূর্বে যে তিন কুরুর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে। এ-ও প্রমাণিত যে, স্বামীর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়াটা কেবলমাত্র তখনই জায়েয ও কার্যকর হবে, যদি এই ফিরিয়ে নেয়ার মূলে শুভ ও কল্যাণের ইচ্ছা থাকে, স্ত্রীর কোনরূপ ক্ষতি করার ইচ্ছা না থাকে। এটা এই রকমেরই কথা ঃ

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

এবং তোমরা তাদেরকে ক্ষতি স্বরূপ আটকে রাখবে না এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করবে।

যদি বলা হয়, 'স্বামীরা তাদেরকে কুরুর মধ্যে ফিরিয়ে নেয়ার অধিক অধিকার সম্পন্ন' এই কথার অর্থ কি স্বামীত্ব-স্ত্রীত্ব বজায় থাকা অবস্থায় ? এ ধরনের কথা তো বলা হয় যেখানে সে অধিকার নিঃশেষ হয়ে গেছে সেখানে। যেখানে স্বামীত্ব বহাল আছে, সেখানে তার অধিকারে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার তো কোন প্রশ্ন উঠে না। স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের অধিকার এখনও তো বহাল রয়েছে ?

জবাবে বলা যাবে, এখানে একটি কারণ ঘটেছে, যখন ইদ্দত শেষ হলেই বিয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, এই কারণে ফিরিয়ে নেয়ার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কথাটি বলা হয়েছে ইদ্দত শেষ হলেই স্বামীত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হিসেবে। এজন্যে তাকে 'ফিরিয়ে নেয়া' বলা হয়েছে। কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার কারণটা দূর করার ব্যাপার এটি। এটা তো এরূপ কথা, যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

তাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তোমরা হয় তাদেরকে যথারীতি রেখে দাও, না হয় তাদের যথারীতি ছেড়ে দাও।

স্বামী স্ত্রীকে এ অবস্থায় রাখতে পারবে, কেননা সে তার স্ত্রী। বক্তব্য হচ্ছে ফিরিয়ে নেয়া, যা বিয়ে বহাল থাকার ব্যবস্থাকারী হায়য শেষ হয়ে যাওয়ার পর-ও। এই সময় যদি ফিরিয়ে নেয়া না হয়, তাহলে বিয়েকে নিঃশেষ করে দেবে।

এই ফিরিয়ে নেয়াটা যদিও মুবাহ, কিন্তু তা কল্যাণের ইচ্ছা শর্তাধীন। কেননা মনীষীদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, ফিরিয়ে নিয়ে স্ত্রীর ক্ষতি সাধন করা ও দীর্ঘদিন ধরে ইদ্দত পালনে তাকে বাধ্য করারই যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে তার এই ফিরিয়ে নেয়াটা সহীহ্ হবে। এ আয়াতটিতে সেই কথাই বলা হয়েছে ঃ "তাদের মিয়াদ পূর্ণ হলে অতঃপর তাদেরকে ভালোভাবে রাখো কিংবা ভালোভাবে ছেড়ে দাও। কিন্তু তাদেরকে কষ্ট দানস্বরূপ ফিরিয়ে রেখো না তাদের উপর সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে।"

এর পরই বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ -

যে লোক তা করবে, সে নিজের উপরই জুলুম করল।

তাই ফিরিয়ে নেয়াটা যদি সহীহ্ না হয়, কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিলেও, তাহলে সে নিজের উপর জুলুমকারী হতে পারে না নিজের কাজের দরুন।

আয়াতটি আরও প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন জিনিসের নামকরণে সাধারণ অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার তার সাথে এমন হুকুম জুড়ে দেয়া, যার সাথে সাধারণ জিনিস থেকে কিছু তার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে— জায়েয। সাধারণ অর্থের শব্দ যা যুক্ত করা জিনিস ছাড়া অন্য কিছুকে শামিল করে— নিষিদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

তালাকপ্রাপ্ত মেয়েরা নিজেদের ইদ্দত পালন করবে তিন কুরু সময় ধরে।

এ আয়াতে সাধারণভাবেই তিন কুরুর কথা বলা হয়েছে। আর তার কমে কোন মতবৈষম্য নেই।

এরপর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নেয়ার অধিক অধিকার সম্পন্ন।' এটা একটা বিশেষ হুকুম তাদের জন্যে, যাদের তালাক সংখ্যা তিন-এর কম। কোন হুকুমে সীমাবদ্ধকরণকে কর্তব্য করে দেয়নি আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তরা নিজেদেরকে তিন কুরু অপেক্ষমান বানিয়ে রাখবে'— তিন তালাকের কম-এর ক্ষেত্রে। কুরআন ও সুন্নাহতে এর বিপুল দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا -

এবং আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যাবহার গ্রহণের হুকুম দিয়েছি।

(সূরা আনকাবুত ঃ ৮)

এই কথা সাধারণ, মুসলিম ও কাফির— সব পিতা-মাতার ব্যাপারেই এই হুকুম কার্যকর। এর সাথে যোগ করা হয়েছে এই কথাটি ঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا -

সেই পিতা-মাতাই যদি তোমাকে বাধ্য করে আমার সাথে শিরক করার জন্যে যে বিষয়ে তোমার জানা বলতে কিছুই নেই, তাহলে তুমি তাদেরকে মানবে না।

(সূরা আনকাবুত ঃ ৮)

এই কথাটি বিশেষভাবে মুশরিক পিতা-মাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কথার শুরুতে সাধারণ পর্যায়ের কথা মুসলিম-কাফির সকলকে শামিল করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কথার শেষ অংশে শুধু কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য কথা বলা হয়েছে, এটা অবাঞ্ছনীয় কিছু নয়।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার—স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

স্ত্রীলোকদের জন্যে (স্বামীদের উপর) সেই সব কিছু যা তাদের উপর (তাদের স্বামীদের) জন্যে রয়েছে প্রচলিত ও মঙ্গলময় নিয়মে। তবে পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটা মাত্রার (প্রধান্য) আছে।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্যে তার সঙ্গী অপর পক্ষের উপর হক রয়েছে। তবে স্বামীর একটা বিশেষ অধিকার স্ত্রীর উপর রয়েছে, যা স্ত্রীর তার উপর সেই রকমের নেই। এই কথাটি আল্লাহ্ এ ভাষায় বলেছেন ঃ পুরুষদের জন্যে তাদের (স্ত্রীদের) উপর একটা মাত্রা রয়েছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের জন্যে পরস্পরের উপর কি অধিকার আছে, তা এ আয়াতে বিস্তারিত বলা হয়নি। অপরাপর আয়াতে তা বলা হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে রাসূলে করীম (স)-এর জবানীতে। স্ত্রীদের অধিকারের একটি দিকে আল্লাহ্ ইঙ্গিত করেছেন এ আয়াতে ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং তোমরা স্বামীরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে প্রচলিত শুভ নিয়মে আচরণ ও পারস্পরিক বসবাস গ্রহণ কর। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

বলেছেন ঃ

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -

অতঃপর হয় ভালো ভাবে তাকে স্ত্রীত্বে রাখ, না হয় ভালোভাবে ছেড়ে চলে যেতে দাও।

বলেছেন ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

এবং সন্তানের পিতার উপর ধার্য হবে সন্তানের মাদের রিযিক দান ও পরিধেয় দেয়— প্রচলিত শুভ নিয়মে।

বলেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উপর কল্যাণকারী পৃষ্টপোষক— শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন— সেই নিয়ম অনুযায়ী যে নিয়মে আল্লাহ পরস্পরকে পরস্পরের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন এবং এই কারণে যে, স্বামীরা তাদের সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

স্বামীদের এই সম্পদ ব্যয় স্ত্রীদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং স্ত্রীদেরকে দাও তাদের মহরানাসমূহ সন্তুষ্ট চিত্তে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

স্ত্রীদের মহরানা সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দেয়াকে তাদের হক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا -

আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে আর এক স্ত্রী বদল করতে ইচ্ছা করে থাক এবং তাদের একজনকে যদি বিপুল পরিমাণ সম্পদ-ও দিয়ে থাক, তা হলে তার থেকে এক বিন্দু জিনিস ফিরিয়ে নেবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ২০)

স্ত্রীকে দেয়া সম্পদের কিছুই ফিরিয়ে না নেয়া স্ত্রীর অধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে যদি তালাক দিয়ে বিদায় করে দেয়ার সিদ্ধান্তও হয়ে থাকে তবুও। তালাক দেয়ার ইচ্ছাটা প্রথমত স্বামীর দিক থেকেই হয়েছে, কেননা বদলাতে চাওয়াটা স্বামীর ব্যাপার হিসেবেই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْآ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -

তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ আদল রক্ষা করতে সমর্থ হবে না, যদি তোমরা আকাঙ্ক্ষীও হও। এমতাবস্থায় তোমরা অন্তত কোন একদিকে পুরা মাত্রায় ঝুঁকে পড়ো না, যার পরিণামে তোমরা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৯)

কোন একজন স্ত্রীর প্রতি বেশি ঝুঁকে না পড়া স্ত্রীদের হক হিসেবে ঘোষিত, যার ফলে অন্য কোন স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হতে পারে। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমান বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়া স্ত্রীর অধিকার। কেননা কোন একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়তে আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে। স্ত্রীর এ-ও অধিকার রয়েছে যে, তাকে সঙ্গম করা

হবে, ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হবে না। তাতে অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, স্ত্রীর স্বামী আছে, কিন্তু কার্যত না থাকার মত। স্বামীর নিকট থেকে সঙ্গম পাওয়ার অধিকার; কিন্তু সে তা পাচ্ছে না। এও তার অধিকার যে, তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাকে বিয়ের বন্ধনে আটকে রাখবে না। এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ -

তোমরা তাদের তাদের স্বামী গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করো না, যখন তারা পারস্পরিকভাবে রাজী হয়ে যাবে শরীয়াতসম্মতভাবে।

এ আয়াতে স্বামীকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, স্ত্রীর প্রতি যখন তার আকর্ষণ নেই, তখন তাকে তালাক না দিয়ে অন্য কোন স্বামী গ্রহণে তুমি তাকে বাধা দিও না। এ সবই স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারের কথা। উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে এই কথাগুলাই বিধৃত।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পর্যায়েও আল্লাহ্‌র কথা রয়েছে। বলেছেন ঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -

সতী নারীরা আনুগত্যপরায়ন হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র পর্যবেক্ষণের অধীন তাদের অধিকার রক্ষা করে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

নেককার বিনয়ী মেয়েলোক— অদৃশ্যের সংরক্ষণকারী আল্লাহ্‌র হেফাজত অনুযায়ী বলা হয়েছে, এ আয়াতের অর্থে স্বামীর বীর্য স্ত্রীদের জরায়ুতে সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তা ফেলে দেয়ার— অকেজো বা বিনষ্ট করার কোন কৌশল করবে না, স্বামীর শয্যা থেকে সে যা গ্রহণ করেছে তা রক্ষা করবে— এই কথাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। তা ছাড়া স্বামীর ঘরের মাল-সম্পদ ও তাদের নিজেদের সম্পদ রক্ষার কথাও বলা হয়েছে। বরং এক সাথে এই সব অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনাই বেশি এবং অধিক বাঞ্ছনীয়। কেননা ব্যবহৃত শব্দ সেই সব কিছুরই ধারক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব-অভিভাবকত্বের ধারক। এ জন্যে স্ত্রীদের কর্তব্য নিজ নিজ স্বামীর কথা মান্য করা, এটা বাধ্যতামূলক। কেননা আয়াতে স্বামীদের قَوَّامٌ বলা অর্থই হচ্ছে তাই।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا -

আর যে স্ত্রীদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের তোমরা ভয় পাও, তাদেরকে ওয়ায করে বুঝ দিতে থাক। (এক পর্যায়ে) শয্যায় তাদেরকে ত্যাগ কর। (আর চরম পর্যায়ে) তাদেরকে মারধোর কর। এরপর তারা যদি তোমাদের মেনে চলতে রাজী হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন উপায় গ্রহণের সন্ধানে তোমরা যাবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

আয়াতটি থেকে বোঝা গেল, স্ত্রীদের নিজেদের ব্যাপারে তাদের স্বামীকে মেনে চলতে হবে, স্বামীর প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণ গ্রহণ না করা কর্তব্য।

স্বামীর হক স্ত্রীর উপর ও স্ত্রীর হক স্বামীর উপর— এই পর্যায়ে নবী করীম (স) থেকে অংসখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যের কতক হাদীস তো কুরআনের সাথে পুরাপুরি সাম স্যশীল, কুরআনেরই প্রতিনিধি। আর কতক হাদীসে তার চাইতেও অনেক বেশি কথা বলা হয়েছে।

আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আলা বসরী আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নুফাইলী প্রমুখ— হাতিম ইবনে ইসমাঈল, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তাঁর পিতা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) আরাফাতের ভাষণে বলেছিলেনঃ

اتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَانَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ، وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَايُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করবে। তোমরা তো তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত স্বরূপ গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র বাণী দিয়েই তোমরা তাদের যৌনাঙ্গকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের হক হচ্ছে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন কাউকে নিয়ে আসবে না, যা তোমরা আদৌ পছন্দ কর না। তারা যদি সে কাজ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে মারবে, তবে নির্মমভাবে বীভৎস মার মারবে না। আর তোমাদের উপর তাদের রিযিক ও পরিধেয় যথারীতি পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

লাইস আবদুল মালিক, আতা, ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন, এক জন মেয়েলোক নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 'হে রাসূল! স্ত্রীর উপর স্বামীর কি হক রয়েছে? জবাবে তিনি কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করলেন। তার মধ্যে এ-ও বললেন, তুমি তোমার স্বামীর ঘর থেকে কোন জিনিস স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দান করবে না। যদি করে, তাহলে তার সওয়াবটা তো স্বামী পাবে; কিন্তু স্ত্রীর উপর হবে তার গুনাহ।

তার পরে প্রশ্ন করল, হে রাসূল, স্বামীর কি হক রয়েছে স্ত্রীর উপর? বললেন, স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বের হবে না, স্বামীর অনুমতি ছাড়া সে নফল রোযা রাখবে না।

মুসয়িব সাঈদুল মুকবেরী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছেন, স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই মেয়েলোক যার দিকে তুমি তাকালে সে তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেবে। আর তাকে কোন কাজের আদেশ করলে সে তোমার কথা পালন করবে। আর তুমি বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলে তোমার ধন-মালের ও তার নিজের হেফাজত করবে। এর পর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন ঃ 'পুরুষরা স্ত্রীদের উপর দায়িত্বশীল— প্রাধান্য সম্পন্ন।'

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতকে দলীল বানিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খরচপত্র দিতে অক্ষম হয়, তাহলে দুই জুম'আর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তো তাদের জন্যে স্বামীদের উপর ধার্য করেছেন, যা স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর। অধিকারের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীকে সমান বানিয়েছেন। অতএব স্বামী স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ না করে তার যৌনাঙ্গ নিজের জন্যে মুবাহ করে নেবে, এটা জায়েয হতে পারে না।

কিন্তু এই কথাটি কয়েকটি দিক দিয়েই ভুল। একটি— স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহারের বদল বা বিনিময় নয়। অতএব একটির না হওয়ার দরুন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রশ্ন উঠে না। স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়ার বিনিময়ে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ভোগের অধিকার লাভ করে না। কেননা স্বামী তো বিয়ের আকদের কারণে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ভোগ করার অধিকার পায়। সেটা বিয়ের চুক্তির বিনিময় হতে পারে। আর তা হচ্ছে মহরানা।

আর দ্বিতীয় কারণ হল যদি তা-ই বদল বা বিনিময় হতো, তাহলে আয়াতের বলে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না। কেননা তার পরই বলা হয়েছে ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটা মাত্রার প্রাধান্য আছে।

এতে স্ত্রী উপর স্বামীর কিছুটা বেশি মর্যাদার অধিকারী হওয়া, প্রমাণিত হয়। আর তা বিয়ের কারণে প্রতিষ্ঠিত হক বা অধিকারের ব্যাপার। আর এই কারণেরই স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ভোগ করার অধিকার পায়, তার জন্যে তা মুবাহ হয়। তা তার ভরণ-পোষণ দিতে না পারলেও।

উপরন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘরে নিজেকে তার নিকট সমর্পণ করে, এই কারণে সে স্বামীর নিকট তার ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারিণী হয়। ফলে স্ত্রীর জন্যে স্বামীর উপর তা-ই ধার্য হয়, যা স্ত্রীর নিকট থেকে স্বামীর পাওনা মুবাহ সাব্যস্ত হয়। তা হল ভরণ-পোষণ নির্ধারণ এবং তা স্বামীর দায়িত্বে অর্পণ। এরূপ অবস্থায় স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ধার্য না হয়ে পারে না, যেমন স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ধার্য না হয়ে পারে না।

আল্লাহ্‌র কথা স্ত্রীদের জন্যে তেমনিই যা তাদের উপর হয় প্রচলিত শুভ নিয়মে। এ আয়াত দ্বারা কতিপয় বিধান প্রমাণিত হয়। তার মধ্যে একটি হল সমপরিমাণ মহরানা দান, যদি বিয়ের সময় মহরানা নির্ধারিত না হয়ে থাকে। কেননা বিয়ের আকদের বলেই স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহারের অধিকার পেয়েছে। স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করবে, স্বামী স্ত্রীর উপর এই অধিকারও পেয়েছে। স্বামী যেমন স্ত্রীর উপর অধিকার পেয়েছে তেমনি স্ত্রীরও অধিকার স্বামীর উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে। স্ত্রী-অঙ্গও তেমনি। তা স্বামীর প্রাপ্য মূল্য মহরানার বিনিময়ে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরা তার উপর সীমালঙ্ঘন করবে, যেমন সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৯৪)

এ থেকে সেই জিনিসের মূল্য দেয়া বোঝায়, যার মালিক সে হয়েছে, যার কোন প্রতীক সেই জাতীয় জিনিস থেকে নেই। স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ব্যাপারও অনুরূপ। তার প্রতীক বিনিময় হল শহর আল-মিসল। আল্লাহ্‌র কথা ঃ بِالْمَعْرُوْفِ থেকে বোঝা গেল, তার বিনিময়ে ততটা দেয়া কর্তব্য, যাতে বাড়তি কিছু নেই, প্রাপ্য পরিমাণ থেকে কম কিছু নেই। নবী করীম (স) যেমন এক স্বামী মরা স্ত্রীকে— যার মহরানা নির্ধারিত হয়নি— তার সাথে যৌন সঙ্গম করা হয়নি— বলেছিলেন তার মতো মেয়েলোকের যে মহরানা হয়ে থাকে, সে সেই রকম মহরানা পাবে। বাড়তিও নয়, তার চাইতে কমও নয়। বলেছিলেন ঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا وَلَا وَكَسَ وَلَاشَطَطَ-

যে মেয়েলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল গণ্য হবে। তার সাথে স্বামী যদি যৌন সঙ্গম করে, তাহলে তার মেয়েলোকের সমান মহরানা পাবে, কমও নয়, বেশিও নয়।

আয়াতে যে 'মা'রূফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটাই তার তাৎপর্য।

আয়াতটি থেকে এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি মেয়েলোক বিয়ে করে এই কথা বলে যে, তাকে মহরানা দিতে হবে না, তবু মহরানা দেয়া অবশ্য কর্তব্য হবে। কেননা বিয়ে মহরানার ব্যাপারে এ পার্থক্য করা হয়নি যে, মহরানা না দেয়ার কথা বললে দেয়া লাগবে না কিংবা দেয়ার কথা বললেই দেয়া লাগবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটা বিশেষ মর্যাদা আছে।

আবূ বকর বলেছেন, 'পুরুষরা মেয়েদের উপর পৃষ্ঠপোষক-সংরক্ষক-নেতৃত্বকারী সেই নীতি অনুযায়ী যা আল্লাহ পরস্পরকে পরস্পরের উপর অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। এই কথা বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামী স্ত্রীর উপর অধিক মর্যাদার অধিকারী। এজন্যেই আল্লাহ পুরুষকে তার উপর সংরক্ষক— চালক-পৃষ্ঠপোষক-নেতৃত্বকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ 'এবং এজন্যে যে, পুরুষরা তাদের ধন-মাল ব্যয় করে।' এই কারণেই স্ত্রীর উপর অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছে স্বামী। আরও পুরুষের অধিক মর্যাদার কারণ হল, আল্লাহ স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে বলেছেন। আর অধিক মর্যাদার এ-ও একটি দিক যে, কোন এক পর্যায়ে আল্লাহ স্ত্রীকে মারধোর করার অধিকার দিয়েছেন স্ত্রীর অবাধ্যতার সময়। শয্যায় তাকে পরিত্যাগ করতেও বলেছেন। অধিক মর্যাদার এ-ও একটি দিক যে, স্বামীকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে তালাক দিয়ে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার। কিন্তু স্ত্রী তার অধিকারী নয়। এটাও একটা দিক যে, এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও স্বামীকে আরও তিনজন স্ত্রী-গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে । কিন্তু স্ত্রীকে স্বামী বর্তমান থাকা অবস্থায় আর এক স্বামী গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়নি। স্বামীর কারণে— তালাক কিংবা মৃত্যুর ইদ্দত পালন কালেও সে আর একজন স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। মিরাস বণ্টনেও নারীর তুলনায় পুরুষের অংশ বেশি। স্ত্রীর কর্তব্য স্বামী তাকে যেখানে ইচ্ছা

নিয়ে যাবে সেখানে তার চলে যাওয়া। কিন্তু স্থানান্তর গ্রহণে স্বামী স্ত্রীর পেছনে দৌড়াতে বাধ্য নয়। তাছাড়া স্বামীর অনুমতি না হলে স্ত্রী নফল রোযাও রাখতে পারে না।

নারীর তুলনায় পুরুষের অধিক মর্যাদা পর্যায়ে এ পর্যন্ত লিখেছি, রাসূলে করীম (স) এ ছাড়া আরও বহু দিকের উল্লেখ করেছেন এবং তা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইসমাঈল ইবনে আবদুল মালিক আবুয যুবায়র— জাবির সূত্রে নবী করীম (স) থেকে এই পর্যায়ের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَايَنْبَغِى لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْكَانَ ذٰلِكَ كَانَ النِّسَاءُ الْاَزْوَاجِهِنَّ -

মানুষ মানুষকে সিজদা করবে, তা কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়। যদি তা বাঞ্ছনীয় হতো তাহলে স্ত্রীরা অবশ্যই স্বামীদের সিজদা করতে পারত।

খালফ ইবনে খলীফা হিফস ইবনে আখী, আনাস বর্ণিত হাদীস হল, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَصْلُحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ لِبَشَرٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مَنْ عِظْمِ حَقِّهٖ عَلَيْهَا ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهٖ اِلٰى مَفْرِقِ رَاْسِهٖ قَرْحَةٌ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ ثُمَّ لَحَسَتْهُ لَمَّا اَدَّتْ حَقَّهٗ -

মানুষের পক্ষে উচিত হতে পারে না মানুষকে সিজদা করা। যদি তা উচিত হতো, তাহলে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। কেননা স্ত্রীর উপর তার হক অতীব বিরাট। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর নামে শপথ করে বলছি, স্বামীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যদি যখম হয়, পুঁজ পড়তে থাকে, আর স্ত্রী যদি চাটে, তবু সে স্বামীর হক আদায় করতে পারল না।

আ'মাশ আবূ জাহিম আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -

স্বামী যদি স্ত্রীকে তার শয্যায় ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে এবং স্বামী তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সে স্ত্রী লোকটির উপর ফেরেশতারা সকাল বেলা পর্যন্ত অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।

হুসায়ন ইবনে মুহসিন তার ফুফু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন নবী করীম (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্বামী আছে কি ? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি তোমার স্বামীর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে কি অবস্থায় আছ ? বললেন, আমি তো তার মনস্তুষ্টি সাধনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। নবী করীম (স) বললেন, ভেবে দেখ, কিরূপ সম্পর্ক তুমি তার সাথে রাখছ। কেননা একথা জেনে নেবে, তোমার স্বামীই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।

সুফিয়ান আবূ যায়দ, আল-আরাজ, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ স্বামী বাড়িতে থাকার সময় স্ত্রী যেন রমযান ছাড়া নফল রোযা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত না রাখে।

আ'মাশ আবূ সালিহ, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা না রাখতে বলেছেন।

এই সমস্ত হাদীস কুরআনের ঘোষণার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এর সবই অধিকারের ব্যাপারে স্ত্রীদের অপেক্ষা স্বামীর অধিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কথা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করে। আর তা-ই হচ্ছে বিয়ে-চুক্তির ঐকান্তিক দাবি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক প্রাপ্ত মহিলারা তিন কুরু সময়কাল নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে' এর মনসূখ হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে।

একটি, মুতরাফ আবূ উসমান আন-নহদী, উবাই ইবনে কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তালাক ও স্বামী মরা মেয়েলোকদের ইদ্দত পালনের আয়াত যখন নাযিল হল তখন আমরা বললাম ঃ হে রাসূল। এমন কিছু মেয়েলোক রয়েছে, যাদের ইদ্দত পালন সম্পর্কে কোন হুকুম নাযিল হয়নি। তারা হল ছোট বয়সের মেয়ে, বয়োবৃদ্ধ ও গর্ভবতী মেয়েলোক। তখন নাযিল হল ঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ -

আর সেই সব মেয়েলোক, তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যে যারা হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে....। (সূরা আত-তালাক্ব ঃ ৪)

শেষের দিকে রয়েছে ঃ

وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

আর গর্ভবতী মেয়েলোকদের ইদ্দত হচ্ছে তাদের গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করা।

(সূরা আত-তালাক্ব ঃ ৪)

আবদুল ওহাব সাঈদ কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ 'তালাকপ্রাপ্ত নারীরা তিন কুরু পর্যন্ত নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে' আয়াতে তালাক প্রাপ্তাদের তিন হায়য কালের ইদ্দত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরে পরিবর্তন করা হয়েছে সে মেয়ের ইদ্দতে, যার বিয়ে হলেও যৌন সঙ্গম হয়নি। আর দুই ধরনের মেয়েদের ইদ্দতও ভিন্নভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা 'যারা হায়য হওয়ার থেকে নিরাশ হয়ে গেছে তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যে থেকে — যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে যাও।' এ আয়াতে দুধরনের মেয়েলোকদের ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে। এক হচ্ছে বয়োবৃদ্ধ যাদের হায়য হওয়া শেষ হয়েছে, এখন হচ্ছে না। আর যাদের এখনও হায়য হয়নি। আর 'বাকেরা' মেয়ে, ওদের ইদ্দত তিন মাস। তাদের ব্যাপারে হায়যের হিসেব গণ্য হবে না। আর যারা গর্ভবতী, তাদের ইদ্দত তিন কুরু থেকে ভিন্নতর করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ গর্ভবতী মেয়েলোকদের ইদ্দত শেষ হবে তাদের সন্তান প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে; এদের ক্ষেত্রেও কুরুর হিসেবে গণ্য নয়। সন্তান প্রসব হলেই তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, উবাই ইবনে কাব বর্ণিত হাদীস কোন কিছু মনসূখ হওয়ার কথা বলে

না। খুব বেশির পক্ষে তাতে এই কথাটুকু আছে যে, লোকেরা অল্প বয়স্কা, বয়োবৃদ্ধা ও গর্ভবতী মেয়েলোকদের ইদ্দত সম্পর্কে নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ফলে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, আয়াতটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গর্ভবতীর ব্যাপারটি এর মধ্যে নেই, যদিও সেও বক্তব্যের মধ্যে শামিল হতে পারে। তেমনি অল্প বয়স্কা নাবালেগা মেয়ে। তার পূর্ণ বয়স্কতা হলে তো তার ইদ্দত তিন কুরু হতে পারে। কিন্তু ছোট-নাবালেগা অবস্থায় যদি তাকে তালাক দেয়, আর বয়োবৃদ্ধার ব্যাপার, আয়াত থেকে একথা বোঝা গিয়েছে যে, তাদের বিষয়ে এ আয়াতে কিছু বলা হয়নি। কেননা বয়োবৃদ্ধ— হায়য হওয়া থেকে নিরাশ— মেয়েলোক তার মধ্যে গণ্য হতে পারে না কোন ক্রমেই। তবে কাতাদাতা বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আয়াতটি সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। তার দাবি হচ্ছে, সঙ্গম কৃতা ও সঙ্গম করা হয়নি— এই উভয় ধরনের মেয়েলোকের ইদ্দত কুরু হিসেবেই হবে। এ থেকে আলাদা করা হয়েছে সেই মেয়েলোক, যার সাথে সঙ্গম করা হয়নি। এখানে যেমন বলা হয়েছে, তা হওয়া খুবই সম্ভব। তবে দুইজন মেয়েলোকের ইদ্দত তিন কুরু থেকে মনসূখ হয়ে গেছে, হায়য হওয়া থেকে নিরাশ মেয়েলোক এবং অল্প বয়স্কা মেয়ে। এদের ব্যাপারে 'মনসূখ' কথাটির প্রয়োগ হয়েছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষীকরণ বোঝানো। ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তাফসীর লেখকের বর্ণনা থেকে 'নূসখ' শব্দটির ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। আসলে তাঁরা বিশেষীকরণকে বোঝাতে চেয়েছেন। আয়াতের প্রসঙ্গে 'নুসখ'-এর উল্লেখ করে কাতাদাতাও এই বিশেষীকরণই বোঝাতে চেয়েছেন, পারিভাষিক 'মনসূখ' হওয়া নয়। কেননা, আসলে তো মনসূখ নয়। মনসূখ হওয়ার কথা সেখানে বলা যেতে পারে, সেখানে হুকুমটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আয়াতটি থেকে কুরুর ইদ্দত বুঝিয়েছে, একথা ঠিক নয়। কেননা তা হওয়া অসম্ভব। বোঝা গেল, তিনি বিশেষীকরণকেই বুঝিয়েছেন। আর একটা দূরতম সম্ভাবনাও আছে। তা হচ্ছে কাতাদাতার মাযহার। যার হায়য শেষ হয়ে গেছে, সে যুবতী হলেও তাকে এমন মেয়েলোক মনে করা যাবে যার হায়য হওয়ার আশা নেই। তা সত্ত্বেও তার ইদ্দত হবে কুরু হিসেবে, তাতে মিয়াদ দীর্ঘ হলেও।

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, যার হায়য হওয়া শেষ হয়ে গেছে সে সেই মেয়েলোকের মধ্যে গণ্য, যার হায়য হওয়ার আশা নেই। তার ইদ্দত হবে আয়েশার ইদ্দত যদিও সে যুবতীও হতে পারে— ইমাম মালিকেরও এই মাযহাব। আয়েশা— যার হায়য হওয়ার আশা নেই— তার ব্যাপারে তার এই মাযহাব হলে হতেও পারে। হতে পারে কুরু থেকে তিনি এই কথাই মনে করেছেন। কেননা কোন্ সময় তার কুরু— হায়য হতে পারে— এটার আশা করা যায়। তবে তাঁর কথা 'তিনজন থেকে গর্ভবতীর কুরু মনসূখ হয়ে গেছে' এটাও হতে পারে। কেননা এরূপ একটা ভাষা পাঠ্য হইতে পারে যে, গর্ভবতীর ইদ্দত তিন হায়য, তা পালিত হবে সন্তান প্রসবের পর, যদিও সে হায়য না হওয়া মেয়েলোকদের মধ্যের মেয়েলোক। আর তা এ জন্যে যে, সে গর্ভবতী। তার ইদ্দত গর্ভপ্রসবের পর তিন কুরু হতে পারে। তাহলে পরিবর্তন যা হল তা এই গর্ভের কারণে। তবে উবাই ইবনে কাব (রা) জানিয়েছেন যে, গর্ভবতীর ইদ্দত কুরু হিসেবে হওয়া সম্ভব হতে পারে না। সাহাবীরা তো রাসূল (স)-কে এই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, পূর্বে গর্ভবতী, হায়য নিরাশ হওয়া ও ছোট বয়সের

মেয়েলোকের ইদ্দত সম্পর্কে কিছুই নাযিল হয়নি। পরে আল্লাহ্ এই আয়াতটি নাযিল করেছেন। প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে 'নূসখ' শব্দের প্রয়োগ এখানে হতে পারে না। শুধু সেখানেই হতে পারে, যেখানে একটা হুকুম প্রমাণিত ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর মনসূখকারী হুকুমটা তার পরে এসেছে। তবে 'নূসখ' বলে বিশেষীকরণ বোঝানোটা পরোক্ষ অর্থে অবশ্যই হতেই পারে। তাহলে ব্যাপারটি সংকীর্ণ হবে না। তবে বিশেষীকরণ অর্থে ব্যবহার করাই আমাদের মতে সবচেয়ে উত্তম কীর্তি। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তা মেয়েরা নিজেদের ইদ্দত পালনে রত রাখবে' থেকে বিশেষভাবে কেবলমাত্র সেই মেয়েলোকদের বুঝতে হবে, যাদের হায়য হয় এবং যারা সঙ্গমকৃতা। কিন্তু হায়য হতে নিরাশ হওয়া ও অল্প বয়সের মেয়ে এবং গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দতের কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। কেননা এসব হুকুম নাযিল হওয়ার পরম্পরা তারিখ তো আমাদের জানা নেই। প্রথমে এসবের হুকুম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরে তা মনসূখ হয়েছে, এমন কথাও জানা যায়নি। তাই মনে করতে হবে যে, এসব আয়াত প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে। এক্ষণে তার প্রয়োগ ও ব্যবহারের দিক দিয়ে-ই তার বিন্যাস করতে হবে। প্রথমে সাধারণ হুকুম এবং তারপরে বিশেষ হুকুমকে সাজাতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আর একটি দিকের বর্ণনা পাওয়া গেছে এই আয়াতে 'নূসখ' সম্পর্কে। সে বর্ণনাটি আল-হুসায়ন ইবনুল হাসান ইবনে আতীয়াতা তাঁর পিতা আতীয়াতা সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন কুরু সময় পর্যন্ত নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে— শেষ কথা ঃ 'তাদের স্বামীরাই এই মিয়াদের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকার সম্পন্ন।

এর অর্থ হচ্ছে, পুরুষ যখন স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন সে তাকে আবার স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকারী হতো, তিন তালাক দিলেও তাই করা যেত। উক্ত আয়াত নাযিল হয়ে তা মনসূখ করে দিয়েছে। নাযিল হয়েছে এই আয়াত ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন ঈমানদার মেয়েলোকদের বিয়ে করবে, তার পরে তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিলে, তখন তাদের উপর কোন ইদ্দত পালনের বাধ্যবাধকতা নেই, যা তোমরা পালন করতে পার। তাই তোমরা তাদেরকে মাত'আ দাও এবং তাদেরকে তোমরা খুব ভালভাবেই ছেড়ে দেবে। (সূরা আহযাব ঃ ৪৯)

দহাক ইবনে মুজাহিম থেকে বর্ণিত, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত সাধারণভাবেই তিন মাস। পরে তা মনসূখ হয়েছে। পরে তা থেকে আলাদা করা হয়েছে যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি সেই মেয়েলোকদেরকে।

এ পর্যায়ে আরও একটি দিক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি মালিক, হিশাম, ইবনে উরওয়ারা, তাঁর পিতা সূত্রে পাওয়া গেছে। আগে এরূপ ছিল যে, একজন লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিত,

দিত, পরে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসত। এটা সে করতে পারত, স্ত্রীকে এক হাজার বার তালাক দিলেও। এই সময় এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিল। পরে তার ইদ্দত শেষ হয়ে এলে তার পূর্বক্ষণেই তাকে ফিরিয়ে নিল। পরে আবার তালাক দিল, বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে আমার নিকট তো আশ্রয় দিব-ই না, আর তুমি আমার নিকট থেকে কখনই ছাড়া পেতে পারবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ -

তালাক মাত্র দুই বারে। তৃতীয় বারে হয় মেয়েলোকটিকে সুষ্ঠুভাবে স্ত্রীত্বে আটকে রাখবে, না হয় ভালভাবে তাকে ছেড়ে দেবে— চলে যেতে দেবে।

তালাকের এই নবতর পদ্ধতি লোকেরা সাগ্রহে গ্রহণ করে নিল। যারা তালাক দিয়েছিল, তারাও এই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে লাগল, আর যারা তালাক দেয়নি, তারাও এই নীতিকে মেনে নিল।

শায়বান কাতাদাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নেয়ার বেশি অধিকারী' এ আয়াতে তিন কুরু ইদ্দত পালনের কথা বলা হয়েছে। এর পরে বলেছেন ঃ তালাক মাত্র দুইবার। প্রত্যেক বারে এক কুরু, পরে এ আয়াত মনসূখ হয়ে যায়। পূর্বের সব প্রচলন বাতিল হয়ে গেল। আল্লাহ তিন তালাককে একটা সীমা বানিয়ে দিলেন। তৃতীয় তালাক দেয়ার পূর্বে স্বামীকে অধিকার দিয়েছেন তার এই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার।

তালাকের সংখ্যা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'তালাক দুইবার। তৃতীয় বারে হয় ভালোভাবে রাখবে, না হয় ভালোভাবে চলে যেতে দেবে।'

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতে কয়েকটি তাৎপর্য বলা হয়েছে। একটি, এ আয়াতে সে তালাকের কথা বলা হয়েছে, যার পরে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ ও অধিকার থাকে। কথাটি উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র ও কাতাদাতা থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয়, এ আয়াতে সুন্নাত তরীকার তালাকের কথা বলা হয়েছে, যা অবশ্যই পছন্দনীয়। কথাটি ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। আর তৃতীয়, এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে যে, কেউ যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেবার ইচ্ছা করে, তার উচিত তালাক কয়টি আলাদা-আলাদা করে— এক-একটি করে দেয়া। এর মধ্যেই দুই তালাকের আদেশ শামিল রয়েছে। তার পরে তৃতীয় তালাকের কথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, যিনি বলেছেন যে, এটা সেই তালাক, যার পরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকে, সে তালাকের পরই ফেরত নেয়ার কথাটি বলা হয়ে থাকলেও বাহ্যত এই মনে হয় যে, এতে মুবাহ হওয়ার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। এর বিপরীত যা, তা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও তার হুকুমটা এই বলা হয়েছে যে, তালাক যদি ফিরিয়ে নেয়ার মত দিয়ে থাকে তাহলেই তা হতে পারে। আর এই আয়াতকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তালাক দেয়ার আদেশের দলীল বলা এবং তিনের কম তালাক দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে বলা— কেননা 'তালাক দুবার' বলার দাবিই হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া, এটা হতে পারে না। কেননা যদি দুই তালাক একসঙ্গে দেয়, তাহলে

সে 'তালাক দুইবারে' দিয়েছে, একথা তো বলা যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি একসঙ্গে দুই দিরহাম দিয়ে ফেলে, তা সে দুইবার দিয়েছে, তা তো বলা যাবে না। এতে বার-কে আলাদা করা যায় না। এরূপ অবস্থায়ও আয়াতটিকে তার উপর প্রয়োগ করার প্রশ্ন। এটা যখন তা-ই হল, তখন ব্যবহৃত শব্দের উদ্দেশ্য যদি দুই তালাক হয়ে থাকে, যাতে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকে, তাহলে 'দুইবার' বলা তাৎপর্য বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। যখন একবারে হুকুমটা প্রমাণিত হয়,— যখন দুই তালাক দেয়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'দুইবার' বলার তাৎপর্য হচ্ছে তা দুইবারে দিতে হবে, এক সাথে দুইটি তালাক একসাথে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্য দিক দিয়ে শব্দটি যদি দুইটি ব্যাপারের ধারক হয়, তাহলে তাকে দুইটি ফায়দা গ্রহণে হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে গ্রহণ করতে হবে। আর তা হচ্ছে, দুই তালাক দেয়ার ইচ্ছা হলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতে হবে। আর ফিরিয়ে নেয়ার হুকুমটাও সেই সাথে থাকবে। এর ফলে ব্যবহৃত শব্দ উভয় তাৎপর্যকে আয়ত্ত করে।

আল্লাহ্র কথা, 'তালাক দুইবার' বাহ্যত এটা একটা খবর বটে, কিন্তু তাৎপর্যের দিক দিয়ে এটা আদেশ। যেমন ঃ 'তালাকপ্রাপ্তা মেয়েরা নিজেদেরকে তিন কুরু সময় ইদ্দত পালনে রত রাখবে' কথাটি এবং 'সন্তান প্রসবকারী মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়াবে' এই এবং এই ধরনের অন্যান্য কথা। এই কথাগুলো সংবাদ হিসেবে বলা হলেও তাৎপর্যগতভাবে এগুলো আদেশ। এগুলো যে আদেশ, খবর নয়; তার দলীল হচ্ছে; তা যদি নিছক খবর হতো, তাহলে এখবর কাকে দেয়া হয়েছে, তার সন্ধান দরকার, কেননা আল্লাহ্র খবরের জন্যে যে বিষয়ে সে খবর দেয়া হল তার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। খবর যে বিষয়ে দেয়া হল, তার অস্তিত্ব ছাড়া খবর হওয়ার কোন তাৎপর্য নেই। লোকদের অবস্থা তো আমরা এই দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তারা এক তালাক দেয়, তিন তালাক দেয় একসঙ্গে। যদিও আল্লাহ্র খবর হচ্ছে 'তালাক দুইবার'। খবর নামের অধীন সবকিছুই এর আওতার মধ্যে আসা আবশ্যক। এমন লোকও পাচ্ছি, যারা আয়াতে বলে দেয়া পদ্ধতিতে তালাক দিচ্ছে না, তখন বোঝা গেল, এটা কোন খবর নয়। এর মধ্যে দুটির একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। একটি হল, তালাক দেয়ার ইচ্ছা হলে তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতে হবে। এটা আদেশ। কিন্তু সুন্নাত তরীকা— পছন্দনীয় নিয়মের তালাকের পদ্ধতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম নীতি হবে যদি কথাটিকে আদশে হিসেবে নেয়া হয়। কেননা এটাকে কোন বিষয়ের সংবাদ দান মনে করা যায় না। বরং এখন মনে করতে হবে, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ طَلِّقُوا مَرَّتَيْنِ 'তোমরা দুইবার তালাক দাও যখন তোমরা তালাক দেয়ার ইচ্ছা কর।' আর এটা ফরয পর্যায়ের হুকুম হয়ে যায়। তবে মুস্তাহাবও হতে পারে দলীলের ভিত্তিতে। তখন কথাটি দাঁড়াবে, যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَالتَّشَهُّدُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَمَسْكُنْ وَخُشُوعٌ -

নামায দুই রাক'আত করে। আর প্রতি দুই রাক'আত অন্তর তাশাহহুদ, স্থিতি নিয়ে বস এবং বিনয়-নম্রতা প্রকাশ।

এটা খবর ধরনের কথা হলেও এই পদ্ধতিতে নামায পড়ার জন্যে এটা মূলত আদেশ।

উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য যদি শুধু মসনূন তরীকার তালাকের কথা বলাই হতো, তাহলে দুই বা তিন তালাক একসঙ্গে দেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার উপর দলীল দাঁড়িয়ে যাওয়া কর্তব্য ছিল। কেননা

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক দুইবার'-এর মধ্যে সকল প্রকারের তালাক-ই শামিল যা সুন্নাত তরীকা মুতাবিক। মসনূন তালাক যত রকমেরী হতে পারে, তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত, এর বাইরে কোন মসনূন তালাক-ই নেই। এর বাইরে কোন তালাক হলে তা হবে সুন্নাত তরীকার বিপরীত। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে লোক দুই বা তিন তালাক একটি বাক্যের মধ্যে একত্রিত করে দিল, তার এই তালাক দান সুন্নাত তরীকার খেলাফ হয়ে গেল।

বোঝা গেল, এ আয়াতটি কয়েকটি অর্থের ধারক। তার মধ্যে এটাও যে, তিনটি তালাককে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া সুন্নাত তরীকার তালাকদান— অবশ্য যদি তিন তালাক দেয়ারই ইচ্ছা হয়। এটাও এই পর্যায়ের কথা যে, স্বামীর অধিকার আছে দুই তালাক দুইবারে দেয়ার। এটাও যে, তিনের কম তালাক দিলে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকবে। এটাও যে, যদি হায়য অবস্থায় দুই তালাক দেয়, তাহলে তা কার্যকর হবে। কেননা আল্লাহ তা কার্যকর হওয়ারই হুকুম দিয়েছেন। এটাও যে, তিনের অধিক সংখ্যক তালাক দেয়ার রীতিটিকে এ আয়াতে মনসূখ ও নাকচ করে দিয়েছে— যেমন ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেকালের লোকেরা যত ইচ্ছা তালাক দিত। পরে আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিত। আলোচ্য আয়াত সেই অসংখ্য তালাককে তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। তিনের অতিরিক্তকে মনসূখ করে দিয়েছে।

এ আয়াতে এই দলীলও আছে যে, মসনূন তরীকার তালাকের সংখ্যা তিন। তবে তাতে মসনূন তরীকায় তালাক ঘটানোর বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি। তা আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলেছেন। সে আয়াতটি হল فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'অতএব তোমরা তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দত অনুযায়ী'। নবী করীম (স) ইদ্দতের বিবরণটা বলে দিয়েছেন। ইবনে উমর (রা) যখন তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিলেন, তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে এভাবে তালাক দিতে বলেন নি তো! ইদ্দতের তালাক দিতে বলেছেন। আর তা হচ্ছে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তুহর অবস্থায় তালাক দেবে। সে তুহরে তার সাথে সঙ্গম করবে না। অথবা তালাক দেবে গর্ভবতী হওয়া অবস্থায়। তার গর্ভ প্রকাশমান হয়েছে— এই অবস্থায় তালাক দিলে তার ইদ্দত পালনের বিধান আল্লাহ দিয়েছেন, তা অনুসরণেরও আদেশ দিয়েছেন। তাহলে তা সুন্নাত তরীকার তালাক হবে এবং তা দুটি পরিচিতিতে কার্যকর হবে। একটি সংখ্যার আর অপরটি সময়ের। সংখ্যার দিক দিয়ে এক তুহরে এক-এর বেশি তালাক হবে না। আর সময়ের দিক দিয়ে তালাক দিতে হবে তুহর সময়ে, যে তুহরে সঙ্গম হয়নি। অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেবে, যখন সে গর্ভ প্রকাশমান হয়ে গেছে।

কুরু বা হায়যওয়ালী মেয়েলোকদেরকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী তালাক দেয়ার ব্যাপারে মনীষীদের বিভিন্ন মত পাওয়া গেছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সর্বোত্তম তালাক হচ্ছে যখন স্ত্রীর তুহর হবে এবং সঙ্গম করা হয়নি, সেই সময় তালাক দেয়া। এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দেবে, সে তার ইদ্দত পূরণ করবে। আর যদি তিন তালাক দেয়ারই ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে প্রতি তুহরে এক তালাক দেবে সঙ্গমের পূর্বে। ইমাম সওরীও এই মত প্রকাশ করেছেন। আবূ হানীফা বলেছেন, ইবরাহীম নখয়ী কর্তৃক রাসূলের সাহাবী থেকে বর্ণিত কথা এই জানতে পেরেছি যে, তারা এক তালাকের অধিক না দেয়া পছন্দ করতেন। এরপর ইদ্দত শেষ হয়ে

গেলে স্বতঃই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এরূপ তালাক তাঁদের মতে প্রতি তুহরে এক-একটি করে তিন তালাক দেয়ার পরিবর্তে অতীব উত্তম। মালিক ও আবদুল আযীয ইবনে আবূ সালমাতা আল মাজেশুন, লাইস ইবনে সাদ, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও আওজায়ী বলেছেন, সুন্নাত তালাক হচ্ছে প্রতি তুহরে সঙ্গমের পূর্বে এক তালাক করে দেয়া। তিন তুহরে তিন তালাক দেয়াকে তারা মাকরূহ মনে করতেন। কিন্তু তা তখন, যদি তাকে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা না করে থাকে। তাকে ছেড়ে দেবে এবং সেই এক তালাকের ইদ্দত শেষ করে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শাফেয়ী বলেছেন— আল মুজানী তাঁর মত বর্ণনা করেছেন— তিন তালাক দেয়া হারাম নয়, যদি বলে ঃ তুমি তিন তালাক সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী। যখন সে পাক থাকবে এবং সঙ্গম করা হয়নি তাকে এক সঙ্গেও তিন তালাক দেয়া যেতে পারে।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা এ পর্যায়ে শাফেয়ীর কথা থেকেই আলোচনা শুরু করব। আমরা বলব, আমাদের তিলাওয়াত করা আয়াত স্পষ্টভাষী উক্ত কথাকে বাতিল ঘোষণার ব্যাপারে। কেননা দুইবারে দুই তালাক দেয়ার আদেশ উক্ত আয়াতে রয়েছে। এক্ষণে কেউ যদি একবারে দুই তালাক দিয়ে বসে, তাহলে সে আয়াতের হুকুমের পরিপন্থী কাজ করল। এই কথার আর একটি দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ -

আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা হালাল করেছেন, তোমরা নিজেরাই তাকে হারাম করো না।
(সূরা মায়িদা ঃ ৮৭)

বাহ্যত এই কথা তিন তালাক দেয়াকে হারাম করে। কেননা তাতে আল্লাহ্‌র হালাল করা জিনিসকে হারাম করার কাজ হবে। আয়াতের এই সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ স্ত্রীদেরকেও শামিল করে, তার দলীল আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ 'অতএব তোমরা বিয়ে কর, যে নারীই তোমাদের ভালো লাগে।' এই সাধারণ কথাই তালাককে নিষিদ্ধ করে। কেননা স্ত্রী হালাল, তালাক দিলে তাকে হারাম করে দেয়া হয়। সুন্নাত তরীকায় তিন তালাক দেয়া এবং সঙ্গম করা হয়নি— এমন স্ত্রীকে এক তালাক দেয়া মুবাহ হওয়ার দলীল পাওয়া না গেলে উক্ত আয়াতই তা নিষিদ্ধ করে দিত। অন্য দিক দিয়ে কিতাবের দলীল এই পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা শুরুতে ইদ্দত পালন জরুরী হয় তাকে ফেরত নেয়ার কথা উল্লেখ ছাড়া তালাক দেয়াকে মুবাহ্ করেন নি। যেমন আল্লাহ্‌র কথা 'তালাক দুইবার, অতঃপর তাকে রাখা ..... আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তারা তিন কুরু কাল নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে'— আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, তারপরে ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন তাদেরকে ফিরিয়ে রাখ শুভ রীতিতে, না হয় ছেড়ে দাও শুভ রীতি অনুযায়ী। কিংবা তাদেরকে শুভ নিয়মে বিচ্ছিন্ন করে দাও।'

এই সব কয়টি আয়াতেই তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশের উল্লেখ রয়েছে। আর এ সব আয়াত থেকেই তালাকের বিধান গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব আয়াত না থাকলে ইসলামী শরীয়াতে তালাক আদৌ বিধিবদ্ধ হতো না। কাজেই তাকে 'মসনূন' প্রমাণ করা শুধু এই সব আয়াতের আলোকেই সম্ভব। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَدْخَلَ فِىْ اَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ -

আমার উপস্থাপিত শরীয়াতে যা নেই তাকে এর মধ্যে যে দাখিল করবে, সে-ই প্রত্যাহৃত হবে।

অবস্থার কম-সে-কম শব্দের বিবরণ হল— তা নিষিদ্ধ আয়াতের কথার পরিপন্থী। কেননা আয়াতে তালাকের উল্লেখই হয়েছে এমনভাবে, যাতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ রাখা হয়েছে।

এ পর্যায়ের হাদীসও উল্লেখ্য। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, কানবী, মালিক, নাফে ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন যখন তার হায়য চলছিল। এটা রাসূলে করীম (স)-এর সময়ের কথা। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলের করীম (স) কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে আদেশ কর, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে রেখে দেবে তার তুহর হওয়া পর্যন্ত। তারপর সে হায়য অবস্থার হবে, তার পরে আবার তার তুহর হবে। তখন যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে তাকে রেখে দেবে। আর ইচ্ছা করলে স্পর্শ করার আগেই তাকে তালাক দেবে। এর পর যে ইদ্দত পালন করতে হবে, সেই ইদ্দতের জন্যেই স্ত্রীদের তালাক দিতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে সালিহ্ আনবাসাতা, ইউনুস, ইবনে শিহাব, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন যখন তার হায়য চলছিল। হযরত উমর (রা) এই বিষয়ের উল্লেখ করেন রাসূলে করীম (স)-এর নিকট। শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হন। পরে বললেন, তাঁকে আদেশ কর, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে তাকে রেখে দেবে তুহর হওয়া পর্যন্ত। পরে হায়য হবে। তা থেকে তুহর হবে। তার পরে ইচ্ছা হলে রেখে দেবে। আর ইচ্ছা হলে তালাক দেবে।

আতাউল খুরাসানী আল-হাসান, ইবনে উমর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও আনাস ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনে যুবায়র, জায়দ ইবনে আসলাম, ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ করেছিলেন পরবর্তী তুহর পর্যন্ত রাখতে বলেছিলেন। পরে বলেছিলেন, তখন ইচ্ছা হয় তালাক দেবে, ইচ্ছা হয় রেখে দেবে।

প্রথমোক্ত হাদীসসমূহ উত্তম। কেননা তাতে বিস্তারিত ও বাড়তি কথা আছে। অবশ্য একথা জানা আছে যে, এই সব হাদীসই একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি ঘটনারই বহুবিধ বর্ণনা। বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ নবী করীম (স)-এর নিজের কথা উদ্ধৃত করেছেন। আবার কেউ কেউ তা বাদ দিয়ে বাড়তি কথাটুকুর উল্লেখ করেছেন, হয় অসতর্কতার কারণে, কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে। এরূপ অবস্থায় তা ব্যবহার করা যেতে পারে বাড়তি কথা পাওয়ার জন্যে যাতে হায়যের উল্লেখ আছে। কেননা সেই বাড়তি কথা বাদ দিয়ে শরীয়াতদাতা তার উল্লেখ করেছেন, আবার কখনও সেই কথাসহ উল্লেখ করেছেন, এমন কথা প্রমাণিত নয়। কেননা তাতে দুই অবস্থার কথা বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু তা আমাদের জানা নেই। অতএব তাকে দুই অবস্থার কথা মনে করা ঠিক নয়। তাছাড়া শরীয়াতদাতা নবী করীম (স) সেই কথাটি দুই অবস্থায় বলেছিলেন— এ কথা যদি মনে করা হয়, তাহলে বেশি কথা সম্পন্ন হাদীস সর্বাগ্রে বলা হয়েছিল— বলে ধরতে হবে। আর অন্যান্য কথা শেষের। ফলে এই শেষের

কথা মনসূখ করে দিয়েছে আগে বলা কথাকে। অথবা যে হাদীসে বেশি বাড়তি কথা নেই, তা আগে বলা কথা হবে। পরে বাড়তি কথা সম্পন্ন হাদীসসমূহে বলা হয়েছে বলে ধরতে হবে। তাহলে এগুলো আগেরগুলোকে মনসূখ করে দিয়েছে বলে মনে করতে হবে। বেশি কথা সম্পন্ন হাদীসই প্রতিষ্ঠিত থাকল। কিন্তু এই দুটির কোন একটি খবরও জানাবার কোন উপায় আমাদের হাতে নেই। হাদীসসমূহের সব বর্ণনাকারী একই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তার তারিখ যখন আমাদের জানা নেই, তখন বাড়তি কথার হাদীস গ্রহণ করাই কর্তব্য দুটি কারণে। একটি, যে কোন দুইটি জিনিসের তারিখ জানা না গেলে দুটিকেই এক সাথে গ্রহণ করা কর্তব্য। একটিকে অপরটির আগে বা পরে মনে না করাই বাঞ্ছনীয়।.... যেমন এক ব্যক্তির দুটি ক্রয়, যখন দুটিরই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে এবং সে দুটির তারিখ জানা না যাবে, তখন সে দুটি এক সাথে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হবে। এই দুই ধরনের হাদীসের ব্যাপারেও এই নীতি গ্রহণীয়। আমাদের বুঝতে হবে, উভয় ধরনের হাদীস একসাথেই প্রকাশিত হয়েছিল। কেননা দুটির তারিখ জানা যায়নি, তাই বাড়তি কথা সহ উভয়কে একত্রিত করে হুকুম প্রমাণ করতে হবে।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাড়তি কথা শরীয়াতদাতা নবী করীম (স) বলেছেন, তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমাদেরকেও আদেশ করেছেন তা গণ্য করার জন্যে। বলেছেন ঃ

مُـرْهُ فَلْيَدَعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اِنْ شَاءَ -

তাকে হুকুম কর, সে তাকে রেখে দেবে তুহর হওয়া পর্যন্ত, তার পরে তার হায়য হবে, তার পরে তুহর হবে। তখন ইচ্ছা করলে সে যেন তালাক দেয়।

এই সব হাদীস সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একথা যখন প্রমাণিত স্থিরকৃত হল যে, এই সহ হাদীস একই সময়ের, সেই এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, যেসব বর্ণনায় বাড়তি কথা নেই— তা মনসূখ হয়ে গেছে, সেই সাথে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তা মনসূখ হয়নি, তখন এখানে মনসূখ হওয়ার কথাটাই বাদ দেয়া উচিত। কেননা সেটা নিছক সম্ভাব্যতার কথা। কাজেই বাড়তি কথা সম্পন্ন বর্ণনাসমূহের হুকুম বহাল আছে বলে মনে করতে হবে। একথা যখন প্রমাণিত হল, শরীয়তদাতা নবী করীম (স) হায়য অবস্থায় সজ্ঘটিত তালাক ও অন্যান্য তালাকের মধ্যে পার্থক্য করার আদেশ করেছেন, সেই হায়যের পরবর্তী তুহরেও তালাক দিতে নিষেধ করেছেন, তখন প্রত্যেক দুই তালাকের মাঝে এক হায়য কালের পার্থক্য করা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। একই তুহরে দুটোকে একত্রিত করা জায়েয নয়। কেননা নবী করীম (স) তুহরে তালাক দিতে হুকুম করেছেন, হায়যে তালাক দিতে নিষেধ করেছেন, সেই সাথে নিষেধ করেছেন সেই তুহরে তালাক দিতে, যা তালাক দেয়া হায়যের পরেই আসছে। অথচ এই দুই তুহরের মধ্যে আসলে কোনই পার্থক্য নেই।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, এক তুহরে তালাক দিলে, পরে সেই তুহরেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে তার জন্যে সেই তুহরেই আর এক তালাক দেয়া জায়েয। তাতে বিরুদ্ধতা হয়ে গেল সেই জিনিসের যার তাগিদ করতে তুমি চেয়েছ হাদীসে বলা বাড়তি কথা সম্পর্কে।

জবাবে বলা যাবে, ফিকহর 'উসূলে' আমরা উল্লেখ করেছি, সেই তুহরেই দ্বিতীয়বার তালাক দেয়া নিষিদ্ধ। যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেও। যেন দুই তালাকের মাঝে এক হায়য দ্বারা পার্থক্য করা হয়। এটাই সহীহ কথা। অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী কাজ করা হয় না।

নবী করীম (স) থেকে তিন তালাক একত্রিত করা নিষিদ্ধ হয়েছে এমনভাবে যে, তাতে কোন নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গের হাদীসটি নাফে মুহাম্মাদ ইবনে শাযান আল-জাওহারী, মুয়াল্লা ইবনে মনসূর, সাঈদ ইবনে জুরাইক, আতা-আল খুরাসানী, আল-হাসান আবদুল্লাহ ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় এক তালাক দিয়েছিলেন, পরে অবশিষ্ট দুই কুরুতে দুই তালাক দেবার ইচ্ছা করেছিলেন, এই কথা রাসূলে করীম (স) জানতে পারেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে ইবনে উমর, এরূপ করতে আল্লাহ তোমাকে আদেশ করেননি। তুমি তো সুন্নাত তরীকার খেলাফ করে বসেছ। সুন্নাত তরীকা হল, তুমি তুহর সামনে রাখবে। তারপরে প্রত্যেক কুরুতে এক তালাক দেবে। রাসূলে করীম (স) আমাদের আদেশ করলেন, আমি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম। বললেন, যখন তার তুহর হবে, তখন তুমি তাকে তালাক দাও কিংবা স্ত্রী হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত কর। আমি বললাম, হে রাসূল! আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমি যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিতাম, তাহলে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন পথই কি আমার জন্যে খোলা থাকত ? বললেন, না। সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তখন ফিরিয়ে নেয়া গুনাহের কাজ হতো।

এই হাদীসে নবী করীম (স) একটি আইন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর তা হচ্ছে, একত্রে তিন তালাক দেয়া গুনাহ।

যদি প্রশ্ন করা হয়, ইবনে উমর (রা) সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসে তুহরকে সুন্নাত তালাক দেয়ার সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন, অতঃপর ইচ্ছা করলে তালাক দেবে। তাতে কম সংখ্যক তালাক থেকে তিন তালাককে বিশেষীকৃত করেন নি। ফলে তাকে দুই ও তিন তালাক একসঙ্গে দেয়া অবকাশ তো থেকে যায়।

জবাবে বলা যাবে, পূর্বে যা বলেছি, তাতে দুই তালাকের মাঝে এক হায়য দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করা কর্তব্য প্রমাণিত হয়েছে। তার সাথে যোগ করা হয়েছে এই কথা ঃ 'অতঃপর ইচ্ছা করলে তালাক দেবে।' এ থেকে আমরা জানলাম যে, আসলে তিনি এক তালাকের কথাই বলেছেন, তার বেশী নয়। কেননা তিনি নিজেই শুরুতে দুই তালাকের মধ্যে পার্থক্য করার যে উক্তি করেছেন, তা নিজেই মনসূখ করে দিয়েছেন, এটা অসম্ভব কথা। তাছাড়া দুই তালাককে একত্রিত করার নিষেধ তো রয়েছেই। আর একই কথার কোন অংশ অপর অংশকে মনসূখ করে দেবে, তা সঙ্গত হতে পারে না। কেননা মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন আসে তখন, যখন একটা হুকুম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজে পরিণত হয়। এইভাবে কোন কথা বলা যে, 'আমি তোমাদের জন্যে দাঁতধারী হিংস্র জন্তু খাওয়া হালাল করে দিলাম। অথচ আমি তা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছি।'— কিছুমাত্র স্বাভাবিক নয়। কেননা এ ধরনের কথা নিতান্তই প্রলাপ, অর্থহীন। আল্লাহ্ এ থেকে পবিত্র।

এ কথা যখন প্রতিষ্ঠিত হল, আমরা জানলাম, রাসূলের কথা ঃ 'অতঃপর চাইলে তালাক দেবে' কথার শুরুতে যে হুকুমটি রয়েছে, তারই উপর ভিত্তিশীল। আর তা হল, এক তুহরে দুই

তালাক একত্রিত করবে না। উপরন্তু এক তুহরে দুই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ হওয়া যদি ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা প্রমাণিত না-ই হয়, তবু তা থেকে তা মুবাহ প্রমাণিত হয় না। যেহেতু তা নিঃশর্ত ও পূর্ব কথার উল্লেখশূন্য হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা রাসূলের কথা 'পরে চাইলে তালাক দেবে' এক তালাকের বেশি দেয়ার অবকাশ দেয় না। আদেশসমূহের অনেক দৃষ্টান্ত এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি, শব্দ যা শামিল করে তার কম-সে-কম জিনিসই ধরতে হবে। অবশ্য কোন দলীল পাওয়া গেলে বেশি সংখ্যা ধরা যাবে। যেমন যদি কেউ অন্য এক ব্যক্তিকে বলে ঃ 'তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও', তাহলে এই আদেশ বলে তার মাত্র এক তালাক দেয়ারই অধিকার হবে, তার বেশি নয়। কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে বলে ঃ 'বিয়ে কর', তাহলে একটি মেয়েলোক বিয়ে করারই তার অধিকার হবে— তখন যদি সে দুটি মেয়েলোক বিয়ে করে, তার একটি বিয়ে নাজায়েয হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মনিব যদি বলে যে, আমি দুটি মেয়ে বিয়ে করার কথাই বলেছি, তাহলে তা জায়েয হবে। রাসূলের কথা ঃ 'সে চাইলে তালাক দেবে' এই ধরনেরই একটি কথা। এখানেও এক তালাকের বেশি হওয়ার অবকাশ নেই। তার বেশি হলে, তা কোন দলীলের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হতে পারে। কুরআন ও সুন্নাত থেকে এখানে আমরা যেসব দলীলের কথা বললাম, তা সবই তিন ও দুই তালাক একত্র করে একবাক্যে দেয়া নিষেধ ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে আগের কালের মনীষিগণও সম্পূর্ণ একমত।

এ পর্যায়ের একটি বর্ণনা উল্লেখ্য, যা আমাশ আবূ ইসহাক, আবূল আহওয়ায আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

طَلَاقُ السُّنَّةِ اَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِيْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَاِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا اُخْرٰى -

সুন্নাতকারীর তালাক হচ্ছে, স্ত্রীর তুহরে— যখন সঙ্গম হয়নি— এক তালাক দেবে। পরে হায়য হয়ে আবার তুহর হলে তখন আর এক তালাক দেবে।

ইবরাহীম নখয়ীও এই কথাই সমর্থন করেছেন। জুহায়র আবূ ইসহাক, আবূল আহওয়ায, আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ যে লোক প্রকৃতপক্ষেই তালাক দিতে ইচ্ছা করে. সে প্রত্যেক তুহরে— যখন সঙ্গম হয়নি— তালাক দেবে। পরে ইচ্ছা হলে তাকে ফিরিয়ে নেবে, সে কাজে দুজন সাক্ষী রাখবে। দ্বিতীয় তালাক দেবে পরবর্তী বারে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক দুইবার-এর এটাই তাৎপর্য।

ইবনে সিরীন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ লোকেরা যদি ঠিকভাবে একটি তালাক দিতে পারে, তাহলে তালাক দেয়া স্ত্রীর নিকট তাকে লজ্জিত হতে হবে না, যদি তার তুহর অবস্থায় ও সঙ্গম না করে তালাক দেয়। কিংবা যদি গর্ভবতী হয়, এমন যে, তার গর্ভ প্রকাশমান হয়ে পড়েছে। এরূপ তালাক দিলে ইচ্ছা হলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর ইচ্ছা হলে তার চলে যাওয়ার পথ ছেড়ে দেবে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, হুমায়দ, ইবনে মুসয়িদাতা, ইসমাঈল, আয়ূব, আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। বলল, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এই কথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) চুপ করে থাকলেন। তখন মনে হল, তিনি বুঝি

মেয়েলোকটিকে সেই ব্যক্তির নিকট ফিরিয়ে দেবেন। তার পরে বললেন, তোমার এক একজন তালাক দাও, তার পরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ে। তার পর এসে 'হে ইবনে আব্বাস— হে ইবনে আব্বাস বলে চিৎকার করে।' অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا –

যে লোক আল্লাহ্কে ভয় করবে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।

আর তুমি যেহেতু আল্লাহ্কে ভয় করনি, এজন্যে আমি তোমার জন্যে কোন পথ পাচ্ছি না। তুমি তোমার রব্ব-এর নাফরমানী করেছ। ফলে তোমার স্ত্রী তোমার নিকট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ –

হে নবী! তুমি যদি তোমার স্ত্রীদের তালাক দাও, তাহলে তালাক দেবে তাদের ইদ্দত পালনের ব্যাপারটি সামনে রেখে। (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)

অর্থাৎ তালাক দেবে। আর তার পরে তাদের ইদ্দত পালন হবে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই তাদের ফিরিয়ে নেবে।

ইমরান ইবনে হুসায়ন থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি পাপ করেছ এবং তোমার নিজের হালাল স্ত্রীকে নিজের জন্যে হারাম বানিয়েছ।

আবূ কালাবা বলেছেন, ইবনে উমর (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, এই কাজ যে করেছে সে মহাক্ষতির কাজ করেছেন। ইবনে আওনা আল হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, যে লোক একই বৈঠকে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, লোকেরা তাকে ঘায়েল করত। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট যখন এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হতো, যে তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছে, তাকে মারধোর করে ব্যথাগ্রস্ত করে দেয়া হতে এবং তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতেন।

এই সাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত হল যে, তিন তালাক একত্রিত করা নিষিদ্ধ। একজন সাহাবীও এর বিপরীত মত দেন নি। অতএব এর উপর ইজমা হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, একথা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন রোগাক্রান্ত অবস্থায়। সেজন্যে তাঁকে কোন দোষ দেয়া হয়নি। একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া যদি নিষিদ্ধই হতো, তাহলে তিনি তা নিশ্চয়ই করতেন না, তার এ কাজের প্রতিবাদ না করেও ছাড়া হতো না। এই কথা প্রমাণ করে যে, তাঁরা এ কাজ সঙ্গতই মনে করেছেন।

জবাবে বলা যাবে, যে হাদীসের তুমি উল্লেখ করেছ তাতে এবং অন্য কোথাও একথা নেই যে, তিনি একই বাক্যে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তিনি শুধু ইচ্ছা করেছিলেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেবেন জায়েয পদ্ধতিতে। তাঁর সম্পর্কে এই কথা এক সমষ্টি বর্ণনাকারীদের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা তা বর্ণনা করেছেন জুহরী তালহা ইবনে আবদুল্লাহ

ইবনে আওফ সূত্রে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার খিটখিটে মেজাজের স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছেন। পরে তাকে তিনি রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই বলেছেন, তুমি যদি তোমার তুহর হওয়ার খবর আমাকে দাও, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই আরও তালাক দেব।

এ হাদীস স্পষ্ট করে বলছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেন নি। ফাতিমা বিনতে কায়স সংক্রান্ত হাদীসেও এই ধরনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মূসা ইবনে ইসমাঈল, আবান ইবনে ইয়াজীদুল আত্তার, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর, আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা বিনতে কায়স তাঁকে বলেছেন যে, আবূ হাফস ইবনুল মুগীরা তাঁকে তালাক দিয়েছেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও বনু মখজুমের কতিপয় ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর নিকট এসে বলেছেন যে, হে আল্লাহ্র নবী। আবূ হাফস তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন এবং তার জন্যে খুব সামান্য 'নফকা' রেখে গেছেন। জবাবে নবী করীম (স) বলেছেন, সে 'নফকা' পাবে না। এই হাদীসের দলীল নিয়ে লোকেরা বলেছেন যে, একসাথে তিন তালাক দেয়া জায়েয। কেননা সে লোকেরা নবী করীম (স)-কে তিন তালাক দেয়ার খবর দিয়েছেন; কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেন নি।

এ হাদীসের কথাগুলো অ-বিস্তারিত। অন্যান্য বর্ণনায় বিস্তারিত কথা এসেছে। একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, ইয়াযীদ ইবনে খালিদ, আর-রমলী, লাইস, আকীল, ইবনে শিহাব, আবূ সালমা, ফাতিমা বিনতে কায়স সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবূ হাফস ইবনুল মুগীরার বিবাহিতা ছিলেন। আর আবূ হাফস ইবনুল মুগীরা তাঁকে তিন তালাকের শেষ তালাকটিও দিয়েছেন। পরে তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার সংকল্প করলেন। এভাবে হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে। আবূ দাউদ তা বলেছেন। সালিহ ইবনে কায়সান, ইবনে জুরাইজ, শুয়ায়ব ইবনে আবূ হামযা— এরা সকলেই জুহরী থেকে এরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। পূর্বোদ্ধৃত হাদীসে যে কথা মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে, এ হাদীসটিতে তা বিস্তারিত বলা হয়েছে। স্পষ্ট কথা হচ্ছে, তিনি তিন তালাকের শেষটি দিয়েছেন। এতে হাদীসের মধ্যে নিহিত প্রকৃত তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, তাতে তিন তালাকের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তা একসঙ্গে দিয়েছেন— এমন কথার উল্লেখ নেই। অতএব বুঝতে হবে, তিনিও তিন তালাকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দিয়েছেন। এই শেষোক্ত হাদীসের এটাই তাৎপর্য। এখানে কুরআন ও হাদীস থেকে যে সব দলীল উল্লেখ করা হল, তা থেকে এবং আগের কালের মনীষীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হল যে, তিন তালাক একত্রিত করে দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যদি বলা হয়, উপরে আমরা দলীল হিসেবে আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাক দুইবার' উল্লেখ করেছি, যদ্দারা প্রমাণ করেছি যে, একটি বাক্যে একত্রিত করে দুই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ। তা সেই কথাই প্রমাণ করে, যেমন করে তুমি উল্লেখ করেছ। তা-ই এই কথার-ও দলীল যে, এক তুহরে দুইবার তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা আয়াতটিতে দুই তুহরে আলাদা করে দুই তালাক দেয়ার কথা নেই। তাহলে দুইবারে দুই তালাক দেয়া যেতে পারে। তা-ই প্রমাণ করে যে, একই তুহরে দুই তালাক আলাদা করে দেয়া মুবাহ। একই তুহরে যখন তা জায়েয, তখন একটি শব্দে তা একত্রিত করাও অবশ্যই জায়েয হবে। এ দুটির মধ্যে তো কেউ-ই পার্থক্যের কথা বলেন নি।

জবাবে বলা যাবে, একথা ভুল এ হিসেবে যে, তা শব্দের হুকুমটি প্রত্যাহার করে, তাকে তুলে ফেলে। তার ফায়দা দূর করে দেয়। আর যে কথা শব্দের হুকুমকে উৎখাত করে, তা-ই প্রত্যাহৃত। শব্দের ফায়দা ফেলে দেয় এজন্যে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক দুইবার' দাবি করে দুই তালাককে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার এবং একটি শব্দে দুইটিকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ হওয়ার— পূর্বে যেমন বলেছি। আর একই তুহরে ভিন্ন ভিন্ন করে দুই তালাক দেয়া মুবাহ হলে একই কথায় সেদুটিকে একত্রিত করাও মুবাহ হয়ে দাঁড়ায়। আর তাতেই কুরআনে বলা কথার ব্যতিক্রম ঘটে। আর একই তুহরে দুটি তালাক ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া ও একত্রিত করে দেয়াকে নিষিদ্ধ করলে এবং দুই তুহরে তা দেয়া মুবাহ মনে করলে শব্দের দাবি অগ্রাহ্য করা হয় না। বরং তাকে কাজে লাগানো হয় বিশেষভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে। কাজেই দুই তুহরে দুই তালাক দিলে তার হুকুম অগ্রাহ্য করা হয় না। বরং তাকে বিশেষীকরণ কর্তব্য হয়। কেননা ব্যবহৃত শব্দই দুই তালাককে বিচ্ছিন্ন করতে বলে। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, যখন বিচ্ছিন্ন করা কর্তব্য হয়, তখন দুই তুহ্‌রে দুই তালাককে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তাই আমরা একই তুহরে দুই তালাককে বিচ্ছিন্নকরণকে বিশেষীকৃত করলাম। শব্দের হুকুম কাজে লাগানো সহকারে সকলেরই ঐকমত্যের ভিত্তিতে একই তুহরে ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়াকে মুবাহ করা হলে তাতে শব্দের হুকুমটা সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। ফলে তালাক দুইবার বলা না বলা সমান হয়ে যায়।

অথচ এই কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

যাঁরা তাকে মুবাহ মনে করেছেন, তাঁরা একটি হাদীসকে দলীল বানিয়েছেন। হাদীসটি উয়াইমির আল-আজলানী বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন তার ও তার স্ত্রীর 'লেয়ান' কার্যকর করে দিয়েছিলেন। পরে দুইজন 'লেয়ান' থেকে নিষ্কৃতি পেলে উয়াইমির বললেন, আমি তার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছি যে, আমি যদি তাকে স্ত্রী বানিয়ে রাখি, তাহলে সে তিন তালাক। তাদের দুজনের মধ্যে নবী করীম (স) বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, তার পূর্বেই উয়াইমির স্ত্রীকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। শরীয়াতের বিধানদাতা নিজেই যখন একসাথে তিন তালাক দেয়াকে অগ্রাহ্য করেন নি, তখন বোঝা গেল, তা মুবাহ।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর পক্ষে এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা সহীহ হতে পারে না। কেননা তাঁর মাযহাব হচ্ছে, স্বামীর 'লেয়ান'-এর কারণে সঙ্ঘটিত বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল স্ত্রীর 'লেয়ান'-এর পূর্বেই। ফলে স্ত্রীর বায়েন তালাক হয়েছিল। তার সাথে অপর কোন তালাক মিলিত হয়নি। তাহলে যে তালাক দেয়া হয়নি, তার জন্যে প্রতিবাদ করার প্রশ্ন কিভাবে উঠতে পারে ? তার হুকুমও প্রমাণিত হয়নি ?

যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তোমার মাযহাবে তার কারণটা কি ? জবাবে বলা যাবে, এটা সম্ভব যে, তা ইদ্দতের জন্যে তালাক দেয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তা হয়েছিল এবং একই তুহরে তালাকসমূহকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তা ঘটেছিল। এই কারণে শরীয়াতদাতা নবী করীম (স) তা অগ্রাহ্য করেন নি। এ-ও হতে পারে যে, তালাক ছাড়া অন্য কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল। তাই তালাক দ্বারা তা ঘটানোকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। তবে যিনি বলেছেন, সুন্নাত তালাক হচ্ছে শুধু এক তালাক দেয়া, তা আমরা মালিক ইবনে

আনাস, লাইস, আল হাসান ইবনে হাই ও আওজায়ীর মতরূপে উল্লেখ করেছি। ভিন্ন ভিন্ন তুহরে তিন তালাক দেয়া মুবাহ যে দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -

তালাক মাত্র দুইবার। তৃতীয়বারে হয় শুভভাবে তাকে রাখবে, না হয় সদয়ভাবে তাকে চলে যেতে দেবে।

এ আয়াতে দুই তালাক দেয়া মুবাহ প্রমাণিত হয়। আর আমরা যখন একমত হয়েছি এ জন্যে যে, একই তুহরে সে তালাক দুটি দেয়া হবে না, তখন তার দুইটি নাম দুই তুহরে ব্যবহার করা কর্তব্য।

اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ 'অথবা সদয়ভাবে তাকে চলে যেতে দেবে'— আল্লাহ্‌র এই কথার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা তৃতীয় তালাকের কথা। স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তিনটি তালাকই দিয়ে দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

এই কথাটি আল্লাহ্‌র এই কথার দ্বারাও প্রমাণিত হয় ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -

হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তোমরা তাদেরকে তালাক দেবে তাদের ইদ্দতের জন্যে। (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)

ইদ্দতের জন্যে তিন তালাক ঘটানোর কথা এর মধ্যে রয়েছে। কেননা একথা জানা আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ইদ্দতের সময়কে লক্ষ্য করে তালাক দাও। শরীয়াতদাতা এই কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিজের এই কথার দ্বারা যে, স্ত্রীকে তালাক দেবে তার তুহর অবস্থায়, যখন সঙ্গম করা হয়নি, অথবা গর্ভবতী অবস্থায়, যখন তার গর্ভ প্রকাশমান হয়েছে। এই ইদ্দতের জন্যে স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার আদেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলা। আসলে তুহরের সময়ে তালাক দেয়ার কথাই বলা হয়েছে। তাই তিন তালাককেও শামিল করেছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ -

তোমরা নামায কায়েম কর সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার কারণে।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮)

এ থেকে বোঝা গেছে যে, যখন যখনই সূর্য মধ্যাকাশ থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়বে, তখন তখনই নামায কায়েম করতে হবে। এটা প্রত্যেক দিন— সমস্ত দিনের জন্যে পালনীয় হুকুম। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও এরূপ ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 'তালাক দাও ইদ্দতের জন্যে।' তুহরের সময়ের কথা বলাই এর উদ্দেশ্য। তাই যখনই তুহর হবে, তখনই তালাক দিতে হবে। উপরন্তু প্রথম তুহরে যখন তালাক দেয়া জায়েয— কেননা সেই তুহরে তার সাথে সঙ্গম করা হয়নি, তখন দ্বিতীয় তুহ্‌রে আর এক তালাক দেয়া জায়েয ঠিক এই কারণেই। সকলেই একমত এই বিষয়ে যে, যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয় তুহরে আর একটি তালাক দেয়াও জায়েয যদি তাকে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা না হয়। কেননা দ্বিতীয় তুহরে সেই তাৎপর্যই পাওয়া

গেছে, যার দরুন প্রথম তুহরে তালাক দেয়া জায়েয হয়েছিল। কেননা তালাক দেয়া মুবাহ হওয়ার সাথে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তা নিষিদ্ধও নয়। কেননা যদি স্ত্রীকে তখন ফিরিয়ে নেয়া হয়, তারপর তার সাথে সঙ্গম করা হয় সেই তুহরেই, তাহলে সেই তুহরেই আবার আর এক তালাক দেয়া জায়েয হবে না। তা মুবাহ হওয়ার উপর ফিরিয়ে নেয়ার কোন প্রভাব নেই। কাজেই দ্বিতীয় তুহরে তালাক দেয়াই কর্তব্য ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বে। যেমন করে তা জায়েয হতো যদি তাকে ফিরিয়ে নেয়া না হয়।

যদি বলা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের কোন ফায়দা নেই। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে 'বায়েন' করে দিতেই চায়, তাহলে সেই একটি তালাক দ্বারাই তা সম্ভব। সম্ভব এভাবে যে, এক তালাক দিয়ে রেখে দেবে, ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে সে স্বতঃই 'বায়েন' হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَتَّخِذُوٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا -

তোমরা আল্লাহ্র আয়াতকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত কর না।

(সূরা বাকারাহ ঃ ২৩১)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক মুবাহ্ হওয়ায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিক, কি না-ই নিক, এর মধ্যে পার্থক্যের এটাই কারণ। ফিরিয়ে না নিলে পরের দুটি তালাক একেবারে বেহুদা হয়ে যায়।

জবাবে বলা যাবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দেয়ার বহু ফায়দা আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক না দিলে তা লাভ করা যায় না। তৃতীয় তালাক দেয়ার দ্বারা ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই যদি স্ত্রী সম্পূর্ণ 'বায়েন' হয়ে যায়, তাহলে তার স্বামী এই সময়ে মরে গেলে তার মীরাস থেকে সে বঞ্চিত হবে। অথবা এই সময়ে যদি তার বোনকে বিয়ে করে কিংবা তাকে বাদ ধরে যদি আরও চারজনকে বিয়ে করে, তাহলে তার প্রাপ্য থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। ইদ্দত পালনকালে ও শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই এসব ঘটলে তা-ই হবে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের মতে এই কথা। তাহলে বোঝা গেল— এক তালাক দ্বারা বায়েন করার পরিবর্তে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক যথারীতি দেয়া হলে অনেক ফায়দা আছে তাতে। অনেক হক আছে যা স্বামী লাভ করতে পারে। কাজেই তা নিরর্থক ও ফায়দাশূন্য নয়। এই কারণেই অপর দুটি তালাক সুন্নাত সময়ে দেয়ার অবকাশ রাখা হয়েছে। স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেও তা জায়েয।

পুরুষদের দেয়া তালাকের ব্যাপারে মতপার্থক্য

আবূ বকর (র) বলেছেন, বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের আগের কালের ও পরবর্তী কালের লোকেরা একমত হয়েছেন এই বিষয়ে যে, ক্রীতদাস স্বামী স্ত্রী 'তালাক দুইবার, অতঃপর হয় শুভভাবে রাখা হবে, না হয় দয়াস্বরূপ চলে যেতে দেয়া হবে' আল্লাহ্র এই কথার মধ্যে শামিল নয়। অর্থাৎ এই কথা তাদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। তাঁরা সব এ বিষয়ে একমত যে, দাসত্ব তালাক সংখ্যা হ্রাস করার জরুরী কারণ। হযরত আলী ও আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ 'মেয়েলোক যদি স্বাধীনা হয়, তাহলে তার তালাক সংখ্যা তিন, তার স্বামী স্বাধীন হোক; কি ক্রীতদাস হোক। আর সে যদি ক্রীতদাসী হয়, তাহলে তার জন্যে দুই তালাকই সম্পূর্ণ, তার

৩০-

স্বামী স্বাধীন হোক, কি ক্রীতদাস।' ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, জুফর, মুহাম্মাদ, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহর-ও এই মত। উসমান, জায়দ ইবনে সাবিত ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, পুরুষদের তালাক বলতে বোঝায়, স্বামী যদি দাস হয়, তাহলে তার প্রাপ্য তালাক সংখ্যা তিন, স্ত্রী স্বাধীনা কিংবা দাসী— যা-ই হোক। ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর এই মত। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-ই দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী হবে, তার প্রাপ্য তালাক সংখ্যা কম হবে তার এই দাসত্বের কারণে। উসমান আল-বত্তীরও এই কথা। হুশায়ম মনসূর ইবনে জাহান, আতা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তালাক দানের ব্যাপারটা মনিবের হাতে। দাস তার অনুমতি দিক আর না-ই দিক। এর দলীল হিসেবে তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ -

আল্লাহ মনিবের মালিকানাধীন দাসকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন, সে কোন কিছুই করতে সক্ষম নয়। (সূরা আন-নহল ঃ ৭৫)

হিশাম আবুয-যুবায়র, আবূ মাবাদ মাওলা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাসের একটি দাস ছিল। সে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছিল। ইবনে আব্বাস তাকে বললেন, তুমি তাকে ফিরিয়ে আন। তোমার কোন মা নেই। কেননা তোমার কিছুই করবার নেই। সে তা করতে অস্বীকার করে। তখন তিনি বললেন, 'সে তো তোমারই, অতএব তাকে গ্রহণ কর।' এই কথা প্রমাণ করে যে, তিনি মনে করেছেন, তার তালাক কার্যকর হবে। যদি তা না হবে, তাহলে তাকে 'তুমি তাকে ফিরিয়ে আন' বলতেন না। 'সে তোমারই' একথা প্রমাণ করে যে, সে ক্রীতদাসী ছিল। এ-ও হতে পারে যে, গোলাম স্বাধীন হবে। কেননা তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনই মনিবের মালিকানাধীন গোলাম হতো, তাহলে তাদের দাসত্ব তালাক সংখ্যা কমিয়ে দেবে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই।

এই পর্যায়ে একটি হাদীস রয়েছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাসের তালাকের কোন গুরুত্ব নেই। নবী করীম (স) থেকে হাদীসটি বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, জুহায়র ইবনে হরব, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আলী ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, উমর ইবনে মাতাব তাকে জানিয়েছেন, বনু নওফলের মুক্ত করা দাস আবূ হাসান তার অধীন এক দাস সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের নিকট ফতোয়া চেয়েছিলেন। সে তার দাসীকে দুই তালাক দিয়েছে। পরে তিনি দুজনকেই মুক্ত করে দিয়েছেন। এক্ষণে এই ঘটনার পর তিনি তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারেন কিনা ? জবাবে বললেন, হ্যাঁ, রাসূলে করীম (স) এরূপ রায়ই দিয়েছেন। আবূ দাঊদ বলেছেন, আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন বলে শুনেছি, আবদুর রাযযাক বলেছেন, ইবনুল মুবারক উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কোন আবূ হাসান ? সে তো এক বিরাট পাথর ধারণ করে বসেছে। আবূ দাঊদ বলেছেন, এই আবূ হাসান সেই ব্যক্তি, যার নিকট থেকে জুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বড় ফিকাহবিদদের একজন ছিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, ইজমা এই হাদীসটিকে রদ করে দিয়েছে। কেননা ইসলামের প্রাথমিক কালের এবং তাঁদের পরবর্তী সময়ের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই

যে, স্বামী স্ত্রী দুজনই যদি কারোর মালিকানাধীন দাস-দাসী হয়, তাহলে তারা পরস্পরে দুই তালাকের মাধ্যমেই হারাম হয়ে যাবে। অপর এক স্বামী গ্রহণের পূর্বে তারা দুইজন পরস্পরের জন্যে হালাল হবে না।

তালাক যে স্ত্রীর অবস্থার দৃষ্টিতে দিতে হবে, এ কথা প্রমাণ করে নবী করীম (স) থেকে ইবনে উমর ও আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির কথা হল ঃ

طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ –

দাসীর তালাক দুই আর তার ইদ্দত দুই হায়য।

এই হাদীসের সনদ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ইদ্দতের মিয়াদ কম হওয়ার ব্যাপারে এই দুটি হাদীসকে ব্যবহার করেছে, যদিও তার সূত্র খবরে ওয়াহিদের। কিন্তু তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত। কেননা যে খবরে ওয়াহিদ উম্মতের ব্যাপক জনতা কবুল করে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়, বিভিন্ন প্রসঙ্গে একথা আগেও বলেছি। দাসীর ইদ্দত দুই হায়য, তার স্বামী স্বাধীন হোক, কি দাস— এ ব্যাপারে শরীয়াতদাতা কোন পার্থক্যের কথা বলেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তালাক হবে স্ত্রীর মর্যাদা অনুযায়ী, স্বামীর মর্যাদা অনুযায়ী নয়।

এর আর একটি দলীল হল, সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, দাসত্ব তালাকের সংখ্যা কম করে যেমন 'হদ্দ'কে মাত্রায় কম করে। 'হদ্দ' কার্যকর করার ব্যাপারে বিবেচিত হবে কার উপর কার্যকর করা হচ্ছে। সে যদি দাস বা দাসী হয়, তাহলেও তার মাত্রা কম হবে। সে ভাবেই দাসীর তালাকের সংখ্যা কম হবে যাকে তালাক দেয়া হচ্ছে সে যদি দাসী হয়। তার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিন তালাক কার্যকর করা যাবে না মসনূন তরীকায়। স্বামী স্বাধীন হলে আর তার স্ত্রী দাসী হলে এরূপ বিধানই হবে। কেননা বিভিন্ন তুহরে তার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিন তালাক দিতে গেলে তৃতীয় তালাকটি দেয়া যাবে না কোন ক্রমেই। স্বামী তিন তালাকেরই মালিক, এই কারণে মসনূন তরীকায় সে ভিন্ন ভিন্ন করে তা কার্যকরও করতে পারে, যেমন স্ত্রী যদি স্বাধীনা হয়, তাহলে তা হতে পারে। এতেই দলীল রয়েছে এই কথার যে, স্ত্রী দাসী হলে তার স্বামী তিন তালাকের মালিক নয়।

এক সাথে তিন তালাক দেয়ার দলীল প্রমাণ

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক দুইবার, তৃতীয় বারে হয় স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখা হবে, না হয় দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া হবে।

প্রমাণ করে যে, একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া যেতে পারে, যদিও তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তা এইজন্যে যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক দুইবার' তার হুকুম স্পষ্ট করে দেয় যখন দুই তালাক দেয়া হয় এই হলে ঃ তুমি তালাক, তুমি তালাক এবং তা এক তুহরে বলা হয়। পূর্বেই বলেছি যে, এরূপ তালাক দেয়া সুন্নাতের খেলাফ। আয়াতের মূল বক্তব্যে যখন এক সাথে দুই তালাক দেয়া জায়েয হওয়ার অবকাশ রয়েছে ঠিক এই দলীলের ভিত্তিতে তখন এ দুটি তালাক একসঙ্গে দেয়াও সহীহ প্রমাণিত হবে। কেননা কেউ-ই এই দুইটির মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেন নি।

অন্য দিক দিয়েও একথা প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ -

সে স্ত্রী সে স্বামীর জন্যে অতঃপর হালাল থাকবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বাদে অপর স্বামী গ্রহণ করছে।

অর্থাৎ স্ত্রী হারাম হয়ে গেল দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দেয়ায়। তা একই তুহরে দেয়া হোক, কি বিভিন্ন তুহরে— তার মধ্যে কোন পার্থক্য হয়নি। তাহলে সব কয়টি তালাক দেয়া জায়েয হয়ে গেল যে ভাবেই দেয়া হোক। মসনূনভাবে দেয়া হোক কিংবা তার বিপরীত হোক। তা মুবাহ হোক, কি হোক নিষিদ্ধ।

যদি প্রশ্ন করা হয়, উপরোদ্ধৃত আয়াতের তাৎপর্য আগেই বলে এসেছ যে, এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে পছন্দনীয় ও নির্দেশিত তালাক পদ্ধতি। কিন্তু একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া তো তোমার মতেই সুন্নাতের খেলাফ। তা হলে সেই আয়াতকেই দলীল বানিয়ে বলতে পার যে, মুবাহ তরীকার বিপরীতে তালাক দেয়া যায়। আয়াতে এই দিকটি তো সমন্বিত নয়।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতে এই সব অর্থই সমন্বিত রয়েছে, সুন্নাতের বিপরীত পন্থায় দুই বা তিন তালাক দেয়ার অবকাশ আছে। পছন্দনীয় ও বিভিন্ন তুহরে তা ভিন্ন ভিন্ন করে দেয়া ইত্যাদি। সব-ই আয়াতের বক্তব্য হতে পারে। যেমন যদি কেউ বলে, 'তোমরা বিভিন্ন তুহরে তিন তালাক দাও।' তখন যদি তোমরা সব তালাক একসঙ্গে দিয়ে দাও, তাহলে তা কার্যকর হবে। তা জায়েয। যদিও দুটি অর্থ পরস্পর বিপরীত নয় এবং আয়াতেও এ দুটির অবকাশ রয়েছে। তাই সেইভাবেই তা গ্রহণ করা কর্তব্য।

যদি বলা হয়, এ আয়াতের তাৎপর্য সেইভাবেই গ্রহণীয় যেমন বলা হয়েছে। আল্লাহ্র কথা ঃ 'অতএব তোমরা তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দত সামনে নিয়ে। শরীয়াতদাতা বলেই দিয়েছেন যে, তালাক তো ইদ্দতের জন্যে। আর তা হল তিন তুহরে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে যদি তিন তালাকই কার্যকর করার ইচ্ছা করে। তার বিপরীত করা হলে তার তালাক কার্যকর হবে না।

জবাবে বলা যাবে, দুটি আয়াত যে জিনিসের দাবি করে, যে হুকুম প্রকাশ করে, আমরা সে দৃষ্টিতেই আয়াতদ্বয়কে ব্যবহার করছি। আমরা বলব, পছন্দনীয় ও আদেশকৃত হচ্ছে ইদ্দতের জন্যে তালাক। যেমন এ আয়াতের প্রসঙ্গে আমরা বলেছি। তালাক যদি ইদ্দতের জন্যে না দেয়, দেয় তিনটিই একত্রিত করে, তাহলে তা কার্যকর হবে। অপর আয়াতটি আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাক দুইবার' এবং আল্লাহ্র কথা ঃ যদি অতঃপর-ও স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না'— এ আয়াতদ্বয়ের দাবি তা নয়। কেননা এ সব আয়াতের যা দাবি, তা 'অতএব তোমরা তালাক দাও' আল্লাহ্র এই কথার বিপরীত কিছু নেই। তবে আয়াতের শুরুতে যে 'ইদ্দতের জন্যে তালাক'-এর উল্লেখ আছে, তাতে তা বাস্তবায়িত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে যদি না ইদ্দতের জন্যে তালাক দেয়া হয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্র এই কথা ঃ

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ..... وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ -

অতএব তোমরা তাদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্দতের জন্যে .... এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। আর যে লোক আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, সে নিজের উপরই নিজে জুলুম করল। (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)

কাজেই যদি না-ইদ্দতের জন্যে তালাক দেয়, তাহলে তা-ই ঘটবে, যা ঘটলে ব্যক্তি নিজের উপর নিজে জুলুমকারী হয়। তালাক দিলেই তার দরুন নিজের উপর নিজে জুলুম করা হবে না।

এই আয়াতেই প্রমাণ রয়েছে অ-ইদ্দতের জন্যে তালাক দিলে সে তালাক সঙ্ঘটিত ও কার্যকর হবে। আল্লাহ্‌র কথার ধারাবাহিকতা থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا -

যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্যে মুক্তির পথ করে দেবেন।

অর্থাৎ যদি তালাক দেয় আল্লাহ যেভাবে তা দিতে বলেছেন, তা হলে সে মুক্তি পেতে পারবে সেই অবস্থা থেকে, যে অবস্থার সৃষ্টি হলে সে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হবে। আর তা হচ্ছে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া। ইবনে আব্বাস প্রশ্নকারীর জবাবে এই তাৎপর্যেরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে প্রশ্নকারী তো তিন তালাক দিয়েছিল। বলেছিল, আল্লাহ তো বলেছেন ঃ 'যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, তিনি তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।' আর তুমি যেহেতু আল্লাহ্‌কে ভয় করনি, এইজন্যে আমি তোমাকে মুক্তির কোন পথ দেখাতে পারছি না। তুমি তোমার রব্ব-এর নাফরমানী করেছ, ফলে তোমার স্ত্রী তোমা থেকে বায়েন— হারাম হয়ে গেছে। এই কারণেই হযরত আলী (রা) বলেছিলেন ঃ 'লোকেরা যদি তালাকের সীমা ঠিক পায়, তাহলে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিলে সে লজ্জিত হবে না।'

যদি বলা হয়, একসঙ্গে তিন তালাক দেয়ার লোকটি তো নাফরমান হয়েছে, তাই তা সঙ্ঘটিত ও কার্যকর হবে না। কেননা যেভাবে তালাক দেয়ার আদেশ করা হয়েছে সেভাবে সে তালাক দেয়নি। যেমন কেউ যদি অপর কাউকে দায়িত্ব দেয় তার স্ত্রীকে তিন তুহরে তিন তালাক দেয়ার, সে যদি একই তুহরে তিনটি তালাকই দিয়ে ফেলে তাহলে তা সঙ্ঘটিত ও কার্যকর হবে না।

জবাবে তাকে বলা যাবে, তালাক দেয়ায় গুনাহগার হলেও তা তালাক সঙ্ঘটিত ও কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। সে তালাকটা তো সহীহ হবে। তার দলীল তো পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। তা সত্ত্বেও আল্লাহ 'জিহার'কে ঘৃণ্য মিথ্যা কথা বলে অভিহিত করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ 'জিহার' করে, তাহলে তা সহীহভাবে সঙ্ঘটিত হবে। 'জিহার'কারীর গুনাহগার নাফরমান হওয়াটা 'জিহার' কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় না। মানুষ যখন ইসলাম থেকে মুর্তাদ হয়ে যায়, তখন সে নাফরমান হয়। কিন্তু তার এই নাফরমান হওয়াটা তার মুর্তাদ হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় না। তার হুকুমটা অনিবার্যভাবে কার্যকর হবে। আল্লাহ্ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তার ক্ষতি সাধন ও তাকে কষ্ট দানের উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا -

শুধু কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না। কেননা তাতে বাড়াবাড়ি করা হবে।

তা সত্ত্বেও তালাকদাতা স্বামী যদি ফিরিয়ে নেয় এবং সে তাকে কষ্ট দিতে চায়, তা হলে ফিরিয়ে নেয়াটা কার্যকর হবে, তার হুকুম প্রমাণিত হবে। তবে তার ও তার উকিল বা ভারপ্রাপ্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, উকিল বা ভারপ্রাপ্ত তালাক দেয় অন্যের জন্যে অন্য কারোর পক্ষ থেকে। সে নিজের জন্যে বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় না। যা সে ঘটায়, তার মালিকও সে নয়। তালাকের কোন হক বা দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তায় না। সে যা ঘটায় তার সে মালিক নয়, তা সত্ত্বেও অন্যের পক্ষ থেকে তার ঘটানো কাজটি অবশ্যই কার্যকর হবে এবং সঠিক হবে। কেননা সে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। এই আদেশের সাথেই তার হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত। তাই সে যদি প্রাপ্ত আদেশের বিপরীত বা অন্যথা করে, তাহলে তা সঙ্ঘটিত হবে না।

কিন্তু স্বামী নিজে তালাকের মালিক। সে তালাক দিলে তালাক সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম আহকাম তার সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়। সে অন্য কারো তালাক দিচ্ছে না, নিজের তালাক দিচ্ছে। অতএব তার দেয়া তালাক সঙ্ঘটিত হবে মালিকের দেয়া তালাক হিসেবে। সে তিন তালাকের মালিক। তালাক দিতে গিয়ে সে যদি নিষিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে তা কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। জিহার ও রিজয়াত— ফিরিয়ে নেয়া, মুর্তাদ হওয়া— আর যে সব কাজ করলে গুনাহগার হতে হয় সেই পর্যায়ে যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি।

যেমন, কেউ যদি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীর মার সাথে সঙ্গম করে, তাহলে তার স্ত্রী তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। এই তাৎপর্যটারই আমরা উল্লেখ করেছি স্বামীর হাতে তিন তালাকের মালিকত্বের কথা। তিন তালাক একসঙ্গে দিলে তা যে কার্যকর হবে, কেননা তা তিন তালাকের মালিকেরই দেয়া। হাদীসের দিক দিয়েও তা প্রমাণিত। হাদীসটি ইবনে উমর (রা) বর্ণিত। তার সনদ-ও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাতে তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম, তারপরও কি আমি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম ? নবী করীম (স) জবাবে বললেন ঃ না, কেননা সে বায়েন হয়ে গেছে। অবশ্য সেই সাথে গুনাহ হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ, জরীর ইবনে হাজিম, যুবায়র ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে আলী, ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে রুকানা, তাঁর পিতা তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ সে তার স্ত্রীকে বায়েন-মুগাল্লাযা তালাক দিয়েছে। পরে সে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে বলে ঃ আমি তো চূড়ান্ত তালাক দেয়ার ইচ্ছা করিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, কয় তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেছিলে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বল। সে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলল, এক তালাক। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তাহলে তুমি যা দিতে চেয়েছ সেই এক তালাকই হয়েছে। তিন তালাক দেয়ার নিয়ত হলে তা-ই সঙ্ঘটিত হতো। অন্যথায় নবী করীম (স) তার দ্বারা আল্লাহ্‌র নামে হলফ করাতেন না। বলতেন না যে, আমি মাত্র এক তালাক দেয়ারই ইচ্ছা করেছিলাম। এই পর্যায়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের যেমন কথা-বার্তা আছে, তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সে তালাক ঘটবে, তবে তালাকদাতা গুনাহগার হবে। কুরআন, সুন্নাহ ও আগের কালের ফিকাহবিদদের 'ইজমা' একসঙ্গে দেয়া তিন তালাক সঙ্ঘটিত হওয়া প্রমাণ করছে, যদিও তাতে গুনাহ হবে।

বশর ইবনুল ওয়ালীদ আবূ ইউসূফ থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাদ খুব রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি বলতেন, তিন তালাক কিছুই নয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিন তালাক দিলে তাকে এক তালাকে পরিণত করতে হবে। দাউদ ইবনুল হুসায়ন, ইকরামা ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদীস এই কথার দলীল। বলেছেন, রুকানা ইবনে আবদ ইয়াযীদ তার স্ত্রীকে একই মজলিসে তিন তালাক দিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন খুব সাঙ্ঘাতিকভাবে। তখন রাসূলে করীম (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছ ? বললেন, তিন তালাক দিয়েছি। বললেন ঃ একই মজলিসে ? বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (স) বললেন, ওটা এক তালাক। অতএব তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নাও যদি ইচ্ছা কর। বললেন, অতপর আমি তাকে ফিরিয়ে নিলাম।

আর একটি দলীল আবূ আসিম কর্তৃক ইবনে জুরায়য, ইবনে তায়ূস তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীস। আবূ সাহবা ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেছেন ঃ আপনি কি জানেন না, তিন তালাককে রাসূলে করীম (স), আবূ বকর সিদ্দিকের সময়ে ও উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রাথমিক কালে এক তালাকে পরিণত করা হতো ? বললেন, হ্যাঁ, জানি।

কিন্তু বলা হয়েছে, এই দুইটি হাদীসই মুনকার— অগ্রহণযোগ্য। সাঈদ ইবনে যুবায়র, মালিক ইবনুল হারিস, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ও নুমান ইবনে আবূ আইয়াশ— সকলেই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যে লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, সে তার রব্ব-এর নাফরমানী করল ও তার স্ত্রী তার থেকে বায়েন হয়ে গেল।

আবূ সাহ্‌বা বর্ণিত হাদীস অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তা হল, ইবনে আব্বস (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ও আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর সময়ে এবং উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রাথমিক কালে তিন তালাক ছিল এক তালাক। পরে উমর (রা) বললেন ঃ 'আমরা যদি তা তাদের উপর কার্যকর করি।' এই কথার তাৎপর্য আমাদের নিকট এই যে, লোকেরা তিন তালাক দিত। তিনি তা-ই তাদের উপর কার্যকর করে দিতেন।

ইবনে অহব আইয়াশ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ফহরী, ইবনে শিহাব সহল ইবনে সাদ সূত্রে খবর দিয়েছেন যে, উয়াইমারিল আজলানী ও তার স্ত্রীর মধ্যে নবী করীম (স) যখন 'লেয়ান' কার্যকর করে দিলেন, তখন উয়াইমার বললেন, হে রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করেছি। আমি যদি তাকে রেখে দিই তাহলে সে তিন তালাক। পরে তিনি তাকে রাসূলে করীম (স)-এর আদেশ দানের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে ফেললেন। পরে রাসূলে করীম (স) তার উপর তার ফরমান কার্যকর করেন।

পূর্বে কুরআনের আয়াত ও সুন্নাতে রাসূল এবং ঐকমত্যের দলীলের ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করেছি, হায়যেও তালাক কার্যকর হবে, যদিও তা গুনাহ। যাদের বিরোধী মত গণনার যোগ্য নয়— এমন কিছু জাহিল লোক মনে করে, হায়য অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না। একটি হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করে। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে সালিহ, আবদুর রাযযাক, ইবনে জুরাইয, আবূয যুবায়র, আবদুর রহমান ইবনে আয়মন মাওলা উরওয়াতা ইবনে উমর ও আবূয যুবায়রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি শুনছিলেন, বললেন ঃ যে লোক তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিল, তার সম্পর্কে আপনি কি মনে

করেন ? বললেন, ইবনে উমরও তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর যুগে। উমর (রা) রাসূলে করীম (স)-কে বললেন ঃ আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছে। হযরত আলী (রা) তার প্রতিবাদ করলেন। এটাকে তিনি কোন গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, যখন তার তুহর হবে, তখনই তাকে তালাক দেয়া উচিত অথবা তাকে রেখে দেয়া উচিত।

জবাবে তাকে বলা যাবে, এই কথাটি ভুল। ইবনে উমর থেকে বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, সেই তালাকের জন্যে তিনি ইদ্দত পালন করিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আল-কানবী, ইয়াযীদ ইবনে ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, ইউনুস ইবনে যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছে। বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে চেন ? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, সে-ই তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। পরে হযরত উমর (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বল। তারপরে যেন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দেয়। বললেন, আমি বললাম, সে এই কারণে ইদ্দত পালন করবে। বললেন, থাম। চিন্তা করে দেখ, সে যদি অক্ষম হয় ও আহাম্মকী করে থাকে ?..... এ হাদীসে ইবনে উমর সংক্রান্ত এই খবর রয়েছে। সে এই তালাকের জন্যে ইদ্দত পালন করেছে। এই সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসেই বলা হয়েছে যে, শরীয়াতদাতা-ই তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। যদি তালাক সঙ্ঘটিত না হতো, তাহলে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উঠতো না। তার ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারটিও সহীহ হতো না। কেননা তালাক দেয়নি, সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়েছে— এরূপ কথা সঙ্গত নয়। কেননা ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন তো তালাক দেয়ার পরই উঠে, তার আগে নয়। 'তিনি এটাকে কিছু মনে করেন নি' কথাটি যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে, তিনি এটাতে তালাক হয়েছে মনে করেন নি। বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তা মনে করেন নি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'অতঃপর হয় ভালোভাবে রাখা হবে, না হয় ভালোভাবে চলে যেতে দেয়াও হবে'— আবূ বকর বলেছেন ঃ فَاِمْسَاكٌ -এর 'ফা' تَعْقِيبٌ বোঝায়। অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত কাজের পর পরেরটি করতে হয়। আয়াতের অর্থ হবে, প্রথমে তালাক সঙ্ঘটিত হবে। তারপর তাকে রেখে দেয়ার, ফিরিয়ে নেয়ার কাজ করতে হবে। امساك অর্থ الرجعة ফিরিয়ে নেয়া। কেননা তা তালাকের বিপরীত অর্থ দেয়। তালাকের পর পালিত ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা চূড়ান্ত হয়। এই কারণে امساك 'রেখে দেয়া' বলতে ফিরিয়ে নেয়াই বুঝিয়েছেন। কেননা তালাক সত্ত্বেও তখনও বিয়ে সম্পর্কটা বেঁচে আছে তিন হায়য অতিক্রম করার মুহূর্তেও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে স্ত্রীর বায়েন হারাম হওয়াকে শেষ করে দিয়েছেন। স্বামীর জন্যে মুবাহ করে দিয়েছেন এই সময় তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া। তা অবশ্য শুভ নিয়মে হতে হবে। সুন্দর-স্বচ্ছন্দভাবে হতে হবে। তা করে তাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন ঃ وَلَاتُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا 'তাদেরকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে রাখবে না, তাহলে সীমালঙ্ঘন করা হবে।' ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা এই শর্তে জায়েয রাখা হয়েছে। অশুভ উদ্দেশ্যে ও পন্থায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে গুনাহ হবে। তবু ফিরিয়ে নেয়াটা সহীহ হবে। কেননা আল্লাহ্‌র পুরা কথা হচ্ছে ঃ

তোমরা তাদের ক্ষতি করা— কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিও না। তাহ্‌লে তোমরা বাড়াবাড়ি করে বসবে। যে তা করবে, সে নিজের উপরই জুলুম করল।

ফিরিয়ে নেয়া সহীহ্ না হলে সে নিজের উপর জুলুমকারী হতো না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ভালো ভাবে ফিরিয়ে নেবে' প্রমাণ করে যে, যৌন সঙ্গম করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে হবে। কেননা বিয়েতে ফিরিয়ে রাখার কাজটা সঙ্গম দ্বারাই হয়। আর তার আনুসঙ্গিক স্পর্শ চুম্বন ইত্যাদি দ্বারা। তার দলীল হল, যার সাথে সঙ্গম করা চিরদিনের জন্যে হারাম, তার সাথে বিয়েও সহীহ্ হয় না। বোঝা গেল, বিয়ে বহাল করে রাখা বিশেষভাবে সঙ্গম দ্বারা হতে হবে। এই সঙ্গমই স্ত্রীকে আটকে রাখে। স্পর্শ ও যৌনতাপূর্ণ চুম্বন, নারী-অঙ্গের উপর দৃষ্টিপাত যৌন উত্তেজনা সহকারে— এগুলোও সেই পর্যায়ের। কেননা বিবাহ-চুক্তি সহীহ্ হওয়া এসব জিনিসের মুবাহ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এ সবের কোন একটি কাজ যখন করা হবে, তখন তা স্ত্রীকে আটকে রাখার— ফিরিয়ে নেয়ার কাজ করবে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা "فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ" সাধারণ তাৎপর্যের। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ "اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ" বিষয়ে দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, এর অর্থ তৃতীয় তালাক। নবী করীম (স) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, বর্ণনার সূত্রটি অপ্রমাণিত। বাহ্যতও তা প্রত্যাহারযোগ্য। তা আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক আল-মিরওয়াজী, আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী, আবদুর রাযযাক, সওরী, ইসমাঈল ইবনে সামী, আবূ রুজাইন সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে রাসূল! শুনুন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তালাক দুইবার, অতঃপর ভালোভাবে ফিরিয়ে রাখা অথবা দয়া ভরে চলে যেতে দেয়া।' এখানে তৃতীয় বারের তালাক কোথায় গেল, রাসূল (স) বললেন ঃ এই 'ভালোভাবে চলে যেতে দেয়া'-ই তৃতীয় তালাক।

আগের কালের ফিকাহবিদদের মধ্য থেকে সুদ্দী, দহাক প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তালাকদাতা স্ত্রীকে রেখে দেবে, শেষ হতে হতেই তার ইদ্দতের শেষ হওয়ার সঙ্গেই সে হারাম হয়ে যাবে।

এটাই সঠিকতম ব্যাখ্যা। কেননা এ ব্যাপারে নবী করীম (স) থেকে কোন কথা প্রমাণিত নয়। তার কয়েকটি দিক রয়েছে। একটি, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব আয়াতে তালাক-এর পরে امساك 'রেখে দেয়া'র কথা এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কথা বলেছেন, সেই সব আয়াতেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়ার কথাও বলেছেন, যেন ইদ্দত শেষ হতে হতে শেষে সে হারাম হয়ে যায়।

আল্লাহ্ কথা ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তারপরে তারা তাদের ইদ্দতের মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা তাদেরকে ভালোভাবে রেখে দাও অথবা ভালোভাবে চলে যেতে দাও।

এ আয়াতে تسريح 'চলে যেতে দেয়া' অর্থ ফিরিয়ে না নেয়া, ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা না

করা। কেননা একথা জানা যে, 'রেখে দাও ভালোভাবে, কিংবা চলে যেতে দাও' বলে একটি কথা বোঝাতে চাওয়া হয়নি। এই পর্যায়েরই আল্লাহ্‌র এই কথাটিও ঃ

فَاذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

যখন তারা তাদের ইদ্দতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে ভালোভাবে রেখে দাও কিংবা তাদেরকে ভালোভাবে বিচ্ছিন্ন করে দাও। (সূরা আত্‌-তালাক্‌ ঃ ২)

এ আয়াতে ভবিষ্যতে তালাক ঘটানোর কথা হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যে ফেলে রাখতে বলা হয়েছে। আর অপর দিকটি হল, কথার ধারাবাহিকতায়ই তৃতীয় তালাক রয়েছে।

তা এই কথাটি রয়েছে ঃ

فَانْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

এর পর-ও তৃতীয় বারে যদি তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না যতক্ষণ না সে অপর স্বামী গ্রহণ করবে সে ছাড়া।

কথার শুরুতেই যখন তৃতীয় তালাকের কথা বলা হয়েছে, তা চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা বোঝায়, তার ফলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায় অপর স্বামী না গ্রহণ করা পর্যন্ত। তখন 'দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া' কথাটিকে নতুন ফায়দা রূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, দুই তালাক দেয়ার পর ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া— ফিরিয়ে না নেয়া।

উপরন্তু যখন জানা আছে যে, হারাম হয়ে যায় যত সংখ্যক তালাকে তা বলাই এখানে উদ্দেশ্য, অসংখ্য তালাক দেয়া চলতি প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করা-ই লক্ষ্য, তখন অথবা 'দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া' কথাটি যদি তৃতীয় তালাকের কথা হয়ে যায়, তাহলে তিন তালাক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে হারাম করে দেয়ার উদ্দেশ্যটা কখনই স্পষ্ট হতো না। শুধু এতটুকু কথা বলে দিলেই হারামকারী চূড়ান্ত বিচ্ছেদ কখনই বোঝাতো না। আল্লাহ্‌র এই কথাটি দ্বারা তাহ্‌রীম— চূড়ান্ত হারাম করে দেয়ার কথা জানা গেল আল্লাহ্‌র এই কথা দ্বারা ঃ

فَانْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

তারপরও (তৃতীয় বারে) যদি তালাক দেয়, তা হলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ সে তার পরিবর্তে অন্য স্বামী গ্রহণ না করছে।

অতএব 'অথবা দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া' কথাটিকে তৃতীয় তালাক মনে করাই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া تسريح باحسان কথাটি যদি তৃতীয় তালাক হয়, তাহলে তার পরে বলা 'অতঃপরও যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়' চতুর্থ তালাক হয়ে যায়। কেননা আরবী ভাষায় ف পরবর্তী কাজ বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। তা ভবিষ্যতের তালাক বোঝায়, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া' কথাটি স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার কথা বোঝায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ পরেও যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ সে তাকে বাদে অন্য স্বামীকে গ্রহণ করছে— এতে কয়েকটি তাৎপর্য সমন্বিত রয়েছে।

একটি, স্ত্রীর তিন তালাকদাতার জন্যে হারাম হওয়া, যতক্ষণ না সে তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ করছে। তিন তালাক দিলে বিয়ে চুক্তিটা হারাম হয়ে যায়, তার সাথে সঙ্গম করাও হারাম হয়ে যায়। কেননা বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল যৌন সঙ্গম করা। 'স্বামী' শব্দটির উল্লেখে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় স্বামী রীতিমত গ্রহণ করতে হবে। এটা মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত কথা এবং এটা ইঙ্গিতমূলক কথা, যা যৌন সঙ্গমকেও শামিল করে। আর ইঙ্গিতমূলক কথা স্পষ্ট কথা বলার প্রয়োজন রাখে না। নবী করীম (স) থেকে প্রখ্যাত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রথম স্বামীর জন্যে স্ত্রীলোকটি হালাল হবে না, যতক্ষণ দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সঙ্গম না করবে। জুহরী উরওয়াতা— আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাফায়াতা আল-কুরাযী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। পরে সে স্ত্রী আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়রকে বিয়ে করে। পরে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে নবী! আমি তো রাফায়াতার স্ত্রী ছিলাম। সে শেষ তিন দিয়েছে আমাকে। পরে আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়রকে বিয়ে করেছি। কিন্তু হে রাসূল, তার কাছে যা আছে তা কাপড়ের ফিতা বিশেষ। রাসূলে করীম (স) এই কথা শুনে হেসে দিলেন। বললেন, তুমি হয়ত রাফায়াতার কাছে আবার ফিরে যেতে চাইছ। কিন্তু তা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তার স্বাদ আস্বাদন করবে এবং সেও তোমার স্বাদ আস্বাদন করবে। জনগণ এই হাদীসটিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে। সমস্ত ফিকাহবিদ এই হাদীসটিকে কাজে লাগিয়েছেন, এটিকে ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতেও এ হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য। এ হাদীসের ব্যাপারে কারোরই কোন ভিন্ন মত নেই। তবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের বর্ণিত একটি হাদীস এর বিপরীত। তিনি বলেছেন, সে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্যে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু বিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হালাল হয়ে যাবে যৌন সঙ্গম ছাড়া-ই। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁর অনুসারী কেউ আছে বলে আমাদের জানা নেই। আসলে এটা এটা বিরল কথা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ –

যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামী গ্রহণ করছে।

হারাম করার লক্ষ্য তিন তালাক সজ্ঘটিত হওয়ার স্থান। দ্বিতীয় স্বামী যখন তার সাথে সঙ্গম করবে, তখন সেই হারামকরণটা দূর হয়ে যাবে। তখন একটি মাত্র বাধা অবশিষ্ট থাকবে। আর তা হল, তখন সে অপর এক ব্যক্তির স্ত্রী। যেমন দুনিয়ার অন্যান্য মেয়েলোক, যারা কারও স্ত্রী হয়েছে, তাদের মতই। পরে এই দ্বিতীয় স্বামী থেকে যখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, তখন সে প্রথম স্বামীর জন্যে (বিবাহের মাধ্যমে) হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহ্র কথা হচ্ছে ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا –

এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে (বা সে মরে গেলে) তার ও প্রথম স্বামীর কোন গুনাহ হবে না, যদি তারা পুনরায় বিবাহিত হয়।

তবে সঙ্গমকৃতার জন্যে ইদ্দত পালনের শর্ত। তা এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আর তালাক প্রাপ্তরা নিজেদেরকে তিন কুরু পর্যন্ত নতুন স্বামী গ্রহণ থেকে বিরত রাখবে। এর পর আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَاتَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

এবং তোমরা বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পাদনের সংকল্পবদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট ইদ্দত শেষ হচ্ছে। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৩৫)

ইদ্দত চলাকালে বিয়ে নিষেধ নিয়ে আরও আয়াত এসেছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে তারা দুজনে পুনর্বিবাহিত হলে তাদের কোন দোষ হবে না'— তালাকের ব্যাপারে অকাট্য দলীল। আর এই স্ত্রীর প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হওয়া কেবল মাত্র তালাকের উপর নির্ভরশীল নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-কোন ধরনের বিচ্ছেদ— মৃত্যু, মুর্তাদ হয়ে যাওয়া, কিম্বু তালাক পর্যায়ের কোন রূপ হারাম হওয়ার দরুন— হলেই এ দুজন পুনরায় বিবাহিত হতে পারে, যদিও আয়াতে কেবল তালাকের কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াত এ-ও প্রমাণ করে যে, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াও বিয়ে জায়েয, অন্তত এই ক্ষেত্রে। কেননা আয়াতে يتراجعا বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা দুজন পুনর্বিবাহিত হবে। এতে অভিভাবকের উল্লেখ নেই।

এ আয়াতে আরও অনেক বিধান রয়েছে, তা 'খুলা' সংক্রান্ত বিধান উল্লেখের সময়ে আমরা আলোচনায় নিয়ে আসব। তবে এখানে তৃতীয় তালাক সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কেননা দুই তালাকের আলোচনার সাথে তা সঙ্গতিসম্পন্ন। 'খুলা' তালাকের ব্যাপারটি অনেকটা স্বতন্ত্র।

খুলা (خُلْعٌ)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ -

তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ, তা থেকে কোন জিনিস ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে হালাল নয়। তবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আল্লাহ্র সীমাসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না বলে ভয় পায় ....।

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে স্ত্রীকে দেয়া দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্য থেকে কোন কিছুই ফিরিয়ে নিতে। তবে তা নেয়ার জন্যে একটি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সে অবস্থা হলে ফেরত নিতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে জিনিস স্ত্রীকে দেয়, তা নেয়া জায়েয নয়। যদিও উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু সেই জিনিস না নেয়ার, যা তাকে স্বামী দিয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এ আয়াতাংশ وَلَاتَقُلْ لَهُمَا। "এবং পিতা-মাতাকে 'উহ' বলো না"। এ থেকে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে 'উহ' বলার চাইতেও বেশি ও কঠিন কাজ পিতা-মাতার প্রতি করা, যেমন মারধোর ও গালাগাল।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَاللّٰهِ -

তবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ভয় পায় যে, তারা দুজন আল্লাহ্র সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে .....।

তায়ূস বলেছেন, এর অর্থ, আল্লাহ্ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মিল-মহব্বত ইত্যাদি রক্ষা করা ফরয করেছেন, পারস্পরিকভাবে তা রক্ষা করতে না-পারার ভয়। আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ-ও এরূপ তাৎপর্য বলেছেন। আল-হাসান বলেছেন, এই সব-ও এর মধ্যে পড়ে যে, স্ত্রী বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমার জন্যে না-পাকি থেকে গোসল করব না। ভাষাবিদগণ বলেছেন, إلاّ أنْ يَخَافَا 'তবে তারা দুইজন ভয় পাবে'-এর অর্থ, দুইজনই মনে করবে। কেননা ভয় পাওয়ার এক অর্থ মনে ধারণা করা।

আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করতে না-পারার এই ভয়ের দুটি দিক রয়েছে। হয় দুজনের একজন খারাপ চরিত্রের লোক হবে অথবা উভয়ই, যার ফলে তারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা রক্ষা না করার অবস্থায় পৌঁছে যাবে। বিশেষ করে আল্লাহ্ পরস্পরের উপর বিবাহের দরুন যে হক-হকুক ও দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পালন করতে না পারা যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ -

(স্বামীদের উপর) স্ত্রীদের সেই সব অধিকারই আছে, যা তাদের উপর (স্বামীদের) আছে ।

হয় একজন অপর জনের ক্রোধের কারণ হবে, যার ফলে ভালো সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন হবে। যার দরুন আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হবে পারস্পরিক হক আদায় করার ক্ষেত্রে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে আগ্রহ-আকর্ষণ ও প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শন জরুরী, তা যদি সে দেখাতে না পারে। অথবা সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে, যা এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -

অতএব তোমরা ভিন্ন দিকে এমনভাবে ঝুকে পড়বে না, যার ফলে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিতে বাধ্য হও। (সূরা নিসা ঃ ১২৯)

এর যে কোন অবস্থাই হোক এবং এর দরুন দুজনই ভয় পাবে যে, যারা এভাবে আল্লাহ্ নির্ধারিত পারস্পরিক সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তাদের জন্যে 'খুলা' خلع - করা জায়েয ও হালাল।

জাবির আল-জাফী আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া, আলী কাররামাল্লাহু আজহাহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এমন কিছু কথা আছে, যা স্ত্রী বললে স্বামীর জন্যে 'ফিদিয়া' গ্রহণ করা জায়েয। যেমন, স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে ঃ 'আমি তোমার কথা শুনব না, মানব না; আমি তোমার জন্যে সময় ভাগ করব না, আমি তোমার সাথে সঙ্গমের নাপাকি থেকে গোসল করব না ইত্যাদি।'

মুগীরা ইবরাহীম-এর কথা বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, স্বামীর পক্ষে জায়েয নয় স্ত্রীর নিকট থেকে ফিদিয়া গ্রহণ। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর কথা না মানে; তার কথামত না চলে, তবে তা জায়েয। কেননা এসব অপরাধ স্ত্রীর, তাই তার নিকট থেকে ফিদিয়া গ্রহণ স্বামীর জন্যে হালাল। স্বামী যদি তার নিকট থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং স্ত্রীও তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে দুজন সালিস পাঠাতে হবে। একজন স্বামীর পক্ষ থেকে আর অপর জন স্ত্রীর পক্ষ থেকে।

আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাসের এই কথা উদ্ধৃত করেছেন ঃ স্বামীর হককে

হালকা করে দেখলে, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেই আল্লাহ্র ধার্যসীমা লঙ্ঘিত হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি বলে ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি তোমার ভাগ ঠিক করব না, তোমার জন্যে শুয়ে দীর্ঘ হব না, তোমার কোন কথা শুনব না। স্ত্রী যদি কার্যতও তা করে, তাহলে তার নিকট থেকে ফিদিয়া নেয়া স্বামীর জন্যে হালাল হবে। তবে যা দিয়েছে, তার চাইতে বেশি নেবে না একবিন্দু। অতঃপর তাকে চলে যেতে দেবে।

খারাপ আচরণ যদি স্ত্রীর দিক থেকে হয়, তাহলে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَانْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا -

স্ত্রীরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে কোন জিনিস দেয় (মহরানার কোন অংশ কমিয়ে দেয়) তাহলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে সুস্বাদু হিসেবে খাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

বলেছেন, যে জিনিস ক্ষতিকর নয়, যাতে ধোঁকা-প্রতারণা নেই, তা-ই স্বচ্ছন্দ ও সুস্বাদু, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ।

আলোচ্য আয়াতটি কি মনসূখ হয়েছে ? এ পর্যায়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। হাজ্জাজ উকবা ইবনে আবুস সাহ্বা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি বকর ইবনে আবদুল্লাহ্কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তার স্ত্রী তার নিকট থেকে 'খুলা' গ্রহণ করতে চায়। তিনি বললেন, স্ত্রীর নিকট তার কিছু গ্রহণ করা জায়েয হবে না। আমি তাকে বললাম, কেন, আল্লাহ্ তো তাঁর কিতাবে ইঙ্গিতে বলেছেন ঃ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَ افْتَدَتْ بِهٖ -

তাহলে স্ত্রী যদি ফিদিয়া বাবদ কিছু দেয়, তাহলে তাদের কোন গুনাহ্ হবে না।

বললেন, এ আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে এ আয়াত দ্বারা ঃ

وَاِنْ اَرَدْ تُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا -

যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে আর একজনকে নিয়ে আসার ইচ্ছা করে থাক, আর অবস্থা এই যে, তোমরা তাদের এক-একজনকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়েছ, তাহলে তা থেকে তোমরা কিছুই গ্রহণ করবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ২০)

আবূ আসিম ইবনে জুরায়য থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি মনে করেন, স্ত্রী যদি জালিম হয়, খারাপ চরিত্র ও আচরণের হয়, তখন স্বামী তাকে 'খুলা' করতে বলে, তাহলে তার জন্যে তা হালাল হবে ? জবাবে বললেন, না। স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে স্ত্রী বানিয়ে রাখবে। আর না হয় তাকে চলে যেতে দেবে।

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত মতটি বিরল। কুরআন ও সুন্নাতের বাহ্যিক ঘোষণার দ্বারাই তা রদ হয়ে যায়। আগের কালে ফিকাহবিদদেরও সে ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও 'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রীর বদল করতে চাও....... ' আয়াতটিতে এমন কিছু নেই যার

দরুন 'যদি তারা আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না বলে তোমরা ভয় পাও, তাহলে স্ত্রীর ফিদিয়া দানে তাদের দুজনের কোন গুনাহ হবে না'— আল্লাহ্‌র এই কথা মনসূখ হয়েছে বলে মনে করা যাবে বা অবশ্যই মনসূখ হয়ে গিয়ে থাকবে। কেননা প্রত্যেকটি আয়াতে একটা বিশেষ অবস্থার উল্লেখ আছে এবং সে আয়াতটির হুকুম সেই অবস্থার মধ্যেই কার্যকর হবে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'খুলা' করা নিষিদ্ধ যখন বাড়াবাড়িটা স্বামীর দিক থেকে হবে এবং স্বামীই এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করবে। কিন্তু তা মুবাহ ঘোষণা করা হয়েছে যখন উভয়ই আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না বলে উভয়ই ভয় পাবে। যখন স্বামী স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ হবে, স্ত্রী খারাপ চরিত্রের হবে। কিংবা স্বামীই হবে চরিত্রহীন। তা সত্ত্বেও সে যদি স্ত্রীকে ক্ষতি করতে বা কষ্ট দিতে ইচ্ছুক না হলেও তারা দুজন পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক ও পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় পায়, তাহলে এই অবস্থা পূর্বোক্ত অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। তাতে একজন অপরজনের উপর আপত্তি তুলবে, তেমন অবস্থা নেই। তাই এর কোন একটি আয়াতের মনসূখ হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বিশেষীকরণেরও প্রয়োজন নেই। কেননা প্রত্যেকটি আয়াতই তার নিজ ক্ষেত্রে ও পরিবেশে পুরাপুরি ব্যবহৃত। আল্লাহ্‌র এই কথাটিও এই ধরনেরই ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ -

আর তাদের বাধাগ্রস্ত করবে না, যেন তোমরা যা দিয়েছ, তার একটি অংশ নিয়ে নিতে পারে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

এতে স্বামীদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের উপরই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে স্ত্রীদেরকে তাদের দেয়া জিনিসপত্র থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া। আর তা তখন, যখন বাড়াবাড়িটা স্বামীর দিক থেকে হবে। যার উদ্দেশ্য হবে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া, ক্ষতিগ্রস্ত করা। তবে সে যদি সুস্পষ্ট কোন নির্লজ্জতার কাজ করে, তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে সিরীন ও আবূ কালাবাতা বলেছেন, এর অর্থ, স্ত্রীর থেকে ব্যভিচারের অপরাধ ঘটে। আতা, জুহরী ও আমর ইবনে শুয়াইব বলেছেন, যার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি হবে, তার দিক থেকে 'খুলা' জায়েয নয়, হালাল নয়। অতএব এসব আয়াতের কোনটিই অপর কোনটির দ্বারা মনসূখ হয়নি। প্রত্যেকটি আয়াতই নিজ নিজ স্থানে কার্যকর ও বহাল।

'খুলা' ব্যবস্থায় কি গ্রহণ হালাল

এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি স্ত্রীকে দেয়া জিনিসের অধিক কিছু তার নিকট থেকে গ্রহণ করাকে মাকরূহ মনে করতেন, অপছন্দ করতেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আল-হাসান, তায়ূস ও সাঈদ ইবনে যুবায়র-ও এই মত দিয়েছেন। হযরত উমর, উসমান, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ, ইবরাহীম এবং আল-হাসানের অপর এক বর্ণনা হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে, তার চাইতে বেশি গ্রহণ করে তার মহিলা 'খুলা' করতে পারে, তা তার জন্যে জায়েয। সেই বেশিটা একটা বেনুনি হলেও হতে পারে।

আবূ হানাফী, জুফর, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ বলেছেন, বাড়াবাড়িটা যদি স্ত্রীর দিক থেকে হয়, তাহলে স্বামীর জন্যে জায়েয যা সে দিয়েছে, তা-ই গ্রহণ করা, তাতে এক বিন্দু বেশি হবে না। আর বাড়াবাড়িটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে 'খুলা' তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করা তার জন্যে জায়েয নয়। যদি নেয়, তাহলে মূল বিচারে তা জায়েয হবে।

ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, স্বামীর যদি ক্ষতি করার বা কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা না থাকে স্ত্রীকে, তাহলে পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা ও বিচ্ছিন্নতা জায়েয হবে। আর যদি স্বামীর ইচ্ছা থাকে স্ত্রীর ক্ষতি করার, তাকে কষ্ট দেয়ার তাহলে তা জায়েয নয়। ইবনে অহব মালিকের এই কথা বর্ণনা করেছেন, যদি জানা যায় যে, স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দিয়েছে, তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে এবং সে স্ত্রীর জন্যে জালিম, তাহলে স্ত্রীর পক্ষে তালাক ঘটিয়ে দেবে, তার মাল যা সে স্বামীকে দিয়েছে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এই মতের উল্লেখ করেছেন, 'খুলা' তালাকে স্বামীর জন্যে সে যা দিয়েছে তার চাইতে বেশি স্ত্রীর নিকট থেকে নিতে পারে, তা তার জন্যে জায়েয। বাড়াবাড়িটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে স্ত্রী রাজী ও সন্তুষ্ট হয়ে স্বামীকে যা দেবে, তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে হালাল হবে খুলা তালাক দেয়ার বিনিময়ে। এজন্যে স্বামীর দিক থেকে স্ত্রীর কোনরূপ ক্ষতির অবকাশ থাকতে পারবে না।

লাইস থেকেও অনুরূপ মত পাওয়া গিয়েছে। সওরী বলেছেন, 'খুলা' তালাকের দাবি যদি স্ত্রীর দিক থেকে হয়, তাহলে তার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে দোষের হবে না। আর যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে হালাল হবে না। আওজায়ী বলেছেন, যে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে 'খুলা' করে, এরূপ অবস্থায় যে, স্ত্রী রোগাক্রান্ত, আর সে-ই যদি বাড়াবাড়ি বিদ্রোহকারী হয়, তাহলে দেয়া জিনিসপত্রের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণের মধ্যে তাকে থাকতে হবে। আর স্ত্রী যদি বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহকারী না হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর সবকিছু তাকেই ফেরত দিয়ে দেয়া হবে। স্বামীর অধিকার হবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার। স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে 'খুলা' করে তার সাথে সঙ্গম করার আগেই, তাহলে তাতে কোন দোষ আছে বলে আমি মনে করি না। যদি তার দেয়া সবকিছু ফিরিয়ে নেয়ার ভিত্তিতেও হয় এবং বিয়ে ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে উভয়ই একমত হয়। আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, খারাপ ব্যবহারটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়, তাহলে কম বা বেশির বিনিময়ে 'খুলা' করা স্বামীর জন্যে জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে খারাপ আচরণটা স্ত্রীর দিক থেকে হলেও স্বামীর অধিকার আদায়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়, তাহলে উভয় যে শর্তেই ইচ্ছা 'খুলা' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। উসমানুল-বত্তীও তাই বলেছেন। শাফেয়ী বলেছেন, স্ত্রীর যে কর্তব্য স্বামীর প্রতি তাঁর পথে স্ত্রীই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে স্বামীর পক্ষে ফিদিয়া-বিনিময়ে 'খুলা' করা জায়েয। আর স্ত্রী খুশীর সাথে স্বামীকে যা দেবে বিয়ে বিচ্ছিন্ন না করেও, তাহলে তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয। আর কিছু দিয়ে স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ করে, তাহলে স্ত্রী খুশীর সাথে যা দেবে, তা গ্রহণ করা তার জন্যে হালাল।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা 'খুলা' তালাক পর্যায়ে কতিপয় আয়াত নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ

شَيْـٔـًا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا -

আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করেই থাক, তাহলে তাকে এক স্তুপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফেরত নেবে? (সূরা আন্-নিসা ঃ ২০)

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীকে দেয়া সম্পদ থেকে কিছুই ফেরত নিতে নিষেধ করছে। এটা তখন, বাড়াবাড়িটা যদি স্বামীর দিক থেকে হয়। এই কারণে হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, এই অবস্থায় স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছুই ফেরত নেয়া জায়েয নয়।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ -

তোমরা স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ, তা থেকে বিন্দু পরিমাণও ফেরত নেয়া তোমাদের জন্যে হালাল হবে না। তবে তারা দুজনই যদি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় পায়, তাহলে ...।

এ আয়াতে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম রাখতে না পারার উভয়ের ভয়ের কারণে স্বামীর জন্যে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করা মুবাহ করে দিয়েছে। আর এর মধ্যে স্ত্রীর ক্রোধ স্বামীর প্রতি, তার সাথে খারাপ ব্যবহার ও তার খারাপ চরিত্র—একজনের, বা উভয়ের এগুলো শামিল রয়েছে। তখন স্ত্রী যা দিয়ে 'খুলা' নিতে চাইবে তা গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয, তবে বেশি নিতে বা চাইতে পারবে না। অবশ্য বাহ্যিকভাবে আয়াতের এই তাৎপর্য বোঝা যায় যে, সবকিছু গ্রহণ করাই স্বামীর জন্যে জায়েয। কিন্তু যা বেশি হবে, তা সুন্নাত দ্বারা বিশেষীকৃত।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ -

জোরপূর্বক স্ত্রীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের জন্যে মোটেই হালাল নয়। এবং যে মহরানা তোমরা তাদের দিয়েছ, তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে তার একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্যে হালাল নয়। কিন্তু তারা যদি কোন সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয় .....।

বলা হয়েছে, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে স্বামীকে এবং স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা ফেরত নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে স্ত্রী যদি কোন প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কারোর কারোর মত, এই সুস্পষ্ট ব্যভিচার বলতে 'যিনা' বুঝিয়েছে, আবার কারোর মত, স্ত্রীর দিক থেকে বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহ। এই কথাটি আল্লাহ্‌র এই কথার দৃষ্টান্ত ঃ 'তোমরা যদি ভয় পাও— আশংকা বোধ কর যে, তারা দুইজন আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করবে না, তাহলে স্ত্রী যে ফিদিয়া দিয়েছে, তা গ্রহণ করতে কারোর উপর দোষ হবে না।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا -

তোমরা যদি ভয় পাও— আশংকা বোধ কর— তাদের দুজনের মধ্যে ফাটল ও ভাঙ্গন সৃষ্টির, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সালিস পাঠাও— নিযুক্ত কর। (সূরা আন-নিসা : ৩৫)

এ আয়াতের হুকুম আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। আল্লাহ্ তা'আলা এ কয়টি আয়াত ছাড়া অন্যান্য আয়াতেও দেয়া মহরানা ফিরিয়ে নেয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু 'খুলা' তালাক পর্যায়ে তার উল্লেখ করা হয়নি এই আয়াতটিতে :

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا -

এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানাসমূহ আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে দিয়ে দাও। পরে তারাই যদি তোমাদের জন্যে সন্তুষ্টচিত্তে তা থেকে কিছু কমিয়ে দেয়, তাহলে তা তোমরা স্বচ্ছন্দ ও সুস্বাদুরূপে খাও। (সূরা আন-নিসা : ৪)

বলেছেন :

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -

তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তাদেরকে তালাক দাও, অথচ তোমরা তাদের জন্যে মহরানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছ, তবে এই অবস্থায় (তালাক দিলে) তাদেরকে অর্ধেক পরিমাণ মহরানা দিতে হবে। তবে স্ত্রীরা নিজেরাই যদি অনুগ্রহ দেখায় (মহরানা গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ-বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে, সে যদি অনুগ্রহ করে ও পূর্ণ মহরানা দিয়ে দেয়, তবে তা অবশ্য ভিন্নতর অবস্থারূপে গণ্য ...। (সূরা বাকারাহ ২৩৭)

এই সবকয়টি আয়াতই তাদের থেকে গ্রহণীয় আইন-বিধান সহ কার্যকর। অতএব আমরা বলব, বাড়াবাড়িটা স্বামীর দিক থেকে হলে, তার জন্যে জায়েয নয় দেয়া মহরানা থেকে কিছু ফেরত লওয়া। কেননা আল্লাহ্ই বলেছেন : এবং তাদেরকে আটক করো না, বাধাগ্রস্ত করো না এ জন্যে যে, তোমরা তাদেরকে যে মহরানা দিয়েছ তার কিয়দংশ তোমরা ফেরত নিয়ে নেবে।

আর বাড়াবাড়িটা যদি স্ত্রীর দিক থেকে হয় কিংবা স্ত্রীর খারাপ চরিত্রের কারণে উভয়ই ভয় পেয়ে যায়, অথবা তাদের উভয়ের প্রত্যেকের দ্বারা অপর প্রত্যেকের ভয় হয় যে, তারা আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্বামী মহরানা বাবদ স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা সে ফেরত নিতে পারে, তা তার জন্যে জায়েয। তবে বেশি নিতে পারবে না।

এমনিভাবে : 'এবং তোমরা তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না এজন্যে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার একাংশ ফেরত নিয়ে নেবে, তবে তারা যদি সুস্পষ্ট কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ....এর

তাৎপর্য পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি স্ত্রী বাড়াবাড়ি করে, বিদ্রোহ করে, তাহলে স্বামী যা তাকে দিয়েছে, তা ফেরত নিতে পারে। তার জন্যে তা জায়েয।

তবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তারা যদি নিজেরাই সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদেরকে মহরানার কিছু অংশ হ্রাস করে দেয়, তাহলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দ সুস্বাদু রূপে খাও, কথাটি 'খুলা' প্রসঙ্গের নয়। খুলা ছাড়া সাধারণ অবস্থার জন্যেই এই বিধান। তখন স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে ধার্যকৃত মহরানার পরিমাণ হ্রাস করে দিতে পারে। যারা বলে যে, 'খুলা' প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় স্ত্রীর কোন কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয নয়, এ আয়াত অনুযায়ী তা সম্পূর্ণ জায়েয, খুলা ছাড়া অন্য অবস্থাতেও। তা কেবল 'খুলা'তে জায়েয, তা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে দুইটি স্থানে কথা বলেছেন। তার একটিতে নিষেধ করেছেন, তা হ্‌ল, 'তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও'..... এই আয়াত। আর অপরটি আল্লাহ্‌র কথা ঃ

তোমরা যা স্ত্রীদের দিয়েছ, তা থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে জায়েয নয়, তবে তারা দুজন যদি আল্লাহ্‌ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না বলে ভয় পায়।

আর অপর আয়াতে তা মুবাহ ঘোষিত হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে স্বতঃই নির্দিষ্ট মহরানা থেকে কিছু পরিমাণ কম করে দেয়, তা হলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দ সুস্বাদু রূপে খাও।

বোঝা গেল, 'খুলা' ছাড়া অন্য অবস্থায় স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের থেকেই ধার্যকৃত মহরানার কিছু হ্রাস করে, এটা কেবল 'খুলা' অবস্থায় জায়েয, অন্য অবস্থায় নয়, এই কথা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত 'খুলা' পর্যায়ে এই হাদীস। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আল-কানবী মালিক, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ— উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে জারারাতা, হুবায়বাতা বিনতে সহল আনসারী সূত্রে এটি এসেছে। হুবায়বা বিনতে সহল সাবিত ইবনে কায়স ইবনুশ শিমাসের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। রাসূলে করীম (স) সকাল বেলা ঘরের বাইরে এলেন। তিনি হুবায়বা বিনতে সহলকে দরজার সামনে অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পেলেন। রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ কে ওখানে ? বললেন, আমি হুবায়বা বিনতে সহল। বললেন, তোমার অবস্থা কি ? বললেন, না আমি, না সাবিত ইবনে কায়স এক সাথে থাকতে পারছি। পরে সাবিত ইবনে কায়স তাঁর নিকট এলে বললেন, এ হচ্ছে হুবায়বা বিনতে সহল, সে যা বলার বলেছে। হুবায়বা বললেন, হে রাসূল। আমাকে ও যা দিয়েছে, তা সব-ই আমার নিকট রয়েছে। তখন রাসূলে করীম (স) সাবিত ইবনে কায়সকে বললেন ঃ তুমি ওর নিকট থেকে ওসব নিয়ে নাও। তিনি নিয়ে নিলেন। অতঃপর হুবায়বা তাঁর পরিবারবর্গের সাথে থাকতে লাগলেন।

এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় 'তার পথ খুলে দাও— ছেড়ে দাও' এসেছে, কোনটিতে 'তাকে বিচ্ছিন্ন করে দাও' ব্যবহৃত হয়েছে।

কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ বলেছেন, স্বামী যা দিয়েছে, তার বেশি নেয়া তার জন্যে জায়েয নয়। এ পর্যায়ের হাদীস আবদুল বাকী ইবনে কানে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল,

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবূ সামীমাতা, আল-অলীদ ইবনে মুসলিম, ইবনে রাইয, আতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে মামলা দায়ের করল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তুমি স্বামীর নিকট থেকে যা যা গ্রহণ করেছিলে তা কি ফিরিয়ে দিতে চাও ? বলল, হ্যাঁ। তার চাইতে বেশিও দিতে চাই। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ না, বেশি নয়।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন ঃ দেয়া জিনিসের অতিরিক্ত নেয়া যাবে না এই হাদীসটির কারণে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই আলোকে বিশেষীকৃত করা হয়েছে। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের বাহ্যিক অর্থ বিশেষীকৃত করা জায়েয। তা এই আয়াতটির দিক দিয়ে; আল্লাহ বলেছেন ঃ

তোমরা যদি আশংকা বোধ কর যে, ওরা দুইজন আল্লাহ নির্ধারিত সীমা কায়েম করবে না, তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে ফিদিয়া দেয়, তাহলে দুজনার কোন দোষ হবে না।

ব্যবহৃত শব্দ কয়েকটি অর্থের সমন্বিত। ইজতিহাদ তার অবকাশ দেয়। আগের কালে ফিকাহবিদদের থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি দিনের বর্ণনা হয়েছে। আল্লাহ্র কথা ঃ

তোমরা ওদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না ওদের যা দিয়েছ তার অংশ কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে। তবে তারা যদি সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার অপরাধ করে, তাহলে ভিন্ন কথা।

এ আয়াতটিও অনুরূপ কতিপয় অর্থের ধারক। অতএব তাকে বিশেষীকরণকৃত করা সঙ্গত। এই কথাটিও ঃ 'অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে পারস্পরিক স্পর্শ করেছ।' এবং 'তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও'— এসব কয়টি আয়াতেরই বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এর একটা তাৎপর্য বলতে আগের কালের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এরূপ অবস্থায় এসব আয়াতের তাৎপর্য নির্ধারণে 'খবরে ওয়াহিদ'-এর সহায়তা নেয়া খুবই সঙ্গত।

হানাফী ফিকাহবিদরা বলেছেন, যে পরিমাণ দিয়েছে তার চাইতে বেশির ভিত্তিতে যদি 'খুলা' তালাক দেয়া সাব্যস্ত করে অথবা স্বামীর দিক থেকে বাড়াবাড়ি হওয়ার সে-ই স্ত্রীকে ধন-মালের ভিত্তিতে 'খুলা' তালাক দেয়, তা মোটামুটি জায়েয হবে। যদিও স্বামীও আল্লাহ্র মধ্যকার ব্যাপারের দিক থেকে তার অবকাশ নেই এই দিক দিয়ে যে, স্ত্রী তা কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজের সন্তুষ্টচিত্ততা সহকারে দিয়ে থাকে। নবী করীম (স) বলেই দিয়েছে ঃ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ -

নিজের মনে খুশীতে না দিলে কোন মুসলিমের মাল গ্রহণ হালাল হবে না।

এই নিষেধাত্মক কথাটি শুধু চুক্তির তাৎপর্যের সাথেই সম্পর্কিত নয়। তার বদলে তার সম্পর্ক যে তাৎপর্যের সাথে, তা হচ্ছে সে স্বামী স্ত্রীকে সেভাবে দেয়নি, যেমন সে তার নিকট থেকে গ্রহণ করেছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে সেভাবে দেয়, তাহলে তা অপছন্দনীয় হবে না। নিষেধ যখন চুক্তি ছাড়া অন্য কিছুর সাথে সম্পর্কিত, তখন চুক্তির বৈধতা নিষিদ্ধ হবে না। যেমন জুম'আর আযান হওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয়, বাইরের লোকদের বিক্রয় করার জন্যে উপস্থিত কিনে রাখা ও আরোহীদের নিকট অগ্রে গিয়ে মাল ক্রয় করা।

তাছাড়া দাস-মুক্তির চুক্তি যখন অল্প বা বেশি মালের ভিত্তিতে জায়েয হতে পারে, ইচ্ছামূলক হত্যার ব্যাপারে সুলাহ্ করা ইত্যাদি, তালাক-ও তেমনি, বিয়েও তেমনি। সমপরিমাণের মহ্‌রানার চাইতেও বেশি ধার্য করা যখন জায়েয— মহ্‌রানা তো স্ত্রী অঙ্গে ব্যবহারাধিকারের বিনিময়— এমনিভাবে সমপরিমাণ মহ্‌রানার অধিকের উপর স্ত্রী গ্রহণ জায়েয। কেননা তা উভয় অবস্থায়ই স্ত্রী-অঙ্গের বিনিময়।

যদি বলা হয় 'খুলা' তালাক যখন বিয়ের চুক্তি ভেঙ্গে দেয়, তখন বিয়ের চুক্তি যত পরিমাণের উপর হয়েছে তার অধিকের ভিত্তিতে জায়েয হওয়া উচিত নয়। যেমন পণ্যের সঠিক মূল্যের অধিককে কম করা জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, তোমার কথা— 'খুলা' বিয়ে চুক্তি ভেঙ্গে দেয়— ঠিক নয়। তা হচ্ছে তালাক, যা সূচিত, তাতে বিনিময়ের শর্ত না করা হলেও। তা সত্ত্বেও তা কম করার অবস্থার হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। স্বামী যা দিয়েছে তার কমের বিনিময়ে 'খুলা' করা হলে তা জায়েয হবে সর্বসম্মতিক্রমে। কোন দ্রব্যের ধার্য মূল্যের কম করা জায়েয নয়। কোন বিনিময় ছাড়াই 'খুলা' করা হলে তা-ও জায়েয। বেসরকারীভাবে 'খুলা' করা সম্পর্কে আগের কালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আল-হাসান ও ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত, বেসরকারীভাবে 'খুলা' জায়েয নয়। সাঈদ ইবনে জুয়াইর বলেছেন, খুলা জায়েজ নয় যতক্ষণ না তার পূর্বে স্ত্রীকে ভালো করে বোঝানো হবে। বুঝ গ্রহণ করলে তো ভালো, অন্যথায় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে। বুঝ গ্রহণ না করলে তাকে মারধোর করা যাবে। তার পর-ও বুঝ গ্রহণ করলে ভালো। অন্যথায় ব্যাপারটি সরকারের গোচরে দিতে হবে। সেখানে স্বামীর একজন ও স্ত্রীর একজন সালিস দিতে হবে। তারা দুজন স্বামী-স্ত্রীর কথা সরকারের গোচরীভূত করবে। তারপর সরকার দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়োজন বোধ করলে তাই করে দেবে, যদি দুজনকে একত্রিত রাখা ভালো বিবেচিত হয়, তাহলে তাই করবে। হযরত আলী, উমর, উসমান ও ইবনে উমর (রা) এবং শুরাইহ, তায়ূস, জুহরী ও অন্যান্যরা মত দিয়েছেন, 'খুলা' তালাক জায়েয সরকারের সংস্পর্শ ছাড়াই। সরকারের সংস্পর্শ ছাড়াই 'খুলা' জায়েয— এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ সম্পূর্ণ একমত। কুরআন মজীদ-ও তা জায়েয ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে ঃ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ -

স্ত্রী যদি 'ফিদিয়া' দেয়, তাহলে তাদের দুজনার কোন গুনাহ হবে না।

'এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তার কিছু অংশ কেড়ে নেবে। তবে তারা যদি কোন স্পষ্ট নির্লজ্জতার অপরাধ করে, তাহলে ভিন্ন কথা।' এ আয়াত দুটিতেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর রাজী হয়ে যদি স্ত্রী ফিদিয়া দেয় ও স্বামী তা গ্রহণ করে 'খুলা' তালাক দিয়ে দেয় সরকারী ব্যবস্থাপনা ছাড়াই, তাহলে তা জায়েয হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নবী করীম (স) সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ 'তুমি কি তোমার স্বামীর বাগান তাকে ফিরিয়ে দিতে চাও ? বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি স্বামীকে বললেন ঃ 'তুমি তা গ্রহণ কর এবং ওকে ছেড়ে দাও।' এই কথাটিও সেই কথাই প্রমাণ করে। কেননা 'খুলা' তালাক যদি বেসরকারীভাবে কার্যকর না হতো, সরকারের হস্তক্ষেপের উপর নির্ভরশীল

হতো, তাহলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তা চাইত বা অস্বীকার করত যখন জানা যেত যে, তারা দুজন আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম করবে না। কিন্তু নবী করীম (স) সে দুজনকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। স্বামীকেও বললেন না যে, ওকে 'খুলা' করে দাও। বরং স্বামী-ই তাকে 'খুলা' করে দিচ্ছিল এবং তার বাগান সে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। তারা দুজন বা তাদের একজন যদি অস্বীকার করত, যেমন পরস্পর 'লেয়ান'কারী স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা শাসকের উপর নির্ভরশীল ছিল না। স্বামীকে বলেন নি— ওকে যেতে দাও। বরং দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। যেমন সহল ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) দুই 'লেয়ান'কারী স্বামী-স্ত্রী মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'তোমার কোন পথ স্ত্রীর উপর— তাকে ফিরিয়ে নেয়ার। সেটি স্বামীর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এ থেকেও 'খুলা' তালাক দেয়ার ব্যাপারটি বেসরকারীভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া জায়েয প্রমাণিত হয়।

নবী করীম (স)-এর এই কথাটিও তাই প্রমাণ করে— বলেছেন, 'কারোর মাল নেয়া হালাল নয়, তবে সে যদি সন্তুষ্টচিত্তে দেয় তবে জায়েয।'

'খুলা' সম্পর্কে প্রশ্ন হচ্ছে, তা কি তালাক কিংবা তালাক নয়? এ বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে উমর, আবদুল্লাহ, উসমান, আল-হাসান, আবূ সালমাতা, শুরাইহ, ইবরাহীম, শবী, মকহুল প্রমুখ বলেছেন, 'খুলা' হল এক তালাক বায়েন। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণও তা-ই বলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। ইবনে আব্বাস (রা) মত দিয়েছেন, 'খুলা' তালাক নয়।

আবদুল বাকী ইবনে কানে আলী ইবনে মুহাম্মাদ, আহল, অলীদ শুবা, আবদুল মালিক ইবনে মায়সারাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তায়ূসকে 'খুলা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ 'তা কিছুই না। আমি বললাম ঃ আপনি প্রায়ই আমাদের নিকট এমন এমন কথা বলেন, যা আমরা জানি না, বুঝি না। তখন বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম, ইবনে আব্বাস (রা) দুই তালাক ও 'খুলা'র পর স্বামী-স্ত্রীকে একত্রিত করেছেন।

বলা হয়, এ ব্যাপারে তায়ূস বড় ভুল করে বসেছেন। তিনি বড় ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও নেককারিতা সত্ত্বেও অনেক ভুল করেছেন। এ পর্যায়ের অনেক অপছন্দনীয় বিষয় তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'যে লোক তিন তালাক দেবে, তা এক তালাক হয়ে যাবে।' ইবনে আব্বাস থেকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ যে লোক তার স্ত্রীকে তারকাসমূহের সংখ্যক তালাক দেবে, তার তিন তালাক বায়েন হয়ে যাবে। লোকেরা বলেছেন, আইয়ূব তো তায়ূসের এই বিপুল ভুল দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ইবনে আবূ নুজাইহ তায়ূস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'খুলা' তালাক নয়। পরে মক্কাবাসীরা তাঁর এই কথার প্রতিবাদ করেছেন। সেখানকার বহু লোককে একত্রিত করা হয়। ফলে তায়ূস তাদের সম্মুখে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এই কথা বলতে শুনেছি।

অথচ আবদুল বাকী ইবনে কানে আহমদ ইবনুল হাসান ইবনে আবদুল জব্বার, আবূ হুমাম, আল-অলীদ, আবূ সাঈদ, রূহ ইবনে জিন্নাহ জাময়াতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছিলেন ঃ রাসূলে করীম (স) 'খুলা'-কে এক

তালাক বানিয়ে দিয়েছিলেন। সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী যখন তার উপর বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহ করল, তখন নবী করীম (স) তাকে যা বলেছিলেন, তা-ও প্রমাণ করে যে, 'খুলা' তালাক। বলেছিলেন ঃ 'তুমি ওর পথ ছেড়ে দাও।' কোন কোন বর্ণনার ভাষা হল ঃ তুমি ওকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। একথা বলেছিলেন স্ত্রীকে স্বামীর দেয়া বাগান ফেরত দিতে বলার পর। স্ত্রী তখন বলেছিল, আমি ফেরত দিয়েছি। আর একথা জানা যে, যে লোক তার স্ত্রীকে বলবে ঃ আমি বিচ্ছিন্ন করলাম বা আমি তোমার পথ ছেড়ে দিলাম, আর তার নিয়তও হবে তাকে বিচ্ছিন্ন করা, এতে তালাক হয়ে যাবে। প্রমাণিত হল যে, শরীয়াতদাতার আদেশ স্বামীর স্ত্রীকে 'খুলা' দেয়াটা মূলত তালাক-ই। তাছাড়া স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে ঃ 'মালের বিনিময়ে আমি তোমাকে তালাক দিলাম' অথবা 'তোমার ব্যাপার আমি তোমার হাতে সপে দিলাম মালের বিনিময়ে,' তাহলে তালাক হয়ে যাবে। এতে কোন মতপার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে ঃ 'আমি তোমাকে মাল ছাড়াই 'খুলা' করে দিলাম'— বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। মালের বিনিময়ে 'খুলা করলেও তাই হবে।

যদি বলা হয়, 'খুলা' শব্দ ব্যবহার করে যদি বলে, তাহলে বিক্রয়ে কম করার মতই ব্যাপার হবে। তাহলে সে বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে, নতুন সূচিত বিক্রয় হবে না।

জবাবে বলা যাবে, মাল ছাড়াও 'খুলা' হয়, এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। মহরানা কম করার ভিত্তিতেও 'খুলা' হতে পারে। আর বিক্রয়ে মূল্য কম করার প্রশ্নটি চুক্তির ভেতরের ব্যাপার। 'খুলা' যদি বিয়ে ভঙ্গের ব্যাপার হতো, তাহলে তা বিয়ের সময়ে নির্ধারিত মহরানার ভিত্তিতেই হতো। তা ছাড়া অন্যভাবে হতে পারত না। অথচ কোন মালের বিনিময় ছাড়া-ই যে 'খুলা' হতে পারে, এ বিষয়ে সকলেই একমত। মহরানা কম করার ভিত্তিতে 'খুলা' হলে তা তো 'মালের বদলে তালাক' হয়ে গেল। সেটা বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হল না। তা এবং 'আমি তোমাকে এই মালের ভিত্তিতে তালাক দিলাম' এই দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

'খুলা' তালাক নয়— এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের একটি দলীল হল, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ 'তালাক দুইবার। অতঃপর হয় রেখে দেয়া শুভ ভাবে, না হয় দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া'— এর পর পরই আল্লাহ্ বললেন ঃ 'তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ, তা থেকে তোমরা কিছু ফেরত নেবে, তা তোমাদের জন্যে হালাল নয়।' .... কথার ধারাবাহিকতা বলে এ পর্যন্ত পৌছল; অতঃপর যদি তালাক দেয়, তাহলে সে স্ত্রীর জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বাদে অপর একজন স্বামী গ্রহণ করবে।' এ কথায় 'খুলা'র পরে তৃতীয় তালাক প্রমাণিত হল। এটা প্রমাণ করে যে, 'খুলা' তালাক নয়। কেননা যদি তালাক হতো, তাহলে এই কথাটি চতুর্থ তালাক পর্যায়ে হয়ে যেত। কেননা দুই তালাকের পর 'খুলা'র কথা হয়েছে। পরে 'খুলা'র পর তৃতীয় তালাকের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের নিকট এটা এভাবে নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা 'তালাক দুইবার' দুই তালাকের কথা বোঝায় যদি তা 'খুলা' হিসেবে নয়, অন্যভাবে ঘটানো হয়। সেই সাথে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার কথাটিও প্রমাণিত এই কথার দ্বারা ঃ 'অতঃপর রেখে দেয়া ভালোভাবে।' পরে সে দুটির হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে যখন সে দুটি 'খুলা' রূপে হবে এবং তাতে নিষেধ ও অনুমতির স্থান থেকে সরিয়ে নেবে। যে অবস্থায় মাল গ্রহণ জায়েয হবে কি হবে না, তারও উল্লেখ হয়েছে। এর পর যোগ করা হয়েছে ঃ 'অতঃপর যদি তালাক দেয় তাহলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বাদে অন্য স্বামী

গ্রহণ করছে।' এতে প্রথমে উল্লেখ করা দুই তালাক একবার 'খুলা' হিসেবে এবং আর একবার 'অ-'খুলা' হিসেবে এসেছে। তাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, দুই তালাকের পর 'খুলা', 'খুলা'র পরে চতুর্থ তালাক।

এটা এমন কথা, যাকে দলীল বানিয়ে বলা হয় যে, 'খুলা' গ্রহণকারীর সাথে তালাক জড়িত হয়। কেননা বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে যখন একমত হয়েছে যে, আয়াতের নির্ধারণ ও তার আইন বিধানের বিন্যাস আমাদের বর্ণনানুযায়ী এবং 'খুলা'র পর তৃতীয় তালাক পাওয়া গেছে এবং তার সঙ্ঘটিত হওয়া ও হারাম হওয়াটা একটা স্থায়ী ব্যাপার— অন্য স্বামী গ্রহণের পর যদিও হালাল হতে পারে— এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'খুলা' গ্রহণকারিণীর সাথে তালাক থাকে, যতক্ষণ সে ইদ্দতের মধ্যে থাকবে।

'খুলা'র পর তৃতীয় তালাক প্রমাণ করা ধারাবাহিকতার আয়াত ঃ 'যদি তার পর-ও তাকে সে তালাক দেয়, তাহলে তাদের দোষ হবে না যদি তারা পুনর্বিবাহিত হয়— যদি তারা ধারণা করে যে, তারা দুজন আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে।' পূর্বোল্লিখিত কথার উপর এটা সংযোজন। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের জন্যে হালাল হবে না যে, তোমরা স্ত্রীদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু ফেরত নিয়ে নেবে। তবে যদি তারা দুজনই ভয় পায় যে, তারা দুজন আল্লাহ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে পারবে না' এ আয়াতে সে দুজনার জন্যেই পুনর্বিবাহিত হওয়াকে মুবাহ ঘোষণা করা হয়েছে তৃতীয় তালাকের পর আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে না পারার ভয় দূরীভূত হওয়ার শর্তে। কেননা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর হয়ত তারা লজ্জিত— অনুতপ্ত হয়ে গিয়ে থাকতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকেই প্রীতি-ভালোবাসার দিকে ফিরে আসতে চাইতে পারে, তার খুব সম্ভাবনা রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, এই তৃতীয় তালাক খুলার পরই উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ -

যদি তারা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমাসমূহ কায়েম করতে পারবে।

কথাটি ইজতিহাদ জায়েয প্রমাণ করে নিত্য নব ঘটিত ব্যাপারাদিতে। কেননা কুরআনে ظَنّ (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ধারণা ও বিশ্বাস)-কে মুবাহ বলা হয়েছে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ 'পরে সে তার জন্যে হালাল হবে না।'— কথাটি স্থাপিত তালাক দুইবার' আল্লাহ্র কথাটির উপর এবং তা পরে যে ফিদিয়ার উল্লেখ হয়েছে, তা ছাড়া-ই।

জবাবে বলা যাবে, এই কথাটি যে ঠিক নয়, তার কয়েকটি কারণ। একটি— 'এবং তোমাদের জন্যে হালাল হবে না যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে এক বিন্দু জিনিস গ্রহণ করো' দুই তালাকের উল্লেখের পর নব সূচিত সম্বোধন। এটা সে দুই তালাকের উপর বিন্যস্ত নয়। কেননা এখানে واو অক্ষর বসিয়ে সংযোজন করা হয়েছে। অবস্থা যখন এই এবং ফিদিয়ার পরে-পরে বলা হয়েছে ঃ 'তার পরে যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছেড়ে আর একজন স্বামী গ্রহণ করছে'— এই

কথাটি 'ফিদিয়ার উপর বিন্যাস্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা পরে বলা কথাটি ঠিক না এবং শুরুতে বলা দুই তালাকের উপর তার বিন্যস্ত হওয়া জায়েয নয়। কোন দলীলের দাবি ছাড়া পরবর্তীর উপর তাকে যোগ-ত্যাগও ঠিক নয়। যেমন বিশেষীকরণের শব্দ দ্বারা ব্যতিক্রম দেখানোতে বলা হয় যে, তা পরবর্তীর উপরই চাপে। তাতে আগে যা বলা হয় তাকে কোন দলীল ছাড়া রদ করা যায় না। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ......

এবং তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা, যারা তোমাদের কোলে লালিতা-পালিতা হয়েছে—সে স্ত্রীদের থেকে যাদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু (যদি শুধু বিয়ে হয়ে থাকে) যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তাহলে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদের বিয়ে করায়) তোমাদের কোন দোষ হবে না .....। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৩)

এ আয়াতে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার শর্ত লালিতা-পালিতা কন্যাদের উপর আবর্তিত, স্ত্রীদের মাদের উপর নয়। কেননা واو অক্ষরের পর তাদের নিকটবর্তী হিসেবে স্ত্রীদের মা'দের উল্লেখ হয়নি, যদিও তা-ই অধিক নিকটবর্তী। 'তালাক দুইবার' কথাটির উপর সংযোজন করা হয়েছে 'পরে যদি তালাক দেয়' কথাটি। যে ফিদিয়া তার পরে তা নয়। কেননা তার পরে যে ফিদিয়ার কথা তার উপর عطف বানাও না। পূর্বে বলা কথার উপর عطف বানাচ্ছ। দুটির মাঝখানে যে 'ফিদিয়া' উল্লেখ তা বাদে।

উপরন্তু আমরা عطف বানাই সে সমস্তের উপর, পূর্বে যার উল্লেখ হয়েছে, যেমন ফিদিয়া, আর তার-ও আগে এসে দুই তালাকের উল্লেখ হয়েছে ফিদিয়া হিসেবে নয়। ফলে এতে দুটি ফায়দা নিহিত। একটি দুই তালাক দিয়ে 'খুলা' করার পর স্ত্রীকে তালাক দেয়া জায়েয এবং দ্বিতীয়, দুই তালাকের পর যখন সে দুটিকে ঘটানো হবে ফিদিয়া হিসেবে নয়।

স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষতি সাধন—কষ্টদান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, অতঃপর তাদের ইদ্দতের মিয়াদ শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যখন তাদেরকে রেখে দেবে ভালোভাবে কিংবা চলে যেতে দেবে ভালোভাবে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ 'পরে তারা পৌঁছে গেছে তাদের ইদ্দতের মিয়াদের শেষ পর্যন্ত-এর অর্থ পূর্ণ বয়স্কতার নিকটবর্তী হওয়া ও তা লাভ করা বলার পেছনে কোন সত্যতা নেই। কেননা মূলে যে اجل বা মিয়াদের উল্লেখ হয়েছে, তার অর্থ ইদ্দত। আর তার পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছা অর্থ, ইদ্দতের শেষ হয়ে যাওয়া। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অবকাশ থাকে না। কুরআনের বহু স্থানেই اجل 'ইদ্দত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারই একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

فَاذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -

তাদের ইদ্দত যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন তাদের ভালোভাবে রাখো, না হয় ভালোভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও।

এর অর্থ পূর্বের আয়াতের যা, তা-ই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

আর গর্ভধারিণী স্ত্রীদের ইদ্দত হচ্ছে তাদের সন্তান প্রসব। (সূরা তালাক্ব ঃ ৪)

বলেছেন ঃ

اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে এবং পরে তারা তাদের ইদ্দতের শেষে পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করবে না।

বলেছেন ঃ

وَلَاتَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

এবং তোমরা বিবাহ-বন্ধনের সিদ্ধান্ত কখনই করবে না, যতক্ষণ না ইদ্দত পূর্ণ হবে।

এই সব আয়াতেই اجل শব্দটি 'ইদ্দত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য ঃ فَاذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ এই আয়াতে ইদ্দত শেষ হওয়া নয়, শেষ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া বুঝিয়েছেন। কুরআন ও অভিধানে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে তখন তালাক দেবে তাদের ইদ্দতের জন্যে।

(সূরা আন-নিসা ঃ ১)

এর অর্থ, তোমরা যখন তালাক দিতে ইচ্ছা করবে এবং তালাক দেয়ার নিকটে পৌঁছে যাবে, তখন তালাক দেবে ইদ্দতের জন্যে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ -

যখন তোমরা কুরআন পড়বে, তখন আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবে। (সূরা আন-নহল ঃ ৯৮)

এর অর্থও যখন তোমরা কুরআন পড়ার ইচ্ছা করবে। বলেছেন ঃ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا 'তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়বিচার করবে।' কথা বলার পর ন্যায়বিচার করবে—এটা অর্থ নয়। বরং কথা বলার পূর্বেই এই সংকল্প করবে যে, বলবে না, বলবে কেবল ন্যায়পরতার কথা। এই প্রেক্ষিতেই اجل শব্দের উল্লেখ বুঝতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, কথা বলার কাছাকাছি যাওয়া। কথা বলে শেষ করার পর ন্যায়পরতা করা নয়। আলোচ্য আয়াতে তার কাছাকাছি যাওয়া অর্থ ভালোভাবে তাকে রাখার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। যদি বিয়ে স্থিত থাকা সমস্ত সময়ই 'ভালোভাবে রাখা' স্বামীর কর্তব্য। কেননা তার-ই নিকটে রাখা হয়েছে تَسْرِيْح অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার। দুজনকে (ভালোভাবে রাখার) আদেশ ও চলে যেতে

দেয়া দুটোরই একই অবস্থা। তা স্থায়ী হয় না। 'মিয়াদ' পৌঁছে যাওয়া অবস্থাকে বিশেষীকরণকৃত হয়েছে, যেন দুটি ব্যাপারেই 'ভালোভাবে' হওয়া সমন্বিত হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 'অতএব তাদেরকে ভালোভাবে রাখো।' এর অর্থ, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া। ইবনে আব্বাস (রা) আল-হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাতা থেকে তা বর্ণিত।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 'অথবা তাদেরকে চলে যেতে দাও ভালোভাবে।' এর অর্থ, স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়া, ফিরিয়ে নেয়ার কাজটা ত্যাগ করা বা না করা, ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আয়াতে 'ভালোভাবে রাখা' মুবাহ্ করা হয়েছে। আর তার বাস্তব রূপ হচ্ছে, স্ত্রীর হক যথাযথভাবে আদায় করা— এ বিষয়ে ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। সেই সাথে تَسْرِيْحٌ চলে যেতে দেয়াকেও মুবাহ করা হয়েছে। তা এমনভাবে হতে হবে যা 'ভালোভাবে' হয়েছে এই অভিধা পেতে পারে। তা এই যে, তাকে ক্ষতি করা বা কষ্ট দেয়ার কোন ইচ্ছাই করা হবে না। ফিরিয়ে নিয়ে তার ইদ্দতকে দীর্ঘ করা হবে না। এর পর-পরই বলা হয়েছে ঃ وَلَاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا 'তাদেরকে ক্ষতি করা বা কষ্ট দান স্বরূপ রেখে দেবে না।' ভালোভাবে বিচ্ছিন্নকরণের তাৎপর্য এ-ও হতে পারে যে, তাকে চলে যেতে দেয়ার সময়ে তাকে জীবনোপকরণ (মাত'আ) দেয়া হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'হয় তাদের রাখা হবে ভালোভাবে, না হয় দয়া সহকারে তাদের চলে যেতে দেয়া হবে' কে দলীল বানিয়ে কোন কোন লোক বলছে যে, ভরণ-পোষণ দিতে অক্ষম ও সামান্য আয়ে স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বামীকে দুটি কাজের যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। হয় রাখবে ভালোভাবে, না হয় চলে যেতে দেবে দয়া সহকারে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয়া বা দিতে না পারা 'ভালোভাবে রাখার' পর্যায়ে গণ্য হয় না। তাই ভরণ-পোষণ দিতে স্বামী অক্ষম হলেই তার নির্দিষ্ট কর্তব্য হয় 'স্ত্রীকে দয়া সহকারে চলে যেতে দেয়া'। এরূপ অবস্থায় সরকার তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে।

আবূ বকর বলেছেন, এটা একটা চরম মূর্খতা। এই আয়াতটিকে দলীল বানিয়ে যে লোক একথা বলতে চাচ্ছে, তার কথা অগ্রহণযোগ্য। ভারণ-পোষণ দিতে অক্ষম স্বামীও স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় স্ত্রীকে ভারণ-পোষণ দেয়ার দায়িত্ব নেই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ ط لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتَاهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا -

যার রিযিকের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়েছে, সে তার পরিবারের জন্যে ব্যয় করবে তা থেকে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেন না— দেন শুধু এতটা যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। অবশ্য আল্লাহ সংকীর্ণতা ও অভাবের পর সহজতা (সচ্ছলতা) এনে দেবেন। (সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ৭)

অতএব অক্ষম-দরিদ্র স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখতেও অক্ষম, এমন কথা বলা জায়েয নয়। হ্যাঁ, ভালোভাবে না রাখা,— রাখা কিন্তু ভালোভাবে নয়, এটা নিন্দনীয়, কিন্তু যে অক্ষম, তার ভরণ-পোষণ করতে না পারা অ-নিন্দনীয়। যদি ভরণ-পোষণ অক্ষম স্বামী স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখতে না পারে, তাহলে আসহাবে সুফফা ও দরিদ্র সাহাবীগণ নিজেদের ও পরিবারবর্গের খরচাদি যোগাড় করতে অক্ষম হয়ে তাদেরকে ভালোভাবে রাখেন নি, বলা যাবে না। আমরা জানি যে, ভরণ-পোষণে সক্ষম বহু স্বামী তাদের স্ত্রীদের ভালোভাবে রাখছে না। ভরণ-পোষণে অক্ষম স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যেতে পারে না। এ আয়াতের ভিত্তিতে তা ঘটানো কর্তব্য বলে ফতোয়া দেয়া জায়েয হতে পারে না। কেননা স্ত্রীদের ভালোভাবে না রাখার অপরাধী কেবল গরীব স্বামীরাই নয়, অনেক সচ্ছল ধনী স্বামীরাও সে অপরাধে অপরাধী। এটা কথার পার্থক্যের ব্যাপার মাত্র। আল্লাহ্র কথা হচ্ছে ঃ 'তোমরা স্ত্রীদেরকে ক্ষতি করার— কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে রেখে দেবে না, (এজন্যেও নয়) যেন তোমরা (তাদের প্রতি) বাড়াবড়ি করতে পার।

মসরুক, আল-হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাতা ও ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হয়েছে তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে, তার ইদ্দত শেষের দিকে পৌঁছার সময় আবার তালাক দিয়ে নতুন করে ইদ্দত পালনে বাধ্য করা, আবার ইদ্দত শেষ হয়ে এলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার তালাক দেয়া। এটা রীতিমত ক্ষতিকর ও কষ্টদান। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ –

যে লোক এরূপ কাজ করবে, সে আসলে নিজেরই উপর জুলুম করে।

এ থেকে বোঝা গেল, ক্ষতি করা ও কষ্টদানের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেও সে ফিরিয়ে নেয়াটা সহীহ হবে। তা না হলে আল্লাহ যে বললেন, সে নিজেরই উপর জুলুম করে, তা তো হতে পারে না। কেননা ফিরিয়ে নেয়াটা বেহুদা হয়েছে। তার কার্যকরতা কিছু নেই। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا –

তোমরা আল্লাহ্র আয়াত-বিধানসমূহকে খেলনার বস্তু বানিও না।

উমর, আল-হাসান ও আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত, বলেছেন, এক ব্যক্তি এমন ছিল যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিত, আবার ফিরিয়ে নিত। আর বলত ঃ 'আমি তো খেলা করছি মাত্র। এর পরই আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ 'তোমরা আল্লাহ্র আয়াত-বিধানকে খেলনার বস্তু বানিও না।' তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'যে লোক তালাক দেবে বা আযাদ করবে কিংবা বিয়ে করবে আর বলবে, আমি খেলা করছিলাম, তাহলে সে মহা অন্যায়কারী। আবুদ-দারদা জানিয়েছেন, এটাই হচ্ছে আয়াতের ব্যাখ্যা। এই বিষয়েই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। বোঝা গেল, তালাক নিয়ে খেলা করা, তা বারবার করা সমান অপরাধ! ফিরিয়ে নেয়াও অনুরূপ। কেননা তার উল্লেখ হয়েছে, রেখে দেয়া বা চলে যেতে দেয়ার আদেশের পর-পরই। অতএব এ দুজন সম্পর্কেও সেই কথা। নবী করীম (স) তাঁর উক্ত কথাটি দ্বারা বিষয়টিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ করে দিয়েছেন। আবদুর রহমান ইবনে হুবায়ব আতা, ইবনে মাহীক, আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ -

তিনটি কাজ এমন যা গুরুত্ব দিলে গুরুত্ব পাবে। আর তা নিয়ে তামাশা করলেও গুরুত্ব পাবে। তা হল, তালাক, বিয়ে ও তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَرْبَعٌ وَاجِبَاتٌ عَلٰى كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِنَّ : الْعِتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنُّذُرُ -

চারটি বিষয় বাধ্যতামূলক যে-ই সে বিষয়ে কথা বলবে তার উপর। তা হল, দাস মুক্তকরণ, তালাক দেয়া, বিয়ে করা ও মানত মানা।

জাবির আবদুল্লাহ ইবনে লুহাই আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

ثَلَاثٌ لَا يَلْعَبُ بِهِنَّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالصَّدَقَةُ -

তিনটি জিনিস এমন, যা নিয়ে কখনও খেলা করতে নেই। তা হল— তালাক, বিয়ে সাদকা দেয়া।

আল-কাসিম ইবনে আবদুর রহমান আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا تَكَلَّمْتَ بِالنِّكَاحِ فَاِنَّ النِّكَاحَ جِدُّهُ وَلَعِبُهُ سَوَاءٌ، كَمَا اَنَّ جِدُّ الطَّلَاقِ وَلَعِبُهُ سَوَاءٌ -

তুমি যখন বিয়ে-শাদীর কথা বলবে, মনে রাখবে, তা খাঁটিভাবে বলা এবং খেলার ছলে বলা সবই অভিন্ন ঠিক যেমন তালাকের কথা খাঁটি ভাবে বলা এবং তা নিয়ে খেলা করা সমান।

বহু সংখ্যাক তাবেয়ীন থেকেও এই বর্ণনাই পাওয়া গেছে। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। জোরপূর্বক তালাক লওয়ার ব্যাপারটি এই মৌল নীতির উপর ভিত্তিশীল। কেননা এ বিষয়ে খাঁটিভাবে কথা বলা ও তামাশা করে বলা সমান। অবশ্য ইচ্ছা ও নিয়তের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে। একজন মুখে যা বলে, তা-ই তার ইচ্ছাও, কিন্তু অপরজন হয়ত তালাক ঘটানোর ইচ্ছায় বলে না। কিন্তু নিয়ত এ ব্যাপারে মুখের কথার ক্রিয়াকে রোধ করতে পারে না। তালাক দেয়ার জন্যে যার উপর জোর প্রয়োগ করা হয়েছে, সে মুখে উচ্চারণ করলেও নিয়ত ও ইচ্ছা তার তা থাকে না, যা মুখে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাতে মুখের কথার মূল্য নষ্ট হয় না। বোঝা গেল, এ ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে মুখে উচ্চারণ কিসের হচ্ছে, তার।

অভিভাবক ছাড়াই বিয়ের অনুষ্ঠান

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ -

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, পরে তাদের ইদ্দতের মিয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামী গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করবে না।

এর প্রকৃত পক্ষেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। عضل শব্দের দুটি অর্থ। একটি, নিষেধ করা। আর অপরটি সংকীর্ণতার সৃষ্টি করা। আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ

عَضَلُ الْقَضَاءُ بِالْجَيْشِ –

বিচারকার্য সৈন্যদের দ্বারা বন্ধ বা বাধাগ্রস্ত করা।

الْأَمْرُ الْمُعْضَلُ 'প্রতিরুদ্ধ ব্যাপার'। আর সংকীর্ণতার অর্থে বলা হয় ঃ عَضَلْتُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ 'আমি তাদের উপর ব্যাপারটি সংকীর্ণ বা কঠিন করে দিয়েছি।' عَضَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدِهَا 'আমি মেয়েলোকটিকে তার সন্তানসহ বন্ধ করে দিয়েছি। আসলে দুটি অর্থই কাছাকাছি। কেননা নিষিদ্ধ কাজ কঠিন ও দুঃসাধ্য। সংকীর্ণ হয়ে যায় কাজের সুযোগ বরং তা শেষ হয়ে যায়। আর الضيق সংকীর্ণ করার অর্থও নিষিদ্ধ করা। বর্ণিত হয়েছে, শবীকে একটা কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন ঃ

زِبَاءُ ذَاتِ وَبَرٍ الاَّ تُنْسَابَ وَلاَتنقاد، وَلَوْنَزَلَتْ بِاَصْحَابِ مُحَمَّدٍ لاَعْضَلَتْ بِهِمْ –

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَاتَعْضُلُوهُنَّ এবং তাদেরকে বাধাগ্রস্ত কর না। অর্থাৎ তাদেরকে নিষেধ কর না। বিয়ে করার কাজটিকে তাদের জন্যে সংকীর্ণ করে দিও না। এই আয়াতটির কতগুলো দিক রয়েছে। কোন মেয়ে যদি অভিভাবক বা তার অনুমতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহিত হয়, তাহলে তা জায়েয হবে— এ কথা এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। একটি, আয়াতের বিয়ে কর্মটি সেই মেয়েলোকদের নিজেদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে অভিভাবকের অনুমতির কথাও বলা হয়নি। দ্বিতীয়, স্বামী-স্ত্রী বিয়েতে প্রস্তুত হয়ে গেলে তখন সে কাজে বাধা দিতে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, অভিভাবক যদি তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করার অধিকারী না হয়, তাহলে সে তো কখনই তা করতে নিষেধ করতে পারবে না। যেমন নিঃসম্পর্কে কোন ব্যক্তির— যার অভিভাবকত্ব নেই— নিষেধ করার অধিকার নেই, তাহলে অভিভাবক ও সম্পর্কহীন ব্যক্তি অভিন্ন হয়ে গেল ?

জবাবে বলা যাবে, এ কথাটা ঠিক নয়। কেননা নিষেধ হক না থাকার কথা বলে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে শুধু সেই কাজে। তাহলে তা হক প্রমাণের দলীল হতে পারে কিভাবে ? উপরন্তু অভিভাবকের অধিকার আছে মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে নিষেধ করা এবং বিয়ে চুক্তিতে যোগাযোগ না করতে বলার। তাহলে নিষেধ করতে যে নিষেধ করা হল, তা শুধু এই বিয়ে করার ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিয়ে করতে নিষেধ করতে পারবে না। এ আয়াতটি আরও প্রমাণ করে যে, মেয়েরা যখন কুফুতে নিজেদের বিবাহিত করবে, তখন তা করতে নিষেধ করতে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিষেধ করার অধিকার তার নেই। যেমন সুদী কারবার ও অনৈসলামী চুক্তি করতে যদি নিষেধ করা হয়, তাহলে যে-কাজ করতে যথারীতি নিষেধ করা হয়েছে, সে কাজে নিষেধ করার অভিভাবকের কোন হক থাকতে পারে না। অতএব তা ভেঙ্গে দেয়ারও তার কোন অধিকার নেই। তারা যদি বিচারকের নিকট মামলা নিয়ে যায়, তখন বিচারক যদি এই ধরনের চুক্তি করতে নিষেধ করে, তাহলে সে জালিম হবে, নিষেধকারী হবে সেই কাজ থেকে, যার নিষেধ করা তার জন্যে নিষিদ্ধ। তাতে

তার হক বাতিল হয়ে যায়, ভেঙ্গে দেয়া যায়। অতএব সে চুক্তি থাকবে। তা ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার কারোর নেই। ফলে তা কার্যকর হবে, জায়েয হবে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা অভিভাবককে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন, যখন তারা নিজেরা পারস্পরিকভাবে রাজী হয়ে যাবে শুভভাবে তখন। তাহলে বোঝা গেল, অ-অভিভাবক যদি তার আক্দ করে, তাহলে ভালোভাবে হচ্ছে না।

জবাবে বলা যাবে, আমরা জানলাম, কোন কাজ যখন ভালোভাবে হবে, তখন অভিভাবকের আক্দ জায়েয হবে না। তা এ জন্যে যে, আয়াতের অকাট্য দলীল হল, স্ত্রীর নিজের আক্দ জায়েয। অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে, যেন সে তাকে নিষেধ না করে। তাহলে ভালোভাবে হওয়ার অর্থে স্ত্রীর আক্দ বৈধ না হওয়া গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। কেননা তাতে আয়াতের আদেশ পালিত হবে না। তা হতে পারে যদি এ আয়তটি মনসূখ হয়ে গেছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু একটি ভাষণে মনসূখ ও মনসূখকারী উভয়ের অবস্থিতি জায়েয নয়। মনসূখ হওয়া কার্য হয় কোন হুকুম প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হওয়ার পর, তার পূর্বে নয়। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তাদের দুজনের রাজী হওয়ায় যে ভালোভাবে হওয়ার শর্ত তা অভিভাবক বা তার অনুমতি নয়। উপরন্তু বিয়ের বিকল্প বা বদল, যা মহরানার পরিমাণের দিকে ফিরে যায়। আর তা হচ্ছে সমপরিমাণ মহরানা। তাতে কোনরূপ কম হতে পারে না। এই কারণে আবূ হানীফা বলেছেন ঃ 'সেই স্ত্রী যদি সমপরিমাণ মহরানার কম ধার্য করে, তা হলে অভিভাবকের অধিকার আছে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো।' অভিভাবক ছাড়াও যে বিয়ে হতে পারে, এ আয়াত ছাড়া অন্য আয়াতেও তার উল্লেখ আছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -

অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে অতঃপর সে তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ না তাকে বাদে অপর স্বামী বিয়ে করবে।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا -

অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে তারা দুজন পুনর্বিবাহিত হলে তাদের কোন দোষ হবে না।

এই দলীলটিতে দুটি দিকের সমন্বয় ঘটেছে, যেমন পূর্বে বলেছি। তার একটি হল আয়াতে বিয়ের কাজটি স্ত্রীর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়, পুনর্বিবাহিত হওয়ার ব্যাপারটিও পুরুষ ও স্ত্রীটির কাজ বলা হয়েছে, দুটি আয়াতের কোথাও অভিভাবকের উল্লেখ হয়নি।

কুরআনে এ পর্যায়ের আরও অনেক দলীল রয়েছে। তার মধ্যে এ আয়াতটি উল্লেখ্য ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

তারা যখন তাদের ইদ্দতের শেষে পৌছে যাবে, তখন তারা নিজেরা নিজেদের ব্যাপারে যথার্থ নিয়মে যে কার্যক্রম গ্রহণ করবে, তাতে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

এ আয়াত অনুযায়ী স্ত্রীদের নিজেদের ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাদের নিজেদের। তাতে অভিভাবকের কোন ভূমিকার একবিন্দু শর্ত নেই। বিয়ের আক্দ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকের উপস্থিতির কোন আবশ্যকতা নেই বলে জানিয়েছে।

যদি বলা হয়, এরূপ বলে তাদের স্বামী গ্রহণের ইখতিয়ারের কথাই বলা হয়েছে। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিয়ে তার উপর চাপানো যেতে পারে না। এতটুকুই মাত্র।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা ভুল। তার দুটি কারণ। একটি হল ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ তাৎপর্য স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে ও অন্যান্য বিষয়ে। আর দ্বিতীয় হল, স্বামী বাছাই করার দ্বারা স্ত্রীর নিজের ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুই লাভ হয় না। তা লাভ করা যায় বিয়ের আকদ ঘটানোর দ্বারা যার সাথে বিয়ের যাবতীয় আইন-কানুনের সম্পর্ক। আয়াতে স্বামী বাছাই ও আক্‌দ ঘটানো— দুটিরই ইখতিয়ার স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ –

যখন তারা দুজন পারস্পরিকভাবে রাজী হয়ে যাবে সুষ্ঠু নিয়ম অনুযায়ী।

এ ব্যাপারে মতপার্থক্য

অভিভাবক ছাড়া স্ত্রীলোকের নিজের বিয়ে নিজে নিজে সম্পাদনের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, কুফুতে নিজে নিজেকে বিয়ে দিতে পারে। তাতে মহরানা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করবে। তাহলে তাতে অভিভাবকের কিছুই বলবার বা আপত্তি করবার থাকতে পারে না। ইমাম জুফরও এই কথাই বলেছেন। যে যদি অ-কুফুতে নিজেকে বিয়ে দেয়, তাহলেও তার বিয়ে জায়েয হবে। তবে তখন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার অভিভাবকদের থাকবে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে আল-মুনযির ইবনুয যুবায়রের নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হাফসার পিতা আবদুর রহমান সেখানে অনুপস্থিত ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের মত হল অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে সম্পূর্ণ জায়েয। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, শবী, জুহরী ও কাতাদাতারও এই মত। আবূ ইউসূফ বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে জায়েয হবে না। হ্যাঁ, অভিভাবক যদি মেনে নেয়, তাহলে সে বিয়ে জায়েয বিবেচিত হবে। আর অভিভাবক যদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, অথচ স্বামী কুফু হয় তাহলে কাযী সে বিয়েকে জায়েয ঘোষণা করবে। বিয়েটা আসলে তখনই— কাযীর অনুমোদনক্রমেই— বৈধ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদেরও এই মত। আবূ ইউসূফের ভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর সর্বজনবিদিত মতটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, স্ত্রী যদি নিজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে এবং কুফুতে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করে তাহলে তা জায়েয হবে। অভিভাবকের কোন অধিকার থাকবে না তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর। ইবনে আবূ লায়লা, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে হতে পারে না। ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, বিয়ে জায়েয হবে না, আর মা কন্যার অভিভাবক হতে পারে না। মেয়ে অপর কোন ব্যক্তিকেও নিজের অভিভাবক বানাতে পারে না। তবে মুসলিম কাযী অভিভাবক হতে পারে। ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের মত বর্ণনা করেছেন, মেয়ে যদি দাসত্বমুক্ত হয় কিংবা হয় মিসকীন, অথবা নীচ বংশের যে, তার কোন বিপদাশংকা নেই, তাহলে যে-কোন ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধি বানাতে পারে, যে তাকে বিয়ে দেবে। তাহলে জায়েয হবে। মালিক এ-ও বলেছেন,

যে মেয়ের ধন-মাল আছে, যে ধনী ও মান-মর্যাদা সম্পন্না, তার বিয়ে অভিভাবক ছাড়া হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কিংবা তার বিয়ের দায়িত্ব সরকার বহন করবে। মালিক এটাকে জায়েয বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি মেয়েলোকটির রক্ত সম্পর্কের হয়— যদিও অপর কেউ তার চাইতেও নিকটবর্তী, তবু সে সেই মেয়েকে বিয়ে দিতে পারে। যে মেয়ে অভিভাবক ছাড়া বিবাহিত হবে, তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি যদি অন্য কেউ হয়, তাহলে ব্যাপারটি সরকারের গোচরীভূত হতে হবে। যদি সে বিয়ে কুফুতে হয়ে থাকে, তাহলে সরকার সে বিয়েকে বৈধ করে দেবে; কিন্তু সে বিয়েকে ভেঙ্গে দিতে পারবে না। এটা ইমাম লাইসের কথা।

তবে এসব কথাই কিন্তু পূর্ণ বয়স্কের বিয়ের ব্যাপারে। সাওদা অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে করেছিল। লাইস বলেছেন, তা জায়েয। অপূর্ণ বয়স্ক বা কুমার-কুমারীকে অভিভাবক নয়— এমন ব্যক্তি যদি বিয়ে দেয়, আর তার অভিভাবক কাছাকাছিও উপস্থিত থাকে, তাহলে ব্যাপারটি অভিভাবকের উপর ন্যস্ত থাকবে। কোন কারণ দেখাতে পারলে সরকার সে বিয়েকে ভেঙ্গে দেবে। তবে তাকে যে লোক বিয়ে দিয়েছে, তার তুলনায় অভিভাবকই সেজন্যে উত্তম ব্যক্তি।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যন্ত কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা মেয়ের বিয়ে জায়েয হওয়ার পর্যায়ে মত প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে, তা সবই এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফার মতের সত্যতা ও সঠিকত্ব প্রমাণ করে। সুন্নাতের দিক দিয়ে উল্লেখ— ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবঝ দাউদ, আল-হাসান ইবনে আলী, আবদুর রাযযাক, মামার, সালিহ ইবনে কায়মান, নাফে ইবনে যুবায়র ই}নে মুতয়িম, ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ -

পূর্ণ বয়স্কের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের কিছুই করার নেই।

আবূ দাউদ বলেছেন, আহমাদ ইবনে ইউনুস ও আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমা উভয়ই মালিক, আবদুল্লাহ ইবনুল ফযল, নাফে ইবনে যুবায়র ইবনে আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا -

পূর্ণ বয়স্ক ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের ব্যাপারে তাদের অভিভাবক অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্ন।

রাসূলের কথা ঃ 'পূর্ণ বয়স্কের ব্যাপারে অভিভাবকের কিছুই করণীয় নেই' বিয়ে সম্পাদনে অভিভাবকের ভূমিকাকে প্রত্যাহার করেছে। আর তাঁর 'পূর্ণ বয়স্ক ছেলেমেয়ে নিজেদের ব্যাপার তাদের অভিভাবকদের অপেক্ষা বেশি অধিকার সম্পন্ন' কথাটি তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের বিয়েতে বাধা দানের অধিকার হরণ করেছে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ -

প্রতিবেশী তার নিজের ঘর-সংসারের ব্যাপারে বেশি অধিকার সম্পন্ন।

রাসূলে করীম (স) এক অল্প বয়স্কের মাকে বলেছিলেন ঃ

اَنْتَ اَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَنْكَحِىْ -

তুমি নিজে যতদিন স্বামী গ্রহণ না করছ, ততদিন এই বালক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তুমিই বেশি অধিকার সম্পন্না।

পুত্রের ব্যাপারে মার হক চিরস্থায়ী নয়। সে মা অন্যত্র বিয়ে না বসা পর্যন্ত সেই অধিকার থাকবে। অতঃপর থাকবে না। জুহরী কর্তৃক সহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত হাদীস-ও তাই প্রমাণ করে। একটি মেয়েলোক নিজেকে রাসূলে করীমের জন্যে উৎসর্গ করে। তিনি বলেছিলেন, আমার মেয়েলোকের কোন প্রয়োজন নেই। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ 'হে রাসূল, ওকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। তখন নবী করীম (স) মেয়েলোকটিকে সেই ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিলেন। তখন তিনি মেয়েলোকটিকে তার কোন অভিভাবক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন নি। তার বিয়ে সঠিকত্বের জন্যে অভিভাবকের উপস্থিতিরও কোন শর্ত করেন নি। নবী করীম (স) নিজে উম্মে সালমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। উম্মে সালমা (রা) বলে পাঠালেন, আমার কোন অভিভাবক নেই যে সাক্ষী হবে। নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমার অভিভাবকদের মধ্য থেকে কেউ উপস্থিত নেই, কেউ অনুপস্থিত-ও নেই, যে আমাকে বাধ্য করবে। তখন উম্মে সালমা তার অল্প বয়স্ক পুত্রকে বললেন ঃ 'উঠ, তোমার মাকে তুমি রাসূলে করীম (স)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।' তখন সে উম্মে সালমা (রা)-কে রাসূলে করীম (স) -এর সাথে কোন ওলী—অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়াই বিয়ে দিল।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) নিজেই যেহেতু উম্মে সালমার অভিভাবক ছিলেন। বস্তুত যে মেয়ে নিজেকে রাসূলের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার অভিভাবক তিনিই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -

নবী মুমিনদের তাদের নিজেদের তুলনায় অনেক বেশি অধিকার সম্পন্ন।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, মুমিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অনেক বেশি অধিকার সম্পন্ন বিশেষ করে সেই সব ব্যাপারে, যে সব ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ বাধ্যতামূলক। তাঁর আদেশের আনুগত্যের ব্যাপারে তিনি অনন্য। কিন্তু মুমিনদের নিজস্ব কাজ-কর্মে ও ধন-মালের ব্যাপারে রাসূল (স) তাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশি অধিকার সম্পন্ন নয়। লক্ষণীয়, উম্মে সালমা (রা) যখন বলে পাঠালেন, আমার কোন অভিভাবক নেই যে সাক্ষী হতে পারে, আপনার-ও অভিভবাক কেউ নেই, তখন রাসূলে করীম (স) তাঁকে বলেন নিঃ আমি তোমার ব্যাপারে তাদের অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্ন। বরং বলেছেন, অভিভাবকদের মধ্যে কেউ নেই যে আমাকে বাধ্য করতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (স) মেয়েদের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে তাদের অভিভাবক নন। একটু চিন্তা-বিবেচনা করলে এটাও প্রমাণিত হবে যে, ব্যক্তি যখন তার ধন-মাল বৈধভাবে আচরণ করবে, তখন তার নিজের বিয়েটাও নিজে করতে পারবে, তা সম্পূর্ণ জায়েয। এ ব্যাপারে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। মেয়েদের ব্যাপারও তেমনি, যেমন পুরুষদের ব্যাপারে এই মাত্র বললাম। পুরুষ মানুষ যদি পাগল হয়, তাহলে তার ধন-মালে সে বৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তখন তার বিয়েও সে নিজে করতে পারে না, জায়েয হবে না। কাজেই আমাদের বক্তব্যের সঠিকত্ব প্রমাণিত হল।

এই ব্যাপারে যাঁরা বিপরীত মত পোষণ করেন, তাঁরা একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি শরীফ সামাক, আবূ আখি মাকাল ইবনে ইয়াসার, মাকাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মাকালের বোন একজনের নিকট বিবাহিতা ছিলেন। সে তাঁকে তালাক দেয়। পরে সেই ব্যক্তি তাঁকে ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। তখন মাকাল তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ -

তোমরা তোমাদেরকে তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে নিষেধ করো না, বাধা দিও না।

আল-হাসান থেকেও এই ঘটনার বর্ণনা এসেছে। আয়াতটি কথিত উপলক্ষেই নাযিল হয়েছিল। নবী করীম (স) মাকাল (রা)-কে ডেকে তার বোনকে বিয়ে করতে দেবার আদেশ করেছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনাশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের নিকট এই হাদীসটি প্রমাণিত নয়। কেননা সনদে সামাক যার নিকট থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেই ব্যক্তি অজ্ঞাত পরিচয় (مجهول)। আর আল-সানা বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল, আর যদি তা প্রমাণিত হয়, তবু কুরআনের আয়াত যে বিয়েকে জায়েয বলেছে, তাকে 'না' করতে পারত না। মাকাল এই কাজ করেছিলেন, পূর্ণবয়স্কা বোনের ইচ্ছামত বিয়েতে বাধা দিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ই তাঁকে সে কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে বাধা দানের তার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। অতএব আয়াতের বাহ্যিক অর্থই দাবি করছে যে, মূলত আয়াতটির সম্বোধন হচ্ছে স্বামীদের প্রতি। কেননা আল্লাহ্‌র কথাটি হচ্ছে ঃ

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেবে, তারপর তারা ইদ্দত পালন শেষ করবে, তখন তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করো না।

'তোমরা বাধাগ্রস্ত করো না' কথাটি তো তালাকদাতা স্বামীদেরকে লক্ষ্য করে বলা। এই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন তার অর্থ হবে, তাদের ইদ্দতকে দীর্ঘ করে দিয়ে তাদের স্বামী গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করো না। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا -

তোমরা তাদেরকে ক্ষতি করা ও কষ্টদানস্বরূপ আটকে রেখো না বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্য।

অবশ্য 'তোমরা বাধাগ্রস্ত করোনা'র সম্বোধন অভিভাবকদের প্রতিও হতে পারে। হতে পারে আগের স্বামীদের প্রতি, সর্বসাধারণ মানুষের প্রতিও হতে পারে। আয়াতে কথটি সাধারণভাবেই এসেছে বলে এই সকলের প্রতিই সম্বোধন হতে পারে।

অপর একটি বর্ণনাকেও তাঁরা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -

যে মেয়ে-ই অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজে বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল—অকার্যকর।

অপর একটি বর্ণনাও রয়েছে ঃ لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ -

অভিভাবক ছাড়া বিয়ে নেই, হতে পারে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স)-এর এই কথা বর্ণনা করেছেঃ

لَاتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا -

কোন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোককে বিয়ে দেবে না, কোন স্ত্রীলোক নিজেকেও বিয়ে দেবে না। কেননা ব্যভিচারিণী নিজেকে বিয়েই দিয়ে থাকে।

প্রথমোক্ত হাদীসটি প্রমাণিত হয়। তাহাভী গ্রন্থের শরহে আমি তার কারণসমূহ বিস্তারিত বলেছি। অন্য শব্দেও বর্ণনাটি এসেছে। যেমনঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا -

যে মেয়েলোক তার অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে বসবে ......।

এটা আমাদের মত এবং আমাদের এই মত সেই দাসী সম্পর্কেও, যে তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত নিজেই নিজের বিয়ে দেবে। রাসূলের কথাঃ "অভিভাবক ছাড়া বিয়ে নেই' কথাটি মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। কেননা এটি আমাদের মতে অভিভাবকের উপস্থিতিতে বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক। ঠিক যেমন পুরুষ মানুষ নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক। কেননা পরিভাষায় 'ওলী' ولى তো সে, যে তার অধীনস্থ লোকের উপর অভিভাবকত্ব লাভ করে। মেয়েরাও এই অভিভাবকত্ব লাভ করতে পারে। নিজেদের কাজে-কর্মে হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব করতে পারে, পারে তার ধন-মালে। তার কোন আংশিক ব্যাপারেও পারে। তবে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি 'অপছন্দনীয়' অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা বিয়ের মজলিসে মেয়েদের উপস্থিতি পছন্দনীয় নয়। কেননা বিয়েটা তো প্রকাশ্যভাবে হতে হবে। এই কারণে লোকেরাই মজলিসে মেয়েদের উপস্থিতির ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করবে। আর আবূ হুরায়রার নিজের কথা হিসাবে 'ব্যভিচারিণী নিজেকে বিয়ে দেয়' বলা হয়েছে। আবূ হুরায়রা বর্ণিত অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ আবূ হুরায়রা নিজে বলেছেনঃ বলা হয়, 'ব্যভিচারিণী নিজে নিজেকে বিয়ে দেয়।' কিন্তু এই কথাটি ভুল এ প্রসঙ্গে। কেননা উক্ত মতে মুসলিম উম্মতের 'ইজমা' রয়েছে। কেননা কোন মেয়ের নিজেকে বিয়ে দেয়া নিশ্চয়ই যিনা নয়। কেবল মুসলমানই তাকে যিনা বলে না। তাতে সঙ্গম কাজের উল্লেখ হয়নি। যদি বলা হয়, মেয়ে নিজেকে বিয়ে দিয়েছে, স্বামী তার সাথে সঙ্গম করেছে, তবে তা-ও যে যিনা নয়, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। কেননা অভিভাবক ছাড়া বিয়েকে যে লোক জায়েয বলে না, সে বড়জোর বলবে, সে বিয়ে ফাসিক— ভালোভাবে হয়নি। তাতে মহরানা ধার্য হবে, ইদ্দত পালিত হবে, স্বামী সঙ্গম করলে ও সন্তান হলে তার বংশধারা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হবে। তাহাভীর শরহে এই বিষয়টি আমি সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্‌র কথাঃ

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ اَطْهَرُ -

তোমাদের জন্যে এই কাজ অত্যন্ত পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সম্পন্ন।

অর্থাৎ মেয়েদের বিয়েতে বাধা না দেয়া কাজটি। কেননা এ কাজ করতে বাধা দিলে বড়

নিষিদ্ধ কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করা যেতে পারে। বিয়ের আক্‌দ না করেই সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারে। তাই বক্তব্য হচ্ছে নবী করীম (স)-এর এই হাদীসের।

তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ، اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব যদি আসে, যার দ্বীন পালন ও চরিত্র তোমরা পছন্দ কর, তা হলে মেয়েকে তার নিকট বিয়ে দাও। যদি তা না কর, তাহলে দুনিয়ায় ফিতনা হবে, হবে বিরাট বিপর্যয়।

আবদুল বাকী ইবনে কানে মুহাম্মাদ ইবনে শাযান— মুয়াল্লা— হাতিম ইবনে ইসমাইল, আবদুল্লাহ ইবনে হরমুজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوْهُ، اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ -

তোমাদের নিকট যদি এমন লোক আসে, যার দ্বীন পালন ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তাহলে তার বিয়ে দাও। যদি তা তোমরা না কর, তাহলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেবে।

দুধ সেবন

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ -

সন্তান প্রসবকারী মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছরকাল দুধ খাওয়াবে।

আবূ বকর বলেছেন, বাহ্যত আয়াতটির কথা যেন একটি খবর। কিন্তু কথার ধরন দেখেই বোঝা যায়, এ কথার দ্বারা কোন খবর দেয়াই উদ্দেশ্য নয়। কেননা খবর হলে সে খবর কাকে দেয়া হল তা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। সন্তান প্রসবকারিণীদের মধ্যে এমন মায়েরা রয়েছে, যারা তাদের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়ায় না। তাই বোঝা গেল, এটা নিছক কোন খবর নয়। এটা যে একটা খবর মাত্র নয়, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। যে শব্দ খবর বহন করে এনেছে, তা প্রকৃত লক্ষ্য নয়, তখন এটা মার প্রতি দুধ সেবন করানোর একটি হুকুম না হয়ে যায় না। আর আরবী ভাষায় খবর দানের ভঙ্গীতে আদেশ দেয়ার রীতি চালু রয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -

তালাক প্রাপ্তারা তিন কুরু সময় পর্যন্ত নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে অপেক্ষা রত রাখবে।

প্রথমোক্ত আয়াতে মার জন্যে দুধ খাওয়ানোর হক প্রমাণ করাই আসল উদ্দেশ্য। পিতা যদি তা অস্বীকারও করে কিংবা দুধ খাওয়ানো বাবদ ব্যয় নির্ধারণ করতে যদি প্রস্তুতও না হয়, তবু মার হক রয়েছে তার সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর। অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ -

যদি মায়েরা তোমাদের জন্যে দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা তাদের মজুরী দিয়ে দাও।
(সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ৬)

অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ -

আর তোমরা (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে বাচ্চাকে অপর কোন স্ত্রীলোক স্তন দেবে। (সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ৬)

এ থেকে বোঝা গেল, মা চাক আর অস্বীকার করুক, তবু তাকেই দুধ খাওয়াতে বাধ্য করতে হবে। দুধ খাওয়ানো বা না-খাওয়ানোর ব্যাপারে তার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্য দুটি দিক থাকে। তা হচ্ছে, পিতা যদি মার দুধ খাওয়াতে অস্বীকার করে, তাহলে পিতাকে বাধ্য করতে হবে। দুই বছর কাল ধরে খাওয়ানোর বাধ্যতামূলক খরচ বহন যদি বেশীও হয়, তবুও। দুধ খাওয়ানোর ব্যয় বেশি পরিমাণে বহন করতে পিতা যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে সেজন্যে বাধ্য করা যায় না। এর পর একটি মাত্র উপায় থাকে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াবে।' এটা সব মার জন্যে সাধারণ কথা। তারা তালাকপ্রাপ্তা হতে পারে, না-তালাক প্রাপ্তাও হতে পারে। অথবা এই কথার পূর্বে যে তালাক প্রাপ্তাদের উল্লেখ হয়েছে, তার সাথে যোগ করা কথাও এটা হতে পারে। যদি এর লক্ষ্য হয় সমস্ত মায়েরা— তালাক প্রাপ্তা ও বিবাহিতারা। বিবাহিতাদের জন্যে জরুরী ব্যয় হচ্ছে স্ত্রীত্বের ভরণ-পোষণ ও বস্ত্র দান। এটা দুধ খাওয়ানোর জন্যে নয়। কেননা স্ত্রী হওয়ার কারণে সে দুধ খাওয়ানোর জন্যে স্বতন্ত্র কিছু পাওয়ার অধিকারী নয়। ফলে তার জন্যে দুটি ব্যয় একত্রিত হবে। একটি সন্তানের পিতার স্ত্রী হওয়ার কারণে। আর অপরটি দুধ খাওয়ানোর জন্যে। যদি সে তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহলে সে দুধ খাওয়ানোর ব্যয়টা অবশ্য পেতে পারে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে। কেননা তাকে দুধ খাওয়াতে বাধ্য করা হয়েছে। এ অবস্থায় সে সন্তানের পিতার স্ত্রী নয়। তার থেকে তালাক প্রাপ্তির কারণে ইদ্দত পালন রতও নয়। কেননা এই কথাটিতে যোগ করা হয়েছে এই কথার উপর ঃ 'আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে, পরে তারা পৌঁছে যাবে তাদের ইদ্দতের শেষ মিয়াদে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে বাধা দিও না।' তাই তখন সে যথারীতি ইদ্দত পালন শেষ করে ফেলেছে সন্তান প্রসব দ্বারা, তখন দুধ খাওয়ানোর মজুরী হিসেবে সে ব্যয় পাওয়ার অধিকারী হবে। এ-ও হতে পারে যে, তালাক দেয়া হয়েছে সন্তান প্রসবের পর। তখন হায়য হিসেবে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

দুধ খাওয়ানোর খরচ ও ইদ্দতকালীন খরচ একসাথে দিতে হলে কি করা হবে— এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। এ পর্যায়ের দুটি বর্ণনায় একটিতে বলা হয়েছে, সে দুটিই একসাথে পাবে। আর অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইদ্দত পালনকালীন খরচা পাওয়ার সাথে সাথে দুধ খাওয়ানো বাবদ কিছুই পাবে না। অবশ্য উদ্ধৃত আয়াত এই দুটি অর্থেরই ধারক। একটি হল, মা তার সন্তানকে দুই বছর কাল ধরে দুধ খাওয়ানোর বেশি অধিকারী। পিতার অধিকার নেই সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে

নিযুক্ত করার। অবশ্য যদি সে দুধ খাওয়াতে রাজী হয়। আর দ্বিতীয়, দুধ খাওয়ানোর খরচা বাবদ পিতার উপর যা বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য হয় তা হচ্ছে মাত্র দুই বছর। আয়াতের দলীলের স্পষ্ট যে, পিতা দুধ খাওয়ানোর খরচায় শরীক নয়। কেননা আল্লাহ— এই খরচ বাধ্যতামূলক করেছেন পিতার উপর সন্তানের মা'র জন্যে। এ সময় সে এবং সন্তান উভয়ই সন্তানের পিতার উত্তরাধিকারী। দুজন মীরাসে শরীক হলেও মা'র তুলনায় পিতাকেই অধিক বাধ্য করেছেন দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করার জন্যে। খরচ বহনের জন্যে বিশেষভাবে পিতাকে বাধ্য করার মূল কথাই হচ্ছে এই। অন্য কাউকে সেজন্যে দায়ী করা হয়নি। ছোট বয়সের ও বড় বয়সের অপ্রতিষ্ঠিত সন্তানের খরচের যাবতীয় ব্যাপারে পিতা-ই দায়িত্বশীল। এ কাজে তার সাথে অন্য কেউ শরীক নয়— উদ্ধৃত আয়াতই তার দলীল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তাদের রিযিক এবং পরিধেয় যথারীতি দেয়ার দায়িত্ব'— স্ত্রী থাকা পর্যন্ত তার এই সবই স্বামীকে বহন করতে হবে। এটাই এই আয়াতের বক্তব্য। কেননা আয়াত তো স্ত্রীও তালাক প্রাপ্তা, সব সন্তান প্রসবকারী মাকেই এর মধ্যে শামিল করেছে। আর আল্লাহ্ কথা ঃ بِالْمَعْرُوْفِ 'যথারীতি' কথাটি বোঝায় ব্যক্তি অবস্থানুপাতে তাকে এই খরচা ও পোশাক দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি আর্থিক অনটনে থাকে, তাহলে যতটা সম্ভব, আর সচ্ছলতার সময়ে সাধ্যানুসারে। কেননা এই অভাবগ্রস্ত পুরুষকে তার সাধ্যের বেশি দিতে বাধ্য করে না। আর সচ্ছল ব্যক্তিকেও বাধ্য করে না পার্থক্য করতে। অবশ্য তা 'যথেষ্ট পরিমাণে' হওয়া আবশ্যক, এটাও আয়াতের দাবি— স্বামীর অবস্থানুযায়ী। আল্লাহ্ নিজেই তার পরে পরেই সে কথাটি বলে দিয়েছেন ঃ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا 'সাধ্যের অতীত কিছু করার কোন দায়িত্ব কাউকেই দেয়া হয় না।' সাধারণ প্রচলিত ও অভ্যাসগত মাত্রার চাইতে বেশি খচর করা যদি স্ত্রীর চাহিদা হয়, তবে তা দেয়া হবে না। অনুরূপভাবে তারই মতে স্ত্রীর প্রয়োজন মাত্রার কম যদি দেয় স্বামী, তাহলে তা তার জন্যে হালাল হবে না, বরং সেই মান অনুযায়ী ব্যয় করতে স্বামীকে বাধ্য করা হবে। এ আয়াতে এ কথারও দলীল রয়েছে যে, খোরাক-পোশক দেয়ার ভিত্তিতে সন্তানের লালন-পালনের জন্যে ধাত্রী নিযুক্ত করাও জায়েয। কেননা উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ যার ব্যবস্থা করেছেন, তা হল দুধ খাওয়ানোর মজুরী দান। আল্লাহ একথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এ আয়াতে ঃ

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

যদি তারা (তালাক দেয়া স্ত্রীরা) তোমাদের জন্যে সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা তাদের মজুরী দাও।

এ আয়াত একথারও প্রমাণ যে, নিত্যনব ঘটিত ব্যাপারাদিতে ইজতিহাদ করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা যে মেয়েলোক সন্তানকে দুধ খাওয়াবে, তার জন্যে প্রচলিত বাজার দর হিসেবে ব্যয় পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে না, তা করার জন্যে চিন্তা-বিবেচনা করতে হবে এবং ন্যায়পরতার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আর এটাই ইজতিহাদ। বিশেষত এ প্রয়োজন এজন্যেও যে, তা সাধারণ অভ্যাস ও প্রচলনের উপর অধিকাংশ লোকের মতের ভিত্তিতে করতে হয়। আর যা যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল, তা নির্ধারণের উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ ও প্রবলতর ধারণা। কেননা অভ্যাসটা একটি মাত্র পরিমাণের উপর দাঁড়ায় যা এমন

যে, তার বেশিও হতে পারবে না, কম-ও হতে পারবে না। অন্য দিক দিয়ে তা ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল। আর তা হচ্ছে স্বামীর সচ্ছলতা ও অ-সচ্ছলতায় তার অবস্থার বিবেচনা, সেই 'কিফায়াত' পরিমাণ নির্ধারণ। সম্ভবতার দিকটিও সামনে রাখা। কেননা আল্লাহ তো বলে-ই দিয়েছেন যে, 'সাধ্যের অতীত কারোর উপরই দায়িত্ব চাপানো হয় না।' আর সচ্ছলতার ব্যাপারটিও সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সাধ্যের অতীত কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয় না' যারা মনে করে যে, স্বামীকে বাধ্য করতে হবে, তাদের ধারণাকে বাতিল প্রমাণ করে। তাদের ধারণা, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে এমন এমন কাজের দায়িত্ব দেন, যা করার সাধ্য তাদের নেই। আসলে এটা আল্লাহ্ সম্পর্কে একটা চরম মিথ্যা কথা অথচ আল্লাহ্ এদের কথার হীনতা ও নির্বুদ্ধিতার অনেক উর্ধ্বে, পরম পবিত্র।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ -

কোন মাতার ক্ষতি করা হবে না তার সন্তানের কারণে এবং কোন পিতারও ক্ষতি করা হবে না তার সন্তানের কারণে।

আল-হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাতা বলেছেন ঃ এ আয়াতে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে পারস্পরিক ক্ষতি সাধনের কথা বলা হয়েছে। সাঈদ ইবনে যুবায়র ও ইবরাহীম বলেছেনঃ দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটি কোন ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে গেলে মাকে ইখতিয়ার দিতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, মাকে তার সন্তানের জন্যে ক্ষতির মধ্যে ফেলা হবে না এভাবে যে, সম্পর্কহীন মেয়েলোক সে সন্তানকে যেমন করে দুধ খাওয়াবে, সে যদি রাজী হয় তাহলে সে-ও ঠিক সেইভাবে দুধ খাওয়াবে, আর সেই রকমই তাকেও মজুরী দেয়া হবে, তা ঠিক নয়, বরং সে অনেক উচ্চতর মর্যাদা পাবে, যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَنْ لَا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

সন্তান প্রসবকারিণী মায়েরা তাদের সন্তানকে দুধ খাওয়াবে পূর্ণ দুই বছর— তার জন্যে যে, দুধ পান করাটাকে পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর দায়িত্ব হবে সেই মাদের খোরপোশ দেয়া শুভ নিয়মে।

এ আয়াতে গর্ভধারিণী মাকে তার সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে অধিক অধিকার সম্পন্ন বানিয়ে দেয়া হয়েছে এই দুই বছর কাল ধরে। পরে আল্লাহ তাঁর কথার দ্বারা সে কথার উপর তাগিদ করেছেন, বলেছেন, 'মার ক্ষতি করা হবে না তার সন্তানের দ্বারা। অর্থাৎ মা যদি দুধ খাওয়াতে রাজী হয়, যেমন করে সে ছাড়া অন্য কেউ তাকে দুধ খাওয়াবে, তাহলে সন্তানের পিতার কোন অধিকার থাকবে না মার কোনরূপ ক্ষতি করার। এবং সন্তানকে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দুধ খাওয়াবার জন্যে দিতে পারবে না। একথাটি তেমনই, যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ -

মা'রাই যদি সন্তানকে তোমাদের জন্যে দুধ খাওয়ায়, তাহলে তাদের প্রাপ্য মজুরী তাদেরকে দাও।

এ আয়াতেও মাকেই দুধ খাওয়ানোর জন্যে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরপর বলেছেন ঃ

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى -

যদি তোমরা পরস্পর কষ্ট দিতে ইচ্ছা কর, তাহলে অবশ্যই অন্য কেউ দুধ খাওয়াবে।

অর্থাৎ দুধ খাওয়ার ব্যাপার মার অধিকার প্রত্যাহার করা হয়নি। হ্যাঁ, যদি কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে অন্যকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিযুক্ত করা যাবে। এ কথাটির তাৎপর্য এ-ও হতে পারে যে, মা যদি সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ না-ই করে, তাহলেও তার সন্তানের কারণে তার ক্ষতি সাধন করা হবে না। তা হতে পারে এভাবে যে, তার কোল থেকে তার সন্তান কেড়ে নেয়া হবে। এরূপ অবস্থায় নিযুক্ত ধাত্রীকে মার নিকট থেকে তাকে দুধ দিবার জন্যে প্রস্তুত করতে স্বামীকে আদেশ করা হবে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ তা-ই বলেছেন। মার নিকট থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নিয়ে তার ক্ষতি করার— তাকে কষ্ট দেয়ার কথাটিও আয়াতে সমন্বিত রয়েছে এবং অন্যকে তাকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে নিযুক্তও করা যেতে পারে— যাতে মার মানসিক কষ্ট দান হবে। এই কারণে আয়াতটির কথাটির উভয় অর্থই করতে হবে। তাহলে অন্য মেয়েলোক দুধ খাওয়ানোর কাজে নিযুক্ত করা থেকে স্বামীকে বিরত রাখা যাবে, যদি মা-ই তাকে দুধ খাওয়াতে রাজী হয়ে যায় যথার্থ মজুরীর বিনিময়ে। আর তা হল খোরাক-পোশাক প্রচলিত নিয়মে ভালোভাবে। আর সে যদি দুধ খাওয়াতে রাজী না হয়, তাহলে ধাত্রী— দুধ দায়িনী মেয়েলোক— মা'র বাড়িতে থেকে শিশুকে দুধ খাওয়াবার জন্যে নিযুক্ত করতে স্বামীকে বাধ্য করা হবে। যেন মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়ার ক্ষতিকর পথ বন্ধ হয়ে যায়।

এ আয়াতে এ দলীলও রয়েছে যে, মা অধিক অধিকার রাখে তার সন্তানকে ধরে রাখার, যতদিন সে ছোট থাকবে। দুধ খাওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও। কেননা তারপরে-ও শিশুর লালন-পালনে মারই অধিক প্রয়োজন। আর দুধ না খেলেও শিশুর জন্যে মার বর্তমানতা একান্তই আবশ্যক, যেমন পূর্বে ছিল। দুধ খাওয়ানোর সময় মা যেমন সন্তানের উপর বেশি অধিকার রাখে, দুধদায়িনী অন্য কেউ হলেও। জানা গেল, মার নিকট শিশু সন্তানের অবস্থানের ব্যাপারে মার অনস্বীকার্য হক রয়েছে। সন্তানেরও হক তাই। মা-ই তো শিশু সন্তানের প্রতি অধিক দয়ার্দ্র হৃদয়। মার টানও সন্তানের প্রতি অন্যদের অপেক্ষা অনেক বেশি। শিশুর ক্ষেত্রে আমাদের মতে ব্যাপারটি এইরূপ যে, শিশু-পুত্রের মনের দাবি হল, সে একা খাবে, একা পান করবে। সে একাই অযূ করবে। আর কন্যা সন্তানের জন্যে এই ব্যবস্থা তার পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত চলতে হবে। কেননা শিশু পুত্র যদি এতটা বড় হয় যে, এখন তার আদব-কায়দা ও লেখা-পড়া শেখা প্রয়োজন, তার প্রাথমিক বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তখন পিতার পরিবর্তে তার মার কাছে থাকা বাচ্চারই ক্ষতির কারণ। পিতার জন্যেও তা কষ্টকর। তদুপরি তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন অধিক তীব্র। এরূপ অবস্থাকে সামনে রেখেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مُرُوْهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ -

তোমাদের সন্তান সাত বছর বয়সের হলে তাকে নামায পড়তে আদেশ কর। দশ বছর বয়সে প্রয়োজন হলে মারপিট কর। আর তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শোবার ব্যবস্থা করে দাও।

অর্থাৎ সাত বছর হলেই তাকে নামায শেখাতে ও আদব-কায়দা জানাতে হবে। কেননা এ সময় সে এসব বুঝতে পারে। এভাবে অন্যান্য জরুরী বিষয়ের শিক্ষা দান এই সময় থেকেই শুরু করতে হবে। এই অবস্থায় বাচ্চার তার তালাকপ্রাপ্তা মার নিকট থেকে যাওয়া তার নিজের জন্যে ক্ষতিকর। যেসব কারণে বাচ্চার ক্ষতি হয় তাতে তার উপর কারোর অভিভাবকত্ব থাকে না। কন্যা সন্তানের অবস্থা ভিন্নতর। উক্ত অবস্থায় তার মার নিকট থাকাটা তার জন্যে ক্ষতিকর নয়। অবশ্য তার হায়য হওয়া অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত বরং সেটা তার জন্যে উপকারী ও কল্যাণকরই হয়। কেননা এই বয়সে তার নারী চরিত্র ও নারী জীবনের নিয়ম-কানুন, দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভ জরুরী এবং তা মার নিকট থেকেই উত্তমভাবে শিখতে পারে। তার উপর এই অভিভাবকত্ব চলতেই থাকে। তার পূর্ণ বয়স্কতা লাভ করার পর-ই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর মা যেহেতু তার গর্ভধারিণী ও তাকে প্রসবকারিণী, এজন্যে মা তার উপর এই অভিভাবকত্বটুকু লাভ করে থাকে। কাজেই এই সময় তার মার নিকট অবস্থান করায় কোন ক্ষতির আশংকা করা যায় না। কাজেই পূর্ণ বয়স্কতা লাভ পর্যন্ত তার মা'র নিকট থাকা খুবই উত্তম। তার পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর তার জন্যে সর্বাধিক প্রয়োজন তার সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণ কাজ পিতাই উত্তমভাবে করতে সক্ষম। এই কারণে এই সময় তার পিতার আশ্রয়ে থাকা আবশ্যক। এই কথা আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কুরআন থেকেই প্রমাণিত। এ বিষয়ে রাসূলে করীম (স) থেকেও কথা বর্ণিত হয়েছে। কথাটি আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে এসেছে। হযরত হামযা (রা)-এর কন্যাকে নিয়ে হযরত আলী, জায়দ ইবনে হারিসা ও জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা) ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন। সে কন্যার খালা ছিলেন হযরত জাফর (রা)-এর স্ত্রী। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ মেয়েটিকে তার খালার নিকট রেখে দাও। কেননা খালা মার সমতুল্য। এই ঘটনা থেকে বোঝা গেল, মার অবর্তমানে খালা 'আসাবা' হওয়ার বেশি অধিকারী। যেমন কুরআনের আয়াত হুকুম দিয়েছে যে, পিতার তুলনায় মা সন্তানকে নিজের নিকট রাখার বেশি অধিকারী। এটা একটা মৌলনীতি এ বিষয়ে যে, মুহাররম রেহেম সম্পন্না মেয়েরা শিশুকে রাখার বেশি অধিকারী। পুরুষদের নিকটতর হতেও নিকটতর পুরুষের আমরা লালন-পালন অপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী।

এই হাদীসটি কয়েকটি তাৎপর্য সমন্বিত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, খালারও লালন-পালন করার অধিকার আছে। আসাবার তুলনায় তার অধিকার বেশি। এই কারণে হাদীসে তাকে মা বলা হয়েছে। তা প্রমাণ করে যে, শিশুর মুহরিম রেহেম সম্পন্ন যে-ই হবে, তার হক রয়েছে এবং তা নিকটতর তারপর নিকটতর হিসেবে কার্যকর হবে। কেননা এই হকটা কেবল জন্মসূত্রেই হয় না। উমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে— আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একজন মেয়েলোক তার সন্তানসহ নবী করীম (স)-এর নিকট আসে। বলে, হে রাসূল! আমার পেট এই শিশুর জন্মক্ষেত্র, আমার স্তনদ্বয় এর পান পাত্র, আমার কোল তাকে পরিবেষ্টন করে

রেখেছিল। এর পিতা তাকে আমার নিকট থেকে কেড়ে নিতে চাচ্ছে। এর জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ তুমি যদ্দিন বিয়ে না বসছ, তদ্দিন এর ব্যাপারে তোমার অধিকার অগ্রগণ্য। হযরত আলী, আবূ বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও মুগীরা ইবনে শুবা প্রমুখ বড় বড় সাহাবী এবং কিছু সংখ্যক তাবেয়ী থেকে উক্তরূপ কথা জানা গেছে। শাফেয়ী বলেছেন, বালক নিজে নিজেই যদি পানাহার করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে ইখতিয়ার দিতে হবে। যদি সে পিতার নিকট থাকা পছন্দ করে, তাহলে তা-ই তার জন্যে ভালো। অনুরূপভাবে যদি মাকে গ্রহণ করে, তাহলে সে তার নিকটই থাকবে।

এই পর্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলে করীমের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তা হল, রাসূলে করীম (স) একটি বালককে তার পিতা-মাতার মধ্যে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দুজনার একজনকে বাছাই করে নাও— যাকে তুমি চাও। আবদুর রহমান ইবনে গনম বলেছেন, আমি উপস্থিত থেকে দেখেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি বালককে তার পিতা-মাতার মধ্যে একজনকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। নবী করীম (স) থেকে যা বর্ণিত, তা হতে পারে, যদি বালক বালেগ হয়ে থাকে। পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর-ও আরবী ভাষায় তাকে 'গুলাম' বলা হয়ে থাকে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিও একটি বালককে এমনিই ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তার ছোট ভাইও যদি বালেগ হতো, তাহলে তাকেও আমি এরূপ ইখতিয়ার দিতাম। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম জন বালেগ — পূর্ণ বয়স্ক হয়েছিল। আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— একটি মেয়েলোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। বলল, সে আমাকে তালাক দিয়েছে এবং সে আমার পুত্রকে আমার নিকট থেকে কেড়ে নিতে চায়। অথচ আমার পুত্র আমাকে অনেক কল্যাণ দিয়েছে, আমাকে আবূ আমবাতার কূপ থেকে পানি পান করিয়েছে। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, তোমার পুত্রের উপর তোমরা দুইজন অংশ ভাগাভাগি করে নাও। তখন স্বামী বলল, আমার পুত্রের ব্যাপারে আমার পক্ষে কে কথা বলবে? নবী করীম (স) বললেন ঃ হে পুত্র! এই তোমার মা, আর এই তোমার পিতা। এখন এ দুজনার মধ্যে তুমি যাকে চাও, পছন্দ করে নাও। তখন পুত্র মা'র হাত ধরল।

মা'র কথা ঃ 'আমার পুত্র আমাকে আবূ আমবাতার কূপ থেকে পানি পান করিয়েছে' বোঝায় যে, সে ছেলে বড় ছিল। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, ছোট বয়সের বালাকের সর্ব ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকে না— দেয়া যায় না। পিতা-মাতার ব্যাপারও তাই। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেছেন, না, পুত্রকে ইখতিয়ার দেয়া যাবে না, কেননা সে দুটি জিনিসের মধ্যে সব চাইতে খারাপটি বেছে চিহ্নিত করতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, কথাটি ঠিক। কেননা বালকরা সাধারণত খেল-তামাশাকে বাছাই করে, শিক্ষা-দীক্ষার দিকে লক্ষ্য দেয় না, সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا 'তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।' আর একথা জানাই আছে যে, পিতা সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে অধিক সক্ষম হয়ে থাকে। এ কারণে সন্তানের মা'র নিকট অবস্থান তার জন্যে ক্ষতিকর হয়। মার নিকট থাকলে নারী স্বভাব তার উপর প্রবল হয়ে দেখা দেবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ 'না পিতার ক্ষতি করা হবে তার সন্তানের দ্বারা (বা কারণে)। স্বামী তার স্ত্রীকে তার সন্তান দ্বারা ক্ষতি করবে তা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। তেমনি স্ত্রীকেও নিষেধ করা হয়েছে, তার সন্তান দ্বারা পুরুষটিকে ক্ষতি করা থেকে। স্ত্রীর দিক থেকে এই ক্ষতিটা খরচ ইত্যাদির দ্বারা হতে পারে। খরচার ব্যাপারে ক্ষতিটা হতে পারে এভাবে যে, সে তার প্রকৃত পাওনার চাইতে অনেক বেশি দাবি করতে ও স্বামীকে তা দিতে বাধ্য করতে পারে। আর খরচাদি ছাড়া এই ক্ষতিটা এভাবে হতে পারে যে, সন্তানের পিতাকে নিষেধ করতে পারে তার সন্তানকে দেখা ও তার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে। সন্তানকে পিতার সাথে অপরিচিত বানিয়েও রাখতে পারে। পিতা যে শহরে বা গ্রামে বাস করে, সেখান থেকে তাকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারে, যেন পিতা তার সন্তানকে দেখতে না পায়। তাতে সন্তানের কারণেই পিতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটাও অসম্ভব নয় যে, মা সন্তানকে এমন বানিয়ে দিল যে, সে পিতার কথা শুনতে প্রস্তুত হয় না। তাকে পিতার নিকট ছেড়ে দিতেও সে নিষেধ করতে পারে। এই সমস্ত দিকই সম্ভাব্যতার পর্যায়ে গণ্য। আর এইসব সম্পর্কেই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সন্তানের পিতাকে সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না'। অতএব আয়াতটিকে এই সব অর্থে গ্রহণ করা কর্তব্য।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ 'এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ হবে'। 'এবং পিতার উপর ধার্য হবে তাদের খোরাক-পোশাক দেয়া ভালোভাবে' থেকে যত কথা এরপূর্বে রয়েছে, সেই কথার সাথে এই কথাটুকু সংযোজন। কেননা সব কথাই واو দ্বারা একটার পর একটা সাজিয়ে বলা হয়েছে। واو হল সংযোজন অক্ষর। ফলে পূর্বে উল্লিখিত সব কথাই একই খোরাক-পোশাকের অবস্থার উপর বলা। এবং প্রত্যেককে অপরকে ক্ষতি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এই সব তাৎপর্যের কথাই ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। এরপর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ হবে।' অর্থাৎ খোরাক-পোশাক দেয়ার দায়িত্ব। আর তার ক্ষতি করতে পারবে না স্বামী, পারবে না স্ত্রীও। কেননা ক্ষতির কাজটি যেমন খোরাক-পোশাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে হতে পারে, তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও। তার সাথে সংযোজিত করে যখন উক্ত কথাটুকু বলা হয়েছে, তখন উপরে উল্লেখকৃত সব কাজ উত্তরাধিকারীর উপরও বর্তাবে। এদিকে হযরত উমর ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকে আল-হাসান, কুবায়বাতা ইবনে যুবায়র, আতা ও কাতাদাতা থেকেও বর্ণিত এই কথাটুকু পর্যায়ে। তাঁরা সকলেই বলেছেন, এটা খোরাক-পোশাক বাবদ খরচাদির ব্যাপারে উত্তরাধিকারীদের দায়িত্বের কথা। ইবনে আব্বাস ও শাবীর কথা হল, পারস্পরিক ক্ষতি হতে পারবে না। আবূ বকর বলেছেন, তাদের দুজনের কথাই তার উপর এই যে, ক্ষতিকর কাজ করা যাবে না। এতে এমন প্রমাণ নেই যে, তাঁরা দুজন উত্তরাধিকারীদের উপর 'নফকা' দেয়ার দায়িত্ব নেই বলে মত দিয়েছেন। কেননা ক্ষতিটা তো 'নফ্কা'কে কেন্দ্র করেই হয়। অন্যান্য ব্যাপারেও হতে পারে যদিও। অতএব তার উপর পারস্পরিক ক্ষতির ব্যাপারটি চাপলেও 'নফকা' দেয়ার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। 'নফকা' দেয়ার দায়িত্ব তার উপর না বর্তিলে তাকে বিশেষভাবে পারস্পরিক ক্ষতি করার থেকে নিষধ করা কোন ফায়দা হয় না। কেননা এ ব্যাপারে সে সম্পর্কহীন ব্যক্তির মতই।

এ-ও বোঝা যায় যে, তাৎপর্য হচ্ছে, 'নফ্কায়' পারস্পরিক ক্ষতিসাধন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও। তারপরই আল্লাহ্র এই কথাটি তার প্রমাণ ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -

তোমরা যদি অন্য কারোর দ্বারা তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে তোমাদের কোন গুনাহ্ হবে না।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, পারস্পরিক ক্ষতিকরণ, দুধ খাওয়ানো ও নফ্আ দেয়া— এর দুটো ক্ষেত্রেই হতে পারে।

আগের কালের ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে যে, ছোট বয়সের বাচ্চার খরচাদি দেয়ার দায়িত্ব কার উপর ? উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, তার পিতা না থাকলে আসাবাদের দায়িত্ব হচ্ছে বাচ্চার পালন-পালনের খরচাদি বহন করা। তাতে তিনি এ পর্যন্ত বলে গেছেন যে, বাচ্চার খরচাদি দেয়ার দায়িত্ব পিতার উপর, মার উপর নয়। কেননা পিতা 'আসাবা'। অতএব এই কাজটির দায়িত্ব 'আসাবা'দের উপরই পড়বে। তারা 'আকিলা' পর্যায়ের। জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন ঃ 'বাচ্চার খরচাদি বহনের দায়িত্ব পুরুষ ও মেয়েলোক— সকলেরই উপর তাদের প্রাপ্য মীরাসের অংশানুপাতে হবে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদদেরও এই কথা। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত— যেমন পূর্বে বলেছি— উত্তরাধিকারীদেরও দায়িত্ব বাচ্চার মাকে কষ্ট না দেয়া। এ-ও আমরা বলেছি যে, এটা প্রমাণ করে যে, তিনি মনে করেন, 'নফ্কা' দেয়ার দায়িত্ব উত্তরাধিকারীর উপর বর্তিবে, কেননা তা না দিলেই তো বাচ্চার মাকে কষ্ট দেয়া হবে, তার ক্ষতি করা হবে। ইমাম মালিক বলেছেন, বিশেষভাবে পিতা ছাড়া 'নফ্কা' দেয়ার দায়িত্ব অন্য কারোর উপর বর্তে না। এমনকি দাদার উপর-ও নয়। দাদার পুত্রের পুত্রের উপর-ও নয়। তবে পিতার পুত্রের জন্যে তা কর্তব্য হবে। শাফেয়ী বলেছেন, ছোট্ট শিশুর 'নফ্কা' তার কোন নিকটাত্মীয়ের উপর কর্তব্য হয় না। হয় শুধু পিতা, সন্তান, দাদা ও পিতার সন্তানের উপর।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ 'এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ' থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, আগেরকালের ফিকাহ্‌বিদরাও এ বিষয়ে একমত যে, নফ্কা সংক্রান্ত দায়িত্ব এই দুটি কথার খারাবীর ফয়সালা দেয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ' নফ্কা ও ক্ষতিকরণ সংক্রান্ত পূর্বে যা কিছু উল্লিখিত হয়েছে, তা সবকেই শামিল করে এবং উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তায়। কোন দলীল ছাড়া তা বিশেষভাবে কারোর উপর ধার্য করা জায়েয হতে পারে না। উত্তরাধিকারীদের উপর তা ওয়াজিব হয়, তা আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। তাদের কেউ-ই বলেননি যে, ভাই ও চাচার উপর নফ্কা ওয়াজিব হবে না। মালিক ও শাফেয়ীর কথা অন্যান্য সকলের কথা থেকে বাইরে। পিতা মুহরিম রেহমওয়ালা বলে যে কারণে তার উপর তা কর্তব্য হয়, নিকটবর্তী যে লোকই এই গুণের হবে, সেই কারণে তারও কর্তব্য হবে। আল্লাহ্র এই কথাটি থেকেও তা-ই বোঝা যায় ঃ

وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ -

এবং তোমাদের নিজের উপরও কোন দোষ হবে না, যদি তোমরা তোমাদের ঘর থেকে আহার কর।

أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ -

কিংবা যেসব ঘরের চাবি তোমাদের হাতে আছে, কিংবা তোমাদের বন্ধুগণ।

(সূরা আন-নূর ঃ ৬১)

এ আয়াতে রেহমওয়ালা মুহরিমের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জন্যে এই অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা তাদের ঘর থেকে খাবার খেতে পারে। বোঝা গেল, তারা অধিকার সম্পন্ন। তা না হলে তাদের জন্যে তা মুবাহ্ করা হতো না।

যদি বলা হয়, আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যে সব ঘরের চাবির মালিক হয়েছ কিংবা তোমাদের বন্ধুগণ ..... অথচ এরা দুজন 'নফকা' পাওয়ার অধিকারী নয়।

জবাবে বলা যাবে, তা এদের থেকে মনসূখ হয়ে গেছে, এটা সকলের মত। কিন্তু রেহমওয়ালা মুহ্‌রিমের মনসূখ হওয়া প্রমাণিত হয়নি।

যদি বলা হয়, চাচার পুত্রের উপর 'নফ্‌কা' দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যদি সে উত্তরাধিকারী হয়।

জবাবে বলা যাবে, বাহ্যত তা-ই আয়াতের দাবি। দলীলের ভিত্তিতেই তাকে বিশেষীকরণকৃত করা হয়েছে।

যদি বলা হয় এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও তেমনি, আল্লাহ্‌র এই কথাটি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর উপর 'নফ্‌কা' ওয়াজিব করে দিয়েছে, তাহলে পিতা ও মার উপরও নফ্‌কা ওয়াজিব করা উচিত তাদের দুজনের মীরাসের পরিমাণ অনুযায়ী।

জবাবে বলা যাবে, 'এবং উত্তরাধিকারীদের উপর ....' বলতে পিতা ছাড়া অন্যদের বোঝানো হয়েছে। তাই এই কারণে যে, কথার শুরুতেই পিতার কথা বলা হয়েছে যে, তার উপরই সমস্ত নফকা বর্তিবে। মা'র উপর কোন দায়িত্ব বর্তিবে না। এর পর সংযোজন করে বলা হয়েছে এই কথাটি ঃ 'এবং উত্তরাধিকারীর উপর অনুরূপ' এর মধ্যে সমস্ত উত্তরাধিকারীর সাথে পিতাকে শামিল করা জায়েয হবে না, কেননা তাতে পূর্বে বলা কথার মনসূখ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু একই কথার মধ্যে মনসূখ ও মনসূখকারী উভয়ের একত্রিত হওয়া জায়েয নয়। তা ছাড়া কোন হুকুমের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হওয়ার আগেই তা মনসূখ হয়ে যেতে পারে না।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন, যখন কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তার পিতা মরে গেছে, অথবা নিঃশেষ নিখোঁজ হয়ে গেছে, তখন তার মার কর্তব্য সেই সন্তানকে দুধ খাওয়ানো। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'এবং প্রসবকারিণী মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়াবে।' এই পিতার উপর যে কর্তব্য ছিল তা না থাকলে ও মার উপর কর্তব্য প্রত্যাহৃত হবে না। কোন রোগের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে মার বুকের দুধ যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য দুধ খাওয়ানোর কোন দায়িত্ব তার উপর বর্তিবে না। আর যদি তার পক্ষে কারোর দুধ খাওয়ানো সম্ভব না হয় এবং না করে, আর তাতে বাচ্চার মরে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলেও অন্য কারোর দ্বারা দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা মার কর্তব্য। সে কর্তব্য বাবার উপর কর্তব্যের দিক দিয়ে নয়। বরং এ কর্তব্য সাধারণভাবে সকলেরই উপর, যখন দেখা যাবে, কেউ মৃত্যুর সম্মুখীন, তার সাধ্যমত সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য।

উক্ত কথার এই অংশে বহু প্রকারের ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। একটি— তিনি মার উপর কর্তব্য চাপিয়েছেন দুধ খাওয়ানোর। দলীল দিয়েছেন আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'এবং প্রসবকারী মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়াবে।' কিন্তু তিনি তারই সাথে মিলিত কথাটির দিকে লক্ষ্য দেন নি। তা হচ্ছে ঃ 'এবং পিতার কর্তব্য তাদের খোরপোশ প্রচলিত নিয়মে দেয়া।' তার জন্যে যে খোরপোশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারই মুকাবিলায় দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব চাপিয়েছেন। কিন্তু বিনিময় না পেলে মার পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা কি করে সম্ভব হতে পারে? পিতার উপর খোরপোশ দেয়ার যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা সে এই দুধ খাওয়ানোর বদলে তা তো সকলেরই জানা। পিতা দুধ খাওয়ানোর বিনিময় দিয়েই মার কাছ থেকে সে সব সুবিধা লাভের অধিকারী হতে পারে, তা ছাড়া নয়। অতএব বিনিময় না দিয়ে তার উপর দুধ খাওয়ানোর কর্তব্য চাপানো কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা পিতার উপর 'নফ্‌কা' দেয়ার কর্তব্য চাপিয়েছেন তার বদলে 'নফ্‌কা' দেয়ার দায়িত্ব পালনের ফলে।

দ্বিতীয়ত, 'দুধ খাওয়াবে তাদের সন্তানদের' কথাটি দ্বারা মায়েদের উপর দুধ খাওয়ানো ওয়াজিব করে দেয়া হয়নি। দুধ খাওয়ানো তো তাদের হক। কেননা দুধ খাওয়াতে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না, এ বিষয়ে সকলেই একমত। সে অস্বীকার-ও করতে পারে। অবশ্য যদি সন্তানের পিতা জীবিত থাকে। আল্লাহ এ বিষয়ে আইন করে দিয়েছেন এই বলে ঃ 'তোমরা দুজন যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে দুধ খাওয়াবে অপর একজন।' অতএব এ আয়াত দ্বারা মার উপর সর্বাবস্থায় দুধ খাওয়ানো ওয়াজিব প্রমাণ করা যাবে না। বিশেষ করে পিতা যখন নিখোঁজ হয়ে যাবে। তার জীবদ্দশায়ও তার উপর তা ওয়াজিব করার ফায়সালা এ আয়াত দিচ্ছে না।

তার পর বলা হয়েছে, রোগ বা অন্য কোন কারণে মার দুধ না থাকলে তার উপর কোন দায়িত্ব নেই, যদি অন্য কারোর দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়, তবুও। এই কথাটিও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা দুধ খাওয়ানোর ফায়দা যদি তার প্রাপ্য হতো সন্তানের কারণে পিতার অবর্তমানে, তাহলে তার মার ধন-মাল দ্বারা তা সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, যদি সে অক্ষম হয়ে গিয়ে থাকে। যেমন পিতার উপর কর্তব্য চেপে আছে বাচ্চার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। যদি দুধ খাওয়ানোর ফায়দাটা তার মাল দ্বারা লাভ করা সম্ভব না হয়, তাহলে দুধ খাওয়ানোর বাধ্যবাধকতা তার উপর চাপানো জায়েয নয়। দুধের ফায়দা মার উপর বাধ্যতামূলক হওয়া এবং তার মালের উপর সে বাধ্যবাধকতা চাপানোর মধ্যে— যখন তার নিজের পক্ষে দুধ খাওয়ানো সম্ভব নয়, পার্থক্যটা কোথায়?

পরে অন্য একটি দিক দিয়েও উক্ত কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে। তা হল— দুধ খাওয়ানো শেষ হওয়ার পর তার খরচাদি যোগাড় করার দায়িত্ব মার উপর পড়ে না। দুধ খাওয়ানোর পর দুধ খাওয়ানো ও খরচাদি যোগাড়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আসলে এ দুটিই অল্প বয়সের বালকের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয়। তাহলে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা যায় কেমন করে? এ দিক দিয়ে পার্থক্য করা গেলে পিতার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পার্থক্য করা জায়েয হতো। এতদূর বলা যেত যে, পিতার উপর বাধ্যতামূলক হচ্ছে দুধ খাওয়ানোর খরচার ব্যবস্থা করা। পরে দুধ খাওয়ানোর মিয়াদ যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন ঐ বালকের জন্যে কিছু ব্যয় করা পিতার কর্তব্য নয়। কেননা আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকটির খোরপোশ দেয়ার দায়িত্ব পিতার উপর চাপিয়েছেন দুধ

খাওয়ানোর জন্যে মাত্র। পরে ধারণা করেছে যে, অন্য কারো দ্বারা দুধ খাওয়ানো মার পক্ষে সম্ভব হলে এবং বাচ্চার মৃত্যুর আশংকা হলে মারও কর্তব্য সে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে, যেমন তার নিজের উপর বাধ্যতামূলক— বাচ্চার মৃত্যুর আশংকা হলে। তা যদি এই অর্থে হয়ে থাকে, তাহলে তা তার পড়শির বা সর্ব মানুষের উপর না চাপিয়ে তার উপর বিশেষভাবে চাপানো যাবে কেমন করে ......? এই সব কিছুই অস্পষ্ট কথাবার্তা, দলীল যুক্তিবিহীন মত ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইমাম মালিক থেকেও এরূপ কথা এসেছে। তিনি এই খরচের দায়িত্ব পুত্রের জন্যে পিতার এবং পিতার জন্যে পুত্রের উপর চাপিয়েছেন। দাদার জন্যে পুত্রের পুত্রের উপর তা জরুরী মনে করেন না। কিন্তু এই কথা আগের কালের ফিকাহবিদদের এবং একালের মনীষীদের কথার সম্পূর্ণ বরখেলাপ। এই কথার সমর্থক কেউ আছে বলে আমাদের জানা নেই। তা সত্ত্বেও কুরআন এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ .... وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا -

এবং মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি লক্ষ্য দেয়ার জন্যে হুকুম দিয়েছি। তার মা তাকে এক দুর্বলতার পর আর এক দুর্বলতার উপর বহন করেছে .... এই পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে— বিষয়ে তুমি কিছুই জান না— বাধ্য করে, তাহলে তাদেরকে তুমি মানবে না। অবশ্য দুনিয়ায় তাদের সাথে ভাল সাহচর্য রক্ষা করবে।

(সূরা লোকমান ঃ ১৪ ও ১৫)

দাদাও এর মধ্যে শামিল। কেননা সে-ও পিতা পর্যায়ে গণ্য। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ 'তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত'। পূর্বোক্ত আয়াতে দাদাকেও পিতা গণ্য করে তার সাথে ভালো আচরণ গ্রহণের আদেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনই মতপার্থক্য নেই। দাদাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেলে— তার ক্ষুধা বন্ধ করার— সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাখলে তার সাথে ভালো সাহচর্য রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ -

তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে এবং তোমাদের বাপ-দাদার ঘর থেকে খাবার খাওয়া তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ নয়। (সূরা আন-নূর ঃ ৬১)

এ আয়াতে সেসব নিকটাত্মীয়দের উল্লেখ করা হয়েছে, পুত্রের ঘর বা পুত্রের পুত্রের ঘরের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা আল্লাহ্র কথা مِنْ بُيُوْتِكُمْ 'তোমাদের ঘর থেকে' তা-ই বোঝায়। যেমন বলা হয়, 'তুমি ও তোমার ধন-মাল তোমার পিতার।' এই কথাটিতে পুত্রকে পিতার মালিকানা বলা হয়েছে। যেমন 'পুত্রের ঘর' বলা হয়। এতে ঘরসমূহকে বাপ-দাদার বলে কথা শেষ করা হয়েছে।

'পুত্রের ও পুত্রের ঘর' বোঝানো হয়েছে, তার দলীল এই যে, একথা পূর্বেই জানা ছিল যে, কোন লোকের নিজের মাল নিজের উপর নিষিদ্ধ নয়। তাই 'তোমার মাল তুমি খাবে তাতে কোন দোষ নেই' এরূপ কথা বলার কোন প্রয়োজন-ই হয় না। কাজেই 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ থেকে খাবে' এই কথা দ্বারা পুত্রের, পুত্রের পুত্রদের ঘর বোঝানো হয়েছে, বুঝতে হবে। এই কারণে তাদের সকলের উল্লেখের প্রয়োজন মনে করা হয়নি, যেমন সমস্ত নিকটাত্মীয়দের উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তরাধিকারীদের তাদের মীরাসের অংশানুপাতে ব্যয় করা জরুরী হওয়ার কারণ কি? .... এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। হানাফী আলিমগণ বলেছেন, তা হচ্ছে, প্রত্যেক মীরাসের অংশধারীর উপর তাদের অংশের অনুপাতে, যা তারা পাবে বালকের সম্পদ থেকে, তার রেহম মুহরিমওয়ালা হওয়ার কারণে। বালকের যারা রেহম-মুহরিমওয়ালা নয়, খরচা যোগানোর কোন দায়িত্ব তাদের উপর নয়, যদিও তারা উত্তরাধিকারীই। এই কারণে খালার উপর বাচ্চার খরচাদি দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আর মীরাসের অংশ দেয়া হয়েছে চাচার পুত্রকে। কেননা চাচাতো ভাই রেহম-মুহরিম নয়। আর খালা এই অবস্থায় যদিও উত্তরাধিকারী নয়, তবে সে রেহম-মুহরিমওয়ালা মীরাস পাওয়ার লোকদের মধ্যের। তা এজন্যে যে, জানাই আছে, সে জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা মালিকের বেঁচে থাকা অবস্থায় মীরাস-ই হয় না। আর তার মৃত্যুর পর কে ওয়ারিস হবে তা কেউ জানে না। এটা অসম্ভব নয় যে, আজকের এই বালক তার উত্তরাধিকারী হয়ে পড়বে, যার উপর তার জন্যে ব্যয় করার দায়িত্ব পড়েছে। তার পূর্বে তার মৃত্যুর পর। এ-ও হতে পারে যে, তার ওয়ারিস এমন ব্যক্তি হবে, যে আড়াল করে রেখেছে তাকে যার উপর এই খরচা বহন ধার্য হয়েছে। অবস্থা যখন এরূপই, তখন জানলাম যে, মীরাস পেয়ে যাওয়াটাই আসল বক্তব্য নয়। আসল অর্থ হচ্ছে, রেহম-মুহরিমওয়ালাই মীরাস পাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর উপরই খরচাদি বহন কর্তব্য, সে রেহম-মুহরিমওয়ালা হোক, আর না-ই হোক। অতএব তা চাচার পুত্রের উপরও ওয়াজিব, কিন্তু খালার উপর নয়।

আমরা যা বলেছি, তা সহীহ্। তার প্রথম দলীল, সকলেই একমত একথায় যে, দাসমুক্তির মনিবের উপর খরচাদি বহন ওয়াজিব নয়, যদিও সে উত্তরাধিকারী। তেমনি মেয়েলোকের জন্যেও বাধ্যতামূলক নয় তার ছোট বয়সের স্বামীর খরচ বহনের। অথচ সে মেয়েলোক তার উত্তরাধিকারী।

এ থেকে প্রমাণ হল যে, খরচাদি বহন ওয়াজিব হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে তার রেহম-মুহরিমওয়ালা হওয়া।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ –

যে লোক দুধ পান করানোটাকে পূর্ণ করতে চায়, তার জন্যে পূর্ণ দুই বছর ......।

এই দুই বছর হয় আল্লাহ্‌র দিক থেকে নির্ধারিত, দুটি অর্থের একটি এই। অথবা হারাম হওয়া অনিবার্য হওয়ার দুধ পানের এটা মিয়াদ নির্ধারণ কিংবা দুধ পানের খরচ বহন পিতার

উপর এই সময়ের জন্যে কর্তব্য। 'দুই বছর'-এর উল্লেখের পর আয়াতের ধারাবাহিকতা চলেছে। বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا -

স্বামী-স্ত্রী দুজনই যদি পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের দুজনের কোন দোষ হবে না।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, 'দুই বছর' যে সময়কালে দুধ খেলে মুহাররম হয়, তার পরিমাণ নির্ধারণ নয় এটা। কেননা , অক্ষরটি تَعْقِيب বোঝায়— বোঝায় প্রথমোক্ত কথার পর-পরই এই কথা। অতএব তাদের ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটি দুই বছর পর হবে। আর দুজনের পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শভিত্তিক দুধ ছাড়ানোটা দুই বছর পর হবে। বোঝা গেল, আয়াতে দুই বছরের উল্লেখ যে দুধ খেলে মুহাররম হয় সেই দুধ খাওয়ানের শেষ সময় নির্ধারণস্বরূপ বলা হয়নি। অন্য কথায় দুই বছর পর-ও দুধ খাওয়ানো জায়েয হবে।

মুআবিয়া ইবনে সালিহ্ আলী ইবনে আবূ তালহা, ইবনে আব্বাস সূত্রে 'সন্তান প্রসবকারী মায়েরাই দুধ খাওয়াবে তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর, তার জন্যে যে দুধ সেবনটাকে পূর্ণ করতে চায়' এই আয়াত পর্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে বলেছেন, অতঃপর পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করলে কোন দোষ হবে না, দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেও ছাড়ানো যেতে পারে; কিংবা তার পরে। ইবনে আব্বাস (রা) এই হাদীস সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'যদি তারা দুজন দুধ ছাড়াতে চায় .... দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগের জন্যে যেমন, পরের জন্যেও তেমন।

আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -

যদি তোমরা ইচ্ছা কর যে, তোমাদের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না .... ।

এই দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থাটা বাহ্যত দুই বছর পরে। কেননা এই কথাটি পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শ ভিত্তিক দুধ ছাড়ানোর উল্লেখের পর তার সাথে সংযোজন হিসেবে বলা হয়েছে। তা তাদের জন্যে মুবাহ করা হয়েছে এবং দুই বছর পরও বাচ্চার জন্যে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা পিতার জন্যে মুবাহ করা হয়েছে, ঠিক যেমন তাদের জন্যে দুধ ছাড়ানো মুবাহ করা হয়েছে যদি তাতে বালকের কল্যাণ হবে বলে বিবেচিত হয়।

আমাদের এই বিশ্লেষণ এটাও প্রমাণ করে যে, দুই বছরের উল্লেখ সময় নির্ধারণ পিতার জন্যে, যে সময়ে দুধ খাওয়ানোর খরচাদি বহন তার জন্যে বাধ্যতামূলক। সরকার তাকে এজন্যে বাধ্যও করতে পারে।

দুধ খাওয়ার মিয়াদ নিয়ে মতপার্থক্য ঃ

আবূ বকর বলেছেন, বড় হয়ে যাওয়া মানুষকে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে আগের কালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মনে করেন, বয়স্ক

ব্যক্তিকে দুধ খাওয়ালে সে মুহাররম হবে, যেমন শিশু-বালককে খাওয়ালে হয়। এই পর্যায়ে তিনি আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস সালিমের প্রসঙ্গের ঘটনা বর্ণনা করতেন। নবী করীম (স) সাহ্লাতা বিনতে সুহায়লকে— সে ছিল আবূ হুযায়ফার স্ত্রী— বলেছিলেন, 'তুমি তাকে পাঁচবার দুধ খাওয়াও, পরে সে তোমার নিকট প্রবেশ করবে। হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট যখন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে অনুমিত দিতে চাইতেন, তখন তার বোন উম্মে কুলসুমকে আদেশ করতেন যে, তাকে পাঁচবার দুধ খাওয়াও। তার পরে সে তার নিক্‌ট উপস্থিত হতো। কিন্তু নবী করীম (স)-এর অন্যান্য সকল বেগমই এই কাজের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সম্ভবত এটা একমাত্র সালিমের জন্যে রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া রুখসত ছিল। এই বর্ণনাও এসেছে যে, সাহলাতা বিনতে সুহায়ল বলল, হে রাসূল! সালিম আমার নিকট আসে তা দেখে আবূ হুযায়ফার চেহারায় আপত্তি লক্ষ্য করি। তখন নবী করীম (স) বললেন, তুমি তাকে দুধ খাওয়াও। আবূ হুযায়ফার আপত্তি দূর হয়ে যাবে। মনে হয়, এটা বিশেষভাবে সালিমের জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। নবী করীমের বেগমগণ (রা) সকলেই উক্ত কাজের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন আবূ যিয়াদ ইবনে দীনারকে ছোট বাচ্চা জন্তু কুরবানী করার জন্যে বিশেষভাবে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তারপর অন্য কারোর জন্যে এই কাজ জায়েয হবে না। হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (স) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা প্রমাণ করে যে, বড় ব্যক্তিকে দুধ খাওয়ালে তাতে মুহাররম হবে না। আমাদের নিকট তা মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, সুফিয়ান, আশযাস, ইবনে সুলায়ম, তাঁর পিতা, মসরুক আয়েশা (রা) সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। মূল কথা, রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে রাসূল! এই লোকটি আমার দুধ ভাই। তখন নবী করীম (স) বললেন, তুমি তোমার দুধ ভাইদের সম্পর্কে চিন্তা কর। কেননা দুধ পান ক্ষুধার কারণেও হতে পারে।' এই কথা প্রমাণ করে যে, দুধ পানের হুকুমটা পানকারীর ছোট বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সেই অবস্থা, যখন দুধ কারো ক্ষুধা বন্ধ করে এবং তা তার জন্যে খাদ্য হিসেবে যথেষ্ট।

আবূ মূসা থেকে বর্ণিত, তিনি মনে করতেন বড় বয়সের লোকদের দুধ খাওয়ানোকে গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য পরে তিনি তাঁর এই মত প্রত্যাহার করেছেন, এই বর্ণনাও তাঁর নিকট থেকে পাওয়া গেছে। আর হুসায়ন আবূ আতীয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, এই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে এসে উপস্থিত হল। পথে তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করে। তার দুই স্তন ফুলে উঠে। পুরুষটি তার উপর মুখের থুথু ফেলে মর্দন করছিল। তখন পুরুষটির পেটে এক চুমুক দুধ প্রবেশ করল। সে আবূ মূসাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বায়েন তালাক হয়ে গেছে। পরে ইবনে মাসউদ (রা)-কে এই ঘটনা জানাল। তিনি দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। তখন আরব বেদুইনকে নিয়ে আবূ মূসা আল-আশআরী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি বললেন, এভাবে দুধ খাওয়ানোর ফলে কি মুহাররম হয় ? দুধ পানের দরুন মুহাররম হয়, যা পানকারীর দেহে গোশত ও অস্থি রচনা ও প্রবৃদ্ধি করে। তখন আশ'আরী বললেন, আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এই বর্ণনাটি তোমাদের সামনে রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর প্রথম মত ত্যাগ করে ইবনে মাসউদ (রা)-এর মত গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় তিনি বলতেন না যে, আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা

করো না। এই কথাও সামনে রয়েছে। তা তার বিরুদ্ধতায় দাঁড়িয়ে আছে। তবে যে ফতোয়া তিনি দিয়েছেন, তা ঠিক। আলী, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্, উম্মে সালমা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বয়স্ক লোককে দুধ খাওয়ালে মুহাররম হয় না। বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ালে কিছু হয় বলে মত দিয়েছেন এমন কোন ফিকাহবিদকে আমরা জানি না। তবে লাইস ইবনে সাদ থেকে একটি বর্ণনা এসেছে, তাঁর থেকে তা বর্ণনা করেছেন আবূ সালিহ। তাতে বলা হয়েছে, বড় বয়সের লোক দুধ খাওয়ালে মুহাররম হয়। কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত বিরল কথা।

কেননা হযরত আয়েশা (রা) থেকে পাওয়া একটি বর্ণনা বলছে যে, বড় বয়সে কারোর দুধ খেলে তাতে মুহাররম হয় না। হাজ্জাজ হিকাম, আবুল শাসা, আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, সে রকম দুধ পান করলে মুহাররম হয়, যদ্দ্বারা পানকারীর দেহে গোশত ও রক্ত জন্মে। হারাম ইবনে উসমান, জাবির-এর দুই পুত্র তাদের পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَلَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ -

বয়স্ক বুদ্ধিমান হওয়ার পর কেউ ইয়াতীম হয় না, শিশুকালের দুধ খাওয়া বন্ধ হওয়ার পর যে দুধ খাওয়া তা গণ্য নয়।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা)-এর হাদীসে, যা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ানো পর্যায়ে। সেটি আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, বালকদের দুধ খাওয়াবে, যেন তারা বড় হয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ালে মুহাররম হওয়ার কথাটি যখন বিরল, তখন এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়ে গেল যে, বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ালে মুহাররম হবে না।

মুহাররম হওয়ার দুধ খাওয়ানোর মিয়াদ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, দুই বছর এবং তার পর ছয় মাসের মধ্যে যে দুধ খাওয়ানো হবে, তাতে মুহারম হবে। এই মিয়াদের মধ্যে দুধ ছাড়ানো হোক আর না-ই হোক, মুহাররম হবে। তারপরে মুহাররম হবে না, দুধ ছাড়ানো হোক আর না-ই হোক। জুফর ইবনুল হুযায়ল বলেছেন, যতক্ষণ দুধ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং ছাড়ানো হবে না, তা-ই মুহাররম হওয়া দুধ খাওয়ানো। তা তিন বছর পর্যন্ত চলতে পারে। আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন দুই বছর মিয়াদের মধ্যে হলে মুহাররম হবে। তার পরে মুহাররম হবে না। দুধ ছাড়ানো গণ্য হবে না। গণ্য হবে সময়। ইবনে অহব মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, দুধের পরিমাণ কম হোক, কি বেশি, মুহাররম হবে দুই বছরের মধ্যে হলে। দুই বছরের পর হলে দুধের পরিমাণ কম হোক বেশি হোক মুহাররম হবে না। ইবনুল কাসিম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, দুধ পানের ব্যাপরটি হুকুমধারী হয় দুই বছর এবং এক বা দুই মাস তার পর। এ ব্যাপারে কেবল মার দুধ পান করানোর দিকে নজর দেয়া হবে না, দেয়া হবে দুই বছর এবং এক কি দুই মাসের প্রতি। তিনি এ-ও বলেছেন যে, দুই বছরের পূর্বেই যদি বিচ্ছিন্ন করা হয় ও দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দুধ খাওয়ায় তাহলে তাকে

'ফতীম' বলা হবে। অর্থাৎ সে মাতৃস্তন্য পান করা ত্যাগ করেছে। তখনকার দুধ খাওয়ানো মুহাররম বানাবে না, কেননা তার পূর্বেই সে দুধ খাওয়ার প্রয়োজন মুক্ত হয়েছে। অতএব তার পরে যে দুধ খাওয়া হয়েছে তাতে মুহাররম হবে না। আওজায়ী বলেছেন, এক বছর সময়ের মধ্যে যদি দুধ ছাড়ানো হয় এবং এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অতঃপর মুহাররম বানানোর দুধ পান হবে না। আর তিন বছরকাল ধরে যদি দুধ খাওয়ানো চলে, এর মধ্যে দুধ ছাড়ানো না হয়, তাহলে দুই বছর পর মুহাররম বানানোর দুধ পান হবে না। আগের কালের মনীষীদের থেকে বহু কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী (রা)-এর কথা ঃ দুধ ছাড়ানোর পর দুধ খেলে তা মুহাররমকারী হবে না। উমর ও ইবনে উমর (রা)-এর কথা মুহাররমকারী দুধ খাওয়ানো কেবল তাই, যা ছোট বয়সে পান করা হবে। এ থেকে বোঝা যায়, এদের নিকট দুই বছরের তেমন গুরুত্ব নেই।

কেননা আলী (রা) দুধ পান সংক্রান্ত হুকুমের ভিত্তি বানিয়েছেন দুধ ছাড়ানোকে। হযরত উমর (রা) ও তাঁর পুত্র ছোট বয়সকে, কোন সময় নির্ধারণ ছাড়াই।

উম্মে সালমা (রা) বলেছেন, দুধ ছাড়ানোর আগে স্তনদ্বয়ে যে দুধ খাওয়া হবে, তা-ই মহাররম বানায়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, যে দুধপান নাড়ি-ভূড়িতে আলোড়িত হবে, কেবল তা-ই মুহাররম বানায়, যদি দুধ ছাড়ানোর পূর্বে দুই স্তনে থাকে। তিনি হুকুমটাকে দুধ ছাড়ানোর পূর্বে ও নাড়িভূড়িতে আলোড়নের পূর্বের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তা ঠিক হযরত আয়েশা (রা) থেকে পাওয়া বর্ণনার মতই। তিনি বলেছেন, যে দুধ পানে পানকারীর দেহে গোশত ও রক্তের সৃষ্টি হয়, কেবল তাই মুহাররম বানায়। এই সব কথাই একথা বোঝায় যে, তারা কেউ-ই দুই বছরের কোন গুরুত্ব দেন নি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, দুই বছর পরের দুধ পান মুহাররম বানায় না। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

اَلرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

ক্ষুধার তাড়নায় যে দুধ পান, তা-ই মুহাররম বানায়।

বোঝা গেল, এই কথাটিও দুই বছরের সাথে সম্পর্কিত নয়। কেননা দুই বছর যদি নির্দিষ্ট সময় মিয়াদ হতো, তাহলে রাসূলে করীম (স) এরূপ কথা বলতেন না। তিনি বলতেন ঃ দুই বছরের মধ্যে দুধ খাওয়া হলে তার হুকুম গণ্য হবে। তিনি যখন দুই বছরের উল্লেখ করেন নি, বরং বলেছেন ক্ষুধার কথা, তখন তার অর্থ হবে, যে সময় স্তনের দুধ শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্ত করে শরীরে শক্তি দেয় কেবল সেটার দ্বারাই মুহাররম হবে। আর এটা দুই বছরের পর-ও হতে পারে। তাহলে বোঝা গেল, দুই বছর পর-ও দুধপান করা হলে তার দ্বারাও মুহাররম হতে পারে। হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ لَارِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ 'একবার দুধ ছাড়ানোর পর দুধ খেলে তা গণ্য হবে না।' প্রমাণিত হলো যে, দুই বছর পর দুধ ছাড়ালে তারপরে দুধ পানের হুকুম কার্যকর হবে না। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত আরও একটা হাদীসে তাই বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اَلرَّضَاعَةُ مَا اَنْبَتَ اللَّحْمَ وَاَنْشَزَ الْعَظْمَ -

যে দুধ পানে দেহে গোশত বাড়ে, অস্থি শক্ত হয়, কেবল তাই গণ্য।

এটাও প্রমাণ করে যে, দুই বছর দুধ পানের জন্যে সময় নির্ধারণ নয়। উপরোদ্ধৃত সব কয়টি হাদীস থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে কথা এসেছে, তার বর্ণনাধারা নির্ভরযোগ্য নয়। তা হল, এই পর্যায়ে গুরুত্ব বহন করে আল্লাহ্‌র এই কথা ঃ

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا -

সন্তান গর্ভে ধারণ এবং তার দুধ ছাড়ানোর মোট সময় ত্রিশ মাস। (সূরা আহক্বাফ ঃ ১)

মেয়েলোক যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে, তাহলে তাকে দুধ পান করানোর মিয়াদ দুই বছর। যদি নয় মাসে প্রসব করে, তাহলে দুধ পানের মিয়াদ একুশ মাস। যদি সাত মাসের প্রসব করে, তাহলে দুধ পানের মিয়াদ তেইশ মাস। এভাবে ত্রিশ মাস পূর্ণ হবে। এই সময়ের মধ্যে গর্ভ ধারণ ও দুধ ছাড়ানো সবই সম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু আগের কালের ও তাদের পরবর্তী ফিকাহবিদদের কেউ এই দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

অথচ বাচ্চাদের দুধ পানের প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন। কেউ দুই বছরের আগেই দুধ ছেড়ে দেয়, কেউ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর-ও তা ছাড়ে না। আর বড় বয়সের লোককে দুধ খাওয়ালে তাতে মুহাররম না হওয়ার ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ একমত। কেবল ছোট বয়সে দুধ পান করলেই তা গণ্য হবে। আগের কালের মনীষীদের এই পর্যায়ে মতামত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর ছোট বয়সের মিয়াদ দুই বছরের মধ্যে সীমিত নয়। দুই বছর বয়স হলেও তাকে বলতে কেউ নিষেধ করতে পারে না। এ থেকে আমরা জানলাম যে, দুই বছর মুহাররম হওয়ার দুধ পানের কোন মিয়াদ নয়। লক্ষণীয়, নবী করীম (স) যখন বললেন, ক্ষুধার তাড়না নিবৃত্ত করার জন্যে যে দুধ পান তাই গণ্য। বলেছেন, যে দুধ পানে গোশত হয়, অস্থি শক্ত হয়, কেবল তা-ই গণ্য। তখন বোঝা গেল, ছোট বাচ্চার অবস্থাটা বিভিন্ন হওয়ার কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যদিও সাধারণত দুই বছর গত হলে বাচ্চার দুধ পানের প্রয়োজন হয় না, এই কারণে দুই বছরকে এ ব্যাপারে গণ্য করা হয়নি। এর পরের বৃদ্ধিটা ইজতিহাদের ব্যাপার। কেননা সেটা অবস্থানুপাতে নির্ধারণ। যখন যথেষ্ট খাদ্য হিসেবে মার দুধ গণ্য হয়, তাতে বাচ্চার দেহে গোশত বাড়ে এই সময় এবং যে সময় দুধ পান জরুরী থাকে না, সাধারণ খাবার খেয়েই বাচ্চা বাঁচে ও বাড়ে, এই দুইটি সময়ের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। ইমাম আবূ হানীফার মতে এই সময়টা হচ্ছে দুই বছরের পর ছয় মাস। এটাই ইজতিহাদের পন্থা, ইজতিহাদের ফলশ্রুতি। যেখানে মত প্রকাশকারীর উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। যেমন ভোগ্য জিনিসের মূল্য নির্ধারণ, সেসব অপরাধের শাস্তি জরিমানা, যার পরিমাণ নির্ধারণে 'তওকীফ' অবতীর্ণ হয়নি এবং তালাক দেয়ার পর সে স্ত্রীকে মাত'আ— জীবনোপকরণ দেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে মনের প্রবল ধারণা অনুযায়ী কোন কিছুর দাবি করার কোন অধিকার কারোর নেই কোন দলীল পেশ করার যায় না বলে। এ পর্যায়ে এটা একটি সুষ্ঠু মৌল নীতি। এইসব একটি পদ্ধতিতেই চলবে। তার দৃষ্টান্ত পূর্ণ বয়স্কতা লাভের সীমা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার কথা, তা হচ্ছে, আঠার বছর। ইয়াতীমের মাল-সম্পদ তার নিকট হস্তান্তর করা যাবে না তার সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধির উদ্রেক না হওয়া পর্যন্ত। তার বিবেচনা চলবে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত। এই বয়সে পৌঁছলে তা তার হাতে ন্যস্ত করতে হবে। এ সব বিষয়ের দৃষ্টান্তসমূহ এমন যে, কোন পরিমাণ নির্ধারণ কেবল ইজতিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব।

কেউ যদি বলে যদিও এসব বিষয়ের নির্ধারণের পন্থাই হচ্ছে ইজতিহাদ, তবু একটি দিকের প্রয়োজন, যে বিষয়ে মনে একটা পরিমাণের প্রতি ধারণা প্রবল হয়ে উঠবে এবং তা সুনির্দিষ্ট হবে, অন্য কিছু নয়। তাহলে ইজতিহাদের পন্থায় দুই বছরের পর মাস গণ্য করা ও একটি পূর্ণ বছর গণ্য না করার কি কারণ থাকতে পারে? ইমাম জুফর তো এই কথাই বলেছেন।

এর জবাবে বলা যাবে, এ পর্যায়ে বলার একটি কথা হল এই যে, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ 'সন্তান গর্ভে ধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর কাজের মিয়াদ ত্রিশ মাস।' তার পরে বলেছেন ঃ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 'তার দুধ ছাড়ানোর কাজটা দুই বছরে হতে হবে।' এই দুই কথার তাৎপর্য থেকে বোঝা গেছে যে, গর্ভের মিয়াদ ধরা হয়েছে ছয় মাস। পরে তার উপর বৃদ্ধি ধরা হয়েছে পূর্ণ দুই বছর পর্যন্ত। কেননা কারোর কারোর গর্ভ দুই বছর পর্যন্ত চলতে পারে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই। আর আমাদের মতে দুই বছরের অধিক কাল গর্ভ চলে না। তাহলে উল্লিখিত গর্ভ এই সমগ্রের মধ্যে দুই বছর থেকে বাইরে যায় না। অনুরূপভাবে দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে ত্রিশ মাসের বাইরে যায় না। কেননা এই দুটি কাজ মোটামুটিভাবে আল্লাহ্র এই কথার মধ্যে উল্লিখত হয়েছে ঃ

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا -

সন্তানের গর্ভ এবং তার দুধ ছাড়ানোর মোট মিয়াদ ত্রিশ মাস। (সূরা আহক্বাফ ঃ ১৫)

আবুল হাসান এ বিষয়ে বলতেন, দুই বছর যখন দুধ ছাড়াবার সাধারণ অভ্যাসগত সময়, এর বেশী হওয়াও অসম্ভব নয়— যেমন আগে বলেছি, অতএব খাদ্য হিসেবে দুধ যেসব দুই বছর পর সাধারণ খাদ্য গ্রহণকালে স্থানান্তর ছয় মাসের মধ্যে হতে হবে। যেমন মার গর্ভস্থ সন্তানের সাধারণ খাদ্যের দিকে চলে যাওয়া ভূমিষ্ট হওয়া সহ ছয় মাস লাগে। আর তা-ই হচ্ছে গর্ভ ধারণের কম-সে-কম মুদ্দাত।

কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'সন্তান প্রসবকারী মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়াবে পূর্ণ দুই বছর তার জন্যে যে দুধ খাওয়ানোটাকে পূর্ণ করতে ইচ্ছুক' দুই বছরের উপর অকাট্য দলীল এবং চূড়ান্ত দুধ খাওয়ানোর জন্যে। অতএব তার পরে— মহাররম হওয়ার— দুধ খাওয়া তার পরে গণ্য হওয়া জায়েয নয়।

তাকে জবাবে বলা যাবে, 'সম্পূর্ণ করতে চাওয়া' কথাটি তার উপর বৃদ্ধির পরিপন্থী নয়। আল্লাহ নিজেই গর্ভের মিয়াদ ধরেছেন ছয় মাস। তা এই কথাটিতে বলা হয়েছে ঃ 'সন্তানের গর্ভ ও তার দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে হতে হবে।' অন্যত্র বলেছেন ঃ 'তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরের মধ্যে।' এই গোটা কথা— যা দুটি আয়াতে বলা হয়েছে— এতে গর্ভের সময় ধরা হয়েছে ছয় মাস। তার উপর কিছু বেশি হওয়া নিষিদ্ধ নয়। দুধ খাওয়ানোর মিয়াদ স্বরূপ দুই বছরের উল্লেখ এ দুটির উপর বৃদ্ধি পাওয়াকেও নিষেধ করছে না। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ -

যে লোক তারিখ মত আরাফাতে উপস্থিত হতে পারল, সে হজ্জ পেয়ে গেল।

তার উপর ফরয বৃদ্ধি নিষিদ্ধ নয়। উপরন্তু তা এমন এক পরিমাণ নির্ধারণ, যা দুধ খাওয়ানোর মজুরী দানের দায়িত্ব পিতার উপর চাপায়। অথচ সে তার অধিক কালের দায়িত্ব

বহনে সাধ্য হতে পারে না। কেননা দুধ খাওয়ানোর কাজটা দুজনের সন্তুষ্টি ও রাজী হওয়ার ভিত্তিতে হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

যদি তারা দুজন রাজী হওয়া ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের কোন অপরাধ হবে না।

আল্লাহ একথাও বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা ইচ্ছা কর যে, তোমাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে, তাহলে তোমাদের দোষ হবে না।

এতে দুই বছর পর-ও মুহাররম হওয়ার দুধ খাওয়ানো প্রমাণিত হল। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মুহাররম হওয়ার হুকুমটা এই দুই বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

যদি বলা হয়, দুধ ছাড়ানোটার গুরুত্ব স্বীকার করা হল না কেন ? যেমন ইমাম মালিক গণ্য করেছেন দুই বছরের মধ্যে, যখন শিশু সাধারণ খাবার খেয়ে দুধ খাওয়ার প্রয়োজন মুক্ত হয়ে যাবে ? যার দলীল হল নবী করীম (স)-এর কথা। বলেছেন, 'দুধ ছাড়ানোর পর দুধের হুকুম হবে না।' এ বিষয়ে সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা এসেছে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই সবই প্রমাণ করে দুধ ছাড়ানোর গুরুত্ব।

জবাবে বলা যাবে, তা যদি আবশ্যিক হতো, তাহলে দুবছর পর শিশুর অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যক, তার দুধ খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, সে তা না খেয়ে পারে কিনা ? কেননা অনেক শিশুর জন্যে দুই বছরের পরও বুকের দুধ খাওয়ার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু দুই বছর পর তা গণ্য করা যখন সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাহৃত, তখন দুই বছরের মধ্যে তা প্রত্যাহৃত হওয়াও প্রমাণিত হল এবং মুহাররম হওয়ার হুকুম নির্ভরশীল হবে সময়ের উপর, অন্য কিছুর উপর নয়।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স)-এর এই কথাটি এসেছে ঃ 'দুই বছর পর মুহাররম করার দুধ পান গণ্য হবে না।'

জবাবে বলা যাবে, রাসূলের কথা হিসেবে মশহুর হল, 'দুধ ছাড়ানের পর দুধ খেলে তাতে দুধ পানের হুকুম কার্যকর হবে না।' তাই এটাই হয়ত আসল হাদীস। আর দুই বছরের উল্লেখ ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করতে হবে। যদি এই শব্দটি প্রমাণিত হয়, তাহলে হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন, দুই বছর পর দুধ খাওয়ানোর দায়িত্বটা পিতার উপর থাকবে না। যেমন 'পূর্ণ দুই বছর— যে দুধ খাওয়ানোকে সম্পূর্ণ করতে চায় তার জন্যেও' এই কথাটির একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত কথা আগে চলে গেছে। তাছাড়া দুই বছর যদি দুধ খাওয়ানোর মিয়াদ হয়, আর এই সময়ের মধ্যে ছাড়ানোও ঘটবে, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই বলতেন না ঃ 'তবে যদি তারা দুইজন দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে।' এই কথাটি দুটি দিক দিয়ে প্রমাণ করে যে, 'দুই বছর' কথাটি দ্বারা 'সময় নির্ধারণ' করা হয়নি দুধ ছাড়ানোর জন্যে। সে দুটি দিকের একটি হল, আল্লাহ্র কথা فصالا 'ছাড়ানো' কথাটি অনির্দিষ্ট نكره হিসেবে এসেছে। যদি দুই বছরে ছাড়ানো হতো, তাহলে নির্দিষ্ট ভাবে الفصال বলা হতো। তাহলে এই ছাড়ানোর কথাটি 'দুই বছর'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যেত। কেননা তা مُشَارٌ اِلَيْهِ - معهود সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ যখন نكره শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন বোঝা গেল, এর দ্বারা দুই বছর বোঝানো হয়নি।

আর দ্বিতীয় দিক হল, দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটিকে তাদের দুজনের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বানানো হয়েছে। কিন্তু যা কোন সীমিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তা কখনও ইচ্ছা, রাজী হওয়া ও পারস্পরিক পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। এতেই দলীল রয়েছে আমাদের পূর্বে বলা কথার।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ وَتَشَاوُرٍ -

যদি তা দুজন ইচ্ছা করে দুধ ছাড়ানোর উভয় রাজী হয়ে পরস্পর পরামর্শ করে।

প্রমাণ করে যে, নিত্য নবঘটিত ঘটনাবলীতে শরীয়াতের বিধান জানার জন্যে ইজতিহাদ করা জায়েয। কেননা উক্ত আয়াতে পিতা-মাতাকে পারস্পরিক পরামর্শ করতে বলা হয়েছে শিশুর কল্যাণের বিষয় উদ্ঘাটনের জন্যে। আর তা নির্ভর করে তাদের মনের বিজয়ী ধারণা ও প্রবলতর চিন্তা-ভাবনার উপর। তবু তা দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রকৃত ব্যাপারের সাথে সাক্ষাৎ ঘটায় না।

তাতে এ বিষয়ের-ও দলীল রয়েছে যে, দুধ খাওয়ার মিয়াদের মধ্যে দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটি তাদের দুজনার রাজী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। কোন একজন অগ্রসর হয়ে দুধ ছাড়াতে পারে না। অন্যজনকে রাজী না করে। কেননা আল্লাহ্ তাঁর কথায় দুজনেরই রাজী হওয়ার ও পারস্পরিক পরামর্শের কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তা করার অনুমতি দিয়েছেন স্বামী-স্ত্রী দুজনার রাজী ও পারস্পরিক পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত হলে। মুজাহিদ থেকে এই কথা বর্ণিত হয়েছে।

আগের কালের কোন কোন মনীষী এ আয়াতের মনসূখ হওয়ার কথা বলেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া গেছে। শায়বান কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ 'যারা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে' এই কথার পর ব্যাপারটা হালকা করার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ 'তার জন্যে যে দুধ পানকে সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে।'

আবূ বকর বলেছেন, সম্ভবত তাঁর মতে দুই বছর কাল দুধ পান ওয়াজিব ছিল পরে তা হালকা করেছেন, এবং পরে দুধ পানের মিয়াদ কম-সে-কম করে দিয়েছেন। এই কথা বলে ঃ 'যে সম্পূর্ণ করতে চায় দুধ পানকে, তার জন্যে।'

আবূ জাফর আর-রাজী রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন কাতাদার মতই মত। আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কথাঃ 'যারা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ খাওয়াবে যে দুধ পানকে সম্পূর্ণ করতে চায় তার জন্যে।' এরপর বলেছেন ঃ 'যদি তারা উভয় রাজী হয়ে পরামর্শ করে দুধ ছাড়াতে চায়।

অতএব দুই বছরের পূর্বে বা পরে দুধ ছাড়াবার ইচ্ছা করলে তাদের কোন দোষ হবে না।

স্বামী-মরে যাওয়া স্ত্রীলোকের ইদ্দত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে যায় এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনে রত রাখবে।

التَّرَبُّصُ بِالشَّيْءِ কোন জিনিস নিয়ে 'তারাব্বুস' করা অর্থ অপেক্ষা করা সেই জিনিস সহ। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ -

অতএব তোমরা অপেক্ষা কর নির্দিষ্ট সময় যতক্ষণ না আসে। (সূরা মুমিনুন ঃ ২৫)

বলেছেন ঃ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ -

এই মরু-বাসিন্দাদের মধ্যে এমন এমন লোক আছে, যারা আল্লাহ্র পথে কিছু ব্যয় করলে তাকে নিজেদের উপর জোরপূর্বক চাপানো খাজনা মনে করে। আর তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তন অপেক্ষা করছে। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৯৮)

এখানেও সেই অপেক্ষা করার অর্থই ব্যবহৃত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ -

ওরা কি বলে কবি। আমরা এ জন্যে কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি।

(সূরা আত্-তূর ঃ ৩০)

প্রথমোক্ত আয়াতে স্বামী মরে যাওয়া স্ত্রীদেরকে উল্লিখিত সময় পর্যন্ত নিজেদের স্বামী গ্রহণের জন্যে অপেক্ষায় রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন। তার পরে-পরেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ -

পরে তারা যখন তাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (ইদ্দত শেষ করবে). তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে যা-ই করবে, তাতে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

আগের দিনে স্বামী-মরা স্ত্রীদের ইদ্দত ছিল এক বছর। আল্লাহ্র কথা ছিল ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ -

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পিছনে স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের স্ত্রীদের জন্যে এই অসীয়ত তাদের করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত যেন তাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া না হয়।

এ আয়াতে কয়েকটি হুকুম রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ইদ্দতের সময় নির্ধারণ এক বছর কাল। আর একটি হল, স্ত্রীর খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার স্বামী রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে বহন করা, যতদিন তারা ইদ্দত পালনে রত থাকবে। কেননা আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায়

বলেছেন ঃ 'অসীয়ত করতে হবে তাদের স্ত্রীদের জন্যে এক বছরকালের জীবনোপকরণের।' তার মধ্যে এটাও যে, স্ত্রী এই এক বছরকাল ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

পরে কুরআনের আয়াতেই চার মাস দশ দিনের অতিরিক্ত সময়কে মিয়াদ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা মীরাসের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে করাও মনসূখ হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র কথা হল ঃ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 'চার মাস দশ দিন'। এতে খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব করে দেয়া হয়নি। বের হওয়াটার মনসূখ হওয়া প্রমাণিত হয়নি। অতএব দ্বিতীয় ইদ্দত কালে ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধই রয়ে গেছে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার বাতিল প্রমাণিত হয়নি বলে। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল ওয়াসেতী— জাফর ইবনে মুহাম্মাদুল ইয়ামন, আবূ উবায়দ, হাজ্জাজ. ইবনে জুরাইয, উসমান ইবনে আতা, আতা, আল-খুরাসানী, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে এ আয়াত পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, 'স্ত্রীদের জন্যে অসীয়ত এক বছরকালের জীবনোপকরণের, ঘর থেকে না বের করে' কথাটির অবস্থা এই যে, আগে স্বামী মরা স্ত্রীদের জন্যে খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এক বছরের জন্যে করা হতো। পরে তা মনসূখ হয়ে যায় মীরাসের আয়াত দ্বারা। মীরাস বন্টনে তাদের জন্যে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ নির্দিষ্ট হয়। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ يَرْضَى الْوَرَثَةُ -

উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসীয়ত নেই। তবে উত্তরাধিকারীরা যদি রাজী হয় .....।

আবূ উবায়দ ইয়াযীদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ, হুমায়দ, নাফে সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি জয়নব বিনতে আবূ সালমা উম্মে সালমা ও উম্মে হাবীবা থেকে এই কথা শুনতে পেয়েছেন যে, একজন মেয়েলোক নবী করীম (স)-এর নিকট এসে বলল, তার একটি মেয়ে আছে, সে মেয়ের স্বামী তাকে রেখে মরে গেছে, তার চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে। এখন সে চোখে সুরমা ব্যবহার করতে চায়। তখন নবী করীম (স) বললেন, তোমাদের এক-একজন আগে বছরের মাথায় উটের গোবর দিয়ে চিহ্ন দিতে। এখন বছর নয়, মাত্র চার মাস দশ দিন সময়।

হুমায়দ বলেছেন, আমি জয়নবকে জিজ্ঞাসা করলাম, উঠের গোবর দিয়ে চিহ্ন দেয়ার অর্থ কি ? বললেন, জাহিলিয়াতের যুগে স্বামী-মরা স্ত্রীলোকেরা তার জন্যে দেয়া ঘর ক্রয় করার সংকল্প করত এবং সেই ঘরে এক বছরকাল ধরে বসে থাকত। যখন এক বছর অতিবাহিত হয়ে যেত, তখন সেখান থেকে বের হয়ে পড়ত। তখন উটের গোবর দিয়ে তার পেছনে চিহ্ন দিত। ইমাম মালিক এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর ইবনে আমর, হুমায়দ, নাফে, জয়নব বিনতে আবূ সালমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এরপর হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। তাতে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে কোন মেয়েলোকের স্বামী মরে গেলে সে ঝুপড়িতে প্রবেশ করত, নিকৃষ্টতম কাপড় পরত। কোন সুগন্ধি ব্যবহার করত না— কোন কিছুই নয়, এভাবেই এক বছরকাল অতিবাহিত করে দিত। তখন তাকে একটি গাধা চলা-চলের জন্যে ও একটি ছাগী বা পাখী দেয়া হতো। এসব নিয়ে সে মরে যেত। যখন সে কোন জিনিস নিয়ে সরে যেত, সেটি মরে যেত। পরে সে বের হতো। তখন তাকে উটের গোবর দেয়া হতো, তা দিয়ে সে চিহ্নর

দিত। পরে সে সুগন্ধি ব্যবহারে দিকে ফিরে আসত। নবী করীম (স) জানিয়েছেন, এক বছরকালের ইদ্দত মনসূখ হয়ে গেছে, তদস্থলে চার মাস দশ দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে এই সময়ে সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধই রয়েছে।

এক বছরকালের ইদ্দতের কথা যদি তিলাওয়াতে শেষে আসে, কিন্তু তা নাযিল হয়েছে আগে। আর চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের কথা যদিও পাঠের দিক দিয়ে আগে; কিন্তু নাযিল হয়েছে পরে এবং তা-ই আগের মিয়াদকে মনসূখ করেছে। কেননা কুরআনের বর্তমান 'তরতীব' নাযিল হওয়ার অনুপাতে নেই। কুরআন বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এক বছরের ইদ্দত মনসূখ হয়ে গেছে। তদস্থলে মাসভিত্তিক ইদ্দত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর স্বামী-মরা স্ত্রীদের জন্যে খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার আগের রেওয়াজ মনসূখ হয়ে গেছে যদি সে গর্ভবতী না হয়। স্বামী-মরা গর্ভবতী স্ত্রীর ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। আলোচ্য আয়াতটি যে বিশেষভাবে স্বামী-মরে যাওয়া অ-গর্ভবতী স্ত্রীর প্রসঙ্গে সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

স্বামী-মরে যাওয়া গর্ভবতী স্ত্রীর ব্যাপারে তিন প্রকারের মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত আলী (রা) বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তা দুটি বর্ণনার একটি— তার ইদ্দত মৃত্যুর ইদ্দত ও সন্তান প্রসবের মধ্যে যেটি তুলনামূলকভাবে বিলম্বে হবে, সেটিই তার ইদ্দত। উমর, আবদুল্লাহ, জায়দ ইবনে সাবিত, ইবনে উমর ও অন্যান্যদের মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ সন্তান প্রসবই তার ইদ্দতকালের শেষ। আল-হাসান থেকে বর্ণিত, তার ইদ্দত সন্তান প্রসব এবং নিফাস থেকে তার পবিত্র হওয়া। এই সময়ের মধ্যে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না, যদ্দিন সে রক্তস্রাব দেখতে পাবে। হযরত আলী (রা) আল্লাহ্‌র কথা ঃ চার মাস দশ দিনকে গ্রহণ করেছেন। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

গর্ভধারী মেয়েলোকদের ইদ্দত হচ্ছে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া। (সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ৪)

সন্তান প্রসব হলেই তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। স্বামী-মরা স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে দুটো আয়াতকে একত্রিত করার উপায় হিসেবে গর্ভধারিণী স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সন্তান প্রসব ও মাস গত হওয়া—এ দুটির মধ্যে যেটি বিলম্বে ও পরে হবে সেটিকে ইদ্দতের শেষ ধার্য করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ঘোষণা করেছেন, এই ব্যাপার যার সে তার সাথে 'মুবাহিলা' করতে পারে। বিষয়টি হচ্ছে, 'গর্ভধারিণীদের ইদ্দত হল তাদের গর্ভস্থ সন্তান প্রসব' কথাটি 'চার মাস দশ দিন' কথাটির পরে নাযিল হয়েছে। এর ফলে যেমন বললাম, সকলেরই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথার উপর যে, 'গর্ভধারিণী স্ত্রীদের ইদ্দত'...... কথাটি সাধারণ ও শর্তহীন। আর স্বামী-মরা স্ত্রীদের কথা যদিও তালাকের পরই উল্লিখিত হয়েছে— কেননা সন্তান প্রসবকে ইদ্দতের শেষ গণ্য করায় সকলেই একমত। তাঁরা সকলেই বলেছেন, স্ত্রী গর্ভধারিণী হলে দশ মাস দশ দিন অতিক্রান্ত হলেই তার ইদ্দত শেষ হবে না, তা শেষ হবে সন্তান প্রসব হলে। কাজেই আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'গর্ভধারিণীদের ইদ্দত তাদের সন্তান প্রসব' তার দাবি অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। সেই সঙ্গে মাসের হিসাব চলতে পারে না। এ-ও তার একটি প্রমাণ যে, মাসভিত্তিক ইদ্দত বিশেষভাবে অ-স্বামী মরা মেয়েলোকদের জন্যে। এ-ও প্রমাণ করে যে,

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তালাক প্রাপ্তারা নিজেদেরকে তিন কুরু ইদ্দত পালনে রত রাখবে' ব্যবহৃত তালাক প্রাপ্তা অগর্ভধারিণীদের ক্ষেত্রে। গর্ভধারিণীর ক্ষেত্রে কুরু হিসাবের ইদ্দত অচল। বরং সাধারণভাবে গর্ভধারিণীরই ইদ্দত হল সন্তান প্রসব। তার সাথে কুরুর হিসাব চলতে পারে না। অবশ্য সন্তান প্রসব ও কুরু দুইটি ইদ্দতে একত্রিত হতে পারত এভাবে যে, তার ইদ্দত সন্তান প্রসবে শেষ হবে না, এবং তিন হায়য পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। তেমনি স্বামী মরে যাওয়া গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব, তার সাথে মাস মেলানো হবে না।

আমর ইবনে শুয়ায়ব— তাঁর পিতা— তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত, বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছে ঃ 'গর্ভধারিণীরা ইদ্দত পালন শেষ করবে সন্তান প্রসব দ্বারা' তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী-মরা স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে। দুজনের জন্যেই তা হবে। উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন, মুবাইয়াতা বিনতিল হারিস তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান প্রসব করে। তখন রাসূলে করীম (স) তাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন। মনসূর, ইবরাহীম, আল-আসওয়াদ, আবুল সানাবিল ইবনে বাকাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুবাইয়াতা বিনতিল হারিস তার স্বামীর মৃত্যুর প্রায় বিশ দিন পর সন্তান প্রসব করে। তখন রাসূলে করীম (স) তাকে বিয়ে করার আদেশ দেন। এ হাদীসটি সহীহ্ বর্ণনা-ধারায় বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে ব্যতিক্রম করার সুযোগ কারোর জন্যেই নেই। কুরআনের বাহ্যিক তাৎপর্যও এই মতকে শক্তিশালী করে।

এ আয়াত বিশেষভাবে মুক্ত স্বাধীন মেয়েলোকদের জন্যে প্রযোজ্য। ক্রীতদাসীর জন্যে নয়। কেননা আগের কালের ফিকাহবিদগণের মধ্যে— আমরা যতটা জানি— এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই যে, স্বামী-মরা দাসীর ইদ্দত হচ্ছে দুই মাস পাঁচ দিন। স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক। আসম থেকে বর্ণিত এ আয়াত দাসী ও স্বাধীনা— সব মেয়েদের ব্যাপারে সাধারণ। দাসীর তালাকের ইদ্দতেও তাই বলছিলেন যে, তা তিন হায়য। কিন্তু এটা অত্যন্ত বিরল কথা। আগের ও পরের ফিকাহবিদদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। সুন্নাতেরও পরিপন্থী এই কথা। কেননা আগের কালের ফিকাহবিদগণ দাসীর ইদ্দত হায়য ও মাসের হিসেবে স্বাধীনার ইদ্দতের অর্ধেক হওয়ায় বিভিন্ন মত পোষণ করেন নি। নবী করীম (স) বলেছেন, দাসীর তালাক দুই, তার ইদ্দত দুই হায়য। এ হাদীসটিকে ফিকাহবিদগণ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন। দাসীর ইদ্দত অর্ধেক করণে তাঁরা এ হাদীসকে কাজেও লাগিয়েছেন। ফলে তা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হয়ে গেছে। এর দ্বারা দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা যায়।

স্বামী-মরা স্ত্রী যদি স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে না পারে, খবর তার নিকট পরে পৌঁছে যায়, তাহলে তার ইদ্দত কিভাবে পালিত হবে, এ বিষয়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর (রা) এবং আতা ও জাবির ইবনে জায়দ বলেছেন, তার স্বামীর মৃত্যুর দিন থেকে গুণতে হবে। তালাকেও তালাক দেয়ার দিন থেকে গুণতে হবে। আল আসওয়াদ ইবনে জায়দ এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদেরও এই কথা। আলী (রা), হাসানুল বসরী, খালাস ইবনে আমর বলেছেন, যে দিন মৃত্যুর খবরটা সে পাবে, সেদিন থেকে ইদ্দত পালন ও গণনা করবে, আর তালাকে যেদিন তালাক দেয়া হবে। রবীআতাও এই মত দিয়েছেন। শবী ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত

হলে মৃত্যুর দিন থেকেই ইদ্দত পালন করতে হবে। আর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হলে যে দিন স্ত্রী মৃত্যুর সংবাদ পাবে, সেদিন থেকেই ইদ্দত পালন শুরু করবে। এই তাৎপর্যের দিক হযরত আলী (রা)-র মত এই হতে পারে যে, স্ত্রীর নিকট তার স্বামীর মৃত্যুর সময় সংক্রান্ত খবর হয়ত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই কারণে মৃত্যুর খবর পাওয়ার দিন থেকে ইদ্দত পালনের জন্যে তিনি আদেশ দিয়েছেন সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ। আর তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তো মৃত্যু ও তালাকের দরুন ইদ্দত পালন করা ফরমান দিয়েছেন। বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন নিজেদেরকে নতুন বিয়ে থেকে বিরত রাখে .....' এবং বলেছেন ঃ 'তালাক প্রাপ্তারা নিজেদেরকে তিন কুরু সময় অপেক্ষায় রাখবে।' এ দুটি আয়াতে স্বামীর মৃত্যু ও তালাক দানের দরুন স্ত্রীদেরকে ইদ্দত পালন করতে হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব এ আয়াত অনুযায়ী মৃত্যুর দিন ও তালাকের দিন থেকেই ইদ্দত পালন শুরু হতে হবে। আর সকল মনীষী যখন একমত হয়েছেন এই কথায় যে, তালাক প্রাপ্তা তালাকের দিন থেকে ইদ্দত পালন করবে, খবর পৌঁছার সময়কে গুরুত্ব দেন নি। মৃত্যু জনিত ইদ্দত-ও তেমনি হতে হবে। কেননা এ দুটিই ইদ্দত পালন কর্তব্য হওয়ার কারণ। উপরন্তু ইদ্দত পালন স্ত্রীর কোন কাজ নয়, এ কারণে তার শুধু খবর জানার গুরুত্ব। ইদ্দত তো হচ্ছে দিন অতিবাহন। এতে তার জানা ও না-জানার মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই। আর মৃত্যুর কারণেও যখন ইদ্দত পালন করতে হবে— যেমন মীরাস, মীরাসে মৃত্যুর সময়ের গুরুত্ব। মৃত্যুর খবর পৌঁছার তেমন গুরুত্ব নেই। তাই ইদ্দতের বেলায়ও তাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে জানা ও না-জানার মধ্যে পার্থক্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন মীরাসের বেলায় হয় না। জানার ফায়দা বেশির পক্ষে তো এই যে, ইদ্দত পালনকারিণীকে ঘরের বাইরে যাওয়া ও অলঙ্কারাদির ব্যবহার পরিহার করে চলতে হয়, যখন খবর জানতে পারবে তখন থেকে। আর জানতে না পারার দরুন ইদ্দতে যেসব জিনিস পরিহার করতে হয় তা পরিহার না করা ইদ্দত পালন ও ইদ্দতের মিয়াদ শেষ হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা সে যদি জানতে পারে, আর সেজন্যে ঘরের বাইরে যাওয়া ও অলঙ্কারাদির ব্যবহার পরিহার না করে, তাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। অনুরূপভাবে সে যদি জানতে পারে তাহলেও তাই।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'চার মাস দশ দিন'। সুলায়মান ইবনে শুয়াইব— তাঁর পিতা আবূ ইউসূফ, আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে মাস হিসাবে। তা যদি চাঁদ দেখার সঙ্গে ওয়াজিব হয় তাহলে চান্দ্রমাস অনুযায়ী ইদ্দত পালন করবে। মাস অসম্পূর্ণ হোক, কি সম্পূর্ণ। ইদ্দত যদি মাসের অংশে ওয়াজিব হয় তাহলে চাঁদের হিসেবে ইদ্দত পালন করবে না, তালাকে নব্বই মাস আর মৃত্যুতে একশত ত্রিশ দিন ইদ্দত পালন করবে।

সুলায়মান ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা মুহাম্মাদ, আবূ ইউসূফ, আবূ হানাফী সূত্রে উক্ত কথার বিপরীত কথাও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, কোন মাসের অংশে যদি ইদ্দত ওয়াজিব হয়, তাহলে সেই ইদ্দত পালন করবে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো। পরে চাঁদের হিসেবে মাস অনুযায়ী ইদ্দত পালন চলবে, পরে প্রথম মাসে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। আর ইদ্দত পালন যদি চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজিব হয়, তাহলে চাঁদ অনুযায়ী ইদ্দত পালন করবে। এটাই আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও শাফেয়ীর কথা। ইমাম মালিক থেকে 'ইজারা'র মাসলায়ও অনুরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে।

ইবনুল কাসিম বলেছেন, কিরা-কসম ও তালাকের ক্ষেত্রেও এইরূপ কথা। হানাফী ফিকাহবিদগণও ইজারার ব্যাপারে এরূপ কথাই বলেছেন। আমার ইবনে খালিদ ও জুফর মাসের অংশে ঈলা হলে এরূপ বলেছেন। সে ইদ্দত পালন করবে প্রতি মাসের হিসাবে, যা তার উপর অতিবাহিত হবে অংশ হিসাবে হোক, কি পূর্ণ হিসাবে হোক।

আবূ ইউসূফ বলেছেন, ইদ্দত পালন করবে দিন গুণতিতে। এভাবে একশত বিশ দিন পূরণ করবে। মাসের অংশ বা পূর্ণত্বের দিকে লক্ষ্য দেবে না।

আবূ বকর বলেছেন, এই সব কথা সুলায়মান ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা আবূ ইউসূফ, আবূ হানীফা সূত্রে মাস হিসেবে ইদ্দত পালন পর্যায়ে বলেছেন, সেই অনুযায়ী। ইদ্দতের মিয়াদের ব্যাপারে, ঈলার মিয়াদে, এবং কিরা-কসম ইত্যাদির মিয়াদের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই— চাঁদ দেখার ভিত্তিতে মাস অনুযায়ী চুক্তি হয়। তাতে সব মাসেই চাঁদকে অনুসরণ করা হবে। তা অসম্পূর্ণ হোক, কি সম্পূর্ণ। কোন মাসের অংশে যদি মিয়াদ শুরু হয়, তাহলে তা হবে আমাদের উল্লিখিত কথার বিপরীত।

তবে যিনি মনে করেন, এ ব্যাপারে প্রথম মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোকে সংখ্যার দিক দিয়ে ত্রিশ দিন ধরতে হবে। আর পরবর্তী মাসসমূহ চাঁদ হিসেবে, পরে শেষ মাসটি প্রথম মাসের অবশিষ্ট সহ দিন হিসাবে গুণতে হবে। তিনি নবী করীম (স)-এর কথার উপর নির্ভর করেছেন ঃ 'তোমরা রোযা থাক চাঁদ দেখে এবং রোযা থাকা বন্ধ কর চাঁদ দেখে। মাসের শেষ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে (ও চাঁদ দেখতে না পারলে) শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।' এই কথাটির দুটি অর্থ। একটি, প্রত্যেক মাসের শুরু ও শেষ চাঁদ অনুযায়ী হবে। আমরাও তা গণ্য করার প্রয়োজন বোধ করেছি। অতএব মাসকেই ধরতে হবে, তা অসম্পূর্ণ হোক, কি সম্পূর্ণ ঠিক। যেমন রাসূলে করীম (স) রমযানের রোযা ও শাবান মাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে প্রত্যেকটি মাসের শুরু ও শেষ চাঁদের হিসাবে হবে না, তখন তাতে ত্রিশ দিন গুণতে হবে। কেননা চাঁদেরও তো মাস অসম্পূর্ণ হয়। তাই প্রথম মাসের শুরু যখন নতুন চাঁদের হিসাবে হবে না, তখন মিয়াদের শেষের ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে হবে। আর সব কয়টি মাস চাঁদের হিসাবে পূর্ণ করা যখন সম্ভব হবে না, তখন তাকেও এভাবেই গণ্য করতে হবে।

আর যিনি সব কয়টি মাস দিন হিসাবে পালন করার কথা বলেছেন, তিনি বলছেন, মিয়াদ পালন যখন চাঁদের হিসাবে শুরু করা যায়নি, তখন এই মাস ত্রিশ দিনে গণনা করাই বাঞ্ছনীয়। তাহলে তার পরবর্তী কোন মাসের অংশে তা শেষ হবে। পরে সব কয়টি মাসের হুকুম সেই রকমেরই হবে। তাঁরা বলেছেন, এই মাসটির অসম্পূর্ণতা অপর কোন মাস দ্বারা পূর্ণ করা সঙ্গত হবে না। সে দুটির মাঝের মাসকে চাঁদ অনুযায়ী বানিয়ে দেবে। কেননা মাসগুলোর ব্যাপার হল, তা দিনগুলো পর পর মিলিত— একটির পর আর একটি হয়ে থাকে। এই কারণে একটি মাসের পূর্ণতা পূর্ণ ত্রিশ দিন হবে প্রথম মিয়াদ থেকে শুরু করে পর-পর মিলিত। ফলে দ্বিতীয় মাসের শুরুটা দ্বিতীয় মাসে কোন অংশে পড়বে। তাহলেই মাসসমূহ এবং তার দিনগুলো পর পর মিলিত— সংযোজিত হবে।

পরবর্তী মাসগুলোকে প্রথম মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোর পর চাঁদের হিসাবে করার গুরুত্বের

কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হল পরবর্তী মাসটিকে নতুন চাঁদের হিসাবে নিতে হবে। তাহলে তার শেষটা নতুন চাঁদের হিসাবেই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَسِيْحُوْا فِى الْأَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ -

অতএব তোমরা জমিনে চার মাস ধরে ভ্রমণ করতে থাক। (সূরা তওবা ঃ ২)

মনীষিগণ এই বর্ণনায় একমত যে, সেই চারটি মাস ছিল যিলহজ্জ মাসের বিশ তারিখ, মুহাররম, সফর ও রবিউল আউয়াল এবং রবিউস্-সানী মাসের দশ দিন। এতে নতুন চাঁদ গণ্য হয়েছে পরে আসা মাসগুলোতে, দিনের সংখ্যা গণ্য হয়নি। অতএব এর মত মুদ্দতের সব ব্যাপারেই সেই রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্‌র কথা وَعَشْرًا 'এবং দশ— অর্থাৎ দশ দিন।' বাহ্যত এর অর্থ দশ রাত ও সেই সাথে দিনগুলোও। কিন্তু রাতগুলোর উপর বিজয়ী হয়েছে যখন তা তারিখে একত্রিত হয়েছে। কেননা নতুন চাঁদের হিসাবে মাসের শুরু চন্দ্রোদয়ের মুহূর্ত রাত থেকেই হয়। মাসগুলোর শুরুই যখন রাত, তখন রাত-ই অগ্রবর্তী থাকবে এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করা হবে দিনগুলোর পরিবর্তে, যদিও তার বিপরীতে দিনগুলোই ফায়দা দেয়। আর যদি দিনগুলোর উল্লেখ একসাথে হয়, তাহলে তার বিপরীত রাতগুলো ফায়দা দেয়। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র কথা ঃ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا 'তিন দিন শুধু ইশারায় (কথা বলবে)'। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا 'তিন রাত সমান।' ঘটনা একটিই। কখনও দিনের উল্লেখ দ্বারা রাতের উল্লেখের প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে, কখনও রাতের উল্লেখ করে দিনের উল্লেখের প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ -

মাস হচ্ছে উনত্রিশ দিনে।

অন্য কথায়, উনত্রিশ, বোঝা গেল, দুটি সংখ্যার প্রত্যেকটি যখন সাধারণভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন তার বিপরীতে অবস্থিত সংখ্যাটিও বোঝা যাবে। লক্ষণীয়, রাতসমূহ ও দিনসমূহের দুটি সংখ্যা যখন ভিন্ন ভিন্ন হবে, তখন শব্দেই সে দুটির মধ্যে পার্থক্য করা হবে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا -

'সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত ক্রমাগত তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন করা উল্লেখ করেছেন, আরবরা বলে صُمْنَا عَشْرًا مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ 'আমরা রমযানের দশটি রোযা রয়েছি।' তারা এই কথা বলে রাত্রের কথার দ্বারা দিনগুলোকে বোঝাতে চায়। কেননা দশ তো রাত্রের জন্যে হয়। দশ দিন বললে স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়া তাতে আর কিছুই জায়েয হয় না। কবি শুধু 'তিন' বলেছেন। এ তিন হল রাত্রি। আর এর অর্থ হল দিন ও রাত্রি। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'চার মাস ও দশ' চার মাস মিয়াদ বোঝাবার জন্যে যথেষ্ট। দশ দিন তার উপর বাড়তি, যদিও সংখ্যার শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের শব্দে বলা হয়েছে।

ইদ্দত পালনকারিণীর বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, তিন তালাক বায়েন দেয়া স্ত্রী ও স্বামী-মরা স্ত্রী সেই ঘর থেকে বের হবে না যে ঘরে সে আগে থেকে বসবাস করে আসছে। তবে স্বামী-মরা স্ত্রী দিনের বেলা বের হতে পারবে। তার নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করবে না। তালাক প্রাপ্তাও রাত্রিবেলা বের হবে না, দিনের বেলায়ও না। তবে ওযর হলে ভিন্ন কথা। আল-হাসানও এই কথাই বলেছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, বায়েন বা রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী-মরা স্ত্রী দিনের বেলায়ও ঘরের বাইরে যাবে না। তাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যত্র রাত্রি যাপন করবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বসবাসের ঘরসমূহে সাজ-সজ্জার উপকরণ থাকবে না, তাহলে স্বামী-মরা স্ত্রী যে কোন ঘরে অবস্থান করতে পারে। তা উত্তম ঘর হোক, কি নিকৃষ্ট ধরনের।

আবূ বকর বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তার জন্যে এই হুকুমের কারণ— আল্লাহ্র কথা ঃ

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ -

তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করবে না, তারা নিজেরাও বের হবে না। তবে যদি তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করে বসে, তাহলে ভিন্ন কথা। (সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ১)

এ আয়াতে তাদের বাইরে বের হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বের করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই হুকুম অবশ্য ইদ্দত পালনকালের জন্যে। তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করে বসে। এটা একটা ওযরের ব্যাপার। তাই ওযরের দরুন বের হতে হলে বের হবে, তা মুবাহ্ করা হয়েছে।

এ আয়াতে যে সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। তবে স্বামী-মরা স্ত্রীর ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম ইদ্দত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ 'এক বছরের জীবনোপকরণ দিতে হবে, ঘর থেকে বের না করে।' পরে চার মাস দশ দিনের অতিরিক্ত সময়টা পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে এই দ্বিতীয়বারের বলা ইদ্দতের হুকুমটা বহাল রয়েছে। অবশ্য ঘরের বাইরে যাওয়ার নিষেধ যথাযথ রয়ে গেছে। কেননা তা মনসূখ হয়নি। ইদ্দতের বাড়তি সময়টাই শুধু মনসূখ হয়ে গেছে।

কুরআনের এই কথাই হাদীসেও এসেছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাঊদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমাতাল কানবী, মালিক, সাদ ইবনে ইসহাক ইবনে কাব ইবনে আজরাতা, তাঁর ফুফু জয়নব বিনতে কাব ইবনে আজরাতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, ফরীয়াতা বিনতে মালিক ইবনে সিনান— তিনিই সাঈদুল খুদরীর বোন— তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি বনু খুদরাতার আত্মীয়দের নিকট যেতে চান। কেননা তাঁর স্বামীকে তারই এক দাস হত্যা করেছে। তাই তিনি তাঁর পিতৃকুলের আত্মীয়দের নিকট চলে যেতে চান। কেননা লোকেরা আমাকে এমন ঘরে বাস করতে দেয়নি, যার সে মালিক। আর 'নফকা'র ব্যবস্থাও করা হয়নি। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ হ্যাঁ, যেতে পার। পরে আমি বের হয়ে গেলাম। পরে আমি হুজরায় কিংবা মসজিদে

ছিলাম, তখন নবী করীম (স) আমাকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বললে ?..... আমি তখন ব্যাপারটি আবার বিবৃত করলাম। আমার স্বামী সংক্রান্ত ঘটনা খুলে বললাম। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

امْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُ -

তুমি তোমার ঘরে অবস্থান কর, যতক্ষণ না ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।

বললেন, পরে আমি সেই ঘরেই দশ মাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করলাম। পরে উসমান আমার নিকট লোক পাঠালেন, সেই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে সব জানালাম। তিনি তা অনুসরণ করলেন ও ফায়সালা করে দিলেন।

ইবনে আব্বাস থেকে এর বিপরীত কথা বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদুল মেরওয়াজী, মূসা ইবনে মাসউদ, শবল, ইবনে আবূ নুজাইহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আতা বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ 'এই আয়াতটি তার ইদ্দত তার পরিবারের লোকদের নিকট পালন করাকে মনসূখ করে দিয়েছে। অতএব সে যেখানেই ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারে। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ 'ঘরের বের না করে;' আতা বলেছেন, সে ইচ্ছা করলে তার পরিবারবর্গের নিকট ইদ্দত পালন করতে পারে এবং তার ঘরেও সে অবস্থান করতে পারে, চাইলে সে বাইরেও বেরুতে পারে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ -

'তারা যদি ঘরের বাইরেও যায়, তাহলে তারা যা করবে, তাতে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

আতা বলেছেন, এর পর মীরাসের আয়াত নাযিল হল। তাতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব মনসূখ হয়ে গেল। এখন সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পরে।

আবূ বকর বলেছেন, মীরাসের বিধানে এমন কিছু নেই, যাতে ঘরে অবস্থান করার বিধান মনসূখ হয়ে গেছে বলে মনে করতে হবে। দুটোই একসাথে হতে পারে। একটি প্রমাণিত হলে অপরটি নিষিদ্ধ হবে, তার কোন কারণ নেই। রাসূলের সুন্নাতে বরং তা প্রমাণিত হয়েছে এক বছরের ইদ্দত মনসূখ হয়ে যাওয়ার ও মীরাসের আইন জারী হওয়ার পর। কেননা ফরিয়ার ইদ্দত চার মাস দশ দিনের ছিল। অথচ রাসূলে করীম (স) তাকে স্থানান্তরিত হতে নিষেধ করেছিলেন। এছাড়া ফরিয়ার কাহিনীতে আর যেসব কথা এসেছে, তা দুটি তাৎপর্য বোঝায়। একটি হল, স্বামীর মৃত্যুর দিন সে যে ঘরে বাস করত, সেই ঘরে বাধ্যতামূলকভাবে অবস্থান গ্রহণ এবং স্থানান্তরিত হতে নিষেধ করা। আর দ্বিতীয় হল, ঘরের বাইরে যাওয়া বৈধ হওয়া। নবী করীম (স) ঘরের বাইরে যাওয়াকে অস্বীকার করেন নি। যদি বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধই হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই নিষেধ করতেন। আগের দিনের ফিকাহবিদদের বহু সংখ্যক থেকে এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উমর, জায়দ ইবনে সাবিত, উম্মে সালমা ও উসমান (রা) উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রী দিনের বেলায় ঘরের বাইরে যেতে পারে। তবে নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করবে না।

আবদুর রাযযাক ইবনে কাসির, মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ওহুদের যুদ্ধে কিছু সংখ্যক পুরুষ শহীদ হয়ে যান। তাঁদের স্ত্রীরা বিধবা ও স্বামীহারা হয়ে যান। তাঁরা একটি ঘরের পাড়া-প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁরা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে বললেন, আমরা আমাদেই এক-একজনের নিকট রাত্রি যাপন করেছি। নবী করীম (স) বললেন, তোমরা দিনের বেলায় পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কর। কিন্তু রাত্র হলেই প্রত্যেকে নিজের ঘরে চলে আসবে।

আগের কালের মনীষীদের বহু সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে, স্বামী-ম'রা স্ত্রীরা যেখানে ইচ্ছা তাদের ইদ্দত পালন করবে। এঁরা হচ্ছেন হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আয়েশা (রা)। উপরে কুরআন ও সুন্নাতের যে দলীল আমরা পেশ করলাম, তাতে প্রথমোক্ত কথাটিরই সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ - فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ -

এক বছর কালের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করার অসীয়ত করবে ঘর থেকে বহিষ্কার না করে। তারপর যদি তারা ঘরের বাইরে যায়, তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে শরীয়াত সম্মত যা-ই করবে, সে জন্যে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সে স্থানান্তরিত হতে পারে। বলা হয়েছে, এর অর্থ হল, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যদি তারা বের হয়, যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'তারা যখন তাদের ইদ্দতের শেষে পৌঁছে গেল, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে যা-ই করুক, তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।'

এ আয়াত— যেমন আমরা বলেছি— প্রমাণ করে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই যদি তারা বের হয়ও, তবু বিয়ে করা তাদের জায়েয হবে না। এটা সর্বসম্মত মত। বোঝা গেল, এর অর্থ হচ্ছে, 'যদি তারা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বের হয়। আর ব্যাপার যখন এই, তখন স্বামী-মরা স্ত্রীদের জন্যে স্থানান্তরিত হওয়া নিষিদ্ধই থেকে গেল।

তাঁরা যে বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তারা রাত্রে ও দিনে কখনই বের হবে না, তার কারণ হল আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ -

এবং তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করবে না এবং তারাও বের হবে না।
(সূরা আত্-তালাক্ব ঃ ১)

এ কথা তাদের সকলেরই ব্যাপারে সাধারণ ও নির্বিশেষ। তাদের ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবেই এবং সকল সময়ের জন্যেই নিষিদ্ধ। অবশ্য স্বামী-মরা স্ত্রীদের অবস্থা এদিক দিয়ে ভিন্ন যে, স্বামী-মরা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তারা নিজেরাই করবে। আর তালাকপ্রাপ্তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের স্বামীর উপর। ফলে তার ঘরের বাইরে যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

স্বামী-মরা স্ত্রীর সাজ-সজ্জা

সাহাবীগণের এক জামা'আত থেকে বর্ণনা এসেছে, স্বামী-মরা স্ত্রীদের সাজ-সজ্জা, অলঙ্কার ও সুগন্ধি ব্যবহার পরিহার করা কর্তব্য। তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা, উম্মে সালমা ও ইবনে উমর (রা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার প্রমুখ তাবেয়ী ও মদীনার ফিকাহবিদদেরও এই মত। হানাফী ফিকাহবিদ এবং বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণও তাই বলেছেন। এ বিষয়ে এদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। নবী করীম (স) থেকেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ কানবী, মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর, হুমায়দ ইবনে নাফে, জয়নব বিনতে আবূ সালমা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁকে এসব হাদীসের কথা জানিয়েছেন। জয়নব বলেছেন, আমি উম্মে হাবীবার নিকট উপস্থিত হলাম যখন তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তিনি হরিৎ বর্ণের সুগন্ধি নিয়ে আসতে বললেন। পরে একটি ক্রীতদাসী তা মর্দন করল। পরে তা তার গাল মুখে মেখে দিল। পরে বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

لَا يَحِلُّ لِاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تَحُدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا -

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন মেয়েলোকের পক্ষে তিন দিনের অধিক সময় কোন মৃতের জন্যে শোক করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্যে তা করতে হবে চার মাস দশ দিন।

জয়নব বললেন, আমার মা উম্মে সালমাকে বলতে শুনেছি, রাসূলের নিকট একটি মেয়েলোক উপস্থিত হল। বলল, হে রাসূল! আমার কন্যার স্বামী মরে গেছে। তার চোখে একটা রোগ দেখা দিয়েছে। এখন কি সে সুরমা লাগাতে পারে? তখন নবী করীম (স) দুইজন বা তিনজন মহিলাকে বললেন, তাদের প্রত্যেকেই বলছিল— না। পরে রাসূলে করীম (স) বললেন, মূলত ইদ্দত চার মাস দশ দিন। জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের এক-একজন বছরের মাথায় উটের গোবর স্থাপন করে চিহ্ন দিতে।

হুমায়দ বলেছেন, আমি জয়নবকে জিজ্ঞাসা করলাম, বছরের মাথায় তোমরা উটের গোবর রেখে চিহ্ন দেয়ার কাজটা কি করতে? জয়নব বললেন, স্ত্রী স্বামী মরে গেলে সে তাঁবুতে প্রবেশ করত এবং তার নিকৃষ্টতম কাপড়খানা পরত। কোন সুগন্ধি বা কোন জিনিস স্পর্শ করত না। এভাবে একটি বছর অতিবাহিত হয়ে যেত। পরে তাকে জন্তুযান স্বরূপ একটি গাধা দেয়া হতো বা একটি ছাগী বা একটি পাখী। তা নিয়ে সে সরে যেত। যে জিনিস নিয়েই সরে যেত, সেটা মরে যেত। পরে সে নিজে বের হয়ে যেত। তখন তাকে উটের গোবর দেয়া হতো, তা দিয়ে সে চিহ্ন দিত। পরে ফিরে আসত। ব্যবহার করতে শুরু করত, যা-ই সে চাইত— সুগন্ধি ইত্যাদি। তখন নবী করীম (স) তাকে ইদ্দতের মধ্যে সুরমা ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। পরে তিনি তাদেরকে আগেরকালের ইদ্দতের কথা এবং অলঙ্কার ও সুগন্ধি ইত্যাদি যা যা পরিহার করে চলত, জানিয়ে দিলেন। পরে বললেন, আসলে ইদ্দত হচ্ছে চার মাস দশ দিন।

এ থেকে বোঝা গেল, এখনকার এই ইদ্দত আগের দিনের এক বছরের শোকের বিকল্প, যখন অলঙ্কার ও সুগন্ধি ব্যবহার পরিহার করা হতো।

আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, জুহায়র, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ বুকাইর, ইবরাহীম ইবনে তহমান, বুদায়ল, আল-হাসান ইবনে মুসলিম, সফিয়াতা বিনতে শায়বা, রাসূলের বেগম উম্মে সালমা সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রীরা হলুদ বর্ণের কাপড়, চিরুনী ও অলঙ্কারাদি ব্যবহার করবে না। খেজাব বা সুরমা ব্যবহার করবে না। উম্মে সালমা (রা) রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রীরা হলুদ বর্ণের কাপড়, চিরুনী, অলঙ্কার ব্যবহার করবে না, খেজাব ও সুরমা লাগাবে না। উম্মে সালমা (রা) এ-ও বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) তাঁকে তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকালে বলেছিলেন, সুগন্ধি দিয়ে মাথা আচড়াবে না। হেনাও ব্যবহার করবে না। কেননা তা এক ধরনের খেজাব।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ তোমাদের মধ্যে যারা মরে যায় এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্যে অসীয়ত করবে।

এই আয়াতে চারটি হুকুম রয়েছে। একটি হচ্ছে, বছর। এক্ষেত্রে চার মাস দশ দিনের অধিক যা তা মনসূখ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্বামীর সম্পদ থেকে তার খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। পরে মীরাসী আইন জারী হয়ে তা-ও মনসূখ করে দিয়েছে, যেমন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব অসীয়ত হিসেবে ওয়াজিব করেছেন তাদের স্ত্রীদের জন্যে। যেমন পূর্বে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে অসীয়ত করা ওয়াজিব ছিল। মীরাসী আইন দ্বারা তা মনসূখ হয়ে গেছে। সেই সাথে নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'ওয়ারিসদের জন্যে অসীয়ত নেই।' তৃতীয় 'সাজ-সজ্জা করার নিষেধ'। আয়াতই সে কথা প্রমাণ করে। রাসূলের সুন্নাত দ্বারাও সে হুকুমটি বহাল রয়েছে। স্বামীর ঘর থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার ব্যাপারও রয়েছে। তা নিষিদ্ধ, এ হুকুমটিও বহাল আছে। এ আয়াতের দুটি হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে। এটি ছাড়া অন্য এমন কোন আয়াতের কথা আমরা জানি না, যার দুটি হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে এবং অপর দুটি হুকুম বহাল রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'বের না করে'ও সম্ভবত মনসূখ হয়ে গেছে। কেননা তার অর্থ বাসস্থান দেয়া স্বামীর মাল থেকে। তা স্বামীর মাল থেকে হওয়াটা মনসূখ হয়ে গেছে। অতএব পরিষ্কার নিষেধ মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু 'বের না করে' কথাটির দুটি অর্থ। একটি হল স্বামীর মাল থেকে বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব হওয়া। আর দ্বিতীয় হল, বের হওয়ার নিষেধ এবং বের করে দেয়ার নিষেধ। কেননা লোকদেরকে যখন বের করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই তাদের অবস্থান করার নির্দেশ ছিল। পরে স্বামীর মাল থেকে তার জন্যে বসবাসের ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতা মনসূখ হয়ে যায়। তখন ঘরে অবস্থান করার বাধ্যবাধকতা অবশিষ্ট থেকে যায়।

স্বামী-মরা স্ত্রীদের খরচাদির ব্যাপার নিয়ে মনীষীদের মধ্যে বিভিন্ন মতের উদয় হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, সে স্ত্রী গর্ভবতী হোক কি না-ই হোক, তার খরচাদি তাকে নিজেকেই বহন করতে হবে। আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, আতা, কুবাইসাতা ইবনে যুয়াইব প্রমুখ তাবেয়ীও সেই মত প্রকাশ করেছেন। শবী

আলী ও আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজন বলেছেন, তার স্বামী যখন মরে গেল তখন তার রেখে যাওয়া সমস্ত মাল থেকেই তার খরচাদি বহন করতে হবে। আল-হিকাম ইবরাহীমের এই মত বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গী-সাথিগণ স্বামী-মরা গর্ভবতী মেয়েলোকদের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন যে, মাল-সম্পদ প্রচুর হলে তার খরচাদি তার সন্তানদের অংশ থেকে বহন করতে হবে। আর কম বা সামান্য হলে সমস্ত রেখে যাওয়া মাল থেকে বহন করতে হবে। জুহরী সালিম ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তার জন্যে সমস্ত মাল-সম্পদ থেকে খরচাদি চালাতে হবে। সব হানাফী ফিকাহবিদই বলেছেন, সে গর্ভবতী হোক আর না-ই হোক, তার জন্যে নফকা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা মৃতের মাল থেকে করার প্রশ্ন নেই। ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, এই খরচাদি স্বামীর মালের রেখে যাওয়া ঋণের মতই, যদি সে গর্ভবতী হয়। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, তার নিজের খরচাদি তাকেই বহন করতে হবে, সে গর্ভবতী হলেও। তার থাকার জন্যে একটা ঘর হতে হবে, তা তার মৃত স্বামীরই হোক না কেন। যদি মৃত স্বামীর উপর ঋণ থাকে, তবুও স্ত্রী তার থাকার ঘর পাওয়ার বেশী অধিকারী তার ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত। ভাড়াটে ঘর হলে এবং তার লোকেরা সেখানে থেকে বের করে দিলে তার থাকার ঘর তার স্বামীর মাল থেকে হবে না, এটা ইবনে অহবের বর্ণনা। ইমাম মালিক থেকে ইবনুল কাসিম থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন যে, মৃতের ধন-সম্পদ থেকে তার খরচাদি দেয়া হবে না। মৃতের ঘর-বাড়ি থাকলে তাকে থাকার ঘর দিতে হবে আর তার উপর ঋণের বোঝা চাপানো থাকলেও পাওনাদারদের মধ্যে তার অধিকার অগ্রগণ্য ঘর পাওয়ার ব্যাপারে। মৃতের মাল-পত্র ঋণ শোধের জন্যে বিক্রয় করা হলে ক্রেতাকে তার স্ত্রীকে থাকার ঘর দেয়ার শর্তে বাধ্য করতে হবে। সওরী বলেছেন, স্ত্রী গর্ভবতী হলে স্বামীর সম্পদ থেকেই তার জন্যে ব্যয় করতে হবে তার সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। সন্তান প্রসব হলে শিশুর জন্যে খরচ করতে হবে তার প্রাপ্য মীরাসের অংশ থেকে। এটা তাঁর থেকে আশজয়ীর বর্ণনা। তাঁর থেকে আল-মুয়াফী বর্ণনা করেছেন, স্ত্রীর খরচাদি তার প্রাপ্ত অংশ থেকে বহন করতে হবে। আওজায়ী বলেছেন, যে স্ত্রীর স্বামী মরে যায় আর সে হয় গর্ভবতী, তা হলে তার খরচাদি ভিন্নভাবে বহন করা হবে না। যদি সে 'উম্ম অলাদ'— দাসীর গর্ভে হওয়া সন্তানের মা হয়, তাহলে তার খরচাদি তার মৃতের সমস্ত ধন-মাল থেকে বহন করতে হবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন, 'উম্মে অলাদ' যখন মনিব থেকে গর্ভবতী হলে তার জন্যে সেই মনিবের মাল থেকেই ব্যয় করতে হবে। আর সন্তান প্রসব হয়ে গেলে সেটা তার সন্তানের অংশ থেকে যাবে। আর যদি সন্তান না হয় তা ঋণ স্বরূপ হবে এবং তা চালিয়ে নেয়া হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, স্বামী মরা স্ত্রীর যাবতীয় খরচ তার স্বামীর সমস্ত মাল থেকে বহন করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী-মরা স্ত্রীর ব্যাপারে দুটি কথা। একটি হচ্ছে খরচাদি ও থাকার ঘর সে পাবে। আর দ্বিতীয়, সে না 'নফকা' পাবে, না থাকার ঘর।

আবূ বকর বলেছেন, গর্ভবতী স্ত্রীর খরচাদির তিনটি অবস্থান কোন একটি অবশ্য হবে। একটি— হয় তা ওয়াজিব হবে প্রথম সূচনা কালে যেমন ওয়াজিব ছিল যখন তার ইদ্দত ছিল এক বছর— এই আয়াত অনুযায়ী অসীয়ত করতে হবে তাদের স্ত্রীদের জন্যে এক বছরের জীবনোপকরণের জন্যে, ঘর থেকে বের না করে। অথবা তা ওয়াজিব হবে যেমন তিন তালাক বায়েন প্রাপ্তার জন্যে ওয়াজিব রয়েছে কিংবা কেবল গর্ভবতী স্ত্রীর জন্যে তা ওয়াজিব হবে, অন্যদের জন্যে নয়, হবে এই গর্ভের জন্যে।

প্রথম দিকটি বাতিল। কেননা তখন তা ওয়াজিব ছিল অসীয়ত হিসেবে। আর ওয়ারিসের জন্যে অসীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিক, সঠিক বা সহীহ্ নয় এই দিক দিয়ে যে, তার জীবদ্দশায় তার জন্যে আলাদা 'নফকা' ওয়াজিব ছিল না। ওয়াজিব হল এমন সময় অতিবাহন ও নিজেকে স্বামীর ঘরে সোপর্দ করে দেয়ার কারণে। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর তা ওয়াজিব হবে না দুটি কারণে। একটি তার উপায় হচ্ছে সরকার স্বামীর উপর তা দেয়ার হুকুম জারী করবে। তার দায়িত্বে তা চাপিয়ে দেব এবং তার মাল থেকে তা নিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু স্বামীর কোন দায়িত্ব এখানে নেই। ফলে তা তার দায়িত্বে চাপানো যাবে না। তারপর তার মাল থেকে তা নিয়ে নেয়াও যাবে না। কেননা এটা তার দায়িত্বে চাপেনি।

আর দ্বিতীয়, স্বামী— মালিকের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন ও হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, মৃত্যুকালে মৃতের কোন ঋণ ছিল না বলে। ফলে তা ওয়ারিসদের মালে চাপানো যেতে পারে না। স্বামীর মালেও তা ওয়াজিব হবে না। তাই তা থেকে নিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উঠে না।

আর স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তার জন্যে স্বামীর মালে 'নফকা' ওয়াজিব করার ব্যাপারটির দুটির মধ্যে কোন একটি দিয়ে অবশ্যই হবে। হয় তা ওয়াজিব হবে এই সম্পর্কের দিক দিয়ে যে, সে ইদ্দত পালনে রত আছে। অথবা এজন্যে যে, সে গর্ভবতী। আমরা আগেই বলেছি যে, ইদ্দত পালন করে এজন্যে তার নফকার দায়িত্ব স্বামীর উপর চাপানো জায়েয হবে না। আর গর্ভের কারণেও তা জায়েয হবে না। কেননা নিছক গর্ভ ওয়ারিসদাতাকে তার খরচ বহনের দায়িত্বশীল বানানো যায় না, সে তাদের নিকট থেকে তার প্রাপক হতে পারে না। কেননা সে নিজে মীরাস পেয়ে অন্যান্য ওয়ারিসদের মতই সচ্ছল। যদি তার সন্তান প্রসব হয়, তাহলেও তার খরচ অন্যান্য ওয়ারিসের উপর বর্তাবে না। তাহলে গর্ভাবস্থায় তা তার উপর ওয়াজিব হবে কি করে? .....তাহলে 'নফকা' পাওয়া তার কোন অধিকার নেই।

ইদ্দতের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ -

তোমরা যদি (স্বামীহীনা) স্ত্রীদের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ কর কিংবা তা তোমাদের মনে গোপন রাখ, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

আয়াতের الخطبة শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এমন সব কথার উল্লেখ, যা বিয়ে সম্পর্ক স্থাপনের কারণ হয়। তার প্রস্তুতি সম্ভব হয়। আর الخطبة অর্থ, ওয়ায-নসীহত, মানুষের মনে বিভিন্ন উপায়ে নম্রতা সৃষ্টির চেষ্টা। এ-ও বলা হয়েছে, الخطبة এর কোন প্রথম নেই, শেষ-ও নেই। যেমন 'রিসালাত'। অবস্থার প্রেক্ষিতে 'খেতবা', যেমন জলসা, কাদাহ। বিয়ের প্রস্তাব ইশারায় পেশ করার তাৎপর্য হল, এমন কথা যা কোন জিনিস বোঝায় সেই আসল জিনিসের উল্লেখ ছাড়াই। যেমন কেউ বলে ঃ ماانا بزان، يعرض بغيره انه زان

এই কারণে উমর (রা) এই ধরনের কথার শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। তাকে স্পষ্ট কথার

বিকল্প মনে করেছেন। আর الكِنَايَة অর্থ স্পষ্টভাবে নামের উচ্চারণ করা থেকে এড়িয়ে যাওয়া। যার ফলে সেই আসল জিনিসটিই বোঝাবে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ –

নিশ্চয়ই আমরা তা কদরের রাতে নাযিল করেছি।

এ আয়াতে কুরআন নাযিল করার কথাই বলা হয়েছে। أَنْزَلْنَاهُ এর হচ্ছে কুরআনের ইঙ্গিত।

ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ 'খেতবা'— বিয়ের ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব এভাবে হতে পারে যে, একজন বলবে, আমি এমন একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে চাই, যার এই গুণ পরিচিতি আছে।' এই বলে প্রস্তাবিত কনের গুণ-পরিচিতি উল্লেখ করবে। আল-হাসান বলেছেন, এভাবে বলবে, আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী বা তুমি আমাকে তোমার থেকে দূরে রেখো না। নবী করীম (স) ফাতিমা বিনতে কায়সকে তার ইদ্দত পালনকালে বলেছিলেন— 'তুমি আমাকে নিজের থেকে হারিও না' পরে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যথারীতি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন উসামা ইবনে জায়দের মাধ্যমে। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তাঁর পিতার সূত্রে বলেছেন, ইদ্দত পালনে রত থাকা অবস্থায় বিয়ের ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব এভাবে হতে পারে ঃ পুরুষটি মেয়েলোকটিকে বলবে ঃ তুমি বড় ভালো, তুমি খুবই ভদ্র। আমি তোমার প্রতি আগ্রহী, আকৃষ্ট। আল্লাহ্ তোমার নিকট ভালো বন্ধন নিয়ে আসবেন ইত্যাদি ধরনের কথাবার্তা। আতা বলেছেন, ইঙ্গিতের প্রস্তাবের কথা এভাবে হতে পারে— বলবে ঃ তুমি বড় সুন্দরী। আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট, আগ্রহী। আল্লাহ ফায়সালা করলে হতে পারে ইত্যাদি। মোটকথা, ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাবে এমন ভাবে কথা বলা, যদ্দারা পুরুষটির আগ্রহ তার প্রতি প্রকাশ পাবে। তবে সুস্পষ্ট কথায় প্রস্তাব দেবে না। সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا –

তবে তোমরা পরিচিত ভালো কথা বলবে।

বলবে, আমি তোমার প্রতি আগ্রহী, আকৃষ্ট। আমি আশা করি, আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ 'কিংবা তোমাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে।' অথাৎ আসল বিয়ের কথা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে বিয়ে করবে এই কথা মনে রেখে তোমরা কথা বলবে।

এভাবে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া শরীয়াতে মুবাহ। মনে বিয়ের কথা লুকিয়ে রেখে ও স্পষ্ট শব্দে বিয়ের কথা না বলে ইঙ্গিতে বলা জায়েয।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক কোন কোন লোক থেকে উল্লেখ করেছেন, ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তাতে 'কযফ'-এর শাস্তি হবে না। কেননা আল্লাহ ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দানকে স্পষ্ট শব্দে ও ভাষায় বলা মত নিষিদ্ধ করেন নি। অনুরূপভাবে 'কযফ' এর ইঙ্গিতকেও স্পষ্ট কথার মতো করেন নি।

ইসমাঈল বলেছেন, দলীল এমন আনা হয়েছে যা তার বিপরীত কথা প্রমাণ করে। কেননা বিয়ের ইঙ্গিত, যদ্দারা কথকের বক্তব্য বোঝা যায়, তাই ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব যখন প্রকৃত বক্তব্য বোঝা যাবে, তখন তা 'কযফ' হবে এবং 'কযফকারীর উপর 'কযফ'-এর হুকুম কার্যকর হবে।

বলা হয়েছে, 'কযফ'-এর ইঙ্গিতকারীর উপর থেকে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কে তা রহিত করবে ? কেননা তার ইঙ্গিতমূলক কথা দ্বারা জানা যায়নি যে, সে 'কযফ' করতে চয়েছে। কেননা তা না-ও হতে পারে।

বলেছেন, এই কথায় একথা মনে করা বাঞ্ছনীয় হয়। 'কযফ'-এর ইঙ্গিত করা জায়েয—মুবাহ। যেমন বিয়ের প্রস্তাব দানের ইঙ্গিতমূলক কথা মুবাহ।

বিয়েতে ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব দানের পন্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে, স্পষ্ট শব্দে ও ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দানকে মুবাহ করা হয়নি, কেননা বিয়ে তো উভয়ে সম্মতিতে হবে। বিয়ের প্রস্তাব দিলে কনের পক্ষ থেকে একটা জবাব অবশ্যই পেতে হয়। কিন্তু ইঙ্গিতের প্রস্তাব সাধারণত কোন জবাবের দাবি করতে পারে না। এই কারণেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হয়ে গেছে।

আবূ বকর বলেছেন, প্রথম কথা যা প্রতিপক্ষের দিক থেকে বলা হয়েছে, ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাবের দরুন শাস্তি হবে না, কথাটি সহীহ্। তার বিপরীত কথা সুস্পষ্ট অগ্রহণীয়। দলীল পেশের দিকটি হল, ইঙ্গিতের প্রস্তাবে শাস্তি হবে না, তার বড় কারণ, সুস্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষিদ্ধ। এই কারণে ইঙ্গিতে বলাকে মুবাহ বলা হয়েছে। ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাবের হুকুম এবং সুস্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব দেয়ার হুকুম দুটি এক নয়, পার্থক্যপূর্ণ। তার ভিত্তি হল 'কযফ'-এর ইঙ্গিত বিপরীত হচ্ছে সুস্পষ্ট ভাষায় বিয়ের কথা বলার হুকুমের। এ দুটিকে কোনক্রমেই অভিন্ন মনে করা যাবে না। আল্লাহও বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে এ দুটির হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তা এজন্যে যে, শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি সন্দেহের কারণে প্রত্যাহৃত হয়। অতএব তা বিয়ের তুলনায় নিষেধে ও প্রত্যাহৃত হওয়ার দিক দিয়ে অধিক তাগিদপূর্ণ। ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব বিবাহের স্পষ্ট কথা বলার মতো নয়, স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব শাস্তি প্রমাণে অধিক তাগিদপূর্ণ। কাজেই ইঙ্গিতমূলক বিয়ের কথায় শাস্তি অপ্রমাণিত হওয়াই অধিক উত্তম নীতি। তা প্রমাণ করে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যদি ইশারা-ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে দুজনের মধ্যে বিয়ে সজ্ঘটিত হবে না। কাজেই ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাব স্পষ্ট ভাষায় দেয়া প্রস্তাবের পরিপন্থী। এই কারণে ইঙ্গিতমূলক প্রস্তাবে 'হদ্দ' প্রমাণিত না হওয়াই অধিক তাগিদপূর্ণ ব্যাপার। এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দেন নি যে, চুক্তিসমূহে অঙ্গীকার ইশারা-ইঙ্গিতে প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় স্পষ্ট কথায়। আল্লাহ্ও বিয়ের ক্ষেত্রে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অতএব 'হদ্দ' প্রমাণিত হবে না। এই পার্থক্যই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ও দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কথার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই তা হবে। তা আমাদের কথা প্রমাণের জন্যে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল। আমরা যদি সেটিকে 'ইল্লাতে'র কারণে— যা উভয়কে একত্রিত করে— কিয়াসের দিকে ফিরাতে ইচ্ছা করি, তাহলেও যথেষ্ট হবে। তা এভাবে যে, বিবাহের হুকুমটি কথার সাথে সম্পর্কিত। যেমন 'কযফ'। কিন্তু ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া ও স্পষ্ট কথায় প্রস্তাব দেয়া যখন পার্থক্যপূর্ণ, তখন ইঙ্গিতের প্রস্তাব প্রতিষ্ঠিত হল, যদিও তার চূড়ান্ত কার্যকরতা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য কথার দ্বারাই হয়।

'কযফ'-এর ইঙ্গিতের সুস্পষ্ট কথার মতই, কেননা তার দ্বারাও মূল উদ্দেশ্য বোঝা যায়, যেমন স্পষ্ট কথার দ্বারা বোঝা যায়, এই কথাটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল— আমার ধারণা, এই কথা বলার সময় আল্লাহ যে ইঙ্গিতের প্রস্তাব ও স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য

করেছেন, তা তিনি ভুলে গেছেন। কেননা দুটির বক্তব্য বোঝা যায় পার্থক্য সহকারে। কেননা বক্তব্য বোঝার সাথে সম্পর্কিত হুকুম পুরাপুরিভাবে প্রস্তাবেই বর্তমান রয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে দুটিরই হুকুম অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নাযিল হওয়া দলীল যখন এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করেছে, তখন এই অভিযোগ ভিত্তিহীন হয়ে গেল। আর আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

তার কথা ঃ 'কযফ'-এর ইঙ্গিতকারীর উপর থেকে শাস্তি দূর কক্ষর দিয়েছে, তা দূর করেছে এজন্যে যে, ইঙ্গিতের প্রস্তস্থব দিয়ে 'কযফ' করতে চাওয়া হয়েছে, তা জানা যায়স্থি। কেননা কথার তাৎপর্য ভিন্নতর হওয়া সম্ভব। এ এমন তকটি চেষ্টা, যা বিপক্ষের বক্তব্যকে প্রমাণিত করতে পাষেনি। তাতে অনুপস্থিতির উপর কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই ফায়সালা চাপানো হয়েছে। কেননা কারোর মনের গোপন ইচ্ছার উপর 'কযফ'-এর শরীয়াতী শাস্তি জারী হতে পারে— তা কেউ-ই বলতে পারে না। তাছাড়া বিপরীত মতের লোকদের দৃষ্টিতেও তা স্পষ্ট কথার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, তাছাড়া অন্য অবস্থার সাথে সম্পর্কিত হয় না। বিরোধীরা একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, 'হদ্দ' দূর হয়ে গেছে এজন্যে যে, তার মনের ইচ্ছাটাই জানা যায়নি।

ইঙ্গিতে বিয়ে মুবাহ, অতএব ইঙ্গিতে 'কযফ'-ও করা যায়, বিরোধী পক্ষের এরূপ মত এমন এক ব্যক্তিরই হতে পারে, যার কথা সে প্রমাণ করতে পারে না। তার এই বাধ্যবাধকতা আরোপের পরিণতি কি, সে দিকেও তার কোন নজর নেই। আমরা বলব, বিপরীত মতের সমর্থনে যে দলীল দেয়া হয়েছে, তা মুবাহ্ প্রমাণের 'ইল্লাত' নয়। ফলে ইঙ্গিতে 'কযফ' হয়, এ কথাও প্রমাণিত হয়। আয়াতকে দলীল বানিয়ে ইঙ্গিতের প্রস্তাবও স্পষ্ট ভাষার প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তার কারণ বিশেষ ও মুবাহ্ করা দুটিই ভিন্ন দলীলের উপর নির্ভর করে।

বিয়ের ইঙ্গিত করা জায়েয, স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের কথা বলা জায়েয নয় এজন্যে যে, বিয়ে তো এ দুটির দ্বারাই হতে পারে। প্রস্তাবের একটা জবাব অবশ্যই পাওয়া দরকার। কিন্তু ইঙ্গিতের প্রস্তাব সাধারণত জবাবের দাবি করতে পারে না। কেননা তা শুধু কথা, তার ভেতরে কোন তাৎপর্য নেই। তা সত্তেও তা চূর্ণ হওয়া। কেননা বিয়ের ইঙ্গিত এবং সুস্পষ্ট প্রস্তাব— এ দুটির একটি জবাবের দাবি করে না। ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভবিষ্যতের কোন সময়ের জন্যে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার দিকেই নিষেধ প্রত্যাবর্তিত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -

কিন্তু সাবধান! তাদের সাথে কোন গোপন চুক্তি বা বাগদানের কাজ করবে না, কোন কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে তা প্রচলিত সঠিক পন্থায়ই বলবে।

কাজেই ইঙ্গিতের প্রস্তাব কোন জবাবের দাবি করতে পারে না। যে 'আকদ' জবাব পাওয়ার দাবি রাখে, তা থেকে নিষেধ সম্পর্কিত প্রস্তাব জায়েয নয়। কাজেই ওদুটির মধ্যে পার্থক্যের প্রশ্ন উঠে না।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, জবাবের দাবি না থাকায় ইঙ্গিত ও স্পষ্ট কথার মধ্যে পার্থক্য নেই। এই ক্ষেত্রেই আয়াত দুটি ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য করেছে। যে চুক্তি জবাবের দাবিদার, তা নিষিদ্ধ হয়েছে আল্লাহ্‌র এই কথার দ্বারা ঃ

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

তোমরা বিয়ের অনুষ্ঠানের সংকল্প গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ ইদ্দত শেষ হয়ে না যাচ্ছে।

আমল 'আক্দ' করতে নিষেধ হওয়াটার দাবি হল স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দিতে নিষেধ করা দলীলের ভিত্তিতে। যেমন وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ 'এবং তুমি তাদেরকে 'উহ' বল না' কথাটি স্পষ্ট বোঝায় পিতামাতাকে গালমন্দ ও মারধোর করার নিষেধ। আর কথার ত্রুটির কারণ এই যে, যেসব চুক্তি জবাবের দাবিদার, তা ইশারা-ইঙ্গিতে সঠিক হয় না। অঙ্গিকারগুলোর ব্যাপারও তাই। তা ইঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হয় না। আর তার কথার জবাবের দাবি না হলে তাহলে তা যা জবাবে দাবি করে, আর যা জবাবের দাবি করে না, এ দুটির হুকুমে কোন পার্থক্য হয় না। তাতে জানা গেল যে, এ দিক দিয়েও দুটির পারস্পরিক পার্থক্য ও দুটির মধ্যের পার্থক্যকে আবশ্যকীয় করবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا -

কিন্তু তোমরা তাদেরকে গোপনে কোন পারস্পরিক ওয়াদা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করবে না।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে এটা ভিন্নতর কথা। ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনে যুবায়র, শবী ও মুজাহিদ বলেছেন, গোপনে তাদের সাথে পারস্পরিক ওয়াদা করার অর্থ কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি দেয়া বা আদায় করা। এই কথা বলা যে, সে যেন তার নিকট আটক হয়ে গেল, বাগদান করা, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে না— এরূপ ওয়াদা করা।

আল-হাসান, ইবরাহীম, আবূ মজলয, মুহাম্মাদ ও জাবির ইবনে জায়দ বলেছেন, 'ওদের সাথে কোন গোপন ওয়াদায় আবদ্ধ হবে না' এ কথার অর্থ যিনায় লিপ্ত হবে না। জায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন, আল্লাহ্র এই কথাটির অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীলোকটির ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠান করবে না। আর বিয়ে করার পর বলা যে, 'আমি এই বিয়ে অবশ্যই গোপন রাখব, কেউ জানবে না। অথবা তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করবে, এবং বলবে, 'আমার এই সঙ্গমের কথা কেউ জানাবে না।' ইতিমধ্যে তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ এই সমস্ত অর্থই দিচ্ছে। কেননা 'গোপন' নাম হচ্ছে যিনার। আয়াতে 'গোপন' বলে এই যিনাকেই বুঝিয়েছে। বিয়ের চুক্তিকেও 'গোপন' নাম দেয়া হয়েছে। যেমন তার আর এক নাম যৌন সঙ্গম। যৌন সঙ্গম ও আক্দ প্রত্যেকটিকেই 'বিয়ে' বলা হয়েছে। এই কারণে আয়াতের অর্থ সঙ্গম ও বিয়ের আক্দ দুটির উপরই প্রযোজ্য। সুস্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়াও বোঝায়, যা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অনুষ্ঠিত হবে।

আয়াতটির এই সব অর্থ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে উত্তম ও সুস্পষ্ট দিক হচ্ছে ইবনে আব্বাস ও তাঁর অনুসারীদের এই ব্যাখ্যা যে, উক্ত আয়াতের সুস্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়া এবং তাকে নিজেকে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন করার চুক্তিতে আবদ্ধ করা ও আটক রাখতে বলা— যেন ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিয়েটা আনুষ্ঠানিকভাবে হতে পারে। কেননা মুবাহ ইঙ্গিতের প্রস্তাব কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এই কারণেই সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষার প্রস্তাব নিষিদ্ধ হয়েছে। অপর একটি দিকও রয়েছে। তা এমন একটা

তাৎপর্য, যা আমরা আয়াত থেকেই পাই। আয়াতের তাই বক্তব্য। ইদ্দতের মধ্যে বিয়ের আক্দ ঘটানো নিষেধ, তা তার নাম সহ কুরআন পাঠের ধারাবাহিকতায়ই রয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিয়ের অনুষ্ঠান করার সংকল্প করবে না।

আয়াতে যখন তা স্পষ্ট ভাষায়ই উল্লিখিত, তাতে ইঙ্গিতের কথা নেই। কাজেই তাতে 'ইশারায় বিয়ের কথা বলা হয়েছে' এরূপ বলা অত্যন্ত দূরবর্তী কথা। পরে যে লোক যিনা বলে আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার কথাও স্বীকার্য নয়। কেননা যিনার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিও ইদ্দতের মধ্যে নিষিদ্ধ, যেমন অন্য সময়ও নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ যিনা হারাম করেছেন নিঃশর্তভাবে, কোন শর্ত ছাড়াই। তা কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তা যদি হতো, তাহলে বিশেষভাবে যিনার পারস্পরিক ওয়াদা করাকে নিষিদ্ধ করার কোন ফায়দাই পাওয়া যেত না। এই ওয়াদাটা ইদ্দতের দরুন নিষিদ্ধ বিশেষভাবে। বলা সব কয়টি কথাই তাৎপর্যের মধ্যে শামিল হতে পারে শব্দের মধ্যে এই সম্ভাব্যতা আছে বলে। তবে ইবনে আব্বাস প্রদত্ত যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, তার থেকে তা বাইরে যায় না।

আল্লাহ্র কথা عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ 'আল্লাহ্ জেনে আছেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদের কথা স্মরণ করবে।' অর্থাৎ আল্লাহ্র জানা আছে যে, তোমরা তাদের স্মরণ করবে বিয়ে করে। কেননা তাদের প্রতি তোমাদের আগ্রহ ও আকর্ষণ রয়েছে। সেই সাথে তোমাদের মনে এই ভয়ও রয়েছে যে, অন্যরা তোমাদের আগে তাদের নিকট পৌঁছে যাবে ও নিয়ে নেবে। এই কারণে ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁদের নিকট পৌঁছা মুবাহ করেছেন, স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের কথা বলাকে মুবাহ করেন নি। আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ মুবাহ জিনিস মুবাহ পথে পাওয়া ও পেতে চেষ্টা করাকে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন, যদিও অন্য উপায়ে তা নিষিদ্ধ। এরূপ কথাই নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত বিলাল (রা) রাসূলের নিকট কিছু উত্তমমানের খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞাসা করলেন, 'খায়বরের সব খেজুরই এই রকম উত্তম?' জবাবে তিনি বললেন, 'না, হে রাসূল। আমরা দুই সা' দিয়ে বিনিময়ে এক সা' গ্রহণ করি, আবার তিন সা' দিয়ে দুই সা' গ্রহণ করে থাকি।' এ কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন, 'না, তোমরা এরূপ করবে না, বরং তোমরা তোমাদের খেজুর নগদ মূল্যে বিক্রয় করে দিয়ে তার দ্বারা এই উত্তম খেজুর ক্রয় করবে।' এই কথার দ্বারা রাসূলে করীম (স) উত্তম খেজুর পাওয়ার একটা মুবাহ পন্থা দেখিয়ে দিলেন।

এ পর্যায়ে আমরা আর এক প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

আল্লাহ্র কথা ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ -

আল্লাহ্ জেনে আছে যে, তোমরা অবশ্যই তাদেরকে স্মরণ করবে।

এই কথাটি এ কথার মতই ঃ

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ -

আল্লাহ্ জেনে আছেন যে, তোমরা এ যাবত নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে।

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

এই বলে রযমানের রাত্রিকালে পানাহার ও যৌন সঙ্গম মুবাহ্ করে দিয়েছেন। আমরা বুঝলাম, যদি তা মুবাহ্ করা না হতো, তাহলে এই নিষিদ্ধ কাজে তাদের অনেকেই হয়ত জড়িয়ে পড়ত। তাই আল্লাহ তা'আলা দয়া করে ব্যাপারটিকে হালকা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র এই কথাটি ঃ 'আল্লাহ জেনে আছেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদের স্মরণ করবে।' এই অর্থের দিক দিয়ে এই কথাটিও বুঝতে হবে ঃ 'তোমরা ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিয়ের আক্দের সংকল্প করবে না।'

এ পর্যায়ে বলা হয়েছে العقدة-এর আভিধানিক অর্থ শক্ত করা। বলা হয় ঃ আমি রশিটিকে শক্ত করে বেঁধেছি।' আর রশি শক্ত করে বাঁধার সাদৃশ্য হচ্ছে সুদৃঢ় করার সাথে।

আল্লাহ্র কথাঃ 'তোমরা বিয়ের বন্ধনের সংকল্প করবে না'— এর অর্থ, বিয়ের আক্দ করে ফেলো না, বিয়ের আক্দ করার সংকল্প গ্রহণ করো না ইদ্দতের মধ্যে। মনে মনে ইচ্ছা গ্রহণ এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিয়ের আক্দ করার সংকল্প করতে কিন্তু নিষেধ নেই। কেননা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর করা হবে— এরূপ সংকল্প করাও নয় নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন ঃ তোমাদের কোন দোষ হবে না স্ত্রীদের প্রতি বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ইঙ্গিত করায় অথবা মনের মধ্যে গোপন রাখায়।

মনের মধ্যে ইচ্ছাকে গোপন রাখায় কোন দোষ হতে পারে না। এ থেকে জানা গেল যে, 'তোমরা বিয়ের আক্দের সংকল্প করো না'— আল্লাহ্র এ কথার অর্থ হচ্ছে বিয়েটা ঘটাবে না, করে ফেলবে না ইদ্দতের মধ্যে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ -

যতক্ষণ না মিয়াদ তার শেষ প্রান্তে পৌছে যায়।

এই আয়াতটুকুতে ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা সম্বোধনের তাৎপর্যের মধ্যেই রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষণীয়, ফরীয়াতা বিনতে মালিক যখন নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন, 'না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইদ্দত শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নয়। তাঁর এই কথার তাৎপর্যে তিনি ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার কথাই বুঝিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কিছু বলার কোন প্রয়োজন মনে করা হয়নি। ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতবৈষম্য নেই যে, যে লোক কোন মেয়েলোকের সাথে বিয়ের 'আকদ' করবে, এ অবস্থায় যে, সে অন্য পুরুষের থেকে তালাক পেয়ে ইদ্দত পালনে রত, তার এই 'আক্দ' ফাসিদ— অকার্যকর হবে।

আগের কালের ও পরবর্তীকালের ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে এই ব্যাপারে যে, অন্য ব্যক্তির থেকে তালাকের ইদ্দত পালনে রত স্ত্রীকে বিয়ে করলে তা কি হবে? ইবনুল মুবারক বলেছেন, আসয়াস শবী মাসরুক সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, উমর (রা)-এর নিকট খবর পৌছল যে, কুরায়শ বংশের এক মেয়েলোককে তার ইদ্দত পালনের মধ্যে বনূ

সকীফ-এর এক ব্যক্তি বিয়ে করেছে। তাই তিনি তাদের দুজনের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, বরং তাদেরকে শাস্তিও দিলেন এবং বললেন, সে তাকে কখনই বিয়ে করবে না। বায়তুলমাল থেকে মহরানা আদায় করিয়ে দিলেন। লোকদের মধ্যে খবর প্রচারিত হয়ে পড়ল। হযরত আলী (রা)-ও তা জানতে পারলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ আমীরুল মুমিনীনকে রহমত করুন, মহরানার টাকা বায়তুলমাল থেকে দেয়ার কি অবকাশ আছে ? ঐ পুরুষ-নারী ভুল করেছে, এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হল, তাদের দুজনকে সুন্নাত তরীকার দিকে ফিরিয়ে দেয়া। তাঁকে প্রশ্ন করা হল তাহলে আপনি এ বিষয়ে কি বলতে চান? বললেন, মেয়েলোকটি মহরানা পাবে পুরুষটির নিকট থেকে, কেননা সে-ই তার স্ত্রী-অঙ্গকে হালাল বানিয়েছিল। অতঃপর তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। মেয়েলোকটি তার প্রথম পালনীয় ইদ্দত সম্পূর্ণ করবে। তার পরে এই দ্বিতীয় বিয়ে-বিচ্ছেদের ইদ্দত পালন করবে। তার পরই তার বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। পরে এই কথা হযরত উমর (রা) জানতে পারেন। তখন তিনি বললেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجِهَالاَتِ اِلَى السُّنَّةِ -

হে জনগণ, তোমরা সকল প্রকারের জিহালাতকে সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দাও।

ইবনে আবূ জায়েদাও আশ'আস থেকে এরূপ বর্ণনাই করেছেন। তাতে বলেছেন, হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর কথাকেই মেনে নিলেন।

আবূ বকর বলেছেন, হযরত আলী ও উমর (রা) একই কথায় একমত হয়েছেন। কেননা হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এর কথা মেনে নিয়েছেন বলে বর্ণনা এসেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, এ রকমের বিয়ে হলে সে পুরুষ-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করতে হবে। মেয়েলোকটি 'মহরে মিসল' পাবে। তার প্রথম ইদ্দতটি পালন শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়জনকে ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পারবে। এটা সওরী ও শাফেয়ীরও মত। মালিক, আওজায়ী, লাইস ইবনে সাদ বলেছেন, না, সেই মেয়েলোকটি দ্বিতীয় পুরুষটির জন্যে কখনই হালাল হবে না। মালিক, লাইস এ-ও বলেছেন, 'মিলকে ইয়াসীন' দাসত্ব প্রক্রিয়ায়ও সে পুরুষটি সে মেয়েলোকটিকে কি হালাল করতে পারবে না ?

আবূ বকর বলেছেন, যেসব ফিকাহবিদের কথা উপরে উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতের ভিন্নতা নেই যে, কোন পুরুষ যদি একটি মেয়েলোকের সাথে যিনা করে, তাহলে সে তাকে বিয়েও করতে পারে, তা তার জন্যে জায়েয। ইদ্দতের মধ্যে যিনা তো বড় বিয়ে। যিনা যখন মেয়েলোকটিকে পুরুষটির বিয়ে করা চিরদিনের জন্যে হারাম করে দেয় না, তখন অন্য কাউকে মনে করে সন্দেহে সঙ্গম করা হলে সে-ও সে পুরুষটির জন্যে হারাম হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার স্বাধীনা স্ত্রী বর্তমান থাকাকালে কোন দাসীকে বিয়ে করে কিংবা দুই বোনকে একসাথে স্ত্রী বানায় এবং উভয়ের সাথে সঙ্গম করে, তাহলে এই মেয়েলোকরা পুরুষটির জন্যে চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে না। ইদ্দতের মধ্যের বিয়েতেও সঙ্গম হলে হয় তাকে সন্দেহবশত সঙ্গম মনে করতে হবে, কিংবা সোজাসুজি যিনা বলতে হবে। দুটির যেটিই হোক, চিরদিনের জন্যে হারাম হওয়ার ব্যাপার হবে না।

যদি বলা হয়— যিনা ও সন্দেহের সঙ্গমে তোমাদের মতেই চিরস্থায়ী হারাম হওয়ার ব্যাপার হয়, যেমন যে লোক নিজ স্ত্রীর মার সাথে যিনা করল বা তার কন্যার সাথে যিনা করল সে স্ত্রী চিরদিনের জন্যে হারাম হয়ে যায়।

জবাবে বলা যাবে, আমরা কোনভাবেই এই আলোচনার মধ্যে নেই। কেননা আমাদের আলোচনা হচ্ছে সেই সঙ্গম সম্পর্কে যা সঙ্গমকৃতা মেয়েলোকটাকে পুরুষটির জন্যে হারাম করে দেয়। তবে যে সঙ্গম অন্য কাউকে হারাম করে, সে বিষয়ের হুকুম হল, এ ধরনের সব সঙ্গমই আমাদের যিনা। তা সন্দেহের সঙ্গম হোক কি মুবাহ্ যিনা হোক। মৌলনীতিতে তুমি এ বিষয়ে পাবে না, যা সঙ্গমকৃতা মেয়েলোকটিকেই হারাম করে। কাজেই তোমার কথা মৌলনীতির বাইরে। আগের কালের ফিকাহবিদদের মতেরও বিপরীত। কেননা উমর (রা) নিজেই হযরত আলী (রা)-এর এই বিষয়ের মতকে মেনে নিয়েছিলেন। তাছাড়া হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মহরানা বায়তুলমাল থেকে আদায় করে দিয়েছেন। তা এইজন্যে যে, তিনি এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এই মহরানা সে অর্জন করেছে একটা নিষিদ্ধ উপায়ে। অতএব তাকে তা সাদকাস্বরূপ দিয়ে দিতে হবে। আর এই কারণেই তিনি তা বায়তুলমাল থেকে আদায় করেছেন।পরে তিনি হযরত আলী (রা)-র মতের দিকে ফিরে এসেছেন। মেয়েলোকটির মহরানা বায়তুলমাল থেকে দেয়ার মত শুধু এজন্যে ছিল যে, সে তা অর্জন করেছে। একটি নিষিদ্ধ উপায়ে, তা রাসূল (স) থেকে পাওয়া একটি বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বর্ণনার কথা হল, একটি ছাগী তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত ধরে আনা হয়েছিল। সেটি ভূনা করে রাসূলের সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। তিনি তা খেতে প্রায় শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই ছাগী আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি তার মালিকের অনুমতি ছাড়া ধরে আনা হয়েছে নিতান্ত অন্যায়ভাবে। লোকেরা তাঁকে পরে প্রকৃত ঘটনার কথা জানাল। তখন তিনি বললেন, এটি বন্দীদের খাইয়ে দাও। আমাদের মতে তার কারণ এই ছিল যে, সেটির মূল্য দেয়া তাদের দায়িত্ব হয়েছিল। অতঃপর তিনি সেটি সাদ্‌কা করে দেয়ার আদেশ করলেন। কেননা সেটি আমাদের হাতে নিষিদ্ধ পন্থায় এসেছিল। তারা তখন পর্যন্ত সেটির মূল্য তার মালিকের নিকট আদায় করে দেয়নি।

সুলায়মান ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, সে মেয়েলোকটির মহরানা বায়তুলমাল থেকেই দেয়া হয়েছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম ও জুহরী বলেছেন, হ্যাঁ, মেয়েলোকটি মহরানা পেতে পারে, যেমন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত উমর (রা) ও আলী (রা) সেই জন্যেই একমত হয়েছিলেন। আর তাঁদের দুজনার উপর সেজন্যে কোন দণ্ডও কার্যকর হবে না । তাতে বোঝা যায় যে, ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে হলে কোন দণ্ড ধার্য হবে না। যদিও একথা জানা আছে যে, কাজটি ছিল হারাম। মেয়েলোকটিও জানত যে, সে ইদ্দত পালনে রত আছে। এই কারণে হযরত উমর (রা) তাকে দোররা মেরেছিলেন। আর তার মহরানা বায়তুলমাল থেকে দিয়েছিলেন। কোন সাহাবীই এ ব্যাপারে তাঁদের দুজনের সাথে মতপার্থক্য করেন নি। ফলে এটি একটি মৌলনীতি হয়ে দাঁড়াল এজন্যে যে, ফাসেদ বিয়েতে যে সঙ্গম হবে, তাতে শাস্তি ওয়াজিব হবে না। তারা সে কাজ হারাম জানুক, আর না-ই জানুক। এই ঘটনা ইমাম আবূ হানীফার মতের সাক্ষী এই ব্যাপারে যে, কেউ যদি কোন মুহাররম মেয়েলোকের সাথে বিয়ে করে সঙ্গম করে, তাহলে তার উপর 'হদ্দ' জারী হবে না।

দুই ব্যক্তির থেকে ইদ্দত পালন ওয়াজিব হলে তাকে কি করতে হবে— এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মদ, জুফর, মালিক (ইবনুল কাসিমের বর্ণনায়) সওরী ও আওজায়ী বলেছেন ঃ কোন মেয়েলোকের উপর দুইজন স্বামীর তরফ থেকে ইদ্দত পালন ওয়াজিব হলে সে ইদ্দত কার্যত একটি হবে সামনের দিকের জন্যে।

প্রথম কথাটির সত্যতার প্রমাণ হল আল্লাহ্ কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদেরকে ইদ্দত পালনে রত রাখবে তিন কুরু।'

এ কথা দাবি করে যে, এই স্ত্রীলোকের ইদ্দতের মিয়াদ তিন কুরু, যদি তার স্বামী তাকে তালাক দেয় এবং অপর কোন ব্যক্তি তার সাথে সন্দেহক্রমে সঙ্গম করে তাহলে। কেননা সে তালাকপ্রাপ্তা, ইদ্দত পালন তার কর্তব্য। তার উপর তিন কুরু'র বেশি সময়ের জন্যে ইদ্দত পালন কর্তব্য করে দিলে আয়াতে তা অতিরিক্ত চাপানোর অপরাধে অপরাধী হবে। কেননা আয়াতে সে অতিরিক্ত ইদ্দতের কথা নেই। কেননা কে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তালাকপ্রাপ্তাদের সাথে সঙ্গম করেছে, আর কে অন্যভাবে করেছে, তার মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করতে পারি না। আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ -

তোমাদের মধ্যের যেসব মেয়েলোক হায়য হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে যাও, তাহলে তাদের ইদ্দতের মিয়াদ তিন মাস, আর যাদের এখনও হায়য হয়নি ......

যে তালাকপ্রাপ্তার সাথে কোন সম্পর্কহীন ব্যক্তি সন্দেহে সঙ্গম করেছে এবং কে তার সাথে সঙ্গম করে নি, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করা হয়নি। অতএব এ অবস্থার দাবি হচ্ছে, তার ইদ্দত হবে তিন মাস উভয় অবস্থাতেই। আল্লাহ্র এই কথাটির দ্বারাও তা-ই প্রমাণিত হয় ঃ

গর্ভধারিণী মেয়েলোকদের ইদ্দতের মিয়াদ হচ্ছে তাদের সন্তান প্রসব হওয়া।

তার উপর ইদ্দত একজন পুরুষ থেকে, কি দুইজন পুরুষ থেকে, তার মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

আল্লাহ্র এই কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

হে নবী! লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও, তা হচ্ছে সময় নির্ধারক লোকদের জন্যে এবং হজ্জের।

কেননা ইদ্দত হচ্ছে সময়ের অতিবাহিত হওয়া। আর নতুন চাঁদ ও মাসসমূহ তার দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়। আল্লাহ্ তাকে সমস্ত মানুষের জন্যে সময় নির্ধারক বানিয়েছেন। অতএব মাস ও নতুন চাঁদসমূহ প্রত্যেকের জন্যে সময়ের নির্ধারক হতে হবে আয়াতটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক বলে। আর সকলেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত, এটাও একটা দলীল এই কথার যে, প্রথম স্বামীর জন্যে সে স্ত্রীর সাথে বিয়ের আকদ করা জায়েয হবে না তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে।

এ থেকে আমরা জানলাম যে, সে স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় জন থেকেও ইদ্দত পালন করছে। কেননা তার থেকে ইদ্দত তাকে বিয়ে করতে নিষেধ করে না।

যদি বলা হয়, হ্যাঁ, তার সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করে। কেননা প্রথম জনের থেকে ইদ্দত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জন থেকেও ইদ্দত পালন শুরু হয়ে যাবে।

জবাবে বলা যাবে, হ্যাঁ, তাকে বিয়ে করা জায়েয হবে। পরে দ্বিতীয় জন থেকে ইদ্দত পালনের স্থান পর্যন্ত পৌঁছার আগেই সে যদি মরে যায়, তা হলে তাকে দ্বিতীয় জন থেকে ইদ্দত পালন জরুরী হবে না। যদি তার এই অবস্থায় তার থেকে ইদ্দত পালনে রত না থাকে, তাহলে তার আক্‌দ হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। কেননা ইদ্দত তো সামনের দিকে চলবে। তা পেছনের আক্‌দকে তুলে ফেলতে পারে না। তার দলীল এ-ও যে, হায়য জরায়ুতে গর্ভের অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ। প্রথম স্বামী যখন তাকে তালাক দিল এবং পরে দ্বিতীয় পুরুষ তার সাথে সন্দেহক্রমে সঙ্গম করল তার হায়য হওয়ার আগেই, পরে সে তিন হায়য অতিবাহিত করল, তাতে গর্ভ না থাকা প্রমাণিত হল। প্রথম গর্ভহীনতা দ্বিতীয় গর্ভহীনতা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তাদের দুজনার থেকেই ইদ্দত শেষ হওয়া আবশ্যক। এটাও একটা প্রমাণ যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় বায়েন তালাক, পরে ইদ্দতের মধ্যে সন্দেহে তার সাথে সঙ্গম করে, তাকে দুটি ইদ্দত পালন করতে হবে। একটি ইদ্দত এই সঙ্গমের কারণে। আর প্রথম ইদ্দতের অবশিষ্ট দিনগুলোও ইদ্দত পালন করবে। এভাবে দুটি ইদ্দত-ই পালিত হয়ে যাবে। সে ইদ্দত একজন পুরুষ থেকে কি দুইজনের থেকে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

যদি বলা হয়, আসলে এটা এক ব্যক্তির জন্যেই কর্তব্য। আর প্রথমটা ওয়াজিব দুই ব্যক্তির জন্যে।

জবাবে বলা যাবে, এক ব্যক্তি আর দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নেই। কেননা দুটি হক যদি এক ব্যক্তির দরুন হয়, তাহলে দুটোকেই একসাথে আদায় করা ওয়াজিব। যেমন দুই ব্যক্তির জন্যে তা পূরণ করা কর্তব্য হয়। যেন ঋণসমূহের মিয়াদ, হজ্জের সময়ে, ইজারার ক্ষেত্রে, 'ঈলার' মিয়াদ একই সময় অতিবাহিত হওয়ায় প্রত্যেকটিরই হক আদায় হয়ে যায়। কাজেই এই মাসগুলো যে জন্যে, তা-ই অন্য কাজের জন্যেও হয়ে যায়।

আবুজ জিনাদ সুলায়মান ইবনে ইয়াসার উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে মেয়েলোক ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করেছে, তাকে তিনি উভয় স্বামী থেকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, দুজনের দিক থেকে একই ইদ্দত পালিত হবে।

যদি বলা হয়, জুহরী সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, প্রথম স্বামী থেকে পালন করা ইদ্দতের অবশিষ্ট দিনগুলো ইদ্দত হিসেবে কাটিয়ে তার পরে দ্বিতীয় জন থেকে ইদ্দত পালন করবে।

জবাবে বলা যাবে, এর মধ্যে একথা নেই যে, প্রথম জনের ইদ্দত পালন শেষ হয়ে গেলে পরেই দ্বিতীয় জনের ইদ্দত সম্পূর্ণ নতুনভাবে পালন করা শুরু করবে। এর অর্থ আসলে এই যে, প্রথম ইদ্দতের অবশিষ্ট দিন-ও দ্বিতীয় ইদ্দতের মধ্যেই পালিত হয়ে যাবে। এভাবেই আবুজ জিনাক বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে।

তালাকপ্রাপ্তার প্রাপ্য মাত্'আ

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ -

যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের মহরানা নির্দিষ্ট করার আগেই তালাক দাও এবং তাদেরকে মাত্'আ দাও, তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না।

অর্থাৎ স্পর্শ করা ও তাদের মহরানা নির্দিষ্ট করা এই দুটি মূল কথা। উক্ত কথার সাথে সংযোজিত করা হয়েছে ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ -

তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দাও এ অবস্থায় যে, তাদের জন্যে তোমরা মহরানা নির্দিষ্ট করেছ, তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক দিতে হবে।

তাই প্রথমোক্ত আয়াতের অর্থ যদি হতো ঃ তোমরা স্পর্শ করনি, অথচ তাদের মহরানা নির্দিষ্ট করেছ, অথবা তা করনি, তাহলে তার সাথে এই শেষোক্ত আয়াত সংযোজন করা কখনই হতো না। او কখনও-কখনও واو অর্থ দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْكَفُوْرًا -

এবং তোমরা আনুগত্য করবে না গুনাহগার নাফরমান ব্যক্তির কিংবা কাফিরের।

এবং অর্থাৎ কাফিরেরও আনুগত্য করবে না।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ -

তোমরা যদি রোগী হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে ফিরে আসল ...। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৩)

এর অর্থ, এবং পায়খানা থেকে আসল এবং তোমরা রোগাক্রান্ত হলে এবং মুসাফির হলে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْيَزِيْدُوْنَ - (الصافات : ١٤٧)

এ আয়াতেও او (অথবা) অর্থ واو এবং। অভিধানে এর কমই ব্যবহৃত হয়। এবং তা 'না' তাতে واو অর্থ দাখিল হওয়ার দিক দিয়ে অধিক প্রকাশমান। যেমন 'তোমরা আনুগত্য করো না তাদের মধ্য থেকে পাপীকে অথবা কাফিরকে'— এর অর্থ এবং কাফিরকে। কেননা তাও প্রথম নিষেধের অধীন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَا اَوْ مَااخْتَلَطَ بِعَظْمٍ -

হারাম করেছিলাম গাভী ও ছাগলের চর্বিও—যা ওদের পৃষ্ঠদেশ ও অন্ত্রের মধ্যে লেগে আছে কিংবা যা হাড়ের সাথে যুক্ত হয়েছে তা বাদে .... (সূরা আন'আম ঃ ১৪৬)

এ আয়াতেও او। 'কিংবা' আসলে 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব আল্লাহ্‌র কথাঃ 'তোমাদের স্পর্শ করা ও তাদের জন্যে মহরানা নির্ধারণের পূর্বে যদি তোমরা তালাক দাও, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না'.... 'না'র পরে او। এসেছে, এখানেও 'এবং' অর্থ হবে। তাতে মাতা ওয়াজিব হওয়ার দুটি তাৎপর্য এক সাথে বিবেচ্য হবে— একটি স্পর্শ না করা আর দ্বিতীয় মহরানা নির্ধারিত না হওয়া অবস্থায় তালাক দিলে মাত্‌'আ ওয়াজিব হবে। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সঙ্গম করার আগে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার স্বামীর আছে। সে সঙ্গমকৃতার মত নয়। তার জন্যে তালাক দেয়া মুবাহ বিনা শর্তে। তাতে তুহর ও হায়যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

আগের কালের ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ মাত্‌'আ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ 'প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যে মাত্‌'আ থাকতে হবে।' জুহরী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন ঃ

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ اِلَّا الَّتِىْ تَطْلُقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا -

প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্যেই মাত্‌'আ রয়েছে। তবে যার মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাকে স্পর্শ করা হয়নি, তাকে অর্ধেক মহরানা দিতে হবে।

আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। শুরাইহ, ইবরাহীম ও আল-হাসান বলেছেন, সঙ্গমের পূর্বেও মহরানা নির্ধারিত হয়নি— এমন স্ত্রীকে তালাক দেয়া হলে তাকে মাত্‌'আ গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হবে। শুরাইহ আরও বলেছেন, তাকে মাত্‌'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমরা মুত্তাকীদের মধ্যের লোক, তা আমরা অস্বীকার করবো না। বললে, আমি অভাবগ্রস্ত। বললেন, আমরা মুহসিন— দয়াশীল, একথাও আমরা অস্বীকার করব না।

আল-হাসান ও আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা এসেছে ঃ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ 'প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্যে মাত্‌'আ জীবনোপকরণ রয়েছে।' সাঈদুবনে যুবায়রকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ মাত্‌'আ কি সকল মানুষেরই দেয়া কর্তব্য ? বললেন, না। শুধু মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য। ইবনে আবুজ জিনাদ তার পিতা থেকে كتاب البيعة-এ বর্ণনা এসেছে, লোকেরা তালাকপ্রাপ্তার জন্যে মাত্‌'আ ওয়াজিব মনে করত না। বরং তাকে মনে করত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক বিশেষ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ। আতা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কোন

ব্যক্তি যখন মহরানা নির্দিষ্ট করবে ও স্পর্শ করার আগেই তালাক দেবে, তার মাত্‌'আ ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নেই। মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেছেন, যার মহরানা নির্দিষ্ট হয়নি মাত্‌'আ কেবল তার জন্যে। আর যার মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে, তার মাত্‌'আ প্রাপ্য নয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক নাফে যে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবনে উমর (রা) তালাকপ্রাপ্তার জন্যে মাত্‌'আ ওয়াজিব প্রাপ্য, তা মনে করতেন না। তবে যে মেয়েকে কোন বিনিময়ে বিয়ে দেয়া হয়েছে, পরে সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়েছে, তার জন্যে মাত্‌'আ ওয়াজিব। মা'মার জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মাত্‌'আ দুটি। একটি সরকার দেবে। আর অপরটি মুত্তাকীদের উপর ধার্য হক—যে মহরানা নির্দিষ্ট হওয়া ও সঙ্গম হওয়ার পূর্বে তালাক দিয়েছে, সে মাত্‌'আ গ্রহণ করবে। কেননা তার মহরানা দেয়া ওয়াজিব নয়, আর যে তালাক দেবে মহরানা নির্দিষ্ট হওয়া ও সঙ্গম হওয়ার পর, তার জন্যে মাত্‌'আ দেয়া স্বামীর কর্তব্য। মুজাহিদ থেকেও এরূপ কথা এসেছে। এ হচ্ছে মাত্‌'আ পর্যায়ে আগের কালের ফিকাহবিদদের মতামত। তবে বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, মাত্‌'আ ওয়াজিব তার জন্যে যা'র সাথে সঙ্গম হয়নি ও কোন মহরানাও ধার্য হয়নি এমতাবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে। যদি সঙ্গম হয়ে থাকে, তাহলে তাকে মাত্‌'আ দেবে, তবে তা নেয়ার জন্যে তার উপর জোর করা যাবে না। সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ ও আওজায়ী এই মতই দিয়েছেন। তবে আওজায়ী মনে করেন, স্বামী স্ত্রী দুই জনের কোন একজন যদি ক্রীতদাস হয়, তাহলে মাতা'আ দেয়া ওয়াজিব নয়, তাথে সঙ্গম ও মহরানা নির্ধারণের আগে তালাক দিলেও ইবনে আবূ লায়লা ও আবুজ জিনাদ বলেছেন, মাত্‌'আ দেয়া ওয়াজিব নয়। ইচ্ছা হলে দিতে পারে, ইচ্ছা না হলে দেবে না। এজন্যে স্বামীকে জোরপূর্বক বাধ্য করা যাবে না। সঙ্গমকৃতা ও সঙ্গমকৃতা নয়—মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে আর হয়নি, এভাবে কোন পার্থক্য করা হয়নি। মালিক ও লাইস বলেছেন, কাউকে মাত্‌'আ দিতে বাধ্য করা যাবে না, তার মহরানা নির্দিষ্ট করা হোক কি না হোক, তার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে কি হয়নি, তাতে কোন পার্থক্য করা হবে না। এটা একটা বাঞ্ছনীয় কাজ বটে, তবে সেজন্যে স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না। মালিক এ-ও বলেছেন, লেয়ানকারিণীর জন্যে কোন অবস্থায়ই মাত্‌'আ প্রাপ্য নয়। শাফেয়ী বলেছেন, মাত্‌'আ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তারই প্রাপ্য, প্রত্যেক স্ত্রীর জন্যে। তার সাথে সঙ্গম করা ও মহরানা ধার্য হওয়ার আগেই যদি বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তবে যাঁর মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে ও সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়েছে, তার জন্যে ওয়াজিব নয়।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা প্রথমে মাত্‌'আ, ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে কথা বলব। তার পরে কথা বলব প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তার জন্যে তা ওয়াজিব বলেছেন, তাদের সম্পর্কে।

মাত্‌'আ ওয়াজিব— তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ -

তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার বা তাদের জন্যে মহরানা নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক দাও

এবং তাদেরকে মাতা'আ দাও তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ চাপবে না। মাত্'আ সচ্ছল লোকের উপর তার পরিমাণে এবং দরিদ্রের উপর তদনুপাতে দেয়া কর্তব্য। এ মাত্'আ সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে দেয়া মুহসিন লোকদের উপর আরোপিত একটি হক বিশেষ।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদের বিয়ে করবে, তার পর তাদের স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দেবে, তাহলে তাদের উপর কোনই ইদ্দত ধার্য নেই, যা তারা পালন করতে পারে। এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে মাতা'আ দাও এবং সুন্দর নির্ঝঞ্ঝটভাবে তাদেরকে চলে যেতে দাও। (সূরা আহযাব ঃ ৪৯)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ-

তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে যথাযথভাবে মাত্'আ রয়েছে মুত্তাকী লোকদের উপর হক হিসেবে।

এসব আয়াত মাত্'আ দেয়া ওয়াজিব প্রমাণ করে কয়েকভাবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ فَمَتِّعُوْهُنَّ 'অতএব তোমরা তাদেরকে মাত্'আ দাও'— এ একটি আদেশ। আর আল্লাহ্র আদেশ পালন ওয়াজিব-ফরয। তা মুস্তাহাব হওয়ারও দলীল। আর দ্বিতীয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'প্রচলিত শুভ নিয়মে মুহসিনদের উপর হক হিসেবে ধার্য।' তার উপর ধার্য 'হক' এই কথার তুলনায় অধিক তাগিদপূর্ণ ওয়াজিব করার শব্দ আর কিছু হতে পারে না। আর তৃতীয়, আল্লাহ্র কথা ঃ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ 'মুহসিন লোকদের উপর হক হিসেবে ধার্য।' এটা তার ওয়াজিব হওয়ার তাগিদ এবং এটা ইহ্সানের শর্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য মুহসিন হওয়া। আল্লাহ্র কথা ঃ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাকী লোকদের উপর ধার্য হক' এই কথাটিও অনুরূপভাবে ওয়াজিব প্রমাণ করে। এটা তার ওয়াজিব-ফরয হওয়ার তাগিদ-ও। 'অতএব তাদেরকে মাত্'আ দাও এবং উত্তমভাবে তাদেরকে চলে যেতে দাও' কথাটিও ওয়াজিব প্রমাণ করে একটি স্পষ্ট আদেশ হিসেবে। আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্যে প্রচলিত শুভ নিয়মে মাত্'আ রয়েছে' ওয়াজিব-ফরয প্রমাণ করে। কেননা এ কথায় মাত্'আ তাদের প্রাপ্য বলা হয়েছে। আমার যা মানুষের জন্যে, মানুষ তার মালিক; দাবি করার পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। যেমন যদি বলা হয়, 'এই ঘরটি জায়দের জন্যে' তাহলে তার অর্থ হবে, ঘরটির সে মালিক।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ যখন বিশেষভাবে 'মুত্তাকীন' ও 'মুহসিনীন' শব্দের উল্লেখ করেছেন মাত্'আ ওয়াজিব ঘোষণার সাথে যুক্ত করে, তখন বোঝা গেল যে, তা ওয়াজিব নয়, বড়জোর

মুস্তাহাব। কেননা যা ওয়াজিব কিংবা ফরয, তাতে মুত্তাকীন মুহসিনীন এবং যারা এই পরিচয়ের নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য হয় না, হয় নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য।

জবাবে তাকে বলা হবে, আয়াতে মুত্তাকীন ও মুহসিনীন-এর উল্লেখ হয়েছে মাত্'আ ওয়াজিব-ফরয হওয়ার তাগিদস্বরূপ, বিশেষভাবে কেবল সেই পরিচিতির লোকদেরই উপর তা ফরয, একথা বোঝাবার জন্যে নয়। এই পরিচিতি ছাড়া অন্যদের জন্যে তা ওয়াজিব নয়, একথা বোঝাতে চাওয়া হয়নি। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 'মুত্তাকী লোকদের জন্যে হেদায়েত'। কুরআন কেবল মাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্যে হেদায়েত নয়, সকল মানুষের জন্যে হেদায়েত। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ -

রমযান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে সকল মানুষের জন্যে হেদায়েতস্বরূপ।

'মুত্তাকীনের' জন্যে হেদায়েত বলায় এ গুণের অধিকারী যারা নয় তাদের জন্যে তা হেদায়েত নয়, তা হওয়া জরুরী হতে পারে না। অনুরূপভাবে 'মুত্তাকীদের উপর হক' মুহসিনদের উপর হক' এই কথা প্রমাণ করে না যে, এই মুত্তাকী ও মুহসিন ছাড়া অন্যদের উপর তা ধার্য হক নয়। তাছাড়া উদ্ধৃত আয়াতসমূহে যেমন মুত্তাকী ও মুহসিনদের উপর তা 'হক' বলা হয়েছে, তেমনি সাধারণভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে ঃ

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً -

অতএব তোমরা মাত্'আ দাও তাদেরকে এবং তাদেরকে ভালো ভাবে চলে যেতে দাও।

(সূরা আহযাব ঃ ৪৯)

এ তো সর্ব সাধারণের জন্যে ব্যাপক ও নির্বিশেষ আদেশ। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। কেননা বিভিন্ন দেশের ফিকাহ্‌বিদগণ যেসব কাজকে মুহসিন মুত্তাকীনদের উপর ফরয বলেছেন, তা অন্যদের উপরও ফরয বলেছেন। প্রশ্নকারীর একথা মনে করা উচিত নয় যে, মাত'আ দেয়া শুধু মুস্তাহাব। কেননা যা মুস্তাহাব, তা-ও তো মুত্তাকী-মুহসিন ও সাধারণ মানুষ সকলের জন্যেই মুস্তাহাব। মুস্তাহাব ব্যাপারেও যখন মুত্তাকী-মুহসিন ও সাধারণ মানুষ,সকলের জন্যেই মুস্তাহাব। মুস্তাহাব ব্যাপারেও যখন মুত্তাকী-মুহসিনকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তখন ওয়াজিব-ফরযে তা করা যাবে না কেন? অতএব বুঝতে হবে যে, মাত্'আ দেয়া ওয়াজিব-ফরয, এ ব্যাপারে মুত্তাকী-মুহসিন ও সর্বসাধারণ মানুষ সমান।

যদি বলা হয়, মহরানা ইত্যাদি সমস্ত 'দেয়ন' ও পারস্পরিক লেন-দেনের যাবতীয় চুক্তির ওয়াজিব ঘোষণায় মুত্তাকী মুহসিনদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি, অথচ শুধু মাত্'আর উল্লেখে বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হল কেন? জবাবে বলা যাবে, সর্বত্রই যখন ওয়াজিব ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তখন শব্দের দাবি অনুযায়ীই হুকুম গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। তার পরই তাকওয়া-ইহ্সানের ধারক লোকদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ নির্ধারণ করতে হবে। আসলে বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে হুকুমের তাগিদস্বরূপ। তাগিদের কারণ বিভিন্ন হতে পারে। বিশেষভাবে তাকওয়া ও ইহ্সানের উপর জোর দেয়ার জন্যেও তা হতে পারে। আবার দেয়া হুকুমটাকে জোরদার করার কারণেও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হতে পারে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং স্ত্রীদের মহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ -

অতএব তার নিকট রক্ষিত আমানত ফিরিয়ে দেয়া উচিত, যার নিকট তা রাখা হয়েছে এবং তার রব্ব আল্লাহ্কে তার ভয় করা উচিত।

কোন বিষয়ে সাক্ষী বানাবার জন্যে আদেশের উদ্দেশ্যেও বিশেষীকরণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে রেহন রাখার কাজে। অতএব তাগিদের শব্দকে অন্যদের উপর ওয়াজিব-ফরয না হওয়ার দলীল কিভাবে বানানো যেতে পারে ? তাছাড়া বিয়ের আক্দকে আমরা এভাবে পাচ্ছি যে, তাতে বদলটা ওয়াজিব হয়। মহরানা নির্ধারিত হলে তা-ই দেয় হয়, আর নির্ধারিত না হলে 'মহ্রে মিসল' দেয় হয়। পরে তার অবস্থা এই হয় যে, মহরানা নির্দিষ্ট হলে স্ত্রী-সঙ্গমের পূর্বে তালাক পেয়ে গেলে তার বদলটা অবশ্যই পেয়ে যায়। বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটলেও তাই। আর সমস্ত চুক্তিই এরূপ হয়ে থাকে। কেননা বিক্রেতার মালিকানায় পণ্য ফেরত এলে সমস্ত মূল্য প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। আর সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক প্রত্যাহৃত হলেও তার বদল (মহরানা) পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। সে বদল হচ্ছে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক। আর যদি মহরানা ধার্য না হয়ে থাকে, তাহলেও তার সেই হুকুমই হবে। এ দুটির মধ্যে সমন্বয়কারী তাৎপর্য হল সঙ্গমের পূর্বে তালাক হওয়া। উপরন্তু বিয়ের 'আক্দ' হলেই 'মহরে মিস্ল' প্রাপ্য হবে, মাত্'আও পাবে। আর তা 'মহরে মিসল'-এরই অংশ ধার্য মহরানার অর্ধেক অবশ্যই ফরয হবে যদি সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দেয়।

যদি বলা হয়, 'মহরে মিস্ল' তো হয় টাকা-কড়ি। আর মাতা'আ হয় কাপড়-চোপড়। জবাবে বলা যাবে, মাত্'আও আমাদের মতে সেই টাকা-কড়িই। তা দিলে অন্য কিছু দিতে বাধ্য করা হবে না। এই বললাম যে, 'মাত্'আ 'মহরে মিস্লের' অংশ, তা ইমাম মুহাম্মাদের মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তিনি বলেছেন, যদি স্ত্রীকে 'মহরে মিসল'-এর বন্ধনে রাখা হয়, পরে সঙ্গমের আগেই তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাকে মাত্'আর বন্ধনে বন্দী করা হবে। তা ধ্বংস হলে সে-ও ধ্বংস হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ তাকে মাত্'আর সাথে রেহনবন্দী করেন না। যদি তা ধ্বংস হয় তাহলে কোন জিনিস না পেয়েই ধ্বংস হবে। কিন্তু মাত্'আ ওয়াজিব-ফরয হয়ে স্বামীর উপর বাকী থেকে যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মাত্'আকে 'মহরে মিস্ল'-এর অংশ মনে করেন না। বরং তা ওয়াজিব ফরয মনে করেন কুরআনের হুকুমের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়েই। তাঁর দলীল-ও রয়েছে। সেই সাথে এই মৌলনীতিও যে, স্ত্রীর বিয়ে বদল বিনিময় পাওয়ার অবশ্যই অধিকারী সঙ্গমের আগে তালাক হলে। 'আক্দ-এর সময় মহরানা ধার্য হোক বা না-ই হোক, তাতে কোন পার্থক্য করা যাবে না। কেননা বিয়ের মাধ্যমে যে স্ত্রী-অঙ্গ ভোগের অধিকার জন্মে স্বামীর জন্যে, তা কখনই বিনিময় ছাড়া হতে পারে না, জায়েয নয়। কাজেই বিয়ের আক্দ হওয়ার সময় মহরানা ধার্য না হলে মহরে মিস্ল অবশ্যই দিতে হবে ঠিক তেমনি, যেমন ধার্য হলে দিতে হয়। তাই সঙ্গমের আগেই তালাক দিলে 'বিনিময়' দেয়া ওয়াজিব-ফরয হওয়ায় উভয় অবস্থাই সমান, অভিন্ন এবং মাত্'আর মহরে মিস্ল-এর অংশের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় বহাল থাকবে।

ইবরাহীম নখ্‌য়ী সঙ্গমের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা সম্পর্কে বলেছেন, তার জন্যে মহরানা ধার্য হয়ে থাকলে অর্ধেক মহরানা তার প্রাপ্য হবে, আর তা-ই তার মাত্‌'আ। তাতে মাত্‌'আর নাম হয় সেই জিনিসের যা সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রীর প্রাপ্য হয় স্বামীর নিকট থেকে। আর তা-ই হবে স্ত্রীর বিয়ের (স্ত্রী-অঙ্গের) বিনিময়।

যদি প্রশ্ন তোলা হয়, মাত্‌'আ যদি মহরে মিস্‌ল-এর অংশের স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে তা মহরানারই বিনিময় হল। আর তালাকের পূর্বে মহরানার বদল পাওয়ার ওয়াজিব হয় না। তাই তার পরেও তা হবে না।

জবাবে বলা যাবে, আমরা বলিনি যে, তার বদল নয়। যদিও তা তার স্থলাভিষিক্ত যেমন আমরা বলি না যে, ব্যবহৃত জিনিসের মূল্য তার বদল। বরং বলি যে, তা যেন তার স্থানে দাঁড়িয়ে। যেমন ক্রয়কারীর জন্যে পণ্যের বদল গ্রহণ করা জায়েয হবে না ক্রয়ের মাধ্যমে তা হস্তগত করার পূর্বে। যদি তা কোন ব্যবহারকারী ব্যবহার করে ফেলে, তা হলে তার নিকট থেকে তার মূল্য গ্রহণ তার জন্যে জায়েয। কেননা তা তারই স্থানে অবস্থিত। যেন তা ঠিক তার বিনিময়ের অর্থে নয়। মাত্‌'আও তেমনি। তা 'মহরে মিস্‌ল'-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে স্ত্রী-অঙ্গের বদল হবে। যেমন তালাক হলে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক স্ত্রী-অঙ্গের বদল হয়।

যদি বলা হয়, 'মাত্‌'আ যদি মহরে মিস্‌ল'-এর অংশের স্থলাভিষিক্ত হয় স্ত্রী-অঙ্গের বদলস্বরূপ; তাহলে তা স্ত্রীর অবস্থার সাথে মিলিয়ে অবশ্যই ওয়াজিব গণ্য করতে হবে। যেমন 'মহরে মিস্‌ল' নির্ধারিত হয় স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করে, স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করে নয়। আল্লাহ্‌ যখন মাত্‌'আ নির্ধারণ করতে বলেছেন স্বামীর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর এই কথায় ঃ

তাদেরকে মাত্‌'আ দাও সচ্ছল অবস্থার স্বামীর পরিমাণ অনুযায়ী এবং দরিদ্র স্বামীর অবস্থানুপাতে।

বোঝা গেল, মাত'আ স্ত্রী-অঙ্গের বদল নয় আর তা যখন স্ত্রী-অঙ্গের বদল নয়, তখন তা তালাকেও বদল হতে পারে না। কেননা স্ত্রী-অঙ্গ মাত্‌'আ পাওয়ার অধিকারী হয় তালাকের কারণে। অতএব স্ত্রীর যা প্রাপ্য হয়, তা বদল পাওয়ার অধিকারী হবে না। আর তা প্রমাণ করে যে, তা কোন জিনিসেরই বদল নয়। অবস্থা যখন এই তখন আমরা বুঝলাম যে, তা ওয়াজিবই নয়।

এর জবাবে বলা যাবে, স্ত্রী অবস্থা নয়, স্বামীর অবস্থাই বিবেচনা করতে হবে, তোমার এই কথাটি আমাদের মতে ও ভাবে নয়, যেভাবে তুমি বলছ। হানাফী মাযহাবের শেষদিকের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আমাদের শায়খ আবুল হাসান (র) বলেছেন, সে ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থাও অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। একথা কিন্তু আয়াতের পরিপন্থী নয়, কেননা আয়াতের হুকুমটা আমরা স্বামীর অবস্থায় বিবেচনায়ও ব্যবহার করি। কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ কেবল স্বামীর অবস্থা বিবেচনার কথা বলেছেন, স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা না করার কথা বলেছেন। এত মত যাঁরা প্রকাশ করেছেন, এই প্রশ্নকারীর সওয়াল তাদের উপরই আরোপিত হয়। কেননা তারা বলেন, মহরে মিসল নির্ধারণে সেই অবস্থার বিবেচনা করতে হবে, যে অবস্থায় স্ত্রী-অঙ্গ স্বামীর ব্যবহারে আসে হয় সঙ্গমের মাধ্যমে অথবা মৃত্যুর মাধ্যমে, যা পূর্ণ মহরানা পাওয়ার অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে সঙ্গমের স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে তা স্বতঃ বিবেচনায়

ব্যয় হয়ে যাওয়া জিনিসের মতই হয় যায়। তবে 'মাত্'আ আমাদের মতে ওয়াজিব হয় কেবল তখন, যখন স্ত্রী-অঙ্গের উপর স্বামীর হক প্রত্যাহৃত হয়। তার কারণ তার দিক থেকেই হয় সঙ্গমের পূর্বে কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত যা হয় তার পূর্বে। তাহলে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করা ওয়াজিব হয় না। কেননা স্ত্রী-অঙ্গ স্বামী লাভ করতে পারে নি, বরং তা লাভ হয়েছে স্ত্রীর জন্য তার পূর্বের কোন কারণে সঙ্গমের হুকুম প্রমাণিত হয়নি বলে। এই কারণে স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করতে হবে, স্ত্রীর নয়। উপরন্তু আমরা যদি তোমার কথা মেনেও নিই যে, তা কোন জিনিসের বদল নয়, তবুও তার ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ হয় না। কেননা 'নফকা' তো কোন জিনিসের বদল নয়। তার দলীল এই যে, স্ত্রী-অঙ্গের বদল হচ্ছে মহরানা। বিয়ের আক্দ করে স্বামী তার মালিক হয়েছে। আর সঙ্গম ও স্বাদ গ্রহণ হচ্ছে মালিকানায় হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতি। মানুষ তার মালিকানায় হস্তক্ষেপ করলে তাতে কোন বদলের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তা মাত্'আ ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করে না। এই কারণেই তার অল্প বয়সের পুত্র-কন্যার খরচাদি বহন তার কর্তব্য হয়ে পড়ে। তা কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। তার এই ব্যয়টা কোন জিনিসের বদল বা বিনিময় নয়। তা মাত্'আ ওয়াজিব হওয়া নিষেধ করে না। যাকাত, কাফ্ফারাও কোন জিনিসের বিনিময় নয়। এগুলি আল্লাহ্ ঘোষিত ফরয বা ওয়াজিব। কাজেই তা কোন জিনিসের বদল নয় প্রমাণকারী মাতা' ওয়াজিব না হওয়ার কিছুই প্রমাণ করতে পারে না। আর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করা সেই অনুপাতের কথা। আর অনুপাতের কথার সাথে ওয়াজিব হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তা যদি ওয়াজিব না হয়, তাহলে তা স্বামীর অবস্থানুপাতে নির্দিষ্টও হতে পারে না। আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ 'সচ্ছল স্বামীর অবস্থার অনুপাতে মাত্'আ আর দরিদ্র স্বামীর অবস্থানুপাতে মাত্'আ। তখন এতেই মাত্'আ ফরয প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা যা ফরয নয়, তা স্বামীর অবস্থানুপাতে বিবেচিতও হতে পারে না। কেননা সচ্ছল অবস্থায় ও দারিদ্রাবস্থায় যা-ইচ্ছা করার সুযোগ তার আছে। তাই যখন মাত্'আর পরিমাণ নির্ধারিত হবে স্বামীর অবস্থানুপাতে এবং সে স্ত্রীকে তালাকও দেয়নি, তখন স্বামী এ ব্যাপারে ইখতিয়ার পাবে। এতে বোঝা যায় যে, মাত্'আ সচ্ছল স্বামীর অবস্থার অনুপাতে মাত্'আ আর দরিদ্র স্বামীর অবস্থানুপাতে মাত্'আ। এ কথার তাৎপর্য এই যে, যে দরিদ্র, যে কিছুর মালিক নয়, তার মাত্'আ দেয়া কর্তব্য নয়। আর তার জন্যে যখন তা কর্তব্য নয়, তখন সচ্ছল স্বামীর জন্যেও কর্তব্য নয়। দরিদ্রের জন্যেও তা কর্তব্য যে বলতে চায়, সে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সীমা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কেননা যার মাল-সম্পদ নেই, আয়াত তার উপর মাত্'আ ফরয হওয়ার ফায়সালা দেয়নি। তার কারণ, তার মাল-সম্পদ বলতে কিছু নেই। অতএব স্বামীর আর্থিক অবস্থাই বিবেচ্য হবে। আর এই কারণে এটা তার উপর ঋণ হিসেবে চাপবে তা-ও জায়েয হতে পারে না। সে তার জন্যে আদিষ্ট-ও নয়।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যন্ত যার কথাবার্তার উল্লেখ হল, এইসব তার অসতর্কতার প্রমাণ। মনে হয় সে আয়াতের অর্থই বুঝতে পারেনি। কেননা আল্লাহ্ এ কথা বলেন নি যে, সচ্ছল ব্যক্তিকে তার ধন-মালের পরিমাণ অনুযায়ী দিতে হবে এবং দরিদ্র ব্যক্তিকে দিতে হবে তার ধন-মাল অনুযায়ী। তিনি বলেছেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্যে একটা পরিমাণ আছে আর দরিদ্র ব্যক্তির জন্যেও একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে। তা তার দায়িত্বে প্রমাণিত হয়ে থাকবে। যখন সে তা দিতে পারবে, তা দেবে। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

আর যার সন্তান দুধ সেবন করানো স্ত্রীদের খোরপোশ দেয়ার দায়িত্ব তার শুভ প্রচলিত নিয়মে ও মানে।

তার উপর এই খোরপোশ ফরয হয়ে আছে প্রচলিত মান অনুযায়ী। যদি সে দরিদ্র হয় যে, সে কিছুরই মালিক না, সে আয়াতের হুকুমের বাইরে যেতে পারে না। কেননা এটা তার দায়িত্ব। প্রচলিত শুভ নিয়মে তা দেয়া তার প্রতিষ্ঠিত দায়িত্ব। তাই যখন সে তা পাবে, তাকে সে দিয়ে দেবে। দরিদ্র ব্যক্তি সম্পর্কেও সেই কথা মাত্'আর হুকুমে। অন্যান্য সব হক-হুকুকের ক্ষেত্রেও তাই। তা দায়িত্বে চাপে। আর দায়িত্ব মূল জিনিসটির মতই হয়। যেমন দরিদ্র ব্যক্তি মূল্য দেয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে একটা পণ্য (বাকী মূল্যে) ক্রয় করতে পারে। তার এই দায়িত্ব গ্রহণ মূল জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হয় বদল প্রমাণিত হওয়ার দিক দিয়ে। দরিদ্র স্বামীর দায়িত্ব গ্রহণ ও সহীহ্ দায়িত্ব গ্রহণ। তাতেও মাত্'আ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন সে দায়িত্বে 'নফকা' এবং অন্যান্য যাবতীয় ঋণ চাপতে পারে।

আবূ বকর বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে মহরানা নির্দিষ্ট না করলেও বিয়ে জায়েয হওয়ার দলীল রয়েছে, কেননা আল্লাহ মহরানা অনির্দিষ্ট থাকা অবস্থায় তালাক জায়েয করেছেন। আর তালাক তো সহীহ্ বিয়ে ছাড়া হতে পারে না। এটাও প্রমাণিত হয় যে, মহরানা নির্দিষ্ট না হলে বিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে না। যেহেতু মহরানা নির্দিষ্ট করা ও মহরানা না থাকার শর্ত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহরানা তো উভয় অবস্থায়ই ফরয। ইমাম মালিক মনে করেছেন, মহরানা না দেয়ার শর্ত করলে বিয়েই সহীহ্ হবে না। তা সত্ত্বেও তার সাথে সঙ্গম করলে তখন বিয়ে সহীহ্ হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর জন্যে 'মহরে মিস্ল' ফরয হয়ে যাবে। মহরানা না দেয়ার শর্ত করা হলেও বিয়ে সহীহ্ হবে— এ ফায়সালা কুরআনের আয়াতই দিয়েছে। তা মহরানা নির্ধারণ না করার থেকে বেশি কিছু ব্যাপার নয়। মহরানা নির্ধারণ না করা যখন বিয়ে সহীহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়, মহরানা দেয়া হবে না শর্ত করলেও বিয়ে সহীহ্ না হওয়ার কারণ ঘটবে না।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, সঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে তালাক দিলে তার জন্যে মাত্'আ ফরয হবে না। কারণ আমরা আগেই বলেছি যে, 'মাত্'আ হচ্ছে স্ত্রী-অঙ্গের বদল। তাই দুটি বদল পাওয়ার অধিকার তার হতে পারে না। সঙ্গম হওয়ার পর তালাক দিলে নির্দিষ্ট মহরানা বা 'মহরে মিস্ল' পাওয়ার অধিকারী হবে স্ত্রী, তখন সেই সাথে মাত্'আ পাওয়ারও অধিকারী হওয়া জায়েয হবে না। বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, যৌন সঙ্গমের আগেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ওয়াজিব হিসেবে 'মাত্'আ পাওয়ার অধিকারী হয় না। কেননা তখন তো সে অর্ধেক মহরানা পেয়ে যায়। এই কথাটি দুভাবে প্রমাণিত। যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। একটি— মহরানার অংশ ওয়াজিব হওয়ার সাথে এক সাথে মাত্'আ পাওয়ারও অধিকার হয় না। অতএব সমস্ত মহরানা পাওয়ার অধিকারী হলে তখন তো আরও অধিক ভালোভাবে তা পাওয়ার অধিকারী হবে না। আর দ্বিতীয়, তার তাৎপর্য হল, সে মহরানার কিছু অংশ পাওয়ার তো সে অধিকারী হল, তা সঙ্গমকৃতার ক্ষেত্রে বর্তমান।

যদি বলা হয়, মহরানার কিছু পাওয়া যখন ওয়াজিব নয়, তখন তো মাত্'আ পাওয়া তার জন্যে ওয়াজিব হবে— মহরানা পাওয়ার অধিকার হবে আরও উত্তমভাবে। বলা হয়েছে, তাহলে

অর্ধেক মহরানা ওয়াজিব হওয়ার সময় তা পাওয়ার অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা কোন কিছু না পাওয়ার সময় মাত্‌'আ পাওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। তেমনি মহরানার কোন অংশ হারালে তখনও তা পাওয়ার অধিকার অবশ্যই হবে। তার কারণ এই যে, স্ত্রীর অংশ বিনিময় পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। তাই যখন মহরানা ওয়াজিব নয়, তখন 'আত্‌'আ ওয়াজিব হবে।' আর যখন অন্য কোন বদল পাওয়ার অধিকারী হবে, তখন মাত্‌'আ পাওয়ার অধিকারী হওয়া ওয়াজিব নয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ -

তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে প্রচলিত শুভ নিয়মে মাত্‌'আ রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে হক হিসেবে।

এটা সব তালাকপ্রাপ্তার জন্যেই সমান। তবে কোন দলীল যদি কিছু বিশেষীকরণ করে, তাহলে ভিন্ন কথা।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা-ই। তবে 'মাত্‌'আ তো নাম হচ্ছে সেই সব জিনিসের, যা দিয়ে কোন-না-কোন ফায়দা পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَفَاكِهَةً وَّاَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ -

এবং ফল ও ঘাস তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্যে জীবনোপকরণ।

(সূরা আবাসা ঃ ৩১-৩২)

তিনি বলেছেন ঃ

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ -

খুব অল্প মাত্‌'আ— জীবনোপকরণ। পরে তাদের পরিণতি জাহান্নাম।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯৭)

বলেছেন ঃ

اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ -

নিশ্চয়ই এই দুনিয়ার জীবন সামগ্রী মাত্র। (সূরা মুমিন ঃ ৩৯)

অতএব মাত্‌'আ الْمُتْعَةُ ও মাতা'আ مَتَاعٌ নাম, যেসব জিনিস দ্বারা কোন-না-কোন ফায়দা কল্যাণ বা উপকার পাওয়া যায়, তা বোঝাবার জন্যেই এই নাম ব্যবহৃত হয়। আর তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে যখন এমনি উপকারী কল্যাণদায়ক কোন জিনিস হওয়া ওয়াজিব মনে করি— যেমন মহরানা ও নফকা ইত্যাদি— তখন আমরা কুরআনের আয়াতে আরোপিত দায়িত্বের কথাই বলি। তাই যে মাত্‌'আয় নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেকও শামিল নেই এবং যা স্ত্রীর জন্যে স্বামী ও স্ত্রীর অবস্থা অনুপাতে নির্দিষ্ট হয়নি, আর সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর জন্যে কখনও নির্দিষ্ট মহরানা, কখনও 'মহরে মিস্‌ল'— নির্দিষ্ট মহরানা যখন হয় না— এই সবই মাত্‌'আ। যখন আমরা কোন-না-কোন প্রকারের মাত্‌'আ ওয়াজিব বলব, তখন সকল প্রকারের মাত্‌'আ-ই তার জন্যে ওয়াজিব করে দেব, তা জরুরী নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ তালাক প্রাপ্তাদের জন্যে সামগ্রীর দাবি পূরণ হয়ে যায় সে নামের সামান্য কোন জিনিসও পাওয়া গেলে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যে সামগ্রী' তালাক হলেই তা পাওয়ার দাবি করে। কিন্তু পূর্বে যে মহরানা পাওয়ার অধিকারী হয়েছে, তা বোঝায় না।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। কেননা একথা বলা সম্পূর্ণ জায়েয যে, তালাক প্রাপ্তার সেইসব মহরানাও রয়েছে যা পাওয়ার অধিকারী হয়েছে তালাকের আগেই। তাই তালাকের পর তা পাওয়ার উল্লেখ হলে তার পূর্বে তা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী কিছু নয়। কেননা তা যদি হতো, তাহলে তালাকের উল্লেখের সঙ্গম উভয় অবস্থায় তার ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা কখনই জায়েয হতো না। তাই তালাকের পর তার ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা হবে আমাদের কথা জানানো যে, তালাকের সঙ্গেই মাত্'আ ওয়াজিব। কেননা কোন লোক ধারণা করতে পারে যে, যা ওয়াজিব হয়েছে, তাকে তালাক বুঝি প্রত্যাহার করে দিয়েছে। তার তালাকের পর ওয়াজিব হওয়ায় তার পূর্বে ওয়াজিব হওয়ার মতই হয়ে গেল।

যদি লক্ষ্য হয় সেই মাত্'আ যা তালাকের দরুন ওয়াজিব হয়েছে, তাহলে তা তিনটি দিক দিয়ে হতে পারে। হয় তা সঙ্গমকৃতার জন্যে ইদ্দতের 'নফকা' হবে কিংবা হবে মাত্'আ অথবা নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক সঙ্গমকৃতা নয় তার জন্যে। আর তা তালাকের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা 'নফকা' মাত্'আরই নাম। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা মরে ও স্ত্রীদের রেখে যায়, তাদের কর্তব্য স্ত্রীদের জন্যে অসিয়ত করা এক বছরের জীবনোপকরণের জন্যে, তাদেরকে ঘর থেকে বের না করেই।'

আল্লাহ্র এই কথায় স্ত্রীর জন্যে ওয়াজিব নফকা ও বাসস্থানকে 'মাত্'আ বলা হয়েছে। আর মহরানা হলে তার সাথে মাত্'আ ওয়াজিব হয় না— এর প্রমাণ হচ্ছে, সকলেই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, তালাকের পূর্বে মাত্'আ পাওয়ার দাবি করার অধিকার নেই। তালাকের পর মহরানার সাথে সাথে যদি মাত্'আও ওয়াজিব হতো, তাহলে তালাকের পূর্বে ওয়াজিব হতো, কেননা স্ত্রী-অঙ্গের বদল, তালাকের বদল নয়। তখন তা মহরানার মতই হয়ে যেত। এতেই দলীল রয়েছে এই কথার যে, মাত্'আ ও মহরানা— এ দুটিই ওয়াজিব হওয়া নিষিদ্ধ।

জবাবে বলা যাবে, 'মাত্'আ মহরে মিস্‌ল-এর অংশ। কেননা তা সেই অংশেরই স্থলাভিষিক্ত। অথচ তালাকের পূর্বে মহরানার দাবি করা স্ত্রীর জন্যে কর্তব্য ছিল। এই কারণে তালাকের পর তার কিছু অংশ সহীহ্ হয়েছে। কিন্তু তুমি তো মহরানার অংশকে মাত্'আ মনে কর না ? এখন মাত্'আ ওয়াজিব হওয়াটা হয় স্ত্রী-অঙ্গের বদল হবে অথবা তালাকের বদল হবে। যদি মহরে মিস্‌লসহ তা স্ত্রী-অঙ্গের বদল হয়, তাহলে তালাকের পূর্বেই তার হকদার হওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি তা স্ত্রী-অঙ্গের বদল না হয়, তাহলে স্ত্রী-অঙ্গ অর্জিত হওয়া অবস্থায় তালাকের কারণে মাত্'আর ওয়াজিব কঠিন।

ওয়াজিব মাত্'আর পরিমাণ নির্ধারণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ –

এবং সস্ত্রীদের মাত্'আ দাও। সচ্ছল ব্যক্তির জন্যে কর্তব্য তার পরিমাণ এবং দরিদ্র ব্যক্তির উপর কর্তব্য তার পরিমাণ। মাত্'আ— জীবনোপকরণ— প্রচলিত শুভ নিয়মে ও মানে।

সচ্ছল অবস্থা ও দরিদ্রাবস্থা বিবেচনায় মাত্‌'আর পরিমাণ নির্ধারণ ইজতিহাদের পন্থায়ই সম্ভব। তাতে বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। কাল ও সময়ের পার্থক্যে তাতে পার্থক্য ঘটে। কেননা আল্লাহ্ তার পরিমাণ নির্ধারণে দুটি জিনিসের শর্ত করেছেন। একটি, তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে স্বামীর সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের অবস্থার প্রেক্ষিতে। আর দ্বিতীয়, তা হতে হবে মারুফ— প্রচলিত ও সুষ্ঠু মানে। ফলে এতে দুটি তাৎপর্য বিবেচনা করা আবশ্যক। অবস্থা যখন এবং উভয় অবস্থায় 'মা'রুফ'-এর বিবেচনা লোকদের অভ্যাসের ভিত্তিতে করতে হবে, আর সেই অভ্যাস বিভিন্ন হয়ে থাকে, পরিবর্তিত-ও হতে থাকে। কাজেই সময়, কাল ও যুগের অবস্থার যাঁচাই ও বিবেচনার ভিত্তিতে তার নির্ধারণ একান্তই আবশ্যক। নিত্যকার ঘটনাবলীতে শরীয়াতের হুকুম জানার জন্যে ইজতিহাদ জায়েয হওয়ার এটা একটা ভিত্তি। ইজতিহাদই শরীয়াতসম্মত হুকুম পাওয়ার একমাত্র উপায় হতে পারে, ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, আমাদের শায়খ আবুল হাসান বলতেন, সেই সাথে মেয়েলোকটির অবস্থা বিবেচনা করাও কর্তব্য। আলী ইবনে মূসা আল-কুমীও তাঁর গ্রন্থে এই কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি দলীল দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মাত্‌'আর পরিমাণ নির্ধারণ দুটি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তাহল, স্বামীর সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যাবস্থার বিবেচনা 'মারুফ' অনুযায়ী নির্ধারণ করা। তিনি বলেছেন, আমরা যদি শুধু স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করি, সেই সাথে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা না করি, তা হলে একটা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। যেমন কেউ যদি দুইজন মেয়েলোক বিয়ে করে তবে একজন শরীফ ভদ্র, শালীন আর অপর জন হয় হীন নীচ ক্রীতদাসী বা মুক্তিপ্রাপ্তা। পরে এ দুজনকে এক সঙ্গে তালাক দিয়ে দিল তাদের সাথে সঙ্গম করার পূর্বেই, তাদের মহরানাও নির্দিষ্ট করা হয়নি— এরূপ অবস্থায় উভয়ের জন্যে কি একই মানের ও মূল্যের মাত্‌'আ দেয়া হবে? হীন নীচ স্ত্রীকে যা দেয়া হবে, তা-ই দেয়া হবে শরীফ ভদ্রকে? কিন্তু এটা তো সামাজিক ব্যবস্থা, অভ্যাস ও নৈতিকতার দিক দিয়ে গ্রহণ অযোগ্য ও অচল। তিনি বলেছেন, উক্ত কথা— যারা বলে যে, কেবলমাত্র স্বামীর অবস্থার বিবেচনা হবে, স্ত্রীর নয়, এই কথা আরও একটি কারণে গ্রহণ-অযোগ্য। তা হল কোন ব্যক্তি যদি ধন-ঐশ্বর্যশালী হয়, হয় বিরাট মর্যাদার, আর সে বিয়ে করে কোন হীন নীচ মর্যাদার মেয়েকে যার মহরে মিস্‌ল হল এক টাকা, সে যদি তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে 'মহরে মিস্‌ল তার প্রাপ্য হবে। কেননা তার মহরানা নির্ধারিত হয়নি এক টাকাও। আর তাকে যদি সে সঙ্গমের আগেই তালাক দেয়, তাহলে তাকে মাত্‌'আ দেয়া কর্তব্য হবে স্বামীর সামার্থানুযায়ী। তা কখনও মহলে মিস্‌ল-এরও দ্বিগুণ তিন গুণ হতে পারে। তাহলে সঙ্গমের পূর্বে দেয়া তালাকের দরুন সে অনেক বেশি পাওয়ার অধিকারী হবে সঙ্গমের পরে তালাক দিলে যা পাওয়ার অধিকারী হবে তার তুলনায়। আর এটা মূল কথার পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ্ তো সঙ্গমের পূর্বে দেয়া তালাকের দরুন স্ত্রীর সঙ্গমের পরে দেয়া তালাকের দরুন প্রাপ্যের অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী বানিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর নয়— কেবল স্বামীর অবস্থার বিবেচনা করেই মাত্‌'আর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে কুরআনের বিরোধিতা করার মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রচলিত ও পরিচিত নিয়ম ও মানেরও বিপরীত হয়ে যাবে। এই কারণে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর অবস্থাটার বিবেচনা হওয়াও একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত মত আরও একটি কারণে বিপর্যয়কর। তা হল, দুজন সচ্ছল অবস্থার লোক যদি

দুই বোনকে বিয়ে করে, তাদের একজন তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল, তাহলে তার মহরানার নির্দিষ্ট ছিল না বলে 'মহরে মিস্ল' হিসেবে তার প্রাপ্য হবে হাজার টাকা। আর অপর জন তার স্ত্রীকে সঙ্গমের আগেই তালাক দিল, মহরানা নির্দিষ্ট করা হয়নি বলে সে স্বামীর অবস্থানুপাতে মাত্'আ পাওয়ার অধিকারী হল। আর তার নিজের বোনের প্রাপ্য 'মহরে মিস্ল'-এর কয়েক গুণ বেশি পেয়ে যাওয়া তার পক্ষে খুবই সম্ভব হতে পারে। পরিণামে দেখা গেল, সঙ্গমকৃতা বোন কম পেল তালাকপ্রাপ্তা বোনের প্রাপ্তির তুলনায়। অথচ উভয় স্ত্রীর অঙ্গ অভিন্ন। আর তারা দুই বোন মহরানার ক্ষেত্রেও সমান মর্যাদার। তাহলে সঙ্গমই তো ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিল সঙ্গমকৃতা বোনের জন্যে। কিন্তু এই অবস্থা অপরিচিত, অপ্রচলিত ও অগ্রহণযোগ্য। এই সব কারণই প্রমাণ করে যে, স্বামীর সাথে সাথে স্ত্রীর অবস্থাও বিবেচনা করতে হবে।

আমাদের হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, স্বামী যদি সঙ্গমের আগেই স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর তার মহরানা নির্দিষ্টও না হয়ে থাকে, তাহলে তার মাত্'আ অর্ধেক, মহরে মিস্ল-এর তুলনায়ও অনেক বেশি হয়ে যাবে। যদিও তার অর্ধেক 'মহরে মিস্ল'-এর এবং মাত্'আর অপেক্ষা কম প্রাপ্য হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সঙ্গমের পূর্বে দেয়া তালাকে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেকের বেশি দেয়ার ব্যবস্থা করেন নি। অতএব মহরানা নির্দিষ্ট না হওয়া অবস্থায় স্ত্রীকে মহরে মিস্লের অর্ধেকের বেশি দেয়া জায়েয হবে না। আর নির্দিষ্ট মহরানা যদি মহরে মিস্ল-এর অধিক হয়, তাহলে তালাকের পর অর্ধেকের বেশি পাওয়ার অধিকারী হবে না। তাহলে 'মহরে মিস্ল'ই উত্তম। আমাদের ফিকাহবিদগণ তার জন্যে কোন জ্ঞাত পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন নি, যা অতিক্রম করা যাবে না বা যার কমও করা যাবে না। তাঁরা বলেছেন, তা প্রত্যেক সময়ের প্রচলিত পরিচিতি অভ্যস্ত পরিমাণ অনুযায়ী হতে হবে। তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, মাত্'আ হবে তিন প্রস্থ কাপড়— বক্ষ-পৃষ্ঠত্রাণ, মুখাবরণ, ইজার। এই ইজারই হচ্ছে বাইরে বের হওয়াকালীন লোকদের দৃষ্টি থেকে দেহ আবৃত রাখার বস্ত্র— আজকের 'বোরকা'! আগের কালের ফিকাহবিদদের থেকে মাত্'আর পরিমাণ হিসেবে জানা গেছে বিভিন্ন বর্ণনা, তাতে এক-একজন নিজ নিজ চিন্তা-বিবেচনায় যা অগ্রসর পেয়েছেন, তাই বলেছেন। ইসমাঈল ইবনে উমায়্যাতা ইকরামা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মাত্'আর উচ্চতর মান হচ্ছে একজন খাদিম দেয়া, তারপরে কম মাত্'আ হচ্ছে 'নফকা'— প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ বহন। তার চাইতে কম হল পোশাক-পরিচ্ছদ। ইয়াস ইবনে মুআবিয়া আবূ মজলষ থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে বললাম, মাত্''আ সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার সামর্থ্যানুযায়ী যা করা সম্ভব তাই। আমি যদি সচ্ছল অবস্থার হই, তাহলে আমি এই এই পোশাক পরিয়ে দেব। আমি তা হিসেব করে দেখলাম, তার মূল্য ত্রিশ দিরহাম। আর আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'মাত্'আয় এমন কোন জিনিস নেই যা খুব সহজেই পাওয়া যায়।' হাম্মাদ বলতেন, মাত্'আ দিতে হবে 'মহরে মিস্ল'-এর অর্ধেক। আতা বলেছেন, প্রশস্ততর মাত্'আ হচ্ছে একটি বক্ষ পৃষ্ঠত্রাণ, মুখাবরণ ও একটি লেপ। শবী বলেছেন, তার বাড়ির পোশক, বক্ষ, পৃষ্ঠত্রাণ, মুখাবরণ, লেপ, বড় চাদর। ইউনুস আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, অনেকে 'মাত্'আ স্বরূপ খাদেম ও যাবতীয় খরচ দিত। অনেকে পোশাক ও খরচাদি দিত। আর তার কম যারা দিত, তারা দিত তিন প্রস্থ কাপড়— বক্ষ-পৃষ্ঠত্রাণ, মুখাবরণ ও লেপ। এর চাইতেও কম মাত্'আ হচ্ছে একখানি

কাপড়। আমর ইবনে শুয়াইব সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উত্তম মানের মাত'আ হচ্ছে মুখাবরণ বা সেই ধরনের কোন কাপড়। হাজ্জাজ আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফলকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, স্বামীর সম্পদ পরিমাণ অনুযায়ী স্ত্রীকে মাত্'আ দিতে হবে। এইসব পরিমাণই মনীষীদের ইজতিহাদ থেকে জানা গেছে। এতে পারস্পরিক যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও কোন বিরুদ্ধতা ছিল না। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, তাঁদের মতে এটা এমন বিষয়, যে সম্পর্কে ইজতিহাদের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণের পর্যায়ের কাজ। শরীয়াতের দলীলে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ -

যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই তাদের তালাক দাও এ অবস্থায় যে, তোমরা তাদের জন্যে মহরানা নির্দিষ্ট করেছ, তাহলে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক তারা পাবে।

বলা হয়েছে, فرض শব্দের আসল অর্থ, পাত্রে খাঁজ কাটা, তার আলামত যদ্দারা তা পার্থক্যপূর্ণ হয়। আর الفرضة অর্থ, কাষ্ঠের উপর বা জিপসাম কিংবা পাথরের উপর পানি ভাগ করার নিদর্শন, যদ্দারা প্রত্যেকের পানির ভাগ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হতে পারে। কিনারাকেও الفرضة বলা হয়, যেখানে নৌকা জাহাজ ভিড়ে। কেননা সেখানে নৌকা জাহাজ উঠানামার চিহ্ন পড়ে যায়। শরীয়াতে فرض নাম হচ্ছে একটা পরিমাণের। বিন্যাসে তা কর্তব্যের উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত। আল্লাহ্র কথা ঃ اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ —নিশ্চয়ই তা, যা কুরআন তোমার প্রতি নির্দিষ্ট করে ধার্য করেছে।

এ আয়াতে فَرَضَ অর্থ নাযিল করেছে এবং তোমার প্রতি তার হুকুম-আহ্কাম বাধ্যতামূলক করেছে। তার তাবলীগ করারও দায়িত্ব দিয়েছে। মীরাসী আইন প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহ্র দিক থেকে কর্তব্যরূপে ঘোষিত। এই আয়াতটির দুটি অর্থ। তার একটি, মীরাস প্রাপকদের জন্যে অংশ নির্ধারণ । আল্লাহ্র কথা ঃ তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই, অথচ তাদের জন্যে তোমরা মহরানা নির্দিষ্ট করেছ .... এ আয়াতে فرض অর্থ মহরানা নির্ধারণ এবং বিয়ের আক্দে তার উল্লেখ ও ঘোষণা করা। উটের অংশগুলোও তাই। তার প্রস্তুতির দিক দিয়ে ও তার চুটের দিক দিয়ে তাতে যে অংশ ধার্য হয় তা। এভাবে পরিমাণ নির্ধারণকে ফরয বলা হয়েছে। পাত্রে যে খণ্ড থাকে পরস্পর থেকে পার্থক্যপূর্ণ হয়ে তার সাথে সাদৃশ্যের কারণে এই নামকরণ হয়েছে। একটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণের এটাই উপায়। এর দ্বারা একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً অথচ তোমরা তাদের জন্যে অংশ নির্ধারিত করেছ-এর অর্থ বিয়ের আকদে মহরানার পরিমাণ নির্ধারণ করা। তার প্রমাণ এর পূর্বে মহরানার নির্ধারণ করা হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তোমরা যদি স্পর্শ

করনি ও মহরানা নির্ধারণ করনি-এমন স্ত্রীকে তালাক দাও, তাহলে তোমাদের কোন গুনাহ্‌ হবে না। এর পরই তাদের জন্যে মহরানা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে এবং সঙ্গম করার পর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত আয়াতে পরিমাণ নির্ধারণ না করার কথা বলা হয়ে থাকলে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে মহরানার পরিমাণ নির্ধারণের কথা হবে— এটাই স্বাভাবিক। এ তালাকের পর স্ত্রী নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক পাবে বলে আল্লাহ্‌ই বলে দিয়েছেন।

বিয়ের আকদ হয়ে যাওয়ার পর যে স্ত্রীর মহরানা নির্দিষ্ট হয়েছে এবং সঙ্গমের আগেই তাকে তালাক দেয়া হয়েছে, তার প্রাপ্য মহরানা কত— এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, সে মহরে মিস্‌ল পাবে। ইমাম মুহাম্মাদেরও এই মত। ইমাম আবূ ইউসূফ বলতেন, সে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক পাবে। পরে তিনি নিজের কথা বাদ দিয়ে প্রথমোক্ত দুজনের মতকেই গ্রহণ করেছেন। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, সে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক পাবে।

সে মহরে মিস্‌ল পাবে— এ কথার দলীল হচ্ছে, এই আক্‌দ মহরে মিস্‌লই ওয়াজিব করেছে। আর আক্‌দই যেহেতু মহরে মিস্‌ল ওয়াজিব করেছে, এই কারণে সঙ্গমের পূর্বে তালাক হলে মাত্‌'আ দেয়াও ওয়াজিব হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি মহরানা নির্দিষ্ট করতে রাজী হয়, তাহলে তা আক্‌দের কারণে মাত্‌'আ ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। তার প্রমাণ হল, এই মহরানা আক্‌দের সময়ই নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব ছিল। পরে সঙ্গমের আগেই তালাক ঘটেছে। এই কারণে মহরে মিসল প্রত্যাহৃত হয়েছে তা ওয়াজিব হওয়ার পর। কেননা আক্‌দে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। আক্‌দের পরেও তাই নির্দিষ্ট পরিমাণের সেই হুকুমই হবে।

যদি বলা হয়, আক্‌দ মহরে মিস্‌ল ওয়াজিব করে নি, তা ওয়াজিব হয়েছে সঙ্গম করার কারণে।

জবাবে বলা যাবে, একথা ভুল। কেননা বিনিময় ছাড়া স্ত্রী-অঙ্গ মুবাহ হওয়াই জায়েয নয়। তার প্রমাণ এই যে, আক্‌দকালে যদি শর্ত করা হতো যে, তাকে মহরানা দেয়া হবে না, তবুও তার জন্যে মহরানা ওয়াজিব হতো। মহরানার যখন স্ত্রী-অঙ্গ মুবাহ্‌ হওয়ার বদল, শর্ত করে তা না করার উপায় নেই, তখন স্ত্রী-অঙ্গ মুবাহ্‌ মনে করে নেওয়ার দারুন মহরানা বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। এর আর একটা প্রমাণ হল, বিয়ের আক্‌দ সহীহ্‌ হওয়ার পর সঙ্গম নিজ মালিকানাধীন জিনিসে হস্তক্ষেপ ও তা ব্যবহার করা মাত্র। আর কারোর নিজ মালিকানায় হস্তক্ষেপ ও তার জন্যে তা ব্যবহার কোন বদল দিতে বাধ্য করে না। যেমন ক্রেতার পণ্যে হস্তক্ষেপ, এই হস্তক্ষেপই মূল্য দিতে তাকে বাধ্য করে না। বোঝা গেল স্ত্রীর মহরে মিসল পাওয়ার অধিকার হওয়া সম্ভব হয়েছে বিয়ের আক্‌দের বলে। আর এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, স্ত্রী মহরে মিসল নিয়ে নিজেকে বিরত রাখবে, এই অধিকার তার আছে। সে যদি আক্‌দের কারণে তা পাওয়ার অধিকারী না হতো, তাহলে তার পক্ষে নিজেকে বিরত রাখা কি করে জায়েয হতে পারে, যা এখনও ওয়াজিব হয়নি তার বলে? তাছাড়া তার দাবি করার-ও তার অধিকার আছে। সে যদি মামলা দায়ের করে, তাহলে তার পক্ষে রায় হয়ে যাবে অনিবার্যভাবে। বিচারক নতুন করে মহরানা ওয়াজিব করবে না, যা পাওয়ার অধিকারী বানিয়ে দেবে না। এই সবই দলীল। তা প্রমাণ করে যে, যার মহরানা আক্‌দকালে নির্ধারিত হয়নি, সে আক্‌দের

কারণেই মহরে মিস্‌ল পাওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। স্বামীর উপর তার তা প্রাপ্য হবে, যেমন প্রাপ্য হয় নির্দিষ্ট মহরানা, বিয়ের আক্‌দে তা নির্দিষ্ট না হলেও।

যদি বলা হয়, মহরে মিসল যদি বিয়ের আকদের কারণেই ওয়াজিব হতো তাহলে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিলে তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়ে যেত না, যেমন নির্দিষ্ট করা মহরানা সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়ে যায় না।

জবাবে বলা যাবে, না, সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হবে না। কেননা যে মাত্‌'আ দেয়া ওয়াজিব, তা তো সেই মহরানার-ই অংশ যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। এই মাত্‌'আ তো নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক, তার জন্যে যাকে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে।

ইসমাঈল ইবনে ইস্‌হাক মনে করেছেন, আক্‌দ হলেই 'মহরে মিস্‌ল' ওয়াজিব হয় না, যদিও আক্‌দ হলেই স্বামী-স্ত্রী সঙ্গমকে মুবাহ্ বানিয়ে নেয়। তিনি বলেছেন, স্বামী স্ত্রীর মুকাবিলা পণ্যের মুকাবিলা মূল্য সমতুল্য। তাই যেমন বলা হয়েছে, তেমন যদি হয়, তাহলে তো সঙ্গমের কারণে মহরানা দেয়া স্বামীর জন্যে বাধ্যতামূলক না হওয়াই কর্তব্য হয়ে পড়ে। কেননা সঙ্গম তো স্ত্রীর একটা হক্ স্বামীর উপর। যেমন স্বামীর হক স্ত্রীর উপর এই যে, সে স্বামীর নিকট নিজেকে সোপর্দ করে দেবে। কেননা একজন অপর জনের যা মুবাহ্ করে নিয়েছে, সেজন্যে তার সেই জিনিসকেই মুবাহ্ করে নিয়েছে। তা হলে স্বামী মহরানা ওয়াজিবকরণে কোত্থেকে বিশেষীকৃত হয়ে পড়ল, যখন সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল? স্ত্রী নিজেকে মহরানার শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখবে না, তা রাখা তার জন্যে বাঞ্ছনীয় নয়, যখন সে বিয়ের আক্‌দের দরুন তা পাওয়ার অধিকারী হল না। মহরানা নির্ধারণও সহীহ্ হবে না। কেননা স্বামীর দিক থেকে তার আকদ তো সহীহ হয়েছে, যেমন স্ত্রীর দিক থেকেও সহীহ হয়েছে। তাই স্বামীর উপর মহরানা বাধ্যতামূলক হবে না, যেমন স্ত্রীর উপরও স্বামীর জন্যে কিছুই বাধ্যতামূলক হবে না। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী-অঙ্গ সঙ্গম ও সন্দেহের সঙ্গম দ্বারা তার উপর দাঁড়াবে না এবং তার কোন বদল গ্রহণ করাও সহীহ্ হবে না। কেননা তার অংশ থেকে তার হক প্রত্যাহৃত হয়েছে। এই সবই মুসলিম উম্মাহর বিবেকসম্মত। তা এই যে, স্বামীর উপর মহরানা ওয়াজিব হবে স্ত্রী-অঙ্গকে মুবাহ বানিয়ে নেয়ার কারণে। আর তা-ই প্রমাণ করে যে, উপরে যার কথা উদ্ধৃত হয়েছে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

সহল ইবনে সায়েদী বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর কথা এসেছে ঃ যে মহিলা নিজেকে রাসূলের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, সেই মহিলাকে অপর এক পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়ার পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন ঃ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ 'তোমার যতটুকু কুরআনী ইলম আছে, তার বিনিময়ে আমি এই মহিলাকে তোমার মালিকানায় দিয়ে দিলাম।' এই কথা প্রমাণ করে যে, স্বামী স্ত্রীর যৌন অঙ্গের মালিক পর্যায়ের। আক্‌দের পর যে মহরানার নির্দিষ্ট করা হয় তা সঙ্গমের আগে তালাক দিলে সে মহরানা প্রত্যাহৃত হয়ে যায়, তার দলীল হচ্ছে, ফরয— মহরানা ধার্যকরণ মহলে মিস্‌ল-এর স্থলাভিষিক্ত কেননা মহরে মিস্‌ল থাকলে ভিন্নভাবে মহরানা ধার্য করা জায়েয নয়। আর এ-ই যখন ব্যাপার, তখন সঙ্গমের পূর্বে তা প্রত্যাহৃত হওয়া অনিবার্য। যেমন মহরে মিস্‌ল প্রত্যাহৃত হয়।

অপর দিক দিয়েও বিবেচ্য এই যে, মহরানা হক হয়ে দাঁড়ায় বিয়ের আক্দ হলেই। কিন্তু তা তার মধ্যে নেই। তাই যে দিক দিয়ে বিয়ের আক্দ বাতিল হয়ে যাবে, সেই দিক থেকে হক-ও বাতিল হয়ে যাবে।

যদি বলা হয়, আক্দে নির্দিষ্ট মহরানা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় আক্দের দ্বারা। কাজেই আকদ বাতিল হলে তা বাতিল হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, আবুল হাসান (র) বলতেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরানা বাতিল হয়ে যাবে। ওয়াজিব হবে অর্ধেক মহরানা। মাত্'আ ওয়াজিব হওয়ার মতই। ইবরাহীম নখয়ীও তাই বলেছেন, এটাই তার মাত্'আ।

কোন কোন লোক এই আয়াতটিকে দলীল বানিয়ে বলেছেন, মহরানা দশ দিরহামের কম-ও হতে পারে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "তোমরা যদি স্ত্রীদের জন্যে মহরানা নির্ধারণ করার পর ও স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দাও, তাহলে নির্দিষ্ট করা মহরানার অর্ধেক মহরানা সে পাবে।"

এখন যদি দুই টাকা মহরানা ধার্য হয় বিয়ের আক্দে, তাহলে আয়াতের ফয়সালা অনুযায়ী তালাকের পর দুই টাকার বেশী পাওয়ার অধিকারী হবে না। কিন্তু এই কথা আমাদের মতে তাদের মতকে প্রমাণ করে না। তা এ জন্যে যে, আমাদের মতে দুই টাকা মহরানা ধার্য করা দশ টাকা নির্ধারণ সমতুল্য। কেননা দশ আক্দে অংশ বিভক্ত হয় না। আর কোন জিনিসের অংশ নির্ধারণ সম্পূর্ণটা নির্ধারণের শামিল। যেমন তালাক অংশে বিভক্ত হয় না। যদি অর্ধেক তালাক দেয়া হয়, তা সম্পূর্ণ তালাক দেয়া হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। আর দশের কম মহরানা ধার্য করা হলে আমাদের মতে দশ ধার্য করা হয়েছে বলে মনে করতে হবে। অতএব তালাকের পর তার অর্ধেক ওয়াজিব হবে। পরন্তু আয়াত মূলত নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক ওয়াজিব হওয়ার দাবিদার। আমরাও সেই অর্ধেকই ওয়াজিব মনে করি মোট পরিমাণের। পরে তার বাড়তি ওয়াজিব মনে করি পাঁচ টাকা পর্যন্ত ভিন্নতর এক দলীলের ভিত্তিতে।

একান্তে মিলিত হওয়ার পর দেয়া তালাক

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে, অথচ তাদের জন্যে মহরানা তোমরা নির্দিষ্ট করেছ, তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক....।

মনীষিগণ এ কথার তাৎপর্য নির্ধারণে মতদ্বৈততায় লিপ্ত হয়েছেন। প্রথমে স্পর্শ করা— المسيس। আয়াতের এ শব্দটির তাৎপর্য কি ? হযরত আলী, উমর, ইবনে উমর ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, যখন দরজা বন্ধ করে দেবে ও পর্দা ঝুলিয়ে দেবে ..... তারপর তালাক দিলে স্ত্রী পূর্ণ মহরানা পাবে। সুফিয়ান সওরী, লায়স, তায়ূস, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তার প্রাপ্য পূর্ণ মহরানা। আলী ইবনুল হুসায়ন ও অন্যান্য তাবেয়ীদের মধ্য থেকে ইবরাহীম নখয়ীর-ও এই কথা। ফরাশ শবী, ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তার প্রাপ্য অর্ধেক মহরানা, যদি স্বামী স্ত্রীর দুই পা'র মাঝখানেও বসে। শ'বী ইবনে মাসউদ (রা) থেকে 'মুরসাল' বর্ণনা করেছেন। শুরাইহ থেকে ইবনে মাসউদের মতো কথাই বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ান সওরী, উমর, আতা, ইবনে আব্বাস (রা)

সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে মহ্রানা ধার্য করলে স্ত্রী মাত্'আ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কেউ কেউ ধারণা করেছেন, এই পর্যায়ে তাঁর কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের কথার মতই; উভয় কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। কেননা তাঁর কথার অর্থ হচ্ছে, সে স্ত্রীর মহ্রানা ধার্য করেনি। আল্লাহ্র কথা ঃ 'স্পর্শ করার আগে'-এর দ্বারা 'একান্তে মিলিত হওয়ার আগে' বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর থেকে তায়ূস বর্ণিত হাদীসে 'স্পর্শ করার আগে' এর অর্থ করা হয়েছে 'একান্তে নিরিবিলিতে মিলিত হওয়ার আগে।' এই একান্তে মিলিত হওয়ার আগে তালাক দিলে স্ত্রী শুধু মাত্'আ পাবে।

বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এই বিষয়েও বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবূ হানীফা (র) আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন ঃ

الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق وطيء ولم يطأ -

সহীহ ও নিবিঘ্ন একান্ত নিরিবিলিতে স্বামী-স্ত্রীর একত্রিত হওয়ার পর তালাক দিলে মহ্রানার কোন অংশ প্রত্যাহৃত হওয়াকে নিষেধ করে, তারা সঙ্গম করুক আর না-ই করুক। আর দুজনের একজনও ইহ্রামকারী কিংবা রোগী, হায়যধারী, রমযানের রোযাদার অথবা রোগমুক্তি মুখী অবস্থায় হবে না। যদি এই সব ঠিক থাকে, তারপরে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তার অর্ধেক মহ্রানা প্রাপ্য হবে। এই সব অবস্থার পরও সঙ্গম না করলেও তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, এই স্ত্রী পূর্ণ মহ্রানা পাবে। কেননা স্বামী তার সাথে একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হয়েছে। যৌন সঙ্গম করা না হলেও ক্ষতি নেই। উক্ত সব অবস্থা যদি স্বামীর দিকে থাকে, আর স্ত্রী হয় রোগমুক্তি মুখী, তাহলে সে অর্ধেক মহ্রানা পাবে। ইমাম মালিক বলেছেন, স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হলে, তাকে চুম্বন করলে ও তাকে ন্যাংটা করলে এবং তা যদি যৌন সঙ্গমের কাছাকাছি পৌছে গিয়ে থাকে, তাহলেও আমি তার জন্যে অর্ধেক মহ্রানাই হতে পারে বলে মনে করি। আর যদি একান্তে মিলিত হওয়ার সময় দীর্ঘ হয়, তাহলে সে নির্দিষ্ট পরিমাণের মহ্রানা পাবে। তবে সে নিজেই যদি কিছু কম করে তাহলে ভিন্ন কথা।

আওজায়ী বলেছেন, কেউ একটি মেয়েলোক বিয়ে করল, পরে স্ত্রীর পরিবারবর্গের নিকট থাকা অবস্থায়ই তার সাথে একান্তে মিলিত হল, চুম্বন দিল, তাকে ধরল, তার পরে তাকে তালাক দিল এ অবস্থায় যে, তার সাথে সঙ্গম করেনি অথবা পর্দা ঝুলিয়ে দিল বা দরজা বন্ধ করল, তার পূর্ণ মহ্রানা প্রাপ্য হল। হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হলেই অর্ধ মহ্রানা তার প্রাপ্য হবে, স্বামী যদি তার সাথে সঙ্গম নাও করে অথবা একান্তে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রী যদি সঙ্গম হয়েছে বলে দাবিও করে, তবু। তখন স্ত্রীর কথাই গ্রহণীয়। কেননা একান্তে মিলিত হওয়ার কাজ হয়েছে।

লায়স বলেছেন, তাকে নিয়ে যদি আলাদা হয় ও পর্দা টানিয়ে দেয়, তাহলে মহ্রানা প্রাপ্য হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একান্তে মিলিত হওয়ার পরও যদি সঙ্গম না করে, পরে তাকে তালাক দেয়, তাহলে অর্ধেক মহ্রানা পাবে। ইদ্দত পালন করতে হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াতই হচ্ছে বড় প্রমাণ। আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং তোমরা স্ত্রীদের মহ্‌রানা একনিষ্ঠভাবে দিয়ে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

সম্পূর্ণ মহ্‌রানা দিয়ে দেয়ারই স্পষ্ট আদেশ। অতএব মহ্‌রানা থেকে কোন অংশের বাদ পড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবশ্য কোন দলীলের ভিত্তিতে হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্‌র এই কথাও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا - وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থানে অপর এক স্ত্রীকে নিয়ে আসতে চাও এবং তাদের একজনকে বিপুল পরিমাণ মহ্‌রানা দিয়ে দিয়েছ, তাহলেও তা থেকে একবিন্দু জিনিস ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি তা নেবে দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট গুনাহ্ হিসেবে। আর তা কেমন করেই বা তোমরা ফিরিয়ে নিতে পার। তোমরা তো পরস্পর মিলিত হয়েছ।

(সূরা আন-নিসা ঃ ২০)

এ আয়াতের দুটি দিক লক্ষণীয়। দলীল হিসেবে তার একটি দিকের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। তা হল, 'তোমরা তা থেকে কিছুই নিয়ে নেবে না।' আর দ্বিতীয় দিক হল, তোমরা তা থেকে কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পার, যখন তোমরা পরস্পরে মিলিত হয়েছ ?

ফরা বলেছেন ঃ আয়াতের افضى অর্থ একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া কোনরূপ বিঘ্নতা ছাড়াই— الخلوة الصحيحة —তাতে সঙ্গম করুক আর না-ই করুক। অভিধানের দিক দিয়ে এটা স্পষ্ট অকাট্য দলীল। এ-ও জানানো হয়েছে যে, الافضاء বলা হয় الخلوة —একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হওয়াকে। তা হওয়ার পর মহ্‌রানা থেকে কিছু কমাতে বা ফিরিয়ে নিতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। এ-ও বোঝা গেল যে, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে الخلوة الصحيحة। 'একান্ত নিরিবিলিতে ও নির্বিঘ্নে মিলত হওয়া' বোঝানো, যাতে স্বাদ আস্বাদনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কেননা الافضاء। শব্দটি فضاء থেকে গৃহীত, যা জমিনে হয়। তা এমন উন্মুক্ত পরিবেশ, যেখানে কোন ঘর-বাড়ি নেই, কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, যা পরস্পরকে পূর্ণ রূপে পেতে বাধা হতে পারে। এতেই প্রমাণিত হল যে, দুজনের মিলিনের পথে কোনরূপ বাধা না থাকা অবস্থায় একত্রিত হওয়ার পর মহ্‌রানার প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। কেননা সেখানে স্ত্রীর স্বামীর নিকট নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় সঁপে দিতে ও স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ করতে কোন অসুবিধাই ছিল না। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ افضى থেকে তা স্পষ্ট হয়।

আল্লাহ্‌র এই কথাও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

অতএব তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর তাদের পরিবারবর্গের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মহ্‌রানা যথাযথভাবে দিয়ে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৫)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً -

পরে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করেছ, অতএব তোমরা ফরয হিসেবেই তাদের মহরানা দিয়ে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৪)

এ আয়াত স্পষ্ট দাবি করছে সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীর সমস্ত মহরানা আদায় করে দেয়ার। কোন দলীল পাওয়া গেলে অন্যথা হতে পারে বটে।

আবূ বকর বলেছেন, হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। আবদুল বাকী ইবনে কানে, মুহাম্মাদ ইবনে শাযাল, মুয়াল্লা ইবনে মনসূর, ইবনে লাহইয়া, আবুল আসওয়াদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সওবান সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ اِلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا اَوْلَمْ يَدْخُلْ -

যে লোক স্ত্রীর মুখাবরণ উত্তোলন করবে ও তার দিকে তাকাবে, তার মহরানা তার প্রাপ্য হয়ে যাবে। তার সাথে সঙ্গম করা হোক, আর না-ই হোক।

আমাদের মতে প্রাথমিক দিকের সমস্ত ফিকাহবিদই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। কেননা ফরাস-এর শ'বী— আবদুল্লাহ ইবনে মাসূউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অনেকের নিকট সপ্রমাণিত নয়। আবদুল বাকী ইবনে কানে বশর ইবনে মূসা— হাওযাতা ইবনে খলীফা, আউফ, জরারাতা ইবনে আওফা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ الْمَهْدِيُوْنَ اَنَّهُ مَنْ اَغْلَقَ بَابًا وَاَرْخى سَتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ واوَجَبَت الْعِدَّةُ -

খুলাফায়ে রাশেদুন আল-মাহদিউন (হেদায়েত প্রাপ্ত) চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, যে লোক (স্ত্রীকে নিয়ে) দরজা বন্ধ করবে ও পর্দা টানিয়ে দেবে, তার স্ত্রীর মহরানা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং ইদ্দত পালনও আবশ্যকীয় হবে।

এ হাদীসে খুলাফায়ে রাশেদুনের আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ -

তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক হচ্ছে আমার পরে আমার সুন্নাত পালন করা এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত পালন করা। তোমরা তা শক্ত করে ধারণ করবে।

বিচার-বিবেচনার দিক দিয়েও উক্ত কথা অবশ্যই স্বীকৃতব্য। কেননা স্ত্রীর দিক থেকে স্বামীর উপর যে চুক্তি রয়েছে, তাতে দুটির একটি অবশ্যই হবে। হয় সঙ্গম হবে, না হয় স্ত্রীর আত্মসমর্পণ হবে স্বামীর নিকট। নপুংসকের যৌন সম্ভোগের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তার বিয়ে জায়েয হওয়া যখন সর্বসম্মত, তখন বোঝা গেল যে, আক্‌দ সহীহ্ হওয়ার সাথে যৌন সম্ভোগ হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা তা-ই যদি হয়, তাহলে যৌন সম্ভোগ না হওয়া অবস্থায়

বিয়েই সহীহ্ হতে পারে না। বিবেচ্য বিষয় হল, বিয়ে সহীহ্ হওয়া যখন সম্পর্কিত হচ্ছে আত্মসমর্পণের সহীহ্ হওয়ার সাথে তখন যেসব মুহাররম মেয়েলোকের আত্মসমর্পণ সহীহ্ নয়, তাদের সাথে বিয়ের আকদও সহীহ্ হতে পারে না। আর বিয়ের আক্দ সহীহ্ হওয়া যখন আত্মসমর্পণ সহীহ্ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, তখন আত্মসমর্পণ সহীহ্ হওয়ার পরে পূর্ণ মহরানা প্রাপ্য হওয়া অবশ্যই সহীহ্ হবে। এই আত্মসমর্পণ সহীহ্ হয় স্বামীর সাথে বিয়ে সহীহ্ হওয়া সংক্রান্ত সব কিছু অর্জিত হলে। উপরন্তু স্বামীর স্ত্রীর নিকট প্রাপ্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ এবং সঙ্গম সঙ্ঘটন তো স্বামীর কাজ। তার সে কাজের অক্ষমতা ও নিজ ইচ্ছায় বিরত থাকা প্রতিবন্ধক হতে পারে না স্ত্রীর মহরানা প্রাপ্তি সহীহ্ হওয়ার পথে; এই জন্যেই হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

المخو بها : ولها المهر كاملا ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم -

যে স্ত্রীকে নিয়ে একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া হবে, তারই পূর্ণ মহরানা প্রাপ্য হবে। তোমাদের দিক থেকে অক্ষমতা হলে স্ত্রীদের কোন দোষ হতে পারে না।

উপরন্তু স্বামী কোন ঘর ভাড়ায় নিল এবং দুজন সেখানে একান্তভাবে একত্রিত হল। তাহলে মহরানা পাওনা হয়ে গেল। কেননা স্ত্রী তো নিজেকে স্বামীর হাতে সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছে। বিয়েতে একান্ত হওয়াও এই রকমই। ফিকাহবিদগণ বলেছেন, মেয়েলোক যদি মুহাররমা হয় বা হায়য সম্পন্না হয় কিংবা হয় রোগাক্রান্ত, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মাত্রার মহরানার পাওনাদার হবে না। তার কারণ এই যে, সেখানে অপর একটি সহীহ্ আত্মসমর্পণ রয়েছে, যার দরুন পূর্ণ মাত্রার মহরানা পাওয়ার দাবিদার হতে পারে। কেননা এই শেষেরটি পূর্ণ মাত্রার আত্মসমর্পণ ছিল না। আর বিয়ের দরুন যে আত্মসমর্পণ স্বামীর প্রাপ্য তা যখন পাওয়া যায়নি, তখন পূর্ণ মাত্রার মহরানা পাওয়ার অধিকারীও হতে পারে না।

যে লোক উক্ত মত অগ্রাহ্য করেছেন, তিনি এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন ঃ তোমরা যদি স্ত্রীদের তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে, যদিও তোমরা তাদের মহরানা নির্দিষ্ট করেছ, তাহলে নির্দিষ্ট মহরানার অর্ধেক পাবে।

আল্লাহ্ অপর আয়াতে বলেছেন ঃ

وَاِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا -

তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদের বিয়ে করবে, পরে তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তোমরা তালাক দেবে, তাহলে তাদের পালন করার মত কোন ইদ্দত তাদের উপর আরোপিত হবে না।

এ আয়াতে পূর্ণ মাত্রার মহরানা পাওয়ার অধিকার ও ইদ্দত পালন ওয়াজিব হওয়া স্পর্শ—অর্থাৎ যৌন সঙ্গম হওয়ার উপর নির্ভরশীল বানানো হয়েছে হাত দ্বারা স্পর্শ না হওয়ার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও।

এর জবাব হল, আল্লাহ্‌র কথা ঃ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ 'তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে' এই কথাটির তাৎপর্য নির্ধারণে সাহাবীগণের বিভিন্ন কথা রয়েছে। হযরত আলী, উমর ইবনে

আব্বাস, জায়দ ও জায়দ ইবনে উমর (রা) একান্তে মিলিত হওয়া الخلوة -র তাৎপর্য অভিধান ও ভাষার দৃষ্টিতে বলেছেন; কিংবা এই দৃষ্টিতে বলেছেন যে, তা একটি শরীয়াতী পরিভাষা বিশেষ। কেননা শব্দের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য শরীয়াত ও অভিধান পরিপন্থীতে বলা জায়েয নয়। সেটি যদি অভিধানের দিক দিয়ে তাঁদের মতে কোন নাম হয়, তাহলে তাই তাকে অকাট্য প্রমাণ করবে। কেননা ভাষা অভিধান সম্পর্কে তারাই বেশি জ্ঞানী পরে আসা লোকদের অপেক্ষা। যদি তা শরীয়াতের দিক থেকে হয় তাহলেও তা তওকীফ রূপেই গ্রহণ করতে হবে। আর তা যখন তার একটা নাম, তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে, তোমরা যদি একান্ত নির্বিঘ্ন নিরিবিলির আগেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের নির্ধারিত মহরানার অর্ধেক দিতে হবে। উপরন্তু স্পর্শ বলতে যে হাত দ্বারা শুধু ছোঁয়া বোঝায় না, বরং অনেকে তার অর্থ করেছেন যৌন সঙ্গম আবার অনেকে একান্ত নিরিবিলি নির্বিঘ্ন একত্রিত হওয়া বুঝিয়েছেন। যদি যৌন সঙ্গম অর্থ করা হয়, তা হলে স্পর্শের কথাটি ইঙ্গিতমূলক (كناية) বুঝতে হবে। তার হুকুম তাই হবে। আর যখন তার অর্থ হবে একান্ত নিরিবিলিতে একত্রিত হওয়া, তখন শব্দের বাহ্যিক অর্থ প্রত্যাহৃত হবে। কেননা স্পর্শ বলে যে নিছক স্পর্শই বোঝানো হয়নি— তাতে সকলেই একমত। অন্য দিক থেকে এই বিষয়ে দলীল চাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। আমরা যে দলীলের কথা উল্লেখ করেছি, তাতে বলেছি, আয়াতটির অর্থই হচ্ছে الخلوة। একান্ত নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া ও যৌন সম্ভোগ নয়। তার অবস্থাসমূহের মধ্যে কম-সে-কম অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমরা কুরআন ও সুন্নাতের যে বাহ্যিক দলীলাদির উল্লেখ করেছি, তা কেবল তারই সাথে জড়িত হবে না। তাছাড়া ব্যবহৃত শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি গণ্য করি, তাহলে তার অর্থ হবে, স্বামী যদি স্ত্রীকে নিয়ে একান্তে মিলিত হয়, তাকে নিজ হাতে স্পর্শ করে, ধরে, তা হলেই পূর্ণ মহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য হবে। কেননা কুরআনে বলা স্পর্শ যথার্থই পাওয়া গেছে— ঘটেছে। আর যদি স্ত্রীকে নিয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠতায় মিলিত না হয়, নিজের হাতে তাকে না ছোঁয়, না ধরে, তা হলে মোট বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলতে হবে। উপরন্তু অর্থ যদি হয় যৌন সঙ্গম তাহলে তার যা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যা তারই মত হতে পারে, তা হওয়া নিষিদ্ধ হবে না। সহীহভাবে আত্মসমর্পণ হওয়াও এই পর্যায়ে গণ্য। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَا جَعَا -

স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তারা উভয়ই পুনর্বিবাহিত হলে তাদের দুজনার কোন দোষ হবে না।

বিচ্ছিন্নতা পর্যায়ে আর যে যে কাজ হতে পারে, তাও এখানে গণ্য। তার হুকুম হল প্রথম স্বামীর জন্যে তার মুবাহ হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী যৌন অঙ্গহীন পুরুষ সম্পর্কে বলেছেন যে, যদি তার স্ত্রীর সাথে একত্রিত হয় তাহলে যৌন সঙ্গম না করেই তালাক দিলে স্ত্রীর পূর্ণ মহরানা প্রাপ্য হবে। এ থেকে আমরা জানলাম যে, প্রকৃত হুকুমটা সঙ্গম হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তা সম্পর্কিত হচ্ছে স্ত্রীর সঠিক আত্মসমর্পণের সাথে।

যদি বলা হয়, স্ত্রীর আত্মসমর্পণ যদি সঙ্গমের বিকল্প হয়, তাহলে তার প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয় সে আত্মসমর্পণটা হলেই। যেমন যৌন সঙ্গম দ্বারা তার প্রথম স্বামীর জন্যে তার হালাল হওয়া সম্ভব হয়।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা ঠিক নয়। কেননা স্ত্রীর আত্মসমর্পণ, তা তো পূর্ণ মহরানা পাওয়ার অধিকারী হওয়ার একটি ইল্লাত বা কারণ মাত্র। তা তার প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল হওয়ার ইল্লাত নয়। লক্ষণীয় যে, সঙ্গমের আগেই যদি স্বামী মরে যায়, তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মহরানা পাওয়ার অধিকারী হবে। স্বামীর এই মৃত্যুটা সঙ্গমের স্থলাভিষিক্ত গণ্য হবে। কিন্তু তাতে প্রথম স্বামীর জন্যে তার হালাল হওয়ার ব্যাপার ঘটে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -

তবে যদি স্ত্রীরা কমিয়ে বা মাফ করে দেয় অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন নিবদ্ধ, সে যদি কমিয়ে বা মাফ করে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'তবে যদি তারা মাফ করে দেয়' এর অর্থ, স্ত্রীগণ যদি মাফ করে দেয়। কেননা এর মূলে যদি স্বামীদের বোঝানো লক্ষ্য হতো, তাহলে বলা হতো, 'তবে যদি স্বামীরা মাফ করে দেয়।' এতে মতের কোন বিভিন্নতা নেই। ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও আগের মনীষীদের থেকে এই বর্ণনাও এসেছে। স্বামীর মাফ করা অর্থ, অবশিষ্ট প্রাপ্য মহরানা ছেড়ে দেয়া। আর তা হচ্ছে সেই অর্ধেক মহরানা, যা তালাকের পর তাদের প্রাপ্য হয়। আল্লাহ্র কথা ঃ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ অনুযায়ী।

যদি বলা হয়, মহরানা তো কখনও নগদ সম্পদ হয়, জমি-জায়গা হয়, তাতে ক্ষমা করা বা কম করার কোন সুযোগ থাকে না।

জবাবে বলা যাবে, এখানে 'ক্ষমা করার অর্থ এ নয় যে, বলে দিল, 'আমি ক্ষমা করে দিলাম।' এখানে ক্ষমা করার অর্থ সহজ করে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। তার অর্থ হবে, স্ত্রী স্বামীকে মালিক হওয়ার চুক্তিতে জায়েয পন্থায় ছেড়ে দেয়া। ফলে আয়াতটির তাৎপর্য হবে স্ত্রী সামীকেই মালিক বানিয়ে দেবে এবং কোন বিনিময় ছাড়াই স্বামীর নিকট পাওনা ছেড়ে দেবে।

এখানে কেউ যদি বলে যে, জমি-জায়গা হেবা করা জায়েয হওয়ার দলীল এ আয়াতেই পাওয়া যাচ্ছে। কেননা আল্লাহ্ স্ত্রীর জন্যে মুবাহ করে দিয়েছেন, স্বামীকে অর্ধেক মহরানার মালিক বানিয়ে দেবে তালাকের পর। এতে কোনটি নগদ সম্পদ, কোনটি ঋণ বা কোনটির বিভক্তি হয়, কোনটির হয় না, তার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। অতএব আয়াতের ফায়সালা ক্রমেই জমি-জায়গা হেবা করা জায়েয প্রমাণিত হল।

জবাবে তাকে বলা হবে, যেমন তুমি ধারণা করেছ, ব্যাপারটি তেমন নয়। ক্ষমা করার অর্থ এ নয় যে, বলবে আমি মাফ করে দিলাম। কেননা একজন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে বলে যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমার এই ঘর থেকে অথবা আমি আমার এই ঘর থেকে তোমাকে নিঃসম্পর্ক বা দায়িত্বমুক্ত করে দিলাম, তাতে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয় না। তাতে হেবা'র আক্দও সহীহ হয় না। ব্যাপার যখন এই, আর আয়াতে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তদ্দারা মালিক বানিয়ে দেয়ার চুক্তি বৈধ হয় না, তখন জানা গেল যে, স্ত্রী স্বামীকে সেভাবে মালিক বানিয়ে দেবে, যেভাবে হেবা ও মালিক বানিয়ে দেয়ার চুক্তি বৈধ হতে পারে। কেননা মালিক বানিয়ে দিতে হলে যে শব্দ দ্বারা তা সহীহ হয় সেই শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অথচ তা আয়াতে ব্যবহৃত হয়নি। তাই এ বিষয়ের হুকুম দলীলের উপর নির্ভরশীল হবে। মৌল

নীতিতে যা জায়েয, তা-ই এ বিষয়ে জায়েয হবে। আর মৌলনীতিতে যা জায়েয হবে না হেবা'র চুক্তি করা, তা এতে জায়েয হবে না। এসব সত্ত্বেও সওয়ালকারী যদি শাফেয়ী মাযহাব অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে আবশ্যকীয় হচ্ছে অ-হস্তগত অবস্থায়ও হেবা জায়েয করে নেবে। কেননা হস্তগত করা ও অ-হস্তগত— এই দুই ধরনের মহরানার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কোন পার্থক্য করেন নি। অতএব স্ত্রী যখন ক্ষমা করে দেবে, অথচ সে তা নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছে, তাহলে তা স্বামীর নিকট সোপর্দ না করেও হেবা করা জায়েয করতে পারে। কিন্তু তা যখন জায়েয নয়, অথচ তা হেবার শর্তে আরোপিত, জমি-জায়গার ব্যাপারেও তাই।

আর যদি ইমাম মালিকের অনুসারী হয়, তাহলে তিনি এই দলীলটা পেশ করেছেন জমি-জায়গায় হেবা জায়েয হওয়া প্রমাণের জন্যে, তা হস্তগত করার পূর্বেও হতে পারে। তাহলে কথা সেই ভাবেই হবে যেভাবে আমরা বলেছি। আল্লাহ্র কথাঃ 'অথবা ক্ষমা করবে সে যার হাতে বিয়ের বন্ধন নিবদ্ধ।'

আগের ফিকাহবিদগণ এ কথার তাৎপর্য পর্যায়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন। হযরত আলী, যুবায়র ইবনে মুতয়িম, নাফে ইবনে যুবায়র (রা) এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে যুবায়র, মুহাম্মাদ ইবনে কায়াফ, কাতাদাহ, নাফে বলেছেন ঃ স্বামীর হাতেই বিয়ের বন্ধন নিবদ্ধ। অনুরূপ বলেছেন আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, সওরী, ইবনে শবরামাতা'আ, আওজায়ী ও শাফেয়ী। এঁরা সকলেই বলেছেন, স্বামীর ক্ষমা হচ্ছে, সে পূর্ণ মহারানা দেবে তালাক দেয়ার পর সঙ্গমের পূর্বে। তাঁরা বলেছেন, 'তবে যদি ক্ষমা স্ত্রীরা' এই কথায় পূর্বে বিবাহিতা ও নতুন বিবাহিতা— সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ পর্যায়ে দুটি বর্ণনা এসেছে। একটি হাম্মাদ ইবনে সালমাতা'আ, আলী ইবনে জায়দ, আম্মার ইবনে আবূ আম্মার, ইবনে আব্বাস সূত্রে। বলেছেন, সে স্বামী। ইবনে জুরাইয— আমর ইবনে দীনার, ইকরামা, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে। এটি দ্বিতীয় বর্ণনা। তিনি বলেছেন, ক্ষমা করা অর্থ তার আদেশ দেয়া, আর স্ত্রী ক্ষমা করলে তা যেমন ক্ষমা করেছে, তেমনই। আর স্ত্রী যদি প্রত্যাহার করে, ফিরিয়ে নেয়, আর তার অভিভাবক ক্ষমা করে, তাহলেও জায়েয হবে— স্ত্রী অস্বীকার করলেও। আল-কামা, আল-হাসান, ইবরাহীম, আতা, ইকরামা ও আবুজ-জিনাদ বলেছেন, সে হচ্ছে স্ত্রীর অভিভাবক। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, সঙ্গম করার পূর্বে— স্ত্রী পূর্বে বিয়ে না হওয়া, তাহলে তার পিতার ক্ষমা করা জায়েয ও কার্যকর হবে। অর্ধেক মহরানা মাফ হয়ে যাবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ বলে সেই স্ত্রীদের ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে, যাদের সাথে সঙ্গম হয়েছে। বলেছেন, পিতা ছাড়া আর কারোর পক্ষেই একবিন্দু মহরানা মাফ করে দেয়ার অধিকার নেই। কোন অসী তা পরে না, না অন্য কেউ তা পারে। লায়স বলেছেন, পূর্বে অবিবাহিত স্ত্রীর পিতার পক্ষে জায়েয আছে সে তার কন্যার মহরানা বিয়ের আক্দের সময়ই মাফ করে দেবে। তা সেই স্ত্রীর উপর কার্যকর হবে। কিন্তু নিবয়ের আক্দ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীর মহরানা থেকে কিছু কমানোর স্বামীর কোন অধিকার নেই। কিছু মাফ করারও অধিকার নেই, যদি সঙ্গমের পূর্বে তালাক হয়ে যায়। পিতার দৃষ্টি হলে ও স্ত্রী অস্বীকার অপছন্দ করলেও স্বামীর সাথে বিচ্ছিন্ন করা জায়েয। বিয়ের পর স্ত্রীর মহরানার কোন অংশ বাদ দেয়া পিতার জন্যে যেমন করে জায়েয নয়, তেমনি সঙ্গম-পূর্ব তালাক হলে স্ত্রীর অর্ধেক মহরানা মাফ করারও তার কোন অধিকার নেই।

ইবনে অহব মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, স্বামীর সম্পর্কচ্ছেদন স্ত্রী থেকে পিতার জন্যে জায়েয।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ মুতাশাবিহ, কেননা তাতে দুটি দিকের সম্ভাবনা আছে। আগের কালের ফিকাহবিদগণ তারই ভিত্তিতে আয়াতটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব আয়াতটিকে মুতাশাবিহ্ না বলে মুহকাম বলাই বাঞ্ছনীয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا -

তোমরা স্ত্রীদের মহরানা নিষ্ঠা সহকারে আদায় করে দাও। তারা নিজেরাই যদি তার থেকে কিছু আন্তরিক সন্তুষ্টি সহকারে ফিরিয়ে বা কম করে দেয়, তাহলে তোমরা তা সুস্বাদু ও সুপেয় হিসেবেই আহার করবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অপর স্ত্রীকে বদল করতে ইচ্ছা করে থাক, অথচ তাদের একজনকে তোমরা বিপুল সম্পদ দিয়ে ফেলেছ, তাহলেও তা থেকে একবিন্দু ফিরিয়ে নেবে না। বলেছেন ঃ 'এবং তোমাদের জন্যে হালাল নয় যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে দেয়া জিনিস থেকে একবিন্দু ফিরিয়ে নেবে, তবে তারা দুজন আল্লাহ্‌র সীমা রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় করলে ভিন্ন কথা।

এসব কয়টি আয়াতই মুহকাম। এর স্পষ্ট অর্থের বিপরীত কোন অর্থ একটিরও গ্রহণ করা যেতে পারে না। অতএব মুতাশাবিহ্ আয়াতটিকে এসব 'মুহকাম' আয়াতের আলোকে গ্রহণ করতে হবে ও তার ব্যাখ্যা করতে হবে। মুতাশাবিহ্ বলা আয়াতটি হচ্ছেঃ 'অথবা ক্ষমা করবে সে যার হাতে বিয়ের বন্ধন নিবদ্ধ।' কেননা আল্লাহ্ নিজেই মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়ার— তারই আলোকে তার ব্যাখ্যা দেয়ার আদেশ করেছেন। তা না করে মুতাশাবিহ্ আয়াতের তত্ত্ব খুঁজে বেড়ানোর নিন্দা করেছেন। বলেছেন ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاۤءَ الْفِتْنَةِ -

যেসব লোকের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা কুরআনের মুতাশাবিহ্ আয়াতের পিছু চলে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭)

উপরন্তু ব্যবহৃত শব্দ যখন একাধিক অর্থ দিতে পারে, তখন সেটির অর্থ মৌলনীতির সাথে মিল রেখে করা আবশ্যক। আর কন্যার কোন মাল স্বামীকে হেবা করার ইখতিয়ার পিতার থাকতে পারে না, তাতে কারোর একবিন্দু মতবিরোধ নেই। অন্য কাউকেও পিতা দিতে পারে না নিজের কন্যার মাল। মহরানাও তেমনি। মহরানা সম্পূর্ণ স্ত্রীর সম্পদ, সে-ই তার মালিক। সে মাল অভিভাবক দিয়ে দিতে পারে— এই কথাও মৌলনীতির পরিপন্থী। কারোর মাল হেবা করার অভিভাবকত্ব অন্য কেউ অধিকার করতে পারে না। এই মত প্রকাশকদের কথা যেহেতু মৌলনীতির বিপরীত, তার পরিপন্থী, অতএব আয়াতটির অর্থ মৌলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে গ্রহণ করতে হবে। কেননা সেটি স্বতঃই কোন মৌলনীতি নয়। তার বহু কয়টি অর্থ হওয়া

সম্ভব হওয়ার কারণে। আর যা স্বতঃই কোন মৌলনীতি নয়, তাকে অপর মৌলনীতির আলোকে গ্রহণ করা ওয়াজিব। তার ব্যাখ্যাও সেই হিসেবেই করতে হবে। উপরন্তু দুটি অর্থ-ও যদি সম্ভাব্যতার আওতার মধ্যে হয় এবং মৌলনীতিতে তার নযীর পাওয়া যায়, তাহলে ব্যবহৃত শব্দের দাবি অনুযায়ী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, স্বামীই বরং অভিভাবক অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সাব্যস্ত হবে শব্দের বাহ্যিক অর্থের দাবিরূপে। তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ বলেছেন, 'অথবা ক্ষমা করবে সে, যার হাতে বিয়ের গ্রন্থি নিবদ্ধ।' এতে অভিভাবকের কোন ইখতিয়ারের কথাই বলা হয়নি, প্রকৃত ও প্রত্যক্ষভাবেও নয়, পরোক্ষভাবেও নয়। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ 'যার হাতে বিয়ের গ্রন্থি' এর দাবি হল বিয়ের সম্পর্ক বর্তমান আছে, তা তারই মুঠিতে, যার মুঠিতে তা থাকতে পারে। যে গ্রন্থি বর্তমান নেই, তার উপর এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে, তা মনে করা জায়েয নয়। অতএব তা অন্য কারোর হাতে আছে, তা-ও মনে করা যায় না। বিয়ের গ্রন্থি যখন অভিভাবকের হাতে নেই— না আক্দের পূর্বে ছিল, না পরে হয়েছে, অথচ তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা স্বামীর হাতেই নিবদ্ধ ছিল, অতএব ব্যবহৃত শব্দ সেই স্বামীকেই বোঝাবে, বিয়ের গ্রন্থি স্বামীর হাতে— যদিও তা সে এখানে তালাক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে— নিবদ্ধ বলে মনে করতে হবে আভিভাবকের হাতে আছে মনে করার পরিবর্তে স্বামীর হাতে আছে (বা ছিল) মনে করাই উত্তম।

যদি বলা হয়, এ বিষয়ে আল্লাহ্র আলোচ্য কথাটি তো তালাকের পরবর্তী অবস্থা প্রসঙ্গে, তালাকের পর তো বিয়ের গ্রন্থি স্বামীর হাতে থাকেনি, সে তো তা ছেড়ে দিয়েছে?

জবাবে বলা যাবে, শব্দে এই সম্ভাবনা আছে যে, যার হাতে বিয়ের গ্রন্থি নিবদ্ধ তাকেই বুঝতে হবে। কিন্তু অলী বা অভিভাবকের হাতে বিয়ের গ্রন্থি অতীতেও যেমন ছিল না, বর্তমানেও নেই। অতএব স্বামীকে মনে করাই উত্তম আয়াতের অর্থ হিসেবে। অভিভাবককে নয়। আয়াতের ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্র এই কথাও রয়েছে ঃ

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ -

তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অগ্রবর্তিতার কথা তোমরা ভুলে যেও না।

অগ্রবর্তিতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

আর তুমি ক্ষমা করে দাও, তা তাকওয়ার খুবই নিকটবর্তী।

অন্য কারো মাল হেবা করায় তার দিক থেকে সেই অন্য কারোর প্রতি অগ্রবর্তিতা আরোপ হয় না। কেননা স্ত্রীর দিক থেকে তো এই অগ্রবর্তিতা হয়নি। অভিভাবকের ক্ষমা করা জায়েয মনে করতে উক্ত আয়াতে বলা অগ্রবর্তিতার তাৎপর্য প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্ ক্ষমার পর তাকওয়ার নিকটবর্তিতার কথা বলেছেন। কিন্তু অন্য কারোর মাল হেবা করায় কোন তাকওয়া নেই। সেই অন্য ব্যক্তি ক্ষমার ইচ্ছা করেনি। ফলে সে তার দ্বারা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তাই স্বামীই হতে পারে সেই ব্যক্তি, যার হাতে নিবদ্ধ বিয়ের গ্রন্থি। মহরানা পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দেয়া তারই কাজ। অতএব উক্ত শব্দ দ্বারা তাকেই বুঝতে হবে। আর স্বামীই যখন সেই ব্যক্তি যার হাতে বিয়ের গ্রন্থি নিবদ্ধ, তখন অভিভাবককে মনে করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হবে না। কেননা আগের কালের ফিকাহবিদগণ দুইটির যে কোনটি অর্থ করেছেন। হয়

হবে স্বামী, না হয় হবে অভিভাবক। আর আমরা যখন দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছি যে, তাতে স্বামীকে বোঝানো হয়েছে, তখন অভিভাবককে মনে করা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে।

আমাদের কথার উপর কেউ যদি বলে, আয়াতে মুস্তাহাব থেকে অগ্রাধিকার পর্যন্ত কথা শামিল রয়েছে, যা তাকওয়ার নিকটবর্তী পর্যন্তও শামিল। আর সেটি যদি বিশেষ সম্বোধন হয়ে থাকে মালিকের প্রতি, তার প্রতি নয় যে অন্য লোকের মাল হেবা করে, মৌলনীতিতে এই নামটি অভিভাবকের জন্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার মতো কিছুই নেই। সে যদি তার অভিভাবকত্বের অধীন কারোর মালে সে কাজ করে, তাহলে তা অবৈধ না হওয়াই তো উচিত। তার প্রমাণ এই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কের ধন-মাল থেকে যদি অভিভাবক সদকায়ে ফিত্‌র দিয়ে দেয় তার পক্ষ থেকে, তাহলে অভিভাবক নিশ্চয়ই সওয়াবের অধিকারী হবে। কুরবানী ও খাতনা করানো ইত্যাদিও এই পর্যায়েরই কাজ।

এর জবাবে বলা যাবে, আমাদের পেশ করা আলোচনার প্রেক্ষিতে যুক্তি প্রয়োগে চরম গাফলতির পরিচয় দেয়া হয়েছে। আমরা বলেছি, অন্য লোকের ধন-মাল থেকে দান করলে সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে না। কিন্তু এর মুকাবিলায় পেশ করা হয়েছে সেই ব্যক্তি ও তার কাজকে, যার তার মালে হক রয়েছে ও অভিভাবক সেই হক-এর বলে তা বের ও ব্যয় করেছে— সে হচ্ছে পিতা। অথচ অসী ও অসী-নয় এমন ব্যক্তির পক্ষে এসব হক আদায় করা জায়েয বলে আমরা মনে করি। কিন্তু সেই পিতার পক্ষে জায়েয নয়, তার অভিভাবকত্বের অধীন ব্যক্তির হক ক্ষমা করে দেবে। তাহলে সদকায়ে ফিতর ও ওয়াজিব হক আদায় করার কাজ দান করে দেয়ার মত কাজ হতে পারে কিভাবে ? তার মালে যে হক চাপেনি, তা সে কি করে দিয়ে দেবে ?

কেউ কেউ মনে করেছে, স্বামীকে তা করার অধিকারী করার কথা বোঝাতে চাইলে কথাটি এভাবে বলা যেত ঃ 'তবে স্ত্রীরা যদি ক্ষমা করে, অথবা ক্ষমা করে স্বামী।' কেননা এর পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। তাহলে কথাটি একত্রে উভয়ের দিকে নির্দেশিত হতো। কিন্তু কথাটি সেভাবে বলা হয়নি, বলা হয়েছে একটা পরিচিতি। বোঝা গেল, এই কথা দ্বারা স্বামীকে বোঝাতে চাওয়া হয়নি।

আবূ বকর বলেছেন, এই কথাগুলো অন্তঃসারশূন্য। এর কোন অর্থ হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কখনও আইন-আদেশ পালনীয় করেন অকাট্য দলীলের দ্বারা, কখনও দলীলের তাৎপর্যগত ভাবধারার দ্বারা। তাতে অকাট্য দলীল থাকে না। কখনও স্পষ্ট শব্দে, যার একাধিক অর্থ হতে পারে। তা কোথাও অধিক প্রকাশমান এবং তা উত্তম। কখনও বিভিন্ন অর্থের ধারক শব্দ ব্যবহার দ্বারা। তাতে আসল লক্ষ্য নির্ধারণে মৌলনীতির সহায়তা লওয়া আবশ্যক হয়। তাতে যুক্তি-প্রমাণ আসে অন্য দিক থেকে। কুরআনে এই সবই পাওয়া গেছে।

এই কথা ঃ আয়াতে স্বামীর কথা বলাই লক্ষ্য হলে বলা হতো ঃ অথবা ক্ষমা করবে স্বামী .... তাতে কথাটি স্পষ্ট স্বামীর দিকে যেত, অন্য কারোর দিকে নয়। কিন্তু তা না বলে কথার বিপরীত অর্থের ধারক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার কোন অর্থ হয় না। সেই সাথে এ-ও বলা যায়, আয়াতে যদি অভিভাবককেই বোঝাতে চাওয়া হতো, তাহলে অভিভাবক স্পষ্ট ভাষায় বলা হতো। এমন শব্দ ব্যবহৃত হতো না, যার অর্থে অভিভাবক ও অন্য লোকও শরীক মনে করা যায়।

এই কথা যার, সে বলেছে, ক্ষমাকারী বলে তাকে বোঝানো হয়েছে যে তার হক-প্রাপ্য ছেড়ে দেয়। স্ত্রী যদি তার প্রাপ্য অর্ধেক মহরানা ছেড়ে দেয়, তাহলে সে হবে ক্ষমাকারিনী। অনুরূপভাবে অভিভাবক-ও। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন জিনিস দেয়, যা দেয়া কর্তব্য নয়, তাতে তো ক্ষমাকারী বলা যাবে না। তাকে বলা যাবে হেবাকারী— দাতা। এই কথাও দুর্বল। কেননা যারা আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বামীকে মনে করেছেন, তাঁরা বলেছেন, স্বামীর ক্ষমা হল মহরানা পরাপুরি দিয়ে দেয়া। এঁরা হচ্ছেন সাহাবী ও তাবেয়ীন। শব্দের তাৎপর্য তাঁরাই অধিক ভালো জানেন। ওদের তুলনায় এঁরা বুঝেন শব্দে কি কি অর্থের সম্ভাব্যতা রয়েছে।

তাছাড়া এক্ষেত্রে ক্ষমা সেই ক্ষমা নয়, যেমন বলা হয়, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।' এখানে ক্ষমার অর্থ স্বামীর দিক থেকে মহরানা পুরাপুরি দিয়ে দেয়া। অথবা স্ত্রীর প্রাপ্য অবশিষ্ট অর্ধেক মহরানার মালিক স্বামীকে বানিয়ে দেয়া তালাকের পর। যেমন মহরানা যদি হতো দাস, তাহলে আয়াতের হুকুমটি তাতেই ব্যবহৃত হতো। তাতে উল্লিখিত মুস্তাহাবের ভাব যথাযথ কায়েম রয়েছে। স্ত্রীর ক্ষমা হতো এই যে, তার প্রাপ্য বাকী অর্ধেক মহরানাটা তালাকের পর স্বামীকে দিয়ে দেবে। এ নয় যে, সে বলবে, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। বরং কোন কিছুর মালিক অন্যকে বানাবার জন্যে যেভাবে কথা বলতে হয়, তা-ই বলবে। তেমনি স্ত্রী যদি মহরানা হস্তগত করে থাকে ও তা ব্যবহার করে পুরা ব্যয় করে ফেলে থাকে, এরূপ অবস্থায় স্বামীর ক্ষমা হচ্ছে তার উপর কিছু পাওনা থাকলে তা থেকে স্ত্রীকে মুক্তিদান। আর মহরানা যদি স্বামীর যিম্মায় ঋণ হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর ক্ষমা হচ্ছে অবশিষ্ট থেকে স্বামীকে নিষ্কৃতি দান। দেখা গেল, সব ক্ষমাই স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত। পরে অনুরূপভাবে স্বামীর সাথে। বলা যায়, তাহলে অভিভাবকের ক্ষমার ব্যাপারে তুমি কি বলতে চাও ? তার পরিচয়টা কি ? আমরা স্বামীর ক্ষমার কথা বলি স্ত্রীর ক্ষমার মতই। অতএব ওসব কথায় ব্যস্ত হওয়ার কোন ফায়দা নেই। কেননা কথা হচ্ছে 'ক্ষমা' শব্দ নিয়ে । আর আলোচনা হচ্ছে অন্য বিষয়ে। তা-ও কথা যার, তার কথাই ত্রুটিপূর্ণ। তবে আমি বিরোধীদের কথার ত্রুটি এড়িয়ে চলেছি। তারা বাজে কথার আশ্রয় নিয়েছে, যার কোন প্রমাণই নেই।

আল্লাহ্‌র কথা إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ বাতিল করে দিয়েছে তার কথা যে বলে পূর্বে অবিবাহিত স্ত্রী তালাকের পর যদি অর্ধেক মহরানা ক্ষমা করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে না। এই কথাটি ইমাম মালিকের। কেননা আল্লাহ্ তাঁর উক্ত কথার মধ্যে কে পূর্বে বিবাহিত ছিল (الثيب) আর কে ছিল না (البكر) তার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। আল্লাহ্‌র কথার সূচনা-সম্বোধনে 'তোমরা যদি স্পর্শ করার আগে ও মহরানা নির্দিষ্ট করার পর স্ত্রীদের তালাক দাও, তাহলে তোমাদের ধার্য করা মহরানার অর্ধেক পাবে'— এতে পূর্বে বিয়ে হওয়া ও বিয়ে না-হওয়া স্ত্রীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এরই সাথে সংযোজিত করা হয়েছে। إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ 'তবে যদি স্ত্রীরা ক্ষমা করে।' এই কথা উভয় শ্রেণীব্যাপক। পূর্বে বিয়ে হওয়া স্ত্রীই শুধু ক্ষমা করতে পারে, আর পূর্বে বিয়ে না-হওয়া স্ত্রী ক্ষমা করতে পারবে না, এরূপ পার্থক্যপূর্ণ কোন কথার একবিন্দু প্রমাণ নেই এ আয়াতে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ —নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক— ওয়াজিব করে এক হাজার টাকার মহরানা ধার্য করে বিয়ে হলেও সম্পূর্ণ টাকা স্ত্রীকে দিয়ে থাকলে তারপর সঙ্গমের

আগেই যদি তালাক দেয়, স্ত্রী টাকা পেয়ে জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকে, তাহালে স্ত্রীকে অর্ধ হাজার দেয়া স্বামীর কর্তব্য হবে। এই অর্ধ হাজারের জামিন হবে স্বামী।

ইমাম মালিক বলেছেন, স্ত্রী মহরানার টাকা পেয়ে যেসব মাল-সামান ক্রয় করেছে, তার অর্ধেক স্বামী নিয়ে নেবে। কেননা আল্লাহ্ তো তার প্রাপ্যই করেছেন নির্দিষ্ট পরিমাণের মাত্র অর্ধেক। স্ত্রীও তাই। তাহলে যা নির্দিষ্ট করা হয়নি, তা স্ত্রীর নিকট থেকে নিয়ে নেয়া জায়েয হবে কি করে ? তা তো তার মূল্যও নয়। এই কথাও মৌলনীতির পরিপন্থী। কেননা কোন ব্যক্তি যদি হাজার টাকা দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে, বিক্রেতা তার নিকট থেকে সে হাজার টাকা নিয়ে নেয়, আর তা দিয়ে সে অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী কিনে ফেলে, পরে দাস-ক্রেতা তার মধ্যে ত্রুটি পায় ও ফিরিয়ে দেয়, তাহলে দাস-বিক্রেতা যেসব জিনিস কিনেছে, তার উপর তো দাস-ক্রেতার কোন অধিকার থাকে না। দ্রব্যগুলো তো দাস-বিক্রেতার মালিকানাধীন। তখন দাস-বিক্রেতার কর্তব্য হল—দাস-ক্রেতাকে হাজার টাকা ফেরত দেয়া। বিয়েতেও তা-ই। এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বিশেষত বিয়েটা তো দ্রব্য-সামগ্রীর ভিত্তিতে হয়নি। বিক্রয়ের চুক্তিও তার ভিত্তিতে হয়নি। হয়েছে এক হাজার টাকার মহরানার ভিত্তিতে।

সালাতুল উস্‌তা, নামাযে (সালাতে) কথা বলা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -

তোমরা সকলে নামাযসমূহের পূর্ণ সংরক্ষণ কর বিশেষভাবে মধ্যম নামায।

এ আয়াতে নামায কাজটি করার আদেশ করা হয়েছে। তা ফরয। অতএব সংরক্ষণের জন্যে তাগিদ করা হয়েছে। এ নামায হল পাঁচ ওয়াক্তের— পাঁচ বারের যা কুরআনে লিখিত এবং সর্বজনপরিচিত— একদিন ও একরাত্রির মধ্যে الصلات শব্দের উপর 'আলিফ' ও 'লাম' অক্ষরদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে, সেজন্যে পরিচিতি নামাযের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বোঝায়। এ কথার মধ্যে শামিল রয়েছে নামাযে দাঁড়ানো, তার ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা, পূর্ণ করা এবং তার সীমাসমূহ রক্ষা করার আদেশ, আর তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে তা করা এবং তাতে কোনরূপ ত্রুটির অবকাশ না রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সংরক্ষণের আদেশ এই সবকিছু দাবি করে। এরপর 'সালাতিল উস্‌তা' আলাদাভাবে উল্লেখ করা অন্যান্য সব নামাযের সঙ্গে সঙ্গে— এটা সেই 'সালাতিল উস্‌তা'র উপর বিশেষ তাগিদ আরোপ। তা দুইটি তাৎপর্য বোঝায়। হয় তা নামাযসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাগ্রগণ্য নামায, তার সংরক্ষণ বিশেষভাবে করার তাগিদ বোঝায়। এই কারণে মোট নামায থেকে আলাদা করে তার উল্লেখ হয়েছে। অথবা তার সংরক্ষণটা অন্যান্য নামায থেকে অধিক তাগিদপূর্ণ করার জন্যে এরূপ বলা হয়েছে।

এ পর্যায়ে বহু সংখ্যক বর্ণনা এসেছে। সে সবের সূত্র বিভিন্ন। তার কতক বর্ণনা প্রথমোক্ত দিকটি বোঝায়। আর অপর কতক বর্ণনা বোঝায় দ্বিতীয় দিকটি। একটি বর্ণনা হযরত জায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকে এসেছে। তিনি বলেছেন, 'সালাতুল উস্‌তা' বলে যুহর-এর নামায বুঝিয়েছেন। কেননা নবী করীম (স) দুপুরবেলা নামায পড়তেন। তখন তাঁর পেছনে এক কাতার কিংবা দুই কাতারের বেশি হতো না। এ সময় লোকেরা তাদের কাজে-কর্মে ও

ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে থাকত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ তোমরা সকলে নামাযসমূহের পূর্ণ সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যম নামায। হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

فَكَانَتْ أَثْقَلُ الصَّلٰوتِ عَلَى الصَّحَابَةِ –

তখন সাহাবীদের জন্যে খুবই দুষ্কর ও অধিক কষ্টসাধ্য ছিল এই নামায।

তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

জায়দ ইবনে সাবিত বলেছেন ঃ সে নামাযকে الوسطى 'মধ্যম নামায' বলা হয়েছে এজন্যে যে, তার পূর্বে থাকে দুই ওয়াক্তের নামায আর পরে থাকে দুই ওয়াক্তের নামায। ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ 'সালাতুল উস্‌তা বলে আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে اِنَّهَا صَلٰوةُ الْفَجْرِ তা হচ্ছে ফজরের নামায। হযরত আয়েশা, হাফ্‌সা ও উম্মে কুলসুম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের নিকট রক্ষিত কুরআনের সহীফায় حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ 'তোমাদের নামাযসমূহের বিশেষ করে মধ্যম নামায অর্থাৎ আসরের নামাযের সংরক্ষণ কর' লেখা আছে। বরা ইবনে আজিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوتِ وَالصَّلٰوةِ الْعَصْرِ –

তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর আর আসরের নামাযের।

উক্ত আয়াতটি এবং তার উক্ত পাঠ রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে হয়েছিল। পরে حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى – 'তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর বিশেষ করে মধ্যম নামাযের'। বরা জানিয়েছেন যে, উক্ত মহিলাদের সহীফায় আয়াতটিতে যে 'সালাতুল আসর'-এর উল্লেখ আছে, সেটি মনসূখ হয়ে গেছে। আসিম জুর আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) বলেছেন, আমরা আহযাব যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম, ব্যস্ততার কারণেই আমরা আসরের নামায যথাসময়ে পড়তে পারিনি। সূর্য প্রায় অস্তোন্মুখ হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বদ্দো'আ স্বরূপ বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ امْلَا قُلُوْبَ الَّذِيْنَ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى نَارًا –

হে আমাদের আল্লাহ্! যারা আমাদেরকে মধ্যম নামায পড়বার সুযোগ দেয়নি, তাদের হৃদয়সমূহ আগুন দিয়ে ভরে দাও।

এ থেকে বোঝা যায়, সালাতুল উস্‌তা বলতে আসরের নামায বোঝায়। হযরত আলী (রা) বলেছেন, আমরা মনে করতাম, তা হচ্ছে ফজরের নামায। ইকরামা সাঈদ ইবনে যুবায়র ও মাকসাম হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তা হল আসরের নামায। সামুরাতা ইবনে জুনদুব (রা) রাসূলে করীম (স) থেকে অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে তাঁর এই কথাটি বর্ণিত হয়েছে। তা হল আসরের নামায। উবাই ইবনে কাব, কুবাইসাতা ইবনে জুয়ায়ব আল-মাগরিব থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

বলা হয়েছে, আসরের নামাযকে 'সালাতুল উস্‌তা' 'মধ্যম নামায' বলার কারণ হল, তা হচ্ছে দিনের দুই নামায ও রাতের দুই নামাযের মাঝখানে অবস্থিত। বলা হয়েছে, প্রথম যে ফরয হয়, তা ছিল ফজরের নামায। আর সে নামাযসমূহের শেষ ওয়াক্তের নামায ছিল এশার নামায। ফলে আসর হল ফরয নামাযসমূহের মধ্যম। 'উস্‌তা' বলে যাঁরা যুহর-এর নামায মনে করেছেন, তাঁরা বলেছেন, কেননা তা দিনের তিন ওয়াক্ত ফজর ও আসরের মাঝখানে অবস্থিত। যাঁরা ফজর-এর নামায বুঝেছেন, তাঁরা ইবনে আব্বাসের কথা তুলেছেন যে, তা রাতের অন্ধকার ও দিনের ঔজ্জ্বল্যের মাঝখানে পড়া হয়। ফলে তা-ই সময়ের দিক দিয়ে মধ্যমে অবস্থিত।

কোন কোন লোক 'আস-সালাতুল উস্‌তা'-কে দলীল বানিয়ে বলেছেন যে, বিত্‌রের নামায ফরয নয়। কেননা তা যদি ফরয হয়, তাহলে তার কোন মধ্যম হতে পারে না। কেননা তখন তো পাঁচ-এর পরিবর্তে ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয দাঁড়িয়ে যায়। তাই বলা যায়, আসরের নামায যদি 'সালাতুল উস্‌তা' হয় তাহলে তা—যেমন বলা হয়েছে ফরয নামাযসমূহের মধ্যম নামায হতে পারে। আর যদি যুহর ধরা হয়, তাহলেও তা হতে পারে এইজন্যে যে, তা দিনের দুই নামাযের মাঝখানে অবস্থিত। কিন্তু তাতে রাতের বিত্‌রের নামাযের ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণিত হয় না। আয়াতের বক্তব্য হল, ফরয নামাযসমূহের মধ্যের মধ্যম নামায। কিন্তু বিতরের নামায ফরয নয়। তা ওয়াজিব মাত্র। আর ওয়াজিব মাত্রই ফরয হয় না। ফরয হল অবশ্য কর্তব্যসমূহের সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত। ফরয নামাযের পর বিত্‌রের নামাযের স্থান। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

انَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ اِلٰى صَلَاتِكُمْ صَلَاةً وَهِىَ الْوِتْرُ وَاِنَّمَا سُمِّيَتْ وُسْطٰى قَبْلَ وَجُوْبَ الْوِتْرُ -

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ফরয নামাযের সাথে আর একটি নামায বাড়িয়ে দিয়েছেন। তা হল বিত্‌রের নামায।

'মধ্যম নামায' নামকরণ হয়েছে বিত্‌রের নামায ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ -

তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে নামাযে বিনয়াবনত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে যাও।

اَلْقُنُوْتُ শব্দের আসল আভিধানিক অর্থ বলা হয়েছে 'কোন জিনিসের উপর স্থিতিশীল হওয়া।' আগের কালের ফিকাহবিদদের বহু কথা এই পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) আল-হাসান, আতা ও শা'বী থেকে এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে مُطِيْعِيْنَ 'অনুগত অবনত'। নাফে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ اَلْقُنُوْتُ طُوْلُ الْقِيَامِ 'দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা-ই কুনূত'। এরপর দলীল স্বরূপ তিনি পড়েছেন ঃ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ اللَّيْلِ 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা নামাযে দীর্ঘ সময় ধরে বিনয়াবনত হয়ে থাকে, সে কি ......? নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

أَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُولُ الْقُنُوتِ -

সর্বোত্তম নামায হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়ানো।

মুজাহিদ বলেছেন, الْقُنُوتُ নীরব নিঃশব্দ থাকা এবং অবনত অনুগত। القنوت -এর আসল অর্থ যখন কোন জিনিসের উপর দীর্ঘ সময় অবস্থিতি গ্রহণ, তখন স্থায়ী অনুগত ব্যক্তিকে قَانِت বলা খুবই যুক্তিযুক্ত। অনুরূপভাবে যে লোক নামাযে দাঁড়ানো, কুরআন পাঠ ও দো'আ দীর্ঘ করল, নিরবতা ও বিনয়কে লম্বা করল, তারা সকলে 'কুনূত' কাজ করল। নবী করীম (স) থেকে এ-ও বর্ণিত, তিনি একটি মাস কাল ধরে চুপচাপ থাকলেন ও স্থিতি সহকারে এক মাস ব্যাপী আরব গোত্রসমূহের একটি গোত্রকে ডাকতে থাকলেন। এর অর্থ, ডাককে সুদীর্ঘ করলেন।

হারিস শিবল, আবূ উমর, শায়বানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলের যামানায় নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। তখন নাযিল হল ঃ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র জন্যে দীর্ঘ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক।' রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে নামাযে চুপচাপ থাকতে আদেশ করলেন। এর অর্থ, নামাযে কথা বলা নিষেধ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেছেন ঃ নবী করীম (স) নামাযে থাকা অবস্থায় আমরা তাঁর প্রতি সালাম বলতাম। তখন তিনি সালামের জবাব দিতেন। হাবশায় হিজরত পর্যন্ত তা চলেছে। কিন্তু পরে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নামাযের সময় সালামকালে তিনি তার জবাব দিতেন না। আমি তাঁকে একথা বললে তিনি বললেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَضَى أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلٰوةِ -

আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন নতুন আদেশ দেন। তিনি ফরমান দিয়েছেন যে, তোমরা নামাযে কথা বলবে না।

আতা ইবনে ইয়াসার আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে (নামাযে থাকা অবস্থায়) সালাম দিলে তিনি ইশারায় তার জবাব দিলেন। পরে তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ

كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلٰوةِ فَنُهِينَا عَنْ ذٰلِكَ -

আমরা আগে নামাযে সালামের জবাব দিতাম। পরে আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইবরাহীম আল-হিজরী, ইবনে ইয়ায, আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সাহাবীরা নামাযে কথা বলতেন। তখন নাযিল হল ঃ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا -

যখন কুরআন পাঠ করা হবে, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শুনবে ও চুপ-চাপ হয়ে থাকবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ২০৪)

মুআবিয়াতা ইবনুল হিকাম আস্-সুলামী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ صَلٰوتَنَا هٰذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ -

আমাদের এই নামাযসমূহে মানবীয় কথাবার্তা মাত্রই শোভন নয়। নামায হচ্ছে তাসবীহ্— আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা, তাকবীর— আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ঘোষণা করা ও কুরআন পাঠের অনুষ্ঠান।

এই সব হাদীসেই নামাযে কথা বলতে নিষেধ হয়েছে। এ পর্যায়েও বর্ণনাকারিগণ বিভিন্নতা দেখান নি যে, শুরুতে নামাযে কথা বলা হতো পরে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। সব ফিকাহ্‌বিদই তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপার সম্পূর্ণ একমত। তবে ইমাম মালিক বলেছেন, নামায সংশোধনের জন্যে কথা বলা জায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলের কথা নামায নষ্ট করে না। হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ এ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য দেখতে পান নি। ভুল হিসেবে কথা বললেও তাতে নামায নষ্ট হয় বলে তাঁরা মত দিয়েছেন। নামাযের ভুল সংশোধনের জন্যে কথা বললেও তাতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তার প্রমাণ আমাদের উপরোদ্ধৃত আয়াত ঃ وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে নামাযে চুপচাপ বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও।' এছাড়া যে বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি নামাযে কথা বলতে নিষেধ করার উপলক্ষেই নাযিল হয়েছে। বর্ণনাটি আয়াতের শানে নুযুল পর্যায়ে না হলেও নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তা ভুলবশতই হোক বা ইচ্ছা করেই বলা হোক। তার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। রাসূলে করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে বর্ণিত সকল হাদীসেরই সেই একই কথা। তা হল নামাযে কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সকল নামায সম্পর্কেই এই কথা।

যদি বলা হয়, নামাযে নিষিদ্ধ শুধু ইচ্ছামূলকভাবে কথা বলা, ভুল করে বলা নিষিদ্ধ নয়। কেননা ভুলবশত কথা বলা বন্ধ করা সম্ভব নয়। জবাবে বলা যাবে, কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তা যেমন ভুল করে বলার উপর তেমনি ইচ্ছা করে বলার উপরও আরোপিত। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হতে পারে শুধু গুনাহের দিক দিয়ে— আযাব পাওয়ার যোগ্যতা হওয়ার দিক দিয়ে। কিন্তু নামায নষ্ট হওয়ার বিধানে এবং তা আবার পড়ার প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে উভয় অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্যই করা যায় না। কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে ভুলবশত কথা বললে যেমন নামায আবার পড়তে হবে, ইচ্ছা করে কথা বললেও তা করতে হবে। অতএব এ দিক দিয়ে দুটি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য হতে পারে না। নামাযে অযূ নষ্ট হওয়া, যৌনক্রিয়া করা ইচ্ছামূলক ভাবে হলে নামায নষ্ট হবে, পুনরায় তা পড়তে হবে। যদিও গুনাহ ও আযাব পাওয়ার যোগ্য হওয়ার দিক দিয়ে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অবস্থা যখন এই— যেমন বলেছি, তখন ভুলবশত কথা বললেও যেমন নামায আবার পড়তে হবে, ইচ্ছা করে বললেও আবার পড়তে হবে। কোন পার্থক্য নেই, গুনাহ ও আযাব পাওয়ার যোগ্যতার দিক দিয়ে পার্থক্য করা গেলেও।

এসব হাদীস থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, নামাযের ভুল সংশোধনের ইচ্ছায় কথা বললে নামায নষ্ট হবে না— এরূপ মত যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের মত ভুল। সে ইচ্ছা ও ইচ্ছা না হওয়ার মধ্যে এবং ভুলবশত ও ইচ্ছামূলকভাবে কথা বলার মধ্যে যাঁরা পার্থক্য করেছেন,

তাঁদের কথাও অযৌক্তিক। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ 'আমাদের এই নামাযে মানুষের কথা বলার কোন অবকাশ নেই' মুআবিয়া ইবনুল হিকাম বর্ণিত হাদীসে তা উদ্ধৃত হয়েছে। এটি একটি প্রকৃত হাদীস। তার অর্থ সুস্পষ্ট ও বাস্তব। এ থেকে এই কথাই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে যে, নামাযে কথা বলা যাবে না। নামাযে কথা বলার পরও যদি সে নামাযী থাকে, তাহলে বুঝতে হয় যে, নামাযে কথা বলা চলে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, যাতে মানুষের কথাবার্তা হবে, তা আর যা-ই হোক, তা নামায নয়। এই হাদীসটি সমস্ত হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান। আর একটি দিক হল, صلاح এর বিপরীত হচ্ছে فساد — প্রথমটির বিপরীত দ্বিতীয়টি। তাই নামাযে যখন কথাবার্তা صلاح পূর্ণ নয়, শোভন নয়— তাহলে তা ফাসাদপূর্ণ, সম্পূর্ণ অশোভন যদি নামাযে কথা হয়ে যায়। অন্যথায় বুঝতে হবে. নামাযে কথা বললে তাতে নামায বিনষ্ট হয় না। কিন্তু তা হাদীসের কথার স্পষ্ট বিপরীত।

আমাদের বিপরীত মতের দুই পক্ষই আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসকে দলীল বানিয়েছেন। দুই হাত-ওয়ালার কাহিনী প্রসঙ্গে সে হাদীসটি এসেছে, কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন ঃ নবী করীম (স) যুহ্‌র কিংবা আসর— বৈকালিক এই দুই নামাযের কোন একটি নামায আমাদের নিয়ে পড়লেন। পরে মসজিদের সম্মুখে রক্ষিত কাষ্ঠের পার্শ্বে দাঁড়ালেন। তর উপর তিনি তাঁর এক হাতের উপর অপর হাত রাখলেন। তখন তাঁর মুখাবয়বে ক্রোধ ফেটে উঠছিল, যা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তখন খুব দ্রুততা সহকারে তিনি বাইরে গেলেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি কি নামায 'কসর' করলেন ? লোকদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)। তখন তাঁরা দুজন তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পেলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল, তার হাত দুইখানি ছিল লম্বা। রাসূলে করীম (স) তাঁকে 'যুল-ইয়াদাইন' (দুই হাতওয়ালা) বলতেন। বললে— হে রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, না ইচ্ছা করেই কসর করেছেন ? জবাবে তিনি বললেন, না, আমি ভুলেও যাই নি, ইচ্ছা করে নামায কসরও করিনি। সেই লোকটি বললেন, আপনি ভুলে গেছেন। তখন নবী করীম (স) লোকদের সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, এই 'দুই হাতওয়ালা' ব্যক্তি কি সত্য বলেছে ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, তারপর তিনি ফিরে এসে অবশিষ্ট দুই রাক'আত নামায পড়লেন। সালাম ফেরাবার পর সহু দুটি সিজদা দিলেন। .... এর পর আবূ হুরায়রা (রা) এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে কথা বলার ব্যাপারটিও আছে ....।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদুল কাতান বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ কায়স ইবনে আবূ হাযিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। বললাম, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন। বললেন, আমি রাসূলে করীম (স)-এর সহবতে তিন বছর ছিলাম। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখন নবী করীম (স) খায়বর জয় করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রার ইসলাম কবুল করার পরে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল। আর জানা-ই আছে যে, কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপার মক্কাতে ঘটেছিল, কেননা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হাবশা থেকে ফিরে এসে জানলেন, নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি তাঁকে নামাযে থাকা অবস্থায় সালাম করেছিলেন, তিনি তার জবাব দেননি। তাঁকে জানিয়েছেন যে, নামাযে কথা বলার রীতি মনসূখ হয়ে গেছে। এ থেকে স্পষ্ট হল যে, 'দুই-হাতওয়ালা' সংক্রান্ত ঘটনাটি নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পরে সঙ্ঘটিত হয়েছে।

ইমাম মালিকের সঙ্গী-সাথীগণ বলেছেন, কথা বললে নামায নষ্ট হবে না, যদি কথা নামায সংশোধনের জন্যে বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলবশত নামাযে কথা বলে ফেললে তাতে নামায নষ্ট হবে না। এদের জবাবে বলা যায়, দুই হাতওয়ালা সংক্রান্ত ঘটনা যদি নামাযে কথা নিষিদ্ধ হওয়ার পরে হয়ে থাকে, তাহলে নামাযে কথা বলা মুবাহ প্রমাণিত হয়। নিষেধকে মনসূখ করে দিয়েছে সে ঘটনা। কেননা তাতে জানানো হয়নি যে, নিষেধ কোন বিশেষ সময়ে, আবার কোন সময়ে নিষেধ নয়। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাতা আবূ হাযিম, সহল ইবনে সাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ نَابَهُ فِيْ صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ -

নামাযে কারোর কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে যেন 'সুবহান-আল্লাহ্' বলে।

আর মেয়েরা হাত মেরে শব্দ করবে, আর এই সুবহান-আল্লাহ বলা পুরুষদের জন্যে ব্যবস্থা।

সুফিয়ান জুহরী আবূ সালমাতা, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ -

এতে নবী করীম (স) নামাযে কারোর কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তাকে 'সুবহান আল্লাহ' বলার আদেশ করেছেন। কিন্তু দুই হাতওয়ালার ঘটনায় কাউকে 'সুবহান-আল্লাহ' বলতে দেখা যায়নি, তা না বলার দরুন নবী করীম (স) দোষ ধরেছেন বলেও উল্লেখ পাওয়া যায় না। বোঝা গেল দুই-হাতওয়ালার ঘটনা ছিল লোকদেরকে তাসবীহ্ বলার কথা জানানোর আগের। কেননা লোকদেরকে তাসবীহ্ বলার কথা শিক্ষা দেয়া হবে, পরে তা তারা বলবে না, তার বিরুদ্ধতা করবে, তা তো কল্পনাও করা যায় না। তাসবীহ্ বলতে আদেশ করার পর তাঁরা যদি এরূপ অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধতা করে থাকেন, তাহলে সে জন্যে রাসূলের পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ এবং সেজন্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশিত হওয়া ছিল একান্তই অপরিহার্য। কেননা তা হলে তো স্পষ্ট আদেশ অমান্য করা হয় ও নিষিদ্ধ কাজ করার দোষে সকলকেই দোষী হতে হয়। তাই বলতে হবে, এতে দলীল রয়েছে এই কথার যে, 'দুই হাতওয়ালার' ঘটনার দুটি দিক— হয় তা নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা অথবা নামাযে কথা বলা প্রথমত নিষিদ্ধ হয়েছে বলে, পরে তা মুবাহ্ করা হয়, পরে পুরুষদেরকে তাসবীহ ও মেয়েদেরকে হাতের শব্দ করার আদেশ দ্বারা তা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে নামাযে কথা বলা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে মদীনায় হিজরতের পর। এতে কোন সন্দেহ হলেই তা প্রমাণিত হয় মা'মর, জুহরী, আবূ সালমাতা ইবনে আবদুর রহমান, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (স) যুহর কিংবা আসরের নামায পড়লেন .... যেমন পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

জুহরী বলেছেন, এই ঘটনা বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল। পরে বিষয়টি সুদৃঢ় হয়ে যায়। জায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেছেন, আমরা নামাযে কথাবার্তা বলতাম। পরে 'তোমরা আল্লাহ্র জন্যে চুপচাপ বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও' আয়াতটি নাযিল হয়। এতে আমরা নামাযে চুপচাপ থাকতে আদিষ্ট হই। আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) বলেছেন, নবী করীম (স) নামাযে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করে। তিনি ইশারায় তার জবাব দেন। বললেন, আমরা আগে

নামাযের মধ্যে করা সালামের জবাব দিতাম, কিন্তু পরে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) ছিলেন রাসূলে করীম (স)-এর অল্প বয়সের সাহাবীগণের একজন। হিশাম-তাঁর পিতা-হযরত আয়েশা সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনা দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আবূ সাঈদুল খুদরী ও আনাস ইবনে মালিক রাসূলের হাদীস খুব বেশি জানতে পারেন নি। কেননা তাঁরা দুজন ছোট বয়সের বালক ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হাবশা থেকে মদীনায় নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

জুহরী সাঈদুবনুল মুসাইয়্যিব, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান উরওয়াতা ইবনুয যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তাঁর সঙ্গীগণ হাবশায় ছিলেন। তাঁরা পরে মদীনায় এসে নবী করীম (স)-এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। জীবনেতিহাস রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যখন বদর যুদ্ধে আবূ জহলকে হত্যা করেছিলেন, আফরার দুই পুত্র যখন তাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। অবস্থা যখন এই, তখন বোঝা গেল, তিনি হাবশা থেকে মদীনায় উপস্থিত হয়ে নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন। আর এই সময়ই নবী করীম (স) বদর যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে অহব, আবদুল্লাহ ইবনুল উমরী-নাফে-ইবনে উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুই হাতওয়ালা সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) ইসলাম কবুল করেছিলেন 'দুই হাতওয়ালা'র শাহাদত লাভের পর। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরায়রা (রা) যা বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বের ঘটনা। কেননা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন খায়বর জয়ের বছর। প্রমাণিত হল যে, আবূ হুরায়রা নিজে সেই ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন না। যদিও তিনি এ বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। যেমন বরা-ইবনে আজিব বলেছেন ঃ

مَاكُلُّ مَانُحَدِّ ثُكُمْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنَاهُ، وَلٰكِنَّا سَمِعْنَا -

আমরা রাসূলে করীম (স) থেকে যা-ই বর্ণনা করি, তার সবটাই যে স্বয়ং রাসূলের মুখে আমরা শুনেছি, তা নয়। তবে তা আমরা শুনেছি নিশ্চয়ই।

আমাদের হাদীসবিদগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে সালামাতা হুমায়দ আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّ ثُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَايَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا -

আল্লাহ্র নামে শপথ। আমরা রাসূলে করীম (স) থেকে যা কিছুই তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, তার সবটাই আমরা সরাসরি তাঁর নিকট থেকে শুনিনি বরং আমাদের সাহাবীগণের পরস্পর পরস্পরের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। আর আমরা একে অপর মিথ্যা বলার দোষে অভিযুক্ত করতাম না।

ইবনে যুরায়জ আমর-ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাদাতা, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ

لَاوَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ مَا اَنَا قُلْتُ مَنْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَفْطِرْ وَلٰكِنْ مُحَمَّدٌ قَالَهُ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ -

না, এই কাবা ঘরের রব্ব-এর কসম, আমি বলছি না যে, যে লোকের না-পাক অবস্থায় সকাল হয়ে যাবে, সে যেন রোযা না রাখে, বরং মুহাম্মাদ (স)-ই এ কথা বলেছেন, এই ঘরের রব্ব-এর কসম।

পরে তাঁকে হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমাতা (রা)-এর এই বর্ণনার কথা জানানো হয় ঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ -

নবী করীম (স) স্বপ্ন ছাড়া অন্য কারণে নাপাক শরীরে সকাল হলে সেই দিনের রোযা রাখতেন।

এ কথা জানার পর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ 'এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। আমি যে কথা বলেছি, তা আমাকে ফযল ইবনুল আব্বাস জানিয়েছেন।

বোঝা গেল, তিনি 'দুই হাতওয়ালা'র যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব শ্রবণ ও অবহিতি নয়।

যদি বলা হয়, তাঁর বর্ণিত কোন কোন হাসীসে এই ভাষা রয়েছে ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন। তা কি করে বললেন ?

জবাবে বলা যাবে, তার কথার মর্মার্থ এ হওয়া সম্ভব যে, রাসূলে করীম (স) মুসলমানদের নিয়ে নামায পড়েছেন। তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। যেমন মুসয়িব ইবনে কুদাম আবদুল মালিক ইবনে মায়সারাতা, নাজাল ইবনে সাবুরাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে বললেন ঃ 'আমি ও তোমরা বনূ আবদে মনাফকে দাওয়াত দিচ্ছিলাম। আজকে তোমরা হচ্ছ বনূ আবদুল্লাহ আর আমরাও বনূ আবদুল্লাহ।

এর অর্থ, তিনি এ কথা তাঁর নিজের বংশের লোকদেরকে বলেছিলেন। যদি বলা হয়, নামাযে কথা বলা যদি বদর যুদ্ধের পূর্বেই নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তখন জায়দ ইবনে আরকাম নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কেননা তিনি তখন ছিলেন খুব অল্প বয়স্ক। তিনি ইয়াতীম ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হচ্ছিলেন, যখন তিনি মূতা'র যুদ্ধে রওয়ানা হচ্ছিলেন। এই রকম অবস্থায় বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটিত ঘটনায় তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন না।

জবাবে বলা যাবে, জায়দ ইবনে আরকাম যদি নামাযে কথা বলা মুবাহ দেখতে পেয়ে থাকেন, তা হতে পারে, নিষেধের পর তা মুবাহ করা হয়েছিল। পরে তা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাহলে তাঁর সর্বশেষ ব্যাপার তো নিষিদ্ধই হল। আর এটাও অসম্ভব নয় যে, আবূ

হুরায়রা (রা)-ও নামাযে কথা বলা মুবাহ্ দেখতে পেয়েছেন নিষেধের পরে যা করা হয়েছিল। তারপরে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে একথা ঠিক যে, দুই হাতওয়ালার যে কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর প্রত্যক্ষ পর্যাবেক্ষণ থেকে নয়। কেননা তিনি ইসলাম কবুল করেছেন তার পরে। সম্ভবত জায়দ ইবনে আরকাম নামাযে মুসলমানদের কথা বলাকালীন অবস্থা থেকে 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে চুপচাপ্ বিনয়ী হয়ে দাঁড়িয়ে যাও' হুকুমটি নাযিল হওয়া পর্যন্ত তাঁকে জানিয়েছেন। আর তাঁর কথা ঃ আমরা নামাযে কথা বলতাম' কথা বলে তিনি মুসলমানদের সম্পর্কেই বর্ণনা দিয়েছেন। তিনিও তাঁদেরই একজন। যেমন নজাল ইবনে সাবুরাতা পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনায় বলেছেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে বলেছিলেন এবং যেমন আল-হাসান বলেছেন ঃ 'ইবনে আব্বাস বসরায় আমাদেরকে ভাষণ দিয়েছেন। অথচ তিনি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সে কথা পরে তিনি জানতে পেরেছেন মাত্র।

দুই হাতওয়ালা সংক্রান্ত ঘটনা ছিল নামাযে কথা বলা মুবাহ্ থাকার সময়ের। তার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাতে উল্লিখিত হয়েছে, নবী করীম (স) মসজিদে রক্ষিত কাষ্ঠের কাণ্ডের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। লোকদের দ্রুততা সহকারে বের হওয়ার পর তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, নামায 'কসর' করেছেন? তখন নবী করীম (স) লোকদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, তখন তিনি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। লোকেরা বললেন, দুই হাতওয়ালা ঠিকই বলেছেন। এই কথাবার্তার কিছু অংশ ছিল ইচ্ছামূলক। এর একটা অংশ নামায সংশোধনের উদ্দেশ্যে ছিল না। বোঝা গেল, এই ব্যাপার ঘটেছিল নামাযে কথা বলা মুবাহ্ থাকার সময়ে। এর গোটা ঘটনাই নামাযে কথা বলা মুবাহ্ থাকার প্রাথমিক অবস্থার হয়ে থাকে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার আগের, তাহলে বিপরীত মতের কোন সমর্থন তাতে নেই, তা তাদের দলীল হতে পারে না। আর যদি তা নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া পরের হয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার পর আবার তা মুবাহ্ করা হয়েছিল। পরে আবার নিষিদ্ধ হয়েছে। ফলে শেষ ঘটনা হল, কথা বলা নিষিদ্ধ। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে যা আছে, তা মনসূখ হয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, রাসূলের কথা ঃ 'পুরুষের জন্যে তাসবীহ্ ও মেয়েদের জন্যে হাতের শব্দ' আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের পরের ব্যাপার। কেননা তা যদি তার আগের ব্যাপার হতো, তাহলে রাসূলের আদেশের বিপরীত কাজ দেখে তিনি অবশ্যই প্রতিবাদ করতেন। আর জনগণও সে আদেশের বিরোধিতা নিশ্চয়ই করতেন না। কেননা তাঁরা তো জেনে গেছেন যে, নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ, তার পরিবর্তে সুবহান-আল্লাহ্ বলতে হবে।

তাতে প্রমাণিত হল যে, নামাযে প্রয়োজন হলে সুবহান-আল্লাহ্ বলার এ আদেশ মনসূখ করেছে কথা বলা দ্বিতীয়বারে নিষিদ্ধ হওয়াকে। কাজেই আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে যা আছে, তা ব্যবহারে ভিন্নতর কথা। তাই নিষেধ সম্পর্কে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা-ই সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী হবে। কেননা এ ব্যাপারে মৌল নীতি হচ্ছে একটি বিষয়ে যদি দুটি হাদীস আসে, তার একটা খাস'— বিশেষ, আর অপরটি 'আম'— সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞরা 'আম'কেই ব্যবহার করতে একমত হন, আর 'খাস' বিশেষকে ব্যবহার থাকে বিভিন্ন মত, তাহলে সর্বসম্মত হাদীসটি মতভেদপূর্ণ হাদীসটির উপর বিচারক হবে।

যদি বলা হয়, ভুলক্রমের কাজ ও ইচ্ছাপূর্বক কাজের মধ্যে তোমরা পার্থক্য করেছ, তাহলে তোমরা ভুলক্রমে কথা বলা ও ইচ্ছাপূর্বক কথা বলার মধ্যে পার্থক্য করবে না কেন?

জবাবে বলা যাবে, এ একটা অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন প্রশ্ন। এর কোন জবাব দেয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে দুটি বিষয়ের একটি যে অন্যটির দলীল, তার কারণটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও আমাদের মতে ভুল করে কিছু করা ও নামায নষ্ট করার ইচ্ছা করে কিছু করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা দুটিতেই কাজটা তো ঘটে যায়। পার্থক্য হতে পারে কাজ করার পূর্বাবস্থা ও কাজ না করার অবস্থার মধ্যে। তাই যদি কেউ ভুল করে যখমের স্থান ঘষে দেয় ও তা থেকে রক্ত বের হয় কিংবা বমি করে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। ভুল করে করলেও নামায নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা নেই।

যদি বলা হয়, ভুলকারীর সালাম ও ইচ্ছাকারী সালামের মধ্যেও তোমরা পার্থক্য কর। তাও নামাযে কথা বলার শামিল। তাহলে নামাযে সর্বপ্রকারের কথা বলা এ রকমেরই হবে।

জবাবে বলা যাবে, সালামও এক প্রকারের যিকির। তা বলে নামায শেষ করা সুন্নাতের বিধান। তাই কেউ যদি ইচ্ছা করে নামায শেষ হওয়ার আগেই সালাম দেয় তাহলে তাতে নামায নষ্ট হবে। যেমন নামাযের শেষে সালাম করে নামায থেকে বের হতে হয়। যদি সে ভুলকারী হয়, তাহলে তাকে যিকিরকারীর যিকির মনে করতে হবে। তাতে নামায শেষ করে বের হওয়া হবে না। সালাম যিকির এইজন্যে যে, তা ফেরেশতাদের প্রতি এবং উপস্থিত মুসল্লীদের প্রতি। তাতে যদি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ জিবরাঈল, মীকাইল কিংবা আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি সালাম বলা হয়, তাহলে তাতে নামায নষ্ট হবে না। তা যখন এক ধরনের যিকির-আযকার, তখন তাহলে নামায থেকে বের হওয়ার কাজটাও হবে না। তবে ইচ্ছা করে যদি তা বলে, তা হলে ভিন্ন কথা। এ রকম ব্যাপার নামাযে তো আছে-ই, তাই তা নামায নষ্ট করবে না। যেমন আত্ তাহাইয়াতে বলা হয় ঃ 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া-আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন' তো পড়াই হয়। এভাবে নামাযে বহু মসনূন যিকির রয়েছেই। তা তো নামাযকে নষ্ট করে না যদি তা ভুলবশতও করা হয়। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, আমাদের এই নামাযে লোকদের কথাবার্তার কোন স্থান বা অবকাশ নেই, তা শোভন নয়। নামাযে যে কথাবার্তা মুবাহ করা হয়েছে, তা নামাযের মধ্যের জিনিস নয়। তা হলে তদ্দারা নামায নষ্ট হবে না। হাদীসেও তার কথা বলা হয়নি। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা করে কোন কথা বলা হয়, তাহলে তাতে নামায নষ্ট হবে। তবে তা এ হিসেবে নয় যে, তা নামাযে নিষিদ্ধ লোকদের কথা। বরং তা এ হিসেবে যে, নামায শেষ করে বের হওয়ার জন্যে তা মসনূন নিয়ম, তবে যদি ইচ্ছা করে তা বলে, তা হলে সে জন্যে মসনূন দিকটিরই ইচ্ছা করেছে। ফলে তাতে তার নামায ভেঙ্গে যাবে।

উপরন্তু শরীয়াতসম্মত নামাযের শর্ত হচ্ছে, নামাযে কথা না বলা। তাই তাতে ইচ্ছা করে কথা বললে কারো মতেই সে নামায হবে না, যদি নামায সংশোধন করার কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা না থাকে, তাহলে তাতে কথা বলা হলে তা নামায থেকে বের করার কাজটা করে দেবে শরীয়াতসম্মত নামায হওয়ার দিক দিয়ে। যেমন তাহারাত। তা নামাযের শর্ত। তাই ভুলবশত তাহারাত ত্যাগ করা হোক কি ইচ্ছা করে ত্যাগ করা হোক, তার হুকুমটা ভিন্নতর কিছু হবে না। অথবা যেমন কুরআন পাঠ, রুকূ, সিজদা অন্যান্য যাবতীয় ফরয কাজ ইত্যাদি ভুল করে না করা বা ইচ্ছা করে না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা নামায বা সালাত একটা শরীয়াতসম্মত কাজের নাম। এই নামের সঠিকথা কতিপয় শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। সে শর্তসমূহ

পূর্ণ না হলে তাকে সেই নামে অভিহিত করা যাবে না। নামাযে কথা না-বলাও একটা শর্ত। তাই নামাযে কথা বলা হলেই তার শরীয়াতী নাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন সে কাজটা আর যা-ই হোক, নামায নামে অভিহিত হতে পারবে না। অতএব নামাযে কথা বলাকে আমরা জায়েয মনে করি না। বিপরীত মতের লোকেরা যদি আমাদের উপর এই অভিযোগ তোলে যে, সিয়ামের শর্ত হচ্ছে পানাহার ত্যাগ করা, শরীয়াতসম্মত নাম তারই সাথে সম্পর্কিত, পরে তাতে ভুল করে খাওয়া, পান করা ও ইচ্ছা করে খাওয়া-পান করার মধ্যে তো পার্থক্য করা হয়। তাহলে নামাযে কথা বলার ক্ষেত্রে সেরূপ পার্থক্য করা হবে না কেন ? তাহলে আমরা বলব, এ দুটি অভিন্ন ধারণার কিয়াস তো ঠিক। এ কারণে হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যদি স্পষ্ট হাদীস না থাকত, তাহলে ভুল করে খাওয়া ও ইচ্ছা করে খাওয়ার মাঝে সত্যই কোন পার্থক্য করা যেত না। আর কিয়াস ছেড়ে দিলে আসল ইল্লাতটা স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায় এবং তা সহীহ হয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْرُكْبَانًا -

কিন্তু তোমরা যদি ভয় পাও, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় কিংবা সওয়ার থাকা অবস্থায় (নামায পড়বে)।

আল্লাহ সম্বোধনের সূচনায় নামাযের আদেশ করেছেন ও তার সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তা প্রমাণ করে যে, নামায পূর্ণ করা, তার ফরযসমূহ যথাযথ আদায় করা বাধ্যতামূলক। নামাযের সীমাসমূহ পুরামাত্রায় রক্ষা করা কর্তব্য। কেননা যে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এটাই তার দাবি। তার পরে 'সালাতুল উস্তা' মধ্যম নামাযের তাগিদ করা হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। সে জন্যে আলাদা তাগিদ করার ফায়দাটা কি তা আমরা পূর্বেই বলেছি। তার পরে তার সাথে সংযোজন করা হয়েছে 'এবং তোমরা আল্লাহ্র জন্যে নীরব বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াও' কথাটি। এর মধ্যেই রয়েছে চুপচাপ থাকা ও নম্র বিনীত হয়ে থাকার আদেশ। চলাচল করতে নিষেধ ও অন্য কাজ করার নিষেধও এর মধ্যে শামিল। এসব হুকুম শান্তিপূর্ণ ও নিশ্চিন্ততার অবস্থায় পালনীয়। এর পরই সংযোজিত হয়েছে ভয়-ভীতিকালীন অবস্থা সংক্রান্ত আদেশ। এসব অবস্থায়ই নামায আদায় করার আদেশ অবশ্য পালনীয়। ভয়-ভীতির দরুন নামায তরক করার কোন রুখসত দেয়া হয়নি। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা যদি ভয় পাও, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা সওয়ার থাকা অবস্থায় নামায পড়বে।' আল্লাহ্র কথা فَرِجَالاً বহু বচনে, এক বচনে رَاجِلٌ। এ দুটোরই ব্যবহার আছে— যেমন বলা হয় ঃ - قَائِم - قِيَام - تَاجِرٌ - وَتِجَارٌ صَاحِبٌ - صِحَابٌ ভয় কালে নামায পড়তে বলা হয়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রুকূ-সিজদা ত্যাগ করায় কোন আযাব হবে না। যেমন রোগীকে দাঁড়িয়ে, বসে বা শয়নে যে কোন অবস্থায় নামায পড়তে বলা হয়েছে, এমন কি জন্তুযানে সওয়ার থাকা অবস্থায়ও নামায পড়ার আদেশ আছে। তা ভয়ের কারণে। ইশরায় নামায পড়াও মুবাহ। আরোহী অবস্থায় নামায ইশারা-ইঙ্গিতেই পড়া যেতে পারে। তাতে দাঁড়ানো ও রুকূ-সিজদা করা কঠিন। ইবন উমর (রা) থেকে ভয়কালীন নামাযের রীতি বর্ণিত হয়েছে। ভয় যদি আরও বেশি হয়, তাহলে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে। সওয়ার হওয়া অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া সম্ভব বা অসম্ভব হলেও নামায পড়তে

হবে। নাফে বলেছেন, ইবনে উমর (রা) উক্ত কথা রাসূল (স) থেকেই বর্ণনা করেছেন বলে মনে করি।

আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধাবস্থা ছাড়া নিছক ভয়কালীন অবস্থায় ওভাবে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। যদি ভয়কালীন অবস্থা হয় ও শত্রুকর্তৃক পরিবেশিষ্টত হয়, তাহলে সেভাবে নামায পড়া সম্পূর্ণ জায়েয। আর ভয়ের কারণে সওয়ার থাকা অবস্থায় ওভাবে নামায পড়া যখন মুবাহ করা হল, তখন কিবলামুখী হতে পারল কি পারল না, তার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাতে কিবলামুখী হয়েও নামায পড়া জায়েয প্রমাণিত হল। কেননা আল্লাহ্ সর্বাবস্থায়ই নামায পড়ার আদেশ করেছেন। কার পক্ষে কিবলামুখী নামায পড়া সম্ভব, আর কার পক্ষে তা সম্ভব নয়, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। তাই যার পক্ষে কিবলামুখী হওয়া সম্ভব নয়, তার জন্যেও সেই অবস্থায়ই— যে অবস্থায় সে পারে— নামাযে পড়তে হবে বলে আদেশ করেছেন। অন্যদিক দিয়ে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, নামাযে নামাযে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা নামাযের ফরয হলেও দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় নামায পড়াকালে তা তরক করাও মুবাহ। আর কিবলামুখী না হওয়া আরও অধিকভাবে জায়েয। কেননা কিবলামুখী হওয়ার চাইতেও অধিক পূর্ণ কাজ হচ্ছে রুকূ সিজদা করা। তাই সেই রুকূ-সিজদা তরক করাও যখন জায়েয, তখন কিবলামূখী হতে না পারলে তা ছাড়াই নামায পড়া অধিক মাত্রায় জায়েয হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

যদি বলা হয়, বলা হয়েছে, আল্লাহ কোন অবস্থায়ই নামায পড়া ত্যাগ করার অনুমতি দেননি, বরং সর্বাবস্থায়ই নামায পড়ার আদেশ করেছেন। অথচ নবী করীম (স) খন্দকের যুদ্ধের দিন চার ওয়াক্তের নামায ত্যাগ করেছেন। এমনকি রাত হয়ে গেলে বিন্যাস অনুযায়ী চার ওয়াক্তের নামায কাযা করেছিলেন। তাতে ভয়কালে নামায তরক করার দলীল রয়েছে।

জবাবে বলা যাবে, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, ভয়কালে নামায পড়ার আদেশ। এর পূর্বে তার ফরযসমূহের উপর তাগিদ করা হয়েছে। কেননা তার উপর সংযোজিত হয়েছে 'তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামায।' তার পরে তার তাগিদ বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্যে নীরব-অবনত হয়ে দাঁড়াও।' এতে চিরন্তন বিনয়নম্রতা স্থিতি ও কিয়াম রক্ষা করার আদেশ হয়েছে। তাতে এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে নড়াচড়া করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তবে নামাযের মধ্যের রুকূ-সিজদা করার জন্যে তা করার অনুমতি আছে। যদি শুধু তা-ই করে, তাহলে তা জায়েয হবে। যেন ধারণাকারী এই ধারণা করতে পারে যে, এভাবেও নামায পড়া যেতে পারে। এরপর ভয়কালে ফরয নামায আদায় কারার হুকুমস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ 'যদি তোমরা ভয় পাও, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকা বা আরোহী হওয়া অবস্থায় এভাবে নামায পড়বে।' শরীয়াত পালনে বাধ্য কোন লোকই তা তরক করতে ওযর পেশ করে নি। যুদ্ধের অবস্থায় কি করা হবে, তা কিন্তু এখানে বলা হয়নি। কেননা ভয়ের সব অবস্থাই যুদ্ধকালীন অবস্থা নয়। শত্রুদের উপস্থিতিও ভয়ের কারণ বটে, যদিও তা যুদ্ধাবস্থা নয়। কাজেই আলোচ্য আদেশ কেবলমাত্র এ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা যুদ্ধচলাকালীন আদেশ নয়। আর নবী করীম (স) খন্দকের যুদ্ধের দিন নামায পড়েন নি, কেননা তিনি এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুদ্ধকাজে এতই ব্যস্ত হয়েছিলেন যে, নামায পড়ার সুযোগই হয়নি। যুদ্ধাবস্থা মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে, তা সর্বজনস্বীকৃত। এই কারণেই তো নবী করীম

(স) অসন্তুষ্ট হয়ে বদদো'আ করে বলেছিলেন ঃ 'কাফিররা আমাদেরকে সর্বোত্তম নামায পড়তে দেয়নি, তাই তুমি ওদের কবর ও ঘর-বাড়ি আগুনে ভরে দাও।'

হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ তাই বলেছেন, যুদ্ধাবস্থা নামাযকে নষ্ট করে।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) যে খন্দকের দিন নামায পড়লেন, তুমি তা অস্বীকার করতে পারনি। কেননা তখনও ভয়কালীন নামাযের আয়াত নাযিল হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও আল-ওয়াকিদী সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, 'যাতুর রিকা' যুদ্ধটি খন্দকের যুদ্ধের আগে সঙ্ঘটিত হয়েছিল। নবী করীম (স) সেই যুদ্ধকালে ভয়কালীন অবস্থায় নামায পড়েছিলেন। তা থেকে বোঝা গেল যে, নবী করীম (স) ভয়ের নামাযও ত্যাগ করেছিলেন খন্দকের দিন কেবল যুদ্ধের জন্যে। কেননা যুদ্ধ নামাযের সঠিকতাকে নষ্ট করে। তা নামায পরিপন্থী অবস্থা। আলোচ্য আয়াতকে দলীল বানিয়েছে তারা, যারা বলে যে, ভীত ব্যক্তির পক্ষেও নামায পড়া জায়েয— চলতে থাকা অবস্থায়ও, সে যদি কিছুর সন্ধানী হয়, তা হলেও। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা ভীত হও, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় বা সওয়ার হয়ে থাকা অবস্থায়।' এটা সে অবস্থা নয়। কেননা তাতে চলাচল করার উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও সন্ধানকারী ভীত নয়। কেননা সে যখন ফিরে আসবে, তখন সে ভয় তার থাকবে না। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা জায়েয কারেছেন ভয় পাওয়া লোকের জন্যে। যখন সে অন্য কারোর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত হবে, তখন সওয়ার হয়ে থাকা বা চলতে থাকা অবস্থায় নামায পড়া তার জন্যে জায়েয হবে।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা যখন ভয়মুক্ত হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকির করবে— নামায পড়বে— ঠিক যেমন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তা তোমরা আগে জানতে না।

আল্লাহ যখন ভয়ের অবস্থা সংক্রান্ত কথা বলে দিলেন এবং দাঁড়িয়ে বা আরোহী যে অবস্থায়ই সম্ভব নামায পড়ার আদেশ করলেন, এরপর যোগ করলেন শান্তিকালীন অবস্থা সংক্রান্ত হুকুম। বললেন ঃ 'যখন তোমরা ভয়মুক্ত হবে, তখন আল্লাহ্র যিকির কর .... 'এ থেকে প্রমাণিত হল যে, পূর্বে ভয়কালীন অবস্থায় যে হুকুম দেয়া হয়েছে, তা নামায পড়া সংক্রান্ত হুকুম। এ থেকে নামাযে যিকির ফরয প্রমাণিত হল। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল্লাহ্র এ কথা ঃ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا -

অতএব তোমরা আল্লাহ্র যিকির কর দাঁড়িয়ে থেকে ও বসা অবস্থায়।

এ কথাটিও তা দৃষ্টান্ত ঃ

وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى -

এবং তার রব্ব-এর নাম স্মরণ করেছে। অতঃপর নামায পড়েছে।

এ কথাটিও ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا -

এবং ফজরের কুরআন পাঠ। ফজরের কুরআন পাঠে নিশ্চয়ই ফেরেশতাদের পর্যবেক্ষিত।
(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৭৮)

এসব কথাবার্তা আল্লাহ্‌র একথা থেকে সূচিত ঃ 'তোমরা সকলে নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর এবং বিশেষভাবে মধ্যম নামায।' এতে নামায কার্যটি সম্পাদনের আদেশ করা হয়েছে। তার ফরযসমূহ পুরাপুরিভাবে আদায় করতে বলেছে। তার শর্তসমূহ আদায় করতে বলেছেন, তার সীমাসমূহ রক্ষা করতে বলেছে আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা সকলে নীরব বিনয়ী হয়ে আল্লাহ্‌র জন্যে দাঁড়াও' আদেশ থেকে নামাযে কিয়াম ফরয করা হয়েছে। আর 'কুনূত' বলতে আনুগত্যও বোঝায়। কাজেই নামাযের সব কাজেই আনুগত্যমূলক হতে হবে। কোন কিছুই যেন তাতে বিঘ্নের সৃষ্টি করতে না পারে। কেননা 'কুনূত' হচ্ছে কোন কিছুর উপর স্থির ও স্থায়ী হয়ে থাকা। অতএব নামাযে কথা বলাও এর দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। চলাচল করা, শুয়ে পড়া, পানাহার করা আর যেসব কাজ আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ আনুগত্যের মধ্যে আসে না, তা সবই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কেননা ব্যবহৃত শব্দ এসব কথাই শামিল করে এবং যা যা আনুগত্যমূলক নয়, তা সবই নিষেধ করে। নামায সম্পর্কিত সব করতে বলে এবং নামায থেকে মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয় যে যে কাজে, তা করতে নিষেধ করে। কেননা তাতে 'কুনূত' বিনষ্ট হয়ে যায়। সব সময় নম্র বিনয়ী ও চুপচাপ স্থিতির দাবি করে। মূল আয়াতে শব্দ কম হলেও নামাযের যাবতীয় কাজকে সুষ্ঠুরূপে করার আদেশ এবং বিপরীতধর্মী সব কাজের নিষেধ এতে রয়েছে। যিকিরসমূহ, সুন্নাতসমূহ সবই আদায় করতে হবে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য নয়— এমন সব কাজ করতে নিষেধ— এরই অন্তর্ভুক্ত।

মহামারী থেকে পলায়ন

আল্লাহ বলেছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ -

তুমি কি বিবেচনা করে দেখেছ সেই লোকদের অবস্থা, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি-এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর ভয়ে— সংখ্যায় তারা কয়েক হাজার ছিল ? পরে আল্লাহ তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা মর' অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তারা ছিল চার হাজার। তারা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা রক্ষা পায়নি, সকলেই মরে গিয়েছিল। এ সময় তাদের নিকট আল্লাহ্‌র একজন নবী পৌছে গিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর দো'আ কবুল করে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

আল-হাসান থেকেও বর্ণনা এসেছে, তারা মহামারী থেকে বাঁচবার জন্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ইকরামা বলেছেন, তারা যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিল।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, মহামারী থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র পছন্দ হয়নি। কথাটি আল্লাহ্ এভাবেও বলেছেন ঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِى بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ -

মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে তোমরা যেখানেই থাক না কেন, এমনকি যদি সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাকারের অন্তরালেও অবস্থান নাও তবুও। (সূরা নিসা ঃ ৭৮)

এভাবেও বলেছেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ -

বল, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, তা তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। (সূরা জুম'আ ঃ ৮)

এ-ও আল্লাহ্র কথা ঃ

قُلْ لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِالْقَتْلِ -

বল, তোমরা যদি মৃত্যু কিংবা হত্যা থেকে পালিয়েও বেড়াও তবু তোমাদের এ পলায়ন তোমাদেরকে কোন ফায়দা— কোন কল্যাণ দেবে না। (সূরা আহ্যাব ঃ ১৬)

তিনিই বলেছেন ঃ

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -

যখন তাদের নির্দিষ্ট মৃত্যুক্ষণ এসে যাবে, তখন এক মিনিট আগেও আসবে না, এক মিনিট পরেও না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৪)

মৃত্যুক্ষণসমূহ সুনির্দিষ্ট। সময় বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। তাতে অগ্রবর্তীকথাও হতে পারে না, হতে পারে না পরবর্তীকথাও। এটা আল্লাহ্ নির্ধারণ— তার এদিক-ওদিক হওয়া সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে বলতে হয়, মহামারী ইত্যাদি থেকে পালিয়ে যাওয়া আল্লাহ্র নির্ধারণ থেকে বাঁচতে চাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। বদফাল গ্রহণ, পাখি তাড়ানো বা রাশিফলের সন্ধান এসব কিছুই আল্লাহ্র নির্ধারণ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তা আদৌ সম্ভব নয়, তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ এক অসম্ভব ব্যাপার।

আমর ইবনে জাবির আল-হাজরমী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُوْنِ كَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فِيْهِ كَالصَّابِرِ فِى الزَّحْفِ -

মহামারী থেকে পলায়ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের মতই ব্যাপার। পক্ষান্তরে তাতে যে ধৈর্য ধরে অবিচল থাকবে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকার মতই।

ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاعَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَاِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِىْ شَىْءٍ فَهِىَ فِى الْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَالدَّارِ، وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِاَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوْا عَلَيْهِ، وَاِذَا كَانَ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا عَنْهُ -

সংক্রামকথা নেই, বদফালিও নেই। বদফালি বলতে যদি কিছু থাকতই, তা হলে তা হতো ঘোড়ায়, নারীতে, ঘর-বাড়িতে। তোমরা যখন কোন স্থানে মহামারীর খবর পাবে যেখানে তোমরা নেই, তাহলে তোমরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে না। আর যদি মহামারী হয় যেখানে তুমি রয়েছ, তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে চলে যাবে না।

উসামাতা ইবনে জায়দ (রা) নবী করীম (স) থেকে এ রকমের কথাই বর্ণনা করেছেন মহামারী সম্পর্কে। জুহরী আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমান-আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নওফল, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছেন। তিনি সার্গ নামক স্থানে পৌঁছলেন। তখন কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা বললেন, স্থানটি রোগাক্রান্ত। তিনি সঙ্গী মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করলেন, তাঁরা একমত হতে পারলেন না। তখন হযরত উমর (রা) প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করেন। তখন হযরত আবূ উবায়দাতা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন আল্লাহ্র নির্ধারণ থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন ? তখন হযরত উমর তাঁকে বললেন, তুমি ছাড়া কথাটি অন্য কেউ বললে ভালো হতো। তবু তোমাকে বলছি, হে আবূ উবায়দা, আমরা আল্লাহ্র এক নির্ধারণ থেকে আর এক নির্ধারণের দিকে পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি বিবেচনা করে দেখ, তোমার একটা উট আছে। তুমি তাতে সওয়ার হয়ে একটি উপত্যকায় অবতীর্ণ হলে। সেখানে তোমার সম্মুখে দুইটি ক্ষেত্র দেখতে পেলে। তার একটি উর্বরতাপূর্ণ আর অরপটি শুষ্কতা মরুবৎ। তখন তুমি যদি উর্বরতার ক্ষেত্রটি গ্রহণ কর, তাহলে সেটা কি আল্লাহ্র নির্ধারণ গ্রহণ করা হবে না ? আর তুমি যদি শুষ্ক-মরুবৎ ক্ষেতটি গ্রহণ কর, তাহলেও কি সেই আল্লাহ্রই তকদীর গ্রহণ করলে না ?

তখন সেখানে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার নিকট ইলম রয়েছে, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه -

তোমরা যদি কোন স্থানে মহামারীর কথা শুনতে পাও, তাহলে সেখানে এগিয়ে যাবে না। আর তোমার স্থানেই যদি তা হয়, তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে বেরিয়ে যাবে না।

এ হাদীস শুনে হযরত উমর (রা) আল্লাহ্র শোকর আদায় করলেন এবং ফিরে চললেন।

এ হাদীসে মহামারী থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর কোথাও হতে থাকলে সেখানে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেও নিষেধ করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে কেউ যদি বলে, মৃত্যু যখন সুনির্দিষ্ট সময় ও স্থানের মধ্যে সীমিত, যা আগেও হবে না, পরেও হবে না, তাহলে যেখানে মহামারী রয়েছে, সেখানে এগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে নবী করীম (স) নিষেধ করলেন কেন ? অথচ সেখান থেকে বেরিয়ে যেতেও নিষেধ করেছেন শুরুতেই। অথচ সেখানে বাইরে থেকে যাওয়া ও সেখানে অবস্থান করার মধ্যে পার্থক্য তো কিছুই নেই।

জবাবে বলা যাবে, সেখানে যেতে নিষেধ করার কারণ হল যদি মহামারীর স্থানে বাইরে থেকে গিয়ে কেউ প্রবেশ করে, তাহলে সেখানেই যদি তার মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়, তাহলে কেউ বলতে পারে— তার মনে জাগতে পারে যে, সেখানে না গেলে তার মৃত্যু হতো না। সেখানে তো যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। যেন পরে এই ধরনের কথা বলার প্রয়োজন না হয়, এ কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى لَوْكَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সেই কাফিরদের মত হইও না, যারা তাদের ভাইদেরকে যখন তারা বিদেশ ভ্রমণে বের হয়েছে, কিংবা যুদ্ধে শরীক হয়েছে (এবং কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে) বলেছে, ওরা যদি আমাদের নিকট থাকত, তাহলে ওরা মরতো না, নিহতও হতো না। একথা বলা হল এ জন্যে যে, আল্লাহ এ ধরনের কথা-বার্তাকে তাদের মনের দুঃখের কারণ বানিয়েছেন।

এ কারণে নবী করীম (স) মহামারীর স্থানে বাইরে থেকে প্রবেশ করাকে পছন্দ করেন নি। কেননা হতে পারে যে, সেখানেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে এল এবং জাহিল লোকেরা বলতে শুরু করল যে, সেখানে না গেলে তো মরতো না।

এ তাৎপর্যই পাওয়া যায় রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে। হাদীসটি এই ঃ

لَا يُوْرِدَنَّ ذُوْعَاهَةٍ عَلٰى مُصِحٍّ -

ক্ষয়রোগ সম্পন্ন ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তির নিকট না যায়।

অথচ তিনি এ-ও বলেছেন, সংক্রমণ নেই, বদফালি নেই। তবু উপরোক্ত কথাটি বলার কারণ হল, কোন সুস্থ নিরোগ ব্যক্তির নিকট ক্ষয়রোগধারী ব্যক্তি গেলে এবং পরে সেই সুস্থ ব্যক্তির তেমন রোগ হলে হয়ত বলতে পারে যে, এ রোগ তার নিকট থেকে সংক্রমিত হয়েছে। সে না এলে তার এ রোগ হতো না।

রাসূলে করীম (স)-কে বলা হল ঃ হে রাসূল! ছাগলের পার্শ্বের তীব্রতা থেকেও ক্ষত হতে পারে। পরে তা উটকেও পেয়ে যায়। তখন নবী করীম (স) বললেন, তাহলে বল, প্রথম যাকে রোগ পেয়েছে, সেটা কিসের সংক্রমণ, তা কোত্থেকে এল ? হিসাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, যুবয়র (রা) মিসর জয় করলেন। তাঁকে জানানো হল যে, সেখানে মহামারী রয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন। বললেন, আমরা এ মহামারীর কারণেই এখানে এসেছি। এ-ও বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন সিরিয়ার দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন, তাদেরকে বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত করলেন এবং তাদের জন্যে দো'আ করলেন। বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَفْنِهِمْ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ -

মনীষিগণ এ কথাটির তাৎপর্য নির্ধারণে বিভিন্ন কথা বলেছেন।

কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন, হযরত আবূ বকর (রা) যখন বাহিনীর লোকদের দৃঢ় মনোবলের, নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহসী উদ্যমশীল দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাদের উপর ফিতনার ভয় পেলেন। তখন সিরিয়ার গোটা এলাকা মহামারীতে আক্রান্ত ছিল এবং সকলেরই জানা ছিল। তাই তিনি এটাই পছন্দ করেছেন যে, তাদের মৃত্যু সেই অবস্থায়ই হোক, যে অবস্থায় তারা রওয়ানা হয়েছিল এবং তা দুনিয়ার চাকচিক্য ও আরাম-আয়েশে নিপতিত হওয়ার আগেই।

কিন্তু অন্যান্যরা বলেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ فَنَاءُ اُمَّتِىْ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ 'আমার উম্মতের সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে আঘাতে ও মহামারীতে।' সেই সাথে তিনি এ-ও জানিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন দেশ শীগগীরই জয় হবে যাদের এ গুণ আছে সেই লোকদের দ্বারা। এ প্রেক্ষিতে দেখলে বলা যায়, হযরত আবূ বকর (রা) উক্ত কথা দ্বারা নিজের এ বাসনা ব্যক্ত করেছেন যে, এ বাহিনীর লোকেরা ঠিক তা-ই হোক, নবী করীম (স) যাদের উল্লেখ করেছেন তাঁর উক্ত কথায়। তাদের অবস্থা সম্পর্কেই তিনি সংবাদ দিয়েছেন। এ কারণে আবূ উবায়দাতা (রা) সিরিয়া থেকে বাইরে চলে যাওয়ার আহ্বানে সাড়া দেন নি।

হযরত মুয়ায (রা) বলেছেন, সিরিয়ায় যখন মহামারী শুরু হয়ে গেল, তিনি তখন সেখানেই ছিলেন। তিনি দো'আ করেছিলেন এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا حَظًّا مِنْهُ -

হে আমাদের আল্লাহ! তার একটা ভাগ আমাদের দাও।

পরে তাঁর নিজের হাতে প্লেগ লেগে গেল, তিনি তা চুম্বন করতেন এবং বলতেন, এর কারণে আমার এই-এই সুবিধা হয়েছে। আরও বলেছেন, আমি যদি অল্প বয়সের হতাম, কেননা, আল্লাহ বহু অল্প বয়সের লোককে বরকত দিয়ে থাকেন। কিংবা অনুরূপ কোন কথা বলেছিলেন, যদ্দারা তিনি মহামারী রোগের কামনা করেছেন, যেন তিনি সেই গুণের অধিকারী হতে পারেন, যে গুণের জন্যে নাবী করীম (স) তাঁর উম্মতকে অভিহিত করেছেন, যাদের দ্বারা আল্লাহ্ দেশের পরে দেশ জয় করাবেন এবং ইসলামকে বিজয়ী ও প্রকাশমান বানিয়ে দেবেন।

উক্ত আয়াতে এ প্রমাণ রয়েছে যে, যারা কবর আযাব হবে না বলে দাবি করে, তাদের এ দাবি বাতিল। তাদের যুক্তি হচ্ছে কবর আযাব মানলে পূনর্জন্ম মানতে হয়। কেননা উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ এ খবর-ও দিয়েছেন যে, তিনি লোকদেরকে মৃত্যু দিয়েছিলেন, পরে আবার তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। কবরেও তেমনি পুনর্জীবন দেবেন এবং তাদেরকে আযাব দেবেন যদি তা তাদের জন্যে সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَقَاتِلُوْا سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

এবং তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র পথে এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা— সর্বজ্ঞ।

এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার আদেশ। আয়াতটি অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথের কোন পরিচিতি বা বিবরণ দেয়া হয়নি। যদিও অপরাপর আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সে আলোচনা যখন আসবে, তখন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

আল্লাহ্র কথা ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عِفَهُ لَهٗ اَضْعَا فًا كَثِيْرَةً -

যে লোকই আল্লাহ্কে করযে হাসানা দেবে, আল্লাহ তাঁকে বহু গুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন।

এ হচ্ছে পুণ্যশীলতা ও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান। এতে অতীব মাধুর্যপূর্ণ কথা প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ব্যয়কে 'ফরয' বলা হয়েছে সওয়াব পাওয়ার অধিকার প্রমাণের তাগিদ বোঝাবার জন্যে। কেননা 'ফরয' হলেই তার বিনিময় প্রয়োজন।

ইয়াহুদীরা ভুলে গিয়েছিল অথবা ভুলে যাওয়ার ভান করেছিল—কি কারণে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। ওরা তাই বলল, আল্লাহ আমাদের নিকট করয চান। কেননা আমরা ধনী লোক, তিনি দরিদ্র, আমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ -

যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ দরিদ্র, আমরাই ধনশালী, তাদের কথা আল্লাহ্ শুনতে পেয়েছেন।

কিন্তু মুসলমানগণ আল্লাহ্র উপরোক্ত আয়াতের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত সওয়াবের উপর দৃঢ় প্রত্যয়শীল হয়েছিলেন। তাই তাঁরা অবিলম্বে দান-সাদ্কার কাজ শুরু করেছিলেন। তাই বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল, তখন আবুদ্দাহ্দাহ (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন ঃ হে রাসূল! ভেবে দেখেছেন, আল্লাহ্ আমাদের নিজেদের ভোগ ব্যবহারের জন্যে যা দিয়েছেন, তা তিনি আবার আমাদের নিকট থেকে 'করয'; বাবদ চাচ্ছেন ? আমাদের দুই খণ্ড জমি আছে, তার এক খণ্ড উঁচুতে আর অপর খণ্ড নীচুতে। এক খণ্ডের মধ্যে যে যেটি সর্বোত্তম তা আমি সাদকা করে দিলাম।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا -

আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে তোমাদের জন্যে তালুতকে বাদশাহ রূপে পাঠিয়েছেন। লোকেরা বলল, আমাদের উপর বাদশাহী হবে কোত্থেকে কেমন করে ?

আয়াত থেকে বোঝা গেল, 'ইমামত' জনগণের উপর দ্বীনী নেতৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ জিনিস নয়। কেননা আল্লাহ অগ্রাহ্য করেছেন তা, যা তারা মানতে অস্বীকার করেছে। তা হল তাদের উপর মালিকত্ব বাদশাহী তো তার হতে পারে না যে নবী-বংশের লোক, না বাশাহ্র বংশধর। আল্লাহ বলে দিলেন যে, জনগণের উপর দ্বীনী নেতৃত্ব ইলম ও শক্তির দৌলতে হবে, বংশানুক্রমে হবে না। আয়াতটি থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, ইলম ও মানসিক গুণ বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্ক বংশধারার সাথে নেই। তা তো আল্লাহ্র তরফ থেকে দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তালুতকে লোকদের উপর ইমাম বাছাই-পছন্দ করে নিয়োজিত করেছেন। তার ইল্ম ও শক্তির গুণের কারণে, যদিও লোকেরা বাংশের দিক দিয়ে তার তুলনায় অনেক উত্তম ও আশরাফ। তালুতের পরিচিতিস্বরূপ আল্লাহ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ 'ইলমে বিশালতা ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে وَالْجِسْمِ 'এবং দেহে'-ও বলে তার শক্তির বৈশিষ্ট্য ও অগ্রসরতার কথা

বুঝিয়েছেন। কেননা এটা সাধারণত স্বীকৃত যে, যে লোক দৈহিকভাবে বড়, সে শক্তিতে অধিক। তাতে শক্তিহীন দৈহিক বিরাটত্ব বোঝাতে চাওয়া হয়নি। কেননা যার শক্তি নেই, তার পক্ষে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নেই। বরং সে বিরাট দেহ তার জন্যে এক দুর্বহ বোঝা বৈ আর কিছু নয়— তার বিপুল শক্তি নেই বলে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ -

যে নদী থেকে পান করছে সে আমার পক্ষের নয়। আর যে তা আস্বাদন করবে না— একটি হুকুম ছাড়া— সে আমার পক্ষের।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, নদী থেকে পান করার অর্থ, নদীতে চুমুক দেয়া, তার উপর ওষ্ঠ নিবদ্ধ করা। কেননা এ পান করাটা ছিল নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ ছিল তার স্বাদ গ্রহণ। তবে কেউ যদি হাতে তুলে কিছুটা পান করে নেয় তা নিষিদ্ধ নয়। এ কথা ইমাম আবূ হানীফার কথার সঠিকত্ব প্রমাণ করে। তিনি বলেছিলেন, যদি কেউ বলে, তুমি যদি ফুরাত নদী থেকে পান কর, তা হলে আমার দাস মুক্ত। সে লোক তাতে চুমুক দিতে পারে যদি সে হাতে তুলে পান করে বা কোন পাত্রে তুলে পান করে, তাহলে সে কিরা ভঙ্গকারী হবে না। কেননা আল্লাহ্ তো নদী থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন। আর সেই সাথে স্বাদ গ্রহণ করতেও নিষেধ করেছেন। তবে এক অঞ্জলী পরিমাণকে রুখসত দিয়েছেন। তাই পানি পান তেমনি নিষিদ্ধ থাকল, যেমন ছিল। বোঝা গেল, অঞ্জলীতে তুলে পান করলে তা নিষিদ্ধ পানের মধ্যে গণ্য হবে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -

দ্বীনে কোন জোর প্রয়োগ নেই। হেদায়েতের পথ গুমরাহী থেকে আলাদা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

দহাক, সুদ্দী, সুলায়মান ইবনে মূসা বলেছেন, এই আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে এ আয়াতটি দ্বারা ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِيْنَ -

হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। (সূরা তওবা ঃ ৭৩)

এবং এ আয়াতটি দ্বারা ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ -

অতএব তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৫)

আল-হাসান ও কাতাদাতা বলেছেন, 'দ্বীনে জোর প্রয়োগ নেই' কথাটি বিশেষভাবে সেই আহ্লি কিতাব লোকদের বেলায়, যারা জিযিয়া দিতে প্রস্তুত হবে। আরবের সাধারণ মুশরিকদের বেলায় এ কথা নয়। কেননা তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে রাজী হয়নি। তাদের নিকট থেকে হয় ইসলাম কবুল নিতে হবে, না হয় তরবারির আঘাত তাদের উপর পড়বে।

কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত আয়াতটি কোন কোন আনসার লোকের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। তারা ইয়াহুদী ছিল। তাদের বাপ-চাচারা নিজেরা ইসলাম কবুল করার পর তাদের সে সব পুত্রদেরকে জোরপূর্বক মুসলিম বানাতে চেয়েছিলেন। একথা ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণিত। এ পর্যায়ে এ-ও বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতের অর্থ হল, যুদ্ধের পরে যারা ইসলাম কবুল করেছে তাদের সম্পর্কে বল না যে, জোর-জবরদস্তির ফলে তারা ইসলাম কবুল করেছে। কেননা তারা ইসলাম কবুল করতে রাজী হয়েছিল। তার ফলেই তাদের ইসলাম গ্রহণ সঠিক হয়েছে। অতএব তারা জোর প্রয়োগের ফলে মুসলিম হওয়া লোক নয়।

আবূ বকর বলেছেন ঃ لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ 'দ্বীনে জোর প্রয়োগের অবকাশ নেই।' এটি সংবাদ দানরূপে বলা কথা। কিন্তু মূলত একটি আদেশ। এটা সম্ভব যে, আয়াতটি মুশরিকদের বিরুদ্ধে করার আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। ফলে তখন সে কথা সব কাফির সম্পর্কেই প্রয়োগীয় ছিল। যেমন আল্লাহ্‌র এই কথাটি ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ -

প্রতিরোধ কর সেই পন্থায় যা অতীব উত্তম। তাহলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে সহসাই অতীব উষ্ণ বন্ধুতে পরিণত হবে। (সূরা হা-মিম-আস সিজদা ঃ ৩৪)

যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ -

উত্তম প্রন্থা দ্বারা দোষ-খারাবীর প্রতিরোধ কর। (মুমিনুন ঃ ৯৬)

অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

এবং যা অতীব উত্তম পন্থা, তদ্দারা বিরোধীদের সাথে মুকাবিলা কর। (সূরা নহল ঃ ১২৫)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا -

যখন তাদেরকে মূর্খ লোকেরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম।(সূরা ফুরক্বান ঃ ৬৩)

ইসলামের প্রথম দিকে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত কাফিরদের প্রতি ইসলাম পেশ করার কাজটি যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল, নবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হল, তারপরও যখন তারা শত্রুতা করতে থাকল, তখন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হল তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে। তখন 'দ্বীনের জোর প্রয়োগ করার অবকাশ নেই' কথাটি আরবের মুশরিকদের বেলায় মনসূখ হয়ে গেল। আয়াত নাযিল হল ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ -

মুশরিকদের যেখানেই পাবে, হত্যা করবে। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৫)

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম সম্বলিত আরও বহু আয়াত রয়েছে। তাই উক্ত আয়াতের প্রয়োগ কেবলমাত্র আহলি কিতাবের সাথে থেকে গেল অর্থাৎ দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে

তাদের উপর কোন জোর প্রয়োগ করা যাবে না। আর আহলি কিতাবদেরকেও নিষ্কৃতি দেয়া হবে তখন, যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে রাজী হয়। তখন তারা মুসলমানদের যিম্মী হয়ে থাকবে। ইসলামের শাসনাধীন হবে।

এ কথার হাদীসী প্রমাণ হচ্ছে, নবী করীম (স) নিজে আরবের মুশরিকদের নিকট থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন নি। তা নাহলে তাদের উপর তরবারি চালিয়েছেন। আর উক্ত আয়াতটির হুকুম সমস্ত কাফিরের উপরও প্রয়োগযোগ্য হতে পারে। কেননা মুশরিক মাত্রই হয় ইয়াহূদী, না হয় খ্রীস্টান। ফলে তাদের উপর ইসলাম কবুল করার জন্যে জোর করা যাবে না। তারা নিজেদের ধর্মই পালন করতে থাকবে, তবে জিযিরা দিতে রাজী হয়ে। আর যে লোক-ই আহ্‌লি কিতাবের কোন দ্বীন পালনে স্থির থাকবে, তখন তাদের সম্পর্কে 'জোর করা যাবে না দ্বীনের ব্যাপারে' এ নীতির প্রয়োগ সম্ভব, তখন তাতে ইমাম শাফেয়ীর মত বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মজুসীদের যারা ইয়াহূদী হবে বা খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করবে, তাদেরকে তাদের আগের ধর্মে ফিরে যেতে অথবা ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করতে হবে। কিন্তু কুরআনের আয়াত এ মত সমর্থন করে না। কেননা আগেই যেমন বলেছি, আমরা উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে কাউকেই কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনে বাধ্য করতে পারি না। এটা একটা সাধারণ কথা। সব কাফিরকেই এর আওতায় গণ্য করা সম্ভব সেইভাবে, যা উপরে বলেছি।

কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে আরবের যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রাসূলে করীম (স) আদেশ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে ইসলাম অথবা তরবারি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না বলে ঘোষণা করেছেন, তার অর্থ তো এই যে, তাদেরকে দ্বীন গ্রহণে ব্যাধ্য করাই হল। আর জানা-ই আছে যে, দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করতে যে লোক বাধ্য হবে, সে প্রকৃত মুসলিম নয়। তাহলে আরবের মুশরিকদের সে জন্যে বাধ্য করার কারণটা কি ?

জবাবে বলা যাবে, তাদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে বাধ্য করা হবে, আকীদা হিসেবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী বানানো নয়। কেননা জোর করে কারোর মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না। এই জন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهُ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ বলবে। তা যদি তারা বলে তা হলে তারা তাদের রক্ত ও ধন-মালকে আমাদের থেকে রক্ষা করতে পারল। তবে তার উপর কোন হক ধার্য হলে ভিন্ন কথা। তবে তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে।

নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবলমাত্র ইসলামের প্রকাশের জন্যে। তারা অন্তঃমুখে জাহির করুক যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত। কিন্তু প্রকৃত হৃদয়গত বিশ্বাস, তা সৃষ্টি করা একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব, তা তাঁরই নিকট সোপর্দ। নবী করীম (স) লোকদের সম্মুখে দ্বীন-ইসলামের অকাট্যতা প্রমাণ না করেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন নি। তার পূর্বে তিনি ইসলামকে পূর্ণভাবে যৌক্তিকথা সহকারে লোকদের

সামনে পেশ করতেন, তাঁর নবুয়তের সত্যতাকে স্পষ্ট প্রতিভাত করে তুলতেন। এসব দলীল-প্রমাণ এক সাথে আকীদা সৃষ্টি ও ইসলামের প্রকাশ ও বিজয় সাধারণের লক্ষ্যে নিবদ্ধ হতো। কেননা এসব দলীল-প্রমাণ, যা তাদের মনে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস জাগাত, তার ফলে ইসলামের প্রকাশও হয়ে যেত। আর যুদ্ধ ছিল ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সাধনের জন্যে। তাতে আরও বড় বড় কল্যাণও নিহিত ছিল। তন্মধ্যে এও একটি যে, তারা যদি বাহ্যিকভাবে ইসলামের প্রকাশ করত তার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও, তাহলে মুসলমানদের সাথে তাদের উঠাবসা ও কুরআন শ্রবণ করা সম্ভব হতো। তারা রাসূলে করীম (স)-এর সত্যতার বাস্তব পর্যবেক্ষণও করতে পারত। সেই সাথে অব্যাহতভাবে চলছিল ইসলামের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার কাজ। তাতে তাদের আকীদার ভুল-ত্রুটি তাদের নিকটই স্পষ্ট হয়ে যেত। সেই সাথে এ-ও চলত যে, আল্লাহ্ তাদেরকে জানাতেন যে, তাদের বংশের মধ্যে এমন এমন লোক আছে, যারা তওহীদী আকীদার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে। ফলে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয হতো না। কেননা একথা জানা ছিল যে, তাদের সন্তানদের মধ্যে তওহীদী ঈমান গ্রহণকারী হবে।

যিম্মীদের মধ্যে কাউকে ঈমান গ্রহণের জন্যে জোরপূর্বক বাধ্য করা হলে বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম হবে এবং তাদেরকে তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যেতে দেয়া হবে না। তবে তারা যদি সে দিকে ফিরে যায়, তা হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। হত্যা ছাড়াই তাদেরকে মুসলিম থাকতে বাধ্য করা হবে। কেননা তারা ইসলাম কবুল করলে জোর প্রয়োগের কারণে ইসলামের হুকুম তাদের থেকে দূর হবে না, যদিও তারা ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে বলে তাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই বলে বোঝা যায়। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, যুদ্ধের কারণে মুশরিকদের মধ্য থেকে যদি কেউ ইসলাম কবুল করে, তবে সে মুসলিম গণ্য হবে।

রাসূল (স)-এর উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে যুদ্ধকালে ইসলাম প্রকাশ করলে তাকে মোটামুটি ইসলাম ও মুসলিম মেনে নিয়েছেন। যিম্মীদের মধ্যে যাকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হবে, তাকেও। সেও কার্যত মুসলিম হবে, সন্দেহের কারণে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। যুধ্যমান লোকদের মধ্য থেকে কোন বন্দী যদি হত্যা করতে চাওয়া হয় এবং তখনই সে ইসলাম কবুল করে, সেও মুসলিম গণ্য হবে। সে ভয়ের কারণে ইসলাম কবুল করেছে এ কারণে ইসলামের হুকুমটা তার থেকে দূর করে দেবে না। এ ধরনের জোর প্রয়োগও যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তার মুসলিম না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক না হওয়ারই কথা। এক্ষেত্রে যিম্মীর অবস্থা যুধ্যমানের অবস্থার মত হবে না। কেননা যুধ্যমান ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যেতে পারে। কেননা তার বাপ-চাচা যিম্মী হয়ে আছে। আর যে লোক যিম্মী হবে, তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে জোরপূর্বক বাধ্য করা যাবে না।

জবাবে বলা যায়, এ কথা যখন প্রমাণিত যে, জোর প্রয়োগ হলেও এবং বাধ্য করা হলেও— যার উপর জোর প্রয়োগ করা যায়, যাকে বাধ্য করা যায়— তার হুকুমটা ভিন্ন রকমের হবে না। এ দিক দিয়ে তার সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন ব্যাপার হচ্ছে দাস মুক্তকরণ ও তালাক দান। আর যে সব কাজে তার যথার্থতা ও অর্থহীনতার হুকুম ভিন্নতর হয় না সে সব ব্যাপার। তার পরে জোর প্রয়োগ আদিষ্ট ও মুবাহ হলেও তা ভিন্নতর হবে না— যেমন দাস মুক্তকরণ ও তালাক এ ব্যাপারে ভিন্নতর হয় না। কেননা কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর যদি জোর প্রয়োগ করে তাকে

বাধ্য করে তালাক দিতে বা দাস মুক্ত করতে তাহলে এ দুটি কাজের হুকুম প্রমাণিত ও কার্যকর হবে। আর জোর প্রয়োগকারী যদি জালিম লোক হয়, তার এই জোর প্রয়োগে এবং এ কাজ করতে তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও দাসমুক্তি ও তালাকের হুকুমটা বাতিল হয়ে যাবে না। এটা হানাফী মাযহাবের মত। ইসলাম গ্রহণের জন্যে জোর প্রয়োগের ব্যাপারটিও অনুরূপ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ -

তুমি কি বিবেচনা করেছ সেই ব্যক্তির ব্যাপার, সে ইবরাহীমের সাথে তার রব্ব-এর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছিল এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন ?

আবূ বকর বলেছেন, কোন কাফিরকে আল্লাহর তরফ থেকে রাজত্ব দান কেবলমাত্র সম্পদের বিপুলতার কারণে ও অবস্থার প্রশস্ততা ও ব্যাপকথার কারণে। কাফিরদের প্রতি দুনিয়ায় এই রূপ-নিয়ামত দান আল্লাহ্‌র নীতি-বিরুদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে মুমিন ও কাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখানে আল্লাহ্‌র এ কথাটিও বিবেচ্য, ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا -

যে লোক এ দুনিয়ায় তাৎক্ষণিক ফল পেতে চাবে, আমরা তাকে তাৎক্ষণিক ফল হিসেবে যা চাবো ও যাকে চাবো দেব। পরে তার জন্যে জাহান্নামও নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করব, সে সেখানে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে প্রবেশ করবে। (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ১৮)

এটা এক ধরনের রাজত্ব বা বাদশাহী দান। তা আল্লাহ কাফিরকেও দিতে পারেন, দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে রাজত্ব বা বাদশাহীতে আদেশ-নিষেধ করার কর্তৃত্ব দান এবং লোকদের ব্যাপারাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিহিত, তা কাফির ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া আল্লাহ্‌র নীতি-বিরুদ্ধ। কেননা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ ও শাস্তি-দণ্ডসমূহ তো সৃষ্টিকূলের কল্যাণ সাধনের জন্যে, তাই যে লোক নিজেই ফাসাদের উপর দাঁড়িয়ে, কল্যাণময় কাজ পরিহারকারী, তাকে আল্লাহ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দেবেন না। কেননা কাফির-গুমরাহ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের নেতৃত্ব সাধারণত দেন না। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ — 'জালিম লোকেরা আমার প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পেতে পারে না।' ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যে লোক তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সে ছিল নমরূদ ইবনে কিন'আন। সে ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর অধীনতা ও অনুসরণ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিল। তাঁকে সে এ যুক্তি দিয়েছিল যে, সে তো বাদশাহ, ক্ষতি করা বা উপকার করার নিরংকুশ ক্ষমতা তার আছে। ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন ঃ 'আমার রব্ব তো বাঁচায় ও মারে। তুমি তা পার না। ইবরাহীম (আ)-এর এই যুক্তির যে মূল কথা, নমরূদ তার জবাব দিতে না পেরে ভিন্ন দিকে চলে গেল। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য ছিল, দ্বীন, মৃত্যু যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি-ই তাঁর রব্ব। তিনি তা সম্পূর্ণ নতুনভাবে পূর্ণ দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকেই করেন। নমরূদ দুজন ব্যক্তিকে ডেকে নিল। তাদের একজনকে সে হত্যা করল। আর বলল, আমি ওকে মৃত্যু দিলাম। আর অপর জনকে ছেড়ে দিল। বলল, আমি ওকে জীবন দিলাম। যদিও প্রকৃত মৃত্যুদান ও জীবন দানের কোন ক্ষমতাই

তার নেই। সেকথা তার নিজের অজানা ছিল না। তাই তার খোদায়ীর এ অর্থহীন প্রমাণ যখন প্রতিভাত হয়ে গেল এবং কাফির নমরূদ ইবরাহীম (আ)-এর উপস্থাপিত প্রমাণের অধিক শক্তিশালী প্রমাণ পেশ করে তার মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে গেল। সে যা করল, তা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে সম্মোহিতও করতে অক্ষম থেকে গেল। কাফির ব্যক্তি নিজেই বুঝেছিল যে, সে যা করেছে, তা ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তির জবাব হয়নি। অবশ্য সে তার সঙ্গীদেরকে অভিভূত করতে চেয়েছিল মাত্র। যেমন ফিরাউন করেছিল। মূসা (আ) যষ্ঠি নিক্ষেপ করলে তা যাদুকরদের নিক্ষেপিত সব রশি-লাঠিকে গিলে ফেলল। লোকেরা জেনে গেল যে, সে যষ্ঠিতে কোন যাদু ছিল না। তা ছিল স্বয়ং আল্লাহ্র কাজ। তখন ফিরাউন উপস্থিত লোকদেরকে ভিন্নভাবে সম্মোহিত করতে চাইল। সে বলল, এটা একটা ষড়যন্ত্র। তোমরা এখানে এই ষড়যন্ত্র করেছ এখানকার অধিবাসীদেরকে এখান থেকে বহিষ্কৃত করার মতলবে। অন্য কথায়, তোমরা সব মূসার পক্ষে চলে গেছ। তার সঙ্গে জোট বেঁধেছ এর পূর্বে। তাই তোমরা মুকাবিলার ময়দানে এসে তার সাথে মুকাবিলা করার অক্ষমতা দেখাচ্ছ। তার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ। ফিরাউনের এ কথাগুলোও ছিল তার সঙ্গীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে।

ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ঝগড়াকারী কাফির নমরূদও তা-ই করেছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ) তাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পরে তিনি এমন যুক্তি উপস্থাপিত করলেন যার মুকাবিলা করার কোন সাধ্যই নমরূদের ছিল না।

তিনি বললেন ঃ

فَانَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ -

আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় কর .....।

কিন্তু এর কোন জবাবী প্রমাণ পেশ করার কোন সাধ্য নমরূদের ছিল না। যুক্তি উপস্থাপনের পরম্পরা ছিন্ন হয়ে গেল। তার পক্ষে জবাব দেয়াই শুধু সম্ভব হল না তা-ই নয়, লোকদের মনে কোনরূপ সংশয় সৃষ্টি করারও কোন সাধ্য তার থাকল না।

ইবরাহীম (আ)-এর এই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। স্পষ্ট ও অকাট্য দলীল। এর অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য বুঝতে হবে। তা এই যে, যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নবী করে পাঠিয়েছিলেন, ওরা ছিল সাবেয়ী ধর্মাবলম্বী, মূর্তিপূজারী, সে মূর্তিগুলো ছিল সাতটি নক্ষত্রের নামে নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ওরা দেবতাদের উপাসক ছিল। আল্লাহ্কে স্বীকার করত না। তারা মনে করত, এই বিশ্বলোকের যাবতীয় ঘটনা, সপ্ত নক্ষত্রের গতি-বিধি, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় সূর্য— তার ও সমগ্র নক্ষত্রের তারা নামকরণ করেছিল 'ইলাহ'। সূর্য তার মধ্যে বড় 'ইলাহ'— তার উপর আর কোন ইলাহ নেই, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে তারা স্বীকারই করত না। তারা এবং আর যারাই নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত— এ ব্যাপারে একমত যে, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহের দুটি গতি আছে বিপরীতমূখী। তার একটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। এই গতি সূর্য ও নক্ষত্রের একান্ত নিজস্ব। আর দ্বিতীয়টি হল, তার কক্ষসমূহকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চালিত করা। এই গতির ফলেই দুনিয়ায় রাত্র ও দিনে একবার আবর্তন ঘটে। অভিজ্ঞ মহলের নিকট এই ব্যাপারটি চূড়ান্ত।

ইবরাহীম (আ) তাকে বললেন, তুমি তো স্বীকার কর যে, তোমরা যে সূর্যের পূজা-উপাসনা কর, যাকে তোমরা ইলাহ বলছ, তার একটা গতি ও নড়-চড় আছে বাধ্যতামূলকভাবে। সেটা তার নিজের গতিশীলতা নয়, বরং অন্যান্য সবকিছুকে তা গতিশীল করে। তাই সেই সবকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে গতিশীল বানায়। আর আমি যার ইবাদত করার জন্যে তোমাকে আহ্বান করছি, তিনি সূর্যের এ গতি সৃষ্টি করেন। সূর্য যদি ইলাহ্ হতো, তা হলে অন্য কারোর দ্বারা চালিত হতো না। চলতে বাধ্যও হতো না।

কিন্তু এই যুক্তি ও প্রমাণের কোন জবাব দেয়া নমরূদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে জনমনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি এর প্রতিরোধ করা। তাই সে শুধু এ কথাই বলতে পারল ঃ

حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ -

তোমরা যদি এখন কিছু করতেই যাও, তা হলে ইবরাহীমকে আগুনে জ্বালাও এবং তোমাদের ইলাহদের সাহায্যে এগিয়ে এস।

সূর্যের এই দুটি বিপরীতমুখী গতিশীলতা— সেই সাথে অন্যান্য নক্ষত্রের গতিবিধি ঠিক একই সময় পাওয়া যায় না। কেননা একই সময় একই অবয়বে হওয়া সম্ভব না। কিন্তু দুটির একটি অনিবার্যভাবে বিপর্যস্ত হতে হয়। ফলে একটা গতি যখন পাওয়া যায় তখন অন্যটা পাওয়া যায় না।

আবূ বকর বলেছেন, যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে প্রথম যুক্তি পেশ করার পর অন্য যুক্তির দিকে চলে যাওয়া কি করে সম্ভব বা সমীচীন হল ? তাহলে বলা যাবে, না, তিনি অন্য যুক্তির দিকে চলে যান নি। বরং তিনি প্রথম যুক্তির উপরই দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বরং প্রথম যুক্তির পরে তারই সমর্থনে আরও একটি অনুরূপ যুক্তি দিলেন। যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওহীদ প্রমাণের জন্যে নানা দিক দিয়ে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। মূলত আসমান ও জমিনের যা কিছুই আছে তা সবই আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ। তিনি তাঁর নবীকে বহু সংখ্যক মুজিজা দ্বারা বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তার যে-কোনটি এমন যে, তা স্বতন্ত্রভাবেই সে কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। ইবরাহীম (আ) কাফিরদের সম্মুখে তা বাদে ভিন্নতর দলীল পেশ করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ -

এমনিভাবে আমরা ইবরাহীমকে আসমান-জমিনের খোদায়ী নিরংকুশতার এলাকা দেখিয়ে থাকি, যেন সে দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের একজন হয়। (সূরা আন'আম ঃ ৭৫)

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ -

পরে যখন রাত উপরে আচ্ছন্ন হয়ে এল, সে একটা তারকা দেখতে পেল। বলল, এটাই আমার রব্ব। (সূরা আন'আম ঃ ৭৬)

তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, ইবরাহীম (আ) তাঁর জনগণকে তাঁর উপস্থাপিত দলীলের উপর

স্থিতিশীল বানাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন তাদের কথার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে। এজন্যে তিনি বলেছিলেন ঃ 'এটাই আমার রব্ব'।

فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ : لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ -

'তারকাটি' যখন অদৃশ্য হয়ে গেল, বললে, আমি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া জিনিস পছন্দ করি না।

ঘটনাটি ছিল কোন রাত্রিকালের। এ রাত্রিবেলায়ই সেখানকার জনগণ তাদের মন্দিরসমূহে একত্রিত হতো। তাদের নির্মিত মূর্তিগুলোর সম্মুখে অবনত হত। এটা ছিল তাদের উৎসব। এই সময়ই তিনি লোকদের সামনে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, তোমরা যে তারকাকে 'ইলাহ' বানিয়েছ, তা একবার প্রকাশিত হয় আবার তা অদৃশ্য হয়েও যায়। তা গতিশীল, স্থিতিশীল নয়। তা স্থানান্তরিতও হয়। এ ধরনের বস্তু কখনই 'ইলাহ' হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। কেননা তাতে পরিবর্তিত হওয়ার অবস্থা প্রকট। চন্দ্রের ব্যাপারেও তা-ই হল। সকাল বেলাতেও তিনি তার যুক্তি লোকদের সামনে পেশ করতে থাকেন সূর্যকে কেন্দ্র করে। এভাবে প্রকৃত দলীল-প্রমাণ জনগণের বিশ্বাসের বিপরীত কথাই প্রমাণ করল। তার পরে তিনি তাদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। এ সংক্রান্ত কাজের বর্ণনা আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন।

এ আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, দ্বীন ইসলামের সত্যতা-অকাট্যতা প্রমাণ করার জন্যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা খুবই সহীহ্ কাজ। এ জন্যে বিবেকসম্মত যুক্তিসমূহ একের পর এক পেশ করা বাঞ্ছনীয়, যেমন করে আল্লাহ নিজে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর তওহীদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করেছেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র সর্বোত্তম গুণাবলী পেশ করতে হবে।

সেই সাথে একথাও প্রমাণিত হল যে, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণিত করা হবে তা অবশ্যই মেনে নেয়া আবশ্যক। আর তার মুকাবিলায় যুক্তি-প্রমাণহীন ধর্মমত পরিহার করা একান্তই কাম্য।

দ্বীনের সত্যতা প্রমাণে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও দলীলাদি পেশ করা অনুচিত বলে মনে করে, উক্ত ব্যাপার দিয়ে তার বাতুলতা প্রমাণিত হয়। কেননা যদি তা-ই হতো, তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ) কোন যুক্তিই পেশ করতেন না। দলীল-প্রমাণ দ্বারা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল তা মেনে নেয়া ও গ্রহণ করা এবং যা মিথ্যা প্রমাণিত হল তা পরিত্যাগ করা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয় বলে তা মেনে নেয়াই বাধ্যতামূলক। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, প্রকৃত সত্য লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে যুক্তি কবুল করা। হক ও বাতিল— সত্য ও মিথ্যা প্রমাণের একমাত্র পথ-ই হচ্ছে, সত্যের প্রমাণ হবে অকাট্য, অবশ্য স্বীকার্য। আর বাতিল বা মিথ্যার পক্ষের কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্যই হবে না। সত্য যদি যুক্তির ভিত্তিতে মিথ্যা থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত না হয়, তাহলে প্রকৃত সত্য কোন দিনই উদ্ঘাটিত হবে না। মিথ্যার দাবি ও প্রচার অবলীলাক্রমে চলতে থাকবে। হক ও বাতিলের মধ্যে যা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তা জানবার কোন উপায় থাকবে না।

এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র সদৃশ্য কিছু নেই। তাঁর পরিচিতি লাভের একমাত্র উপায়ই হচ্ছে, তাঁর তওহীদের অকাট্য দলীল। আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রাসূলগণ তো এই যুক্তি প্রমাণের বলেই কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলা করেছেন। আল্লাহ্র এমন কোন গুণের উল্লেখ তাঁরা করেন নি, যার কোন সাদৃশ্য থাকতে পারে। আল্লাহ্র কাজ দ্বারাই আল্লাহ্র প্রমাণ দিয়েছেন। এ যুক্তি-প্রমাণ দিয়েই কাফির-মুশরিকদের পরাজিত করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ - قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ -

বললেন, আমি একদিন বা একদিনের কিছু অংশ কাল অবস্থান করেছি। আল্লাহ্ বললেন, না, বরং তুমি একশ বছর অবস্থান করেছ।

প্রথম কথাটি যিনি বলেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলেন নি। আল্লাহ্ তাঁকে মৃতাবস্থায় একশত বছর কাল পর্যন্ত রেখেছিলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে খবর জানিয়েছেন। তিনি সব শুনে বললেন, আমার মনে হয়, আমি একদিন বা একদিনের কিছু সময় এখানে পড়েছিলাম। আল্লাহ্ 'আসহাবে কাহাফ' সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এ ঘটনার সত্যতার দৃষ্টান্ত।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ -

তাদের একজন বলল, কতদিন পর্যন্ত তোমরা এ অবস্থায় পড়ে আছ ? তারা বলল; একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়।

অথচ তাদের এ অবস্থায় পড়ে থাকার মিয়াদ তিনশ নব্বই বছর। কিন্তু তারা যে সময়টার কথা বলল, তা তারা মিথ্যা তো বলেনি। এটা ছিল তাদের ধারণা। তাদের এ কথার তাৎপর্য তো এই যে, 'আমাদের ধারণায় আমরা সম্ভবত পূর্ণ একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ কাল এরূপ অবস্থায় পড়ে রয়েছি।' নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তার দৃষ্টান্ত, যখন তিনি দুই রাক'আতা নামায পড়লেন কোন এক এশার নামাযের, তখন দুই হাতওয়ালা সাহাবী তাঁকে বললেন ঃ 'আপনি নামায 'কসর' করলেন না চার রাক'আত পড়াতে ভুলে গেলেন ?' তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, না, 'কসরও করিনি, ভুলেও যাই নি।' কথাটি তিনি সত্যই বলেছিলেন। কেননা এটা ছিল তাঁর ধারণা এবং তাঁর ধারণা অনুযায়ী তিনি যা বলেছেন, তা সত্য। তিনি মনে করেছেন, তিনি এশার চার রাক'আতই পড়িয়েছেন। নামায যথারীতি সম্পূর্ণ করেছেন। এভাবে নিজের ধারণানুযায়ী বলার অবকাশ আছে, সেজন্যে তাঁকে কোনক্রমেই তিরস্কার করা যায় না। নিজের বিশ্বাস বা ধারণা অনুযায়ী বলা তো মিথ্যা হতে পারে না, যদিও তা প্রকৃত ব্যাপারের বিপরীত। তিনি তো সেই প্রকৃত ব্যাপারের বর্ণনা দেন নি।

এ কারণে বেহুদাভাবে যে লোক কিরা-কসম করে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন। সে বিষয়ের বর্ণনাটি এই যে, এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, এই এই ঘটনা ঘটেছিল নাকি ? তখন সে তার নিজের ধারণা মতে বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম। অথবা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। যদিও আসল ব্যাপার ছিল তার কথার বিপরীত। সে তো তার নিজের ধারণা মতো বলেছে। তার মতে সেটাই ছিল সত্য কথা।

দানের অনুগ্রহ দেখানো

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَااَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآاَذًى -

যেসব লোক তাদের ধন-মাল আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, পরে তারা যা ব্যয় করেছে তার পেছনে অনুগ্রহ দেখানো বা পীড়া দান করে না।

আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলেছেন ঃ

يَـاَيُّهَا الَّذِيْـنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَاذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের দানসমূহ অনুগ্রহ দেখিয়ে ও পীড়া দিয়ে নিষ্ফল করে দিও না সেই ব্যক্তির মতো, যে তার মাল ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَاقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى -

ভালো পরিচিত কথা এবং ক্ষমা অতীব উত্তম এমন দান থেকে, যার পেছনে আসে পীড়া।

বলেছেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَفِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

তোমরা যে সুদ দাও লোকদের ধন-মালের প্রবৃত্তি হওয়ার উদ্দেশ্য, তা আল্লাহ্র নিকট কিছু বৃদ্ধি পায় না। তবে তোমরা যে যাকাত দাও, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও, তাদের ধন-মালই প্রকৃতপক্ষে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। (সূরা আর-রূম ঃ ৩৯)

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, দান-সদকা খালেসভাবে আল্লাহ্র জন্যে হতে হবে, তা অনুগ্রহ দেখানো ও পীড়াদান মুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তা প্রকৃত সাদকা হবে না। তা বাতিল হয়ে যাবে। বাতিল হয়ে যাওয়া অর্থ নিষ্ফল হয়ে যাওয়া। তার সওয়াব না হওয়া ও না পাওয়া। পরিণামে তা এমন হওয়া যে, সে কোন সাদকাই করেনি। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে যত কাজই করা হবে, তার সব ও প্রত্যেকটি সম্পর্কেই এই কথা। সে কাজের সাথে রিয়াকারিতার একবিন্দু সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য কারোরই নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভ তার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কেননা তাহলে সে কাজ বাতিল গণ্য হবে, নিষ্ফল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ -

তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে বাতিল— নিষ্ফল করে দিও না। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)

বলেছেন ঃ

وَمَآ اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ -

তাদেরকে কিছুই আদেশ করা হয়নি, আদেশ করা হয়েছে মাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার, কেবল তাঁরই জন্যে দ্বীন ও আনুগত্যকে খালেস করে এবং অন্য সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্পূর্ণরূপে একমুখী হয়ে। (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

অতএব যে কাজ আল্লাহ্র জন্যে খালেস হবে না, কেবল আল্লাহ্রই নৈকট্য লাভ যে কাজের মূল লক্ষ্য হবে না— লক্ষ্য হবে অন্য কিছু, তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না, তাতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্র এ কথাটিও তার একটি নযীর ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ -

যে লোক পরকালের ফসল পেতে চায়, তার ফসল আমরা বাড়িয়ে দেব। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে আমরা দুনিয়া থেকেই দেব। তবে পরকালে তার কোন অংশ প্রাপ্য থাকবে না। (সূরা শুরা ঃ ২০)

এ কারণে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, হজ্জের উপর ইজারাদারী জায়েয নয়। নামাযের ব্যাপারেও তাই। কুরআন শিক্ষার মজুরী নেয়াও তাই। এ ধরনের অন্যান্য যেসব কাজের শর্ত হচ্ছে যে, তা আমরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করব, তা-ও মজুরির বিনিময়ে করা যাবে না। কেননা সে সব কাজে মজুরি গ্রহণ করা হলে তার লক্ষ্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ থাকে না। পূর্বোদ্ধৃত আয়াতসমূহ এই কথাটির কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। তার আরও বহু দলীল আছে। আমর আল-হাসান থেকে ঃ

لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى -

এ আয়াতের তাফসীর পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'সাদকা দানকারী যাকে সাদকা দিয়েছে, তার উপর যদি নিজের অনুগ্রহ দেখায়, বলে— আমি তোমার প্রতি এই এই অনুগ্রহ করেছি, আল্লাহ এই কাজকেই নিষিদ্ধ করেছেন। বলেছেন, তার বরং আল্লাহ্র শোকর আদায় করা উচিত এজন্যে যে, আল্লাহ তাকে সাদকা করার পথ দেখিয়েছেন এবং তার তওফীক দিয়েছেন।

আল-হাসান থেকে আল্লাহ্র এ কথারও তাফসীর বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -

যারা তাদের ধন-মাল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ব্যয় করে এবং তাদের মনের স্থিতিস্বরূপ .....

বলেছেন, তারা নিজেরাই দৃঢ় মনোভাব পোষণ করে এ ব্যাপারে যে, তারা তাদের ধন-মাল কোথায়— কোন কাজে ব্যয় করবে। শবী বলেছেন, তাদের মনে সত্যতা ও দৃঢ় প্রত্যয় স্বরূপ নির্ধারণ করে। কাতাদাতা বলেছেন, তাদের মনের দৃঢ়তা স্বরূপ।

দান-সাদকায় অনুগ্রহ দেকানো এভাবেও হয় যে, দানকারী বলবে, আমি অমুকের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছি। তাকে আমি বাঁচিয়েছি, তাকে আমি ধনী করে দিয়েছি। এভাবে দান গ্রহণকারী ব্যক্তির জীবনকে অনুগ্রহের কথা বলে বলে তিক্ত-বিরক্ত করে তোলা। তাকে মানসিক যন্ত্রণা ও পীড়া দেয়া, বলা যে, তুমি তো একটা গরীব মানুষ, তোমাকে সাহায্য করে করে আমি কত না বিপদে পড়েছি। আল্লাহ্ তোমার থেকে আমাকে নিস্তার দিন।

এরই মতো কথা তাও, যা একজনকে গরীব বলে তিরস্কার করবে, লজ্জা দেবে। এই জন্যে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'প্রচলিত ভালো কথাবার্তা এবং ক্ষমা করা এমন দানের তুলনায় অনেক উত্তম যার পেছনেই আসে তিক্ততা।'

অর্থাৎ— প্রকৃত কথা আল্লাহ্ই ভালো জানেন— কথার ভালো জবাব দেয়া, ভদ্র সৌজন্যমূলক

কথা বলা এবং মানুষের দোষ ক্ষমা করে দেয়া অনেক ভাল, অনুগ্রহ প্রকাশ করে কষ্ট দেয়ার তুলনায়। অন্য কথায়, প্রার্থীর দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনাকে লুকানো কর্তব্য। আর ক্ষমা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে জুলুম করেছে তা ক্ষমা করাও সেই দানের তুলনায় অনেক ভালো, যার পরে দান গ্রহীতাকে জ্বালা-যন্ত্রণা বা মানসিক কষ্ট দেয়া হয়। কেননা এরূপ করলে সে গুনাহ করবে। প্রার্থীকে যদি উক্ত ভাবে প্রার্থনার জবাবটা দেয়া হয়, তাহলে তাতে গুনাহ থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। এ কারণে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য না দিয়ে ভালো সৌজন্যমূলক কথাবার্তাও বলা যায়, তাহলে তা দান করে কষ্ট দেয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাই বলেছেন ভিন্ন ভাষায় ঃ

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا -

আর তোমরা যদি তাদেরকে এড়িয়ে যেতে চাও আল্লাহ্‌র প্রতি যে রহমত পাওয়ার আশা পোষণ কর তার প্রতীক্ষায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে খুবই সহনীয় কথা বলবে।

(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ২৮)

আয়-উপার্জন করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেরা যা উপার্জন কর এবং জমিন থেকে আমরা তোমাদের জন্যে যা উৎপাদন করি সেই পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় কর।

এ আয়াতে কামাই-রোজগার ও আয়-উপার্জন করা মুবাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ উপার্জন পবিত্র, নির্দোষ। কামাই-রোজগার বা আয়-উপার্জনের দুটি দিক রয়েছে । একটি হল, মাল বা পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়। তাতে মুনাফা লাভ আর দ্বিতীয় হল, মুনাফার বিনিময়। আল্লাহ্ তাঁর কুরআনের বহু স্থানেই তার মুবাহ হওয়ার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন। যেমন বলেছেন ঃ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ -

এবং আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় হালাল করেছেন।

বলেছেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অন্যান্য কিছু লোক দুনিয়ায় পরিভ্রমণ করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধান করে এবং আরও অন্যান্য কিছু লোক আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে। (সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০)

বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ -

তোমরা তোমাদের রব্ব-এর নিকট থেকে তাঁর অনুগ্রহ পেতে চাবে, তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৯৮)

অর্থাৎ ব্যবসায় করা, ভাড়ায় দেয়া আর সেই সাথে হজ্জ-ও করা— এসবই জায়েয। মুনাফার বিনিময় করা পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَانْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ -

আর তারা যদি তোমাদের জন্যে (তোমাদের বাচ্চাদের) দুধ খাওয়ায়, তাহলে তোমরা তাদের মজুরি দিয়ে দাও। (সূরা আত-তালাক ঃ ৬)

শুয়াইব (আ) বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَاْ جُرَنِىْ ثَمَانِىَ حِجَجٍ -

আমি চাই, আমার এই দুটি কন্যার মধ্যে একজনের বিয়ে তোমার সাথে সম্পন্ন করব। তবে এ শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকরী করবে। (সূরা কাসাস ঃ ২৭)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَا جَرَا اَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ اَجْرَهُ -

যে লোক কোন মজুর নিয়োগ করবে, তাকে যেন তার মজুরি কত— তা জানিয়ে দেয়া হয়।

তিনি বলেছেন ঃ

لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَنْ يَّسْئَلَ النَّاسَ اَعْطُوهُ اَوْمَنَعُوهُ -

তোমাদের যে কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি রশি লয়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে বিক্রয় করে জীবিকা উপার্জন করা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল। কেননা লোকেরা তাকে কিছু দিতেও পারে, না-ও দিতে পারে।

আল-আমাশ ইবরাহীম, আল-আসওয়াদ আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ -

মানুষ নিজের উপার্জন থেকে আহার করবে, এটাই হচ্ছে পবিত্রতম জীবিকা। জেনে রাখো, ব্যক্তির সন্তানও তার একটা উপার্জন।

আগের কালের এক জামা'আত ফিকাহবিদদের আল্লাহ্র কথা ঃ

اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ 'তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে তোমরা ব্যয় কর'-এর তাফসীরে এই বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র উপার্জন উপায়ের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য। আল হাসান ও মুজাহিদ তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য।

এ সব আয়াতের সাধারণ ঘোষণাবলী সর্বপ্রকারের ধন-মাল থেকে সাদকা-দান ওয়াজিব করে দিয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কথা ঃ مَا كَسَبْتُمْ 'তোমরা যা উপার্জন করেছ' এ সবকেই শামিল করে, যদিও তার পরিমাণ এককভাবে যথেষ্ট নাও হয়, তবুও। ধন-মালের যত প্রকার

আছে, উপার্জনের যত উপায় আছে, সবকিছু থেকেই সাদকা করতে হবে। তার মোট পরিমাণ যাই হোক। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। নবী করীম (স) থেকে দেয় পরিমাণ কত, তার বর্ণনা পাওয়া গেছে। সর্বপ্রকারের মালের দেয় পরিমাণ সম্পর্কে অকাট্য দলীল রয়েছে। অবশ্য দেয় পরিমাণ অভিন্ন নয়, বিভিন্ন মালের উপর ধার্য পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন ব্যবসায়ের পণ্য সামগ্রী। কোন কোন লোক আয়াতটির বাহ্যিক অর্থকে দলীল বানিয়ে বলেছে যে, অস্থায়ী দ্রব্যাদির العروض। যাকাত ফরয নয়। উক্ত আয়াত আবার অনেকের মতে ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য হওয়ার দলীলও বটে। এছাড়া আরও অনেক মাল রয়েছে, যাতে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَنْفِقُوْا 'তোমরা ব্যয় কর'-এর অর্থ, সাদকা দাও, দান কর। আর সব মালের মধ্যে উত্তম মাল দিতে ও মন্দ মাল না দিতেও হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা ঃ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ –

এবং তোমরা মন্দ মালের দিক লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখো না যে, কেবল তা থেকেই তোমরা দান করবে।

এ আয়াতে تُنْفِقُوْنَ অর্থ দান কর, সাদকা দাও, এ বিষয়ে আগের ও পরের মনীষীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। কোন কোন মনীষী বলেছেন, এ হুকুমটি নফল সাদকা সম্পর্কিত। কেননা ফরয যাকাত থেকে রদ্দি মাল বের করা হলে উত্তম মালদাতার যিম্মায় থেকে যায় এবং তা তাকে আদায় করতে হবে। আমাদের মতে শব্দটিকে ওয়াজিব প্রমাণকারী না বলে নফল প্রমাণকারী বলার ব্যাপার মাত্র। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। একটি, اَنْفِقُوْا কথাটি আদেশ। আর আমাদের মতে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনীয়— ফরয। তবে তা ফরয নয়, নফল, এ কথা প্রমাণের কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা মন্দ মালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না যে, শুধু তা থেকেই তোমরা ব্যয় করবে' থেকে বোঝা যায় না যে, এটা নফল বা মুস্তাহাব। কেননা নফল বা মুস্তাহাব ব্যয়েও রদ্দী মাল ব্যয় করা নিষিদ্ধ, শুধু বিশেষভাবে মুস্তাহাব ব্যয়-ই তো নিষিদ্ধ নয়। ফরয ব্যয়ও নিষিদ্ধ। বরং রদ্দি মাল বাদ দিয়ে উত্তম মাল-ই বের করা কর্তব্য। কেননা আয়াতে তার উল্লেখ নেই। তা অপর দলীল থেকে জানা যায়। আয়াতের দাবি হচ্ছে, সাদকা দান ফরয, তার পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তা সত্ত্বেও আয়াতের দলীল যদি প্রমাণ করে যে, রদ্দি মাল ছাড়া অ-রদ্দি মাল দান করা তার কর্তব্য নয়, তা হলে আয়াতের হুকুমটি ফরয থেকে মুস্তাহাবের দিকে ফিরে যাবে না। কেননা হতে পারে, আয়াতের শুরু অংশ পালন ফরয হবে। পরে কোন কোন সাধারণ ব্যয়কে বিশেষ হুকুমের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তাতে সম্বোধনের শুরুটা বিশেষ হুকুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ও সাধারণ থেকে তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়া কর্তব্য হয় না। এর বহু কয়টি নিদর্শনও রয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা তা বলেছিও।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ –

এবং সেই ফসল থেকে, যা আমরা তোমাদের জন্যে জমিন থেকে উৎপাদন করেছি।

জমিনে যা-ই উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ কম হোক, জমিন থেকে উৎপন্ন সর্বপ্রকারের ফসলেই আল্লাহ্‌র হক ধার্য হয় এবং তা দেয়া কর্তব্য হয়। এই দলীলের ভিত্তিতেই ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, জমিনের ফসল কম হোক, কি বেশি হোক, সবটার উপর ওশর ধার্য হবে। জমিন থেকে মানুষ যা-ই উৎপন্ন করবে, তার সকল প্রকারের উপরই তা ফরয হবে। আয়াতের ধরন থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এটা হল ফরয সাদকা। কেননা আয়াতের ধারাবাহিকথায়ই আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন ঃ

وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -

তোমরা তো গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না, তবে তোমরা যদি তা উপেক্ষা কর, তাহলে ভিন্ন কথা।

এটা যদিও ঋণ ফেরত দেয়া পর্যায়ের কথা তার মালিক তা ফেরত নিতে চায়, সে সাধারণত কখনই ভালোটা রেখে মন্দটা নিতে রাজী হবে না। অবশ্য বেশি ভ্রূক্ষেপ না করলেও তেমন গুরুত্ব না দিলে ভিন্ন অবস্থা হতে পারে। বোঝা গেল, জমিনের ফসল থেকে ব্যয় করার হুকুমটা ফরয সাদকা সম্পর্কিত। তবে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে ঋণ আদায়ে উপেক্ষা করার দিকে। যদি তা নফল দানের ব্যাপার হতো তাহলে তাতে ভ্রূক্ষেপ না করার উল্লেখ হতো না। কেননা সে ক্ষেত্রে তো কম হোক কি বেশি হোক ব্যয় করতেই হতো। তার দান না করারও ইখতিয়ার রয়েছে। এতেই এমন দলীল রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, এখানে যে ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে, তা ফরয সাদকা পর্যায়ের কাজ।

তবে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তাতে ব্যয় করার জন্যে মন্দ মালের দিকে লক্ষ্য দিও না', এ পর্যায়ে জুহরী আবূ আমামাতা ইবনে সহল ইবনে হানীফ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'নবী করীম (স) দুই প্রকারের খেজুর— জারুর ও লওনুল হুবায়ক— গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।' বলেছেন, লোকেরা ফরয সাদকায় নিকৃষ্ট ধরনের ফসল দিত। তখনই এই কথাটি নাযিল হয়েছিল ঃ তোমরা মন্দ জিনিস থেকে সাদকা দিতে মনকে স্থির করো না। বরা ইবনে আজিব (রা) থেকেও এরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না, সে দিকে উপেক্ষা দেখালে অবশ্য ভিন্ন কথা!' এ পর্যায়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের কেউ যদি এ রকম হাদিয়া পায় বা কাউকে হাদীয়া দেয়া হয় যেমন দেয়া হয়েছে, তাহলে সে কখনই তা গ্রহণ করবে না। হ্যাঁ, কে কি দিল, সেদিকে লক্ষ্য না দিলে ভিন্ন কথা। অনেকে লজ্জা এড়ানোর জন্যেও খারাপ মাল দেখেও কিছু বলে না। উবায়দাতা বলেছেন, এ হুকুমটা যাকাতের প্রসঙ্গে। ফলের তুলনায় নকল দিরহাম-ও আমার অধিক পছন্দ। এ আয়াত পর্যায়ে ইবনে মাকাল বলেছেন, লোকদের কোন মালই মন্দ নয়। তবে জাল বা শক্ত দিরহাম খারাপ। তোমরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। বলেছেন, কোন লোকের নিকট তোমার যদি কোন হক বা পাওনা থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই শক্ত ও জাল দিরহাম গ্রহণ করবে না। তোমরা ভালো খেজুর ছাড়া মন্দ খেজুরও গ্রহণ করবে না। এখানেও উপেক্ষা দেখালে ভিন্ন কথা হবে। তোমরা হয়ত তা ধরলে না, এগিয়ে গেলে। নবী করীম (স) থেকে এরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। 'কিতাবুস্ সাদাকাত'-এ তা লিখিত আছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ -

জরাজীর্ণ ও এক চোখ কানা পশু যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হবে না।

এ হাদীসটি জুহরী সালিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তবে যদি তোমরা উপেক্ষা কর'-এর অর্থ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তবে তোমরা যদি আসল দাম থেকে কমিয়ে দাও। আল-হাসান এবং কাতাদাতাও এরূপই বলেছেন। বরা ইবনে আজিব বলেছেন, 'তবে তোমরা যদি তা গায়ে না মাখ, গুরুত্ব না দাও।' বলা হয়েছে, তোমরা তা গ্রহণ করো না, তবে তোমরা যদি মূল্য কমিয়ে দাও। তাহলে তোমরা ফরয সাদকায় কি করে খারাপ মাল দিতে পার ? আল্লাহ্‌র বলা কথার এসব অর্থই হতে পারে। এ সবই আল্লাহ্‌র বক্তব্য মনে করাও অযৌক্তিক হবে না। তোমরা মন্দ মালের দান গ্রহণ করবে না। তবে তোমরা যদি তেমন গুরুত্ব না দাও, উপেক্ষা কর তাহলে ভিন্ন কথা। আর উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিস বাদ দিয়ে মন্দ জিনিস গ্রহণ কেবল উপেক্ষার কারণেই সম্ভব। তারা তা বিক্রয় বা ক্রয় করলেও কম মূল্যই তা করতে পারে।

যদি কোন লোক পরিমাপের বা ওজনের জিনিসে প্রয়োজনীয় কম গুণের জিনিস দেয়, উত্তম জিনিস বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস দেয়, আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ বলেছেন, তার অতিরিক্ত দেয়া কর্তব্য নয়। মুহাম্মাদ বলেছেন, দুটির মধ্যে যা বাড়তি তা দেয়া তার কর্তব্য। ছাগল, গরু ও অন্যান্য যাকাতের পশু— যা ওজন করা হয় না, ফিতা দিয়ে মাপাও হয় না— বাড়তিটা দেয়া কর্তব্য বলে সকলেই মত দিয়েছেন। অতএব ইমাম মুহাম্মাদ আলোচ্য আয়াতকেই তাঁর মতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা মন্দ মালের উপর মন নিবদ্ধ করো না এজন্যে যে, তা থেকে তোমরা সাদকা দেবে'-এর অর্থ রদ্দি মাল দেবে না। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা নিজেরাই তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না, তবে তোমরা যদি লক্ষ্য না কর, তাহলে ভিন্ন কথা'— এ কথায় এ ভাবটিও রয়েছে যে, তোমরা— যাদের অন্যের নিকট কিছু পাওনা রয়েছে, তাদের উপেক্ষা না করারও অধিকার আছে। কোনরূপ ভ্রূক্ষেপহীনতা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং উত্তম মাল থেকেই নিজের পাওনাটা নেয়া উচিত। এ থেকে এ-ও বোঝা যায় যে, দাতার উচিত অতিরিক্তটা দিয়ে দেয়া। যেন তাতে উপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখা না দেয়। কেননা যে হক-এর কথা বলা হচ্ছে সেটা তো আল্লাহ্‌র হক। তাতে রদ্দি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। যার ফলে সে ব্যাপারে উপেক্ষার প্রশ্নই দেখা দেবে।

তবে আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ বলেছেন, যেসব জিনিসে বেশি ও কম করা জায়েয নয়, তাতে উত্তম ও রদ্দি মালের মধ্যে পার্থক্য নেই এদিক দিয়ে যে, তাতে বেশি ও কম করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সে জাতীয় মূল্যে সমান হবে। লক্ষণীয়, কেউ যদি তার ঋণের তাগাদা করে এই বলে যে, তা উত্তম মাল হতে হবে, তা-ই সে দিল, কিন্তু পরে জানালেন যে, তা রদ্দি মাল ছিল, তা হলে সে পাওনাদারকে কিছুই ফিরিয়ে দেবে না। দুটি জিনিসের মধ্যে যা বাড়তি আছে, তাও নয়। এ বিষয়ে আবূ ইউসূফ বলেছেন, ঋণদাতার নিকট থেকে গ্রহীতা যা নিয়েছিল, সেই মতো জিনিসই সে দেবে। ঋণদাতার পাওনা ফিরিয়ে দেবে কিন্তু ফরয সাদকায় তা সম্ভব নয়। কেননা তাতে গরীব ব্যক্তিটি তো কিছুই দেয়নি। সে যদি কোন ঋণ দিয়ে থাকে, তাহলে ফরয সাদকা থেকে তার পাওয়ার কিছু নেই। সে উত্তম জিনিস ফিরিয়ে দেয়ারও দাবি করতে পারে না। এ কারণে বাড়তি দিতে সে বাধ্য নয়। ফরয সাদকাদাতাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সে যেন রদ্দি

মাল দিতে সংকল্প গ্রহণ না করে। তার কর্তব্যই হচ্ছে বাছাই করা উত্তম মাল দেয়া। ফিকাহবিদগণ বলেছেন, রদ্দি মাল দিতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সে যা দিয়েছে, তা যদি উত্তমের পর্যায়ে গণ্য হয়, তাহলে তা-ই তার জন্যে যথেষ্ট হবে— যেমন ইতিপূর্বে বলেছি। তবে যে জিনিসে বাড়তি দেয়া জায়েয, সে বাড়তি দিতে আদিষ্ট। কেননা তার দেয়া জিনিসের মূল্য রদ্দি মালের তুলনায় বেশি হতে পারে। তার কতক কতকের বিনিময়ে বাড়তি সহকারে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে।

আর ইমাম মুহাম্মাদ উত্তমকে বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস দেয়া জায়েয নয় বলেছেন। তবে তার মূল্যের পরিমাণ সহকারে দেয়া যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন। ফলে বাড়তিটা দিয়ে দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব বলেছেন, কেননা দাস ও তার মনিবের মধ্যে সূদের ব্যাপার নেই। এ আয়াতে এর দলীলও আছে যে, সর্বপ্রকারের ঋণের আদান-প্রদানে উত্তম মাল থেকে রদ্দি মাল গ্রহণ করাও জায়েয। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাতে উপেক্ষা প্রদর্শনকে জায়েয বলেছেন। এর কোন প্রকারের, অন্য প্রকারের পার্থক্যের কথা বলা হয়নি। এ কথা থেকে আরও কয়েকটি তাৎপর্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যের একটি হচ্ছে, ক্রটিপূর্ণ মুদ্রার দাবি করা জায়েয, যাতে ধোঁকার মাত্রা কম, আর বেশির ভাগ উত্তম রৌপ্য বাকীতে দেয়া মালের মূলধনে। আর যে দুটি ছাড়া গ্রহণ করা জায়েয নয়, তার মুদ্রার মূল্য। এ-ও বোঝা যায় যে, এ ক্ষেত্রে রদ্দিটা উত্তমের পর্যায়ে গণ্য। উত্তম চাঁদি রদ্দি চাদির বিনিময়ে বিক্রয় করাও জায়েয বোঝায়। তবে ওজনে ঠিক থাকতে হবে। কেননা যার কতক থেকে কতকের দাবি করা জায়েয, সেখানে পরস্পর ক্রয় বিক্রয়ও জায়েয। এ-ও বোঝা যায় যে, নবী করীম (স)-এর কথা ঃ

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مَثَلاً بِمِثْلٍ -

স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান গ্রহণ করা জায়েয।

এই সমান সমান অর্থ ওজনে সমান সমান। গুণের দিক দিয়ে নয়। ঋণদাতা রাজী থাকলে রদ্দি থেকে উত্তম তাগাদা করাও জায়েয। যেমন জায়েয উত্তম থেকে উত্তমের তাগাদা করা। কেননা এ দুটির গুণের দিক দিয়ে পার্থক্যের ব্যাপারে কোন হুকুম নেই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, বলেছেন ঃ

خَيْرُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যে উত্তম, সে-ই তোমাদের মধ্যে অতীব ভালো।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ

قَضَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم وَزَادَنِى -

রাসূলে করীম (স) আমার পাওনা দিয়ে দিয়েছেন। বেশিও দিয়েছেন।

ইবনে উমর (রা) আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম ও শবী সকলেই বলেছেন ঃ

لَابَأْسَ اِذَا اَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ سُوْدًا اَنْ يَّقْبِضَهُ بِيْضًا اِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذٰلِكَ عَلَيْهِ -

কালো দিরহাম করয দিয়ে সাদা দিরহাম ফেরত নিতে পারে, যদি ঋণ দেয়ার সময় তার শর্ত করা না হয়ে থাকে।

সুলায়মান আত-তীমী, আবূ উসমান নাহদী, ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি দিরহাম করয দিয়ে তার চাইতে উত্তম ফেরত নেয়া অপছন্দ করতেন। একথা প্রমাণ করে না যে, করয গ্রহীতা রাজী হলেও তা মকরূহ। তবে দেয়া জিনিসের তুলনায় অনেক ভালো জিনিস গ্রহণ করা জায়েয নয়, যদি দাতা রাজী না হয়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَاءَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ -

শয়তান তোমাদের দারিদ্য আসার ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে নির্লজ্জতার কাজ করার আদেশ করে।

বলা হয়েছে ঃ اَلْفَحْشَاءُ 'নির্লজ্জতা' কয়েকভাবে ঘটতে পারে। তবে এখানে এর অর্থ, কার্পণ্য, বখিলী। অরবরা বখীলকে 'ফাহেশ' বলে, আর বখিলীকে বলে 'ফাহাশ' ও 'ফাহ্‌শা'।

আলোচ্য আয়াতে বখিল ও বখিলী উভয়েরই নিন্দা করা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ -

তোমরা যদি দান-সাদকা প্রকাশ কর (প্রকাশ্যভাবে দাও বা দিয়ে প্রচার কর), তাহলে তা খুবই ভালো।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র এ কথাটি নফল দান-সাদকা সম্পর্কে। আর ফরয দান-সাদকার কথা তো প্রকাশ ও প্রচার করাই উত্তম। অন্যথায় তা না দেয়ার মিথ্যা দোষারোপ ও অভিযোগ উঠতে পারে। আল-হাসান, ইয়াযীদ ইবনে আবূ হুবায়ব ও কাতাদাতা বলেছেন, সকল প্রকারের দান-সাদকায় গোপনীয়তা অবলম্বন উত্তম। অথচ দান-সাদকা প্রকাশ ও প্রচার করাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসা করেছেন। অবশ্য তা প্রকাশ না করা গোপন রাখারও প্রশংসা করেছেন। বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

যারা তাদের ধন-মাল রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় (দান) করে, তাদের এ কাজের শুভ ফল তাদের রব্ব-এর নিকট রয়েছে।

আর ঃ

وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

তোমরা যদি দান-সাদকাকে গোপন করে রাখ— প্রকাশ-প্রচার না কর এবং তা দরিদ্র লোকদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম।

আল্লাহ্‌র এ কথাটি সম্ভবত নফল দান-সাদকা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস থেকে তো সেই রূপই বর্ণিত হয়েছে। আর এ-ও হতে পারে যে, এ কথাটি সকল প্রকারের দান-সাদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে, বিশেষ করে সেসব দান-সাদকা, যেগুলো সেসবের

পাওনাদারদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দাতাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তা নফল হোক কি ফরয, অবশ্য যা সরকারের ভাণ্ডারে জমা করার জন্যে নির্দেশিত তা ছাড়া। তবে আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ যেহেতু ব্যাপক অর্থবোধক, এজন্যে সর্ব প্রকারের দান-সাদকাই এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। কেননা الصدقت শব্দের উপরে যে 'আলিফ' ও 'লাম' রয়েছে, তা জাতীয় বোঝায় অর্থাৎ দান-জাতীয় সব-ই এর মধ্যে শামিল।

এ থেকে বোঝা গেল যে, সর্ব প্রকারের দান-সাদকাই গরীবদেরকে দিতে হবে, তাদের জন্যেই ব্যয় করতে হবে। তারা তার প্রাপক তাদের দারিদ্র্যের কারণে। অন্য কোন কারণে নয়। তবে যাকাত ও ওশর ইত্যাদি ফরয যাকাত ব্যয়ের খাত আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন তাঁর এই কথার দ্বারা ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ -

ফরয সাদকা— যাকাত কেবল মাত্র ফকীর মিসকীনদের জন্যে— (সূরা আত্-তওবা ঃ ৬০)

এ আয়াতে ফরয সাদকা পাওয়ার অধিকার দারিদ্র্যের কারণেই হয় বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্য কোন কারণে নয়। এর পর আরও কয়েক প্রকারের পাওনাদারদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারাও দারিদ্র্যের কারণেই এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হয়েছে। তবে কেউ কেউ আছে যারা দারিদ্র্যের কারণে তা গ্রহণ করে না। যেমন যাদের হৃদয় জয় করা লক্ষ্য, যাকাত সংগ্রহ বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারী। এরা যা পায়, তা সাদকা বা যাকাত হিসেবে নয়। বরং যাকাত রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে সংগৃহীত হয়। তার পরে সেখান থেকে এরা নিয়ে নেয়। তাদেরকে যা দেয়া হয়, তা যাকাত হিসেবে নয়। বরং তাদের কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে এবং মুসলিম জনগণকে তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা ও উৎপাত-উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্যে অথবা তাদের হৃদয়কে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে।

বিরোধী মতের লোকেরা এ কথাটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে বলে, যাকাত-সাদকা বাবদ জমা হওয়া সমস্ত সম্পদ শুধু গরীবদেরকে দিয়ে দেয়া জায়েয, বায়তুলমালে জমা না করেই। লোকেরা যখন পশুর যাকাত গরীবদেরকে দিয়ে দেবে, তখন বায়তুলমালে জমা দেয়ার বা সরকারের প্রাপ্য কিছুই থাকবে না। তার প্রাপ্য প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে, কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তোমরা যদি যাকাত-সাদকা গোপন রাখ ও সরাসরি গরীবদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম। দান-সাদকা-যাকাত সকল বিষয়েই এ কথা প্রযোজ্য। কেননা 'সাদকাত' শব্দটি এখানে 'জাতীয়' বা সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু আমাদের মতে এ কথা এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না। কেননা এ আয়াতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কথা রয়েছে, তা হল, দাতার জন্যে তা ভালো। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য (বা বায়তুলমালে জমা দেয়ার দায়িত্ব) প্রত্যাহৃত হয় না। সরকারের তা গ্রহণাধিকারও বিলুপ্ত হয় না। আর দাতার জন্যে ভালো ও কল্যাণময় হলেই যে রাষ্ট্রীয় অধিকার অস্বীকৃত হবে, তারও কোন যুক্তি নেই। কেননা দাতার জন্যে তা ভালো ও অধিক কল্যাণকর হলেও রাষ্ট্র সরকারই তা গ্রহণ করবে। তাতে তো কল্যাণের দিকটি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে দ্বিতীয়বার তা গ্রহণ করায়। এ কথাটি নফল দান-সাদকা সম্পর্কে, তা আমরা আগেও বলেছি। কোন কোন মনীষী বলেছেন, ফরয যাকাত ইত্যাদি প্রকাশ্যভাবে দেয়া তা গোপন করার তুলনায় অনেক ভালো—

এ কথার উপর ইজমা হয়েছে। ফরয নামায সম্পর্কেও তাঁরা এ কথাই বলেছেন। আর এ কারণে আযান ইকামত হলে নামাযের জামা'আতে হাজির হওয়ার জন্যে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। ফরয নামায প্রকাশ্যভাবে পড়া উচিত বলেই তাঁরা মত দিয়েছেন। শুধু নামাযই নয়, সকল ফরয সম্পর্কেই এ কথা। অন্যথায় যাকাত না দেয়ার মিথ্যা দোষে দোষী সাব্যস্ত হওয়া খুবই সম্ভব। বে-নামাযী বলেও চিহ্নিত হতে পারে। কাজেই আল্লাহ্র কথা ঃ 'যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং সরাসরি গরীব লোকদেরকে দিয়ে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে অতীব ভালো' বিশেষভাবে নফল দানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা নফল ইবাদত গোপনে করা তার প্রকাশ করা অপেক্ষা অনেক উত্তম। তাতে রিয়াকারিতা থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّ عَرْشِهِ : اَحَدُهُمْ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تَصَدَّقَتْ بِهِ يَمِيْنُهُ -

সাতজন লোককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, তাদের একজন হল সে, যে কোন দান দিয়ে দেবে; কিন্তু তার ডান হাত কি দিয়েছে, তার বাম হাত তা জানবে না।

এ কথাটি নিশ্চয়ই নফল দান-সাদকা সম্পর্কে। ফরয সম্পর্কে নয়। এ হাদীস যে নফল দান সম্পর্কে, তার প্রমাণ এই যে, পশুর যাকাত দেয়ার পূর্বে কর্মচারী যখন আসবে ও তা দেয়ার দাবি জানাবে, তখন তা দিয়ে দেয়া তার জন্যে ফরয। এ অবস্থায় দেয়াটা প্রকাশ্য করাও ফরয হয়ে যায়। এ থেকেই বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র কথা ঃ 'আর যদি তোমরা তা গোপন রাখ ও সরাসরি গরীবকে দিয়ে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে খুবই ভালো, নফল দান-সাদকা সম্পর্কেই উচ্চারিত।

যাকাতের অংশ মুশরিককে দেয়া

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلاَ نْفُسِكُمْ -

ওদেরকে হেদায়েত করে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। বরং আল্লাহ্ই যাকে চান হেদায়েত করেন। আর তোমরা যে ধন-মাল ব্যয় (দান) কর, তার সওয়াব তোমাদের জন্যেই।

আবূ বকর বলেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতের শুরু— সম্বোধন এবং পরে বলা কথা প্রমাণ করে যে, 'ওদেরকে হেদায়েত করার দায়িত্ব তোমার উপর নয়' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, ওদের উপর যাকাত-সাদকা ধার্য করা। কেননা এর শুরুর সম্বোধনে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা যদি দান-সাদকা প্রকাশ কর, তা হলে তা খুবই ভালো'— এর পর সংযোজিত হয়েছে,'তোমার দায়িত্ব নয় ওদেরকে হেদায়েত করা। তারপরে বলা হয়েছে ঃ 'আর তোমরা যে ধন-মাল ব্যয় (দান) কর, তা তোমাদের জন্যেই কল্যাণকর।' কথার শুরুতে যা বলা হয়েছে এবং যা শেষের দিকে বলা

হয়েছে সাদকা-দান পর্যায়ে, তার তাৎপর্য হল, ওদেরকে সাদকা-যাকাত দেয়া মুবাহ, যদিও ওরা দ্বীন-ইসলামে নেই। আগের কালের ফিকাহবিদদের বহু সংখ্যকের এই মত বলে বর্ণনা এসেছে। জাফর ইবনে আবুল মুগীরা সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَاتَصَدَّقُوْا اِلَّاعَلٰى اَهْلِ دِيْنِكُمْ -

তোমরা তোমাদের যাকাত-সাদকা দেবে কেবল সেই লোকদেরকে, যারা তোমাদের দ্বীন বিশ্বাস করে।

তখনই এই আয়াত 'তাদের হেদায়েত করা তোমরা দায়িত্ব নয়' নাযিল হয়। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ تَصَدَّقُوْا اِلَّا عَلٰى اَهْلِ الْاَدْيَانِ 'বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে তোমরা সাদকা-যাকাত দাও।'

হাজ্জাজ সালেমুল মক্কী— ইবনুল হানফিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, মুশরিকদেরকে যাকাত-সাদকা দেয়া লোকেরা পছন্দ করেনি। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ নাযিল করেছেন ঃ 'ওদেরকে হেদায়েত করা তোমার দায়িত্ব নয়' তখন লোকেরা অ-ফরয দান সাদকা ওদেরকে দিতে শুরু করল।

আবূ বকর বলেছেন, 'লোকেরা অ-ফরয সাদকা-যাকাত ওদেরকে দিতে শুরু করল' কথাটি কার, তা আমি জানি না। হতে পারে, যাকাত, পশুর সাদকা ছাড়া অন্যান্য দান দিতে শুরু করার কথা বলা হয়েছে— কিরা-কসমের কাফফারা ছাড়া। তেমনি 'অতঃপর লোকেরা অ-ফরয সাদকা দিতে লাগল' কথাটিও। আয়তটি কোন দানকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেনি। কেননা লোকদের কাজ তা করা ওয়াজিব প্রমাণ করে না। তা সত্ত্বেও লোকদের ইখতিয়ার রয়েছে তাদেরকে সাদকা দেবে কি দেবে না— তার মধ্যে।

আল-আমাশ জাফর ইবনে আয়াস, সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কুরায়যা ও নযীর বংশের নিকটাত্মীয় মুসলমান ছিলেন। তাঁরা ওদেরকে সাদকা-যাকাত দেয়াকে এড়িয়ে যেতেন, দিতেন না। তাদেরকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানাতেন, তখন এ কথাটি নাযিল হয়েছিল ঃ 'ওদের হেদায়েত করা তোমার দায়িত্ব নয়' আয়াতের শেষ পর্যন্ত। হিশাম ইবনে উরওয়াতা— তাঁর পিতা— তাঁর মা আসমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'আমার মা মুশরিক ছিল কুরায়শ-আধিপত্যকালে সে আমার নিকট আসে। তখন আমি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি তার সাথে সেলায়ে রেহমী করব কিনা? জবাবে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।'

আবূ বকর বলেছেন, উক্ত আয়াতটি তাৎপর্যের দিক দিয়ে যে কথা বোঝায়, তা এ আয়াতটিরও বক্তব্য ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا -

এবং তারা আল্লাহ্‌র মুহাব্বতে মিসকীন ইয়াতীম, বন্দীদেরকে খাবার খাওয়ায়।

এ প্রেক্ষিতে আল-হাসান বলেছেন, আয়াতে বন্দী বলতে মুশরিক বন্দীকেই বুঝিয়েছেন। সাঈদ ইবনে যুবায়র ও আতা বলেছেন, ওরা আহ্‌লি কিবলা ও অন্যান্যরা।

আবূ বকর বলেছেন, প্রথম মতটি অধিক প্রকাশমান। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে কেবল মুশরিকরাই বন্দী হতে পারে। তার নযীর হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ -

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তোমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে ও ন্যায়বিচার তাদের প্রতি প্রয়োগ করবে, তা থেকে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

এ আয়াতে তাদের কল্যাণ করাকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন, যদিও তারা মুশরিক। তবে শর্ত এই যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হবে না। দান-সাদকা দেয়া তো কল্যাণময় কাজ। অতএব তাদেরকে যাকাত-সাদকাত দেয়া খুবই সঙ্গত এবং জায়েয। আর এসব আয়াত বাহ্যতই সর্ব প্রকারের দান-সাদকা তাদেরকে দেয়া জায়েয বলে। তবে নবী করীম (স) তার মধ্য থেকে যাকাত ও পশুর সাদকাকে ভিন্ন করে দিয়েছেন। আর সেই সাথে সেসব দানও, যা সরকার চালিত বায়তুলমালে দেয়া কর্তব্য রাসূলের এই কথার ভিত্তিতে ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اٰخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَاءِكُمْ وَاَرُدُّهَا فِيْ فُقَرَاءِكُمْ -

আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, তোমাদের ধনীদের নিকট থেকে সাদকা-যাকাত গ্রহণ করব এবং তা তোমাদেরই গরীব লোকদের মধ্যে ফিরিয়ে দেব।

হযরত মুয়ায (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِيْ اَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ وَيُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ -

তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর একটা হক আরোপ করেছেন তাদের ধন-মালে। তা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে।

তাহলে যে সব সাদকা— যাকাত সরকার-কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে, তা অন্যান্য সমস্ত দান সাদকা থেকে স্বতন্ত্র। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন ঃ এমন সব সাদকা-যাকাত যা সরকারের গ্রহণ করা হবে না, তা যিম্মী (অমুসলিম) যাদেরকে দেয়া জায়েয। আর যা সরকারে গ্রহণ করা হবে, তা যিম্মীদের দেয়া জায়েয হবে না। তা হলে কাফফারা, মানত ও সাদকায়ে ফিতরা ইত্যাদি যিম্মীদেরকে দেয়া জায়েয হবে।

যদি বলা হয়, ধন-মালে যাকাত তো সরকারের গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু তা যিম্মীদেরকে দেয়া জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, না আসলে তা সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। নবী করীম (স) নিজেই সরকার চালক হিসেবে তা গ্রহণ করতেন। সেই ভাবে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-ও তা

গ্রহণ করেছেন। হযরত উসমান (রা) লোকদেরকে বলেছিলেন, এটা যাকাত দেয়ার মাস। অতএব যার ঋণ আছে, তা আদায় করে দাও। পরে তার অবশিষ্ট মাল ছেড়ে দিক। এতে মালের মালিকদেরকেই তার যাকাত আদায় করার দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা গ্রহণ করায় সরকারের হক প্রত্যাহৃত হয়নি।

ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন, কোন ওয়াজিব সাদকাই কাফিরদেরকে দেয়া জায়েয নয়। যাকাত সম্পর্কিত হুকুমই কিয়াস করে তার উপর প্রয়োগ করতে হবে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ -

সে সব গরীবের জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র পথে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বলে দুনিয়ায় চলাফেরা করতে পারে না।

অর্থাৎ উপরে যে ব্যয় বা দানের কথা বলা হয়েছে, তা সাদকা-যাকাতকেই বুঝিয়েছে। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন, এ আয়াতে 'গরীব লোক' বলে মুহাজিরদেরকে বুঝিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ 'আল্লাহ্‌র পথে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে' বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কাফির-শত্রুদের ভয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বের হওয়া থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছে, বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কাতাদাতা এ কথা বলেছেন। কেননা احصار অর্থ কোন রোগ বা প্রয়োজন কিংবা ভয়-ভীতির কারণে নিজেদেরকে সর্বপ্রকারের কাজ থেকে বিরত রাখা। শত্রুরা যখন কাউকে বাইরে যেতে দেয় না, তখন তাকে বলা যাবে اُحْصِرَ 'সে পরিবেষ্টিত হয়েছে।'

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ -

তাদের নিজেদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকা ও পবিত্রতা গ্রহণের কারণে জাহিল ব্যক্তি তাদেরকে ধনী-সচ্ছল লোক বলে ধারণা করে।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সে লোকদের বাহ্যিক অবস্থা ও রূপ, ধরন-ধারণ ধনী লোকদের সাথে সাদৃশ্যশীল। তা না হলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী লোক বলে ধারণা করত না। কেননা একটি লোকের দারিদ্র্যাবস্থা দুটি জিনিস দ্বারা বোঝা যায়। তার একটি হল, বাহ্যিক অবস্থার জরাজীর্ণতা ও আউল-বাউল দেখতে। আর দ্বিতীয়টি হল তার ভিক্ষা চাওয়া এজন্যে যে, সে একজন দরিদ্র। কিন্তু কোন লোকের বাহ্যিক চাল-চলন ও বেশ-ভূষা যদি ধনী লোকদের মত হয়, তাহলে সে যে গরীব, তা বোঝা খুবই দুষ্কর। যে কোন লোক খুব সহজেই তাকে ধনী ব্যক্তি মনে করবে।

এ আয়াত একথারও দলীল যে, একজন ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ মূল্যবান ও শোভামণ্ডিত হলেও তাকে যাকাত না দেয়ার কারণ নেই। কেননা আল্লাহ তো আমাদেরকে যাকাত দিতে বলেছেন। যার বাহ্যিক অবস্থা ধনী সদৃশ, তাকেও দিতে বলেছেন। সুস্থ সবল স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকেও যাকাত দেয়া যেতে পারে। কেননা আল্লাহ্ সেসব মুহাজিরকে যাকাত দিতে বলেছেন,

যারা নবী করীম (স)-এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তারা রোগাক্রান্ত ছিলেন না, অন্ধও ছিলেন না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

سِيْمَا - تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ -

মানে আলামত; চিহ্ন। তাদের চিহ্ন দেখেই তোমরা তাদেরকে চিনতে পারবে।

মুজাহিদ এ আয়াতাংশের তাফসীরে বলেছেন, তোমরা তাদের تَخَشُّعْ শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখেই বুঝতে পারবে। সুদ্দী ও রুবাই ইবনে আনাস বলেছেন, سِيْمَاهُمْ বলে তাদের দারিদ্র্যের চিহ্ন ও লক্ষণ বুঝিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

سِيْمَا هُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ -

তাদের মুখমণ্ডলে তাদের পরিচিত সিজদা চিহ্নরূপে। (সূরা ফাতেহ ঃ ২৯)

তাই প্রথমোক্ত আয়াতে سيما অর্থ, মানুষের মুখাবয়বে খারাপ অবস্থা ও চাকচিক্যহীনতা দেখেই তাদেরকে চিনতে পারবে, যদিও তাদের বেশ-ভূষা ও বাহ্যিক রূপ খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত। হতে পারে, আল্লাহ তাঁর নবীকে এমন কোন ইল্ম দিয়েছেন, যদ্দ্বারা তাদেরকে দেখলে তাদের দারিদ্রাবস্থা তিনি জানতে পারতেন। আমরা যদিও তা বুঝতে ও চিনতে না পারি। আমরা তো জানতে পারি তখন, যখন তারা ভিক্ষা চায় অথবা তাদের চরম দারিদ্র্যাবস্থা সম্পর্কে কোন না কোনভাবে জানতে পারি। এ থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যিক লক্ষণ দেখেও অনেক সময় বোঝা যায় না যে, তার আসল অবস্থার দৃষ্টিতে তার প্রাপ্য কি? হানাফী ফিকাহবিদগণ দারুল ইসলামে মরা ব্যক্তির মধ্যে যে লক্ষণ পাওয়া যায়, তাকেই গণ্য করেছেন। অথবা তার মৃত্যু কাফিরের দেশে হলে— যখন তার ব্যাপারটি তার পূর্বে কুফর বা ইসলামের দিক দিয়ে কিছুই জানা যায়নি, তখন তার লক্ষণসমূহ বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তার উপর যদি কুফরের চিহ্ন পাওয়া যায়— যেমন পৈতা, খাতনা না করা অথবা খ্রীষ্টান পাদ্রী-পুরোহিতদের ন্যায় চুল-দাড়ি যথেষ্ট লম্বা করা ইত্যাদি পাওয়া গেলে তাকে কাফিরদের একজন মনে করতে হবে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তার জানাযার নামাযও পড়া হবে না। পক্ষান্তরে তার উপর যদি মুসলিম হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহলে মুসলমানের মতই তার জানাযার নামায পড়া ও কাফন-দাফন মুসলমানের মতই করতে হবে। আর যদি বিশেষভাবে কোন আলামতই না পাওয়া যায়, তাহলে তার মৃত্যু মুসলমানের জনপদে হলে তাকে মুসলিম মনে করতে হবে। আর কাফির জনপদে মারা গেলে তাকে কাফির মনে করতে হবে, সে জনপদটি দারুল হরব-এ হলেও। এক্ষেত্রে তার নিজের অবস্থানের লক্ষণই হল বড় প্রমাণ। তাই কোন বিশেষ লক্ষণ পাওয়া অবস্থায় তাকে যে স্থানে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেছে, সেই স্থানের দৃষ্টিতে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

পড়ে পাওয়া বালক বা বালিকা সম্পর্কেও এ বিবেচনা কাজ করবে। বাস্তব অবস্থার দৃষ্টিতে অপরাধী নির্ধারণ ও চিহ্নিতকরণের একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে হযরত ইউসূফ ও জুলায়খা সংক্রান্ত ঘটনায় আল্লাহ্র বলা ঃ

اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّمِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ - وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

তার জামা যদি সম্মুখের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়, তাহলে মেয়ে লোকটি সত্য বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের একজন। পক্ষান্তরে তার জামা যদি পেছন দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়, তাহলে মেয়েলোকটি মিথ্যা বলেছে, পুরুষটি সত্যবাদী। (সূরা ইউসূফ ঃ ২৭)

এ আয়াতে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার একটা অকাট্য মানদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং তা আলামত ভিত্তিক।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَتَعْرِ فَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ -

এবং তুমি তাদেরকে অবশ্যই চিনবে তাদের কথার স্বর শুনে। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩০)

ইউসূফ (আ)-এর ভাইরা তাঁর জামায় মিথ্যামিথ্যি রক্ত মেখে দিয়েছিল এবং তাদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে এটাকে একটি আলামত বানিয়েছিল।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَجَاءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ -

তারা তাঁর জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। (সূরা ইউসূফ ঃ ১৮)

আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا -

তারা লোকদেরকে জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না।

الحاف এর অর্থ, স্থায়ীভাবে চাইতে থাকা। কেননা الحاف অর্থ সর্বব্যাপী হওয়া, স্থায়ীভাবে ধরা। বোঝা গেল, জড়িয়ে ধরে কেবল চাইতেই থাকা নিন্দনীয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা লোকদেরকে জড়িয়ে লেপহে ধরে চায় না।' তার অর্থ, তিনি জড়িয়ে লেপটিয়ে ধরে৮ভিক্ষা চাইতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু মূলত ভিক্ষা চাইতে০তো নিষেধ করেন নি?

জবাবে বলা যাবে, আয়াতের ধরন ও সম্বোধনে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যা ভিক্ষা চাইতেই নিষেধ করে মূলগতভাবে। আর তা হল, 'মূর্খ লোক তাদের ভিক্ষা চাওয়া বিমুখতা দেখে তাদেরকে ধনী লোক বলে ধারণা করে।' তারা যদি প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষা চাইতে এবং জড়িয়ে লেপটিয়ে ধরার কাজটি না-ও করত, তাহলে তো তাদেরকে কেউ ধনী মনে করতে পারত না। আল্লাহ্‌র কথা ঃ مِنَ التَّعَفُّفِ ও তা-ই প্রমাণ করে। কেননা এ শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে 'কানায়াত' যা নিজের আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্টির ভাবধারা। ভিক্ষা চাওয়া পরিহার করা। বোঝা গেল, ভিক্ষা না-চাওয়াই তাদের আসল পরিচিতি। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَغْنٰى اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنِ اسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ -

যে লোকে পরবিমুখ হল, আল্লাহ্ তাকে ধনী বানাবেন। আর যে লোক ভিক্ষা চাওয়া থেকে বিরত থাকল, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আমরা এই যা বললাম যে, আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, কারোর কাপড়-চোপড় পরা থাকলেই তাকে যাকাত দেয়া নিষেধ নয়। তার তা গ্রহণ করাও নিষেধ নয়। যদি তার অপ্রকাশমান অবস্থা এই হয় যে, সে দরিদ্র, আর তার ঘর-বাড়ি, মাল-সরঞ্জাম যানবাহন ও খাদেম-চাকরও থাকে তার নানা প্রয়োজন পূরণার্থে, তা হলেও। কেননা হয়তবা এগুলোর তার বাস্তবিকই প্রয়োজন রয়েছে। তাই এসব সত্ত্বেও সে অ-ধনী ব্যক্তি হতে পারে। কেননা ধনী তো তাকেই বলা যায়, যার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে।

তাই কত পরিমাণ ধন-মাল থাকলে তাকে ধনী বলা যায়, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা এসেছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, কোন ব্যক্তির ঘর, পোশাক, দ্রব্যাদি, খাদেম ও যানবাহনের পরও এতটা নগদ সম্পদ থাকবে যা দুইশত দিরহামের সমান, সে ধনী ব্যক্তি, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যদি দুইশত দিরহাম পরিমাণের কম থাকে, তাহলে ধনী নয়, যাকাত গ্রহণ তার জন্যে হালাল।

ইমাম মালিক আবুল কাসিমের বর্ণনানুযায়ী মত দিয়েছেন, যার চল্লিশ দিরহাম থাকবে, তাকেও যাকাত দেয়া যাবে। মালিকের অপর এক বর্ণনানুযায়ী আর একটি মত হল, যার চল্লিশ দিরহাম আছে, তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। সওরী, আল-হাসান ইবনে সালিহ্ বলেছেন, যার পঞ্চাশ দিরহাম নগদ সম্পদ আছে, সে যাকাত গ্রহণ করবে না। উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান বলেছেন, যার এক বছরের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা নেই, তাকে যাকাত সাদকা দেয়া যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া যাবে, যার দ্বারা সে তার প্রয়োজন পূরণ করবে ও দারিদ্র্যের সীমা থেকে বাইরে গিয়ে সচ্ছলতা লাভ করবে। তাতে যাকাত ফরয হবে, কি হবে না, তার কোন সীমা নেই। আল মুজানী ও রুবাই তাঁর এ মতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ কথারও বর্ণনা দিয়েছেন যে, শক্তিমান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যে যাকাত হালাল নয়, যদি সে দরিদ্র ব্যক্তিও হয়।

মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ব্যবস্থার পরে নগদ সম্পদ হিসেবে অতিরিক্ত কারোর নিকট সঞ্চিত থাকলে সে গরীব নয়, ধনী, আমাদের পূর্বে বলা এই কথাটির সত্যতা প্রমাণকারী দলীল একটি হাদীস। হাদীসটি আবদুল হামীদ ইবনে জাফর তাঁর মুজীনা! গোত্রের এক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। সেই ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে ভাষণ দিতে শুনেছেন। তিনি বলছিলেন ঃ

مَنِ اسْتَغْنَى اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنِ اسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ اَوَاقٍ سَأَلَ اِلْحَافًا –

যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত হতে চায়, আল্লাহ্ তাকে সচ্ছল করে দেবেন, পরমুখাপেক্ষিতামুক্ত বানিয়ে দেবেন। আর যে লোক স্বীয় আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট হবে, আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোকদের নিকট ভিক্ষা চাবে, অথচ তার নিকট পাঁচ 'আউকিয়া' (দুইশত দিরহাম— সাড়ে পঞ্চাশ তোলা রৌপ্য) সমান সম্পদ রয়েছে, তাহলে সে (কুরআন নিষিদ্ধ) জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চাওয়ার কাজ করল।

হাদীসে যে পরিমাণের উল্লেখ রয়েছে, সেই পরিমাণ সম্পদ কারোর থাকলে সে দারিদ্রাবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সচ্ছলতার পর্যায়ে পৌছে গেছে। তার ভিক্ষা চাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

আমি আদিষ্ট হয়েছি, তোমাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে সাদকা-যাকাত গ্রহণ করব এবং তা তোমাদেরই গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেব। তারপরে বলেছেন, দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম। তার কমে কিছু নেই।

এই কথাটিতে ধনীর ধন পরিমাণ বলা হয়েছে দুইশত দিরহাম। অতএব এটাকেই গণ্য করতে হবে, অন্য কিছু নয়। এ থেকে এ-ও বোঝা গেল যে, যার এ পরিমাণ সম্পদ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে। কেননা নবী করীম (স) তাঁর উক্ত কথায় মানুষকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন— ধনী ও গরীব। কথিত পরিমাণ সম্পদের মালিককে ধনী বলেছেন এবং তার নিকট থেকে যাকাত নিতে আদেশ করেছেন। আর যে দরিদ্র, তাকে ধনীর নিকট থেকে নেয়া সম্পদ দেয়া হবে, সে সেই ব্যক্তি যে উক্ত পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়।

আবূ কারশাতাস সালুসী সহল ইবনুল হানযালিয়াতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি এ কথাটি ঃ

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ -

যে লোক ধন-সম্পদ নিজের থাকা সত্ত্বেও লোকদের নিকট ভিক্ষা চাবে, সে জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! مَاظَهْرُغِنَاءٍ একজনের ধন-সম্পদের প্রকাশমানতা কি ? বললেন ঃ

اِنْ يَّعْلَمَ اَنَّ عِنْدَ اَهْلِهِ مَايُغَدِّيْهِمْ وَيُعَشِّيْهِمْ -

যদি জানা যায় যে, তার সকাল-দুপুরের এবং রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা তার নিকট আছে।

জায়দ ইবনে আসলাম আতা ইবনে ইয়াসা, বনু আসাদের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাকে বলতে শুনলাম, তিনি এক ব্যক্তিকে বলছেন ঃ

مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ اُوْقِيَّةٌ اَوْعِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافًا -

তোমাদের মধ্যে যার নিকট এক আউকিয়া কিংবা তার সমমূল্যের সম্পদ আছে, সে যদি ভিক্ষা চায়, তাহলে সে (কুরআন নিষিদ্ধ) জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চাওয়ার কাজ করল।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ তাঁর পিতা, ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايَسْئَلُ عَبْدٌ مَسْئَلَةً وَلَهُ مَايُغْنِيْهِ اِلَّا جَاءَتْ شَيْنًا اَوْكُدُوْحًا اَوْخُدُوْشًا فِىْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

যে লোক একবারও ভিক্ষা চাবে, অথচ তার জন্যে যথেষ্ট সম্পদ তার নিকট রয়েছে সে

মর্যাদাহানিকর নির্লজ্জ কিংবা হীন উঞ্ছবৃত্তি অথবা কিয়ামতের দিন তার মুখে রক্তঝরা যখম হওয়ার কাজ করল।

জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একজনের ধনাঢ্যতা কি? বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম কিংবা সমপরিমাণ স্বর্ণ। এ কথাটি ভিক্ষাবৃত্তি মাকরূহ হওয়া পর্যায়ে বলা' কিন্তু তাতে সাদকা-যাকাত হারাম একথা কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয় না। নবী করীম (স) খুবই পছন্দ করতেন যে, যার নিকট সকাল-সন্ধার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সে ভিক্ষা করবে না, ভিক্ষা করা ছেড়ে দেবে। কেননা তখনকার সময়ে মুসলমান গরীব ও সুফফাবাসী এমন ছিলেন, যাদের নিজের নিকট সকাল-সন্ধায় খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণে নবী করীম (স) এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, যার নিকট এই পরিমাণ সম্পদ আছে, সে তা নিয়েই ভিক্ষা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। ভিক্ষা ত্যাগ করে স্বীয় আত্মমর্যাদাকে ভিক্ষার কলুষতা থেকে পবিত্র রাখবে। যেন যাকাত বাবত বণ্টিত সম্পদ সে পায়, যার জন্যে তা অধিক প্রয়োজনীয়। তা গ্রহণ করা বা ভিক্ষা চাওয়া হারাম, সেজন্যে নয়। সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যাকাত গ্রহণ মুবাহ হওয়ার পথ মৃত শব খাওয়ার প্রয়োজন হওয়ার পথ নয়। কেননা মৃত শব খাওয়া হালাল হয় কেবল সেই চরম অবস্থায়, যখন জীবন বাঁচানোর তা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যাকাত গ্রহণ প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তির জন্যেই মুবাহ। সে মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হওয়ার মত অবস্থায় না পৌঁছলেও— যখন তার নিকট কিছুই থাকে না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দারিদ্র্যই তার জন্যে যাকাত গ্রহণ করাকে মুবাহ করে দিয়েছে। উপরোদ্ধৃত হাদীসসমূহের ব্যবহারিক হুকুম বিভিন্ন, হাদীসসমূহও মূলত বিভিন্ন। তবে উদ্ধৃত হাদীসসমূহে দুইশত দিরহামকে যে ধনাঢ্যতার মান নির্দিষ্ট করেছে এবং তা কারোর নিকট থাকলে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ হারাম, তা সর্বসম্মত মত। এটাই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। এছাড়া আর যা কিছু, তা হয়ত মাকরূহ পর্যায়ের কিংবা তা মনসূখ হয়ে গেছে অন্যান্য হাদীস দ্বারা, যদি তার অর্থ হয় যাকাত গ্রহণের হারাম হওয়া।

সূদ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ -

যারা সূদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান স্বীয় স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ-জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

পরে বলেছেন ঃ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا -

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম করে দিয়েছেন।

আবূ বকর বলেছেন ঃ الربا -এর আভিধানিক অর্থ হল— বৃদ্ধি, বাড়তি। এ থেকেই আরবী শব্দ الرابية। তার চতুষ্পার্শ্বের জমিনের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, চমৎকার ফসল ফলে। এ থেকেই ربوة শব্দ, উঁচু ভূমি।

আরবদের কথা ঃ

أَرْبَى فُلاَنٌ عَلَى فُلاَنٍ فِى الْقَوْلِ أَوِالْفِعْلِ اِذَازَا دَعَلَيْهِ -

অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির উপর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে কথায় বা কাজে যখন সে তার চেয়ে বেড়ে যায়।

শরীয়াতী পরিভাষায় তার কয়েকটি অর্থ। যদিও আভিধানিক ভাবে এই শব্দটি নাম হিসেবে সে জন্যে তৈরী করা হয়নি। নবী করীম (স) একটি হাদীসে আগে পরে করাকে ربا বলেছেন। হাদীসটি উসামা ইবনে জায়দ (রা) বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ -

সূদ আগে পরে করার মধ্যে রয়েছে।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ

اِنَّ مِنَ الرِّبَا اَبْوَابًا لاَّتَخْفِىْ مِنْهَا السَّلَمُ فِيْ السِّنِّ -

সূদের বহু কয়টি দুয়ার রয়েছে। তা কোন লোকের নিকটই প্রকৃত নয়।

উমর (রা) এ-ও বলেছেন যে, সূদের আয়াতটি কুরআনের সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াত। নবী করীম (স) তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার আগেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। অতএব তোমরা সূদ পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর সন্দেহমূলক লেন-দেন।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ربا একটি শরীয়াতভিত্তিক নাম হয়ে গেছে। কেননা তা যদি তার আসল আভিধানিক অর্থ নিয়েই অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে তা হযরত উমর (রা)-এর নিকট নিশ্চয়ই গোপন থাকত না। তিনি আভিধানিক নামের বড় বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর যোগ্যতারও অধিকারী ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, আরবরা স্বর্ণকে স্বর্ণের, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জানত না। 'নাসা' হচ্ছে সূদ। ইসলামী শরীয়াতেও তা সূদ। অবস্থা যখন এই, তখন এ নামটিও অন্যান্য সব অস্পষ্ট নামগুলোর মত হয়ে গেছে, যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এই নামসমূহ আভিধানিক অর্থ থেকে সরে এসে শরীয়াতভিত্তিক নাম পরিগ্রহ করেছে। তা এমন সব অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা বোঝাবার জন্যে এই শব্দটি তৈরী করা হয়নি অভিধানে। যেমন الصلاة، الصَّوْمُ، الزَّكٰوةُ —এ সব কয়টিরই শরীয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা আবশ্যক, কাজেই তা সাধারণ অর্থবোধক শব্দ বলে কোন ধরনের চুক্তিকে হারাম করার দলীল হিসেবে এই শব্দটিকে ব্যবহার করা যায় না। কোন অর্থে ব্যবহারের দলীল থাকলে ভিন্ন কথা। তখন তা শরীয়াত নির্ধারিত নামে চিহ্নিত হবে। নবী করীম (স) কুরআনের আয়াত দলীল হিসেবে আল্লাহ্র কোন বক্তব্যকে প্রকাশ করে, তার ব্যাখ্যা করেছেন। কোন কোনটিকে দলীল হিসেবেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোতে আল্লাহ্র বক্তব্য যে 'তওকীফ' তা মনীষীদের নিকট অজানা ছিল না। আরবরা যে ربا বা সূদের সাথে পরিচিত ছিল, যার সাথে তাদের বাস্তব সম্পর্কও ছিল, তা হল 'করয'। যদি কেউ কারোর নিকট থেকে 'করয' নিল নির্দিষ্ট মিয়াদে, সেই মিয়াদ অনুযায়ী যদি তা ফেরত দিতে না পারত, তাহলে সময় নিয়ে নিত এবং করয-এর পরিমাণও বাড়িয়ে দিত। এটা উভয়ের সম্মতিতেই হতো। নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের সাথেও তা পরিচিত ছিল না। সাধারণত পণ্যের পারস্পরিক বিনিময় করা হতো। তাতে একই জাতীয় পণ্যে বেশি-কম হতো। তাদের মধ্যে এটাই বেশি পরিচিত ছিল, সকলেরই জানা ছিল।

এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ۔

আর তোমরা যে সূদ দাও লোকদের ধন-মালে প্রবৃদ্ধি হবে— এ উদ্দেশ্যে, তা হলে জেনে রাখবে, আল্লাহ্র নিকট কিন্তু তা বৃদ্ধি পায় না। (সূরা রূম ঃ ৩৯)

জানিয়ে দিলেন যে শর্তাধীন সেই প্রবৃদ্ধি ছিল মূলধনে সূদ। কেননা করযদাতার দিক থেকে তার কোন বিনিময় নেই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً -

তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩০)

এতে সেই অবস্থা সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে এ কালাম এসেছে। তা হল চক্র বৃদ্ধি হারে প্রবৃদ্ধির শর্ত। তারা যে সূদের লেন-দেন করত, তাকে আল্লাহ্ বাতিল করেছেন। আরও বহু প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়কেও বাতিল করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'সূদ'। আল্লাহ্র কথা وَحَرَّمَ الرِّبَا 'এবং সূদ হারাম করেছেন' কথাটিতেই সেই সব শামিল রয়েছে। رِبًا বলতে যত প্রকারের কারবার হতে পারে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার সব কিছুকেই হারাম করে দিয়েছেন। তাদের সূদী কারবার ঠিক সেই নিয়মেই হয়েছে, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হল দিরহাম বা দিনার বাড়তির শর্তে একটা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে 'করয' দেয়া।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে رِبًا বা সূদ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল সেই সূদ, যা জাহিলিয়াতের আমলে আরবে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। দ্বিতীয় হল, একই জাতীয় দ্রব্যাদির মধ্যে মাপে বা ওজনে বেশি-কম করা। এ হচ্ছে হানাফী আলিমগণের ব্যাখ্যা। আমালিক ইবনে আনাস একই জাতীয় ও সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ও পুঞ্জীকৃত হওয়াকে গণ্য করেছেন। ইমাম শাফেয়ী একই জাতীয় পণ্য নেয়া। তা হলে একই জাতীয় হওয়াটা সকলেরই নিকট গুরুত্বপূর্ণ। অন্য জিনিসের সাথে সংযুক্ত করার ফলে কম-বেশি করা হয়েছে সেই দৃষ্টিতেই। তৃতীয় হল, 'নাসা'। তা কয়েক প্রকারের। প্রত্যেকটি জিনিসের একই জাতীয় হওয়া। তার কিছুকে অপর কিছুর বিনিময়ে বিক্রয় করা— আগে পরে করে, তা মাপের জিনিস হোক, কি ওজনের পণ্য অথবা অন্য কিছু। তাই আমাদের মতে একটি কাপড়ের বদলে অপর একটি বিক্রয় করা একই জাতীয় হওয়ার কারণে জায়েয নয়। কোনটি হয় কম-বেশি করা হারাম করার শর্তে, যেখানে একই জাতীয় হওয়ার তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন। তা মাপা ও ওজন করা। দিরহাম ও দীনারের মূল্য ছাড়া অন্য কিছুতে। তাই যদি সব বিক্রয় করা হয় চুনার বদলে— আগে পরে করে, তা হলে জায়েয হবে না মাপের বর্তমান থাকার কারণে। যদি লোহা বিক্রয় করা হয় স্বর্ণের বিনিময়ে আগে পরে সময়ের ভিত্তিতে, তাহলে তা জায়েয হবে না ওজনের কারণে।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে সূদের কতিপয় দুয়ার

উমর ফারুক (রা) বলেছেন, সূদের বহু দুয়ার আছে, তা প্রচ্ছন্ন কিছু নয়। তার মধ্যে থেকে একটি হচ্ছে اَلسَّلَمُ فِى السِّنِّ —আরবরা তা জানতো ও চিনতো না। তাতে বোঝা গেল, তিনি কথাটি বলেছেন, 'তওকীফ' হিসেবে। যত প্রকারের সূদ হতে পারে তা সবই এই নামের

অন্তর্ভুক্ত শরীয়াতের দৃষ্টিতে। যেমন 'নাসা' ও বেশি-কমের করাবার শর্তের ভিত্তিতে হলেই তা সূদ। ফিকাহবিদদের নিকট এ পরিচিতিই স্থির হতো।

নবী করীম (স)-এর একটি কথা তার দলীল। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًا ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًا -

গম শস্য গমের বদলে ক্রয় বিক্রয় হতে পারে, শর্ত হচ্ছে তা একই রকমের হতে হবে, হাতে হাতে অর্থাৎ নগদা-নগদি হতে হবে। কোনটির বাড়তি হলেই সূদ হবে। বার্লির বদলে বার্লির ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, তার উভয়টা অভিন্ন প্রকারের হতে হবে, হাতে হাতে হতে হবে। কোনটির চাইতে কোনটি বেশি হলে সূদ হবে। খেজুর, নমক, স্বর্ণ, রৌপ্য— এ সবেরও তিনি উল্লেখ করেছেন। একই জাতীয় পণ্যে মাপে বা ওজনে কোনটির বাড়তি ধরা হলেই সূদ হয়ে যাবে। উসামাতা ইবনে জায়দ (রা) এ হাদীস তাঁর থেকে আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الرِّبَا فِىْ النَّسِيَةِ -

মিয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পদ্ধতি হল সূদের পদ্ধতি।

কোন কোন হাদীসের ভাষা হল ঃ

لَارِبَا اِلَّافِىْ النَّسِيْئَةِ -

সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করাতেই সূদ। তাছাড়া অপর কোনটিই সূদ নয়।

প্রমাণিত হল যে, সূদ নামটি শরীয়াতের দৃষ্টিতে কখনও ব্যবহৃত হয় تفاضل পারস্পরিক বৃদ্ধি অর্থে, আবার কখনও নাসয়িয়া— সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে মূলধন বৃদ্ধিকরণ অর্থে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন ঃ 'সূদ কেবল নাসয়িয়া পদ্ধতিতে হয়।' স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য দ্বারা রৌপ্য পারস্পরিক পরিমাণ বৃদ্ধি সহকারে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। আর এজন্যে তিনি হযরত উসামা ইবনে জায়দ (রা) বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করতেন। পরে যখন তিনি সেই হাদীস সম্পর্কে জানতে পারলেন, যাতে পণ্যসমূহের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে পারস্পরিক বৃদ্ধিতে যে লেনদেন হয়, তা-ও হারাম, তখন তিনি স্বীয় পূর্বের মত প্রত্যাহার করেন।

জাবির ইবনে জায়দ বলেছেন, লেন-দেন সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস তাঁর পূর্বমত ত্যাগ করেছেন। মুত'আ বিয়ে সম্পর্কিত মত-ও তিনি পরিহার করেছিলেন। উসামা বর্ণিত হাদীসের অর্থ হচ্ছে দুই জাতীয় পণ্যে বাড়তি-কমতি সংক্রান্ত। যেমন উবাদাতা ইবনুস সামিত (রা) ও অন্যান্যদের নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। তাতে কথা রয়েছে ঃ গম গমের বিনিময়ে একই রকমের, হাতে হাতে হলে জায়েয, এ পর্যায়ে হাদীসে ছয় প্রকারের দ্রব্যের উল্লেখ হয়েছে। পরে বলেছেন ঃ

بِيْعُوْا الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ -

তোমরা গমকে বার্লির বদলে বেচা-কেনা কর যেমন তোমরা চাও, তবে তা হাতে হাতে হতে হবে।

কোন কোন হাদীসের ভাষা হল ঃ

وَاِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ -

পণ্যের প্রকার যদি পার্থক্যপূর্ণ হয়, এক না হয়, তাহলে তোমরা সেগুলোর বিনিময় কর যেমন তোমরা চাও। তবে তা হাতে হাতে— এক হাতে দেয়া অন্য হাতে নেয়া (নগদ) হতে হবে।

এতে দুই জাতীয় পণ্যে নাসয়িয়া পদ্ধতির কারবার নিষিদ্ধ হল তা পাত্র দ্বারা মাপের হোক, কি পাল্লার দ্বারা ওজনের হোক, তাতে বেশি কম করা মুবাহ্ করা হয়েছে। উসামা (রা) বর্ণিত হাদীস এই তাৎপর্যে ব্যবহৃত। আর আয়াতে ربا বা সূদ বলতে বোঝায় ঃ

شَرْىُ مَا يُبَاعُ بِاَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهٖ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ -

যা বিক্রয় হয় তার মূল্য দিয়ে দেয়ার আগেই স্থিরকৃত মূল্যের কমে ক্রয় করা।

এ কাজ সূদ। তার দলীল হচ্ছে হাদীস, যা ইউনুস ইবনে ইসহাক তাঁর পিতা আবুল আলীয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। একজন মেয়েলোক তাঁকে বলল— আমি জায়দ ইবনে আরকামের নিকট আমার একটি দাসী বিক্রয় করেছি সে আটশত দিরহাম দেবে এই শর্তে। পরে সে সেটি বিক্রয় করে দিতে চাচ্ছে। তখন আমি সেটি তার নিকট থেকে ছয়শত দিরহামে ক্রয় করে নিয়েছি। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন— তুমি অত্যন্ত খারাপভাবে বিক্রয় করেছ এবং অত্যন্ত খারাপভাবে ক্রয় করেছ। তুমি জায়দ ইবনে আরকামকে আমার এ কথা পৌঁছিয়ে দাও যে, সে যদি এখন তওবা না করে, তাহলে রাসূলে করীম (স)-এর সাথে তার করা সব জিহাদ বরবাদ হয়ে যাবে। তখন সে মেয়েলোকটি বলল, হে উম্মুল মুমিনীন, আপনি কি বিবেচনা করে দেখেছেন, আমি যদি আমার মূলধনটাই শুধু ফিরিয়ে নিই, তাহলেও কি খারাপ হবে ? তখন তিনি বললেন ঃ

فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ -

যার নিকট তাঁর রব্ব-এর উপদেশ পৌঁছল, ফলে সে খারাপ কাজ থেকে বিরত হল, তাহলে আগে যা হয়ে গেছে, তা তার জন্যে হবে।

আর তার চূড়ান্ত ফায়সালার ব্যাপার তো আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ।

হযরত আয়েশা (রা)-এর এই সূদ সংক্রান্ত আয়াতটি এ পর্যায়ে পাঠ করা তাৎপর্যপূর্ণ, যখন মেয়েলোকটি বলেছিল, আমি যদি আমার শুধু মূলধনটাই গ্রহণ করি, তা হলেও কি খারাপ কারবার হবে ?.... হযরত আয়েশা (রা)-র দৃষ্টিতে সেটা ছিল সূদ। আর এভাবে তার নাম সূদ নির্ধারণ, এটা 'তওকীফ' পদ্ধতিতেই হয়েছে।

ইবনুল মুবারক হিকাম ইবনে জুরাইক-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট খাদ্য বিক্রয় করল বাকী মূল্যে নির্দিষ্ট মিয়াদে। যে সেই খাদ্য ক্রয় করেছিল, সে তা বিক্রয় করে দেয়ার ইচ্ছা করল নগদ মূল্যের বিনিময়ে যে তার নিকট

বিক্রয় করেছিল তার নিকট। তখন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বললেন, এটা সূদ। আর একথা জানা-ই আছে যে, সে প্রথম ধার্যকৃত মূল্যের কমে ক্রয় করতে চেয়েছিল। কেননা সমান মূল্যে ক্রয় করা বা বেশি মূল্যে ক্রয় করা জায়েয, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এটাকে সূদ বলেছেন। এ কাজ করতে নিষেধ এসেছে ইবনে আব্বাস, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, মুজাহিদ, ইবরাহীম, শবী— এই সকলের নিকট থেকে। আল-হাসান ও অন্যান্যদের মধ্যে ইবনে সিরীন বলেছেন, নগদ মূল্যে বিক্রয় করে থাকলে তা তার পুনরায় ক্রয় করা জায়েয। কিন্তু বাকী মূল্যে বিক্রয় করে থাকলে তার চাইতে কম মূল্যে ক্রয় করতে পারবে না। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট মিয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার ক্রয়-বিক্রয় চলবে।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সে যখন বিক্রয় করে দিল, পরে সে তা তার পূর্ব নির্ধারিত মূল্যের কমে ক্রয় করল, তাহলে তা জায়েয হবে। অবশ্য মূল্য হাতে নেয়ার উল্লেখ করা হয়নি।

এ-ও হতে পারে যে, তার বক্তব্যে এটা আছে যে, মূল্য হাতে নিয়ে নেয়ার পর হলে জায়েয হবে। হযরত আয়েশা (রা) ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব-এর কথা থেকে প্রমাণিত হল যে, এ কাজটা সূদ। তাঁরা দুজন 'তওকীফ'-এর ভিত্তিতেই এটাকে 'সূদ' নামে অভিহিত করেছেন। কেননা অভিধানের দিক দিয়ে এটাকে তো ربا নাম দেয়া হয়নি। অতএব এ নামকরণটা নিশ্চয়ই শরীয়াতের দেয়া নাম হবে। আর শরীয়াত নির্ধারিত নামসমূহ নবী করীম (স) কর্তৃক নির্ধারিত— 'তওকীফ'।

সূদের একটি দুয়ার—ঋণের বদলে ঋণ গ্রহণ

মূসা ইবনে উবায়দাতা আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ঃ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ - আর কোন কোন হাদীসের ভাষা হল ঃ

نَهَى عَنِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُمَا سَوَاءٌ -

মনের সাথে ঋণের বিনিময় করা যদি সে দুটিই সমান হয়, নিষেধ করেছেন।

উসামাতা ইবনে জায়দ বর্ণিত হাদীসে বলেছেন ? সূদ কেবল মাত্র 'নাসয়িয়া পদ্ধতিতে। তবে ঋণের বদলে ঋণের চুক্তিতেও সূদ রয়েছে। তবে তা মজলিস পরিমাণে হলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। কেননা গম ক্রয়ে দিরহাম দিয়ে দেবে। এ দুটি ঋণের বদলে ঋণ হবে। তবে দিরহাম গ্রহণ ও করয করার পূর্বে যদি দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। দীনার দিয়ে দিরহাম ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয, যখন সে দুটিই ঋণ। আর পরস্পর 'করয' করার পূর্বেই যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বাতিল হয়ে যাবে।

আয়াতে হারাম ঘোষিত সূদ

এক ব্যক্তির উপর এক হাজার দিরহামের মিয়াদী ঋণ থাকলে সে যদি তা অবস্থার কারণে পাঁচশত দিরহাম দেয়ার ভিত্তিতে সন্ধি করে নেয়, তা হলে তা জায়েয হবে না। সুফিয়ান হামীদ— মায়সারা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা

করলাম, ধরুন, আমার একটা ঋণ কোন ব্যক্তির উপর রয়েছে নির্দিষ্ট মিয়াদে ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে। তখন আমি তাকে বলি, তুমি যদি তাড়াতাড়ি করে আমার টাকা ফেরত দাও, তাহলে আমি তোমাকে কিছু টাকা হ্রাস করে দেব। জবাবে তিনি বললেন, এটা সূদ হবে। জায়দ ইবনে সাবিত (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, এ কাজ নিষিদ্ধ। সাঈদ ইবনে যুবায়র, শবী ও আল হিকাম-ও তাই বলেছেন। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণও এ মতই দিয়েছেন। সাধারণ ফিকাহবিদদেরও তা-ই মত। ইবনে আব্বাস ও ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, এ কাজে কোন দোষ নেই।

কিন্তু এ কথা যে বাতিল, তা দুইটি দিক দিয়ে প্রমাণিত হয়। একটি হল, ইবনে উমর (রা) এই কাজকে সূদ নামে অভিহিত করেছেন। আর শরীয়াতের দেয়া নামসমূহ যে 'তওকীফ' তা আমরা আগেই বলেছি। আর দ্বিতীয়, এ কথা জানা-ই আছে যে, জাহিলিয়াতের যুগে সূদ ছিল মিয়াদী 'করযে' শর্তভিত্তিক বাড়তি সহকারে। মূলধনের বৃদ্ধিটা বাড়ানো মিয়াদের বদল। আল্লাহ্ এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, বাতিল করেছেন। বলেছেন ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ -

তোমরা যদি এ কারবার থেকে তওবা কর— বিরত থাক, তা হলে তোমাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনটা তোমরা ফেরত নিতে পারবে।

বলেছেন ঃ

وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا -

সূদের যতটা বাকী রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও।

অর্থাৎ বাড়ানো মিয়াদের কোন বদল গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। একজনের উপর যদি এক হাজার দিরহাম পাওয়া থাকে মিয়াদের ভিত্তিতে তার এই দেয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হবে, যদি তা মিয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ফেরত দেয়। তাহলে প্রাপ্য পরিমাণ কম করে দেয়া হল মিয়াদের মুকাবিলায়। অতএব তা সেই সূদের কাজ হল, যা হারাম ঘোষণা করায় আল্লাহ্ অকাট্য দলীল পেশ করেছে। আর যদি কারোর উপর হাজার হাজার দিরহাম প্রাপ্য হয়, আর বলে যে, তার ফেরত দেয়ার মিয়াদ বাড়িয়ে দাও, আমি একশত দিরহাম বাড়িয়ে দেব, তাহলে এটা যে জায়েয হবে না, তাতে কোন মতভেদ নেই। কেননা কথিত এক শত দিরহাম তো সময়ের বদল, বাড়ানো মিয়াদের মূল্য। আর সময়ের বদল হওয়ার কারণে মূলধনের পরিমাণ কমানোর অর্থই হল অপর দিক বাড়ানো। তাই তা জায়েয হবে না। মিয়াদের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণটাই মূলত জায়েয নয়।

যেমন কেউ যদি দর্জীকে একটা কাপড় দিয়ে বলে— তুমি যদি এটা আজকেই সেলাই করে দাও তাহলে এক টাকা পাবে। আর কাল দিলে পাবে অর্ধ টাকা। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, এ দ্বিতীয় শর্তটা বাতিল। কাল-ও যদি সে সেলাই করে দেয় তাহলেও সেই এক টাকাই তার প্রাপ্য হবে। কেননা মিয়াদের কারণে মজুরি ঘাটতির কথা বলা হয়েছে। অথচ উভয় অবস্থায় মূল কাজটা তো সম্পূর্ণ। এক ও অভিন্ন। এ কারণে তা জায়েয হবে না। কেননা তাতে সময়ের মূল্য ধরা ও তাতে সময়কে বিক্রয় করা হয়।

আগের কালের যে সব ফিকাহবিদ ঋণের টাকা আগে দিলে মূল টাকা কম করা জায়েয বলে মত দিয়েছেন, তা সম্ভবত তখন, যদি তাকে শর্ত বানানো না হয়, তবেই জায়েয হবে। বিনা শর্তে হলে তাতে দোষ হবে না। অন্যান্যরা এ শর্ত ছাড়াই জায়েয বলতে সন্তুষ্ট।

আমরা বলেছি, পরিমাণে কম-বেশি হলে সূদ হবে, তার প্রমাণ হচ্ছে ছয়টি প্রকারের পণ্য সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর বলা কথা। আর ক্রয়-বিক্রয়ে 'নসয়িয়া' সূদ হবে রাসূলে করীম (স)-এর কথানুযায়ী। আর তা যদি দুই প্রকারের পার্থক্যপূর্ণ হয়, তাহলে তোমরা যেমন ইচ্ছা হাতে হাতে (নগদ) ক্রয়-বিক্রয় কর। রাসূলের কথা ঃ إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ 'নাসয়িয়া' সূদ। আর পশু ক্রয়-বিক্রয় 'মূল্য অগ্রীম পণ্য বাকীতে' যে 'বায়য়ে সিলম' হয়, তা সূদ হয় সেই 'নাসয়িয়া' 'সূদ' কথাটির কারণেই। আর তার কথা ঃ 'প্রকারে যদি পার্থক্যপূর্ণ হয়, তাহলে কেনা-বেচা কর, যেমন চাও, হাতে-হাতে।' হযরত উমর (রা) সূদ বলেছেন বাকীতে বিক্রয় করা জিনিসকে তার মূল্য আদায় করার আগেই তা কম মূল্যে ক্রয় করাকে। এর ব্যাখ্যা আমরা পূর্বেই দিয়েছি। আর মিয়াদের আগে তাড়াতাড়ি ঋণের টাকা ফেরত দেয়ার শর্তে সেই টাকার পরিমাণ কম করাও সূদ। ফিকাহবিদগণ ছয় প্রকারের পণ্যের পরিমাণে কম-বেশি করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন। এ পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর হাদীস বহু কয়টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর বর্ণনাকারী বহু সংখ্যক এবং ফিকাহবিদগণ সে হাদীসকে ব্যবহার করতে সম্পূর্ণ একমত বলে সে হাদীসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, এই অকাট্য দলীলের তাৎপর্যের সাথে হুকুম সম্পর্কিত। যা অন্য বিষয়েও গণ্য করা যেতে পারে, করা উচিত। তবে এ ঐকমত্যের পর বর্গ (generic) বিবেচনায় মতপার্থক্য করেছেন। সে মতপার্থক্যের দিকগুলো এ আলোচনার শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি। তবে পরিমাণে বেশি ও কম করা হারাম হওয়াটা এই ছয়টি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের দৃষ্টিতে বিরল মতের কিছু লোক যে-ছয়টি বিষয়ে হারাম হওয়ার 'তওকীফ' এসেছে, অন্যগুলোকে হারামের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, এ পর্যায়ের যে মতপার্থক্য আছে, তা তারা গণ্য করে না। হানাফী আলিমগণ যখন পাত্র দ্বারা মাপ ও পাল্লার ওজনকে গুরুত্ব দেন, তা হাদীস থেকে যেমন প্রমাণিত, তেমনি চিন্তা-বিবেচনায়ও যুক্তিসঙ্গত। বিভিন্ন স্থানে আমরা এটার উল্লেখ করেছি। হাদীসের কথার ধরন থেকেই তা প্রমাণিত এভাবে যে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ كَيْلاً بِكَيْلٍ -

স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ— সমগুণে, সম-পরিমাণে সম-ওজনে। গমের বদলে গম সমগুণে, সম-পরিমাণে।

এ হাদীসে পাল্লার ওজনে বিক্রয়ের জিনিস ওজনে সমান সমান হতে হবে। আর মাপে বিক্রয়ের জিনিসে সমান সমান ও পুরাপুরি হওয়া বাধ্যতামূলক। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হারামকরণে মাপ ও ওজনটা বর্গের মিলিত হয়ে গণ্য হবে।

বিরোধী মতের লোকেরা আয়াতে ব্যবহৃত أكل খাওয়া শব্দটির বলে দলীল দিয়েছেন যে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّاكَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ -

যারা সূদ খায়, তারা কেবল সেই ব্যক্তির মতই দাঁড়ায় যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল বানিয়ে দিয়েছে।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَاتَاْكُلُوا الرِّبَا 'তোমরা সূদ খেয়ো না।'

দুটি আয়াতেই সূদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ সূদ শুধু খাদ্রদ্যব্যেই হবে। খাদদ্রেব্য ছাড়া অন্য কিছুতেই সূদের প্রশ্ন উঠে না।

কিন্তু তাদের এ কথা আমাদের মতে তাদের মত প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করে না, তার কয়েকটি দিক রয়েছে। তার একটি, পূর্ব যেমন বলেছি— শরীয়াতে 'রিবা' বা 'সূদ' শব্দটি 'মুজমাল'— অস্পষ্ট। তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক। তার এ সাধারণত্বের কারণে তাকে দলীল বা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা সহীহ্ হতে পারে না। অপর একটি দলীল দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে যে, তা সূদ। তারপরই তাকে আয়াতটির ভিত্তিতে হারাম করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে যে, তা খাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়, খুব বেশি করা গেলেও খাদ্যে সূদ প্রমাণিত হতে পারে। তবে সর্ব প্রকারের খাদ্যে সূদ, একথা কিন্তু আয়াতে নেই। আমরা প্রমাণ করেছি যে, বহুসংখ্য খাদ্যদ্রব্যেই সূদ হতে পারে। আমরা যখন তা করেছি; তখন আয়াতের আরোপিত দায়িত্বই পালন করেছি মাত্র। আর এক হাজার টাকা এক হাজার একশত টাকার বিনিময়ে বিক্রয় হারাম। এই বিষয়ে যে 'তওকীফ' ও মতের ঐক্য রয়েছে, যেমন হাজার টাকা হাজার টাকার বিনিময়ে মিয়াদের ভিত্তিতে বিক্রয় করা বাতিল। আমরা তা প্রমাণ করেছি। এতে শর্তাধীন মিয়াদ মূলধনে কমতির স্থলাভিষিক্ত হল ঃ তা এক হাজার টাকা এক হাজার একশত টাকায় বিক্রয় করার সমান হল। অতএব 'করয'-এর ক্ষেত্রে মিয়াদ ভিত্তিতে বাড়তি কমতি করা সহীহ্ নয়। যেমন জায়েয নয় হাজার টাকার করয-এর বিনিময়ে হাজার একশত টাকা গ্রহণ। কেননা মিয়াদে কম করা ওজনে কম করার মতই। আর সূদ কখনও হয় ওজনে কম করার দিক দিয়ে, আর তা কখনও হয় মিয়াদে কম করার দিক দিয়ে। করয-এও সেই রকমই হওয়া উচিত।

কোন প্রশ্নকারী যদি বলে যে, এদিক দিয়ে 'করয' বিক্রয়ের মত ব্যাপার নয়। কেননা বদল বা বিনিময় করয করার পূর্বেই 'করয' পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা হতে পারে। তা জায়েয কিন্তু হাজার ঢাকা হাজার একশত টাকার বিক্রয় করাতে তা জায়েয হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, মিয়াদে কম ধরা হয় যদি তা শর্তাধীন হয়। যদি তা শর্তাধীন না হয়, তাহলে 'করয' ছেড়ে দেয়ার দুইটি মালের কোন একটিতে কমতি হওয়া জরুরী হয় না। বিক্রয়টা অপর তাৎপর্যের কারণে বাতিল হয়। যাতে একটির অপরটি থেকে কম হয় না যেমন একই মজলিসে পারস্পরিক 'করয' ওয়াযিব হওয়ার দুই প্রকার বা একই প্রকারের কোন পার্থক্য ঘটে না। অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে। এ দুটির মধ্যে বেশি ও কম হওয়া জায়েয। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম, ও দুটির করয-এর কারণ এদিক দিয়ে নয় যে, করয তরক করা হলে কমতির কারণ ঘটবে করয করা হয়নি এমন জিনিসে। এক ব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তির

নিকট হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম বিক্রয় করে। তার মূল্য কয়েক বছর ধরে নিল না। তাহলে গোলাম— ক্রেতার পক্ষে হাজারের উপর মুনাফা নিয়ে সেটি বিক্রয় করে দেয়া। আর যদি একমাস মিয়াদের শর্তে হাজার টাকায় তা ক্রয় করে, মিয়াদ হয়ে গেলেও ক্রেতার জন্যে হাজারের উপর মুনাফা নিয়ে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না সে বলবে যে, সে তা বাকী মূল্যে ক্রয় করেছিল।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, চুক্তিতে যে মিয়াদের শর্ত হয়, তা মূল্যে হ্রাস সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তা ওজনে কম হওয়ার মতই হয়ে যায় কার্যত। ব্যাপার যখন এই তখন 'করয' ও বিক্রয়ের মধ্যে উপরোল্লিখিত দিক দিয়ে সাদৃশ্য হওয়া সহীহ। তার উপর এ প্রশ্ন আসতে পারে না। তাতে মিয়াদ বাড়িয়ে দেয়া বাতিল প্রমাণিত হয় নবী করীম (স)-এর এ কথার দ্বারা ঃ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ সূদ শুধু 'নাসয়িয়া'য়। এতে বিক্রয় ও 'করয'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এটা সর্বসম্মত। তা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, 'করয' যখন শুধু অনুগ্রহস্বরূপ হয়, তা হাতে নিয়ে না নেয়া পর্যন্ত সহীহ্ হয় না, ঠিক 'হেবার' মত। অতএব তাতে কোন মিয়াদ নির্ধারণ সহীহ্ হবে না, যেমন 'হেবায়' সহীহ্ হয় না। নবী করীম (স) তাতে মিয়াদ নির্ধারণ বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ যে লোক কোন প্রতিষ্ঠান বানালো, তা তার হবে এবং তার পরে তা হবে তার ওয়ারিশানদের। মালিকানার শর্ত হিসেবে সময় বা মিয়াদ নির্ধারণকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন।

উপরন্তু টাকা-পয়সার করয হল ধারে লওয়া। আর ধারে লওয়াটাই করয। কেননা তাতে উপকার গ্রহণের মালিক অন্যকে বানিয়ে দেয়া হয়। কেননা 'করয' বাদ নেয়া আসল মূলধনটা খরচ না করাতে সে তার কোন ফায়দাই পাবে না। এই কারণেই হানাফী মনীষীরা বলেছেন, কেউ যখন কাউকে টাকা-পয়সা ধারে দিল, সেটা 'করয' হল। এ কারণে নগদ-টাকা ভাড়ায় লাগানোকে তাঁরা জায়েয বলেন নি। কেননা তা একান্তই 'করয'। সে নগদ টাকা ধারে নিয়েছে এ শর্তে যে, সে তার চাইতে বেশি ফেরত দেবে। ধারের ক্ষেত্রে যখন মিয়াদ নির্ধারণ সহীহ নয়, তখন 'করয'-এও তা সহীহ্ হবে না।

নগদ টাকার 'করয' ধারে লওয়া, একথা একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত। হাদীসটি ইবরাহীম-আল হিজরী আবুল আহ্ওয়াস— আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

تَدْرُوْنَ اَىُّ الصَّدَقَةِ خَيْرٌ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ - قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمِنْحَةُ اَنْ تَمْنَعَ اَخَاكَ الدَّرَاهِمَ اَوْظَهْرَالدَّابَّةِ اَوْلَبَنَ الشَّاةِ وَالْمِنْحَةُ هِىَ الْعَارِيَةُ -

কোন্ সাদকা সর্বোত্তম, তা কি তোমরা জান? সাহাবীগণ বললেন, তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-ই ভালো জানেন। বললেন, সর্বোত্তম সাদকা হচ্ছে অনুগ্রহ। তুমি তোমার ভাইকে টাকা-পয়সা দিয়ে অনুগ্রহ করবে কিংবা উটের পিঠ দিয়ে বা ছাগলের দুধ দিয়ে। প্রকৃত অনুগ্রহ হল ধার দেয়া।

টাকা-পয়সা 'করয' দেয়াকে এ হাদীসে ধার দেয়া বলা হয়েছে। অপর হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ -

অনুগ্রহ অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।

ধার দেয়ার মিয়াদ নির্ধারণ যখন সঠিক নয়, তখন 'করয'-এও তা সহীহ্ হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী 'করয'-এর সময় নির্ধারণকে জায়েয বলেছেন।

ক্রয়-বিক্রয়

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ -

এবং আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের ক্রয়-বিক্রয় মুবাহ এবং হালাল। কেননা بَيْعٌ শব্দটি আভিধানিকভাবে বোধগম্য ও যুক্তিসঙ্গত একটা অর্থ বোঝাবার জন্যে রচিত। আর তা হল ঃ

تَمْلِيْكُ الْمَالِ بِمَالٍ بِاِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا -

মালের বদলে একটা মালের মালিক বানিয়ে দেয়া উভয় পক্ষের রাজী বা সম্মত হওয়ার ভিত্তিতে প্রস্তাবনা ও কবুলের মাধ্যমে।

ভাষার দিক দিয়ে بَيْعٌ শব্দটির এ-ই হচ্ছে প্রকৃত তাৎপর্য। এ ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু আছে জায়েয, কিছু কিছু 'ফাসেদ'— খারাপ। কিন্তু তা সাধারণ অর্থবোধক শব্দ بَيْعٌ-এর আওতার মধ্যেই রয়েছে এ পার্থক্য সত্ত্বেও যে, তার কোন কোনটি জায়েয আর কোন কোনটি জায়েয নয়। আলোচ্য আয়াতটি পটভূমি সাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তার দ্বারা বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কেননা অনেক প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় এমন, যা নিষিদ্ধ। যেমন হাতে নেয়া হয়নি এমন জিনিস বিক্রয় করা। মানুষের নিকট নেই, এমন জিনিস বিক্রয় করা। ধোঁকার (غرر) ক্রয়-বিক্রয়। অজানা জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়। হারাম জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা। আয়াত পড়ে যদিও এ সব ও অন্যান্য সর্বপ্রকারের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয মনে হয়; কিন্তু তার মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক ক্রয়-বিক্রয়কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিশেষীকরণ যদিও আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি সাধারণ তাৎপর্য হরণ করে না। যে সব ক্রয়-বিক্রয় এই বিশেষীকরণের আওতায় আসেনি এবং তার কোন প্রমাণ বা দলীল-ও পাওয়া যায়নি, তা অবশ্যই সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে গণ্য থাকবে। আয়াতটি ওয়াকফ করা সম্পত্তিও বিক্রয় করা জায়েয প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ্ তো যে-কোন ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ঘোষণা করেছেন। ক্রয়-বিক্রয় তো একজনের প্রস্তাবনা ও অন্য জনের গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে চুক্তিকারীর জন্যে মালিকানা সঙ্ঘটিত হয় না। যেমন উভয় পক্ষের ইখতিয়ারের শর্তে যে সব বিক্রয় চুক্তি গৃহীত হয়, তা মালিকানাকে জরুরী করে দেয় না। অথচ তা ক্রয় ও বিক্রয়। দুই পক্ষের দুই উকিল ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে কিন্তু তারা কেউ বিক্রয়ের জিনিসের মালিক হয় না।

আল্লাহ্র কথা ঃ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'এর সূদ হারাম করেছেন'। এ আয়াতটিও মোটামুটি কথা বলেছে। এ কারণে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। সূদের কোন কোন দিক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত। ক্রয়-বিক্রয় নয়, এমন ব্যাপারেও সূদ থাকে। তা হচ্ছে জাহিলিয়াতের সূদ। যে 'করয' এ মিয়াদের শর্ত এবং 'করয' গ্রহীতাকে বাড়তি মাল ফেরত দিতে হয়, তাতেও সূদ হয়।

আয়াতের ধারাবাহিকতায় সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিশেষীকৃত করে নেয়া হয়েছে সূদী ক্রয়-বিক্রয়কে। আল্লাহ্র কথা ঃ 'এবং ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন।'

ইমাম শাফেয়ী মনে করেছেন الربا। 'সূদ' কথাটি কখনই মোটামুটি কথা ছিল না। তা-ই জরুরী করেছে بيع শব্দের মোটামুটি অবস্থা। কিন্তু আমাদের মতে তা নয়। কেননা যেসব ক্রয়-বিক্রয়কে সূদ নাম দেয়া হয়নি, তাতে তার সাধারণত্বের দিকটি অব্যাহত রয়েছে। তবে যেটার সূদ হওয়ার বা না হওয়ার ব্যাপারে সংশয় আছে, যেখানে সিদ্ধান্তহীন থাকতে হবে। যেটা সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, তা সূদ নয়, সূদ হারাম হওয়ার আয়াতকে তার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করা ঠিক নয়। উসূলিল ফিকাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا -

তা এজন্যে যে, তাঁরা বলেছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের কাজটি তো সূদের মতই।

কাফিররা সূদকে মুবাহ বলে বিশ্বাস করত। তাদের এ বিশ্বাসের কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, সূদ হিসেবে বাড়তি যা লওয়া হয় এবং সর্বপ্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করা হয়, এ দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। এ ব্যপারে আল্লাহ তা'আলা শরীয়াতের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়ার যে মহা কল্যাণ সমূহ নিহিত রেখেছেন, তার কথা তারা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। তাদের এ ভুলে যাওয়া ও মূর্খতার নিন্দা করেছেন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে। কিয়ামতের দিন তাদের যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদের উপর যে মহা আযাব নাযিল হবে, সে বিষয়ে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন।

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন'— আল্লাহ্র এ কথাটিকে দলীল বানিয়ে বলা হয়েছে যে, ক্রয়কারী যে জিনিস দেখেনি তা তার নিকট বিক্রয় করা জায়েয। গম সমান পরিমাণের গমের সাথে বিনিময় পদ্ধতিতে ক্রয় করাও জায়েয বলা হয়েছে। তা হস্তগত করার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায় না। তা এ জন্যে যে, যে শব্দ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতেই ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কাম ও কবজা করার, তার উপর হস্তক্ষেপ করার, তার মালিকানা লাভ করার এবং এ পর্যায়ে অন্যান্য যাবতীয় কাজ সবই গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। পারস্পরিক কবজা না করলেও এ সংক্রান্ত হুকুম আহ্কাম পেতে হবে। এ আয়াতটি ঠিক আল্লাহ্র এ কথাটির মতই ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ -

তোমাদের মা'দেরকে তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। (সূরা আন-সিনা ঃ ২৩)

এর অর্থ মাদের সাথে যৌন সম্ভোগ সম্পর্ক স্থাপন হারাম করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র এ কথাটিকেও সেই কথার দলীল হিসেবে পেশ করা হয় ঃ

لَاتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ –

তোমরা তোমাদের ধন-মাল পারস্পরিকভাবে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক পন্থায় পারস্পরিক বিনিময় হলে ভিন্ন কথা। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৯)

তা দুটি দিক দিয়ে বিবেচ্য। একটি ক্রেতা-বিক্রেতার পণ্য হস্তগত করা ছাড়াই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগে ও পরে খাওয়া মুবাহ হওয়াই এ আয়াতের দাবি। আর দ্বিতীয়, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অপর পক্ষের 'কবজা' করার পূর্বেই ক্রয়কারীর পক্ষে তা খাওয়া মুবাহ হওয়া।

আর আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ –

অতঃপর যার নিকট তার রব্ব-এর নিকট থেকে নসীহত-উপদেশ পৌঁছে গেছে এবং সে কাজ থেকে বিরত রয়েগেছে, তার জন্যে পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা জায়েয হবে। আর তার গোটা ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট সোপর্দকৃত।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, নিষেধের পর যে লোক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকল, তার জন্যে তা হালাল হবে, সূদ হারাম হওয়ার পূর্বে যা তার দখলে চলে গেছে ও হস্তগত হয়েছে। আর যা তার দখলে যায় না, হস্তগত হয়নি তা সে পাবে না। কেননা আয়াতের ধারাবাহিকতায়ই বলে দেয়া হয়েছে যে, যা হস্তগত হয়নি— দখলে আসেনি, তা নিষিদ্ধ।

যা দখলে আসেনি— হস্তগত হয়নি তা আল্লাহ্র এ আয়াত দ্বারাও বাতিল ঘোষিত হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا – اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, আর যে সূদ এখনও অনাদায় রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার লোক হয়ে থাক।

এ আয়াত দ্বারা এখনও হস্তগত হয়নি— এমন যাবতীয় সূদকে বাতিল ঘোষণা করেছেন; সূদ হারাম ঘোষণা নাযিল হওয়ার পূর্বে তার চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া থাকলেও তা গ্রহণ করা যাবে না। যা এর পূর্ব পর্যন্ত হস্তগত হয়েছে তার চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার তাগিদ করা হয়নি—কেননা তার লেন-দেন সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন এ আয়াতটিতে ঃ 'যার নিকট তার রব্ব-এর নিকট থেকে উপদেশ-নসীহত এসেছে, পরে সূদ থেকে বিরত হয়েছে, তার পূর্বে যা লেন-দেন হয়ে গেছে, সেটা জায়েয।'

সুদ্দী প্রমুখ তাফসীরকারের এ মত-ই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

এবং ছেড়ে দাও যে সূদ এখনও অনাদায় রয়ে গেছে তা, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকে।

অর্থাৎ যা 'কবজা' করা হয়নি, নিয়ে নেয়া হয়নি, তাকে আল্লাহ্ বাতিল করে দিয়েছেন; যা হস্তগত হয়েছে, তা বাতিল করা হয়নি।

এরপর বলেছেন ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ -

যদি তোমরা এখন তওবা কর, তাহলে তোমাদের মূলধনটা ফিরিয়ে নিতে পারবে।

যা এখনও হস্তগত হয়নি সেই সূদ বাতিল করার এটা তাগিদী ঘোষণা। মূলধন ফেরত পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কেননা তাতে তো সূদ নেই, কিছু পরিমাণ বাড়তিও তাতে নেই।

ইবনে উমর ও জাবির (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর বিদায় হজ্জ-এর ভাষণে মক্কায় বলেছিলেন— জাবির (রা) বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে বলেছিলেনঃ

اِنَّ كُلَّ رِبَا كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبَا اَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

জাহিলিয়াতে প্রচলিত সর্বপ্রকারের সূদ— সূদী কারবার আজ স্থগিত। আর সর্বপ্রথম যে সূদকে আমি মওকূফ করে দিচ্ছি, তা হল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদ।

নবী করীম (স)-এর এ কাজটি— হস্তগত না হওয়া সূদকে বাতিল করা এবং যা হস্তগত হয়েছে তা মেনে নেয়া— কুরআনের আয়াতের সাথে পুরাপুরি সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল।

নবী করীম (স)-এর আলোচ্য ভাষণে বহু সংখ্যক আইন-বিধানের উল্লেখ হয়েছে। তার একটি, হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির উপর এমন যা কিছুই ঘটেছে, যার কারণে তা হারাম হওয়া জরুরী, তা সংঘটিত হওয়া অবস্থায় মওজুদ থাকার মতই। আর যা হস্তগত করার পর ঘটেছে, যার দরুন সে চুক্তির হারাম হওয়া জরুরী হয়েছে, তা ভেঙ্গে দেয়া জরুরী নয়। এটা খ্রীস্টানদের কাজের মতো। তারা দুইজন যখন কোন দাস পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় করবে মদের বিনিময়ে— মদ দিয়ে দাস ক্রয় করবে, আমাদের মতে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। মূল্য বাবদ মদ হস্তগত করার আগেই যদি তাদের দুজনের একজন ইসলাম কবুল করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন শিকার ক্রয় করে, পরে ক্রেতা বা বিক্রেতা ইহরাম বাঁধল, তাহলে শিকার ক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তার উপর এমন কিছু ঘটেছে, যার দরুন হস্তগত করার পূর্বে চুক্তিটি হারাম হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছেন সেই সূদ, যা তখনও হস্তগত হয়নি। কেননা তার উপর এমন কিছু ঘটেছে যার দরুন হস্তগত করার পূর্বেই তার হারাম হয়ে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে— তখন মদ্য হস্তগত করা হয়ে থাকলেও। অতঃপর তারা দুজন ইসলাম কবুল করেছে অথবা ইহরাম বেঁধেছে, যা ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করেনি। যেমন হস্তগত হওয়া সূদকে আল্লাহ বাতিল করে দেননি যখন সূদ হারামের আয়াত নাযিল করেছেন। এটা জায়েয। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তখন ক্রয় করা দাসকে হত্যা করা হস্তগত করার পূর্বে বাধ্যতামূলক হবে না। ক্রয়-বিক্রয়টাও বাতিল হয়ে যাবে না। ক্রেতার জন্যে অপরাধীর অনুসরণ জায়েয এ দিক দিয়ে

যে, ক্রয়-চুক্তির উপর চুক্তি হারাম হওয়ার কোন কারণ সঙ্ঘটিত হয়নি। কেননা চুক্তিটি স্বরূপে বহাল রয়েছে যেমন ছিল। আর মূল্যটা পণ্যের স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। বিক্রেতা ও ক্রেতার জন্যে ইখতিয়ার থাকবে, এটাই যথেষ্ট।

এ আয়াত এ কথার একটা দলীল যে, বিক্রেতার হাতে পণ্যটির ধ্বংস হওয়া এবং তাতে 'কবজা' প্রত্যাহৃত হওয়া চুক্তি বাতিল হওয়াকে জরুরী করে দেবে। হানাফী ফিকাহবিদ ও ইমাম শাফেয়ী এ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, বাতিল হবে না, মূল্যটা দেয়া ক্রেতার জন্যে বাধ্যতামূলক কেননা তাকে নিষেধ করা হয়নি।

আয়াতটি স্পষ্ট করে বলে যে, পণ্য হস্তগত করাটা ক্রয় বিক্রয়ের সম্পূর্ণতা। আর 'কবজা' প্রত্যাহার চুক্তি বাতিলের কারণ। তা এজন্যে যে, আল্লাহ যখন সূদ হস্তগত করাকে প্রত্যাহার করেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যে চুক্তি করেছিল তাও বাতিল করে দিয়েছেন। তখন শুধু মূলধন ফেরত নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে আদেশ করেছেন। তাতে বোঝা গেল যে, পণ্য হস্তগতকরণ চুক্তি সহীহ্ হওয়ার অন্যমত শর্ত। আর চুক্তির উপর যখনই এমন কিছু ঘটবে, যা তাকে প্রত্যাহৃত করে, তা সেটিকে অনিবার্যভাবে বাতিল করে দেবে।

তাতে এ প্রমাণ-ও রয়েছে যে, 'দারুল হরবে' যে সব চুক্তি হবে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ও মুসলিম ইমামের বিজয় সাধিত হলে তা ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন হবে না, তা খারাপ ভিত্তির উপর চুক্তিকৃত হয়ে থাকলেও। কেননা একথা জানা-ই আছে যে, আয়াতটির নাযিল হওয়া ও নবী করীম (স)-এর আরাফাতে ভাষণ দান এবং সেখানে হস্তগত করা হয়নি এমন সূদ প্রত্যাহার করা— এ দুয়ের মাঝে মক্কায় বিজয় লাভের পূর্বে সূদের যে চুক্তি সঙ্ঘটিত হয়েছিল, সেগুলোকে পরে ভেঙ্গে দেয়া হয়নি। তাতে আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কি ছিল এবং তা নাযিল হওয়ার পর কি হয়েছে, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য বা তারমত্য করা হয়নি। এ থেকে বোঝা গেল, দারুল হরবে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে যেসব চুক্তি সঙ্ঘটিত হবে, তন্মধ্যে যা হস্তগত করা হয়েছে তা ইসলামের বিজয় ও মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা ভেঙ্গে ফেলা হবে না। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'যার নিকট তার রব্ব-এর নিকট থেকে উপদেশ আসবে এবং সে বিরত হবে, তা হলে আগে যা হয়ে গেছে, তা তার হবে'-ও সেই কথাই প্রমাণ করে। কেননা যা করায়ত্ত হয়েছে, তাকে আল্লাহ 'ইসলাম-পূর্ব' বলে চিহ্নিত করেছেন।

فَلَهُ مَا سَلَفَ 'তার জন্যে তা যা আগে হয়ে গেছে' এ কথাটির একটি তাৎপর্য এ-ও বলা হয়েছে যে, যে সব গুনাহ আগে হয়ে গেছে তা আল্লাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু কথাটি সে পর্যায়ের নয়। কেননা এর পরই আল্লাহ বলেছেন ঃ 'তার গোটা ব্যাপারটাই আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ।' অর্থাৎ যে কাজে মানুষ সওয়াব বা আযাব পাওয়ার যোগ্য হবে, সেগুলোর হুকুম পরকালে কি হবে তা ইহকালে আমাদেরকে জানানো হয়নি। অপর দিক দিয়ে তা-ই যদি বক্তব্য হতো তা হলে আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি, তা অস্বীকৃত হতো না। তাহলে দুটি জিনিস এক সাথে হতো। কেননা এ দুটিই হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন, আর ইসলামের পূর্বে যা সে কবজা করে নিয়েছে তাও তার জন্যে হয়ে যাবে। আর এ কথাটি প্রমাণ করে যে, যুধ্যমান কাফির লোকদের যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয়— তারা যখন

ইসলাম কবুল করবে সব অতীত বলে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহই বলে দিয়েছেন ঃ 'যা অতীত হয়ে গেছে, বা সব তার হয়ে গেছে।'

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে আর যে সূদ অনাদায় রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।

আবূ বকর বলেছেন, এ আয়াতটির দুটি অর্থ হতে পারে। একটি তোমরা যদি আল্লাহ্‌র এ আদেশ মেনে না লও, এবং তাঁর অনুগত না হও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিক থেকে যুদ্ধের কথা জেনে নাও। আর দ্বিতীয়— অবশিষ্ট সূদ যদি তোমরা ত্যাগ না কর, আল্লাহ্‌র হুকুম নাযিল হওয়ার পর-ও তা ত্যাগ না কর, তাহলে .... তা হারাম একথা বিশ্বাস করলেও কার্যত যদি তা ত্যাগ না কর, তাহলে তোমাদের পরিণতি হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাতা ও রুবাই ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত, যে লোক সূদী কারবার করল, ইমাম তাকে তওবা করতে বলবে। তওবা করলে ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। কেননা তখনও তার সূদী কারবার করার অর্থ হবে, সে তা হালাল মনে করে। আর হারামকে হালাল মনে করা ইসলামী মনীষীদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী সুস্পষ্ট কুফরী।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

তোমরা আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের অপেক্ষা কর।

সূদী কারবারীদেরকে কাফির বলতে বলে না। কেননা উক্ত কথাটি কুফরীর কম গুনাহ খাতার কারণেও এরূপ হুমকি দেয়ার আবশ্যক হতে পারে। জায়দ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) হযরত মুযায় (রা)-কে কাঁদতে দেখলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে কাঁদালো ? বললেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ

اَلْيَسِيْرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادَى اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ -

খুবই হালকা ধরনের দেখানোপনাও শিরক। আর যে লোক আল্লাহ্‌র বন্ধুদের সাথে শত্রুতার আচরণ করল, সে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করার মতো অপরাধ করল।

এ হাদীসে পারস্পরিক যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, যদিও তাদেরকে কাফির বলা হয়নি। সূদ্দী-সুবাইহ (উম্মে সালমার মুক্ত দাস)— জায়দ ইবনে আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে বলেছেন ঃ

اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ -

আমার যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে যার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করেছ। আমি শান্তি দেব, যাকে তোমরা শান্তি দেবে।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا -

যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাদের এ দুষ্টকর্মের শাস্তি ..... (সূরা মায়িদা ঃ ৩৩)

ফিকাহ্‌বিদ মনীষিগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এ হুকুমটি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এখনও কার্যকর হয়ে আছে। ডাকাতি-ছিনতাই কর্মে যারা লিপ্ত, তাদের ক্ষেত্রে এ ঘোষণাটি পুরাপুরি কার্যকর। যাদের গুনাহ বড় বড়, নাফরমানীর কাজে যারা চিরলিপ্ত, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিত বিরাজ করছে— তা এ আয়াতটি থেকে বোঝা যায়। কেননা তাদের এ কাজ যুদ্ধের মতোই। তারা বিরত হলেও এ যুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে চলতে থাকবে। তাদের ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে। যদিও তারা কাফির হয়ে যায়নি ও ইমাম দ্বারা বিরত হয়নি। যদি তারা ইমামের কথায়ও বিরত না হয়, তাহলে যতটা তাজীরী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে, তা-ই তাদেরকে দিতে হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্ যেসব গুনাহের জন্যে এবং তা পৌনপুনিকভাবে করার দরুন আল্লাহ্ আযাব দেয়ার ওয়াদা করেছেন, সেই সবগুলোর ব্যাপারও ঠিক তাই। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে, তাদের ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও বিরত না হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। অন্য কথায় তারা বিরত না হলে তাদেরকে সে পরিমাণ আযাব দেয়া হবে, যতটা আযাব পাওয়ার তারা যোগ্য বিবেচিত হবে। যেসব কর্তৃত্বশালী জালিম লোক জনগণের ধন-মাল কেড়ে নেয়, অন্যায়ভাবে কর, শুল্ক ইত্যাদি আদায় করে, সব মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, বিরত না হলে তাদেরকে হত্যা করা। এ সব লোক সূদখোরদের চাইতেও বড় অপরাধে অপরাধী। কেননা তারা আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নিষেধের মর্যাদা নষ্ট করেছে, সমগ্র মুসলমানের মর্যাদাও নষ্ট করছে। সূদখোরও যেহেতু সূদখোরী করে আল্লাহ্‌র মর্যাদা নষ্ট করছে। যাকে সে সূদ দেয় তার মর্যাদা হয়ত সে নষ্ট করে না। কেননা তার প্রতি আন্তরিকতা সহকারেই তা দেয়। বিভিন্ন অন্যায় কর ও শল্ক গ্রহণকারীও মূলত ডাকাত ও ছিনতাইকারীর কাজই করে আল্লাহ্‌র নিষেধ অমান্য করে, মুসলিম জনগণের মর্যাদাও নষ্ট করে। কেননা তারা তা জোরজবরদস্তির মাধ্যমে গ্রহণ করে, কোন ব্যাখ্যা দানও করে না, এ কাজ কোন সন্দেহের বশবর্তী হয়েও তারা করে না। তাদের বারবার ও পৌনপুনিকতা সহকারে করা এ কাজ সম্পর্কে যখনই জানা যাবে, তখনই মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাদেরকে হত্যা করা, সে হত্যা যেভাবেই ঘটানো সম্ভব হোক না কেন। তাদের অনুসারী সাহায্যকারী যারা, যারা জনগণের ধন-মাল লুণ্ঠনে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে দাঁড়ায়, তাদেরকেও সেই অভিন্ন পরিণতির সম্মুখীন করতে হবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে দুটি দিক দিয়ে মতের সামঞ্জস্য ছিল। একটি হল, তারা দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করে কুফর গ্রহণ করেছে। আর দ্বিতীয় হল, তারা ইসলামের ফরয যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। তার অর্থ যাকাত ফরয— এ কথা তারা মেনে নিচ্ছে না, তা দিচ্ছেও না। ফলে দুটি তাৎপর্য একত্রিত হয়েছে এতে। একটি— আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে নিতে অস্বীকার করা। আর তা কুফর। আর দ্বিতীয়, তাদের ধন-মালে রাষ্ট্রীয়ভাবে দেয় যে সব সাদকা ফরয, তা আদায় করছে না। আর

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মূলে এ দুইটি কারণই একত্রিত ছিল। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন ঃ

لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا مِمَّا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ -

ওরা যদি একটি রশিও— যা রাসূলে করীম (স)-কে দিত— আমাকে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি ওদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।

অপর একটি বর্ণনায় عقالا (রশির) পরিবর্তে عناقا (উট) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমরা বলেছি যে, ওরা কাফির হয়ে গিয়েছিল, যাকাত দিতে অস্বীকার করে ওরা কাফিরই হয়ে গিয়েছিল। কেননা সাহাবীগণ ওদের নাম দিয়েছিলেন أهل الردة 'মুর্তাদ হয়ে যাওয়া লোক।' তাঁদের দেয়া এ নাম আমাদের সময় পর্যন্ত-ও চলে এসেছে। তারা তাদের মেয়েলোক ও বাচ্চাদের বন্দী করত। তাদের মধ্যে প্রসার পাওয়া এ অপরাধের দরুনই কেবল মুর্তাদ ছিল না। এ এমন একটা ব্যাপার যা নিয়ে সেই প্রথম যুগ থেকে শুরু করে পরবতর্তীকালের মুসলমানদের মধ্যে কোন মতভেদের সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা) যে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, যারা সূদ খায়, তাকে হালাল মনে করে, তারা কাফির। যদি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের সাথে মুর্তাদ হিসেবেই আচরণ করবে। যদিও তারা এর পূর্বে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যদি তারা সূদকে হারাম মানে এবং তার কাজ করে তাকে হালাল মনে না করে, তাহলে রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদি তারা বিরত হয় ও তওবা করে, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি বিরত না হয়, তাহলে রাষ্ট্র তাদেরকে মারধোর করে, আটক-বন্দী করে হলেও তাদেরকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে।

বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) নাজরানবাসীদেরকে লিখে পাঠিয়েছিলেন— তারা ছিল খ্রীস্টান যিম্মী— হয় তোমরা সূদ পরিহার কর, না হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবনে সালাম আয়ূব আদ-দিমাশকী— সাদান ইবনে ইয়াহইয়া— আবদুল্লাহ ইবনে আবূ হুমায়দ— আবূ সলীহ্ আল-হাযলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) নাজরানবাসীদের সাথে সন্ধি করেছেন এবং তাদেরকে একটি সন্ধিপত্র লিখে দিয়েছেন। তার শেষে লিখেছেন ঃ

তোমাদের কর্তব্য হবে, তোমরা সূদ খাবে না। তোমাদের মধ্যে যে লোক সূদ খাবে, তার থেকে আমার যিম্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তা হলে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা যদি এ নিষেধ না মান, তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিক থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও, এবং এর পূর্বে বলা কথা ঃ 'হে ঈমানদার লোকগণ; তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অবশিষ্ট সূদ তোমরা ছেড়ে দাও।' তাদের দুজনের উপরই আরোপিত। একটি হল ব্যাপারটিকে তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া। আর দ্বিতীয়, সূদখোরের উপর শরীয়াতী শাসন পুরোমাত্রায় কার্যকর করা— আদেশ পালনে রাজী হওয়া সহ। তারপর যদি কেউ আদেশ প্রত্যাখ্যান করে, অমান্য করে, তার এই অমান্যতা বা মুর্তাদ হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যে

আদেশ কবুল করে নেবে, তা সত্ত্বেও সে কাজ করবে তা হারাম মানা সত্ত্বেও, তারা অরাজী হলে তাদেরকে তা ছাড়াবার ও ত্যাগ করাবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। অবশ্য তাদেরকে মুর্তাদ গণ্য করা হবে না। তারা বিরত না হলে সরকার তাদের মারপিট বা আটক যা-ই বিবেচনা করবে, তাজীর হিসেবে তা-ই কার্যকর করতে হবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ -

তা হলে তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিক থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।

এ আয়াতে জানান দেয়া হয়েছে যে, উক্ত আয়াতে যে আদেশ করা হয়েছে, তারা যদি তা পালন না করে, তাহলে তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হয়ে পড়বে। তা থেকে এ-ও জানা গেল যে, আল্লাহ্র আদেশ পালন না করা এক মহা অপরাধ। অপরাধের বিরাটত্ব সম্পর্কে জানান দেয়া হয়েছে এ আয়াত। আর তারা এ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে বাধ্য। তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী-রূপে চিহ্নিত হয়েছে— এ নামে তারা অভিহিত হয়েছে। এ রূপ নামকরণের দুটি তাৎপর্য। একটি হচ্ছে কুফর, যদি সূদকে হালাল মনে করা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হারাম, বিশ্বাস করেও তা খাওয়া হলে তার উপর শরীয়াতের বিধান কার্যকর করা। অনেকে আয়াতটিকে এ অর্থেও গ্রহণ করেন যে, এতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে। তাদের জন্যে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেন তারা না জানার ধোঁকায় পড়ে না থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ -

যদি তোমরা কোন জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা বোধ কর, তাহলে সন্ধি তাদের (মুখের) উপর নিক্ষেপ করে সমান সমান হয়ে যাও। কেননা বিশ্বাসঘাতকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (সূরা আনফাল ঃ ৫৮)

এখানে কথার সম্বোধনকে যদিও এ দৃষ্টিকোণে মনে করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এ কথাটি তাদেরকে বলা হয়েছে যদি তারা যাকাত দিতে অস্বীকারকারী হয়। আর যদি প্রথম দিকে ধরি, তা হলে বুঝতে হবে যারা এ কাজ করবে, তাদের সকলের জন্যেই এ কথা। উদ্ধৃত হুকুমটি সকলেরই পালনীয়। আর এটাই উত্তম ব্যাখ্যা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ -

ঋণ গ্রহীতারা যদি দারিদ্র্য কষ্টে পড়া লোক হয়, তা হলে তাকে সহজতা সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে।

এর দুটি তাৎপর্য রয়েছে। একটি তোমাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণকারী যদি দরিদ্র ও অর্থ কষ্টে পড়া লোক হয়, তা হলে তার সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর দ্বিতীয়

তার নামটাই তার অর্থ বোঝাবার জন্যে যথেষ্ট। এ আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস, শুরাইহ্ ও ইবরাহীম বলেছেন, এ আয়াতের কথাটি বিশেষভাবে সূদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। শুরাইহ্ ঋণ ফেরত দিতে অক্ষম ব্যক্তিকে আটক করার ফায়সালা দিতেন। ইবরাহীম আল-হাসান, রুবাই ইবনে খায়সম ও দহাক সকল প্রকারের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি বর্ণনা অনুরূপ এসেছে। অন্যান্যরা বলেছেন, আয়াতে ফেরত দিতে অক্ষম ব্যক্তিকে যে সময় দিতে বলা হয়েছে তা সূদের প্রসঙ্গে যেমন, তেমন সর্ব প্রকারের ঋণেই প্রযোজ্য তার উপর কিয়াস করে।

আবূ বকর বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কথা ঃ 'যদি দরিদ্র হয়, তাহলে তার সচ্ছলতার অপেক্ষা করতে হবে'-এর মধ্যে সর্বপ্রকারের ঋণের ব্যাপার যখন গণ্য হতে পারে— তার সম্ভাব্যতার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি— আগের কালের মনীষীরাও সেই রূপই ব্যাখ্যা করেছেন, তখন বুঝতে হবে যে, যে অর্থের ও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা নেই, তা তাঁরা নিশ্চয়ই বলেন নি। তাই আয়াতটি সাধারণ তাৎপর্যেই ব্যবহার করতে হবে। কেবল 'সূদের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজ্য' তা বলা যাবে না। তবে তার কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। কেননা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়েছে বলেও মনে করার অবকাশ আছে। তবে তা দলীল ছাড়া হতে পারে না।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্র কথা ঃ 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আর্থিক কষ্টের মধ্যে হলে তার সচ্ছলতার অপেক্ষা করতে হবে' কোন সিদ্ধান্ত দিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পূর্বের কথার সাথে সঙ্গতি রেখে, তখন এর সিদ্ধান্তটা সেই পূর্বে বলা কথার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বলতে হবে।

জবাবে বলা যাবে— না, আল্লাহ্র উক্ত কথাটি নিশ্চয়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার শব্দ সমূহই তার বক্তব্য ও তাৎপর্য স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে। কেননা আর্থিক সংকীর্ণতা কষ্ট ও অপেক্ষা করার কথা এমন ঋণের কথাই বোঝায়, যার দাবি করা অনিবার্য। আর অপেক্ষা করা বা সময় দেয়া প্রমাণিত হক প্রসঙ্গেই হতে পারে, যার দাবি করা সঠিক। হয় তাড়াতাড়ি ফেরত দেয়ার জন্যে তাগিদ হবে, নয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দই যখন সেই ঋণ বোঝায়, যার সবই অপেক্ষা করার ব্যাপার জড়িত— যখন ঋণগ্রহীতা অর্থকষ্টে নিমজ্জিত হবে, তখন স্বীকার করতে হবে যে, আয়াতে শব্দসমূহ তাৎপর্য বোঝাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট, তাই তার শব্দকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা কর্তব্য। তাকে শুধু সূদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মনে করা ঠিক নয়।

কোন কোন লোক মনে করেছেন— তাঁরা অবশ্য আমাদের কথার সমর্থন করেছেন— উক্ত আয়াত কেবলমাত্র সূদের ব্যাপারে প্রযোজ্য মনে করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তো সূদ বাতিল করে দিয়েছেন। তাই সে ব্যাপারে অপেক্ষা করার আর সময় দেয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে কিভাবে? তাই আয়াতটিকে সর্বপ্রকারের ঋণের প্রসঙ্গে ধরে নিতে হবে।

কিন্তু এরূপ যুক্তি ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ সূদ বাতিল করেছেন, তা হল শর্ত করা বাড়তি। কিন্তু মূলধন গ্রহণ করার অধিকার তো বাতিল করেন নি। কেননা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ 'ছেড়ে দাও সূদের যা কিছু এখনও বাকী রয়েছে তা আর সূদ হল মূলধনের উপর বাড়তি।' তারপর বলেছেন ঃ 'তোমরা যদি তওবা কর, তাহলে তোমরা মূলধনটা ফেরত পেতে পারবে।'

তার পরে বলেছেন ঃ যদি ঋণগ্রহীতা আর্থিক কষ্টে থাকে' ..... অর্থাৎ সর্বপ্রকারের ঋণ প্রসঙ্গে এই কথা। যে ঋণ-ই দারিদ্রের কারণে ফেরত পাবে না, সেখানেই অপেক্ষা করার ও সময় দেয়ার প্রয়োজন। এ ঋণের মধ্যে মূলধন-ও রয়ে গেছে। অবশিষ্ট সূদ বাতিল করে দেয়ার মূলধন কিন্তু বাতিল হয়ে যায়নি। বরং তা ঋণ হিসেবেই ঋণ-গ্রহীতার উপর থেকে যাবে। তা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।

যদি বলা হয়, তাহলে এই মূলধন আদায়েও অপেক্ষা করা ও সময় দেয়ার আদেশ রয়েছে। তাই মূলধন ও অন্যান্য ঋণ সমান হয়ে গেল।

জবাবে বলা যাবে, আমাদের আলোচনা আয়াতের তাৎপর্যের ব্যাপকতা— তা কি কি শামিল করে— তাই নিয়ে। যদি তা কেবল সূদের মূলধনের ব্যাপার হয়, তাহলে তা দলীলের দিক দিয়ে অন্য কিছুকে শামিল করবে না। তাকে শামিল করবে অর্থ ও তাৎপর্যের সাধারণত্বের দিক দিয়ে। আর তখনই বাইরের কোন দলীলের প্রয়োজন দেখা দেবে অবশ্যম্ভাবীরূপে সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্যে। আর তা আয়াতে উল্লিখিত তাৎপর্য ফিরিয়ে নিতে হবে, যা সব কিছুকে শামিল করে। তোমার ও বিরোধীদের মধ্যে যে কথা-বার্তা, তা 'কিয়াস'-এর দিক দিয়ে নয়। তোমাদের পারস্পরিক মতপার্থক্যকে নিয়ে, আয়াতটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক; কিংবা বিশেষ অর্থবোধক। আর 'কিয়াস'-এর কথা এবং অনুল্লিখিতকে উল্লিখিতের উপর ফিরিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা তওবা করলে তোমাদের মালের আসলটা তোমাদের থাকবে'— এর দাবি হচ্ছে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট তার পাওনা পাওয়ার দাবি করতে পারবে। তার মূলধন সে নিজেই ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে, তার অসন্তুষ্টি হলেও। কেননা আল্লাহ নিজেই তার তাগাদা করার ও দাবি জানানোর অধিকার দিয়েছেন। তাতে ঋণগ্রহীতা সন্তুষ্ট থাকুক, কি অসন্তুষ্ট হোক, তার কোন শর্ত করা হয়নি।

এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যারই অন্য কারোর নিকট কোন ঋণ আছে, তা সে অবশ্যই ফেরত চাবে, তা সে তার নিকট থেকে নিয়ে নেবে। সে দিতে চাক, আর না-ই চাক। এ পর্যায়েই রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস এসেছে। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা যখন নবী করীম (স)-কে বলল, আবূ সুফিয়ান একটা ভয়ানক কৃপণ ব্যক্তি। আমাকে এমন পরিমাণ দেয় না, যা আমার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে, যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। অথচ আমার সন্তানও রয়েছে। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

خُذِىْ مِنْ مَالِ اَبِى سُفْيَانَ مَايَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ -

তুমি আবূ সুফিয়ানের মাল থেকে ততটা নিয়ে নাও, যা প্রচলিত মানে তোমার ও তোমার সন্তানের জন্যে যথেষ্ট হয়।

তার অর্থ, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রীর তার স্বামীর মাল থেকে যতটা পাওয়া ন্যায়সঙ্গত, তা সে নিয়ে নেবে। তাতে আবূ সুফিয়ান রাজী না থাকলেও কোন দোষ নেই।

আয়াতের দলীল এ-ও প্রমাণ করে যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ ফেরত দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তা না দেয়, তাহলে সে হবে জালিম। তা দুটি দিক দিয়ে স্পষ্ট বোঝায়। একটি হল

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে মূলধনটা তোমাদের প্রাপ্য।' এতে মূলধনটা ফেরত পাওয়ার জন্যে দাবি ও তাগাদা করার অধিকার স্বীকার করা হল। আর এতেই নিহিত রয়েছে এ কথা যে, ঋণগ্রহীতা তার উপর যে ঋণের বোঝা রয়েছে তা সে ফেরত দিতে বাধ্য। তা আদায় করে দিতে সে অস্বীকার করতে পারে না। কেননা সে যখনই তা ফেরত দিতে অস্বীকার করবে, তখনই সে হবে জালিম। তার এ কাজটা 'জুলুম' বলে অভিহিত হবে। আর তাহলে সে অবশ্যই আযাব পাওয়ার যোগ্য হবে। তা হল কয়েদ। আর দ্বিতীয় দিক হল, আয়াতের ধারাবাহিকতায়ই আল্লাহ্‌র এ কথাটি রয়েছে ঃ

لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ -

তোমরাও জুলুম করবে না, তোমাদের উপর-ও জুলুম করা হবে না।

অর্থাৎ তোমরা মূলধনের অতিরিক্ত নিয়ে ঋণগ্রহীতার উপর জুলুম করতে পারবে না। আর মূলধনটাও হারিয়ে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে— তোমরা হবে মজলুম তা-ও হতে পারবে না। বোঝা গেল, ঋণগ্রহীতা যখনই মূলধনটা ফেরত দিতে অস্বীকার করবে— ফেরত দেবে না, সে হবে জালিম। তাকে শাস্তি দান করা আবশ্যক হবে।

সকল ফিকাহবিদ এ সম্পর্কে একমত যে, ঋণগ্রহীতা মূলধন না দিলে শাস্তিযোগ্য। এই শাস্তিটা নিশ্চয়ই মারপিট দিয়ে হবে না। তাহলে শাস্তির একমাত্র পথ থাকে জেলে আটক রাখা। কেননা এ জেলে বন্দী করার শাস্তি ছাড়া অন্য কোন প্রকারের শাস্তি দানের পথ খোলা নেই। নবী করীম (স) থেকে এ ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে, আয়াতটি ঠিক তা-ই বোঝায়। তা একটি হাদীস, মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ নফিলী— আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আমর ইবনে আবূ দলীলা, মুহাম্মাদ ইবনে মায়মুন, আমর ইবনুশ শরীদ— তাঁর পিতা সূত্রে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) আমাকে বললেন ঃ পাওনাদার তার প্রাপ্য চাইতে ও সেজন্যে শাস্তিও দিতে পারে। ইবনুল মুবারক বলেন ঃ তার পাওনা চাওয়া তার জন্যে হালাল, সে সেজন্যে কঠোরতা করতে পারে, শাস্তি দিতে পারে, বন্দীও করতে পারে। ইবনে উমর, জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَاِذَا اُحِيلَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍ فَلْيَحْتَلْ -

ধনী বা সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ ফেরত দিতে টাল-বাহানা করা জুলুম। তোমাদের কেউ যদি ভরপুর অবস্থার ব্যক্তির উপর কৌশল করে তাহলে সেটা করতে পারে।

মোটকথা, সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ ফেরত দিতে টাল-বাহানা করা একটা জুলুম। যে তা করবে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে। আর তা হল কয়েদ, আটক। কেননা এ ছাড়া অন্য কোন শাস্তির কথা হাদীসে যে আসেনি, সে বিষয়ে সকলেই একমত।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুয়ায ইবনে আসাদ, নজর ইবনে শুমায়ল, হারামাস ইবনে হাবীব, একজন মরুবাসী, তাঁর পিতা, তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-এর নিকট আমার খাতককে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ ওর উপর তোমার দাবি পেশ করে ওকে আটকাও। তার পর বললেন ঃ

হে বনূ তামীমের লোকটি, তুমি তোমার বন্দীকে নিয়ে কি করতে চাও?

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঋণগ্রস্তকে পাওনাদার আটক করতে পারে। কেননা বন্দী তো সে, যাকে আটকানো হয়েছে। তাকে বন্দী বলা হয়েছে, যখন বোঝা গেল যে, তাকে আটক করার অধিকার ঋণদাতার আছে। তার এ কথাটিও, যা তিনি আমাকে বলেছেন। পাওনাদারের অধিকার আছে তাকে (ঋণগ্রহীতাকে) ধরার ও শাস্তি দানের। আর শাস্তি দান অর্থ আটক করা। এ ছাড়া অন্য কিছু করার কারোর অধিকার নেই।

কোন অবস্থায় ঋণগ্রহীতাকে আটক করা যাবে, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদরা বলেছেন, কারোর উপর ঋণ প্রমাণিত হলে— তা যে কোন ভাবেই প্রমাণিত হোক— তাকে দুই মাস কি তিন মাসের জন্যে আটক করা যেতে পারে। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। তখন যদি সে ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে কারাগারে ফেলে রাখা যাবে, যতক্ষণ তার ঋণ শোধ না করবে। আর যদি সে দারিদ্র্যাবস্থার হয়, তাহলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ, আবূ হানীফা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বলে যে, আমি দরিদ্র অসচ্ছল ব্যক্তি এবং তার প্রমাণও সে পেশ করে কিংবা বলে যে, আমার বিষয়ে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তখন কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাকে দুই বা তিন মাস বন্দী করে রাখতে হবে। তার পরে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। তবে সে যদি সর্বজনপরিচিত গরীব মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আটক ও বন্দী করা যাবে না।

ইমাম তাহাভী আহ্‌মাদ ইবনে আবূ ইমরান সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, আমাদের সঙ্গীদের শেষের দিকের লোক মুহাম্মাদ ইবনে শুজা বলতেন, প্রত্যেকটি ঋণেরই মূল হচ্ছে মাল, ঋণী ব্যক্তির হাতে তা এসেছে পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যের মতো। সেজন্যে তাকে বন্দী করা যাবে। আর যার মূলে মাল নেই, তার হাতে তা পৌঁছে মহরানার মতো। আর খুলা করা বা সুলহ করা ইচ্ছা ও কাফালা পর্যায়ের ব্যাপার। কাজেই সেজন্যে তাকে বন্দী করা যাবে না, যতক্ষণ তার নিকট তার মওজুদ থাকা ও ভরপুর থাকা প্রামাণিত না হবে।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, ঋণের দরুন ঋণগ্রহীতাকে বন্দী করা যাবে, যখন জানা যাবে যে, তার নিকট মাল রয়েছে, কিন্তু সে দিচ্ছে না। ইমাম মালিক বলেছেন, ঋণের কারণে স্বাধীন বা ক্রীতদাস, কাউকে বন্দী করা যাবে না। তার ব্যাপারটি একেবারে ফেলেও দেয়া যাবে না। যদি অভিযোগ আসে যে, সে ধন-মাল লুকিয়ে রেখেছে, তাহলে তাকে বন্দী করা হবে। আর তার নিকট কিছু পাওয়া না গেলে তাকে আটক করা যাবে না। তাকে ছেড়ে দিতে হবে। আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, ঋণী ব্যক্তি সচ্ছল হলে তাকে ঋণ ফেরত না দেয়ার জন্যে বন্দী করা যাবে। আর দরিদ্র হলে বন্দী করা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, কারোর উপর ঋণ প্রমাণিত হলে তার প্রকাশমান মাল-মাত্তা বিক্রয় করে তা থেকে আদায় করা হবে, সেজন্যে ঋণী ব্যক্তিকে বন্দী করা যাবে না। যদি তেমন কিছু পাওয়া না যায় তাহলে বন্দী করা যাবে। আর তার সম্পদাদি বিক্রয় করে যতটা ঋণ আদায় করা যায়, করতে হবে। যদি সে নিজের দারিদ্রের কথা বলে, তাহলে তা অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে কবুল করা যাবে। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ঋণী ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়, তাহলে তার সচ্ছলতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে' তা-ই বলে। তার

পরও তাকে আল্লাহ্‌র নামে হলফ করতে বলা যাবে এবং তার পরে পাওনাদারদিগকে তাকে ধর-পাকড় করতে নিষেধ করতে হবে।

আবূ বকর বলেছেন, আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, ঋণগ্রস্তকে বন্দী করা হবে প্রথমত যদি বিচারকের নিকট তার ঋণটা প্রমাণিত হয়। কেননা আয়াত থেকে তা-ই প্রমাণিত। তাছাড়া কুরআন-হাদীসে তাকে জালিম বলা হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে, যা তার ঋণ হিসেবে প্রমাণিত হয়। আর সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে, যদি তা আদায় করতে অস্বীকার করে। কাজেই তার উপর শাস্তি বহাল থাকবে। যতদিন না তার দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়।

যদি বলা হয়, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যদি ঋণ আদায় না করে, তাহলে সে জালিম হবে। কেননা আল্লাহ্ কারোর নিন্দা করেন না সেজন্যে যা করার কোন সাধ্য তার নেই। এ কারণে নবী করীম (স) শাস্তি পাওয়ার যোগ্যতা থাকার শর্ত করেছেন। যেমন আমাকে বলা হয়েছে যে, যে পাবে, সে তার দাবি পেশ করবে সেজন্যে শাস্তি দেবে। শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হওয়ার শর্ত হল সম্পদ থাকা, যা থেকে ঋণ আদায় করে দেয়া সম্ভব। তাহলে তাকে বন্দী করা ও শাস্তি দেয়া জায়েয হবে না। তবে যদি প্রমাণিত হয় যে, তারি নিকট ঋণ ফেরত দেয়ার টাকা আছে, কিন্তু সে দিতে প্রস্তুত নয়। ঋণ থাকার কথা কেবল জানলেই হবে না, স্থায়ীভাবে তার ঋণ ফেরত দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। কেননা হতে পারে, ঋণ প্রমাণিত হওয়ার পর দারিদ্র্য সৃষ্টি হতে পারে।

জবাবে বলা যাবে, যেসব ঋণ বদলের ক্ষমতা তার হাতে থাকবে, সে যদি তা আদায় করে, তাহলে তার সচ্ছলতার কথা নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারি। তার দারিদ্র্যের কথা আমরা জানতে পারি না। কাজেই তার সচ্ছলতার উপর অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না দারিদ্র্য প্রমাণিত হয়। আর যা তার জন্যে বাধ্যতামূলক কোন বিনিময় ছাড়া-ই, তা তার হাতে অর্জিত, তা আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব। কেননা তার জন্যে বাধ্যতামূলক চুক্তিতে তার প্রবেশ তা আদায় করার বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার। তা আদায় করার জন্যে তার বারবার দাবি করা এবং তার দারিদ্র্যের দাবি করা সচ্ছল ব্যক্তির মিয়াদভিত্তিক দাবির মতই। তা তার ব্যাপারে সত্য প্রমাণিত হয় না। এ কারণে হানাফী ফিকাহ্‌বিদগণ যেসব ঋণের বদল তার হাতে লাভ করার সংবাদ জানা যাবে, আর যা তার হাতে আসার কথা জানা যাবে না— এ দুইটিকে অভিন্ন মনে করেছেন। কেননা যে চুক্তি তার উপর সে ঋণটিকে বাধ্যতামূলক করেছে তাতে তার দাখিল হওয়াটা ঋণ আদায় করে দেয়ার বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি এবং দাবিদারের দাবি করার অধিকার মেনে নেয়ার শামিল। কেননা চুক্তির দুই পক্ষের প্রত্যেকেরই দখল রয়েছে চুক্তির মধ্যে। তাদের দুজনেরই তাতে দাখিল হওয়ার অর্থ দুজনেই স্বীকার করে— চুক্তির ভিত্তিতে যেসব অধিকার অনিবার্য হয়েছে তার বাধ্যবাধ্যকতা। তা দুজনের একজনও অস্বীকার করলে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না। এ কারণে আমরা বলেছি, তার দাবি হল তার সঠিকত্ব সম্পর্কে উভয়েরই স্বীকৃতি। কেননা তাতে তার হকসমূহ পূরণের বাধ্যতা নিহিত রয়েছে। যা তার জন্যে বাধ্যতামূলক তা অস্বীকার করলে বিপর্যয় অনিবার্য। চুক্তির বাহ্যিক দাবি এটাই। দুজনের মধ্যে চুক্তি হলেও বাহ্যত তা সহীহ্ হলে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টির দাবি অসত্য বলে স্বীকৃত। তখন কথা হিসেবে দুজনেরই সঠিকতার কথা মেনে নিতে হবে। এতেই দলীল রয়েছে আমরা যা বলেছি তার সত্যতার। তা এই যে, যে লোক নিজের উপর কোন ঋণ বাধ্যতামূলক

বানিয়ে নেবে কোন চুক্তির দ্বারা, তার পক্ষে সে চুক্তির বাধ্যবাধকতা আদায় করা কর্তব্য। তার সম্পর্কে হুকুম দিতে হবে যে, সে একজন সচ্ছল ব্যক্তি, তার এতটা দারিদ্র্য স্বীকার করা যাবে না, যার ফলে তার নিকট পাওয়ার দাবি করা যাবে না। যেমন তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ প্রমাণিত হওয়ার পর কোন নতুন মিয়াদ নির্ধারণকে সত্য মানা যাবে না।

আমাদের ফিকাহ্‌বিদগণ যে বলেছেন, তাকে বন্দী করতে হবে প্রথম যখন ঋণের মামলা বিচারকের সম্মুখে পেশ করা হবে, ঋণদাতা যখন তার ঋণের দাবি করবে। তার নিকট ঋণ ফেরত দেয়ার দাবি করার পূর্বে তার অবস্থা সম্পর্কে কারোর নিকটই কিছু জানতে চাওয়া হবে না। তাকে ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম মনে করেই তা করতে হবে। শুরুতে তার ব্যাপারটি দোষমুক্তই মনে করতে হবে, কেননা হতে পারে তার নিকট টাকা-পয়সা আছে, যা সে গোপন করে রেখেছে। অন্যরা তা জানে না। তখন তাকে অসচ্ছল মনে করা যাবে না। অতএব তাকে আটক করতে হবে। তার নিকট যা আছে তা প্রকাশ করতে হবে। কেননা এ-ও তো হতে পারে যে, তার নিকট অপর কোন জিনিস আছে, বন্দীদশা তাকে অসহ্য করে তুলবে। তার মান-মর্যাদা বোধ-ও তাকে তা বের করে আনতে বাধ্য করতে পারে। তাই কথিত মিয়াদে যখন তাকে আটক করা হবে, তখন আশা করা যায়, তার সে জিনিস বেরিয়ে পড়বে। তারপর তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কেননা এটা হতে পারে যে, সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা তার গোপন সচ্ছলতা সম্পর্কে জানে। পরে যখন তার দারিদ্র্য প্রমাণিত হবে, তখন তাকে কয়েদ থেকে মুক্তি দিতে হবে।

শুরাইহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি সূদ ছাড়া অন্যান্য ঋণের জন্যে দরিদ্র ব্যক্তিকেও আটক করতেন। তখন একজন দরিদ্র ব্যক্তি তাকে বলবে, তাকে বন্দী করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দরিদ্র হয়, তাহলে তার সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে।' শুরাইহ বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ সেসবের মালিক— অধিকারীদের নিকট আদায় করে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮)

কিন্তু আল্লাহ্ আমাদেরকে এমন জিনিসের আদেশ করছেন না, যে জন্যে তিনি আমাদের আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় শুরাইহর মত পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'ঋণী ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার সচ্ছলতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে'— এটি কেবল সূদ প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য কোন ক্ষেত্রে তা দলীল হবে না। সূদ ছাড়া অন্যান্য ঋণ দরিদ্র ও সচ্ছল ব্যক্তির মধ্যে আটকের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা যাবে না। হতে পারে, এ ব্যাপারে তিনি এমন একটা মাযহাব গ্রহণ করেছেন, যাতে প্রকৃত দারিদ্র্য সম্পর্কে জানবার আমাদের কোন উপায়ই নেই। কেননা হতে পারে, লোকটি নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ করে, আর তার প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, সে সচ্ছল মানুষ। এ কারণে সূদের মূলধনটার জন্যেই শুধু অপেক্ষা করতে হবে। কুরআন এ ক্ষেত্রেই অপেক্ষা করার কথা বলেছে। তা ছাড়া অন্যান্য পারস্পরিক লেন-দেনের

চুক্তিতে ঋণ ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতাই আরোপ করেছে এবং তা আদায় করার জন্যে দাবি করতে থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ কথাটি যে ঠিক নয়, তার কারণ আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। তাতে আমরা দলীল বানিয়েছি ব্যবহৃত শব্দের সাধারণ তাৎপর্যকে। সর্বপ্রকারের ঋণকে তাতে শামিল করেছি। তা সত্ত্বেও কুরআনের আয়াতটি যদি কেবলমাত্র সূদের ব্যাপারে ঋণী ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়ার কথা নিয়েই নাযিল হয়ে থাকে, অন্যান্য ঋণ সম্পর্কে যদি তার বক্তব্য না থাকে, তাহলে অন্যান্য সর্বপ্রকারের ঋণকে তার উপর কিয়াস করতে হবে। কেননা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সচ্ছলতার অবস্থার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, দুজনেরই দাবি করার বাধ্যবাধকতার সঠিক হওয়ার ও তা আদায় করে দেয়া কর্তব্য হওয়া সম্পর্কে, তাই আদায় করে দেয়া হলে কয়েদ করার নিয়ম প্রত্যাহৃত হবে, এতেও দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

তবে আল্লাহ্র কথা ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন আমানতসমূহ সেসবের অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দেবার জন্যে'।

শুরাইহ্ এ আয়াতকে দলীল বানিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যার নিকট টাকা পাওনা, তাকে বন্দী করতে হবে। কেননা আয়াতটি অন্য লোকের যেসব জিনিস কারোর হাতে মওজুদ রয়েছে যে বিষয়ে কথা বলে। তার হাতে তা রয়েছে, তাই তা আদায় করে দেয়া তার কর্তব্য। কিন্তু তার যিম্মায় যেসব ঋণ আছে, তার জন্যে দাবি করার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্টতা আদায় করার সম্ভাব্যতার সাথে। তাই যে নিজে দরিদ্র, তার উপর তো আল্লাহ্ ততটুকু দায়িত্বই চাপিয়েছেন যতটুকু পালন করা তার পক্ষে সম্ভব। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا - سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا -

আল্লাহ্ কোন মানুষকে দায়িত্ব দেন না, দেন শুধু ততটুকুর, যা তিনি তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই দারিদ্র্যের পর সচ্ছলতার সুবিধা দেবেন।

অতএব সে যখন তা দিতে অক্ষম, তখন সে তা দেয়ার দায়িত্বশীল নয়। ফলে তাকে আটক ও বন্দী করা জায়েয হতে পারে না।

যদি বলা হয়, ঋণ তো একটা আমানত বিশেষ। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِذَا اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ -

তোমরা কিছু লোক যদি অপর কিছু লোককে বিশ্বাস করো, তা হলে যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে তার কর্তব্য হল তার আমানতটা ফিরিয়ে দেয়া।

এ আয়াতে ঋণের কথাই বলা ও বোঝানো হয়েছে। সে ঋণের কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত কোন ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তোমরা তা অবশ্যই লিখবে।

জবাবে বলা যাবে, 'আল্লাহ্র কথা ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে আমানতসমূহ সে সবের মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাও'— এর অর্থ যদি হয় ঋণ ফেরত দেয়া, তাহলে এ আদেশ পালন সম্ভব হওয়া শর্তের উপর ভিত্তিশীল হবে। কেননা যেমন পূর্বে বলেছি— যা করার সাধ্য নেই তা করার কোন দায়িত্ব আল্লাহ্ কারোর উপর চাপান না। করার সাধ্য না থাকলে সে তা করবে কি ভাবে ? ঋণগ্রহীতার বাহ্যিক প্রকাশেই বোঝা যায়, সে তা আদায় করতে অক্ষম। শুরাইহ-এর আগের দিনের কোন মনীষীই এই বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না যে, আল্লাহ্ সাধ্যের অতীত কোন কাজের দায়িত্ব কাউকে দেন না। তাঁরা এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়শীল ছিলেন না। হয়ত তাঁরা মনে করতেন যে, সে ঋণের টাকা ফেরত দিতে সক্ষম, যদিও বাহ্যত তারা দরিদ্র। এ কারণেই ঋণীকে বন্দী করার ফায়সালা দিয়েছেন।

শাসকের নিকট যদি তার দারিদ্র প্রমাণিত হয় এবং তাকে বন্দীদশা থেকে খালাস করে দেয়, তাহলে সে ঋণ প্রাপকের দাবি ও তা ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতার মাঝে সে কি প্রতিবন্ধক হবে ? .... এ পর্যায়ে মনীষিগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, পাওনাদারের অধিকার আছে ঋণী ব্যক্তিকে ধরবে। ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ থেকে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, ঋণ যার নিকট পাওনা— অর্থাৎ ঋণী ব্যক্তিকে খাবারের জন্যে, পায়খানা-প্রেশাবের জন্যে তার নিজের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে যদি তার খাবার এনে দেয়া হয় ও পায়খানা-পেশাবের স্থান করে দেয়া হয়, তাহলে তাকে তার নিজের ঘরে যাওয়া থেকে বিরত রাখা জায়েয হবে। অন্যান্যদের মধ্য থেকে ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, পাওনাদারের অধিকার নেই ঋণী ব্যক্তিকে ধরার। লায়স ইবনে সাদ বলেছেন, স্বাধীন দরিদ্র ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিতে হবে এবং তা থেকে তার ঋণ শোধ করা হবে। এরকম কথা এক জুহ্রী ছাড়া আর কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেননা লায়স ইবনে সাদ জুহ্রীর এ মত বর্ণনা করেছেন। দারিদ্য প্রকাশিত হওয়া তার ঋণ ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতাকে প্রত্যাহার করে না। তখনও তার নিকট পাওনা শোধের দাবি করা যাবে, তাগাদা করা যাবে। এর প্রমাণ হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি হিশাম ইবনে উরওয়াতা তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স) একজন আরব বেদুঈনের নিকট থেকে নির্দিষ্ট মিয়াদে মূল্য দেয়ার শর্তে একটি উট ক্রয় করেন। মিয়াদ শেষ হলে সেই বেদুঈন নবী করীম (স)-এর নিকট পাওনার তাগাদা করার জন্যে উপস্থিত হয়। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, তুমি তো পাওনাটা নেয়ার জন্যে আমার নিকট এসেছ, কিন্তু আমার নিকট দেয়ার মত কিছুই নেই। তাই তুমি বরং অপেক্ষা কর সাদকা আসা পর্যন্ত। তখন বেদুঈন ব্যক্তি একটি দুর্বোধ্য শব্দ করল, যার অর্থ হযরত উমর (রা) বুঝতে পেরেছিলেন। তখন নবী করীম (স) বললেন, ছাড়, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।

নবী করীম (স) অকপটে জানালেন যে, তাঁর নিকট কিছু নেই। তাকে পাওনা তাগাদা করতে নিষেধ করলেন না। বরং বললেন, 'পাওনাদারের কথা বলার অধিকার আছে।' এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দারিদ্র্য তার নিকট পাওনার তাগাদা করার প্রতিবন্ধক নয়, ঋণ ফেরত দেয়ার দায়িত্ব থেকেও তাকে মুক্তি দেয় না।

রাসূলের কথা ঃ দাঁড়াও, সাদকা (যাকাত) আসুক (পাওনা দিয়ে দেব)। এ কথা প্রমাণ করে যে, নবী করীম (স) বাকীতে উট কিনেছিলেন নিজের জন্যে নয়; বরং সাদকার জন্যে। কেননা

তিনি যদি নিজের জন্যে খরিদ করে থাকতেন, তা হলে তিনি সে পাওনা নিশ্চয়ই সাদকার উট থেকে দিতেন না। কেননা তার নিজের জন্যে সাদকা জায়েয ছিল না। এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি অন্য কারো জন্যে বাকীতে কিছু ক্রয় করে, তাহলে তার দামটা দেয়া যে তারই দায়িত্ব। কেননা চুক্তিটা তারই সাথে সঙ্ঘটিত হয়েছে, যার জন্যে কিনেছে, তার সঙ্গে হয়নি। তার প্রমাণ, নবী করীম (স) পাওনাদারকে তাগাদা করতে নিষেধ করেন নি, দাবি না করতেও বলেন নি। এ হাদীসটি আবূ রাফে বর্ণিত হাদীসের তাৎপর্যে অভিন্ন। সে হাদীসটি হল, নবী করীম (স) একটি যুবক বয়সের উট বাকীতে কিনেছিলেন। পরে তার মূল্য সাদকার উট থেকেই আদায় করেছিলেন। কেননা এ মূল্যটা সাদকার মালের উপর একটা ঋণ ছিল। অপর একটি বর্ণনায় নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, পাওনাদারের হাতও আছে, মুখও আছে। হাম্মাদ ইবনুল হাসান এই বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, হাতে আছে বাধ্য করা, আর মুখে আছে তাগাদা করার অধিকার।

হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত নন— এমন একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া, ইবরাহীম ইবনে হামযা, আবদুল আযীয, ইবনে মুহাম্মাদ, আমর ইবনে আবূ উমর, ইকরামা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তির দশ দীনার পাওনা ছিল অপর ব্যক্তির নিকট। সে তাকে পাকড়াও করল। সে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমার নিকট কিছু নেই, যা দিয়ে আজ আমি তোমার পাওনা দিতে পারি। পাওনাদার বলল, না, আমি তোমাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না তুমি আমার পাওনা শোধ করবে। কিংবা তুমি আমার নিকট একজন বহনকারীকে নিয়ে আসবে, যে তোমার এই ঋণের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে নেবে। সে বলল— আল্লাহ্র কসম, তোমার পাওনা দিয়ে দেয়ার মত কিছুই আমার নিকট নেই। আমার এ ঋণের যামিন হবে— এমন কোন লোককেও আমি আনতে পারব না। এরপর সে লোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হল, বলল, হে রাসূল, এই লোকটি আমাকে পাকড়াও করেছে। আমি তার নিকট এক মাসের সময় চাইলাম, কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করেছে। সে আমাকে তার পাওনা দিয়ে দিতে বলে, না হয় একজন যামিন আনতে বলে। তারপরে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমার যামিন হবে— এমন কাউকে পাব না আর আজ তার পাওনাও আমি দিতে পারছি না। তখন রাসূলে করীম (স) পাওনাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ওকে এক মাসের সময় দেবে? সে বলল, না। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, ঠিক আছে, আমি-ই ওর যামিন হলাম। রাসূলে করীম (স) তার যামিন হলে লোকটি চলে গেল ও একটি 'ডেগ' তাঁর নিকট নিয়ে আসল, যার ওয়াদা সে করেছিল। রাসূলে করীম (স) লোকটিকে জিজ্ঞাসা কররেন, তুমি এই স্বর্ণ কোত্থেকে পেলে? বলল, খনি থেকে। তখন তিনি বললেন, তুমি এটি নিয়ে চলে যাও, এর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। ওতে ভালো কিছু নেই। পরে তিনি নিজেই তার ঋণ শোধ করে দেন। এই হাদীসটি থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, নবী করীম (স) লোকটিকে পাকড়াও করতে পাওনাদারকে নিষেধ করেন নি। যদিও সে আল্লাহ্র নামে কিরা করে বলছিল যে, তার নিকট ঋণ শোধ করার কিছু নেই।

হাদীস বর্ণনায় অভিযুক্ত নন— এমন একজন বর্ণনাকারী আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনুল জারুদ ইবরাহীম ইবনে আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ইবনে আবূ উবায়দ উবাই আল আ'মাশ, আবূ সালিহ, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একজন

আরব বেদুঈন নবী করীম (স)-এর নিকট খেজুরের তাগাদা করতে এসেছিল, যা তার নিকট পাওনা ছিল। সে তার প্রতি কঠোরতা করে ও কড়াকড়িভাবে পাওনার দাবি করে। এতদূর বলল যে, আমার পাওনা না দিলে আমি তোমার বিপদ ঘটাব। সাহাবীগণ তাকে ভর্ৎসনা করলেন, ধমকালেন, তাঁরা বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কার সাথে কথা বলছ ? তখন লোকটি বলল, আমি আমার হক আমার পাওনার দাবি করছি। তখন নবী করীম (স) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা না পাওনাদারের পক্ষের লোক ছিলে ? পরে তিনি খাওলা বিনতে কায়স (রা)-এর নিকট বলে পাঠালেন, তোমার নিকট খেজুর থাকলে আমাকে ধার দাও। আমার নিকট খেজুর এসে গেলে তোমাকে দিয়ে দেব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে রাসূল! তিনি তাঁকে করয দিলেন, তা দিয়ে তিনি তাঁর ঋণ শোধ করলেন। আরব বেদুঈনকে খাওয়ালেন ও পরে সে বলল, আপনি আমার পাওনা দিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ্ আপনার পাওনা পূর্ণ মাত্রায় দেবেন। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

أُولٰئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، اِنَّهَا لَاقُدِّسَتْ اُمَّةٌ لَايُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ مِنْهَا حَقُّهُ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ -

নবী করীম (স)-এর ঋণ শোধ করার কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি বেদুঈনের পাওনা দাবি করতে নিষেধ করেন নি, তার প্রতিবাদও করেন নি। তার তাগাদা করার অধিকারকে অস্বীকার করেন নি। তার রুঢ় ব্যবহারে ও কঠোর আচরণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন, তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ 'তোমরা না হকদারের পক্ষের লোক ছিলে ?'

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ঋণী ব্যক্তির দারিদ্র্যর কারণেই তাকে সময় দিতে হবে এমন কথা নয়। পাওনাদার নিজে সময় দিলেই সেই সময় পাবে। অন্যথায় নয়।

এ কথার প্রমাণ আর একটি হাদীস। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে' আহমদ ইবনে আব্বাস-আল-মুয়াদ্দিব, আফ্ফান ইবনে মুসলিম, আবদুল ওয়ারিস, মুহাম্মাদ ইবনে জাহদাতা, ইবনে বুরায়দাতা, তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ صَدَقَةٌ وَمَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ -

যে লোক অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে সময় দেবে, তার সাদকা হবে। আর যে ব্যক্তি অর্থ কষ্টে পড়া ব্যক্তিকে ঋণ শোধের সময় দেবে, তার জন্যে প্রত্যেকটি দিন সাদ্কা হবে।

তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে বলতে শুনলাম, যে লোক অর্থ কষ্টে পড়া ব্যক্তিকে সময় দেবে, তার জন্যে সাদকা। তার পরে শুনলাম, আপনি বলছেন, যে লোক অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে ঋণ শোধের অবসর দেবে, তার জন্যে প্রত্যেক দিনের সাদকা হবে—এর অর্থ কি ? তখন নবী করীম (স) বললেন, যে লোক অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে ঋণের মিয়াদ শেষ হওয়ার আগে সময় দেবে, তার জন্যে সাদকা। আর যে ব্যক্তি তাকে সময় দেবে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তার জন্যে প্রত্যেক দিন সাদকা হবে।

আবদুল বাকী মুহাম্মাদ ইবনে আলা ইবনে আবদুল মালিক ইবনুল মিরাজ,ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ আল-হারভী, ঈসা ইবনে ইউনুস— সাঈদ ইবনে হাজনাতা আল আসাদী, উবাদাতা ইবনুল অলীদ ইবনে উবাদাতা ইবনুস সামিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবুল ইউসরাকে বলতে শুনেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْوَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ -

যে লোক অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে সময় দেবে কিংবা সময় বাড়াবে, আল্লাহ তাকে সে দিন ছায়া দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া হবে না।

প্রথমোক্ত হাদীসে রাসূলের কথা ঃ যে অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তিকে সময় দেবে, তার জন্যে প্রত্যেক দিন সাদকা প্রমাণ করে যে, নিছক দারিদ্র্যর কারণেই কেউ আপনা-আপনি অবকাশ পেয়ে যায় না, যতক্ষণ পাওনাদার নিজে সময় না দেবে। কেননা তার সময় দেয়া ছাড়াই যদি সে সময় পেয়ে যেত, তাহলে রাসূলের উক্ত কথাটি সহীহ্ হয় না। তাহলে পাওনাদারের দেয়া সময়ের বদলে সাদকা হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কেননা কোন কাজ না করলে তার বদলে সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তার সময় দেয়ার কাজটি ছাড়াই সময় পেয়ে গেলে পাওনাদারের সওয়াব পাওয়ার হকদার হওয়া সম্ভব নয়।

আর আবুল ইউসরা বর্ণিত হাদীসের কথাগুলোও সে কথাই বোঝায় দুই ভাবে। একটি, সময় দেয়ার বদলে সওয়াব পাওয়ার অধিকার হওয়া। আর দ্বিতীয়, সময় দেয়াকে পাওনা পরিমাণ হ্রাস করার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এবং একথা জানাই আছে যে, পাওনা-পরিমাণ হ্রাস করা কেবল পাওনাদারেরই কাজ। সময় দেয়াও তাই। এসবই এক সাথে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র কথা ঃ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ 'সচ্ছলতা পর্যন্ত সময় দিতে হবে' দুইটি দিকের যে-কোন একটি দিকে ফিরে যায়। একটি, সময় দান সঙ্ঘটিত হবে ঋণগ্রস্তকে কয়েদ না করার ও তাকে শাস্তি না দেয়ার দ্বারা। কেননা সে এর কোনটির যোগ্য নয়। কেননা নবী করীম (স) সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ আদায় করে দিতে টাল-বাহানা করাকে জুলুম বলেছেন। কিন্তু তার দারিদ্র্য প্রমাণিত হওয়ায় সে ঋণ শোধ না করলে জালিম হবে না। এ কারণে আল্লাহ্ তাকে কয়েদ রেহাই দিয়ে সময় দিতে বলেছেন। অবশ্য তাকে পাকড়াও না করা জরুরী হয় না অথবা তা মুস্তাহাব হবে। তাকে সময় দিতে উপদেশ দেয়া হয়েছে তাকে পাকড়াও না করতে ও তার নিকট তাগাদা না করতে বলে। তা হলে পাওনাদারের দেয়া সময় পেলেই সে অবকাশ পেতে পারে। উপরোদ্ধৃত হাদীসসমূহই তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

কেউ যদি বলে যে, পাকড়াও করা তো কয়েদ করার মতোই। এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা উভয় অবস্থায়ই তার স্বাধীনতা তিরোহিত হয়।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। কেননা তাকে শুধু ধরলেই তার স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। তার অর্থ হচ্ছে, পাওনাদারের পক্ষ থেকে একজনকে লাগাতে হবে যে, তার কাজ কর্ম লক্ষ্য করবে, তার কামাই-রোজগার দেখবে। আর যে কৃতকাজ এজন্যে ফায়দা দেয়, তা করবে। তার খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ ছেড়ে দেবে। অবশিষ্টটা ঋণ শোধ বাবদ নিয়ে নেবে। তা ঠিক কয়েদ করার মতো নয়। এটা কোন শাস্তিও নয়।

মারওয়ান ইবনে মুয়াবিয়াতা, আবূ মালিক আল-আশজায়ী, রবয়ী ইবনে খরাজ, হুযায়ফাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর একজন বান্দাকে বলবেন ঃ তুমি কি আমল করেছ ? সে বলবে, আমি তোমার জন্যে কোন নেক আমল করিনি যদ্দারা আমি তোমাকেই পেতে আশা করতে পারি, না নামায, না রোযা। তবে তুমি আমাকে অনেক অর্থসম্পদ দিয়েছিলে। আমি লোকজনের সাথে মিশতাম। তখন সচ্ছল ব্যক্তিকে সচ্ছলতা দিতাম এবং অর্থকষ্টে অর্জরিত ব্যক্তিকে সময়-সুযোগ দিতাম। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি এগুলো পাওয়ার তোমার অপেক্ষও বেশি অধিকারী। তোমরা আমার এই বান্দাকে ছেড়ে দাও। তখন তাকে মাফ করে দেয়া হবে।

তখন ইবনে মাসউদ (রা) বললেন— আমিও রাসূলে করীম (স) থেকে এরূপ কথাই শুনেছি।

এ হাদীসও প্রমাণ করে সে কথা, যা পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহ প্রমাণ করে। তা হল, অর্থকষ্টে পড়া ব্যক্তি শুধু তার দারিদ্র্যের কারণে ঋণ শোধে সময় পেয়ে যেতে পারে না। কেননা তা দরিদ্র ব্যক্তিকে সময় দেয়া ও সচ্ছল ব্যক্তির প্রতি সচ্ছলতা দানের সাথে সমন্বিত ও একত্রিত ব্যাপার। আর এসব তার নফল কাজ, ওয়াজিব-ফরয নয়।

কেউ কেউ মনে করে, কেউ যখন অর্থকষ্টে পড়ে এবং শুধু এ অর্থকষ্টের দরুন তার সময় পেয়ে যাওয়ার অধিকার আছে, তখন তাকে পাকড়াও করাও যাবে না। তার দলীল হল একটি হাদীস। হাদীসটি লায়স ইবনে সাদ বুকায়র, ইয়ায ইবনে আবদুল্লাহ, আবূ সাঈদুল খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে ফল ক্রয় করে বিপদে পড়েছিল। তাতে তার ঋণ বেড়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (স) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা এ লোকটিকে সাদকা দাও। লোকেরা আদেশ পেয়ে তাকে সাদকা দিল। কিন্তু তার ঋণ শোধের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছল না। তখন রাসূলে করীম (স) পাওনাদারদের বললেন, যা পাও তা-ই তোমরা নিয়ে নাও। তাছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না। রাসূলে করীম (স)-এর কথার এ অংশ 'তা ছাড়া আর কিছু তোমরা পাবে না'-কে দলীল বানিয়ে বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাকে পাকড়াও করা যাবে না।

এর জবাবে বলা যাবে, জানা আছে যে, তাদের প্রাপ্য খতম হয়ে গেছে, তা তিনি বোঝাতে চান নি। কেননা ঋণী ব্যক্তির নিকট যখনই মাল পাওয়া যাবে, তখনই তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত তার নিকট থেকে নিয়ে নেয়ার জন্যে পাওনাদাররা অধিক হকদার, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। ফলে ঋণী ব্যক্তির যিম্মায় পাওনাদারদের হক্ থেকে যাওয়ার কথাই প্রমাণিত হয়। তাদের হক শেষ হয়ে গেছে এমন কথা বলা হয়নি, যেন তারা তাদের পাওনাসমূহ পুরাপুরি পেয়ে যেতে পারে। অবশ্য তা তার উপার্জন থেকে নিতে হবে তার মৌলিক প্রয়োজন পুরা করার ব্যবস্থা রেখে। আর ঋণগ্রস্তকে পাকড়াও করার এটাই অর্থ। কেননা ঋণী ব্যক্তি ভবিষ্যতে যা উপার্জন করবে, তার উপর পাওনাদারদের হক প্রমাণিত, তা থেকে তারা তাদের হক নিয়ে নিতে পারে, তা নিয়ে আমাদের কোন মতপার্থক্য নেই। আর এ থেকেই পাওনাদারের তাকে পাকড়াও করার অধিকার প্রমাণিত হয়।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'তোমাদের এ ছাড়া কিছু নেয়ার নেই' তাতে পাওনাদারদের

হক যে এখনও আছে, তা অস্বীকৃত হয় না। আর পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহে অর্থকষ্টে পড়া ঋণীকে সময় দেয়া পর্যায়ে রাসূলে করীমের যে কথা এসেছে এবং পাওনাদারকে ঋণীকে সময় দেয়ার জন্যে যে উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা রয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, ঋণ শোধে সময় দেয়া জায়েয, তা এমন অবস্থা যা ছিনতাই ও ক্রয়জনিত বাধ্যবাধকতার অবস্থা।

ইমাম শাফেয়ী মনে করেছেন, যখন মূল্যটা অবশিষ্ট থেকে যাবে, তখন সে জন্যে সময় দেয়া সহীহ নয়। কিন্তু এ মত আমাদের পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহের বিপরীত। কেননা এ সব হাদীসের দাবি হচ্ছে সময় দেয়া জায়েয। ইবনে বুরায়দাতা বর্ণিত হাদীস তার ব্যাখ্যা করেছে। তা সে লোকের ব্যাপারে যাকে মিয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সময় দেয়া হয়েছে অথবা সময় দেয়া হয়েছে মিয়াদ শেষ হওয়ার পর। তার সনদ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, সাঈদ ইবনে মনসূর, আবুল আহওয়াস, সাঈদ ইবনে মসরূক, শবী, সামআন, সামুরাতা ইবনে জুনদব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে ভাষণ দিলেন। বললেন ঃ এখানে অমুক বংশের কোন লোক আছে কি ? ..... কিন্তু কোন লোক উত্তর দিল না। পরে আবার তাই বললেন। তখনও কেউ সাড়া দিল না। তার পর আবারও তাই বললেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল। বলল, আমি আছি হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, প্রথম দুইবারের ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কোন্ জিনিস নিষেধ করেছিল ? আমি শুধু এই শেষবারেই তোমার সাড়া পেলাম। ...... তোমাদের বংশের একজন লোক তার ঋণের জন্যে বন্দী হয়ে আছে। আমি তাকে দেখেছি, তুমি তার ঋণ শোধ করে দাও, যেন কোন লোক তার নিকট কিছু পাওনার দাবি করতে না পারে।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ আল-সহরী, আন-নহদী, অহব, সাঈদ ইবনে আবূ আয়ূব, আবূ আবদুল্লাহ আল-কুরাশী, আবূ বুরদাতা ইবনে আবূ মূসা-আল-আশযারী তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَّلْقَاهُ عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهَاهُ اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ يَّمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً -

যেসব কবীরা গুনাহের কাজ করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন, তা বাদে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ যা নিয়ে বান্দা তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তা হল বান্দা ঋণ নিয়ে মরবে, অথচ ঋণ শোধের কোন ব্যবস্থা করে যাবে না।

এ দুটি হাদীস প্রমাণ করে যে, পাওনা দাবি করা ও ঋণীকে পাকড়াও করা থেকে অর্থ কষ্টে পড়া ঋণী ব্যক্তি রেহাই পাবে না। মরে গেলেও পাওনাদারের দাবি শেষ হবে না, যদি তার পাওনা দেয়ার ব্যবস্থা করে না যায়।

যদি বলা হয়, এ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দারিদ্র্যাবস্থায় মরে যায়, তাহলে হয় সে তার ঋণ শোধে অক্ষম হবে তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, না হয় সে তা হবে না। যদি সে অক্ষম থেকে যায়, তাহলে তার এ অক্ষমতার কারণে সে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে, যেসব গুনাহ্ থেকে তওবা করেনি সেসব গুনাহের মতো। আর যদি অক্ষম না হয়ে থাকে, ঋণ শোধের

প্রতি উপেক্ষা না দেখিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ সেজন্যে তাকে পাকড়াও করবেন না। কেননা আল্লাহ্ তো কাউকে পাকড়াও করেন তার গুনাহ হলে।

জবাবে বলা যাবে, এ কথা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য, যে তার ঋণ শোধ করার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। পরে তার এ অপরাধের জন্যে সে তওবা করে নি। তওবা না করেই সে মরে গেছে দারিদ্র্যাবস্থায়। এ কারণে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করবেন। যে লোক অন্যের নিকট ঋণী সে দরিদ্র হলে তার জন্যে এ হুকুম। কেননা সে তার অপরাধের জন্যে তওবা করেছে, তা আমরা জানি না। তাই দুনিয়াই তার নিকট পাওনার জন্যে অবশ্যই দাবি করতে হবে, যেমন সে পাকড়াও হবে আল্লাহ্র নিকটও।

যদি বলা হয়, একজন তার ঋণ শোধ করতে উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং তার এ অপরাধ সে পৌনপুনিকভাবে করে। আর একজন তার ঋণ শোধ করতে এলেই দায়িত্বহীনতা দেখায় না, কিংবা প্রথমে হয়ত দায়িত্বহীনতা দেখিয়েছে, পরে সে তার এ অপরাধ থেকে তওবা করেছে, এ দুইজনের মধ্যে পার্থক্য করা বাঞ্ছনীয়। তাই যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে, তওবা করেনি, তাকে পাকড়াও করা জরুরী মনে করবে। কিন্তু যে লোক উপেক্ষা প্রদর্শন করেনি অথবা শুরুতে করেছিল, পরে তওবা করেছে, তার জন্যে তা জরুরী মনে করবে না।

জবাবে বলা যাবে, তার গুনাহ থেকে তার তওবা করার নিগূঢ় তত্ত্ব যদি আমরা জানতে পারি কিংবা জানতে পারি যে, সে ঋণ শোধে উপেক্ষা প্রদর্শনকারী ছিল না, তাহলে তার বিষয় ও যার উপেক্ষা প্রকাশমান, পাকড়াও করার ব্যাপারে এ দুজনের মধ্যে আমরা অবশ্যই পার্থক্য করব। যেমন আল্লাহ্র নিকট ও-দুজন সংক্রান্ত হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা প্রদর্শনকারী নয়, তা তো আমরা জানি না। কেননা হতে পারে, তার হাতে লুকিয়ে রাখা অনেক সম্পদ রয়েছে। অথচ সে বাহ্যত স্বীয় অর্থ কষ্টই দেখিয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক তার দারিদ্র্য প্রকাশ করার সাথে সাথে তার উপেক্ষা-অক্ষমতার গুনাহ থেকে তওবা করার কথাও প্রকাশ করেছে। হতে পার, সে প্রকৃতপক্ষে সচ্ছল ব্যক্তি, তার ঋণ সে সহজেই আদায় করে দিতে পারে, সে যা প্রকাশ করেছে, প্রকৃতপক্ষে সে তা নাও তো হতে পারে। এ রকম যখন হবে, তখন ঋণীকে পাকড়াও করা ও তার নিকট পাওনা দাবি করা অবশ্যই চলতে থাকবে। যেমন তার মৃত্যুর পর-ও তাকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। আবূ কাতাদাতা বর্ণিত হাদীসটিও তা-ই প্রমাণ করে। সেটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল, আল-আসকালানী, আবদুর রাযযাক, মামার, জুহরী, আবূ সালমাতা, জাবির সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মরে যেত, রাসূলে করীম (স) তার জানাযা পড়াতেন না। একবার এক মাইয়্যেত নিয়ে আসা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই লোকটির উপর কোন ঋণ চাপানো আছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। দুই দীনারের ঋণ আছে। বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়। তখন আবূ কাতাদাতা আল-আনসারী বললেন, সে দুই দীনারের ঋণ শোধ করার দায়িত্ব আমার উপর থাকল হে রাসূল! তখন রাসূলে করীম (স) তার জানাযা পড়লেন। পরে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয় দান করলেন, তখন তিনি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করলেন ঃ

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ –

আমি প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্যে তার নিজের চাইতে অনেক বেশি অধিকারী।

বোঝা গেল, মরার পর-ও ঋণের দাবি বহাল না থাকলে— যখন সে ঋণী দারিদ্র্যাবস্থায় মরে যায়, তখন সে হয়ত নামায কামাই দেয়ার গুনাহ্ নিয়ে যায় না; কিন্তু সে এমন হয় যে, যেন তার উপর কোন ঋণ চাপানো নেই।

এতে দলীল রয়েছে এ কথার, যে ঋণী ব্যক্তির অর্থ সংকট বা দারিদ্র্য তাকে পাকড়াও করা ও তার নিকট পাওনা দাবি করা থেকে নিষ্কৃতি দেয় না।

ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল, মুহাজির আবদুল মালিক ইবনে উমাইর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কোন লোক যদি হযরত আলী (রা)-এর নিকট তার পাওনাদারকে নিয়ে আসত, বলতেন, তোমার যে পাওনা তাকে আটক করেছে তার প্রমাণ পেশ কর। সে যদি বলত, তা হলে এখন আমি তাকে পাকড়াও করছি, তা হলে বলতেন, তাকে পাকড়াও করা থেকে তোমাকে কোন্ জিনিস বিরত রেখেছে?

তবে জুহরী ও লায়স ইবনে সাদের কথা সে দুজনের শাস্তি চালু করা ও তার প্রাপ্য মজুরি থেকে ঋণ আদায় করে নেয়ার প্রসঙ্গে— আয়াতের পরিপন্থী কাজ। রাসূলে করীম (স) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তারও বিরোধী। কুরআনের আয়াত হচ্ছে ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ –

যদি ঋণী ব্যক্তি অর্থকষ্টে নিপতিত হয়, তা হলে তা সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবসর দিতে হবে।

এতে একথা বলা হয়নি যে, তার উপর যা প্রাপ্য আছে সে জন্যে তাকে মজুর বানিয়ে মজুরি দিতে হবে। এ ছাড়া নবী করীম (স) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতেও তাকে মজুর খাটিয়ে তার মজুরি থেকে পাওনা আদায় করার কথা বলা হয়নি। তাতে বরং তাকে ছেড়ে দেয়ার কথাই আছে। আবূ সাঈদুল খুদরী বর্ণিত হাদীসের কথা ঃ 'তোমাদের জন্যে তা বাদে আর কিছু নেই' যা পাওয়া গেছে তার অধিক যখন পাওয়া যাবে না, সেই সময়ের প্রসঙ্গের কথা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ –

আর তোমরা সাদকা করবে। তা তোমাদের জন্যে অতীব কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।

অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে সাদকা করা তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে সময় দেয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। এ কথা প্রমাণ করে যে, সাদকা 'করয' দেয়া অপেক্ষা ভালো। কেননা 'করয' হল কাউকে মাল দেয়া ও বিলম্বে তা ফেরত পাওয়ার আশা করা। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, দুই বার 'করয' দেয়া একবারের সাদকা দানের সমান। আল-কামা আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلسَّلْفُ يَجْرِيْ مَجْرِيْ شَطْرِ الصَّدَقَةِ -

ধারে দেয়া সাদকার ধারায় চলমান হয়।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। ইবরাহীম ও কাতাদাতা বলেছেন, 'এবং তোমরা সাদকা করবে তা তোমাদের জন্যে অতীব কল্যাণময়' আয়াতের তাৎপর্য হল মূলধন। আল্লাহ্ ঋণ থেকে মুক্তকরণকে সাদকা নাম দিয়েছেন, বাহ্যত মনে হয়, তা যাকাত থেকে দেয়া জায়েয। কেননা যাকাতকে সাদকা নাম দেয়া হয়েছে। তা যেহেতু অর্থকষ্টে পড়া ঋণী ব্যক্তি সম্পর্কে কথা। আমরা উন্মুক্ত চোখে দেখলে বুঝব, যেসব মালে যাকাত ফরয হয়, সেসব মালের যাকাত থেকে তা দেয়া জায়েয। তা মূল জিনিস হিসেবে দেয়া এবং ঋণ শোধ করে দেয়া দুটিই চলে, তবে হানাফী ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন, যাকে ঋণমুক্ত করা হবে তার জন্যে দেয়া যাকাত প্রত্যাহৃত হবে, অন্যটা নয়। কেননা ঋণ একটি হক্— পাওনা। ঠিক যেটি নিয়েছে, সেটিই ফিরিয়ে দেয়া নয়। লোকদের হক-হকুক যাকাতের ধারায় চলে না। যেমন ঘরের অধিবাস, দাসের খিদমত প্রভৃতি। আর সেটিকেই সাদকা নামকরণ তা যাকাত থেকে আদায় করা জরুরী করে দেয় না সর্বাবস্থায়। আল্লাহ্ কিসাস মুক্তিরও নাম দিয়েছেন সাদকা। বলেছেন ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ -

এবং তাদের উপর এক্ষেত্রে ফরয করে দিলাম জানের বদলে জান .... হ্যাঁ, যে লোক এটাকে সাদকা করে দেবে (কিসাসমুক্ত করে দেবে), তাহলে তা তার জন্যে কাফফারা হবে।

(সূরা মায়িদা ঃ ৪৫)

এর অর্থ, কিসাস মাফ করে দেয়া। কিসাস মাফ করে দেয়া কাফফারার মতই কাজ, এ ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমরা জানি না। ইউসূফ (আ)-এর ভাইদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا -

এবং আমরা সামান্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছি। অতএব আমাদের জন্যে পাত্র পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের প্রতি সাদকা করুন। (সূরা ইউসূফ ঃ ৮৮)

তারা তাঁর নিকট এ দাবি জানায় নি যে, তাঁর নিজের মাল থেকে তাদেরকে সাদকা দিক। তারা বলেছিল, তাদের নিকট বিক্রয় করুন এবং তাদের জন্যে মাপতে নিষেধ না করুন। কেননা শুরুতে তাদেরকে দিতে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা এ-ও বলেছিল যে, আমাদের জন্যে পাত্র পূর্ণ করে দিন। তা-ই তারা চেয়েছিল, যা তারা তাদের সামান্য জিনিস দ্বারা ক্রয় করেছিল। এর উপর যখন 'সাদকা' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারছে, তখন যাকাত বোঝাবার জন্যেও এ শব্দটির ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু 'সাদকা' ঋণের জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার ইল্লাত হতে পারে না তা যাকাত বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হওয়ার।

পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন পারস্পরিক লেন-দেনের কোন নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্যে চুক্তি করবে, তখন তোমরা তা লিপিবদ্ধ করবে।

আবূ বকর বলেছেন, কিছু লোক এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মিয়াদ ভিত্তিক লেনদেনের চুক্তি লিপিবদ্ধ করা এবং তার জন্যে সাক্ষী রাখা ফরয। তা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা লিখ' এ আদেশ দ্বারা প্রমাণিত। সেই সাথে এ কথাও ঃ

فَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ -

আর তোমরা দুজন সাক্ষী বানাও তোমাদের পুরুষদের থেকে।

পরে এ ফরযটা মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র এ কথার দ্বারা ঃ

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَه -

তোমাদের পরস্পর যদি পরস্পরকে বিশ্বাস করে, তাহলে যার কাছে যে আমানতটা আছে তা যেন সে ফিরিয়ে দেয়।

এ কথা আবূ সাঈদুল খুদরী, শবী ও আল-হাসান থেকে বর্ণিত। অন্যান্যরা বলেছেন, না, প্রথমোক্ত আয়াতটি মুহকাম— দৃঢ় ও মনসূখ হয়ে যায়নি।

আমিমুল আহওয়াল ও দাউদ ইবনে আবূ হিন্দু ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

لَاوَاللّٰهِ اِنَّ اٰيَةَ الدَّيْنِ مُحْكَمَةٌ وَمَا فِيْهَا نَسْخٌ -

না, আল্লাহ্‌র কসম! ঋণ সংক্রান্ত আয়াতটি মুহকাম, দৃঢ়, স্থায়ী। তাতে মনসূখ হওয়ার কিছু নেই।

শু'বা ফরাস-শ'বী আবূ বুরদাতা, আবূ মূসা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন ঃ

ثَلٰثَةٌ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَهُمْ رَجُلٌ كَانَتْ لَهٗ امْرَاَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَرَجُلٌ اَعْطٰى مَالَهُ سَفِيْهًا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى - وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ - وَرَجُلٌ لَهٗ عَلٰى رَجُلٍ دَيْنٌ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ بِهٖ -

তিন লোক আল্লাহ্‌কে ডাকে, কিন্তু কোন জবাব পায় না। এক ব্যক্তি, যার চরিত্রহীন স্ত্রী রয়েছে কিন্তু তাকে সে তালাক দেয়নি। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যে তার মাল নির্বোধ ব্যক্তিকে দিয়েছে, অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমরা নির্বোধ লোকদেরকে তোমাদের মাল দিও না।'

আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যার অপর কাউকে দেয়া ঋণ আছে; কিন্তু তাতে কাউকে সাক্ষী বানায়নি।

আবূ বকর বলেছেন, উপরোক্ত হাদীসটি নবী করীম (স)-এর কথা হিসেবে 'মরফূ' বর্ণিত হয়েছে। জুয়ায়বির দহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি তার হক যায়, তাহলে সওয়াব-কর্মফল পাবে না, যদি তাঁকে ডাকে, জবাব পাবে না। কেননা সে নিজে আল্লাহ্র হক নষ্ট করেছে, আদায় করেনি, আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করেছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেছেন; 'তোমরা যখন পারস্পরিক বেচা-কেনা কর, তখন তার সাক্ষী রাখ'— এর অর্থ, তোমাদের হক-হকুকে যদি কোন মিয়াদ থাকে, তাহলে তাতে সাক্ষী বানাও। মিয়াদ না থাকলেও সর্বাবস্থায়ই তোমার হক-এর উপর সাক্ষী রাখ। ইবনে জুরাইয বলেছেন, যদি অর্ধ দিরহামের কেনা-বেচা করে, তাহলেও কি সাক্ষী রাখতে হবে, আতাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, এই সবই হচ্ছে আল্লাহ্র 'তোমরা পারস্পরিক বেচা-কেনা করলে সাক্ষী রাখ' এ কথাটির ব্যাখ্যা।

মুগীরা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সাক্ষী রাখতে হবে সবজির পাতায় হলেও। আল-হাসান ও শবী থেকে বর্ণিত, ইচ্ছা হয় সাক্ষী রাখবে, না হয় রাখবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'যদি তোমাদের কতক লোক অপর কতক লোককে বিশ্বাস করে।' অর্থাৎ পারস্পরিক বিশ্বাস থাকলে সাক্ষী না রাখলেও চলবে। লায়স মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা) যখন কিছু বিক্রয় করতেন, তার উপর সাক্ষী বানাতেন কিন্তু লিখতেন না। বোঝা যায়, তিনি লেখার আদেশকে মুস্তাহাব মনে করতেন। কেননা তা লেখা ওয়াজিব বা ফরয হলে সাক্ষী রাখার সাথে সাথে লেখার কাজও করতেন। কেননা আয়াতে এ দুটির হুকুম এক সাথেই দেয়া হয়েছে।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্র কথা, 'তাহলে লিখ.... তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাও' পর্যন্ত এবং 'তোমরা সাক্ষী রাখ যখন পরস্পরে বেচা-কেনা কর' এ থেকে মিয়াদ ভিত্তিক ঋণে সাক্ষী রাখা ও লেখা দুটিই হয় ফরয হবে আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর এ হুকুমটি স্থায়ী ও প্রমাণিত ছিল। পরে তা আর ওয়াজিব ফরয থাকেনি 'যদি তোমরা কতক অপর কতককে বিশ্বাস কর' কথাটির দরুন। অথবা এ সবই এক সঙ্গে নাযিল হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে লেখা ও সাক্ষী রাখা দুটিই ওয়াজিব ফরয হবে না। কেননা তাতে মনসূখ ও মনসূখকারীর একত্রে নাযিল হওয়া মানতে হয় একই আয়াতের মধ্যে। কেননা কোন হুকুম স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের আগে তা মনসূখ হতে পারে না। কিন্তু এ দুটি হুকুমের এক সঙ্গে নাযিল হওয়ার তারিখ আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়নি। তাই মানতে হবে যে, দুটি হুকুমই এক সাথে নাযিল হয়েছে। তাহলে লেখার ও সাক্ষী রাখার হুকুম পরস্পর মিলিত হয়ে নাযিল হয়েছে মানতে হবে। তাহলে এ থেকে প্রমাণিত হল যে, লেখার ও সাক্ষী রাখার আদেশ মুস্তাহাব, ওয়াজিব বা ফরয নয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা এসেছে, তিনি বলেছেন, ঋণ সংক্রান্ত আয়াত 'মুহকাম'— মনসূখ হয়নি, তা প্রমাণিত হয় না। কেননা তিনি সাক্ষী বানানোকে ওয়াজিব মনে করেছেন। তিনি হয়ত মনে করেছেন যে, সব কয়টি আদেশই একসাথে নাযিল হয়েছে। তাহলে আয়াতের ধারাবাহিকতায় সাক্ষী রাখার আদেশটা মুস্তাহাব

হয়। কেননা আল্লাহ্র এ কথাও তো রয়েছে 'যদি তোমাদের কতক অপর কতককে বিশ্বাস করে।' ইবনে উমর (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তিনি সাক্ষী বানাতেন। ইবরাহীম ও আতা সামান্য বেচা-কেনারও সাক্ষী বানাতেন। আমাদের মতে তাঁরা সকলেই মাত্র মুস্তাহাব হিসেবেই এ কাজ করতেন। ওয়াজিব-ফরয হিসেবে নয়। আর আবূ মূসা থেকে যে বর্ণিত হয়েছে তিনজন লোক আল্লাহকে ডাকে, কিন্তু জবাব পায় না, তাদের একজন হল সে, 'যার অপর ব্যক্তিকে দেয়া ঋণ আছে, কিন্তু তার সাক্ষী রাখেনি' থেকেও প্রমাণিত হয় না যে, তিনি সাক্ষী রাখাকে ওয়াজিব-ফরয মনে করতেন। লক্ষণীয়, তিনি এর সাথে চরিত্রহীন স্ত্রীকে তালাক দেয়নি— এমন ব্যক্তির কথাও বলেছেন। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, চরিত্রহীন স্ত্রীকে তালাক দেয়া ওয়াজিব বা ফরয তো নয়। এ কথাটি মূলত তাঁর নিজের। তাঁর এ কথার তাৎপর্য এতটুকু যে, যে লোক এরূপ কাজ করে সে সতর্কতা অবলম্বন করেনি। আল্লাহ্ মুক্তি ও নিষ্কৃতির যে পথ বানিয়েছেন, সে সে পথে চলেনি। আর বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, লেখার, সাক্ষী রাখার ও রেহন রাখার আদেশ, যা এ আয়াতটিতে এক সঙ্গে উল্লিখিত— পালন করা মুস্তাহাব মাত্র। যে কাজে আমাদের স্বার্থ, কল্যাণ ও দ্বীন-দুনিয়ার সতর্কতা নিহিত, তা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। এর একটিও ঠিক ওয়াজিব বা ফরয নয়। মুসলিম উম্মাহ্ শুরু থেকে এ পর্যন্ত এ কথা মেনে এসেছে যে, পারস্পরিক লেনদেন— ঋণের চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয় ও নিজ নিজ দেশে কেনা-বেচায় কোন সাক্ষী বানাবার সাধারণ কোন প্রচলন নেই। সেসব দেশের ফিকাহবিদগণ তা জানতেন। কিন্তু তাঁরা তার প্রতিবাদ করেন নি। সাক্ষী রাখা ওয়াজিব বা ফরয হলে তা না হওয়ার প্রতিবাদ না করে তাঁরা কিছুতেই চুপ থাকতে পারতে না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা সকলে এ কয়টি কাজকে মুস্তাহাব মনে করতেন। তা স্বয়ং নবী করীম (স)-এর সময় থেকেই চলে এসেছে আমাদের এ কাল পর্যন্ত। সাহাবা ও তাবেয়ীন যদি তাঁদের বেচা-কেনায় সাক্ষী বানিয়ে থাকতেন, তাহলে তা নিশ্চয়ই সকলের জানা থাকত এবং ধারাবাহিকভাবে একাল পর্যন্ত চলে আসত। আর সাক্ষী না বানানোর প্রতিবাদ তাঁরা অবশ্যই করতেন। কিন্তু তাঁদের সাক্ষী বানানোর কথা ধারাবাহিকতার সাথে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি এবং তা না হওয়ার জন্যে তার প্রতিবাদ করার কথাও জানা যায়নি। তাই প্রমাণিত হলো যে, লেনদেন, ধার-করয ও বেচা-কেনায় সাক্ষী রাখা ও লেখা নিশ্চয়ই ওয়াজিব-ফরয নয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'অতএব তোমরা তা লিখ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেই লোকদেরকে, যাদের উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের শুরুতে। শুরুতে 'হে ঈমানদার লোকেরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ আদেশ অবশ্য সেসব লোকের জন্যে, যারা পারস্পরিক লেনদেন— ঋণ দেয়া-নেয়া করে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক চুক্তি করে।

যদি বলা হয়, আল্লাহ্ تَدَايَنْ 'পারস্পরিক ঋণ দেয়া-নেয়া' বলার পর আবার دَيْنٍ 'ঋণ' শব্দটির উল্লেখ করেছেন কেন? تَدَايَنْ পারস্পরিক যা হয়, সেটাই তো دَيْنٍ ঋণ?

জবাবে বলা যাবে, কেননা আল্লাহ্র কথা تَدَايَنْ শব্দটির বহু কয়টি অর্থ রয়েছে। তার دَيْنٍ উচ্চারণে তার অর্থ হতে পারে প্রতিফল। যেমন مَـٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 'প্রতিফল দানের দিন।'

তাই تَدَا يَنْتُمْ -এর অর্থ হতে পারে পারস্পরিক প্রতিফল দান। তাই دَيْن শব্দের উল্লেখ করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হল যে, এখানে পারস্পরিক ঋণদান-গ্রহণ বোঝানো হয়েছে। এটা পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপার। আর মূল কথাটির ওপর তাগিদ বোঝাবার জন্যেও তার উল্লেখ হয়ে থাকতে পারে। মনের কোঠায় প্রকৃত অর্থটি বসিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেও হতে পারে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى –

যখন তোমরা পারস্পরিক ঋণ দেয়া-নেয়া কারবার করবে নির্দিষ্ট একটা মিয়াদের ভিত্তিতে।

এতে সর্বপ্রকারের পারস্পরিক লেনদেন শামিল হয়েছে, যাতে কোন মিয়াদ নির্দিষ্ট করা সহীহ্ হয়। তাই বলে এ থেকে সর্বপ্রকারের লেনদেনেই একটা সময় নির্ধারণ জায়েয, একথা প্রমাণিত হয় না। কেননা আয়াতে সর্বপ্রকারের কারবারের সময় নির্ধারণ জায়েয হওয়ার বর্ণনা নেই। বরং তাতে ঋণ মিয়াদভিত্তিক হলেই তাতে সাক্ষী রাখার আদেশ রয়েছে। তবে ঋণ দানের ব্যাপারে সময় নির্ধারণ যে জায়েয, তা অপর এক দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয়। কোনটাতে তা জায়েয নয়, তা-ও কোন দলীলের দ্বারাই জানা যায়। ঋণের বদলে ঋণ মিয়াদ জায়েয হওয়ার কোন ফায়সালা উক্ত আয়াতে দেয়া হয়নি। ফলে সর্বপ্রকারের পারস্পরিক লেনদেন মিয়াদভিত্তিক হতে পারা প্রমাণিত হয় না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ اَسْلَمْ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ –

যে লোক 'সালম' (অগ্রিম মূল্য গ্রহণ পণ্য সরবরাহ পরে) প্রক্রিয়ায় বিক্রয় ও ক্রয় করবে, তার উচিত নির্দিষ্ট মাপের সাথে। তার ওজন জানা ও মিয়াদ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

সর্বপ্রকারের মাপের, ওজনের ও জানা মিয়াদের 'সালম' জায়েয হওয়ার কোন প্রমাণ তাতে নেই। তার মাপ ওজন জ্ঞাত, বর্গ, প্রজাতি বা প্রকার ও গুণের কথা অন্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়া বাঞ্ছণীয়। যখন প্রমাণিত হবে যে, এটা 'সাল্ম', তাহলে পরে প্রয়োজন হবে একটা নির্দিষ্ট ও জানা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে 'সাল্ম' করা। উক্ত আয়াত থেকে যখন পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু তার এ সাধারণ ও ব্যাপক তাৎপর্যের দ্বারা সর্বপ্রকারের চুক্তি জায়েয হওয়ার দলীল হতে পারে না। কেননা আয়াতে সাক্ষী বানাবার আদেশ রয়েছে, যদি পারস্পরিক লেনদেন সহীহ্ হয়, তবেই তা কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে সর্বপ্রকারের লেনদেনে মিয়াদের শর্ত আরোপ করা জায়েয হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। যখন ঋণ ও তাতে মিয়াদ নির্ধারণ সহীহ্ হবে, তখনই সাক্ষী বানাবার আদেশ কার্যকর করার সময় উপস্থিত হবে।

কেউ কেউ 'করয' কাজে মিয়াদ নির্ধারণ জায়েয হওয়ার দলীল রূপে এ আয়াতকে পেশ করেছেন। কেননা 'করয' ও অন্যান্য সমস্ত লেনদেনের চুক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। অথচ আমরা জেনে গেছি যে, 'করয' যার নাম, তা আমাদের মতে সে রকম নয়, যেমন বলা হয়েছে। কেননা সর্বপ্রকারের ঋণ জায়েয হওয়ার যেমন তাতে কোন দলীল নেই, তেমনি সর্বপ্রকারের ঋণে সময় নির্ধারণ জায়েয হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। কেবলমাত্র সেরূপ ঋণের উপর সাক্ষী বানাবার আদেশ হয়েছে, যাতে সময় নির্ধারণ প্রমাণিত হয়েছে। কেননা সব ঋণ

প্রমাণিত নয়, তাতে সাক্ষী বানাবার কথা বলা হয়েছে— একথা মনে করা কঠিন। তাই তার তাৎপর্য এই হতে হবে যে, তোমরা যখন এমন ঋণের লেনদেনের চুক্তি করবে, যাতে সময় নির্ধারণ জায়েয, তখন তোমরা তা অবশ্যই লিখবে। তাই 'করয' মাত্রেই সময় নির্ধারণ জায়েয প্রমাণের জন্যে এ আয়াতকে যে লোক দলীল বানাবে, সে যথার্থভাবে প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি। 'করয' পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি নয়। 'তোমরা যখন কোন ঋণের পারস্পরিক চুক্তি করবে' 'করয' এ কথাটির আওতায় পড়ে না। কেননা কেবল চুক্তি হলেও 'করয' না হলে ঋণ হয় না। অতএব 'করয' তার আওতার বাইরে গণ্য হওয়া আবশ্যক।

আবূ বকর বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা যখন নির্দিষ্ট মিয়াদের ভিত্তিতে ঋণের পারস্পরিক চুক্তি করবে' সর্বপ্রকারের সময়ভিত্তিক ঋণকে শামিল করে। তার বদলটা আসল সে জিনিস হোক; কিংবা হোক ঋণ, তা অভিন্ন। তাই যদি কেউ কোন ঘর বা দাস ক্রয় করে হাজার দিরহামে নির্দিষ্ট একটা মিয়াদে মূল্য দেয়ার শর্তে, তাহলে আয়াতের দাবি অনুযায়ী লেখা ও সাক্ষী রাখার আদেশ তখন পালন করতে হবে। অথচ আয়াতটি প্রমাণ করেছে যে, তা শুধু মিয়াদী ঋণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ— দুইটির যে কোন একটির বদলে, দুটিতেই এক সাথে নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ যখন তোমরা পারস্পরিক কোন ঋণের চুক্তি করবে নির্দিষ্ট কোন মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে। আয়াতে দুইটি ঋণের কথা বলা হয়নি। তাতে দুইটির মাত্র একটি বদলে মিয়াদ প্রমাণ করা হয়েছে। তাই একসাথে দুটি বদলেই মিয়াদ নির্ধারণ জায়েয নয়। অথচ নবী করীম (স) ঋণের বদলেই ঋণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যদি দুইটি ঋণে চুক্তি হয়, তাহলে তা জায়েয 'সাল্‌ম'-এ। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ হবে একটি মজলিসে। আয়াত থেকে 'সালম' বোঝাও নিষিদ্ধ নয়। কেননা দুই বদলের একটিতে মিয়াদ নির্ধারণ তো 'সাল্‌ম' প্রক্রিয়ার কাজে হয়। অথচ আল্লাহ্‌ আদেশ করেছেন সাক্ষী রাখার জন্যে এমন পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তিতে, যা কেবল মিয়াদভিত্তিক ঋণেই হতে পারে। কাতাদাতা আবূ হিশাম ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মিয়াদভিত্তিক সাল্‌ম-এর কথাই আল্লাহ্‌র কিতাবে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র কিতাবের দীর্ঘতম আয়াতে তা-ই নাযিল করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) জানিয়ে দিলেন যে, মিয়াদভিত্তিক 'সাল্‌ম' আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যের অধীন শামিল রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, যে কোন মিয়াদী ঋণ প্রমাণিত, তার কথাই উক্ত আয়াতে বক্তব্য। তা মুনাফা বদল পর্যায়ের হোক, কিংবা মূল বস্তুর বদল পর্যায়ের। যেমন ইজারা চুক্তির মিয়াদী মজুরি দান, আর 'মহরে মুয়াজ্জাল।' খুলা, তালাক, ইচ্ছামূলক হত্যার সুলাহ্‌ও মিয়াদভিত্তিক দাস-মুক্তির চুক্তি লেখন। কেননা এগুলো মিয়াদী ঋণ বিশেষ, পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমরা আগেই বলেছি, আয়াতটির প্রবণতা হচ্ছে, এই হুকুমটি কার্যকর হবে দুই বদলের কোন একটিতে যদি তা মিয়াদভিত্তিক হয়। এক সাথে দুটির মধ্যে নয়। কেননা আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى -

যখন তোমরা পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি করবে কোন মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে।

অতএব সর্বপ্রকারের চুক্তিই এ আয়াতের মধ্যে শামিল। তা সেই চুক্তি, যার দ্বারা কোন মিয়াদী ঋণ প্রতিষ্ঠিত। সে ঋণে মুনাফার বদল হবে কিংবা মূল জিনিসের বদল— তার মধ্যে

কোন পার্থক্য নেই। তাহলে লেখা ও সাক্ষী বানানো সবই মুস্তাহাব পর্যায়ের হবে, তদ্দ্বারা এসব চুক্তির কথাই বলা উদ্দেশ্য। আর সাক্ষীর সংখ্যা ও সাক্ষ্যের গুণ পরিচিতি সে সবগুলোতেই গণ্য হবে। কেননা ব্যবহৃত শব্দে কিছুকে অপর কিছু থেকে বিশেষীকরণ করা হয়নি। তাই বিয়েতে একজন পুরুষ ও দুইজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে, যদি মহরানা মিয়াদী ঋণ পর্যায়ের হয়। আর খুলা তালাক, ইজারা ও ইচ্ছামূলক হত্যার সুলাহ্ এবং এ পর্যায়ের আর যা যা হয়, তাতেও। কোন কোন মিয়াদী ঋণে এসব বিধানকে সীমাবদ্ধ রাখা ও অন্যগুলোকে বাদ দেয়া জায়েয হবে না। কেননা আয়াত তো সবকিছুকেই শামিল করে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى অর্থাৎ নির্দিষ্ট ও জানা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে চুক্তি হবে। আগের কালের ফিকাহবিদদের এক বিরাট সংখ্যকের এই মত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'মূল্য নগদ ও পণ্য বাকীর (সালম) কারবার যে-ই করবে, তার তা করা উচিত জানা মাপ, জানা ওজন ও জানা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে।' আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ -

আর তোমাদের মধ্যকার এ চুক্তিনামা একজন লেখক পূর্ণ ন্যায়পরতা ও পক্ষপাতহীনতা সহকারে লিখবে।

যে ব্যক্তি লোকদের পারস্পরিক লেনদেনের দলীল-দস্তাবেজ লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এটা তারই জন্যে নির্দেশ। সে তা পারস্পরিক পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতে লিখবে। লেখাটা চূড়ান্ত না হলেও যখন তা লেখা হবে, তখন তা অবশ্যই পূর্ণমাত্রায় ইনসাফ ও সততা-ন্যায়পরতা সহকারে লিখতে হবে। এটাই তার একমাত্র পথ। তাকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির পূর্ণ নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে। যে উদ্দেশ্যে এ দলীল লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, তার হক আদায় করতে হবে। তার শর্তসমূহ যথার্থ ও বৈধ হতে হবে। তা সব শরীয়াত সম্মতভাবে হতে হবে। বিভিন্ন অর্থ সম্পন্ন শব্দ ব্যবহার এড়িয়ে যেতে হবে। সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যে সব শব্দের দরুন কোন-না কোন সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে তা বাদ দিতে হবে। ফিকাহবিদদের পারস্পরিক মতপার্থক্যকে অতিক্রম করতে হবে। যেন ঋণ চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় একটি স্পষ্ট ও দৃঢ়-নির্ভরযোগ্য দলীল পেয়ে যেতে পারে। আয়াতে যেসব সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, তা পুরামাত্রায় অবলম্বন করতে হবে। এ কারণে লেখার আদেশ করার পর-পরই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ -

কোন লেখক তা আল্লাহ্‌র দেয়া জ্ঞান অনুযায়ী লিখতে অস্বীকার করবে না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ সহীহ্ চুক্তির যেসব নিয়ম-বিধান ও জায়েয প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক লেন-দেনের পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী দস্তাবেজ লিখতে হবে। যার ফলে ঋণ চুক্তির প্রত্যেকটি পক্ষ সহীহ্ ঋণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে, কেননা লেখক নিজেই যদি এসব নিয়ম-নীতি ও আইন-বিধান না জানে, তা হলে সে এমন দলীল লিখে ফেলতে পারে, যাতে পক্ষদ্বয়ের নির্দোষ উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাদের পারস্পরিকভাবে করা চুক্তিই বরবাদ হয়ে যেতে পারে। দলীল লিখিতভাবে তৈরী করা যদিও মুস্তাহাব, তবু তা যদি লেখা-ই হয়, তাহলে তা

যেন পূর্ণ সতর্কতা সহকারে লেখা হয়। এসব শর্তের ভিত্তিতেই তা হতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ -

তোমরা যখন নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাতসমূহ ধৌত করবে। (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

এ আয়াতে ফরয ও নফল— সর্ব প্রকারের নামাযই শামিল রয়েছে। আর একথা তো জানাই আছে যে, যে নামায নফল, তা ওয়াজিব বা ফরয নয়। কিন্তু যখন তার নিয়ত করা হবে, তখন যদি সে অযূ সহ না হয়, তাহলে তাকে তাহারাতের সর্ব শর্তই পূর্ণ করতে হবে। অদায় করতে হবে তার সব রুকন। আর নবী করীম (স) যেমন বলেছেন ঃ 'সাল্‌ম' ক্রয়-বিক্রয় করলে তা জানা মাপে, জানা ওজনে ও জানা মিয়াদের ভিত্তিতে করতে হবে।' 'সাল্‌ম' করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সে কাজ করার ইচ্ছা ও সংকল্প করা হলে তাকে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পুরামাত্রায় আদায় সহকারে করতে হবে। ঋণ চুক্তি ও তাতে সাক্ষী বানানো ওয়াজিব ফরয কাজ নয়। কিন্তু তা যখন শেষ হবে, তখন তা অবশ্যই আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত লিখতে হবে। তার সঠিকতার জন্যে জরুরী যাবতীয় শর্ত পুরামাত্রায় লিখতে হবে, যেন তা লেখার মূল লক্ষ্যটা অর্জিত হয়।

লেখকের লেখার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আগের কালের ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। শবী বলেছেন, তা ওয়াজিব-কিফায়া বা ফরয-কিফায়া। যেমন জিহাদ প্রভৃতি। সুদ্দী বলেছেন, লেখকের তা লেখা কর্তব্য বটে, তবে যদি তার অবসর থাকে। আতা ও মুজাহিদ বলেছেন, লেখা তার জন্যে ওয়াজিব। দহাক বলেছেন, লেখার এ আদেশকে মনসূখ করে দিয়েছে আল্লাহ্‌র এ কথা ঃ

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -

তবে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

আবূ বকর বলেছেন, আমরা আগেই বলেছি যে, লেখাটা মৌলিকভাবে ঋণ লেনদেনের পক্ষদ্বয়ের জন্যেই ওয়াজিব বা ফরয নয়। তাহলে একজন সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্যে তা লিখে দেয়া কি করে ওয়াজিব বা ফরয হতে পারে, যার এ চুক্তির সাথে কোন সম্পর্কই নেই। তার কোন কারণ তার সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে যারা তা ওয়াজিব বা ফরয মনে করেন, তাঁরা হয়ত এ ধারণা নিয়েছেন যে, তা আসলে ফরয। তেমনি যে লোক তা সুন্দরভাবে লিখতে পারে, তার জন্যে কর্তব্য এই যে, যার জন্যে তা লেখা ফরয, সে তার সাহায্যের জন্যে লেখার কাজটা করে দেবে। কিন্তু আমাদের মতে মূলতই লিখিত দলীল তৈরী করা ফরয নয়। তবে ঋণ চুক্তির পক্ষদ্বয় যদি একটা নকল করতে ইচ্ছা করে— মজবুত দলীল তৈরী করার সংকল্প গ্রহণ করে থাকে, আর তারা দুজন সে বিষয়ে জ্ঞানী ও পারদর্শী না হয়ে থাকে, তাহলে যার এ বিষয়ে জ্ঞান ও পারদর্শিতা আছে তার কর্তব্য হল সে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পক্ষদ্বয়কে ব্যাখ্যা করে বোঝাবে। কিন্তু দলীল লিখে দেয়া তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবে বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়া তার কর্তব্য, যেন তারা দুজন তা লিখে দলীল তৈরী করতে পারে কিংবা সে নিজেই তাদের দুজনের জন্যে দলীলটা মজুরি নিয়ে হোক বা সেবামূলক কাজ হিসেবে লিখে দেবে। অথবা অন্য যে লোক

লিখতে পারে, তার দ্বারা লিখিয়ে দেবে। যেমন কোন লোক যদি নফল রোযা রাখার বা নফল নামায পড়ার সংকল্প করে, কিন্তু সে তার নিয়মাদি জানে না, তখন যে তা জানে তার কর্তব্য হয়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে, যদিও এ রোযা বা নামায ফরয নয়। আলিমগণের তো নফল মুস্তাহাব কাজের জ্ঞান দান কর্তব্য, বিশেষভাবে সে বিষয়ে যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে। যেমন ফরায়েয সম্পর্কিত জ্ঞান। নবী করীম (স) নিজে নফল ও মুস্তাহব কাজেরও শিক্ষা দিতেন। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ -

হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার রব্ব-এর নিকট থেকে যা-ই নাযিল হয়েছে, তার তাবলীগ কর— লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ -

যেন তুমি প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

(সূরা নহল ঃ ৪৪)

আর আল্লাহ্ তার রাসূলের প্রতি যেসব বিধান নাযিল করেছেন, নফল মুস্তাহাব কাজের বিধানও তাতে রয়েছে এবং তা তাঁর উম্মতের নিকট বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। মুসলিম উম্মাহ্ তার নবীর নিকট থেকে নফল মুস্তাহাব কাজের চিরন্তন ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করে ও প্রচার করে এসেছে, যেমন ফরয কাজসমূহের বিবরণও নিয়ে চলেছে। প্রকৃত ব্যাপার যখন এই, তখন ফরয, নফল বা মুস্তাহাব সম্পর্কে যার যতটা জানা আছে তা জানিয়ে দেয়া। সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে প্রশ্নকারীকে সব কথা বুঝিয়ে দেয়া একান্তই কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاۤءَ ظُهُوْرِهِمْ -

স্মরণ কর, আল্লাহ্ যখন কিতাব প্রাপ্ত লোকদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, তার কথা তারা লোকদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করবে এবং তোমরা তা গোপন করে রাখবে না। কিন্তু পরে তারা সে অংশীদারকে তাদের পেছনের দিকে নিক্ষেপ করেছিল। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৭)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ -

যে লোক কোন ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, পরে সে যদি তা গোপন রাখে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।

এভাবে দলীল-দস্তাবেজ সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে এবং তার শর্তাবলীও জানা আছে, তার কর্তব্য হল তা জানিয়ে দেয়া তাকে, যার তা জানা দরকার এবং যতটা দরকার। অনুরূপভাবে দ্বীন ইসলাম ও শরীয়াত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের প্রচার করা আলিমগণের কর্তব্য। এ একটা

ফরয— ফরযে কিফায়া, মানুষের কল্যাণের জন্যে তা পালিত হওয়া কর্তব্য, বাঞ্ছনীয়। এ কাজ কিছু লোক করলে অবশ্য অন্যদের দায়িত্ব মুক্তি সম্ভব হবে। তবে নিজ হাতে দলীল রচনা বা লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য, এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই, কেউ তা কর্তব্য বলে, তা-ও আমার অজানা। তবে লেখা জানে— এমন কাউকে না পাওয়া গেলে তা লিখতে অস্বীকার করা তার উচিত নয় যে তা লিখতে জানে। তবে দলীল লেখা লেখকের উপর যদি ফরযই হতো, তাহলে লেখার জন্যে মজুরি গ্রহণ করা নিশ্চয়ই জায়েয হতো না। কেননা যা ফরয, তা করার জন্যে মজুরি গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। অথচ ফিকাহবিদগণ লেখার মজুরি গ্রহণ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ করেন নি। তা থেকে বোঝা যায় যে, দলীল লেখাই আসলে ফরয নয়। ফরযে কিফায়াও নয়। না নির্দিষ্টভাবে তা ফরয। আল্লাহ্র কথা ঃ 'লেখক— আল্লাহ তাকে যেরূপ জ্ঞান দিয়েছেন, সেরূপ লিখতে অস্বীকার করবে না' আল্লাহ্ যে ন্যায়পরতা সহকারে দলীল লিখতে বলেছেন, তার বিপরীতভাবে লিখতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধটা অবশ্য পালনীয়, যদি শরীয়াতের বিধানের বিপরীত লেখা তৈরী করার ইচ্ছা করা হয়। যেমন বলা হয়, 'নফল নামায পড়বে না তাহারাত ব্যতিরেকে। 'লজ্জাস্থান আবৃত না করে নামায পড়বে না।' এর অর্থ, নফল নামায পড়ার আদেশ নয়। তা পড়তে নিষেধও করা হয়নি এ কথা দ্বারা। নিষেধ হচ্ছে যেভাবে তা করা উচিত তার বিপরীতভাবে করা। যেসব শর্তে নামায হয়, সেসব শর্ত পূর্ণ করে তা না করাই নিষিদ্ধ। আল্লাহ্র— 'এবং লেখক আল্লাহ্ যে জ্ঞান তাকে দিয়েছেন সে ভাবে লিখতে অস্বীকার করবে না, অতএব তা লেখবে'— কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভাবে লেখা জায়েয তার বিপরীত লিখতে নিষেধ করা। কেননা লেখার কাজটা মূলতই ফরয নয়। তবু যদি লিখতেই হয়, তাহলে তা আল্লাহ্র শেখানো নিয়মে লিখতে হবে। যেমন কেউ যদি বলে ঃ 'তোমার নফল নামায পড়া উচিত তাহারাত ও লজ্জাস্থান আবৃত রাখা সহকারে।' এরূপ কথায় নফল নামায পড়তেও বলা হয়নি, না পড়তে নিষেধও করা হয়নি।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَالْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا –

এবং লেখবে সে যার উপর হক আরোপিত এবং অবশ্যই ভয় করবে আল্লাহ্কে যিনি তার রব্ব এবং তা থেকে একবিন্দু জিনিস কমাবে না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে লোকই অন্য কারোর জন্যে কোন জিনিসের অঙ্গীকার করবে, সে ব্যাপারে তার কথাই অগ্রগণ্য হবে। কেননা بَخْسٌ শব্দের অর্থ, কম করা। আল্লাহ যখন কম করা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন, তখন তা থেকে বোঝা যায়, যদি কম করা হয়, তাহলে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। আর তা আল্লাহ্র এ কথার মতই ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ –

এবং তাদের রেহমে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্যে হালাল নয়।

(সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

গোপন করার ব্যাপারে আল্লাহ যখন তাদেরকে উপদেশ দিলেন, বোঝা গেল যে, মূলত মিয়াদের কথাই সেখানে অগ্রাধিকার পাবে তাদের কথায়। আর যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ -

এবং তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন করো না। যে তা গোপন করবে, তার অন্তরটা পাপী।

তা থেকে বোঝা যায়, তারা যখনই তা গোপন করবে, তখন তাদের কথাই গ্রহণীয় হবে। তেমনি কমানো ত্যাগ করার ব্যাপারে যার উপর হক তাকে উপদেশ দেয়াটা এটা প্রমাণ এ জন্যে যে, তাদের কথাই হবে রুজু করার কেন্দ্রভূমি। নবী করীম (স) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে ঠিক আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। আর তা হল ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ -

প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদী পক্ষের। আর বিবাদী পক্ষের করণীয় হচ্ছে কিরা-কসম করা।

এতেও কথা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে তার, যার উপর দাবি তোলা হয়েছে বাদীর কথার সে গুরুত্ব নেই। বিবাদীকে কিরা-কসম করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর তা-ই হচ্ছে আল্লাহ্র এ কথাটির তাৎপর্য ঃ 'এবং তা থেকে একবিন্দু জিনিসও কম করবে না।' তাতে তার কথা গ্রহণ করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

কোন কোন লোক উক্ত আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলেছেন যে, মিয়াদের ব্যাপারে কথা তাঁর গ্রহণ করতে হবে, যার নিকট টাকা পাওনা রয়েছে, পাওনা যার নিকট চাওয়া হচ্ছে। কেননা আল্লাহ্ লেখানোর দায়িত্ব তাকেই দিয়েছেন এবং কম না করার ওয়ায তাকেই করা হয়েছে, সে যেন মাল ফেরত দেয়ার ব্যাপারের পরিমাণে ও মিয়াদে অন্যথা না করে। বলা যাবে, কম না করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মিয়াদ কম করার ব্যাপারে ঋণী ব্যক্তিকে যার নিকট পাওনা চাওয়া হচ্ছে— উপদেশ দেয়া কঠিন। কেননা তার উপর দাবি প্রমাণিত হওয়ার পর সে যদি সমস্ত মিয়াদটিকেই প্রত্যাহার করে, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। যেমন দাবিকারীকে তার মালের পরিমাণ না কমানোর উপদেশ দেয়া যায় না। কেননা সে যদি তার দাবি থেকে ঋণী ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দেয়, তাহলে তার এ নিষ্কৃতি দান সঠিক হবে। কার্যকর হবে।

এ আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে, এখানে যে কম করার কথা বলা হয়েছে তা আসলে ঋণের পরিমাণের কম করা। মিয়াদে কম করা নয়। কাজেই আয়াতে মিয়াদের ব্যাপারে ঋণী ব্যক্তির কথাই গ্রহণ করার পক্ষের কোন দলীল নেই।

যদি বলা হয়, মূল মালের ব্যাপারে মিয়াদ প্রমাণিত হওয়া তাতে কম করা অনিবার্য করে দেয়। তাই মালের পরিমাণ কম করার ব্যাপারে ঋণী ব্যক্তির কথাই যখন গ্রহণীয় হবে, তখন মিয়াদের ব্যাপারেও তারই কথা গ্রহণীয় হওয়া উচিত। কেননা তাতেই মাল কম হওয়ার কারণ নিহিত আছে। কেননা তার কম করণে তার কথাকেই সত্য বলে মেনে নিতে আয়াতে বলা হয়েছে। আর 'কম' কখনও হয় পরিমাণে কম হওয়ায়। আর কখনও মিয়াদের পরিচিতিতে কম হওয়ায়।

জবাবে বলা যাবে, আল্লাহ্ যখন বলেছেন ঃ 'যার উপর হক ধার্য হচ্ছে সে মুখে বলে দলীল লেখাবে, আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, কেননা তিনিই তার রব্ব এবং তাতে একবিন্দু কম করবে না'— এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যার হক, সে তার নিজের হককে নিজেই কম করবে না। তাহলে মূল কথাটি এই দাঁড়ায় যে, 'ঋণের পরিমাণে একবিন্দু জিনিসও কম করবে না।' মিয়াদের দাবিদার ঋণের পরিমাণ কম করতে পারে না। কেননা ঋণের পরিমাণ কামানো অর্থ মালের পরিমাণ কমানো। আর মিয়াদটাই তো ঋণ নয়, তার অংশও নয়। তার ব্যাপার যখন এই, তখন মিয়াদের দাবিতে তার কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়ার কোন দলীল আয়াতে নেই। আর মিয়াদ যে ঋণ নয়, তা তোমাকে জানিয়ে দেয় এ কথা যে, ঋণ কখনও প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর মিয়াদ বাতিল হয়ে যায় এবং সেই ঋণটাই তার স্থানে দাঁড়িয়ে যায়। আবার মিয়াদ প্রত্যাহৃত হয়, ঋণ আদায়ের ব্যাপারটি ত্বরান্বিত হয়। অতএব ত্বরান্বিত হল ঋণ, যার একটা মিয়াদ নির্দিষ্ট ছিল। এরপরই আল্লাহ্ বলেছেন, 'তা থেকে একবিন্দু কমাবে না' অর্থাৎ ঋণ থেকে এমন জিনিস কমাবে না, যা সে মিয়াদের আওতায় পড়ে না। অপর দিক দিয়ে বলা যায়, মিয়াদে কম করাটা হুকুমের দিক দিয়ে হয়। কেননা মিয়াদ শেষ হলেও শেষ হওয়ার পূর্বে হস্তগত জিনিস যদি একই অবস্থায় থাকে, তাহলে জানা যাবে যে, সে জিনিসে কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি। তবে হুকুমের দিক দিয়ে তাতে কমতি হয়েছে, একথা পরোক্ষ অর্থে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে নয়। আর আয়াত শামিল করে সেই কমতি, যা প্রকৃত। আর তা হচ্ছে পরিমাণে কমতি। আর তার নিজের কমতির দিক হতে পারে তার রদ্দি হওয়া বা তা আত্মসাৎ হওয়া প্রভৃতি দ্বারা। যেমন কালো দিরহামের অঙ্গিকার করা ও রদ্দি গম দেয়ার কথা বলা। এসব হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি বা কমতি। যা হস্তগত হয়েছে তার গুণাগুণে পার্থক্যের কারণে। তাই মিয়াদের কতকাংশ ধরে নেয়া জায়েয হবে না, যা তাতে প্রকৃত নয়, পরোক্ষ ব্যাপার। কেননা ব্যবহৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝালে তাতে পরোক্ষ অর্থের প্রবেশ হতে পারে না।

এ আয়াতে এ কথার দলীল রয়েছে যে, মিয়াদের ব্যাপারে পাওনাদারের কথাই গ্রহণীয় হবে। কেননা আল্লাহ্‌র এ কথার সূচনায় তাকেই সম্বোধন করা হয়েছে ঃ

যখন তোমরা পারস্পরিক ঋণের লেনদেনের চুক্তি করবে নির্দিষ্ট মিয়াদের ভিত্তিতে, তাহলে তোমরা তা লিপিবদ্ধ করবে।

বলেছেন ঃ 'এবং তোমাদের পুরুষদের থেকে দুইজনকে সাক্ষী বানাবে।'

এতে ঋণ চুক্তির উভয় পক্ষকেই সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে, যখন মালটা মিয়াদ ভিত্তিক হবে। এ অবস্থায় মিয়াদের ব্যাপারে কথা যদি ঋণী ব্যক্তিরই গ্রহণীয় হয়, তাহলে পাওনাদারের পক্ষে সাক্ষী বানাবার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। আর মিয়াদের ব্যাপারে পাওনাদারের সাক্ষী বানাবার প্রয়োজন প্রমাণ করে যে, সে ব্যাপারে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। ঋণী ব্যক্তির কথা সেখানে অসত্য হবে। যদি সে ব্যাপারে তা সত্য হয়, তাহলে ঋণদাতা— পাওনাদারের সাক্ষী বানাবার কোন স্থান থাকে না। তার কোন অর্থও হয় না।

যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে, সাক্ষী বানাবার হুকুমটা কেবলমাত্র ঋণী ব্যক্তির উপর আরোপিত, ঋণদাতা— পাওনাদারের উপর নয়?

তাহলে জবাবে বলা যাবে, একথা আয়াতটির বক্তব্যের পরিপন্থী। কেননা আয়াতে তো বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট মিয়াদের ভিত্তিতে পারস্পরিক ঋণের লেন-দেন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, ...'-এর সাথে সংশোধিত করা হয়েছে এ কথা; 'তাহলে তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাও ?' এতে সম্বোধন করা হয়েছে ঋণদাতা, গ্রহীতা— উভয় পক্ষকে এবং উভয় পক্ষকেই সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি কেউ বলতে পারে যে, ঋণ গ্রহীতাকেই বিশেষভাবে এ আদেশ করা হয়েছে, তাহলে অপর একজন বলতে পারে যে, না, এখানে কেবল ঋণদাতা— পাওনাদারকেই সাক্ষী বানাবার জন্যে আদেশ করা হয়েছে, ঋণ গ্রহীতাকে বলা হয়নি। কিন্তু তা বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। তাই আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষকেই সাক্ষী বানাবার কাজটি করতে হবে। আদেশটি উভয়ের জন্যে ধরে নিতে হবে, একথা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন বলতে হবে যে, মিয়াদী ঋণদাতার জন্যে সাক্ষী বানাবার হুকুম নেই। কেননা তার অস্বীকৃতিতে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। বোঝা গেল, মিয়াদের ব্যাপারে তার কথাকেই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী মানতে হবে। ঋণ গ্রহীতাকে আল্লাহ্ দায়িত্ব দিয়েছেন চুক্তিনামার বিবরণ লেখাবার। তা তখনকার জন্যে কথা, যদি সে উত্তমভাবে লেখাতে সক্ষম হয়। অন্যথায় অন্য কেউ লেখাতে পারে, যদি সে তা স্বীকার করে নেয়। তাহলে তা জায়েয হবে। কেননা সে অঙ্গীকার করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সাক্ষীদেরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যখন তারা স্মরণ করিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করবে। আর মুখে বলে লিখিয়ে দেয়াটা স্মরণ করার কারণ হবে। যেমন দুজন পুরুষের একজন পাওয়া গেলে একজন পুরুষের বদলে দুইজন মেয়েলোককে সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে, যেন একজন অপরজনকে সংশ্লিষ্ট বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

নির্বোধের উপর প্রতিবন্ধকথা আরোপ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْضَعِيْفًا اَوْلَايَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ -

কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ-নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লিখিয়ে দেবে।

নির্বোধ ব্যক্তির উপর তার তৎপরতা বন্ধ কর্তব্য হওয়ার পক্ষপাতী প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই এ আয়াতটিকে দলীল বানিয়েছে। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন গোষ্ঠী আবার তা বাতিলও করে। যারা নির্বোধ ব্যক্তির উপর প্রতিবন্ধকথা আরোপের পক্ষপাতী, তারা বলে, তারা বলেছে যে, আল্লাহ নিজেই তার কথার দ্বারা এ প্রতিবন্ধকথা আরো জরুরী করে দিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় নির্বোধ ব্যক্তির অভিভাবকই তার পক্ষ থেকে দলীলের বক্তব্য লিখিয়ে দেয়ার কাজটি করবে।

কিন্তু যারা এ মত সমর্থন করে না, তাদের বক্তব্য হল, আল্লাহ্ তার ঋণচুক্তি সংক্রান্ত আয়াতেই নির্বোধ ব্যক্তিকেও লেনদেনের চুক্তি করার অনুমতি দিয়েছেন এবং লেনদেনের

ব্যাপারে তার অঙ্গীকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ দুই পক্ষের মাঝে মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শুধু বক্তব্য লিখিয়ে দেয়ার ব্যাপার। কেননা সে তার ও তার প্রতিপক্ষের দায়-দায়িত্বের কথা যথার্থভাবে ও পুরামাত্রায় লিখিয়ে দিতে অক্ষম। অথচ এ লিখিয়ে দেয়া দলীল-দস্তাবেজের জরুরী শর্ত। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তার অভিভাবক ন্যায়পরতা সহকারে লিখিয়ে দেবে'— এর অর্থ ঋণের অভিভাবক। এ কথা আগের কালের মনীষীদের এক বিরাট সংখ্যক থেকে বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেছেন, এর অর্থ এ নয় যে, নির্বোধের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তার অভিভাবক এ কাজ করবে এবং সে ঋণটা তার উপর চাপিয়ে দেবে ও বহাল করবে। কেননা যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত তার অভিভাবকের প্রতিশ্রুতি তার উপর কার্যকর হবে না। কারোর মতেই নয়। তাহলে জানতে পারলাম যে, এর অর্থ হচ্ছে ঋণের অভিভাবক, তাকেই লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ার দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে, যেন সে তা যার উপর ঋণ চাপছে, তার নিকটবর্তী করে দেয়।

আবূ বকর বলেছেন, আয়াতে বলা 'সফীহ' কে, এ বিষয়ে আগের কালের মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁদের অনেকে বলেছেন, 'সফীহ' বলে 'বালক' বুঝিয়েছেন। এটা হাসান থেকে বর্ণিত। বলেছেন, বালক ও মেয়েলোক বোঝানো হয়েছে।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ -

এবং তোমরা তোমাদের মাল সফীহদের দিও না। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫)

এ আয়াতে মুজাহিদ বলেছেন, মেয়েলোক। শবী বলেছেন, দাসী। দাসী বা অল্প বয়স্ক মেয়েদের ধন-মাল দিতে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও সে কুরআন পড়তে সক্ষম হয়েছে। আসলে এ কথার মূল ভিত্তি হল, যে ধন-মাল রক্ষা করতে সক্ষম নয়, সে। কেননা ধন-মাল কেবল তাকেই দেয়া যেতে পারে, যার নিজের ও নিজের ধন-মালের রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা আছে। এতে কারোরই কোন ভিন্ন মত নেই। পূর্ণ বয়স্ক হলে সে তার নিকট অর্পিত সব ধন-মালের হিফাজত ও ব্যয়-ভার সে করতে পারবে। উপরন্তু স্বামী তার সাথে যৌন সঙ্গমও করেছে।

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে এক বছরকাল অতিবাহিত করেনি কিংবা তার নিজের গর্ভে সন্তান জন্মেনি, তাকে কোন রাজত্ব দান করা জায়েয নয়। আল-হাসান থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আবূ শামা বলেছেন, মেয়েলোক যতক্ষণ সন্তান প্রসব না করবে, ততক্ষণ কোন দান-ও তার জন্যে জায়েয নয়। অথবা সে যদি পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে না থাকে, তাহলেও তাই। ইবরাহীমও তাই বলেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এ সব কথার আসল তাৎপর্য হল স্ত্রীর পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা লাভ না করা। কেননা স্ত্রীর হাতে ধন-মাল দেয়ার এটা যে কোন সীমা নয়, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেননা সে যদি স্বামীর ঘরে একটি বছরকাল অতিবাহিত করেও এবং সন্তানও প্রসব করে, তবু যদি সুস্থ বুদ্ধিমত্তা না পেয়ে থাকে এবং তার ব্যাপারাদি সামলাবার যোগ্যতা অর্জন করে না থাকে, তাহলে তার মাল-ও তার নিকট অর্পন করা যাবে না। এ থেকে আমরা জানলাম যে, তাঁরা সকলেই বুদ্ধিমত্তা না পাওয়া লোক সম্পর্কে এ মত দিয়েছেন।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে سَفَهٌ শব্দটি আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল سَفَهٌ فِي الدِّيْنِ ঋণ লেনদেনের বুদ্ধিহীনতা। তা মূর্খতাও বটে। বলা হয়েছে ঃ

اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاۤءُ -

জেনে রাখ, ওরাই হচ্ছে নির্বোধ— মূর্খ।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ -

এবং তোমরা তাদের ধন-মাল নির্বোধ— মূর্খদের দেবে না।

কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তাদের (পুরুষদের) ধন-মালের কর্ত্রী বানাবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ -

এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।

অর্থাৎ 'তোমাদের কিছু সংখ্যক অপর কিছু সংখ্যককে হত্যা করবে না।' আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ -

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না।

এর-ও অর্থ ঃ তোমরা একদল অপর দলকে হত্যা করো না।

এ সব কথা যিনি বলেছেন, তিনি শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব থেকে দূরে সরে গেছেন। বাহ্যত এসব কথার সমর্থনে কোন দলীলই নেই। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ দুই শ্রেণীর লোক শামিল করে। প্রত্যেকটি শ্রেণী মূল শব্দে অন্য থেকে স্বতন্ত্র। এক শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করা হয়েছে 'তোমরা তোমাদের ধন-মাল নির্বোধ— মূর্খদের দিও না' কথায়। আর অপর শ্রেণীর নির্বোধ— মূর্খ লোক তাদের সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে, যখন আল্লাহ তোমাদের মাল' বললেন, তখন বুঝতে হবে, এ কথার অর্থ, যাদের সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছে, তাদের ধন-মালের কথাই বলা হয়েছে। মূর্খ-নির্বোধদের ধন-মাল নয়। এখানে নির্বোধ-মূর্খদের মনে করা ঠিক হতে পারে না। কেননা সম্বোধন কোনভাবেই তাদেরকে লক্ষ্য করে হয়নি। সম্বোধন করা হয়েছে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির লোকদেরকে। তা 'অতএব তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর' কথাটির মত নয়। আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' কথাটিও সে রকমের নয়। কেননা এতে হত্যাকারী ও নিহত হওয়া সব লোকই একই সম্বোধনের মধ্যে শামিল। দুই পক্ষের এক পক্ষকে অন্য পক্ষ থেকে সম্বোধনে পার্থক্য করা হয়নি। কাজেই তার অর্থ এ হতে পারে, তোমাদের কতক অপর কতককে যেন হত্যা করে।

বলা হয়েছে, السفه। শব্দের আসল অর্থ হালকাত্ব— গুরুত্বহীনতা। মূর্খকেও 'সফীহ' বলা হয়। কেননা সে হালকা বুদ্ধির লোক। অসম্পূর্ণ বুদ্ধি বা ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধির লোক। 'সফীহ' শব্দটির ব্যবহার যেখানে যেখানে হয়েছে, তার সবখানেই মূর্খতার তাৎপর্য রয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে 'সফীহ' অর্থ দ্বীনী বিষয়ে মূর্খ। ধন-সম্পদে সফীহ্ সে তার সংরক্ষণ ও প্রয়োগ-ব্যবহার পদ্ধতিতে মূর্খ। তার ব্যবস্থাপনা করতে অক্ষম। আর মেয়ে লোক ও বালক-বালিকাকেও 'সফীহ' বলা হয়েছে তাদের মূর্খতার কারণে। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতার দরুন ভালোয়-মন্দে পার্থক্য বোধ না থাকার দরুন। আর মতামত প্রকাশে 'সফীহ' বলা হয় তাকে, যে মূর্খ, আজে-বাজে কথা বলে— তাকেও 'সফীহ' বলা হয়। কেননা সে তার টাকা-পয়সা ভালো ভাবে

ব্যয় করতে পারে না। সে জাহিল লোকদের মধ্যেই গণ্য হয়। হালকা বুদ্ধি লোকও এ পর্যায়ে গণ্য। 'সফীহ্‌' শব্দটি এ সবকেই শামিল করে। এখন আমরা আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে শব্দটির তাৎপর্য বের করতে পারি। আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَإِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا -

যার উপর হক আরোপিত হচ্ছে, সে যদি 'সফীহ্‌' হয়। ....

এ থেকে হয়ত এ কথা বুঝিয়েছেন যে, ঋণ-চুক্তির শর্তাবলী লেখানোর ব্যাপারে যদি সে মূর্খ হয়, যদিও সে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ঠিক-বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম, আজে-বাজে কথা বলে না। বিপর্যয়কারীও নয়। এ রূপ হলে তার অভিভাবককে তা লিখিয়ে দেবার কাজটি করবে। শেষে মুখে তার অঙ্গীকার করবে সেই 'সফীহ্‌' ব্যক্তি। কেননা 'হক'টা তো তারই উপর আরোপিত হচ্ছে। আলোচ্য তাৎপর্যের দিক দিয়ে এ কথা খুবই উত্তম। কেননা যার উপর 'হক'টা আরোপিত হচ্ছে, সে তো পারস্পরিক ঋণচুক্তি করার আয়াতের শুরুতেই উল্লিখিত হয়েছে। যদি তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, তাহলে সে সেই কাজটাও করতে পারে না। অথচ সে সম্বোধনে সে শামিল রয়েছে।

অপর একটি দিক দিয়েও বিবেচনা করা যায়। নিষেধাজ্ঞা আরাপিত ব্যক্তির অভিভাবকের পক্ষে তার দ্বারা ঋণের অঙ্গীকার কখনো জায়েয নয়। হ্যাঁ, জায়েয হবে, সরকার (বা বিচারপতি) যদি ক্রয় বা বিক্রয়ের কাজে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে, তা হলে। কিন্তু অভিভাবক তার উপর তা আরোপ করতে পারে, তারা তাকে দিয়ে অঙ্গীকার করাতে পারে— এমন কথা কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর এতেই দলীল রয়েছে এ কথার যে, আয়াতে 'সফীহ্‌'র অভিভাবকের কথা বলা হয়নি। বোঝানো হয়েছে ঋণের অভিভাকের কথা। রুবাই ইবনে আনাসের এ মতই বর্ণিত হয়েছে। ফরা-ও তা-ই বলেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اَوْ ضَعِيْفًا এর অর্থ বলা হয়েছে, বিবেক-বুদ্ধিতে দুর্বল। কিংবা বালক— যাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা আয়াতটির সূচনা বুঝিয়ে দেয় যে, যার উপর হক ধার্য হচ্ছে, তার পারস্পরিক ঋণচুক্তির পক্ষ হওয়া জায়েয। এদের সকলেরই কার্যতৎপরতা বিধিসঙ্গত। পরে যখন দলীলের লিখিতব্য বিষয়াদি লিখিয়ে দেয়ার কাজ সামনে আসবে, সাক্ষী রাখার প্রয়োজন হবে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে এমন ব্যক্তির, যে শর্ত সমূহ জানা না থাকা ও বুদ্ধির দুর্বলতার কারণে লিখিয়ে দেয়ার কাজটি ভালো ভাবে করতে পারে না। যদিও বুদ্ধির কমতির কারণে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ ঘটেনি। আর অল্প বয়স্কতা; কিন্তু বেশি বয়স হওয়ার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ব্যবহৃত উপরোক্ত শব্দটির মধ্যে পড়ে। তা দুটি ব্যাপারকেই শামিল করে। সেই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে তার কথাও, যে তা লিখিয়ে দিতে পারছেন। পারছে না হয় কোন রোগের কারণে কিংবা বেশী বয়সের লোক হওয়ার কারণে, তার বাকশক্তি রহিত হওয়া বা আউলিয়ে যাওয়ার কারণে। তোতলা হওয়ার কারণেও হতে পারে— এ সবই সম্ভব। হতে পারে, আল্লাহ এ সবই বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা ব্যবহৃত শব্দের এ সবেরই সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এর কোনটিতেই এমন দলীল নেই, যা প্রমাণ করবে যে, 'সফীহ্‌'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেই হবে। কেই যদি 'সফীহ্‌'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ জরুরী মনে করেন, তা হলে তার দলীল হিসেবে এ আয়াতটি পেশ করা সঠিক হবে না। কেননা এ আয়াত

দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রমাণিত হয় না। তা এ জন্যে যে, السفه শব্দটির বহু কয়টি অর্থ রয়েছে। সেগুলো পরস্পর বিভিন্ন। তার কয়েকটির উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। ঋণ চুক্তির ক্ষেত্রে سفه নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা। কিন্তু সেজন্যে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে পারে না। কেননা অন্য অর্থের দিক দিয়ে কাফির ও মুনাফিকরাও 'সফীহ্'। তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে না। যে লোক আজে-বাজে কথা-বার্তা বলে, সে-ও 'সহীফ' নামে অভিহিত। খুব তাড়াতাড়ি খারাপ-খারাপ শব্দ মুখে উচ্চারণ করে। এ ধরনের 'সফীহ্' আবার নিজেদের ধন-মালের রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ হতে পারে। অন্তত তা নষ্ট করে না, এমন আছে। বেহুদা খরচ করেও উড়ায় না। আল্লাহ বলেছেন ঃ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَه 'তবে যারা নিজেদেরকে 'সফীহ্' বানিয়েছে।' এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। আবূ উবায়দাতা বলেছেন, এ আয়াতে তার কথা বলা হয়েছে, যে নিজেকে ধ্বংস করতে চায়, নিজেকে ক্ষয় করে দিতে প্রস্তুত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স)-কে বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ رَأْسِىْ دَهِيْنًا وَقَمِيْصِىْ غَسِيْلاً وَشَرَاكُ نَعْلِىْ جَدِيْدًا اَفَمِنَ الْكِبْرِ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : لاَ اِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ -

আমি পছন্দ করি—ভালোবাসি—যে, আমার মাথা তৈলযুক্ত হোক, আমার জামা ধৌত হোক, আমার জুতার ফিতা নতুন হোক। হে রাসূল! এটা কি অহংকারের কথা ? বললেন, না। অহংকার হচ্ছে তার, যে সত্যাকে জানলো না, যে লোকদেরকে দূরে ছুড়ে ফেলল-ডোবালো, সত্যকে না-জানা, না বোঝাই বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা মূলত মুর্খতা-ই হচ্ছে 'সাফাহাত'।

'সফীহ্'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে মতদ্বৈততা

ইমাম আবূ হানীফা স্বাধীন— পূর্ণ বয়স্ক বিবেক-বুদ্ধি অধিকারী ব্যক্তির উপর তার নিজের ধন-মালসহ যাবতীয় ব্যাপারে তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ সঙ্গত মনে করতেন না। তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে, না তার অপচয় ও বেহুদা খরচের কারণে, আর না তার ঋণ বা দারিদ্র্যের কারণে। সরকার (বিচারক) যদি কারোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তারপর সে কোন ঋণের অঙ্গীকার করে কিংবা তার ধন-মালে ক্রয়-বিক্রয় বা হেবা অথবা অন্য কোনরূপ তৎপরতা করে, তাহলে তার এ তৎপরতা জায়েয হবে, তার বুদ্ধিমত্তা না থাকলে তা অধিক হবে এবং তার ও তার ধন-মালের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে। তা সত্ত্বেও সে যদি অপর কারোর জন্যে অঙ্গীকার করে কিংবা তার জন্যে কিছু ক্রয় করে, তাহলে সে যা করেছে তা জায়েয হবে। তার ধনমালের উপর তৎপরতা চালানো নিষিদ্ধ হবে যতদিনে সে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত না পৌঁছবে। পঁচিশ বছর বয়সের হয়ে গেলে তার ধন-মালের কর্তৃত্ব তার হাতেই ফিরিয়ে দিতে হবে, তার বুদ্ধিমত্তা দেখতে না পাওয়া গেলেও। উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসানও ঠিক এরূপ কথাই বলেছেন। শুবা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, কোন স্বাধীন ব্যক্তির উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যাবে না। ইবনে আওন মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কোন স্বাধীন ব্যক্তির উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যাবে না।

প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যেতে পারে কেবল ক্রীতদাসের উপর। হাসানুল বসরীও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন, কোন লোক যদি বাস্তবিকই 'সফীহ' হয়, তাহলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে। যখন তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করবে ও তাকে বন্দী করবে, তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে। তার কোন ক্রয় বা বিক্রয় বৈধ হবে না। কোন ঋণের জন্যে তার অঙ্গীকারও গ্রহণ করা যাবে না। তবে অকাট্য কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে, যা এ ব্যাপারে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেবে যে, তা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বের ঘটনা, তাহলে ভিন্ন কথা।

তাহাভী ইবনে আবূ উমর ইবনে সুমায়াতা— মুহাম্মদ সূত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ পর্যায়ে আবূ ইউসূফের কথাকেই প্রকাশ করেছেন। তার উপর কিছু বাড়িয়ে বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি সেই অবস্থায় থাকে যখন তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়া উচিত, তাহলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে মনে করতে হবে, বিচারক তার উপর কার্যত তা আরোপ করুক, আর না-ই করুক। আবূ ইউসূফ বলতেন, যদি তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হয়ে থাকে এসব ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ার কারণে, শেষ পর্যন্ত বিচারক যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তাহলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, লোকটি পূর্ণবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও যদি বুদ্ধিমত্তা লাভ না করে থাকে, তাহলে তার ধন-মালের উপর কোন কর্তৃত্ব চালাবার অধিকার তাকে দেয়া যাবে না। তার বিক্রয় বা হেবা কোনটিই জায়েয হবে না। সে তখনও না-বালেগ গণ্য হবে। সে যদি কিছু বিক্রয় করে বা ক্রয় করে, শাসক তা বিবেচনা ও যাচাই করে দেখবে। যদি ভালো মনে হয়, তাহলে তার অনুমতি দেবে, তার জন্যেও তা জায়েয হবে। সে বুদ্ধিমান না হওয়া পর্যন্ত না-বালেগই বিবেচিত হবে। সে যেন একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যে এখনও বালেগ হয়নি। তবে পিতার উপদেষ্টা অভিভাবকের পক্ষে না-বালেগের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। যে বালেগ হয়েছে, তার পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করা তার জন্যে জায়েয হবে না। তবে সরকারের আদেশে তা পারবে।

ইবনে আবদুল হিকাম ও ইবনুল কাসিম ইমাম মালিকের এ মত বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ তার অভিভাবকত্বের অধীন কোন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে সরকারের নিকট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কর্তব্য। যেন সব লোককে জানানো যায়, সকলেই তা শুনতে পায় তার বৈঠকে, তার সাক্ষীও থাকে। তারপর সফীহ যা বিক্রয় করেছে, যা ঋণ করেছে, তা প্রত্যাহার করা হবে। পরে তার অবস্থা ভালো হয়ে গেলে তার সাথে তার সম্পর্ক হবে না। একথা ক্রীতদাসের বিপরীত। মুক্তদাস মরে গেলে আর সে যদি কিছু ঋণ করে থাকে, তাহলে তার দিক থেকে কার্যকর হবে না। সে মরে গিয়েও যেন জীবন্ত। তবে সেজন্যে যদি সে এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তাহলে সে ঋণের বদল তা-ই হবে। পুত্র তখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, যখন তার অধিকার হবে পিতার নিকট থেকে তা বের করে নেয়ার। তার পিতা থুর-থুরে বুড়ো হলেও। তবে পুত্র যদি মুক্ত হয়ে যাওয়া দাস হয় কিংবা সফীহ হয়, দুর্বল হয় তার বিবেক-বুদ্ধিতে, তাহলে তার জন্যে তা জায়েয হবে না। ফিরয়াবী সওরী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ –

৫৫–

তোমরা ইয়াতীম-নাবালোকদের যাচাই পরীক্ষা চালাতে থাক। তারা যদি বিয়ের যোগ্যতা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, তার পরে তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ লক্ষ্য কর, তাহলে তাদের ধন-মাল তাদের নিকট দিয়ে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৬)

এ পর্যায়ে সওরী বলেছেন, বিবেক-বুদ্ধি ও সংরক্ষণ যোগ্যতা তার ধন-মালের ব্যবস্থাপনার জন্যেই কাম্য। তিনি এ-ও বলতেন, তার যদি দুটি যোগ্যতা অর্জিত হয়ে থাকে, পূর্ণবয়স্কতা পেয়ে থাকে এবং তার ধন-মাল সংরক্ষণের যোগ্যতা লাভ করে থাকে— তাহলে তাকে তা থেকে দূরে রাখা যাবে না।

আল-মুজানী ইমাম শাফেয়ীর মত তার 'মুখাতাসার' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের ধন-মাল তাদেরকে দিয়ে দিতে বলেছেন দুটি কারণে। সে দুটি কারণ না হলে তা তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। তা হচ্ছে, পূর্ণ বয়স্কতা লাভ এবং বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে দ্বীনী যোগ্যতা, তার ধন-মালের কল্যাণ সাধনে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হবে। আর মেয়েলোকের মধ্যে যদি বুদ্ধিমত্তা জেগে উঠেছে বোঝা যায়, তাহলে তার ধন-মাল তাকেই দিয়ে দেয়া হবে। সে বিবাহিতা হোক, আর না-ই হোক। যেমন ছেলে সন্তান, বিয়ে করুক আর না-ই করুক। কেননা আল্লাহ এ দুজনকে অভিন্ন ও পার্থক্যহীন করেছেন। কারোর বেলায়ই বিয়ের কথা তোলা হয়নি, তার শর্ত করা হয়নি। কারোর নির্বুদ্ধিতার বা খারাপ কাজের কারণে সরকার যদি তার উপর প্রতিবন্ধকথা আরোপ করে, তার উপর সাক্ষী রাখা হবে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর যদি কিছু বিক্রয় করে, তাহলে সে তার মাল বিনষ্ট করছে বলে বোঝা যাবে। আর যখনই নিষেধাজ্ঞা তার উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হবে, তারপরই নিষেধাজ্ঞা আরোপের অবস্থা আবার ফিরে এলে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। আবার যদি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সময় আসে তাহলে তা আবার আরোপ করা হবে।

আবূ বকর বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী ও বিরোধী পক্ষসমূহ যে দলীলের উপর নির্ভর করছে, আমরা তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি। ঋণ সংক্রান্ত আয়াতটিতে কার দৃষ্টিতে কি প্রমাণ বিদ্যমান, তা-ও আমরা দেখিয়েছি। আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, আয়াতটিতে অধিক প্রকাশমান দলীল হল নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল ও তৎপরতা বিধিসম্মত হওয়ার দলীল রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষের লোকেরা দলীল হিসেবে একটি হাদীসও পেশ করেছেন। হাদীসটি হিশাম ইবনে উরওয়াতা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর যুবায়র (রা)-এর নিকট এলেন। বললেন, আমি একটা বিক্রয়ের কাজ করেছি। এক্ষণে হযরত আলী (রা) আমার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ইচ্ছা করছেন। তখন যুবায়র (রা) বললেন, আমি বিক্রয়ে তোমার সাথে শরীক রয়েছি। পরে হযরত আলী (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট এলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বললেন। তখন যুবায়র (রা) বললেন, আমি এ বিক্রয়ে তার সাথে শরীক রয়েছি। তখন হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ 'আমি কেমন করে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করব এমন ব্যক্তির উপর, যার সাথে শরীক রয়েছেন যুবায়র।' লোকেরা বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা সকলেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয মনে করেছেন। তবে যুবায়রের শরীকদারীর কারণে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ঘটনা সাহাবীদের উপস্থিতিতেই ঘটেছে, কেউ তার প্রতিবাদ করেন নি।

আবূ বকর বলেছেন, এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, যুবায়র (রা) নিষেধাজ্ঞা জারী করা জায়েয মনে করতেন। বরং শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তিনি হযরত উসমান (রা)-এর প্রতিবন্ধকতা আরোপের অধিকার আছে বলে মনে করতেন। কিন্তু তার ব্যাপারে তার সাথে একমত হওয়ার কোন প্রমাণ এতে নেই। আর আসলে এ সবই পার্থক্যপূর্ণ ইজতিহাদী ব্যাপার। উপরন্তু প্রতিবন্ধকতা বা নিষেধাজ্ঞা দু'প্রকারের। একটি হচ্ছে, সাধারণ হস্তক্ষেপ, তৎপরতা চালানো ও অঙ্গীকার করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। আর দ্বিতীয়টি হল, ধন-মালের ব্যাপারে কিছু করা থেকে নিষেধ। হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) যে প্রতিবন্ধকথা আরোপ জায়েয মনে করেছেন, তা হলো ধন-মালের ব্যাপারে কিছু করা থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা। কেননা হতে পারে সে সময় আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের বয়স পঁচিশ বছর পর্যন্ত পৌছায়নি। ইমাম আবূ হানীফাও তাই মনে করতেন, এ বয়স না হওয়া পর্যন্ত তার ধন-মাল তার নিকট ফিরিয়ে দেয়া যায় না। যদি বুদ্ধিমত্তা সে লাভ করে না থাকে। এই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা)-ও একজন সাহাবী। তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপকে অস্বীকার করেছেন। তাহলে এ ব্যাপারে সাহাবীগণের ঐকমত্য আছে— একথা কি করে বলা যেতে পারে ? তাঁদের আরও একটি দলীল হচ্ছে জুহরীর বর্ণনা। তিনি উরওয়াত, আয়েশাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট খবর পৌছল যে, তিনি তাঁর জমির কিছু অংশ বিক্রয় করেছেন এ খবর পেয়ে যুবায়র (রা) বলেছেন যে, তিনি যেন এ থেকে বিরত থাকেন। অন্যথায় তিঁনি (যুবায়র) তার (আয়েশার) উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাবেন। একথা তিনি (আয়েশা) জানতে পেরে বললেন ঃ 'আমি আল্লাহ্র নামে কিরা করে বলছি, আমি ওর সাথে কোনদিন কথা বলব না।'

লোকেরা বললেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুবায়র (রা)-ও আয়েশা (রা) উভয়ই নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয মনে করতেন। তবে তিনি যুবায়রের কথার প্রতিবাদ করেছেন এজন্যে যে, যুবায়র (রা) তাঁকে নিষেধাজ্ঞা আরোপের উপযুক্ত পাত্রী মনে করেছেন। অন্যথায় তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলতে পারতেন যে, না, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আদপেই জায়েয নয় এবং তিনি তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করতেন।

আবূ বকর বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা আরোপ সম্পর্কেই হযরত আয়েশার প্রকাশ্য প্রতিবাদ রয়েছে। তা প্রমাণ করে যে, তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপকে জায়েযই মনে করতেন না। যদি তা না হতো, তাহলে তিনি তার প্রতিবাদই করতেন না, তা যদি এমন হতো যে, তাতে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। তাঁর থেকে যে প্রতিবাদটি এসেছে, তা প্রমাণ করে যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইজতিহাদের কোন অবকাশ আছে তা তিনি আদৌ মনে করতেন না।

যদি বলা হয়, হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে কোন ইজতিহাদের অবকাশ নেই। নিছক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারটি সম্পর্কে তার এ মত নয়। নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয হওয়ায় যদি ইজতিহাদের অবকাশ না থাকত, তাহলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতেন যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ জায়েয নয়। ফলে তিনি শুধু তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে অস্বীকার করেছেন।

জবাবে বলা যাবে, তিনি নিছক নিষেধাজ্ঞা আরোপকেই অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি ওর সাথে কখনই কথা বলব না। আর তুমি দাবি করছ যে, তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপকে অস্বীকার করেন নি, শুধু তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিবাদ করেছেন বিশেষভাবে। কিন্তু তা প্রমাণিত হয় না।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল প্রমাণিত হয় একটি হাদীস দ্বারা। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, কানবী, মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, বিক্রয় কাজে তিনি ধোঁকার শিকার হন। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ যখন তুমি কিছু বিক্রয় করবে, তখন বলবে ঃ لَا خِلَابَةَ 'কোন সংশয়ের অবকাশ নেই।' তাই পরে তিনি যখনই বিক্রয়ের কাজ করতেন তখনই এই শব্দটি উচ্চারণ করতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আরজী ও ইবরাহীম ইবনে খালিদ আবূ সওর আল-কলবী, আবদুল ওহাব, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব ইবনে আতা, সাঈদ কাতাদাতা, আনাস ইবনে মালিক সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর যুগে এক ব্যক্তি কেনা-বেচার কাজ করত। তার এ কাজের চুক্তিতে যথেষ্ট দুর্বলতা থাকত। তখন তার পরিবারের লোকেরা তাকে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হল। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! এ ব্যক্তির (ক্রয়-বিক্রয় কাজের) উপর আপনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন। সে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে। তার এ সবরে চুক্তিতে যথেষ্ট দুর্বলতা থাকে। নবী করীম (স) লোকটিকে নিজের নিকট ডাকলেন। তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করতে নিষেধ করে দিলেন। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি তো কেনা-বেচা না করে থাকতে পারি না। (তা থেকে বিরত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি যদি তা ত্যাগ করতেই না পার, তাহলে বেচা-কেনার সময় তুমি বলবে, হা-আ-হা এবং কোন সংশয় নেই।

প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছিল, সে নিজে বিক্রয়ে প্রতারিত হয়। তখন তাকে তৎপরতা চালাতে নিষেধ করেন নি। তার উপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেন নি। নিষেধাজ্ঞা আরোপ যদি ওয়াজিব-ফরযই হতো, তাহলে নবী করীম (স) তা না করে থাকতে পারতেন না। আর বিক্রয় তো এমন যে, তা নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য।

যদি কেউ বলে, রাসূলে করীম (স) লোকটিকে বলেছিলেন, বিক্রয় কালে তুমি বলবে ঃ কোন সংশয় নেই। তাকে বিক্রয়ের কাজ করার অনুমতিই দিয়েছেন। অবশ্য তার শর্ত ছিল, কোনরূপ ধোঁকাবাজি ছাড়াই বিনিময়টা পুরামাত্রায় আদায় করে নেয়া।

জবাবে বলা যাবে, তাহলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতীরা যেন রাজী হয়ে যায় তার উপর, যার উপর স্বয়ং নবী করীম (স) এ বিক্রয় কাজে প্রতারিত হওয়া 'সফীহ' ব্যক্তির ব্যাপারে রাজী হয়েছিলেন। কোন ফিকাহবিদই 'সফীহ' লোকদের ব্যাপারে সে শর্ত আরোপের কথা বলেন নি। যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী তারাও নয়। যারা তা নিষেধ করে—বিপরীত মত পোষণ করে, তারাও নয়। কেননা যে লোক নিষেধাজ্ঞা আরোপ সঙ্গত মনে করে, সেও বলে যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে সরকার। তাকে তৎপরতা চালাতে নিষেধ

করবে। তৎপরতা চালাবার সুযোগ দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিক্রয় কালে 'কোন সংশয় নয়' বলার প্রস্তাবনা দেয়াও প্রয়োজনবোধ করে না। যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিরোধী, তারা তো সর্বাবস্থায়ই তৎপরতা চালানো জায়েয হওয়ার পক্ষপাতী।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হল, বিবেক-বুদ্ধিমান হওয়ার পর 'সফীহ্'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল, সঙ্গত নয়। এ শর্ত সংহত হওয়ার নির্ভরতা সঙ্গত হলেও নয়। সর্বপ্রকারের পারস্পরিক বিক্রয় কালে তার উল্লেখ করা হলেও। তাহলেই পারস্পরিক বিক্রয়ের চুক্তিসমূহে দৃঢ়তা গ্রহণ সঙ্গত হবে। সর্বপ্রকারের দর কষাকষিকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

এ হাদীসে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন তুমি কিছু বিক্রয় করবে, বলবে কোন সংশয় নেই, তা ইমাম মুহাম্মদের মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তিনি বলেন, 'সফীহ' যদি পূর্ণ বয়স্ক হয়, তখন তার ব্যাপারটি সরকারের নিকট তোলা হয়, তখন সরকার তার কৃত চুক্তিসমূহের অনুমোদন দেবে যতক্ষণ না তাতে কোনরূপ ধোঁকাবাজি হয়, কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয়। যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ সঙ্গত মনে করে তারা সকলেই তা অগ্রাহ্য করেছে, কেউ তা গণ্য করেনি।

আবূ বকর (র) বলেছেন, বলা সঙ্গত যে, ইমাম মুহাম্মাদের মতও হাদীসের পরিপন্থী। কেননা যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত, তার বেচা-কেনাকে তিনি জায়েয মনে করেন নি। তবে বিচারকের নিকট ব্যাপারটি উত্থাপিত হলে তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে তার বিক্রয়কে স্থগিত করা হবে, যেমন সম্পর্কহীন ব্যক্তির বিক্রয়। সে যদি মালিকের অনুমতি ও আদেশ ছাড়াই বিক্রয় করে, তাহলে তাও স্থগিত হয়ে যাবে। নবী করীম (স) যে ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে, তুমি যখন কিছু বিক্রয় করবে, তখন বলবে, কোন সংশয় নেই, তার বিক্রয়কেও স্থগিত করেন নি। বরং তাকে বৈধ বিক্রয় করতে বলেছেন। তা কার্যকর হবে— যখন বলবে, কোন সংশয় নেই। ফলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতীদের মত এ হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত হল।

তবে আনাস বর্ণিত হাদীসকে উভয় মতের লোকেরাই দলীল বানিয়েছে। যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী, তারা বলেছে, লোকটির পরিবারবর্গ রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে লোকটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বলল। কেননা তার বিক্রয়ে দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। তখন নবী করীম (স) তাদের দাবির প্রতিবাদ করেন নি। বরং লোকটিকে বিক্রয় চালাতে নিষেধ করলেন। যখন সে বলল, সে বিক্রয়ের কাজ না করে স্থির থাকতে পারে না, তখন বললেন, তাহলে বিক্রয় কালে তুমি বলবে— কোন সংশয় নেই। ফলে তিনি তাকে বিক্রয় কাজ চালাবার অনুমিত দিলেন একটা শর্তের ভিত্তিতে। আর সে শর্ত হচ্ছে তাতে দরকষাকষি থাকবে না ও ধোঁকাবাজি হবে না।

পক্ষান্তরে যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিপক্ষে, তাদের দলীল বিশ্লেষণ এভাবে যে, লোকটি যখন বলল যে, আমি বেচার কাজ না করে থাকতে পারি না, তখন নবী করীম (স) তার তৎপরতাকে বাধামুক্ত করে দিলেন। তাকে বললেন, তুমি যখন বিক্রয় করবে, তখন বলবে— কোন সংশয় নেই। নিষেধাজ্ঞা আরোপ যদি ওয়াজিব হতো, তাহলে সে তার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে দূর করার উদ্দেশ্যে বলত না যে, আমি বেচার কাজ না করে থাকতে পারি না।

কেননা কেউ বিক্রয় থেকে বিরত থাকতে পারে না বলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী কোন ব্যক্তিই তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না। যেমন অল্পবয়স্ক বালক ও পাগলের উপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপে সকলেই একমত। তারা দুজন যদি ঐরূপ বলে ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাতে চায়, তাদের দাবি কখনই মেনে নেয়া হবে না। তাদেরকে এ পরামর্শও দেয়া হবে না, আচ্ছা যখন না করে পারছ না তখন বিক্রয়কালে বলে দিও যে, কোন সংশয় নেই। নবী করীম (স) যে তাকে শর্তভিত্তিক অনুমতি দিয়েছেন, তা প্রমাণ করে যে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ওয়াজিব নয়। আর শুরুতে তিনি যে তাকে বিক্রয় কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং তাকে 'কোন সংশয় নেই' বলার পরামর্শ দিলেন, তা তার জন্যে একটা সুষ্ঠু বিবেচনা মাত্র। তার ধন-মালের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ মাত্র। যেমন সমুদ্র পথে ব্যবসায় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বা ভয় সংকুল পথে চলাচলকারী লোককে বলা হয়, তোমার মাল-পত্র নিয়ে ঝুঁকিতে পড়ো না, তার সংরক্ষণ করা বা এ ধরনের কোন পরামর্শ, কিন্তু তা তো নিষেধাজ্ঞা আরোপ নয়। এ শুধু পরামর্শ, উপদেশ, সুস্থ চিন্তা-বিবেচনার উদ্বোধন।

নিষেধাজ্ঞা আরোপের মত যে বাতিল, তার আর একটি দলীল হল— এ বিষয়ে কোনই মতভেদ নেই যে, সফীহ এমন অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি করতে পারে যার ফলে শরীয়াতের 'হদ্দ' বা কিসাস কার্যকর হতে পারে। এ ব্যাপারটি কিন্তু এ ব্যাপারে সকল সন্দেহ-সংশয়ের অপনোদন করে। তাহলে মানুষের অধিকার পর্যায়ে তার অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি উত্তমভাবে গৃহীত হওয়া উচিত।

কেউ যদি বলে যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বীকারোক্তি করা জায়েয, যার ফলে 'হদ্দ' বা কিসাস কার্যকর হতে পারে। কিন্তু তার ধন-মাল পরিবেষ্টনকারী ঋণের স্বীকৃতি বা হেবা জায়েয নয়। তা 'হদ্দ' ও কিসাস কার্যকর হওয়ার স্বীকারোক্তি মৌলিকভাবে জায়েয হলেও ধন-মাল ও তাতে তৎপরতা চালানোর অঙ্গীকার জায়েয হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, আমাদের মতে এ সব ব্যাপারেই রোগীর অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি জায়েয। তবে আমরাই তা বাতিল করে দিই যদি তা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের হয়, কেননা তখনকার সময়ের তৎপরতা মৃত্যুকালীন গণ্য হবে। সে মরে গেলে তার এ তৎপরতা সঙ্ঘটিত ও কার্যকর হবে অন্য লোকের পক্ষে, যারা এর বেশী অধিকারী। তারা হচ্ছে পাওনাদাররা— উত্তরাধিকারীরা। তবে মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত তার সব রকমের তৎপরতাই বৈধ ও কার্যকর হবে। যেমন তার হেবা দানকে আমরা বাতিল করি না। তার যে গোলামকে সে আযাদ করে দিয়েছে, তার উপর নতুন করে মুক্তি চেষ্টা চাপিয়ে দিই না, যতক্ষণ না মৃত্যু সঙ্ঘটিত হচ্ছে। আর মৃত্যুর পূর্বে তার 'হদ্দ' ও কিসাস সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি ও ধন-মালের অঙ্গীকার তো সারা জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ বৈধ প্রমাণকারীরা আর একটি দলীল পেশ করে। তা হল আল্লাহর কথাঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا -

এবং তোমরা বেহুদা খরচ করো না।

এবং আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ -

এবং তোমার হাত তোমার গর্দানের কাছে বেঁধে রেখো না।

এ ঘোষণানুযায়ী বেহুদা খরচ নিন্দিত, নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব সরকারের কর্তব্য তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। আর তা এভাবে হবে যে, তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাকে সে কাজ করতে নিষেধ করে দেবে।

এমনিভাবে স্বয়ং নবী করীম (স)-ও ধন-মাল বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। তাই তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ধন-মাল বিনষ্ট করা থেকে বিরত রাখা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আসল কথা হল, এতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা আমরাই বলি যে, বেহুদা খরচ করা নিষিদ্ধ। যে তা করবে, তাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। কিন্তু বেহুদা খরচ করতে নিষেধ করলে তাতেই কারোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ফরয হয়ে যায় না। কেননা বেহুদা খরচ করতে নিষেধ করা তো সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু কারোর নিজের ধন-মালে তার হস্তক্ষেপ ও তৎপরতা চালানো, তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেয়া, তার অঙ্গীকারকে অকেজো করা— এরূপে তার অন্যান্য সর্বপ্রকারের কাজকর্ম বন্ধ করা— এ এমন একটা ব্যাপার, যা নিয়ে আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের মধ্যে গভীর মতপার্থক্য রয়েছে। অথচ আয়াতে এমন কিছুই নেই, যা এসব কাজ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব হতে পারে। কেননা তার নিজের বিষয়ে কোন অঙ্গীকার বা স্বীকৃতি তো কোন বেহুদা খরচের ব্যাপারে নয়। যদি তাতে বেহুদা খরচকারী হয়, তাহলে অঙ্গীকার দানকারী সকলকেই অঙ্গীকার করতে নিষেধ করতে হবে। পক্ষপাতিত্বের বিক্রয়ও তো কোন বেহুদা খরচ নয়। কেননা তা বেহুদা খরচ হলে তো সকল মানুষকেই তা করতে নিষেধ করতে হবে। 'হেবা', সাদকাও বেহুদা খরচের পর্যায়ে পড়ে না। তা হলে উদ্ধৃত আয়াত যে বেহুদা খরচ করতে নিষেধ করে, যে তা করে তার নিন্দা করা হয়েছে, এর বলে সেসব চুক্তি করার উপর নিষেধাজ্ঞা কি করে আরোপ করা যেতে পারে, যাতে বেহুদা খরচ বলতে কিছুই নেই ? তবে ইমাম মুহাম্মাদ এ আয়াতকে তাঁর মতের সমর্থনে পেশ করতে পারেন। কেননা তিনি তাঁর সে সমস্ত চুক্তিকে জায়েয মনে করেন, যাতে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই— নেই তার ধন-মালের বিনষ্টকরণ। তবে আয়াতে যা আছে, তা হল বেহুদা খরচকারীদের নিন্দা এবং বেহুদা খরচ করার নিষেধ।

যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে, তারা বলে, হ্যাঁ, বেহুদা খরচ করা নিন্দিত এবং তা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কারোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, তার ধন-মাল নিয়ে কর্মতৎপরতা চালানো বন্ধ করে দেয়া এ আয়াত থেকে ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। বিবেচ্য— মানুষকে তার ধন-মাল নিয়ে সমুদ্রে বিপদে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। ভয়-সংকুল পথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কোন সরকারই তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে না। কোন লোক যদি তার গাছপালা ও কৃষি ফসলকে ফেলে রাখে, তাতে পানি সেচ না করে, তার খোলা জমি পড়ে থাকে, তাতে নির্মাণের কাজ না করে, তাহলে তার ধন-মাল বিনষ্ট না হয়— এজন্যে সরকার তাকে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে যে সব চুক্তিতে কারোর মাল বিনষ্ট হওয়ার আশংকা আছে, তা করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা যায় না। নবী

করীম (স)-ও ধন-মাল বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কারো উপর ধন-মালে হস্তক্ষেপ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা যায় না। তার পক্ষের কোন দলীলও তাতে নেই। বেহুদা খরচের ব্যাপারেও আমাদের এ কথা।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল এবং যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তার-ও নিজের ধন-মালে তৎপরতা চালানো জায়েয, এর আর একটা প্রমাণ হল— কোন বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী পূর্ণ বয়স্ক মানুষ থেকে যখন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়, বেহুদা খরচ করে তার জন্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষের পূর্বোল্লিখিত ফিকাহিবদগণ— মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বাদে— বলেন, সরকার যখন তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে তার কৃত চুক্তি ও দেয়া অঙ্গীকার— নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর যা হয়েছে— বাতিল হয়ে যাবে। সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে যা হয়েছে, তা যদি বৈধ হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে তার অর্থ এই হয় যে, এখন সে যা করবে, তা আমি এখন বাতিল করে দিচ্ছি কিংবা ভবিষ্যতে যা করবে তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কোন সহীহ্ কথা নয়। কেননা তাতে সে চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হয়, যা এখনও অনুষ্ঠিতই হয়নি। যেমন কেউ যদি বলে— তুমি আমার নিকট যা বিক্রয় করেছ এবং যেসব চুক্তি তুমি আমার সাথে করেছ, আমি তা সবই ভেঙ্গে ফেললাম। কিংবা বিক্রয়ে আমার জন্যে ইখতিয়ারের যে শর্ত রয়েছে, আমি সব বাতিল করে দিলাম। অথবা কোন মেয়েলোক বলবে ঃ তুমি ভবিষ্যতে আমার দিকে যত ব্যাপার ফিরিয়ে দেবে, তা সব এখনই আমি বাতিল করে দিলাম। .... এ ধরনের সব কথাই বাতিল— অর্থহীন। যেসব চুক্তি ভবিষ্যতে হবে, তা এখনই বাতিল করা অর্থহীন।

এ ব্যাপারে আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদের উপর অভিযোগ উঠে। তা হল— তারা দুজনই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পরও 'মহরে মিসল' দিয়ে বিয়ে করা জায়েয মনে করেন। অথচ তাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ বাতিল হয়ে যায়। কেননা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে এজন্যে ঃ যেন সে তার ধন-মল বিনষ্ট না করে, তাহলে সে তো বিয়ে করে তা ধ্বংস করতেই বসেছে। তা এভাবে হতে পারে যে, সে 'মহরে মিসল'-এর বিনিময়ে বিয়ে করল। পরে সে তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বেই তালাক দিল, তখন তো স্ত্রীকে অর্ধেক মহরানা দিতে বাধ্য হবে। এ পর-ও সে এ রকমের অনেক কাজই করতে ও তাতে নিজের ধন-মাল ব্যয়ও করতে পারে। তাহলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেও তার ধন-মাল বিনষ্টকরণ বন্ধ করা গেল না।

তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে শর্ত হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা লাভ ও তাকে তার ধন-মাল ফিরিয়ে দেয়া— তার ফিরে পাওয়ার যোগ্যতা হওয়া, তার সাক্ষ্য দান জায়েয হওয়া। এ এমন একটি কথা, যা তার আগে আর কেউ বলেন নি। এর ভিত্তিতে শাসকদের নিকট ফাসিক লোকদের নিজেদের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার দান জায়েয না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের বিক্রয় ও ক্রয়সমূহ-ও নাজায়েয ঘোষিত হওয়া উচিত। যে লোকের সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণিত হয় নি, তা ক্রয়-বিক্রয়ের সাক্ষ্যদান করাও সাক্ষীদের উচিত নয়। এমন বাদীর মামলাও বিচারকের কবুল না করা উচিত, যতক্ষণ তার সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণিত না হবে। কোন বিবাদীরও তার বিরুদ্ধে দাবি বা অভিযোগ কবুল করা যেতে পারে না, যতক্ষণ তার সাক্ষ্য দান তার নিকট সহীহ্ না হবে। যে লোক সততা-ন্যায়পরতার গুণধারী নয়, যার সাক্ষ্য জায়েয নয়, তার নিকট

তার অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি জায়েয হতে পারে না। তার কৃত চুক্তিসমূহও কার্যকর হওয়া উচিত নয়। কেননা তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কিন্তু এ সব কথাই ইজমার বিপরীত।

নবী করীম (স)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত লোকেরা অধিকার নিয়ে বৎসা ও ঝগড়া-বিবাদ করে আসছে। কিন্তু নবী করীম (স) নিজে এবং আগের কালের শরীয়াতবিদ— কেউ-ই বলেন নি যে, তোমাদের এ সব দাবি-দাওয়া কবুল করা যাবে না। অন্য কারোর উপর কারোর দাবি পেশ কালে কেউ একথা বলেন নি যে, তোমার এ দাবি গৃহীত হবে কেবল তার সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণিত হওয়ার পর, তার আগে নয়। আল-হাজরামী নবী করীম (স)-এর নিকট একজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন এই বলে যে, সে লোকটি শরীয়াতের আইন ভঙ্গকারী, তাঁর সামনেই সে তা করেছে। কিন্তু নবী করীম (স) তাঁর মামলা বাতিল করে দেন নি। তার অবস্থা সম্পর্কে জানতেও চান নি। ব্যাপারটি একটি হাদীসের বর্ণনায় বর্ণিত। তা মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, হান্নাদ, আবুল আহ্ওয়ায, সামাক, আল-কামা ইবনে ওয়ায়েলিল হাজরামী তাঁর পিতার সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, হাজরামাউত থেকে এক ব্যক্তি উপস্থিত হল আর এক ব্যক্তি এলো কিন্দা থেকে। তারা দুজন নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে আল হাজরামী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ব্যক্তি আমাকে পরাজিত করেছে একটি জমির ব্যাপারে, যা আমার পিতার ছিল। আল-কিন্দী বললেন, সে জমি তো আমার দখলে, আমিই তার চাষাবাদ করি। তার উপর ওর তো কোন অধিকার নেই। তখন নবী করীম (স) আল-হাজরামীকে বললেন, তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি ? বললেন, না। নবী করীম (স) বললেন, তাহলে তোমাকে (বিবাদীকে) সেজেন্য হলপ করতে হবে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূল। ও তো ফাজের— গুনাহগার ব্যক্তি। কি নিয়ে হলপ করছে, তার কোন পরোয়াই সে করে না। ও কোন কিছুতে ভয় পায় না। রাসূল (স) বললেন, সে ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই। তাই ফিসক-ফজুরীই যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ হতো এবং সেজন্যে তা জরুরী হতো, তাহলে রাসূলে করীম (স) নিশ্চয়ই তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। অথবা তার মামলাটাই বাতিল করে দিলেন। কেননা বাদীই স্বীকার করেছে যে, সে লোকের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত। তার বিরুদ্ধে মামলা করা জায়েয নয়। ধন-মালে মালিকানা হস্তক্ষেপ এবং চুক্তিসমূহের ও অঙ্গীকারসমূহের কার্যকরতার দিক দিয়ে মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই— এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মত-দ্বৈততাই নেই। অথচ কুফর হল সবচেয়ে বড় ফাসিকী, ফাসিকীর চাইতেও অধিক বড়। তা-ই যখন নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ নয়, তখন তার তুলনায় কম গুনাহ্ ফিস্ক-ফজুরী কি করে তার কারণ হতে পারে! আর মুসলিম ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, মুসলমান ও কাফির ধন-মালে হস্তক্ষেপ ও চুক্তিসমূহের কার্যকারিতায় সম্পূর্ণ অভিন্ন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ -

এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী বানিয়ে নাও।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের সূচনায় ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে 'হে ঈমানদার লোকগণ' বলে। তার পরে উপরোক্ত আয়াতাংশ সংযোজিত হয়েছে। এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ। তার একটি হল সাক্ষীর গুণ-পরিচিতি। কেননা তারাও ঈমানের গুণে সম্বোধিত। আর আয়াতের ধারবাহিকতায়ই বলা হয়েছে ঃ 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে'। তাই মুসলমানদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের জন্যে সাক্ষীকে অবশ্যই ঈমানদার হতে হবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, স্বাধীনতা, ক্রীতদাস না হওয়া। সম্বোধনের মধ্যেই এ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। তা দুভাবে বোঝা যায়। একটি হল, "তোমরা যখন কোন প্রকারের পারস্পরিক ঋণের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে .... যার উপর হক ধার্য হচ্ছে সে যেন দলীলের বিষয়-বস্তু লিখিয়ে দেয়" পর্যন্ত। আর এ কাজ তো স্বাধীন লোকদের পক্ষেই সম্ভব, ক্রীতদাসদের পক্ষে তা আদৌ করণীয় নয়। তার দলীল হল, ক্রীতদাস পারস্পরিক ঋণের কোন চুক্তি করতে পারে না। তার কোন অঙ্গীকারও কার্যকর হবে না। তবে তার মনিবের অনুমতিতে পারে। আয়াতের সম্বোধনে তা সেই লোক শামিল, যার পক্ষে স্বাধীনভাবে এ কাজ করা সম্ভব, করার অধিকার আছে। সেজন্যে অন্য কারোর অনুমতির অপেক্ষা থাকবে না। তাহলে প্রমাণিত হল যে, এ সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাক্ষীকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে।

আর দ্বিতীয় তাৎপর্য হল, সম্বোধনের দলীল হিসেবে 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে' বলা হয়েছে। এ শব্দের বাহ্যিক তাৎপর্যের দাবি হচ্ছে মুক্ত স্বাধীন লোক হওয়া। যেমন ঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَا مٰى مِنْكُمْ -

এবং তোমাদের মেয়েদেরকে বিয়ে দাও।

অর্থাৎ 'যারা দাসী নয়, স্বাধীনা, তাদেরকে বিয়ে দাও।' কেননা এই আয়াতাংশ সংযোজিত হয়েছে এ আয়াতের পরে ঃ

وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَا ئِكُمْ -

এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা নেককার।

উপরের আয়াতের مِنْكُمْ 'তোমাদের মধ্যে থেকে'-এর মধ্যে ক্রীতদাস শামিল নয়।

এতে দলীল রয়েছে এ কথার যে, আলোচ্য সাক্ষ্যদানের শর্ত হচ্ছে মুসলিম হওয়া এবং স্বাধীন মুক্ত মানুষ হওয়া। ক্রীতদাসের কোন সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। কেননা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করা ফরয। আর সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে স্বাধীন মানুষকে। স্বাধীন মানুষ ছাড়া অন্যদেরকে সাক্ষী বানানো যাবে না। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা এসেছে যে, এ সাক্ষী হতে হবে স্বাধীন পুরুষ মানুষ।

যদি বলা হয়, তুমি যে বললে যে, আয়াতে ক্রীতদাস গণ্য নয়। অথচ তাতে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ নেই।

জবাবে বলা যাবে, আয়াতের সম্বোধনের প্রকৃতি থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আয়াতে যে কাজের হুকুম দেয়া হয়েছে তা স্বাধীন লোকদের করণীয়। তার পরে দুজন সাক্ষী বানাবার কথা বলা হয়েছে। তা-ও অবশ্য পালনীয়। তখন কথাটি দাঁড়ায় এভাবে যে, 'এবং তোমরা দুজন স্বাধীন পুরুষকে সাক্ষী বানাও।' অতএব সাক্ষীর স্বাধীন হওয়ার শর্ত অগ্রাহ্য করার কারোর

অধিকার নেই। কেননা তা জায়েয হলে দুইজনের সংখ্যার শর্তটিও অগ্রাহ্য করা জায়েয হবে। আর তাতেই একথা নিহিত রয়েছে যে, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য বাতিল, অগ্রহণযোগ্য।

ক্রীতদাসের সাক্ষ্য দান পর্যায়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কাতাদাতা আল-হাসান— আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

شَهَادَةُ الصَّبِى عَلَى الصَّبِى وَالْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ -

বালকের ব্যাপারে বালকের সাক্ষ্য এবং দাসের ব্যাপারে দাসের সাক্ষ্য জায়েয।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, উবাই, আবদুর রহমান ইবনে হুমাম, কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনা করছিলেন যে, আলী (রা) বলেছেন ঃ

يَسْتَثْبِتُ الصِّبْيَانَ فِىْ الشَّهَادَةِ -

বালকদেরকে সাক্ষ্যদান পর্যায়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।[১]

এ থেকে প্রথমোক্ত হাদীসটি দুর্বল হয়ে পড়ে। হিফস ইবনে গিয়াস আল-মুখতার ইবনে ফুলফুল আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন— এমন কাউকে আমি জানি না। উসমান আল-বত্তী বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য তার মনিব ছাড়া অন্য কারোর জন্যে হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন, ইবনে শাবরামাতা তা জায়েয মনে করতেন শুরাইহ্ থেকে পাওয়া দলীলের ভিত্তিতে। ইবনে আবূ লায়লা ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। খাওয়ারিজরা কূফা নগরী দখল করায় সেখানকার বিচার ব্যবস্থার কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তারা ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কবুল করার নির্দেশ দেয়। তাদের আরও কিছু কিছু মতের তিনি উল্লেখ করেছেন। তা বিপরীত ধরনের ছিল। তা পালন করতে আদেশ করে। তারপরই তারা তাঁকে বিচারক পদে বহাল রাখে। কিন্তু রাত্র হলে তিনি নিজের জন্তুযানে সওয়ার হয়ে মক্কায় চলে যান।

পরে হাশিমীরা প্রশাসন কায়েম করলে তাঁকে কুফার বিচারপতি পদে তারা পুনর্বহাল করে দেয়। জুহরী সাঈদুবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উসমান ইবনে আফফান (রা) ফায়সালা দিয়েছেন যে, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য জায়েয, অবশ্য দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের পর। তার পূর্বেও প্রত্যাখ্যান করা হতো না। শুবা মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, ইবরাহীম নখয়ী উট-চুরির ব্যাপারে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কবুল করতেন। সেই শুবাই ইউনুস, আল-হাসান সূত্রে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। আল-হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, না, তা জায়েয নয়, হিফ্স থেকে হাজ্জাজ, আতা, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও ইবনে শাবরামাতার (দুইটি মতের একটি মত) এবং মালিক, আল শাম ইবনে সালিহ ও শাফেয়ী বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য কোন কিছুতেই গ্রহণীয় নয়।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছি যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত সাক্ষ্য বিশেষভাবে স্বাধীন মানুষের। ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের কথা এখানে বলা

১. অর্থাৎ তাদের নিকট থেকে জানতে চেষ্টা করতেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে মেনে নিতেন।

হয়নি। আয়াতের পরবর্তী অংশও প্রমাণ করে যে, এখানে ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের কথা বলা হয়নি। তা হল ঃ

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا -

সাক্ষীগণকে সাক্ষ্যদানের জন্যে ডাকা হলে তারা অস্বীকার করতে পারবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, ডাকা হলে সাক্ষ্য দেবে। অপর কিছু লোক বলেছেন ঃ যখন সাক্ষী যথারীতি মানা হয়ে যায়। অপর লোকেরা বলেছেন, উভয় অবস্থায়ই সাক্ষ্যদান ওয়াজিব। কিন্তু ক্রীতদাস মানিবের হক আদায়ে ব্যস্ত থাকে বলে সে সাক্ষ্য দানের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। অতএব সাক্ষ্যদানের কোন হুকুমই তার প্রতি নেই। সে তো তার মনিবের খিদমত বাদ দিয়ে অন্য কাজে মশগুল হতে পারে না। এমন কি কুরআন পাঠ, কুরআন লেখানো ও সাক্ষ্য দানও তার মধ্যে শামিল, হজ্জ ও জুম'আর নামাযের সম্বোধনেও তারা শামিল নয়। কেননা তাদের জন্যে তাদের মনিবের হক অবশ্যই পালনীয়। সাক্ষ্য দানও তাই। কেননা সাক্ষ্য দান তো কেবল সাক্ষীদের উপর সুনির্দিষ্ট নয়। তা ফরযে আইন নয়। তা ফরযে কিফায়া মাত্র। অথচ জুম'আ ও হজ্জ ফরযে আইন প্রত্যেকটি পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের উপর। কিন্তু ক্রীতদাসের জন্যে হজ্জ ও জুম'আ ফরযে আইন নয় মনিবের হক আদায়ের তাগিদের কারণে, তখন আরও অধিক উত্তমভাবে সে মনিবের হক-এর কারণেই সাক্ষ্যদান তার কর্তব্য হবে না।

আল্লাহ্র এ কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ -

এবং তোমরা আল্লাহ্র জন্যে সাক্ষ্য কায়েম কর।

আল্লাহ্র এ কথাও ঃ

كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ -

তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, আল্লাহ্র জন্যে সাক্ষ্যদাতা ....

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوا -

তোমরা খাম-খেয়ালী— নফসের খাহেশের অনুসরণ করে সুবিচার থেকে ফিরে যাবে না।

এ আয়াতে শাসককে আল্লাহ্র সাক্ষী বলা হয়েছে। যেমন সমস্ত সাক্ষীকেই আল্লাহ্র জন্যে সাক্ষ্যদাতা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহ্র জন্যে সাক্ষ্য কায়েম কর।' তাই ক্রীতদাস যখন শাসক হতে পারে না, তখন তারা সাক্ষীও হতে পারে না। কেননা শাসক ও সাক্ষী— উভয়ের দ্বারাই হুকুম— আইন— কার্যকর হয়।

ক্রীতদাসের সাক্ষ্য বাতিল, তা এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ -

আল্লাহ্ ক্রীতদাসকে দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন, সে কিছুই করতে সক্ষম নয়। (সূরা নহল ঃ ৭৫)

তা এজন্যে যে, এ কথা জানা আছে যে, শক্তি বা ক্ষমতা নেই এ জন্যে বলা হয়নি যে, তাদের বাস্তবিকই কর্মক্ষমতা বলতে কিছুই নেই। কেননা শক্তি— ক্ষমতার দিক দিয়ে স্বাধীন ও

ক্রীতদাসের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। বোঝা গেল, আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, ক্রীতদাসের কথা। কৃতচুক্তি ও তার কর্মতৎপরতা হস্তক্ষেপ ও তার মালিকানা প্রভৃতি কার্যকর নয়। উক্ত আয়াতে ক্রীতদাসকে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে কাফির-মুশরিকদের পূজ্য মূর্তিগুলোর। সেগুলোও কোন কিছুর মালিক হয় না, কোন কাজ করার ক্ষমতা ওদের থাকে না। আর যে সব ব্যাপারের সাথে বান্দাগণের হক— হুকুম জড়িত, সেসব ক্ষেত্রে ওদের হুকুম বাতিল হওয়া স্বাভাবিক। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলেছেন, ক্রীতদাস নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। আয়াতের শব্দে এ তাৎপর্য নিহিত না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ ব্যাখ্যা দিতেন না। বোঝা গেল, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য সাক্ষ্য না হওয়ার মতোই। তার চুক্তি, অঙ্গীকার ও তৎপরতা— যা কথার মধ্যে পড়ে— তা সবই এ রকম। তাই ক্রীতদাসের সাক্ষ্য অ-কার্যকর— আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের দিক দিয়েই ক্রীতদাসের সাক্ষ্য বাতিল, তার আরও প্রমাণ এই যে, সাক্ষ্য দান ফরযে কিফায়া, যেমন জিহাদ, কিন্তু জিহাদের হুকুম ক্রীতদাসদের প্রতি জারী করা হয়নি। সে যদি পরিবেষ্টিত হয় বা যুদ্ধও করে, তাহলে গনীমতের কোন অংশও সে পাবে না। অতএব সাক্ষ্যদানের আদেশও তার প্রতি ধ্বনিত হয়নি। যখন সাক্ষ্য দেবে, তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। শহীদদের জন্যে দেয়া কোন হুকুমই তাদের বেলা কার্যকর হবে না। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও গনীমতের কোন অংশ সে পাবে না। ক্রীতদাস যদি সাক্ষ্যদানের যোগ্য হতো, তাহলে তার সাক্ষ্য কার্যকর হওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল। সে যে সাক্ষ্য দেবে পরে তা দিতে অস্বীকার করলে তাকে জরিমানা দিতে হবে। কেননা এটাই সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিধান। শাসক যদি তার সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন হুকুম কার্যকর করে, তবে তা কার্যকর হবে। কিন্তু ক্রীতদাস সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকলে তাকে জরিমানা দিতে বাধ্য করা যাবে না। তা থেকে বোঝা গেল যে, সে সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার বা যোগ্যতাই রাখে না। তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন রায় দেয়া হলে তা নাজায়েয হবে।

মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, মেয়েদের অংশ পুরুষদের অংশের অর্ধেক। এমনিভাবে দুইজন মেয়েলোকের সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বানানো হয়েছে। তার অর্থ একজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক; যেমন একজন মেয়েলোকের মীরাস একজন পুরুষের অর্ধেক। তাই ক্রীতদাস যখন আসলেই মীরাস পাওয়ার অধিকারীই নয়, তাই তার সাক্ষ্যদানেরও অধিকারী হওয়া উচিত নয়। কেননা মীরাসের ক্ষেত্রের ঘাটতি সাক্ষ্যের ক্ষেত্রের ঘাটতিকে অনিবার্য করে দেয়। অতএব মীরাস না পাওয়া সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার না পাওয়ার সমান। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য জায়েয হওয়ার পর্যায়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বর্ণনা ধারার দিক দিয়ে সহীহ্ প্রমাণিত হয়নি। আর যদি সহীহ্ হয়ও, তাহলে বুঝতে হবে, তা একজন ক্রীতদাসের সাক্ষ্য অপর ক্রীতদাসের জন্যে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাক্ষ্যদান জায়েয হওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন ও ক্রীতদাস সমান হওয়ার মাসলায় ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে কোন মতভেদ আমাদের জানা নেই।

যদি বলা হয়, ক্রীতদাসের দেয়া খবর গ্রহণ করা হয়। যেমন রাসূলে করীম (স) কোন হাদীস যদি বর্ণনা করে তাহলে তার দাসত্ব তার দেয়া খবর গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অতএব তার সাক্ষ্য গ্রহণের পথেও কোন প্রতিবন্ধকতা হওয়া উচিত নয়।

জবাবে বলা যাবে, খবর সাক্ষ্যদানের মূল নয়। অতএব এ দুটিকে একইভাবে গ্রহণ করা যায় না। শরীয়াতের আহ্‌কামে 'খবরে ওয়াহিদ' গৃহীত হয়। কিন্তু এক ব্যক্তির সাক্ষ্য অকার্যকর। খবর বা হাদীসের বর্ণনাধারায় অমুক থেকে অমুকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাক্ষ্য তো সাক্ষ্য হিসেবেই গৃহীত হবে। ক্রীতদাস যখন বলবে রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তখন তার এই বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু সাক্ষীর সাক্ষ্য সাক্ষ্যদানের শব্দ সহকারে দিতে হবে। নিজের কানে শোনার বা নিজের চোখে দেখার কথা বলতে হয়। যেমন পুরুষ ও নারী খবর বর্ণনায় সমান, কিন্তু সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সমান নয়। কেননা দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। অথচ পুরুষ ও নারী— উভয়ের দেয়া খবরে কোন পার্থক্য নেই। তাই ক্রীতদাসের দেয়া খবর গ্রহণকে তার সাক্ষ্য দানের অধিকার প্রতিষ্ঠার দলীল হতে পারে না।

আবূ বকর বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেছেন, কোন শাসক বা বিচারক ক্রীতদাসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোন হুকুম বা ফায়সালা দেয়, পরে তা যদি আমার নিকট পেশ করা হয়, তাহলে সে হুকুম বা রায়কে বাতিল করে দেব। কেননা তা বাতিল করার মতে ফিকাহবিদদের ঐকমত্য হয়েছে।

বালকদের সাক্ষ্য পর্যায়েও ফিকাহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, বালকদের সাক্ষ্যদান কোন বিষয়েই জায়েয নয়।

ইবনে শাবরামাতা, সওরী ও শাফেয়ীও তাই বলেছেন। ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, বলাকদের কিছু অংশের অপর কিছু অংশের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান জায়েয। মালিক বলেছেন, বালকদের তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষ্যদান জায়েয। অন্যদের ব্যাপারে নয়। তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে কেবলমাত্র যখম সম্পর্কে সাক্ষ্যদান জায়েয হবে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারপর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। তবে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগের দেয়া সাক্ষ্যের উপর পুনরায় সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন হলে দেবে। স্বাধীন পুরুষ ছেলেদের সাক্ষ্য জায়েয হবে, বালক বয়সের স্বাধীন মেয়েদের সাক্ষ্যদান জায়েয হবে না।

আবূ বকর বলেছেন, ইবনে আব্বাস, উসমান ও ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, বালকদের সাক্ষ্য বাতিল। আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, বালকদের পরস্পরের ব্যাপারে পরস্পরের সাক্ষ্যদান বাতিল। আতা-ও তা-ই বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে হুবায়ব ইবনে আবূ সাবিত বলেছে, শবীকে বলা হলো, ইয়াস ইবনে মুআবিয়া বালকদের সাক্ষ্যদানে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। তখন শবী বললেন, মসরূক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আলী (রা)-এর নিকট ছিলেন। তখন পাঁচজন বালক তাঁর নিকট আসে। তারা বলে আমরা ছয়জন ছিলাম। আমরা পানিতে ডুব দিয়েছিলাম। তখন আমাদের মধ্য থেকে একটি বালক ডুবে গেল। তখন তিনজন অপর দুইজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, ওরা দুইজন তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। অভিযুক্ত দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, আমরা নই ওরা তিনজনই তাকে ডুবিয়ে মেরেছে। তখন হযরত আলী (রা) দুইজনের উপর দিয়াতের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ ধার্য করলেন। আর তিনজনের উপর দিয়াতের এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করলেন। তবে আবদুল্লাহ ইবনে হুবায়ব বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য। এটা হাদীসবিদদের মত। তা সত্ত্বেও হাদীসের তাৎপর্য

অবোধগম্য। হযরত আলী (রা)-র ক্ষেত্রে এরূপ কথা সত্য বলে মানা যায় না। কেননা ডুবে মরা বালকের অভিভাবকরা যদি দুই পক্ষের মধ্যের কোন এক পক্ষের উপর অভিযোগ দায়ের করে, তাহলে তাদের সাক্ষ্যকে তারা মিথ্যা বলবে, যা তারা অন্যদের বিরুদ্ধে দিয়েছে। আর যদি তারা সবকয়টি বালকের উপরই দাবি তোলে, তাহলে কার্যত তারা উভয় পক্ষকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবে। কিন্তু এ কথা হযরত আলী (রা) থেকে প্রমাণিত নয়।

বালকদের সাক্ষ্য বাতিল— এ কথা এ আয়াতটি প্রমাণ করে। বলা হয়েছে, হে ঈমানদার লোকগণ তোমরা যদি কোন ঋণের পারস্পরিক চুক্তি কর কোন নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে .....

এই সম্বোধন তো পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি। কেননা বালকরা পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি করার অধিকারী নয়। তেমনি যার উপর হক ধার্য হবে সে যেন লিখিয়ে দেয়ার কাজটা করে। এতেও বালকরা গণ্য নয়। কেননা তাদের অঙ্গীকারই বৈধ নয়। আল্লাহ্‌র কথা وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا এবং যেন তার রব্ব আল্লাহ্‌কে সে ভয় করে এবং তা থেকে একবিন্দু জিনিস কম না করে' কোন বালককে বলার মত কথা নয়। কেননা বালক তো শরীয়াত পালনে বাধ্য (مكلف) নয়। ফলে কোন শাস্তি বা ভয়ের কথা তাকে বলা যেতে পারে না। তারপর 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজনকে সাক্ষী বানাও' কথাটিও বলে যে, তা বালকদের বলা হয়নি। কেননা বালকরা এখনও আমাদের পুরুষদের মধ্যে গণ্য হয়নি। সম্বোধনের শুরুতে তো পূর্ণ বয়স্কদের কথা বলা হয়েছে। তাই 'তোমাদের পুরুষদের' বলতেও সেই পূর্ণবয়স্কদেরকেই বুঝতে হবে, বালকদের নয়। 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদেরকে মনোনীত কর' কথাটিও বালকের সাক্ষী হওয়ার বিপরীত কথা বলে। 'যখন ডাকা হবে, তখন সাক্ষীগণ অস্বীকার করবেন।' এ নিষেধও বালকদের জন্যে নয়, তারা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করতে পারে। বাদী তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে হাযির করতে পারে না। 'এবং সাক্ষ্য গোপন করো না, যে তা গোপন করবে, সে পাপী মনের লোক।' এ কথা নিশ্চয়ই বালককে বলা যেতে পারে না। তারা সাক্ষ্য গোপন করলে তাদের পাপাত্মা হওয়া প্রমাণিত হবে না। আর সাক্ষ্যদান থেকে বিরত তাকলে তারা জরিমানা দিতে বাধ্য হবে না। এ কথাও প্রমাণ করে যে, তা সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত হলে বা যার সাক্ষ্য দান সহীহ্ সে যদি সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে সে বাধ্য হবে। তবে যখমের ব্যাপারে বিশেষভাবে তাদের সাক্ষ্যদান ও তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এমন একটি কথা, যার কোন দলীল নেই। যাদের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই, তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির ব্যাপার। কেননা মৌল নীতি হল যখমের ব্যাপারে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, সর্ব ব্যাপারেই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে সাক্ষ্য গ্রহণ, পরে নয়, একটি অর্থহীন কথা। কেননা এ সাক্ষ্যদাতারাই হয়ত অপরাধী হতে পরে। তাদেরকে পাকড়াও করা হবে, এ ভয়েতেই হয়ত তারা সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটা যে বালকদের অভ্যাস, তা কারোর অজানা নেই। ওরা নিজেরা অপরাধী হলে অপরাধের বোঝা অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে তারা কসুর করে না। কেননা ওরাই অপরাধী হিসেবে পাকড়াও হতে পারে, এ ভয় তো ওদের আছে। উপরন্তু সাক্ষ্য দানে আল্লাহ যখন শর্ত করেছেন সততা-নিরপেক্ষতার, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে

কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়েছেন, ফাসিকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে যে লোক মিথ্যা বলা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না, তখন মিথ্যার জন্যে যাকে পাকড়াও করা যায় না তার সাক্ষ্য দান কি করে জায়েয হতে পারে। আর বালককে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখা সম্ভবও নয়, কোন লজ্জা-শরমও তাকে ক্ষান্ত করতে পারে না, তাদের সাক্ষ্য কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, বালকদের মিথ্যা বলাকে তো লোকেরা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে। বলা হয় এ 'লোকটি তো বালকদের চাইতেও বেশি মিত্যাবাদী।' যাদের অবস্থা এই, তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণীয় হতে পারে! তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এবং অন্যরা তাদেরকে শিখিয়ে দেয়ার সুযোগের পূর্বের অবস্থাকে গণ্য করা হলে— কেননা তারা সাধারণত অন্যের শেখানোর দরুনই মিথ্যা বলতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাকে— তাহলে ব্যাপারটি সেরূপ হয় না, যেমন ধারণা করা হয়েছে। বালকরা মিথ্যাকে চিনে, যেমন চিনে সত্যকে। তবে যে বয়স পর্যন্ত পৌছলে সাক্ষ্যদানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝতে পারে, সেই বয়স পর্যন্ত পৌছা আবশ্যক। ও তাৎক্ষণিক কোন কারণেও মিথ্যা বলতে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হতে পারে, এ ভয়েও তারা চট করে কারোর পক্ষে ও কারোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। এ রকম আরও অনেক ব্যাপার আছে, যা তাদের অবস্থা থেকে জানা যায়। অতএব বালকদের সাক্ষ্যকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বেও সত্য বলে হুকুম দেয়ার অধিকার কারোর নেই। যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর-ও এরূপ হুকুম দেয়ার অধিকার কারোর নেই। যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর-ও এরূপ হুকুম দেয়া সম্ভব নয়। অবস্থা যখন এই এবং এটাও জানা গেল যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না ও দেবার সংকল্পও গ্রহণ করে না, তাহলে তো মেয়েলোকদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা কর্তব্য, যেমন পুরুষদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত যেমন একটি গোষ্ঠী বা বহু কয়জন লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু সাক্ষ্যের ব্যাপারে যখন সংখ্যার গুরুত্ব আছে, আর সাক্ষ্যে যার পুরুত্ব বিশেষভাবে পুরুষদের যখমে— মেয়েদের নয়— তখন সাক্ষ্যের সব কয়টি শর্তই পূর্ণ বয়স্কতা ও সততা— ন্যায়পরতা-পুরামাত্রায় পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আর তাদের কতকের উপর অপর কতকের সাক্ষ্য যেমন করে জায়েয বলেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও তা জায়েয হওয়া উচিত। কেননা তাদের পরস্পরের সাক্ষ্য পরস্পরের উপর পুরুষদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান অপেক্ষা অধিক তাগিদপূর্ণ নয়। কেননা এ মতের লোকটির মতে তারা মুসলমান রূপে গণ্য।

অন্ধের সাক্ষ্য দান পর্যায়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ বলেছেন, অন্ধের সাক্ষ্য কোন অবস্থায়ই জায়েয হতে পারে না। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-ও এরূপ মত দিয়েছেন। আমর ইবনে উবায়দ আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, অন্ধের সাক্ষ্য কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। আশয়াস থেকেও এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, তার দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পূর্বে যদি কিছু দেখে থাকে, তবে সে বিষয়ে তার সাক্ষ্য চলবে। ইবনে লাহইয়াতা আবূ তা'মাতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, অন্ধের সাক্ষ্য জায়েয নয়। আবদুর রহমান ইবনে সীমা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, উবাই, হাজ্জাজ ইবনে যুবায়র ইবনে হাযিম কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একজন অন্ধ লোক আয়াস ইবনে মুআবিয়াতার নিকট সাক্ষ্য দিল। তখন আয়াস তাকে বললেন, তোমার সাক্ষ্যকে আমি প্রত্যাখ্যান করছি না। কিন্তু তুমি হয়ত

সততা-ন্যায়পরতাপূর্ণ না-ও হতে পার। বরং তুমি একজন অন্ধ ব্যক্তি, চক্ষে দেখতে পাও না। পরে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নি। ইমাম আবূ ইউসূফ ইবনে আবূ লায়লা ও শাফেয়ী বলেছেন, সে ব্যক্তি অন্ধ হওয়ার পূর্বে যদি কোন কথা জেনে থাকে, তাহলে সে বিষয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্ধ অবস্থায় যা গেছে, সে বিষয়ে তার সাক্ষ্য জায়েয হবে না। শুরাইহ ও শবী অন্ধের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। মালিক ও লায়স ইবনে সাদও অন্ধের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। যদি সে অন্ধ অবস্থায়ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেনে থাকে, তবুও। তবে সে যদি তালাকের ক্ষেত্রে আওয়াজ চিনতে পেরে থাকে ও অঙ্গীকার বুঝতে পেরে থাকে, তবে যদি সে যিনার সাক্ষ্য দেয় বা 'কযফ' দণ্ডের, তা হলে তা গ্রহণ করা যাবে না।

অন্ধের সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মায়মুন আল বলখী আল-হাফিয, ইয়াহইয়া ইবনে মূসা (বখ্ত নামে পরিচিত) মুহাম্মাদ ইবনে সুলায়মান ইবনে মসমূল, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালমাতা ইবনে অহরাম— তাঁর পিতা তাযূস ইবনে আব্বাস সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স)-কে সাক্ষ্য দান সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি সূর্য দেখতে পাও ? তাহলে সাক্ষ্য দিও। অন্যথায় সাক্ষ্য দেবে না। অর্থাৎ সূর্যকে স্বচক্ষে দেখাকে সাক্ষ্যদানের শর্ত বানিয়েছেন। অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা যদি সূর্যকে যেমন দেখে ঘটনাটি তেমনি দেখতে পেয়ে থাকে, তাহলেই তার সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা ও অধিকার হতে পারে, অন্যথায় নয়। অন্ধ ব্যক্তি যেহেতু কোন কিছুই দেখেতে পায় না, তাই তার সাক্ষ্য জায়েয নয়। অপর দিক দিয়ে অন্ধ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে। এ জন্যেও তার সাক্ষ্য জায়েয নয়। কেননা আওয়াজ বা কণ্ঠস্বর অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে। যে কথা বলে সে কখনও কখনও অপরের কণ্ঠস্বরে কথা বলতে পারে। ফলে কণ্ঠস্বরের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা যায় না। আর বাক-কারী ও শ্রোতার মাঝে পর্দা থাকলে তো ব্যাপারটি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে অপরের কণ্ঠস্বরের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা যে দৃঢ় প্রত্যয় আবশ্যক, তা এখানে পাওয়া যায় না। তার গোটা ব্যাপারই নিছক ধারণা-অনুমান ভিত্তিক হয়ে পড়ে।

তাছাড়া সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানের শব্দে কথা বলতে হবে। যদি সে-সাক্ষ্যদানের শব্দ বাদ দিয়ে অন্য শব্দ ব্যবহার করে, যদি বলে, আমি জানি, বলে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। এ থেকে বোঝা গেল, সাক্ষ্য সাক্ষ্যদানের জন্যে ব্যবহার্য শব্দের সাথে সম্পর্কিত। আর সে সাক্ষ্যের ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শন, স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখতে পাওয়া। তাই যার সাক্ষ্যে এ মাত্রা পাওয়া যাবে না, তার সাক্ষ্য জায়েয হবে না। না দেখেও সাক্ষ্য দিলে তা অগ্রহণযোগ্য হবে।

কেউ যদি বলে যে, অন্ধ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তার সাথে সঙ্গম করতে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে গেছে। তার নিজের স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, মনে করা যায়। কেননা সন্দেহ পোষণ করে কোন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে যাওয়া জায়েয নয়।

জবাবে বলা যাবে, অন্ধের পক্ষে নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে যাওয়া তার বিজয়ী ধারণা

ভিত্তিতে সম্ভব। এভাবে যে, তার স্ত্রীর সাথে ফুলশয্য হয়েছে, তাকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই তার স্ত্রী। যদিও সে নিজে তাকে চিনে না। তাহলেও তার সাথে তার সঙ্গম করা জায়েয। তেমনি কোন দাসী-কন্যার হাদিয়া কবুল করাও জায়েয। কেননা নবী করীম (স) তাই বলেছেন। তার স্ত্রী সাথে সঙ্গম করার জন্যে তার এগিয়ে যাওয়া জায়েয।

যদি কেউ তাকে জায়দ সম্পর্কে এই খবর দেয় যে, সে অঙ্গীকার করেছে বা বিক্রয় করেছে কিংবা 'কযফ' করেছে, তাহলে যার বিষয়ে তাকে খবর দেয়া হয়েছে, তার বিষয়ে তার সাক্ষ্যদান জায়েয নয়। কেননা সাক্ষ্যদানের একমাত্র নিয়ম হল দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রত্যক্ষ দর্শন। আর অন্যান্য যত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বিজয়ী ধারণাকে ভিত্তি করা জায়েয। একজনের কথা কবুল করাও জায়েয। কিন্তু সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে তা ভিত্তি হতে পারে না।

তবে যদি সাক্ষী হতে বলা হয় তার দৃষ্টিমান থাকা অবস্থায় এবং পরে সে অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব গ্রহণকাল কার্যত সাক্ষ্যদানের সময়কালীন অবস্থার তুলনায় অধিক দুর্বল হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না। তার প্রমাণ হল সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব কাফির বা ক্রীতদাস কিংবা বালক অবস্থায় গ্রহণ করা হলে, পরে স্বাধীন, মুসলিম, পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় কার্যত সাক্ষ্য দিলে তা-ও জায়েয হবে না। যদিও এ শেষোক্ত অবস্থার লোকের সাক্ষ্য সাধারণত গ্রহণ করা যায়। আর যদি সে বালক বা ক্রীতদাস; কিংবা কাফির অবস্থায় সাক্ষ্যদানের কাজ করে, তাহলে তা জায়েয হবে না। বোঝা গেল, দায়িত্ব গ্রহণ কাল দায়িত্ব পালন কালটির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত। অন্ধের পক্ষে সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব গ্রহণ করাই সঠিক নয়। তার অন্ধত্বই তার এ দায়িত্ব গ্রহণের পথে বড় বাধা। তাই সে সাক্ষ্যদান সহীহ্ হওয়াও অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। যদি কাউকে সাক্ষী বানানো হয়, তার ও তার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার সাক্ষ্যদান কথাই সহীহ হতে পারে না। অনুরূপভাবে কার্যত সাক্ষ্য দানের পথে কোন প্রতিবন্ধক হলেও তার সাক্ষ্যদান জায়েয হবে না। আর অন্ধত্ব হচ্ছে এ প্রতিবন্ধক তারও যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে তার মাঝে। অতএব সাক্ষ্য দান জায়েয হবে না। ইমাম আবূ ইউসূফ এ দুটির মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন হলে সেই ভিত্তিতে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব গ্রহণ সহীহ হবে। পরে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দানকালে সে হয়ত অনুপস্থিত বা মরে গেছে, তাহলে তার সাক্ষ্য দান জায়েয হওয়ার পথে তা বাধা হবে না। তেমনি সাক্ষীর অন্ধত্ব যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, তার মৃত্যু বা অনুপস্থিতির সমান। তাই তার সাক্ষ্য কবুল হওয়া নিষিদ্ধ হবে না।

এর জবাব দুই ভাবে দেয়া যায়। একটি এই যে, সাক্ষীকে তার নিজ সত্তার দিক দিয়ে গণ্য করা। সে যদি সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে। আর যদি সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সম্পন্ন না হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। আর অন্ধ ব্যক্তির অন্ধত্ব তার সাক্ষ্যদানের যোগ্য হওয়ার পথে বাধা। তাই অন্য কারোর প্রেক্ষিত গণ্য করা হবে না। আর অনুপস্থিত ও মৃত— এ দুজনের ব্যাপারে সাক্ষীর সাক্ষ্যদান সহীহ, যদি তাকে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া থেকে বহিষ্কৃত করার মত কিছু সম্মুখে এসে না পড়ে। যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তার অনুপস্থিতি বা মৃত্যু সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। অতএব তার সাক্ষ্য জায়েয হবে।

আর দ্বিতীয় দিক হল, মৃত ও অনুপস্থিতের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানকে আমরা জায়েয মনে করি না। তবে তার পক্ষ থেকে বাদীই যদি তাকে হাজির করে, তাহলে তার ব্যাপারে সাক্ষ্যদান হবে। তখন তার উপস্থিতি অনুপস্থিতি ও মৃতের উপস্থিতির স্থলাভিষিক্ত হবে। আর অন্ধ উপস্থিত বাদী ছাড়া অন্যের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের অর্থে। তাহলে তার সাক্ষ্যদান সহীহ্ হবে না। তারা যদি আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তোমরা যখন কোন পারস্পরিক ঋণের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে'-কে দলীল হিসেবে পেশ করে, সেই সাথে আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাহলে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষ্য বানাবে' এবং 'যাদেরকে সাক্ষী বানানো তোমরা পছন্দ কর তাদের থেকে' অন্ধ ব্যক্তিও অনেক সময় পছন্দনীয় ব্যক্তি হয়ে থাকে, সে তো আমাদের স্বাধীন পুরুষদের মধ্যেরই লোক, তাহলে বাহ্যিক বিবেচনায়ই তার সাক্ষ্য কবুল হওয়া উচিত।

এর জবাবে আমরা বলব, আয়াতটি বাহ্যত প্রমাণ করে যে, অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল না হওয়া উচিত। কেননা আয়াতের শব্দ হল وَاسْتَشْهِدُوا। 'এবং তোমরা সাক্ষ্য চাও' কিন্তু অন্ধ ব্যক্তির নিকট সাক্ষ্য চাওয়া যায় না। কেননা তার নিকট সাক্ষ্য চাওয়ার অর্থ, যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে সেটিকে তার সম্মুখে উপস্থিত করতে হবে, তার দ্বারা সেটিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়, যা উপস্থিত, তা প্রত্যক্ষ করা যাবে কি করে ? কেননা অন্ধত্ব তার ও সেই জিনিসের মাঝে প্রতিবন্ধক। যেমন প্রাচীর। যদি উক্ত দুটি জিনিসের মাঝে একটা দেয়াল থাকে, তাহলে তার এক পাশ থেকে অপর পাশ দেখা যেতে পারে না। আর 'শাহাদত' (প্রত্যক্ষ দর্শন) যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, তা প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর নির্ভরশীল, সাক্ষ্য দিয়ে যে জিনিসের উপর কারোর হক প্রতিষ্ঠিত করা লক্ষ্য, সেই অবস্থায়ই তার প্রত্যক্ষ দর্শন জরুরী। কিন্তু অন্ধের বেলায় তা অসম্ভব। কাজেই তার সাক্ষ্য বাতিল হওয়া অনিবার্য। এ হচ্ছে আয়াতের বক্তব্য, আয়াতের প্রমাণ। আয়াতটিই দলীল হচ্ছে তার সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার। তা জায়েয প্রমাণের অপেক্ষা নাজায়েয প্রমাণ করে অধিক বলিষ্ঠভাবে।

ইমাম জুফর বলেছেন, অন্ধের সাক্ষ্য জায়েয নয়, তা অন্ধ হওয়ার আগের কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিক বা পরের কোন বিষয়ে। তবে বংশের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য চলবে। তা এভাবে যে, সে বলবে, অমুকে অমুকের পুত্র, সে অমুকের পুত্র, সে অমুকের পুত্র।

আবূ বকর বলেছেন, ইমাম জুফর বংশের ব্যাপারে অন্ধের সাক্ষ্যদান সহীহ বলেছেন সম্ভবত একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে। তা সাক্ষী প্রত্যক্ষ না দেখলেও দিতে পারে। তাই কারোর বংশের ধারাবাহিকতার খবর যখন অন্ধের কানে বারবার নানাভাবে পৌঁছায়, তখন সে বিচারকের সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। এটা সহীহ হওয়ার ভিত্তিতে যুক্তি দেখানো হয় যে, রাসূলে করীম (স) থেকে যার হুকুম মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত, সে বিষয়ের খবর দানের অন্ধ ও দৃষ্টিমান অভিন্ন। যদিও তারা দুজনই তা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পায়নি। তারা লোকদের দেয়া খবর শুধু শুনতেই পেয়েছে, তবুও। অনুরূপভাবেই 'মুতাওয়াতির' পদ্ধতিতে কোন বংশ তালিকার শুদ্ধতার জ্ঞান লাভ করেছে, তা বর্ণনা করা তার জন্যে জায়েয। যদিও তারা তার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে নি। তখন তার বলে সাক্ষ্য কায়েম করা সহীহ্ হবে। আর এ বিষয়ে তার দেয়া সাক্ষ্যও কবুল করা যাবে। এ সব ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার বিষয়টির প্রত্যক্ষ দর্শন কোন শর্ত নয়।

মরুবাসীর নগরবাসী সম্পর্কে সাক্ষ্যদান বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, লায়স, আওজায়ী ও শাফেয়ী বলেছেন, তা জায়েয, যদি সততা ও ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয়। জুহরীরও এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে অহব মালিকের এ মত বর্ণনা করেছেন যে, নগরবাসীর বিষয়ে মরুবাসীর সাক্ষ্যদান জায়েয নয়। তবে যখমের বিষয়ে জায়েয আছে। ইবনুল কাসিম তাঁর এ মত বর্ণনা করেছেন, নগরবাসীর ব্যাপারে মরুবাসীর সাক্ষ্য শহরাঞ্চলে জায়েয হবে না। তবে সফরে গিয়ে নগরবাসী যদি অসিয়ত করে থাকে তাহলে সে বিষয়ে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে জায়েয হবে। তবে তা জায়েয হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে মরুবাসীর সততা ন্যায়পরতা সম্পন্ন হওয়া।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আয়াতের দলীলসমূহের আলোকে এ পর্যন্ত স্বাধীন পূর্ণ বয়স্কের সাক্ষ্য কবুল হওয়া পর্যায়ে যা কিছু বলেছি, তাতে মরুবাসী ও নগরবাসীর অভিন্নতাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা সম্বোধনে ঈমানকে ভিত্তি করা হয়েছে, যারা ঈমানদার তাদের সকলের জন্যেই সে হুকুমটি পালনীয়। কেননা 'হে ঈমানদার লোকেরা' বলা হয়েছে, আর ওরা সকলেই তো ঈমানদার। পরে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষ্য বানাও'-এর অর্থ মুমিন স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। এ পরিচিতিও ওদের সকলেরই, পরে বলেছেন ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদের পছন্দ কর' তাদের মধ্য থেকে তারা যদি সততা ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয় তবে তারাও তা-ই হতে পারে। তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া বা বিচ্ছেদ ঘটানো পর্যায়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ -

এবং তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন লোককে সাক্ষী বানাও।

এই পরিচিতিটাও তাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে নগরবাসী ও মরুবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হলে আয়াতসমূহের সাধারণ ও নির্বিশেষ প্রয়োগ হতে পারে না। না হওয়ার সমর্থনে কোন দলীলও নেই। আর তারা সকলেই যে এসব সম্বোধনে শরীক, সে বিষয়ে কোন মতভেদও নেই।

কেননা তাঁরা এক মরুবাসীর জন্যে অপর মরুবাসীর সাক্ষ্যকে জায়েয মনে করেন আয়াতটির আরোপিত শর্তের ভিত্তিতে। আর তারা যখন আয়াতের বক্তব্যের মধ্যে শামিল তখন নগরবাসীর ব্যাপারেও তাদের সাক্ষ্য জায়েয হওয়ারই দাবি করছে আয়াতটি। কেননা তাদের পরস্পরের বিষয়ে পরস্পরের সাক্ষ্যদান জায়েয হওয়াই আয়াতটির দাবি আর এ হিসেবেই আয়াতটির দাবি হচ্ছে নগরবাসীর সাক্ষ্যদান মরুবাসীর ব্যাপারে জায়েয।

তারা যদি একটি হাদীসকে দলীল বানাতে পারে। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে সায়ন ইবনে ইসহাক, আত-তস্তরী, হারমালাতা, ইবনে ইয়াহইয়া, ইবনে অহব, নাফে ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল হাদী, মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আতা ইবনে ইয়াসার, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ

لَاتَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِى عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ -

মরুবাসীর নগরবাসীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দান জায়েয নয়।

কিন্তু এ ধরনের হাদীসের কুরআনের বাহ্যিক তাৎপর্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো বাঞ্ছনীয় নয়। সেই সঙ্গে একথাও যে, তাতে যখম ও অ-যখমের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ নেই। মরুবাসী সফরে থাকুক, কি নিজ ঘরে উপস্থিত থাকুক, এর-মধ্যেও পার্থক্য নেই। উক্ত হাদীসকে দলীল বানালে তার সাধারণ তাৎপর্যের বিরুদ্ধতা করা হবে।

অথচ সামাক ইবনে হরব ইকরামা— ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, একজন মরুবাসী রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। তখন নবী করীম (স) হযরত বিলাল (রা)-কে কাল থেকে যেন সকলে রোযা রাখে জনগণের মধ্যে এ ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন অর্থাৎ রাসূলে করীম (স) মরুবাসীর চাঁদ দেখার সাক্ষ্যকে কবুল করে নিলেন এবং লোকদেরকে রোযা রাখতে শুরু করার ঘোষণা দেওয়ায়ে দিলেন। হতে পারে, মরুবাসীর রাসূলের নিকট সাক্ষ্যদানের এ হাদীসটি, যা আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি তার বিপরীত কথা জানতে পেরেছেন। ফলে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়। অথচ আবূ হুরায়রা (রা) তারই খবর দিয়েছেন। পরবর্তী বর্ণনাকারীরা কারণ উল্লেখ না করেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ-ও সম্ভব যে, মরুবাসী ব্যক্তি সেই সময়ে কথাটি বলেছিল, যখন শিরক ও মুনাফিকী দুটিই তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ -

আর মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা তারা যা খরচ করে তাকে জরিমানারূপে মনে করে এবং তোমাদের উপর বিপদ-আপদের আবর্তনের অপেক্ষা করছে।

(সূরা তওবা ঃ ৯৮)

যে সব মরুবাসীর এ পরিচিতি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। মরুবাসীদের অন্যান্য লোকদের পরিচয়স্বরূপ এর পরে আর একটি আয়াতে তাদের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ -

এ মরুবাসীদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার। আর যা কিছু ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দো'আ লাভের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে। (সূরা তওবা ঃ ৯৯)

মরুবাসীদের পরিচিতি যাদের, তারা নিশ্চিয়ই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় ও মুসলমানদের নিকট গ্রহণীয়। তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয় হবে।

তাই এ পরিচিতি যাদের, তারা নিশ্চিয়ই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় ও মুসলমানদের নিকট গ্রহণীয়। তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণীয় হবে।

মরুবাসীদের সাক্ষ্য নগরবাসীদের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে না— হয় তাদের দ্বীনি দোষ-ক্রটির কারণে, অথবা তারা সাক্ষ্যদানের বিধি-বিধান ও কিভাবে সাক্ষ্য দিতে হয়, তার নিয়ম-পদ্ধতি জানে না এ কারণে। যদি তাদের দ্বীনী দোষ-ক্রটির কারণে হয়ে থাকে, তাহলে

তাদের সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। আর এ দিক দিয়ে নগরবাসী ও মরুবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর যদি সাক্ষ্য সংক্রান্ত শরীয়াতী হুকুম-আহকাম তাদের না-জানার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে মরুবাসীদের ব্যাপারেও নগরবাসীদের সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়াই উচিত, যেমন মরুবাসীদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না নগরবাসীদের ব্যাপারে।

যদি মরুবাসীর সাক্ষ্য যখমের ব্যাপারে গৃহীত না হয়, আর সফরে নগরবাসীর ব্যাপারেও গৃহীত না হয়, যেমন নরবাসীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় না উক্ত পরিচিতির অধিকারী হয়েও। আর মরুবাসী সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ জরুরী হয়; সেই সাথে সাক্ষ্যদানের হুকুম-আহকাম, ওজনে— নগরবাসীর ব্যাপারে, আর অন্যদের ব্যাপারেও— সাক্ষ্য কবুল না হওয়ার কারণ দূর হওয়ার দরুন। তখন তাকে মরুবাসী নামে অভিহিত না করাই উচিত। তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানের কারণ তার মধ্যে আছে, একথা না বলাই বাঞ্ছনীয়। যেমন নগরবাসীর নগরবাসী হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্য জায়েয হওয়ার কথা বলা উচিত নয়। যদি তারা সাক্ষ্য জায়েয হওয়ার শর্তের গুনাবলীহীন হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ -

যদি সাক্ষী হিসেবে দুজন পুরুষ মানুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোককে বানাতে হবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, প্রাথমিকভাবে দুজন সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে। আর তার দুজনই হল সাক্ষী! কেননা আরবী শব্দ 'শাহেদ' ও 'শহীদ' একই অর্থবোধক। যেমন 'আলীমুন' ও 'আলেমুন' 'কাদেরুন' ও কাদিরুন' একই অর্থ দেয়। এরপর সংযোজিত হয়েছে এ কথা ঃ 'তবে তারা দুজন যদি দুজন পুরুষ না হয়' অর্থাৎ সাক্ষীদ্বয় যদি দুজন পুরুষ না হয়, 'তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে লোক।' প্রথম বাক্যাংশ 'ওরা দুজন যদি দুজন পুরুষ না হয়' বলে হয় একথা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, দুজন পুরুষ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক হতে হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا -

তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে মাটির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ কর।

অথবা যেমন বলেছেন ঃ

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآ سَّا -

তাহলে দুজন পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্তকরণ। (সূরা মুজাদিলা ঃ ৩)

তারপর বলেছেন ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ -

যদি না পায়, তাহলে দুই মাস রোযা। (সূরা মুজাদিলা ঃ ৪)

.... শেষে ঃ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا -

যে লোক সামর্থ্যবান হবে না, সে ষাট জন মিসকীন খাওয়াবে। (সূরা মজাদিলা ঃ ৪)

এভাবে আরও যেখানে যেখানে আসল ফরযের অনুপস্থিতি কালে তার বদলে— তদস্থলে অন্য কিছু করতে বলা হয়েছে, তা সবই এ ধরনের কথা।

অথবা তা থেকে বলতে চাওয়া হয়েছে ঃ 'সাক্ষী দুজন যদি দুজন পুরুষ না হয়, তাহলে সাক্ষী দুজন হবে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক।' তার অর্থ, 'সাক্ষী' নামটি একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের উপর কার্যকর হল। ফলে তার সাধারণ তাৎপর্যের দিক দিয়ে সমস্ত হক্-হুকুকের ব্যাপারে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সাথে দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য গণ্য হয়ে গেল। তবে অপর কোন দলীলের ভিত্তিতে ভিন্ন কথা প্রমাণিত হলে আলাদা কথা। বোঝা গেল, দুজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত হল একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য যখন দুজন পুরুষ হবে না, তখন। এ থেকে দ্বিতীয় দিকটি প্রমাণিত হল। আর তা হল, একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোককে দুজন সাক্ষীর নাম দেয়া হল। ফলে এটা শরীয়াত মুতাবিক নাম হয়ে গেল। তাই যেখানেই দুজন সাক্ষী বানাবার আদেশ করা হয়েছে, সেখানেই এরূপ করা ফরয হয়ে গেল। দলীল ভিন্ন কিছু প্রমাণ করলে অন্য কথা। এর সাধারণ তাৎপর্যের কারণে দলীলরূপে পেশ করা জায়েয হবে রাসূলের এ কথায়, তিনি বলেছেন ঃ

لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ -

অভিভাবক ও দুজন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হতে পারে না।

বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্যে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্যের হুকুম দেয়া হল। কেননা এ তিনের সমষ্টিকেই 'দুজন সাক্ষী' নাম দেয়া হয়েছে। আর নবী করীম (স) দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিয়ে হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ধন-মালের ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষদের সাথে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য পর্যায়ে মনীষিগণের বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও উসমানুল-বত্তী বলেছেন পুরুষদের সাথে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না, শরীয়তী হদ্দ ও কিসাসে। তা ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় হক-হুকুকের ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে, বশর ইবনে মূসা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবাদ, শুবা, আল-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, আতা ইবনে আবূ রিবাহ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) বিয়েতে একজন পুরুষ ও দুইজন মেয়ে লোকের সাক্ষ্যকে জায়েয বলেছেন, জরীর ইবনে হাজিম, যুবায়র ইবনুল খরীত, আবূ লবীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উমর (রা) তালাকে মেয়েলোকের সাক্ষ্যকে জায়েয বলেছেন। ইস্‌রাইল, আবদুল আলা, মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়া আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, চুক্তিতে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য জায়েয হবে। হাজ্জাজ আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা) বিয়েতে পুরুষের সঙ্গে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য জায়েয মনে করতেন। আতা থেকে বর্ণিত তিনি তালাকের ব্যাপারে মেয়েলোকদের সাক্ষ্য জায়েয মনে করতেন। আওন শবী শুরাইহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, দাসমুক্তির ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য জায়েয মনে করতেন। শবী তালাক পর্যায়েও এ কথা বলেছেন। আল-হাসান ও দহাক দুজনই বলেছেন, মেয়েলোকদের সাক্ষ্য কেবলমাত্র সন্তান প্রসব ও ঋণের ব্যাপারে জায়েয, গ্রহণীয়। ইমাম মালিক বলেছেন, 'হদ্দ' ও কিসাসের মামলায় পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয নয়, তালাকেও নয়, বিবাহেও নয়, বংশ তালিকা

নির্ধারণেও নয়, বংশীয় আনুগত্য সম্পর্কেও নয়, নারীর ইযযত সংরক্ষণ সম্পর্কেও নয়। অবশ্য ওকালত ও অসিয়তের ব্যাপারে গ্রহণ করা যাবে, যদি তাতে দাসমুক্তির ব্যাপার না থাকে। সওরী বলেছেন, হদ্দ ছাড়া অন্যান্য সর্বব্যাপারেই নারীদের সাক্ষ্য জায়েয হবে। তাঁর থেকে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, কিসাসে তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। আল-হাসান ইবনে হাই বলেছেন, 'হদ্দ'-এর ব্যাপারে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। আল-আওজায়ী বলেছেন, বিবাহে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। লায়স বলেছেন, অসিয়তে ও দাসমুক্তিতে নারীদের সাক্ষ্য জায়েয। কিন্তু বিয়ে তালাক, হদ্দে জায়েয নয়। সেই ইচ্ছামূলক হত্যায়ও জায়েয নয়, যাতে হত্যাকারীকে দণ্ড দেয়া হবে। শাফেয়ী বলেছেন, ধন-মাল ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। অসিয়তেও জায়েয হবে না পুরুষ ছাড়া। অসিয়তে ধন-মালের ব্যাপারে জায়েয হবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দাবি হল পুরুষের সাথে মেয়েদের সাক্ষ্য সমস্ত পারস্পরিক ঋণ চুক্তিতে জায়েয হওয়ার দাবি করে। আর তা হলো ঋণের ব্যাপারে গৃহীত যে কোন চুক্তি। তার বদলে ধন-মাল কিংবা কোন দ্রব্য হোক, কি মুনাফা হোক বা ইচ্ছামূলক হত্যাকাণ্ড হোক। কেননা এর প্রত্যেকটিই এমন চুক্তি, যাতে ঋণ রয়েছে। কেননা একথা জানা আছে যে, তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে ঋণের পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে আল্লাহ্র এ কথানুযায়ী যে দুটি জিনিসের উপর চুক্তি হয়, সে দুটি দুইটি ঋণ হবে তা আয়াতের লক্ষ্য নয়। কেননা তা একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে জায়েয হবে না, তাতে প্রমাণিত হল যে, এর তাৎপর্য হচ্ছে ঋণটা কোন বদলের ঋণের অস্তিত্বের উপর ভিত্তিশীল হবে, সে যে কোন ঋণই হোক না কেন। আর তার দাবি হল, মহরে মুয়াজ্জল (মিয়াদী মহরানা) ভিত্তিক বিয়ের চুক্তির ব্যাপারে একজন পুরুষের সাথে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হওয়া, যদি তা পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি হয়। ইচ্ছামূলক হত্যার ব্যাপারে, খুলা মালের বিনিময়ে, খুলা তালাক ও ইজারাসমূহেও জায়েয হবে। কেউ যদি দাবি করেন যে, এসব চুক্তির বিষয়টা আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের বাইরে গণ্য, তা মেনে নেয়া যাবে না। অবশ্য কোন দলীল দিতে পারলে অন্য কথা। কেননা কথা বা নীতির সাধারণত্ব সর্ববিষয়ে তার জায়েয হওয়ার দাবিদার।

ধন-মালের ব্যাপারাদি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হওয়ার দলীল হচ্ছে একটি হাদীস। হাদীসটি আবদুল বাকী ইবনে কানে ও আহমাদ ইবনুল কাসিম আল জাওহারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আবূ মামার-এর ভাই মুহালাফ ইবনুল হাসান ইবনে আবূ ইয়াযীদ, আল আমাশ, আবূ অয়েল, হুযায়ফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) কবুলকারিণী ও জন্মগ্রহণ (মালের বিনিময় ছাড়া) সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। এ বিষয়ে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, মেয়েদের সাক্ষ্য কেবলমাত্র ধন-মালের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে চলবে, তা নয়। সন্তান জন্মগ্রহণ সম্পর্কেও মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয। মতপার্থক্য হচ্ছে শুধু সংখ্যার ব্যাপারে। উপরন্তু যখন 'শাহীদাইনে— দুজন সাক্ষী' কথাটি শরীয়াত অনুযায়ী একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর দুজন সাক্ষীকেই بينة। 'অকাট্য প্রমাণ' বলা হয়েছে, তখন অকাট্য প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদীর, আর কিরা করার দায়িত্ব বিবাদীর' কথাটির সাধারণ তাৎপর্য অনুযায়ী সর্বপ্রকারের মামলাতেই একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করা— রায় দেয়া— অবশ্য কর্তব্য। কেননা بينة।

কথাটি তাকে সম্পূর্ণরূপে শামিল করে। তা ধন-মালে অকাট্য প্রমাণ হতে পারে। এ শব্দটি যখন তার উপর ব্যবহৃত হতে পারে, তখন সাধারণ তাৎপর্যের দাবিতে তা সর্বপ্রকারের বাদীর জন্যেই প্রযোজ্য— তার থেকে কোন কিছু বিশেষীকরণে দলীল পাওয়া গেলে তা ভিন্ন কথা। 'হদ্দ' ও কিসাসকে আমরা বিশেষীকরণকৃত করে নিয়েছি একটি হাদীসের কারণে। হাদীসটি জুহরী থেকে বর্ণিত। বলেছেন, রাসূলে করীম (স) এবং তাঁর পর দুই খলীফার আমলে এ সুন্নাত জারি রয়েছে যে ঃ

أَنْ لَّا تَجُوْزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيْ الْحُدُوْدِ وَلَا فِيْ الْقِصَاصِ -

'হদ্দ' ও কিসাসে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয হবে না।

আর ঋণের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সাক্ষ্য কবুল করার ব্যাপারে সকলেই একমত হয়েছেন। তাই সকল প্রকারের হক-এর দাবিতে তা কবুল করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কোনরূপ সন্দেহ এ জিনিসকে বিনষ্ট করতে পারে না। কেননা ঋণ তো একটা হক্-এর ব্যাপার। তা সন্দেহের কারণে প্রত্যাহৃত হতে পারে না।

ধন-মাল ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও তা জায়েয— একথা প্রমাণ করে একথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা মিয়াদের ব্যাপারেও জায়েয রেখেছেন, যখন বলেছেন ঃ 'তোমরা যখন কোন মিয়াদের জন্যে পারস্পরিক ঋণ চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, তখন তা লিখে রেখো'। তারপরে বলেছেন ঃ 'তারা দুজন পুরুষ না হলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক।' এতে মিয়াদের উপর পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সাক্ষ্য জায়েয করা হয়েছে। অথচ তা ধন-মালের ব্যাপারে নয়। যেমন— তা জায়েয করেছেন ধন-মালের ব্যাপারেও।

যদি বলা হয়, মিয়াদ তো ধন-মালের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হয়।

তাহলে জবাবে বলা হবে, একথা ভুল। কেননা মিয়াদ কিফালতের ব্যাপারেও হয়ে থাকে। সে কিফালত ব্যক্তির হোক, কি স্বাধীন লোকদের অর্জিত মুনাফার ক্ষেত্রে হোক— যা ঠিক ধন-মাল নয়। অনেক সময় শাসক-বিচারক খুনের ব্যাপারে বা তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার দাবির ব্যাপারে 'অকাট্য প্রমাণ' পেশ করার ব্যাপারে একটা মিয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়। কাজেই একথা বলা যে, মিয়াদ কেবল ধন-মালের লেনদেনের ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করা হয়, কথাটি ঠিক নয়। তা সত্ত্বেও দ্রব্য-সামগ্রী মাল ছাড়া পাওয়া যায় না। বিয়েও সঙ্ঘটিত হয় না মাল ছাড়া। অতএব তাতে মেয়েদের সাক্ষ্য গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষীদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর, তাদের থেকে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, লোকদের দিয়ানতদারী আমানতদারী ও সততা-ন্যায়পরতা চিনতে ও জানতে পারা কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবেই সম্ভব, প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তবতা কতখানি, তা জানা সম্ভব নয়। কেননা তাদের হৃদয়-মনের গোপন মণিকোঠায় কি লুক্কায়িত রয়েছে, তা জানা যায় না। জানতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তার পরেও আল্লাহ সাক্ষীর ব্যাপারে তা গণ্য করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন এ আয়াতাংশের মাধ্যমে। বোঝাগেল, সাক্ষীদের

সততা-ন্যায়পরতা নির্ধারণের ব্যাপারে, তাদের কর্মনীতির সুস্থতা ও সুসংবদ্ধতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা-বিবেচনা করার পর বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে রায় ঠিক করতে হবে। হতে পারে কতক লোকের ধারণা কোন সাক্ষীর সততা-ন্যায়পরতার ব্যাপার প্রবল হবে। ফলে তারা তাকে পছন্দ করবে। সে সময়ই অপর কিছু লোকের হয়ত সে ধারণা হবে না। তাহলে 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদের পছন্দ করবে' কথাটি বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে কার্যকর হবে। তাতে অধিকাংশ লোকের রায়কেই অগ্রগণ্য মনে করতে হবে। আসলে তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে সাক্ষ্যের ব্যাপারটি গড়ে উঠে।

তার একটি হল العدالة সততা-ন্যায়পরতা, দ্বিতীয় হল কোনরূপ খারাপ কাজের অভিযোগ তার উপর না থাকা, সততা— ন্যায়পরতা থাকা সত্ত্বেও। আর তৃতীয় হল জাগৃতি, স্মরণশক্তি ও অসাবধানতার স্বল্পতা। প্রথমটি العدالة —তার মূল হল ঈমান, কবীরা গুনাহ্ পরিহার ও ওয়াজিব-সুন্নাতে আল্লাহ্র হক যথাযথ আদায় করতে থাকা। কথার সত্যতা ও আমানতদারী। আর যিনার মিথ্যা অভিযোগ করায় দণ্ডিত না হওয়া।

আর কোনরূপ খারাপ কাজের অভিযোগ অভিযুক্ত না হওয়ার ব্যাপারটি এ জন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, যার জন্যে সাক্ষ্যদান সে যদি পিতা বা সন্তান কিংবা স্বামী বা স্ত্রী না হয়, আর এ সাক্ষ্য সে আর কখনও দিয়েছে ও তার সে সাক্ষ্য তুহমাতের কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এমন না হয়— হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তার কারণ উপরে বলে এসেছি। আর তারা যদি সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন ও পছন্দনীয় হয় ....।

আর জাগৃতি, স্মরণশক্তি ও অসাবধানতার স্বল্পতার শর্ত এ জন্যে যে, যদি তারা অসর্তক না হয়, ব্যাপারাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ না হয়, তাহলে তার মতো লোককে কিছু কথা শেখালে তারা শিখতে পারে। অনেক সময় তার উপর মিথ্যাকে জোরদার বানানো হয়, ফলে সে তারই সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে একজন অনারব রোযাদার তাহাজ্জুদগুজার কিন্তু অসতর্ক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, তার ব্যাপারে ভয় হচ্ছে, তাকে কোন বুঝ দিলে সে তা গ্রহণ করবে— এ ব্যক্তি সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে ফাসিকের চাইতেও অধিক খারাপ।

আবদুর রহমান ইবনে সামা আল-মুহবির আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা, আসওয়াদ ইবনে আমের, ইবনে হিলাল, আশয়াস আল-হাদালী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আল-হাসানকে বলেছেন, হে আবূ সাঈদ, আয়াস তো আমার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন তিনি উঠে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আয়াসের নিকট গেলেন। বললেন ঃ হে মালকায়ান! তুমি এর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছ কেন ? তোমার নিকট কি রাসূলে করীম (স)-এর এ কথা পৌঁছেনি, তিনি বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ مِنْ ذَبِيْحَتِنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ -

যে লোক আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের যবেহ্কৃত জন্তুর গোশ্ত আহার করবে সে-ই সেই মুসলিম, যার জন্যে আল্লাহ্র যিম্মা ও তাঁর রাসূলের যিম্মা রয়েছে। তারপরে তিনি বললেন, হে শায়খ! আপনি কি শুনেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, তাদের মধ্য থেকে।

আর তোমার এ সঙ্গী সেই পছন্দনীয় লোক নয়।

আবদুল বাকী ইবনে কানে, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহহাব, সরী ইবনে আসেম সূত্রে সনদ সহকারে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আয়াস ইবনে মুআবিয়ার নিকট আল-হাসানের সঙ্গীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল। আয়াস তার সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই কথা আল-হাসানের নিকট পৌছল। বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল। পরে তিনি আয়াসের নিকট এলেন। বললেন, হে ইয়ালকা', তুমি তো একজন মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ করেছি! বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাকে পছন্দ কর, তাকে সাক্ষী বানাও।' কিন্তু ও লোকটি পছন্দনীয় লোকদের মধ্যে গণ্য নয়। এরপর আল-হাসান চুপ হয়ে যান। শায়খের প্রতিপক্ষ বললেন, সাক্ষ্যের জন্যে পছন্দের ও সন্তুষ্টির শর্ত হচ্ছে, সাক্ষীকে অবশ্যই জাগ্রতমনা, সচেতন, যা শুনবে তা স্মরণ রাখতে সক্ষম, সতর্কতার সাথে সাক্ষ্যদানকারী হতে হবে। বশর ইবনুল ওয়ালীদ আবূ ইউসূফ থেকে العدل -এর পরিচিতিতে কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। একটি হল, যে সব নির্লজ্জ কাজের দরুন 'হদ্দ' জারী হওয়া ওয়াজিব এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজ থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। ফরযসমূহ যথারীতি আদায়কারী হতে হবে। পবিত্র ও নেককারীর চরিত্র হতে হবে। অধিকাংশ সগীরা গুনাহ্ও ত্যাগকারী হতে হবে। তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব। কেননা একেবারে বেগুনাহ্ হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তার গুনাহ্ পবিত্র চরিত্রতার অধিক হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য আমরা প্রত্যাখ্যান করব। যে লোক শতরঞ্চ ও দাবা খেলে, তাতে জুয়া ধরে বা যে লোক কবুতর খেলায় রত থাকে, তাকে উড়ায়, তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না। অনুরূপভাবে যে লোক খুব বেশি মিথ্যা কিরা-কসম করে, তার সাক্ষ্য জায়েয নয়। যে লোক জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্তের নামায তরক করে, জামা'আতে শরীক হওয়াকে হালকা করে বা ঠাট্টা করে, কিংবা অপরাধ হিসেবে বা শরীয়াতের সীমালংঘন হিসেবে, তার সাক্ষ্যও জায়েয হবে না। কোন ব্যাখ্যাকার যদি জামা'আত ত্যাগ করে এবং তা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয়, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। যদি কেউ স্থায়ীভাবে ফজর নামাযের দুই রাক'আত ত্যাগ করে, তার সাক্ষ্যও গৃহীত হবে না। যদি কেউ নির্লজ্জ মিথ্যা বলায় খ্যাতিমান হয়, তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না। যদি সে ভাবে সে পরিচিত নাও-হয়। অনেক সময় মানুষ এমন ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ে, যাতে মন্দের বদলে ভালো ও কল্যাণের মাত্রা অধিক, তাহলে তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে। গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তো কেউ হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, নফসের খাহেশের পেছনে চলা লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। তবে তাদেরকে সততা, ন্যায়পরতা সম্পন্ন হতে হবে। তবে রাফেযী— যাদেরকে 'কিতাবীয়া' বলা হয়— শুনেছি তাদের কতক লোক তাদের পরস্পর যখন হলপ করে তখন তারা কতক অন্য কতককে সত্যবাদী বলে দাবি করে, তাই আমি তাদের সাক্ষ্যকে বাতিল করি।

আবূ ইউসূফ বলেছেন, যে ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণকে প্রকাশ্যে গালাগাল করে, আমি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি না। কেননা যে ব্যক্তি লোকদেরকে গালাগাল করে, প্রতিবেশিকে গালমন্দ করে, তার সাক্ষ্য আমি কবুল করব না। অথচ রাসূলের সাহাবীগণ তো সর্বাধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

আবূ ইউসূফ বলেছেন, রাসূলের সাহাবীগণ পরস্পরে মতপার্থক্য করেছেন, মারামারি, যুদ্ধ বিগ্রহ-ও করেছেন। তা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের লোকদের সাক্ষ্য নিশ্চয়ই জায়েয হবে। কেননা তাঁরা পারস্পরিক যুদ্ধ করেছেন একটা ব্যাখ্যার পার্থক্যের কারণে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী খাহেশের অনুসারীরাও তেমনি।

আবূ ইউসূফ বলেছেন, তার বিষয়ে আর কাকে জিজ্ঞাসা করেছ? তখন তারা বলল, আমরা তাকে রাসূলের সাহাবীদেরকে গাল দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করছি। অতএব আমি গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা না বলবে যে, গালাগাল দিতে আমরা শুনেছি।

যদি বলে যে, আমরা যদি তাকে ফিসক ফুজুরীর দোষে দোষী করি এবং তার সম্পর্কে সেই ধারণাই করি, কিন্তু দেখিনি কখনও, তাহলে আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। এ দুজনার মধ্যে পাথ্যর্ক হল, যারা বলে যে, আমরা তাকে গালাগাল দেয়ার দোষে দোষী করছি, তার জন্যে তারা কল্যাণ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছেন, আমরা তাকে গাল দেয়ার দোষে দোষী করছি। কিন্তু একথা না শুনতে পাওয়া পর্যন্ত তা কবুল করা যাবে না। যারা বলে যে, আমরা তাকে ফিস্‌ক-ফুজুরী দোষে দোষী করছি। আর তার প্রতি আমরা ধারণাও তাই করি। তবে আমরা তাকে দেখিনি। আমি তা কবুল করব, তার সাক্ষ্যদানকে আমি জায়েয বলব না। তারাও তার জন্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করেছে। তার সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণ করেছে।

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ থেকে উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, আমি খাওয়ারিযমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি না। কেননা ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই বিদ্রোহ করেছিল।

বললেন, তাদের সাক্ষ্য কেন জায়েয মনে করেন না, অথচ আপনি হারুরিয়ার ঘটনায় জড়িত লোকদের সাক্ষ্য— শাহাদাত— জায়েয মনে করেন? বললেন, তা এ কারণে যে, তারাও আমাদের ধন-মাল হালাল মনে করেনি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিদ্রোহ করেনি। যখন তারা বিদ্রোহ করেছে, অমনি আমাদের ধন-মালকেও হালাল মনে করতে শুরু করেছে। অতএব বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত তাদের সাক্ষ্যও জায়েয।

আমাদের নিকট আবূ বকর মুকররম ইবনে আহমাদ, আহমাদ ইবনে আতীয়াতা আল-কুফী বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে সামায়াতাকে বলতে শুনেছি, আবূ ইউসূফকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি ঃ বখিল বা কৃপণের সাক্ষ্য গ্রহণ বিচারক শাসকের পক্ষে জরুরী নয়। কেননা কৃপণ ব্যক্তিকে তার কার্পণ্য অনেক দূরে নিয়ে যায়। তখন সে তার হক্-এর উপরে নিয়ে যায় ধোঁকাবাজির ভয়কে। আর যে ব্যক্তি এরূপ হবে সে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন (عدل) হতে পারে না। আমি হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, আমি ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি ঃ আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُوْنُوْا وَسَطًا لَاتَكُوْنُوْا بُخَلَاءَ وَلَاسَقَلَةً فَاِنَّ الْبَخِيْلَ وَالسَّقَلَةَ الَّذِيْنَ اِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ لَمْ يُؤَدُّوْهُ وَاِنْ كَانَ لَهُمْ حَقٌّ اِسْتَقْصَوْهُ -

হে জনগণ! তোমরা মধ্যম নীতির অনুসারী হও এবং কৃপণ হবে না, পাতলা কোমরওয়ালা হবে না। কেননা কৃপণ ও পাতলা কোমর লোকেরা এমন হয় যে, তাদের উপর কারোর হক ধার্য হলে তারা তা আদায় করে না। আর তাদের হক যদি অন্যদের উপর ধার্য হয়, তাহলে তারা তা জোর করে হলেও আদায় করে নেয়।

তিনি আরও বলেছেন, দূরে সরে থাকা মুমিনের প্রকৃতি নয়। দানশীল ব্যক্তি কখনই দূরে সরে থাকা (কার্পণ্যের) নীতি গ্রহণ করে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ -

(নবী তার স্ত্রীকে) এই বিষয়ে কতকটা সতর্ক করেছিল, আর কতকটা বাদ দিয়েছিল।

আমাদের নিকট মুকররম ইবনে আরমাদ, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসলিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আল-হামানীকে বরতে শুনেছি, আমি ইবনুল মুকাররমকে বলতে শুনেছি, আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, যার কার্পণ্য থাকবে, তার সাক্ষ্য জায়েয হবে না। কার্পণ্য তাকে দূরে নিক্ষেপ করে। সে তার দূরবর্তীর তীব্রতায় ধোঁকার ভয় পায়। ফলে সে তার হক-এর ঊর্ধ্বে স্থান দেয় ধোঁকার ভয়কে। ফলে সে সততা-ন্যায়পরতার ধারক হতে পারে না।

আয়াস ইবনে মুআবিয়া থেকে এ রকম আরও অনেক বর্ণনার দৃষ্টান্ত আছে। ইবনে লাহইয়াতা আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি আয়াস ইবনে মুআবিয়াকে বললাম, আপনি জানিয়েছেন যে, আপনি ইরাকের উচ্চমানের লোকদের কৃপণদের এবং সমুদ্রগামী ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য জায়েয মনে করেন না। বললেন, হ্যাঁ, তাই। তবে যারা ভারতের দিকে সমুদ্র যাত্রা করে, তারা তাদের দিয়ত নিয়ে ধোঁকাবাজি করে, আর দুনিয়ার স্বার্থের লালসায় পড়ে তাদের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাই আমি বুঝেছিলাম যে, আমি যদি কোন সাক্ষ্যে তাদের একজনকে দুই দিরহাম দিই, তাহলে সে তার ঋণে ধোঁকাবাজি করতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। আর যারা ফারেস (পারস্যের) গ্রাম নগরে ব্যবসায় করে, তারা সূদে তাদেরকে লালায়িত বানায় জেনে শুনে। এ কারণে আমি সূদখোরদের সাক্ষ্যদানকে জায়েয ঘোষণা করতে অস্বীকার করেছি। আর ইরাকের শরীফদের অবস্থা এই যে, কোন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা যখন তাদের কারোর উপর আসে, তখন তাদের সরদারের নিকট আসে ও তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, সুপারিশ করে। তখন আমি আবদুল আ'লা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর-এর নিকট বলে পাঠালাম যে, সে যেন আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নিয়ে না আসে।

আগের কালের ফিকাহবিদদের থেকে বর্ণনা এসেছে, তাঁরা এমন লোকদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন, যাদের থেকে এমন সব ব্যাপারাদি প্রকাশিত হতো, যাতে তার কর্তার ফাসিকী তা কাটাতে পারত না। তবে তা তাদের দুর্বলতা কিংবা ভাঁড়ামি প্রমাণ করত। এ কারণে তাদের ও

তাদের মতো লোকদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা জরুরী মনে করেছেন। এ পর্যায়ের একটি বর্ণনা, যা আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, মাহমুদ ইবনে খান্দাশ, জায়দ ইবনুল হুবাব, দাউদ ইবনে হাতিমুল বসরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, বসরায় নিযুক্ত বিলাল ইবনে আবূ বুরদাতা সে লোকের সাক্ষ্য জায়েয বলতেন না, যে মাটি খায় ও দাড়ি উৎপাটিত করে। আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে হাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ, শুরাইহ, ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়মান, ইবনে জুরাইয সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মক্কার অধিবাসী ছিল। সে উমর ইবনে আবদুল আজীজের নিকট সাক্ষ্য দিল। সে লোকটি তার বাচ্চার দাড়ি উৎপাটিত করত এবং তার দাড়ি ও তার গোঁফের চারপাশের দাড়ি রেখে দিত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি ? বলল, অমুক। বললেন, তুমি তোমার নামের উৎপাটনকারী। এই বলে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলেন।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে সাদ, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ, আল-জায়দ ইবনে যকওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার সাক্ষীকে বিচারপতি শুরাইহর নিকট ডাকলো। তার নাম ছিল রবীআতা। বললেন, হে রবীআতা! হে রবীআতা! সে কোন জবাব দিল না। পরে ডাক দিলেন, হে রবীআতাল কুয়াইফির বলে। তখন সে ডাকের সাড়া দিল। বললেন, আমি তোমার নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু তুমি তার কোন জবাব দিলে না। যখন তোমাকে 'কুফর' মিলিয়ে ডাকলাম, তখন তুমি ডাকে সাড়া দিলে, এর কারণ কি ? তখন সে বলল, আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন। রবীআতা হল আমার উপনাম— লকব। তখন বললেন, উঠ, দাঁড়াও। তার পক্ষকে বললেন, অন্যদেরও নিয়ে আস।

আবদুল বাকী আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ, তাঁর পিতা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম, সাঈদ ইবনে আবূ আরুবাতা, কাতাদাতা, জাবির ইবনে জায়দ, ইবন আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নির্জলা মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য জায়েয নয়। হাম্মাদ ইবনে আবূ সালমা, আবুল মুহজিম, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, দাস প্রথার ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য জায়েয নয়। শুরাইহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, ঘুঘু, কবুতর শিকারীর সাক্ষ্য জায়েয মনে করতেন না। মুসমির বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি শুরাইহ্র নিকট সাক্ষ্য দিল তার লম্বা জামার আস্তিন ছিল সংকীর্ণ। পরে তিনি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। বললেন, ও লোকটি অযূ করে কিভাবে এরূপ পোশাক পরা অবস্থায় থাকে ?

আবদুল বাকী ইবনে কানে মুয়ায ইবনুল মুসান্না, সুলায়মান ইবনে হরব, জরীর ইবনে হাজিম, আল-আ'মাশ, তমীম ইবনে সালামাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি শুরাইহ্র নিকট সাক্ষ্য দিল। সে বলল, আমি আল্লাহ্র সাক্ষ্যে সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর আমি আজ তোমার কোন সাক্ষ্যই জায়েয ধরে নেব না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, শুরাইহ্ যখন লোকটির মধ্যে বাড়াবাড়ি কৃত্রিমতা দেখলেন, যা তার কর্তব্যভুক্ত নয়, তখন তার সাক্ষ্য কবুলের মানদণ্ডে তাকে উত্তীর্ণ মনে করতে পারলেন না। আমরা এখানে যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করলাম, তা আগের কালের মনীষীদের সম্পর্কে। তাঁরা উল্লিখিত কারণসমূহের দরুন তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা জরুরী মনে করেছেন। তবে

এগুলোর কর্তাদের ফাসিকী সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয়নি। তাদের সততা-ন্যায়পরতাও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। এসব ঘটনা তাদের ভাঁড়ামি প্রমাণ করেছে মাত্র। এরই কারণে তারা তাদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এসব লোক উদ্ধৃত কার্যকলাপের দরুন এ আয়াতের আলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তা হল ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর, তাদের মধ্য থেকে—

আর তাঁরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের মুজতিহাদ অনুযায়ী। যে সাক্ষীর ভাঁড়ামি তাঁর মতে প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠেছে, হালকা বোধ হয়েছে বা দ্বীনি ব্যাপারকে গুরুত্ব দেয় না বলে মনে হয়েছে, তার সাক্ষ্য তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ادب القاضى গ্রন্থে লিখেছেন ঃ যার ভাঁড়ামি চরিত্র প্রকট হয়ে দেখা দেবে, আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। বলেছেন, মুখান্নাস বা নপুংসকের সাক্ষ্য জায়েয হবে না। যে ঘুঘু বা কবুতর উড়ায় বা খেলায়, তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাতা থেকে কথিত, এক ব্যক্তি ইবনে আবূ লায়লার নিকট সাক্ষ্য দিয়েছিল। তিনি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন আমি ইবনে আবূ লায়লাকে বললাম, অমুক ব্যক্তির ন্যায় .... তার অবস্থা এই, তখন তা শুনে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন বললেন, সে তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? সে তো এক দরিদ্র ব্যক্তি ? .... তা থেকে বোঝা গেল, তাঁর নীতি হল, দারিদ্র্য সাক্ষ্য কবুলের প্রতিবন্ধক। কেননা তার উপর নির্ভর করা যায় না। তাকে ধন-মালের লোভ বিভ্রান্ত করতে পারে। সে এমন বিষয়ে সাক্ষ্য দাঁড় করাতে পারে, যা জায়েয নয়।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, বিপুল পরিমাণ জিনিসের সওয়ালের সাক্ষ্য জায়েয নয়। অল্প জিনিসের তা জায়েয, যদি তারা সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয়। মালিক দরিদ্রের সাথে প্রার্থনা করার ব্যাপারটিকে শর্ত করেছেন। বেশি পরিমাণ জিনিসে তুহ্‌মাতের কারণে সাক্ষ্য কবুল করেন নি। হালকা অল্প-স্বল্প জিনিসের বেলায় সাক্ষ্য কবুল করেছেন। কেননা তাতে তুহ্‌মাত থাকে না। ইমাম শাফেয়ীর মতো আল-মুজানী ও রুবাই বর্ণনা করেছেন, এ ব্যক্তির উপর যদি বিজয়ী ও অধিক প্রকাশমান হয় আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও মানবিকতা, তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে। পক্ষান্তরে তার উপর বিজয়ী ও প্রধান হয়ে উঠে গুনাহ, নাফরমানী ও অ-মানবিকতা, তাহলে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল হিকাম ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি লোকের বেশির ভাগ কাজ যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক হয়, কোন কবীরা গুনাহের দিকে অগ্রগতি না থাকে, তাহলে সে عدل সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন লোক। সাহসিকতা নির্ভীকতার অর্থ যদি সংরক্ষণশীলতা, উত্তম নির্বাকতা, মর্যাদা রক্ষা, ভাঁড়ামি পরিহার বোঝায়, তাহলে তা ঠিক কথা। আর তা বলে যদি পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্র-পরিচ্ছন্নতা, যানবাহনের সচলতা ও হাতিয়ার যন্ত্রপাতির নতুনত্ব ও উত্তম কারুকার্যতা বুঝিয়ে থাকে, তাহলে তা অনেক দূরবর্তী কথা। বরং তা সত্যের ব্যতিক্রম। কেননা এসব ব্যাপার ও বিষয়াদি কোন মুসলিমের নিকটই সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার শর্ত হতে পারে না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আগের কালের মনীষীদের যেসব কথা-উক্তির আমরা উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদদের যে মতামত আমরা তুলে ধরেছি, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে তাঁরা যে সব ব্যাপার-বিষয়ের গুরুত্ব প্রদান করতেন বলেছি, এ কথা স্পষ্ট যে, এ সবই সাক্ষ্য

কবুলের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রবল ধারণা অনুমান ভিত্তিক ইজতিহাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁদের মতে এ সবের গুরুত্ব ছিল বলেই তাঁরা তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সাক্ষ্যদানের জন্যে পছন্দনীয় ব্যক্তিকে, কার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়, তা তাঁরা এভাবেই নির্ধারণ করেছেন।

যার ব্যাপারে কোন সংশয় জাগেনি, বিচারক সাক্ষ্যদানের সময়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কি করবে না, এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-এর প্রতি বিচার কার্য সম্পর্কে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا مَجْلُوْدٌ فِىْ حَدٍّ اَوْمُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةَ زُوْرٍ اَوْظَنِيْنًا فِىْ وَلَاءٍ اَوْقَرَابَةٍ -

সব মুসলমানই পরস্পরের ব্যাপারে عدول —সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন। তবে কোন শরীয়াতী দণ্ডে যে লোক দণ্ডিত হয়েছে; কিংবা যে লোক সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে অথবা বন্ধুত্ব বা নিকটাত্মীয়তার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত, সে عدول গুণের বাইরে।

মনসূর বলেছেন, আমি ইবরাহীমকে বললাম, মুসলমানদের মধ্যে عدل কি ? বললেন যার ব্যাপারে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ দেখা যায় না, প্রকাশ পায়নি, সেই عدل সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন। হাসানুল বসরী ও শবী থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। মামার তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'আল-হাসানুল বসরী যখন বিচারপতি নিযুক্ত হলেন, তিনি সাধারণভাবে মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। তবে প্রতিপক্ষ সাক্ষীকে 'জেরা' করত। হুশাইম উল্লেখ করেছেন, আমি ইবনে শাবরামাতাকে বলতে শুনেছি, তিনিটি কাজ যা আমার পূর্বে কেউ করেনি এবং আমার পরে তা কেউ ত্যাগও করবে না কখনই। তা হল সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা, জেরা করা। পক্ষদ্বয়ের দলীলাদি প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদে মিষ্ট কথা বলা।

ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, আমি সাক্ষীদের ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করি না। তবে যে পক্ষের বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য দেয়, তারা যদি তাদের আঘাত দেয় বা ঘায়েল করে তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করি। তারা যদি তাদেরকে আঘাত করে, তাহলে আমি তাদের বিষয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং প্রকাশ্যভাবে তাদের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণ করি। তবে 'হদ্দ' ও কিসাসের সাক্ষীদের ক্ষেত্রে আমি এ নীতি অনুসরণ করি না। আমি তাদের সম্পর্কে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং প্রকাশ্যে তাদের নির্মলতা প্রকাশ করি। ইমাম মুহাম্মাদ সাক্ষীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন তাদেরকে আঘাত করা না হলেও।

ইউসূফ ইবনে মূসা আল-কাতান আলী ইবনে আমের ইবনে শাবরামাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, গোপনে সর্বপ্রথম যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, সে হলাম আমি। লোকদেরকে যখন বলা হতো, তোমাকে অম্লান প্রমাণ করবে এমন কেউ আছে কি ? থাকলে তাকে উপস্থিত কর। তখন এক-একজন বলত, আমার জনগণই আমার অম্লানতার কথা বলবে। তখন লোকেরা লজ্জাবোধ করত ও তারাই তার অম্লানতার কথা বলত। আমি যখন এ ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, তখন গোপনে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলাম। পরে তাদের সাক্ষ্য সহীহ প্রমাণিত হলে তখন বলতাম, তোমার অম্লানতা প্রকাশ্যভাবে কে প্রমাণ করবে, তাকে উপস্থিত কর।

আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ সাক্ষীদের সম্পর্কে গোপনে ও প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করতেন এবং

তাদের অম্লানতাও প্রকাশ্যে প্রমাণ করতেন— প্রতিপক্ষ তাদের দোষ না ধরলেও। মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া যাবে না, যতক্ষণ তাদের সম্পর্কে গোপনে খবরাখবর নেয়া না হবে। লায়স বলেছেন, আমি তো লোকদেরকে পেয়েছি কিন্তু সাক্ষীদের থেকে তাদের অম্লানতা প্রমাণ করার দাবি জানাই নি। বিচারক পক্ষকে বলতেন, তোমাদের নিকট এমন কোন লোক থাকলে নিয়ে আস, যে ওদের সাক্ষ্যের উপর জেরা করবে। অন্যথায় আমি ওদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তোমার উপর রায় জারি করে দেব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সাক্ষীদের ব্যাপারে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। যদি ফিরে যায়, তাহলে তার এ ফিরে যাওয়ার কারণ প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে, যেন লোকেরা জানতে পারে যে, এ ব্যক্তিই তার সাক্ষ্য থেকে ফিরে গেছে। যেন এক নামের সাথে অন্য নাম মিলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আগের কালের মনীষীদের মধ্যে যিনি সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য থেকে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে, যে তার মুসলিম হওয়ার কথা প্রকাশ করেছে, তিনি ভিত্তি করেছেন লোকদের সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতকে, সাধারণ্যে সাক্ষীর সততা-ন্যায়পরতা প্রমাণের ব্যাপারে। তখন তো ফাসিক লোকের সংখ্যাও ছিল কম। আর নবী করীম (স) নিজে তার পরবর্তী প্রথম যুগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের মঙ্গল ও কল্যাণময়তার ঘোষণা দিয়ে গেছেন। আমাদের নিকট আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, সুফিয়ান, মনসুর, ইবরাহীম উবায়দাতা, আবদুল্লাহ সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -

সর্বোত্তম লোক আমার সময়ের, তার পরে তারা যারা এদের পরে আসবে, তার পরে তারা যারা তাদের পরে আসবে।

—এই তিন বা চারটি যুগ সম্পর্কে এ কথা। তার পরে এমন লোকদের আগমন হবে, যখন তাদের একজনের সাক্ষ্য ছাড়িয়ে যাবে তার কিরা-কসমকে। আর তার কিরা-কসম ছাড়িয়ে যাবে তার সাক্ষ্যকে। বলেছেন, আমাদের সময়ের লোকেরা সাক্ষ্যদান ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির জন্যে আমাদেরকে মারত। আমরা তখন অল্প বয়সের বালক ছিলাম। আগের দিনের মনীষী ও বিভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ তাদের সময়ের মুসলমানদেরকে সততা-ন্যায়পরতার মানদণ্ডে উন্নীত মনে করতেন। আর এ সততা-ন্যায়পরতার প্রকাশের কারণে সাক্ষ্যকে জায়েয ধরে নিতেন। তাদের মধ্যে সন্দেহজনক লোক ছিল না, তা নয়। ফিস্‌ক-ফুজুরীও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হতো। ফলে তাদের ব্যাপারটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে যেত। ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন হাদীসে উক্ত তৃতীয় যুগের লোক, যার মঙ্গলময়তা ও কল্যাণশীলতার সাক্ষ্য স্বয়ং নবী করীম (স) দিয়েছেন। ফলে তিনি যে অবস্থার মধ্যে ছিলেন, সেই প্রেক্ষিতেই কথা বলেছেন। তিনি যদি পরবর্তীকালে লোকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারতেন, তাহলে সাক্ষীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে তা-ই বলতেন, যা অন্যান্যরা বলেছেন। আর জিজ্ঞাসাবাদ না করে কোন সাক্ষীরই সততা-ন্যায়পরতার উপর ভিত্তি করে রায় দিতেন না।

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক আরব বেদুঈনকে— যে নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছিল, বলেছিলেন— তুমি কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দাও ?

বলল, হ্যাঁ, তারপরে তিনি লোকদেরকে রোযা রাখার হুকুম দিলেন তার দেয়া খবরের ভিত্তিতে। তার মুসলমান হওয়া প্রকাশিত হওয়ার পর তার সততা-ন্যায়পরতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তুলেননি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, সাক্ষীদের সততা ন্যায়পরতা ও অম্লানতার এবং তাদের পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারটি তাদের ইজতিহাদ ও বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে মীমাংসিত হতো। বিশেষ করে এ জন্যে যে, মানুষের ব্যাপারাদি অজানা— গায়েব লোকে নিহিত। আমাদের জ্ঞান তা আয়ত্ত করতে পারে না। আবার আল্লাহ্ও আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন লোকদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রতারিত না হতে এবং তারা নিজেদের সম্পর্কে বিশ্বস্ততা ও কল্যাণকামিতার যে সব দাবি করে তাতে ভুলে না যেতে। আল্লাহ্র কথা হলো ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

এমন লোক-ও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে সন্তুষ্ট বিস্মিত করে দেয়। (সূরা বাকারা ঃ ২০৪)

কিন্তু পরে তাদের আসল ব্যাপার ও অবস্থা সম্পর্কে জানিয়েছেন এই বলে ঃ

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِيْ الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا -

যখন সে দূর সরে যায়, তখন সে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য চেষ্টা চালায়। (সূরা-বাকারা ঃ ২০৫)

অর্থাৎ আল্লাহ যার বাহ্যিক কথা আমাদেরকে মুগ্ধ করে তাদের ভেতরকার আসল কি তা জানিয়ে দিলেন।

অন্য লোকদের অবস্থা বর্ণনা পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ -

তুমি যখন তাদেরকে দেখবে, তাদের অবয়বসমূহ তোমাকে মুগ্ধ-বিস্মিত করে দেবে। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৪)

মোটকথা, আল্লাহ লোকদের বাহ্যিক অবস্থা ও কথাবার্তায় প্রতারিত হতে নিষেধ করেছেন। আর সেই রাসূল (স)-কেই অনুসরণ করতে বলেছেন আমাদেরকে। বলেছেনঃ وَاتَّبِعُوْهُ এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর।

বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলে উত্তম আদর্শ রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

তাই ব্যাপার যদি মানুষের বাহ্যিক প্রকাশের উপর নির্ভর করতে হয়, তার সাক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টির ব্যবস্থা না হয় এবং তার বিষয়ে জানা-শুনার পন্থা গ্রহণ করা না যায়, আর তা সত্ত্বেও তার সততা-ন্যায়পরতার উপর বিজয়ী ধারণা জন্মে তাহলে তার সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণ করতে

হবে। যে সব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়, তাদের দুটি গুণের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তার একটি হলো العدل সততা-ন্যায়পরতা । বলেছেন ঃ

اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -

তোমাদের মধ্য থেকে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন দুইজন। (সূরা মায়িদা ঃ ১০৬)

বলেছেন ঃ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ -

তোমাদের মধ্য থেকে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন লোককে সাক্ষী বানাও।

(সূরা আত্-তালাক ঃ ২)

আর দ্বিতীয় গুণ হল সাক্ষীর পছন্দনীয় মনোনীত হওয়া। বলেছেন ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষী হিসেবে তারা তোমাদের পছন্দনীয়-মনোনীত, তাদের থেকে—

আর পছন্দনীয় মনোনীত তো তারাই হবে যারা সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন।

হ্যাঁ, সততা-ন্যায়পরায়ণতা সম্পন্ন হওয়ার পরও সাক্ষী হিসেবে অপছন্দনীয়-অমনোনীত হতে পারে। হতে পারে সে মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত, অসতর্ক ব্যক্তি। তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা বা তাকে সম্মোহিত করা অসম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহ্র কথাঃ 'তোমাদের পছন্দনীয় মনোনীত সাক্ষী' কথাটিতে দুটি গুণ সমন্বিত। একটি ন্যায়পরতা-সততা আর অপরটি জাগৃতি স্মরণশক্তির তীব্রতা ও বুঝ-সমঝের তীক্ষ্ণতা।

যিনার ক্ষেত্রে সাক্ষীর জন্যে শুধু সততা-ন্যায়পরায়ণতা থাকার কথা আল্লাহ বলেননি। তাতে সততা-ন্যায়পরতা ও পছন্দনীয় হওয়ার সব কয়টিরই শর্ত রয়েছে। তা আল্লাহ্র এ কথার আলোকে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا -

তোমাদের নিকট কোন ফাসিক ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে এলে তোমরা তার সততা-যথার্থতা যাচাই কর। (সূরা হুযরাত ঃ ৩)

ফাসিকদের দেয়া সর্বপ্রকারের খবরাখবরের বেলায় সততা-যথার্থতা যাচাই করার এ আদেশ অনিবার্যভাবে কার্যকর হতে হবে। আর সাক্ষ্যদানও এক প্রকারের সংবাদ দান। অতএব তাতে প্রমাণের দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা অর্জিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষ করে সাক্ষী যদি 'ফাসিক' ব্যক্তি হয়। ফাসিক ব্যক্তির দেয়া সংবাদে প্রমাণ-দৃঢ়তার উপর আল্লাহ নিজেই যখন অকাট্য দলীল এনেছেন এবং আমাদের জন্যে সততা ও ন্যায়পরতা সম্পন্ন পছন্দনীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য কবুল করা বাধ্যতামূলক করেছেন। একজনের ফিস্ক-ফুজুরীর ব্যাপারটি তো দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানা যায়। কিন্তু সততা-ন্যায়পরতার কথা বাহ্যিক অবস্থা ছাড়া দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানা যেতে পারে না। এ থেকে জানা গেল যে, তা বিজয়ী ধারণার উপর ভিত্তিশীল। সাক্ষীর কল্যাণময়তা, তার উচ্চারণের সত্যতা ও আমানতদারী যদিও বেশীর ভাগ ধারণার উপর ভিত্তিশীল তবুও তা এক প্রকারের ইলম। যেমন মহিলা হিজরতকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَانْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ -

যদি তোমরা তাদেরকে মুমিন বলে জানতে পার, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের দিকে ফিরিয়ে দেবে না। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)

এ আয়াতের যে 'ইলম' বা জানার কথা বলা হয়েছে, তা বাহ্যিকভাবে জানার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার কিনা তা জানার কথা বলা হয়নি। সাক্ষীর সততা-ন্যায়পরতা জানার ব্যাপারটিও বাহ্যিক উপায়ে জানা। গায়বীভাবে জানার বিষয় নয়। কেননা গায়বী জানা তো কেবল মাত্র আল্লাহ্র পক্ষেই সম্ভব। নিত্য নবঘটিত ব্যাপারাদিতে শরীয়াতের হুকুমই জিহাদের পন্থায় জানা এবং সাক্ষীর কথার সত্যতা প্রমাণের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে একটা মৌলিক নীতি। সাক্ষ্যসমূহ বস্তুত দুনিয়া ও দ্বীনী ব্যাপারসমূহের নিদর্শনাবলীর মধ্যে গণ্য। জনগণের অধিকার প্রমাণ ও দলীল-দস্তাবেজে সৃষ্টিকুলের কল্যাণ তার দ্বারাই সঙ্ঘটিত হয়। জনগণের বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা, নসব, বংশধারা এবং রক্তের বংশানুক্রমিকতা প্রমাণেরও এটাই উপায়। বিজয়ী ধারণা ও অধিকাংশ রায়ের উপরই তা ভিত্তিশীল। কেননা সাক্ষীগণের দেয়া সাক্ষ্য ও যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া হল তার সত্যতা যথার্থতা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক যুগের মাসুম ইমামের কথা যারা বলেন, তাদের কথার বাতুলতা উক্ত কথার আলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যারা এরূপ যুক্তি দেখায় যে, সমস্ত দ্বীনী ব্যাপার বিজয়ী ধারণা নয়— প্রকৃত ইল্মের উপর নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর তা যুগ-ইমামের নিকট থেকেই পাওয়া যায়। যুগ-ইমাম ছাড়া ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা মানুষের রায়-অভিমত-ভুলও হতে পারে, ঠিকও হতে পারে। এ রূপ যুক্তি প্রদর্শন সত্যভিত্তিক নয়। কেননা তাদের এ ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের প্রশ্ন উঠে না। হ্যাঁ, কেবলমাত্র মাসুম ইমামের সাক্ষ্যই গ্রহণীয় হতে পারে। যাদের ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে থাকা চরমভাবে বিশ্বাস্য।

তাই আল্লাহই যখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন যদি তারা তাদের বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে পছন্দনীয় হয়, প্রকৃত জ্ঞান যদি লাভ না-হয়, গায়বী বিষয়াদি যদি নাও জানা যায়— সেই সাথে মিথ্যা ও ভুল বলার সম্ভাবনাও থাকে, তবু তা গ্রহণ করতে হবে।

এ থেকেও তাদের নির্মিত আসল ভিত্তিটিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারা যদি বলে, ইমাম সাক্ষীদের সত্যতা ও অসত্যতা জানতে পারেন, তাহলে জবাবে বলা যাবে, তাহলে মামলা মুকদ্দমার শুনানী ও সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদিতে কেবল মাসুম ইমামেরই করণীয় হবে। সেই ইমামকে বিচারক— বিচারপতি হতে হবে, ইমামের ন্যায় মাসুম না হলে এবং সাক্ষীদের ব্যাপারদি গায়েবীভাবে না জানলে তার বিচারক হওয়া উচিত নয়, সে আমানতদারও তো হতে পারে না। ইমামের সাহায্যকারীদেরও তো মাসুম ও ভুল-ভ্রান্তি পদস্খলন মুক্ত হতে হবে। কেননা দ্বীনের হুকুম-আহকাম তাদের সাথেও তো জড়িত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। এ সব গুণ ছাড়াও লোকেরা শাসক-বিচারক হতে পারে, হতে পারে সাক্ষী ও সাহায্যকারী। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, দ্বীনের অধিকাংশ ব্যাপারই ইজতিহাদী রায় ও বিজয়ী ধারণার উপর ভিত্তিশীল।

আলোচনায় আমারা দেখিয়েছি যে, উক্ত আয়াত দ্বারা সাক্ষীদের সততা-ন্যায়পরতার ব্যাপারে ইজতিহাদী রায় ও বিজয়ী ধারণার উপর নির্ভর করতে বাধ্য করেছেন, এ থেকেই যে সব

ব্যাপারে শরীয়াতের অকাট্য দলীল নেই, কোন ইজমাও অনুষ্ঠিত হয়নি, সে সব ক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদ করাকে যারা অগ্রাহ্য করে, তাদের কথার বাতুলতাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কেননা রক্তধারা, বংশধারা ও ধন-মালের সাথে দুনিয়া ও দ্বীনী কল্যাণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এ সব ব্যাপরেই আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার আদেশ করেছেন। যদিও আমরা তাদের গায়বী অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে আমরা শুধু তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই ধারণা করতে ও তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। যদিও তাদের মিথ্যা ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। তাদের ইজতিহাদ জায়েয প্রমাণিত হয়। বিজয়ী ধারণা ও মতের ভিত্তিতে কাজ করা সম্ভব প্রমাণিত হয় বিশেষ করে যে সব বিষয়ে শরীয়াতের কোন হুকুম পাওয়া যায়নি, আগের লোকদের কোন ঐকমত্যও কোন ব্যাপারে হয়নি।

নবী করীম (স) থেকে দ্বীনী ব্যাপারাদি পর্যায়ে বহু খবরাখবর বর্ণিত হয়েছে, যা ঠিক নির্ভরযোগ্য কোন ইলম দেয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা কবুল করা উপরোদ্ধৃত আলোচনার আলোকে জায়েয প্রমাণিত হয়। যেমন সাক্ষীদের দেয়া সাক্ষ্য গ্রহণ, যদিও যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে সত্য— এমন কথা বলা যায় না। অথচ তা গ্রহণ করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। যদিও বাহ্যিক ইলমের ভেতরে নিহিত প্রকৃত অবস্থা গায়েবী এবং তা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত। তাই যারা বলে যে, খবর দ্বীনী বিষয়ে নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত ইলম দেয় না তা কবুল করা জায়েয নয়, পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে তা বাতিল প্রমাণিত হয়। 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণ করা যাবে না বলে যারা দলীল পেশ করে, তাদের দলীল ও কথাও উক্ত আলোচনায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তাদের কথা হল, আমরা যদি 'খবরে ওয়াহিদ' কবুল করি, তাহলে খবরদাতাকে আমরা রসূলে করীম (স)-এর মর্যাদা থেকেও অনেক বেশি মর্যাদা দেয়ার অপরাধ করি। কেননা আসলে খোদ রাসূলে করীম (স)-এর দেয়া খবর আমরা মানতে বাধ্য হই তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণকারী মুজিযা জাহির হওয়ার পর। অথচ আল্লাহ আমাদেরকে সাক্ষীদের সাক্ষ্য কবুল করতে বলেছেন তাদের বাহ্যিক সততা-ন্যায়পরতার ভিত্তিতে, তাদের সত্যতা প্রমাণকারী কোন মুজিযা জাহির না হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ কবুল করা সম্পর্কে তাদের এ কল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আমরা উল্লেখ করেছি, সাক্ষী সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হলেও তার দেয়া সাক্ষ্যকে তুহমত মুক্ত হতে হবে। তা এজন্যে যে, ফিকাহবিদগণ তার কোন-কোনটির ব্যাপারে একমত আর কোন-কোনটির ব্যাপারে বিভিন্ন মত। ভিন্ন দেশের ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সাক্ষীর সাক্ষ্য তার সন্তানের জন্যে, তার পিতার জন্যে বাতিল। তবে উসমানুলবত্তী বলেছেন, সন্তানের সাক্ষ্য পিতার জন্যে, পিতার সাক্ষ্য পুত্রের জন্যে, তার স্ত্রীর জন্যে জায়েয হবে, যদি তারা সততা-ন্যায়পরতা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন চরিত্রের এবং উচ্চ মর্যাদায় সুবিখ্যাত হয়। তবে এতে সব মানুষ কখনই সমান হয় না। এ কারণে পিতা ও অনাত্মীয় ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হবে। তবে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদ মালিক, লায়স, শাফেয়ী ও আওজায়ী প্রমুখ মনীষী তাদের একজনের সাক্ষ্য অন্যজনের জন্যে জায়েয মনে করেন না। আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, তাঁর পিতা, অকী', সুফিয়ান, জাবির, শবী, শুরাইহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পুত্রের সাক্ষ্য পিতার জন্যে ও পিতার সাক্ষ্য পুত্রের, স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর জন্যে, স্বামীর সাক্ষ্য তার স্ত্রীর জন্যে জায়েয হবে না। আয়াস ইবনে মুআবিয়াতা জায়েয মনে করেন ব্যক্তির সাক্ষ্য তার নিজের পুত্রের জন্যে। আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহ্মাদ

তাঁর পিতা— আফফান, হাম্মাদ ইবনে জায়দ, খালিদুল হাযা, আয়াস, ইবনে মুআবিয়া সূত্রেও এরূপ বর্ণনা এসেছে ঃ

পিতার সাক্ষ্য পুত্রের জন্যে বাতিল, তা প্রমাণ করে এ আয়াত ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ -

তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর কিংবা তোমাদের পিতার ঘর থেকে আহার করবে, তাতে কোন দোষ নেই।

এতে সন্তান বা 'পুত্রদের ঘর' কথাটির স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ নেই। কেননা তা এর মধ্যেই শামিল রয়েছে। কেননা পুত্ররা তো পিতার সাথেই সম্পর্কিত। তাই 'তাদের ঘর' বলেই 'তাদের পুত্রদের ঘর' বলা যথেষ্ট মনে করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

তুমি এবং তোমার ধন-মাল তোমার পিতার জন্যে।

পুত্রের ধন-মাল পিতার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলেছেন ঃ

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَاِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِكُمْ -

ব্যক্তির নিজ উপার্জন থেকে আহার করা অতীব উত্তম। তার সন্তান-ও তারই উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে আহার কর।

এ কথায় পুত্রের মালিকানাকে পিতার মালিকানা বলা হয়েছে এবং তা খাওয়া মুবাহ্ বলা হয়েছে। তাকে তারই উপার্জন বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই তার পুত্রের জন্যে তার সাক্ষ্য পাওয়ার হক প্রমাণিত হয়েছে, যেন তা নিজের জন্যেই প্রমাণিত। আর নিজের জন্যে নিজের সাক্ষ্য যে বাতিল, তা জানা-ই আছে। কাজেই তার পুত্রের জন্যেও তার সাক্ষ্য বাতিল হবে। পুত্রের ব্যাপারে যখন তা প্রমাণিত হল, সেই হুকুমই প্রমাণিত হবে পিতার জন্যে তার পুত্রের সাক্ষ্য। কেননা এ দুজনের মধ্যে কেউ কোন পার্থক্য করে না।

যদি বলা হয়, সাক্ষী সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হলে এদের সকলেরই সাক্ষ্য কবুল হওয়া উচিত। যেমন তা সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্য গৃহীত হয়। তার সাক্ষ্য তুহমাতের কারণে এদের সকলের জন্যে কবুল করা না হলে, তাহলে সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্যেও তা কবুল করা জায়েয হবে না। কেননা যে লোক তার পুত্রের জন্যে সাক্ষ্যে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হবে, যা তার জন্যে হক হবে না, তাই অপরিচিত সম্পর্কহীন ব্যক্তির জন্যে এ ধরনের তুহমাত তার উপর-ও হওয়া অসম্ভব নয়।

জবাবে বলা যায়, পুত্রের জন্যে পিতার সাক্ষ্য কবুল করার তুহমাত প্রতিবন্ধক নয়। আর তার পিতার জন্যে তুহমাত ফাসিকী এবং মিথ্যা নয়। তুহমাত তাতে এ দিক দিয়ে যে, সে হবে তার নিজের জন্যে বাদী। লোকদের কোন একজন— তার আমানতদারী প্রমাণিত হলে এবং তার সততা-ন্যায়পরতা যদি সহীহ্ও হয়, তাহলে সে নিজের জন্যে যা সে দাবি করে তাতে তার তাসদীককারী হওয়া জায়েয নয়, সে যে তাকযীব করে তার ভিত্তিতে নয়, বরং এ দিক দিয়ে যে, নিজের জন্যে প্রত্যক দাবিকারীর দাবি প্রমাণিত নয়। প্রমাণিত হয় অকাট্য দলীলের

ভিত্তিতে, যা তার জন্যে সে জিনিসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ফলে নিজের পুত্রের জন্যে সাক্ষ্যদাতা নিজের জন্যে দাবিকারীর মতই।

আমাদের হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে সাক্ষী তার সাক্ষ্যকে নিজের দিকে টানবে গনীমতের মাল হিসেবে; কিংবা সে তদ্দ্বারা নিজের থেকে জরিমানা হিসেবে দূর করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ সময় সে দাবিকারীর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর দাবিকারী— বাদী নিজের মামলার সাক্ষী হতে পারে না। আর নবী করীম (স) অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কেউ হতে পারে না। প্রকাশ্য মুজিযা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, তিনি সত্য কথা বলেছেন, সত্য ছাড়া কখনই কিছু বলেন নি। তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা— তিনি কখনও মিথ্যা বলেছেন বলা সম্পূর্ণ নাজায়েয। আমরা নিঃসন্দেহে জানি, তিনি ভেতরে তা-ই ছিলেন, যা ছিলেন প্রকাশ্যে। তাঁর ভেতরটা বাইরের সাথে পুরামাত্রায় সামঞ্জস্যশীল ছিল। তিনি যে দাবি করেছেন নিজের ব্যাপারে, তিনি শুধু তা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তার সত্যতা অন্যের সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণ করেছেন যখনই প্রতিপক্ষ তার দাবি করেছে। তা খুজায়মা ইবনে সাবিতের একটি ঘটনা। আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা, আবুল ইয়ামান, শুয়ায়ব, জুহরী, আমারাতা ইবনে খুজায়মাতাল আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তার চাচা রাসূলে করীম (স)-এর একজন সাহাবী, তিনি তাঁকে বলেছেন, নবী করীম (স) একজন বেদুঈনের নিকট থেকে একটা ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন। তখন বেদুঈন বলতে লাগল, একজন সাক্ষী রাখুন, যে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আপনার নিকট ঘোড়াটি বিক্রয় করেছি। তখন খুজায়মা বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ঘোড়াটি কিনেছেন আর সে আপনার নিকট বিক্রয় করেছে। তখন নবী করীম (স) তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের সাক্ষ্য দেবে ? বললেন, হে রাসূল! আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেব। তখন নবী করীম (স) খুজায়মাতার সাক্ষ্যকে দুজন সাক্ষীর সমতুল্য বানালেন। বোঝা গেল, নবী করীম (স) যে দাবি করেছেন তার সত্যতা প্রমাণের জন্যে নিজের দাবিকেই যথেষ্ট মনে করেন নি। বরং অকাট্য দলীল ও নিদর্শনাদির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছু বলতেন না। বেদুঈন যখন তাঁকে সাক্ষ্য আনতে বলল, তখন বলেন নি যে, না, তার কোন প্রমাণ নেই। সব বাদী— দাবিকারীর ব্যাপারই এরূপ। অতএব লোকদের অকাট্য প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক। কিন্তু তদ্দ্বারা নিজের দিকে গনীমত টানতে পারবে না। আর তার দ্বারা নিজের থেকে জরিমানাও রোধ করবে না। আর পুত্রের জন্যে পিতার সাক্ষ্য যদ্দ্বারা নিজের বিরাট পরিমাণের গনীমত টেনে নেবে, তা নিজের জন্যে দেয়া সাক্ষ্যের মতই।

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের জন্যে সাক্ষ্যদান

এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, মালিক, আওজায়ী ও লায়স প্রমুখ বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর একজনের পক্ষে অন্যজনের সাক্ষ্যদান জায়েয নয়। সওরী বলেছেন, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সাক্ষ্যদান জায়েয। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সাক্ষ্যদান জায়েয নয়। শাফেয়ী বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর একজনের পক্ষে অপরজনের সাক্ষ্যদান জায়েয।

আবূ বকর বলেছেন, এ ব্যাপারটি সন্তানের জন্যে পিতার এবং পিতার জন্যে সাক্ষ্যদানের মতই। এর কয়েকটি দিক রয়েছে।

একটি— এদের একজনের অপরজনের ধন-মাল দ্বারা প্রশস্ততা লাভ করার ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে এরূপ সাক্ষ্যদানে এবং তা মুবাহ্ যার জন্যে কারোরই কারোর নিকট থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই স্বামী তার স্ত্রীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে যা প্রমাণ করবে, তা তো ঠিক নিজের জন্যে প্রমাণ করার মতই। অনুরূপভাবে স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে যা প্রমাণ করবে, তাও তার নিজের জন্যে প্রমাণ করার মতই। বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ধন-মাল থেকে সুবিধা লাভ পিতা-পুত্রের ধন-মালের পারস্পরিক সুবিধা লাভ থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। আর ব্যাপার যখন এই, আর পিতা ও পুত্রের পরস্পরের জন্যে সাক্ষ্যদান যখন জায়েয ও গ্রহণযোগ্য নয়, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের জন্যে সাক্ষ্যদান অনুরূপভাবে অগ্রহণযোগ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা স্ত্রীর মালের ব্যাপারে স্বামী সাক্ষ্যদান স্বামীর মালিকানাধীন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। কেননা স্ত্রীর মহরে মিসল বৃদ্ধির পায় স্ত্রীর মাল বৃদ্ধি দ্বারা। ফলে নিজের জন্যে সাক্ষ্যদাতা সেই জিনিসের মূল্য বাড়ায় যার সে-ই মালিক। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-হাজরামী (রা)-কে বলেছিলেন— যখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, তাঁর দাস তাঁর স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে— দাস তোমার, মালও চুরি করেছে তোমার। অতএব তার উপর হাত কাটার আইন কার্যকর করা যাবে না।

এ কথা দ্বারা তিনি স্বামী-স্ত্রী দুজনার একজনের মালকেই দুজনের যৌথ মালিকানার মাল বলেছেন। কেননা তাদের দুজনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই তাদের প্রত্যেকে অপর জনের জন্যে যা প্রমাণ করবে, তা তার নিজের জন্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, স্বামীর ধন-মালের পরিমাণ যখনই বৃদ্ধি পাবে, তখন স্ত্রীর স্বামীর নিকট থেকে খরচ বাবদ যা পাওয়ার তার পরিমাণও বেড়ে যাবে। ফলে স্ত্রী যেন নিজের জন্যেই সাক্ষ্য দিল— ব্যাপারটা এরূপ হয়ে যাবে। কেননা স্বামীর অভাব ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই স্ত্রী হওয়ার কারণেই খরচা পেয়ে থাকে, পাওয়ার অধিকারিণী হয়।

কেউ যদি বলে, দরিদ্র বোন ও চিররোগী ভাই দুজনই তাদের ভাইর নিকট থেকে 'খরচা' পাওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে, যদি সে ভাই সচ্ছল ও অর্থশালী হয়। কিন্তু তাই বলে তাদের সাক্ষ্য ভাইর জন্যে নিষিদ্ধ হয়নি তো ?

জবাবে বলা যাবে, ভ্রাতৃত্ব খরচা পাওয়ার অধিকার হওয়ার কারণ নয়। কেননা যে সচ্ছল বা অর্থশালী, সে তো তার ভাইর নিকট খরচা পাওয়ার অধিকারী নয়, যদিও সে তার ভাই, একই বাপ-মায়ের সন্তান। আর ভ্রাতৃত্ব ও স্ত্রীত্ব থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র ব্যক্তির নিকট থেকে কিছুই পেতে পারে না, স্বামী গরীব হোক; কিংবা হোক ধনী। তাই একথা প্রমাণিত হল যে, মেয়েলোক তার সাক্ষ্য দ্বারা নিজের জন্যেই খরচা বেশি প্রমাণ করে, যদিও সে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী হিসেবেই তা পেতে পারে। কিন্তু বংশ সম্পর্কে সেরূপ নয়। কেননা সে সম্পর্কের দরুন 'খরচ' পাওয়ার অধিকার জন্মে না যার সাথে সে সম্পর্ক আছে তার নিকট থেকে। এ কারণে এ দুটি এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার।

চাকর বেতনভূক কর্মচারীর সাক্ষ্য

ইমাম তাহাভী মুহাম্মাদ ইবনে সিনান, ঈসা, মুহাম্মাদ, আবূ ইউসূফ, আবূ হানীফা সূত্রে

উল্লেখ করেছেন, চাকর— বেতনভূক কর্মচারীর সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে জায়েয নয়, কোন বিষয়েই, যদিও সে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হোক না কেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, হিশাম ও ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ চাকর— কর্মচারীর সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে জায়েয নয়। কোন কর্মচারী যদি মিলিতভাবে কয়েক জনের মালিকানাধীন হয় এবং তাদের কোনজনের বিরুদ্ধে কিছু না বলে, তাহলে তার সাক্ষ্য জায়েয। উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান একথা সমর্থন করেছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, চাকর-কর্মচারী নিযুক্ত শ্রমিকের সাক্ষ্য তার নিয়োগকারীর জন্যে জায়েয নয়। তবে সে যদি সততা-ন্যায়পরতায় প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সে যদি ঘরের পরিবারের কর্মচারী হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য জায়েয হবে না। আল-আওজায়ী বলেছেন, কর্মচারীর সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে জায়েয নয়। সওরী বলেছেন, কর্মচারীর সাক্ষ্য তার মনিবের জন্যে জায়েয; যদি সে নিজের দিকে না টানে।

আবদুল বাকী ইবনে কানে' মুয়ায ইবনুল মুসান্না, আবূ উমর আল হাওযী, মুহাম্মাদ ইবনে রাশিদ, সুলায়মান ইবনে মূসা, আমর ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) খিয়ানতকারী পুরুষ বা স্ত্রীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যান করেছেন মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির তার ভাইর বিরুদ্ধে এবং পরিতৃপ্তের সাক্ষ্য ঘরের লোকদের জন্যে জায়েয নয়। অন্যদের জন্যে তা জায়েয।

মুহাম্মাদ ইবনে বকর (র) আবূ দাউদ, হিফ্স ইবনে উমার, মুহাম্মাদ ইবনে রাশিদ তার সনদে অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তিনি পরিতৃপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য ঘরের লোকদের জন্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, ঘরের লোকদের জন্যে 'পরিতৃপ্ত' কথাটির মধ্যে বিশেষ কর্মচারী শামিল ও গণ্য। কেননা তার অর্থ, সে তাদের অধীন। বিশেষ কর্মচারী হওয়া তার পরিচিতি। তবে মিলিতভাবে কয়েকজনের কর্মচারী হলে সে এবং অন্যান্য সব মানুষ তার ধন-মালে অভিন্ন অবস্থায়। তাই তাদের এ অবস্থা তাদের সাক্ষ্য সহীহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। 'শরীকুল ইনান'(شريك العنان —দুই সমান ক্ষমতাশীলদের শরীকদারীর ব্যবসায়) তার সাক্ষ্য শরীকদারীর মাল ছাড়া অন্য বিষয়ে জায়েয।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে সাক্ষ্য অভিযোগের দরুন প্রত্যাখ্যাত হবে, তা কখনই কবুল করা হবে না। যেমন ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য তার ফাসিকীর কারণে যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, পরে সে তওবা করে সংশোধিত হয়, আর তখন সে সেই সাক্ষ্যই দেয়, তা কখনই গৃহীত হবে না। স্বামী-স্ত্রীর দুইজনের একজনের সাক্ষ্য অপরজনের জন্যে যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, পরে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর যদি সেই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না। তাঁরা এ-ও বলেছেন, কোন দাস যদি কোন সাক্ষ্য দেয় বা কাফির কিংবা বালক সাক্ষ্য দেয় ও তা প্রত্যাখ্যাত হয়, পরে সে দাস মুক্ত ও আযাদ হয়, কাফির ইসলাম কবুল করে বা বালক পূর্ণবয়স্ক হয় এবং সেই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না। যদি তা পূর্বে প্রত্যাখ্যাত না হয়ে থাকে, তাহলে তা জায়েয হবে।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে ইমাম মালিকের মতই বর্ণিত হয়েছে। হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, অভিযোগ ও দোষারোপের কারণে কোন সাক্ষ্য যদি প্রত্যাখ্যাত হয়,

তাহলে তা কখনই কবুল হবে না। অবশ্য সরকারের তা বাতিল করার সিদ্ধান্তের পূর্বে। সরকারের হুকুম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না, হুকুম হলে হবে। আর হুকুম অনুযায়ী প্রমাণিত না হলে তা ভঙ্গ করাও জায়েয নয়। দোষারোপ-অভিযোগ নিশ্চিহ্ন হওয়ার সরকারী হুকুম— যার কারণে একমাত্র সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল— না হলে সে সাক্ষ্য বাতিলকরণের সরকারী হুকুম কার্যকর হবে, তা ভঙ্গ করা কখনই জায়েয হবে না। দাসত্ব, কুফর, অল্পবয়স্কতা— এর কোন কারণে প্রত্যাখ্যাত হলে সরকারের সে অভিযোগ বাতিল হওয়ার হুকুম তার দূরীভূত হওয়ার হুকুমের অধীন। কেননা স্বাধীন হওয়া, মুসলিম হওয়া ও পূর্ণ বয়স্কতা হওয়া— এ সবই সরকারী সিদ্ধান্তের অধীন ব্যাপার। তাই যে সব কারণে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে গিয়েছিল সে সব দূর হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যখন সরকারী সিদ্ধান্ত সহীহ্ হবে, তখন তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গৃহীত হবে। আর যখন অভিযোগ দূর হওয়ার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত সহীহ্ হবে না— কেননা সে ব্যাপারে কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে না, আর সে ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তও হবে না, তাহলে তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে। কেননা যা সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে সাব্যস্ত হয়েছে, তা অনুরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত বাতিল হতে পারে না। অতএব সততা-ন্যায়পরতা, অভিযোগ না হওয়া ও অসতর্কতা কম হওয়া— এ তিনটি বিষয়ের আমরা যে উল্লেখ করলাম, তা সাক্ষ্যের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর এ কথাগুলোই শামিল রয়েছে আল্লাহ্র এ কথায় ঃ

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ -

সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদের পছন্দ কর (সাক্ষী বানাতে রাজী হও) তাদের মধ্য থেকে।

এই ছোট্ট আয়াতাংশে যে বিপুল তাৎপর্য, তত্ত্ব ও আইন-বিধানের প্রমাণাদি নিহিত রয়েছে, তা অবশ্যই লক্ষণীয়। অথচ আয়াত বিরাট দীর্ঘ নয়, শব্দ ও অক্ষরও তাতে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি। খুবই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে এ বিরাট তাৎপর্য নিহিত হওয়া খুবই বিস্ময়কর। আর এ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য পর্যায়ে আগেকালের মনীষিগণের যেসব কথা ও উক্তি— মন্তব্য আমরা উল্লেখ করেছি, তা থেকে শরীয়াতের হুকুম বের করার যে নিয়ম-পদ্ধতি উল্লেখ করেছি, তার যে সব তত্ত্ব আমরা বিশ্লেষণ করেছি— আয়াতে এ সব কিছুরই সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কালাম। আল্লাহ্র নিকট থেকেই তা নাযিল হয়েছে এবং সর্বতোভাবে পবিত্র— অমলিন। কেননা সৃষ্টি— মানুষ-এর পক্ষে এমন শব্দ ব্যবহার করা কখনই সম্ভব হতে পারে না, যাতে বিরাট-ব্যাপক-বিশাল তাৎপর্য নিহিত থাকতে পারে, সংক্ষিপ্ত কথার এত বিস্তৃত ব্যাখ্যা হতে পারে, যার মধ্য থেকে এত সব হুকুম-আহ্কাম বের করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে এর চাইতে আরও কত বেশি তাৎপর্য যে এ থেকে বের হওয়া সম্ভব হবে তা আজ আমরা ভাবতেও পারি না, আমাদের কল্পনায়ও আজ তা আসতে পারে না, আমাদের আজকের ভাবনা-চিন্তা তা আয়ত্তও করতে পারে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ -

দুজনের একজন যদি ভুলে যায়— বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

تَذَكَّرَ ও تُذْكِرَ —এ দুভাবেই শব্দটি পাঠ করা হয়েছে এবং পাঠ করা যায়। বলা হয়েছে, দুটিরই অর্থ এক ও অভিন্ন। ذَكَّرْتُهُ ও ذَكَرْتُهُ দুটোই একই কথা বোঝাবার জন্যে বলা হয়ে থাকে। একথা রুবাই ইবনে আনাস, সূদ্দী, দহাক থেকে বর্ণিত।

আমাদের নিকট আবদুল বাকী ইবনে কানে, আবূ উবায়দ, মুমিন্নমায়রাফী, আবূ ইয়ালী আল-বসরী, আল-আসমায়ী, ইবনে আবূ আমার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, যে فَتُذْكِرَ পাঠ করবে, সে বোঝাতে চাইবে তাদের দুজনের সাক্ষ্য উল্লেখ করা — স্মরণ করানোর পর্যায়ের কাজ। আর যে فَتُذَكِّرَ পড়বে, তার ইচ্ছা হল এ কথা বোঝানো যে, তার সাক্ষ্য উপদেশ দান বা নসীহতকরণ পর্যায়ের কাজ। এ কথা সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না থেকে বর্ণিত।

আবূ বকর (র) বলেছেন, দুটি তাৎপর্যই যখন সম্ভাব্যতার মধ্যে, তখন দুটি পাঠের প্রত্যেকটি থেকে ভিন্নতর ও নবতর তাৎপর্য গ্রহণ করা উত্তম। তাই فَتُذْكِرَ পাঠ দুজন সাক্ষীকেই সাক্ষ্য বিধির ভিত্তিতে ও তার নির্ভুলতা-নিখুঁততার দৃষ্টিতে একজন পুরুষের সাক্ষ্যদান পর্যায়ের বানিয়ে দেবে। আর فَتُذَكِّرَ পাঠের তাৎপর্য হবে, একজনের ভুলে যাওয়া অবস্থায় অন্যজনের স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থে। এর প্রত্যেকটি পাঠ থেকে তার অনিবার্য অর্থ গ্রহণ করাই তার যে-কোন একটি অনিবার্য অর্থ গ্রহণের তুলনায় অনেক উত্তম।

নবী করীম (স)-এর এ কথাটি থেকেও তা-ই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

مَارَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبُ لِعُقُوْلِ ذَوِي الْاَلْبَابِ مِنْهُنَّ -

আমি তাদের তুলনায় বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে দ্বীন ও বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়ে কমতির বেশি অধিকারী আর দেখিনি।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল! ওদের বিবেক-বুদ্ধির কমতির ব্যাপারটা কি? বললেন, ওদের দুইজন মেয়েলোকের সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য বানিয়েছেন, এটাই তাদের বিবেক-বুদ্ধির অধিক কমতির প্রমাণ। এ কথাটি তাঁর ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যশীল, যিনি বলেছেন ঃ 'তাদের একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে' এর অর্থ, তারা দুজন সাক্ষ্যদানের নিয়মানুবর্তিতায় ও তার মর্যাদা রক্ষায় একজন পুরুষ সদৃশ হবে।

এ আয়াতে এ বিষয়ের দলীলও রয়েছে যে, মেয়েদের দুজনের বদলে একজনের সাক্ষ্য দান জায়েয হবে না, তার মর্যাদাযত পরিচিতই হোক-না-কেন। তার কাজ শুরু অপর মেয়েলোককে স্মরণ করিয়ে দেয়া। লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্র দলীল লেখা ও তাতে সাক্ষী বানানোর কথা বলার পর বলেছেন ঃ দুজন মেয়ে সাক্ষীর একজন যদি ভুলে যায়, তাহলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে। অর্থাৎ শুধু দলীল লেখা ও সাক্ষী বানানোর উপরই নির্ভর করা হয়নি, একজন মেয়ে সাক্ষী মূল কথা ভুলে গেলে অপর মেয়ে সাক্ষী তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেবে, এ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

তেমনি আল্লাহ্র এ কথাটিও ঃ

ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَنْ لَّاتَرْتَابُوْا -

আল্লাহ্র নিকট এটাই অধিক ন্যায়বিচার পূর্ণ ব্যবস্থা, সাক্ষ্যের জন্যে অধিক শক্ত নীতি এবং তোমাদের সন্দেহ কম-সে-কম করার পদ্ধতি।

এ আয়াত প্রমাণ করল যে, দলীল লিখতে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তার মাধ্যমে সাক্ষ্যদানের অবস্থা ও পদ্ধতিটা স্মরণ করা যায়। আর সাক্ষ্য হতে পারে না যদি তা স্মরণ— সংরক্ষিত রাখা না যায়। এ থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষী যদি বলে যে, 'এ ব্যাপারে আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নেই' এবং পরে বলে যে, 'আমার নিকট সাক্ষ্য আছে,' তাহলে তা কবুল করা হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'যদি দুজনের একজন ভুলে যায়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে।' অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার পর যদি তা স্মরণ করে তাহলে তার সাক্ষ্যদান জায়েয হবে।

ইবনে রুস্তম মুহাম্মাদ (র) থেকে উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছিল, যা সে জানত। তখন সে প্রথমে বলল, আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নেই। পরে সে ব্যক্তি সে বিষয়ে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দিল। বলেছেন, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে যদি সে সততা-ন্যায়পরতা সম্পন্ন হয়। কেননা সে বলেছে, আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। পরে তা আমি স্মরণ করেছি। কেননা মূল হকটা তো আর তার নিজের নয়। কাজেই তার পক্ষে তার কথা অবশ্যই জায়েয হবে। এখানে 'হক' হচ্ছে অন্য লোকের। এভাবেই তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এটা এ রকম বলা কথা নয় যে বাদী বলবে, আমার তার নিকট এই 'হক' নেই। পরে সে তার দাবি তোলে, তাহলে তার দাবি কবুল করা যাবে না, এ 'হক' তার হবে না। কেননা সে নিজেই স্বীয় অঙ্গীকার দ্বারা তা বাতিল করে দিয়েছে। আর সাক্ষ্য, তা 'হক' অপরের জন্যে— কাজেই 'আমার নিকট কোন সাক্ষ্য নেই' কথাটি দ্বারা সে 'হক' বাতিল হয়ে যেতে পারে না।

আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তাদের দুজনের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে' উপরোক্ত কথার সঠিকত্ব প্রমাণ করে। লিখিত জিনিসের উপর সাক্ষ্যদান পর্যায়ে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ বলেছেন, লিখিত জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া যাবে না। তবে তার দ্বারা স্মরণ করা যাবে। তাদের এ কথাই প্রখ্যাত। ইবনে রুস্তম বলেছেন, আমি মুহাম্মাদকে বললাম, এক ব্যক্তি সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দিত। সাক্ষ্যের লেখার উপরও সাক্ষ্য দিত। তাতে মোহর মারা হতো কি হতো না— তাতে কোন পার্থক্য করা হতো না। তার লেখা পরিচিত ছিল। বলেছেন, তার লেখা পরিচিত হলে সে বিষয়ে সাক্ষ্যদান তার পক্ষে সম্ভব হতো। তার উপর 'মোহর' সিল মারা হতো আর না-ই হতো তাতে কোন পার্থক্য হতো না। জবাবে বললাম, যদি লোক উম্মী হয়, পড়তে না পারে, ফলে অন্য লোক তা লিখবে তার হয়ে। সে বিষয়ে সে সাক্ষ্য দেবে না। তবে যদি স্মরণ করতে পারে ও সংরক্ষিত থাকে, তাহলে পারবে। আবূ হানীফা বলেছেন, বিচারক তার দেওয়ানে যা-ই লিখিত পাবে, তাতেই বিচারের রায় দেবে না। যদি সে তা স্মরণ করতে পারে তবে পারবে। আবূ ইউসূফ বলেছেন, সে তাতে বিচারকার্য করবে, রায় দেবে যদি তার দস্তাবিজে জমা করা অবস্থায় পায়। পায় তার মোহরের অধীন। কেননা তখন তা করলে তাতে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা মুহাম্মাদের কথা। তা তার মোহরের অধীন না হলে তার দ্বারা যে কোন জিনিস ঘটানো যাবে না, সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। অন্য বিচারক থেকে পাওয়া ফাইলে— নথিপত্রের ভিত্তিতে বিচারক কোন রায় দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার পূর্বের বিচারকের হুকুম হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য না দেবে। ইবনে আবূ লায়লা আবূ ইউসূফের সাথে একমত হয়েছেন, তার নথিপত্রে পাওয়া জিনিস

সম্পর্কিত মতের ব্যাপারে। আবূ ইউসূফও একথা ইবনে আবূ লায়লার সূত্রে বলেছেন যে, কোন লোক যদি বিচারকের নিকট তার বিপক্ষের জন্যে কোন কিছুর অঙ্গীকার করে, কিন্তু তা তার নথিপত্রে প্রতিষ্ঠিত না করে এবং তার ভিত্তিতে সে বিষয়ে বিচার কার্য না করে, পরে সে অঙ্গীকারকারী— তার পক্ষে ও তার বিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিতে বলে তাহলে সে তদনুযায়ী বিচার কার্য করবে না— রায় দেবে না। ইবনে আবূ লায়লা তাই বলেছেন। আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ বলেছেন, সে বিষয়ে সে বিচার করবে। মালিক বলেছেন, যার হাতের লেখা চেনা— পরিচিত, সাক্ষ্যের কথা স্মরণ করতে পারে না, সে লেখা জিনিসের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে না। তবে তার নিজের জানা অনুযায়ী সে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু বিচারক সে সাক্ষ্যকে জায়েয ধরে নেবে না। তবে তার নিজের জানা অনুযায়ী সে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু বিচারক সে সাক্ষ্যকে জায়েয ধরে নেবে না। তবে তার উপর 'হক' ধার্য, সে যদি তার সাক্ষ্য তার নিজের উপর লিখে থাকে 'হক-এর কথা উল্লেখ সহকারে, আর সাক্ষীগণ মরে গিয়ে থাকে, পরে সে অস্বীকার করে, তার পরে দুইজন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, এটা তার নিজেরই লেখা, তাহলে মাল সম্পর্কে সে ফয়সালা দেবে। তবে মালের মালিককে কিরা-কসম করতে বলা যাবে না। আশহুব উল্লেখ করেছেন, যার হাতের লেখা পরিচিত, কিন্তু সে সাক্ষী হওয়ার কথা স্মরণ করতে পারে না, তাহলে সে তা সরকারের নিকট জমা করে দেবে এবং তাকে তা জানিয়ে দেবে, যেন সে সে বিষয়ে তার রায় জানতে পারে। সওরী বলেছেন, যখন সে বারণ করে যে, সে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সে সেই সাক্ষ্য লিখেছে, তা হলে সে লিখিত বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। লায়স বলেছেন, সে যদি চিনতে পারে যে, তা তার নিজের হাতের লেখা, আর সে লোক যদি সত্য সাক্ষ্যদাতা হওয়ার দিক দিয়ে জানা-শুনা খ্যাতিমান হয়, তাহলে সে সাক্ষ্য দেবে। শাফেয়ী বলেছেন, অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকারের কথা যদি স্মরণ করে, তাহলে তার ভিত্তিতে রায় দেবে। তার নথিপত্রে তা শামিল হোক, আর না-ই হোক। কেননা নথিপত্রের কাজ হচ্ছে শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়া। আল-মুজানীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, সে স্মরণ করতে না পারা পর্যন্ত সাক্ষ্য দেবে না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ দুজনের একজন ভুলে গেলে— বিভ্রান্ত হলে তাদের অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে' এর তাৎপর্য আমরা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। আর দলীল লেখার উল্লেখের পর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক ন্যায়বিচার বিধায়ক, সাক্ষ্যের জন্যে দৃঢ় নীতি নির্ধারক এবং সন্দেহ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিকটতর ব্যবস্থা।' এর তাৎপর্য হল, সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করা জায়েয হওয়ার একটি শর্ত হল সাক্ষী তা স্মরণ করবে। শুধু লেখার উপর নির্ভর করা জায়েয হবে না। কেননা লেখা ও দস্তাবেজ তৈয়ার করার আদেশ হয়েছে, তদ্দ্বারা সাক্ষ্যের কথা স্মরণ করা হবে, কেবল এই উদ্দেশ্যে। এ কথা আল্লাহ্‌র এ কথা দ্বারাও প্রমাণিত হয় ঃ

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

তবে যে লোকরা 'হক' সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে জেনে-শুনে। ..... (সূরা যুখরুফ ঃ ৮৬)

তাই যদি সেই সে সাক্ষ্যদানের কথা স্মরণ করতে না পারে, তাহলে সে বিষয়ে জানে না বলতে হবে। আর আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -

যে বিষয়ে তোমার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে তুমি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

আয়াতটি উপরোক্ত কথাকেই প্রমাণ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকেও তা-ই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হল, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا رَاَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَاِلَّا فَدَعْ -

তুমি যখন ঘটনাটি ঠিক সূর্যকে দেখতে পাওয়ার মতই দেখে থাক, তাহলেই সাক্ষ্য দেবে। অন্যথায় সাক্ষ্য দেয়া ত্যাগ করবে।

এ হাদীসের সনদ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হাতের লেখার উপরও তো মিথ্যার অভিযোগ উঠতে পারে এবং সাক্ষীর উপর সন্দেহ হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। মনে করা হতে পারে যে, এটা তারই হাতের লেখা, অথচ প্রকৃত পক্ষে তার লেখা নয়। কিন্তু সাক্ষ্য যখন একটি জিনিসের বাস্তব পর্যবেক্ষণের ব্যাপার, সাক্ষ্যের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান বা জানা থাকার ব্যাপার। তাই যে লোক সাক্ষ্যের কথা স্মরণ রাখতে পারে না, সে তো এ গুণের বিপরীত অবস্থায় রয়েছে। তাই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া জায়েয হতে পারে না। বস্তুত সাক্ষ্যের ব্যাপারটির উপর খুব বেশি তাগিদ আরোপ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, স্পষ্ট উচ্চারিত শব্দে সাক্ষ্য না দেয়া হলে তা গ্রহণ করা যাবে না। স্থলাভিষিক্ত শব্দ বললেও গ্রহণ করা যাবে না। তাই যে হাতের লেখায় মিথ্যা আরোপিত হতে পারে, পরিবর্তন করা যেতে পারে, তার উপর ভিত্তি করে কাজ করা যেতে পারে কিভাবে? আবূ মুআবিয়া আন-নখয়ী শবী থেকে বর্ণনা করেছেন, যার হাতের লেখা ও মহর চেনা যাবে; কিন্তু সাক্ষী হওয়ার কথা মনে করতে পারে না, সে সাক্ষ্য দেবে না, সে তা স্মরণ করতে না পারা পর্যন্ত সাক্ষ্য দেবে না।

আল্লাহ্‌র কথা 'যদি দুজনের একজন বিভ্রান্ত হয়' অর্থ ভুলে যায়। কেননা বিভ্রান্তি হয় কোন কথা মন থেকে সরে গেলে। যে কোন জিনিস ভুলে গেছে, সে সেই জিনিস থেকে সরে গেছে, চলে গেছে। আয়াতে বলা হয় ঃ ضَلَّتْ عَنْهُ الشَّهَادَةُ 'সাক্ষ্য তার থেকে হারিয়ে গেছে' এবং ضَلَّ عَنْهَا 'সে সাক্ষ্য থেকে হারিয়ে গেছে। এর অর্থ একই।

সাক্ষী ও কিরা-কসম

সাক্ষী একজন। তখন তার সাক্ষ্য নেয়া এবং বাদীর দ্বারা কিরা-কসম করিয়ে কোন রায় দেয়া জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, দুজন সাক্ষী দ্বারা বিচারকার্য হবে না। একজন সাক্ষী ও অপর পক্ষের কিরা-কসমের ভিত্তিতে কোন রায় দেয়া যাবে না। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, এ দুটির ভিত্তিতে বিশেষ ধন-মালের ব্যাপারে ফায়সালা করা যাবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ - فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ -

এবং তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী বানাও। দুজন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক ......

এ আয়াত স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে, যাঁরা একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার কার্য করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন, তাঁদের মত বাতিল। কেননা আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সাক্ষী বানাও' আদেশে আয়াতের সূচনায় যে পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তির কথা বলা হয়েছে তাতে সাক্ষী বানাবার নির্দেশ রয়েছে। তা বিচারকের নিকট পেশ করা এবং বিচারকের পক্ষে তা গ্রহণ করার বাধ্যবাধকথা শামিল রয়েছে। কেননা ব্যবহৃত শব্দে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। আর কোন চুক্তিতে সাক্ষী বানানোর উদ্দেশ্যই হল কোন পক্ষে অস্বীকৃতির সময়ে তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা। অতএব তাতে দুজন সাক্ষী বানানোর নির্দেশ অবশ্য পালনীয় হয়ে আছে। অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক— এ তো হতেই হবে। সে সাক্ষী বানাতে হবে চুক্তির ব্যাপারে বিচারকের নিকট ফায়সালার জন্যে পেশ করার উদ্দেশ্যে। বিচারক সে সাক্ষ্য গ্রহণে বাধ্য। ব্যাপার যখন এই, তখন বাহ্যত তা আদেশ এবং পালন করা ফরয। এটা আল্লাহ্‌র আদেশ, আর আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ— প্রত্যেকটি আদেশই পালন করা ফরয। আল্লাহ উক্ত সংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করা বিচারকের জন্যে বাধ্যতামূলক করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র আদেশ ঃ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً -

অতএব তোমরা তাদেরকে আশিটা দোররা মার। (সূরা নূর ঃ ৪)

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

অতএব তোমরা তাদের দুজনার প্রত্যেককে একশটি দোর্‌রা মার। (সূরা আন-নূর ঃ ২)

এ আয়াতদ্বয়ে যে সংখ্যার উল্লেখ হয়েছে, সেই সংখ্যার কম সংখ্যক দোর্‌রা কখনই জায়েয হতে পারে। সাক্ষ্যের জন্যে যে সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতে, তাও বাধ্যতামূলক। সেই সংখ্যার কম সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিচার করা জায়েয নয়। বরং তা কুরআনের বিরুদ্ধতা। যথা কেউ যদি 'কযফ' অপরাধের শাস্তি হিসেবে সত্তর দোররা কিংবা যিনার দণ্ডে নব্বই দোররা জায়েয বলে, তাহলে সে কুরআনের স্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধতা করে। উপরন্তু সাক্ষ্যের আয়াতে সাক্ষীদের ব্যাপারে দুটি জিনিস শামিল রয়েছে। একটি হচ্ছে সংখ্যা আর অপরটি গুণ-পরিচিতি। তা হল, সাক্ষীরা হবে স্বাধীন, পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে' এবং বলেছেন ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা পছন্দ কর এমন লোকদের থেকে।' সাক্ষীদের জন্যে এ দুটি গুণ বর্তমান থাকা শর্ত। এর কোন একটি গুণকে বাদ দেয়া জায়েয নয়, দুটি গুণের থেকে একটি গুণ পাওয়া গেলেই তার ভিত্তিতে বিচারের কাজ চালানো যাবে না। অনুরূপভাবে উদ্ধৃত সংখ্যা হ্রাস করাও জায়েয হবে না। কেননা বিচার কার্য করার জন্যে উদ্ধৃত দুটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকাই আয়াতের দাবি। সে দুটির একটি হল সংখ্যা আর অপরটি সততা-ন্যায়পরতা পছন্দ হওয়া। এর কোন একটি বাদ দেয়া জায়েয হতে পারে না। সততা-ন্যায়পরতা অপেক্ষা সংখ্যাটা রক্ষা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পছন্দ হওয়ার ব্যাপার-ও। কেননা সংখ্যাটা তো দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানা, বোঝা ও দেখা যায়। কিন্তু সততা-ন্যায়পরতার ব্যাপারটি বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়, প্রকৃত পক্ষে জানা সম্ভব হয়

না। তাই বাহ্যিকভাবে প্রামাণ্য সততা-ন্যায়পরতার শর্ত বাদ দেয়া যেমন জায়েয নয়, ঠিক তেমনি প্রকৃত ব্যাপারের দিক দিয়ে সংখ্যার শর্তটি বাদ দেয়াও জায়েয নয়। উপরন্তু আল্লাহ যখন মেয়েদের সাক্ষ্যদানকে জায়েয করার ইচ্ছা করেছেন সতর্কতা রক্ষার শর্তের ভিত্তিতে, তখন দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য— একজন পুরুষের স্থলে— হওয়া অবশ্যই জরুরী হবে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কথা হল ঃ 'তাদের দুজনের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।' তারপরে বলেছেন,'এ ব্যবস্থা আল্লাহ্র নিকট অধিক সুবিচারপূর্ণ, সাক্ষ্যের ব্যাপারে অধিক দৃঢ়তা বিধায়ক এবং সন্দেহ থেকে অনেক দূরে থাকার উপায়।'

এ ব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তুহমাত, সন্দেহ ও ভুলভ্রান্তি প্রতিরোধ করার কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেছেন। আর তাতেই নিহিত রয়েছে বাদীর কিরা-কসম গ্রহণ না করা এবং একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার না করার বিধান। কেননা তাহলে আল্লাহ্ যে সতর্কতা ও বাহ্যিক দিক রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, তাকে বাদ দিয়ে তা ছাড়াই বিচারকার্য করা হবে। সন্দেহ-সংশয় থেকে দূরে থাকার জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাকে অগ্রাহ্য করা হবে। বাদী পক্ষের কিরা-কসম গ্রহণ করায় বিরাট সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয়ার সম্ভাবনা, তার উপর প্রচণ্ড 'তুহ্মাত' হওয়াও অসম্ভব নয়। আর তা আয়াতের লক্ষ্যের পরিপন্থী ব্যাপার। আর একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসম গ্রহণ করা বাতিল— এ আয়াতটুকুও তা প্রমাণ করে ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমাদের পছন্দনীয় লোকদের মধ্যে থেকে'। একজন সাক্ষী, যে অগ্রহণযোগ্য তা তো জানা-ই আছে। আয়াত-ও সেকথা বলে না। বাদীর কিরা-কসমকে তো আর সাক্ষী বলা যায় না। আর যে লোক নিজের জন্যে এটা দাবি করে, তাতে সে পছন্দনীয় ব্যক্তিও হতে পারে না। অতএব একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করা কুরআনের আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী— এ সব দিক দিয়ে। আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যে সতর্কতা গ্রহণ করাতে চেয়েছেন এবং যে দৃঢ়তা নিশ্চিন্ততাকে বিচারকার্যে নিশ্চিত করা জরুরী মনে করেছেন, তাতে তা সবই সুদূরপরাহত ব্যাপার হয়ে যায়। নবী করীম (স)-এর একটি কথা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ -

অকাট্য প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদীর উপর এবং কিরা-কসম করার কাজ বিবাদীর করণীয়।

এ হাদীসে 'অকাট্য প্রমাণ' ও কিরা-কসমের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কাজেই কিরা-কসম 'অকাট্য দলীল' পর্যায়ে গণ্য হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেননা কিরা-কসমকে অকাট্য দলীল বানানো জায়েয হলে রাসূলের কথাটি এ ধরনের রূপ নেয় ঃ 'বাদীর উপর অকাট্য প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব, বিবাদীর উপর অকাট্য প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব।'

এ اَلْبَيِّنَة 'অকাট্য প্রমাণ' কথাটি একটি বর্ণনাম, এ পর্যায়ের সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অকাট্য প্রমাণ যা কিছু তা পেশ করার দায়িত্ব বাদীর উপর। তার উপর কিরা-কসমের কোন দায়িত্ব নেই। উপরন্তু اَلْبَيِّنَة 'অকাট্য প্রমাণ' কথাটি অস্পষ্ট— ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফিকাহবিদগণ একমত হয়ে বলেছেন, হাদীসের 'অকাট্য প্রমাণ' বলতে বোঝায় দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে সাক্ষী। এ জিনিসের উপরই 'অকাট্য প্রমাণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপর্যগতভাবে কথাটি দাঁড়ায় ঃ 'দুজন পুরুষ সাক্ষী

অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে সাক্ষী পেশ করার দায়িত্ব বাদীর উপর অর্পিত।' অতএব তার কমে 'অকাট্য প্রমাণ' কথাটি বাস্তবায়িত হতে পারে না। উপরোক্ত হাদীসটি 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের হলেও মুসলিম উম্মাহ তাকে পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে ও আইনের ধারা হিসেবে ব্যবহারও করেছে। ফলে তা 'মুতাওয়াতির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর এ কথাটিও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ -

মানুষকে যদি তার দাবি অনুযায়ী-ই দেয়া হতো, তাহলে এক-এক জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠীর রক্ত ও ধন-মাল পেতে চাইত।

এ হাদীসটির কথার ধরন দুভাবে সাক্ষী ও কিরা-কসম বাতিল হওয়া সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করছে ঃ একটি এই যে, বাদীর কিরা-কসম বাদীর দাবি বিশেষ। কেননা কিরা-কসম করে তার দাবিকেই জানিয়ে দেয় মাত্র এবং এ দুটি অভিন্ন। তাই সে যদি তার কিরা-কসম দ্বারা কিছু পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে তা তার শুধু দাবির দ্বারাই পাওয়ার যোগ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নবী করীম (স) শুধু দাবির বলে কিছু পাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। আর দ্বিতীয়, বাদীর শুধু দাবির ভিত্তিতে পাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অতএব কিরা-কসমের বলেও কিছু পাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। কেননা বাদীর কিরা-কসম তার নিজের শুধু মৌখিক কথা ছাড়া আর তো কিছুই নয়। আল-কামা ইবনে অয়েল ইবনে হাজার— তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীস-ও তাই প্রমাণ করে। হাদীসটি হাজরামী প্রসঙ্গে। তিনি আল কিন্দীর সাথে একটি জমির ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। জমিটি তাঁর দখলে ছিল এবং তিনি সেটি তাঁর জমি বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু আল-কিন্দী তা অস্বীকার করছিলেন। তখন নবী করীম (স) আল-হাজরামীকে বলেছিলেন ঃ তোমার দুজন সাক্ষী অথবা প্রতিপক্ষের কিরা-কসম তোমার জন্যে কিছুই প্রমাণ করে না। করে তা-ই'— এ কথার তাৎপর্য হল, দুজন সাক্ষী পেশ না করা পর্যন্ত কোন দাবিই স্বীকৃতি পেতে পারে না। এর অর্থ, তার জন্যে কিছুই প্রমাণ করে না।

যদি বলা হয়, বিবাদীর স্বীকারোক্তির দ্বারা পাওয়ার যোগ্য হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয় নি। অনুরূপভাবে একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের দ্বারা দাবি পাওয়ার যোগ্য হওয়াকেও নিষিদ্ধ করা হয়নি।

জবাবে বলা যাবে, বিবাদী তো বাদীর দাবিকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। এ অস্বীকৃতিকালে বাদীর দাবির সত্যতা প্রমাণকারী সিদ্ধান্তের কথাই নবী করীম (স) বলেছেন। কিন্তু বিবাদী যদি দাবি স্বীকার করে, তাহলে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তা প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু বাহ্যত তা কিছুই না-পাওয়ার দাবি করে। তবে যা হাদীসে বলা হয়েছে, শুধু তা। যদি বিবাদী স্বীকার করে, তাহলে তার এ স্বীকৃতিতেই বাদী তার দাবি পেয়ে যাওয়ার যোগ্য হবে— এটা সর্বসম্মত মত। এ জন্যেই আমরা সেই হুকুম দেব, একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। তাই রাসূলের কথা ঃ তোমার দুজন সাক্ষী অথবা তার কিরা-কসম তোমার জন্যে কিছু নয়, তা বাতিল হওয়াই প্রমাণ করে।

যাঁরা এ মতে দিয়েছেন যে, একজন সাক্ষী ও সেই সাথে বাদীর কিরা-এর ভিত্তিতে বিচার করা যাবে, তাঁরা প্রমাণ হিসেবে কতিপয় অস্পষ্ট হাদীস পেশ করেছেন, সে সব বর্ণনায় নবী

করীম (স)-এর কতিপয় বিচারের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা তার উল্লেখ করব এবং সে কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব।

একটি হাদীস আবদুর রহমান ইবনে সীমা বর্ণিত। বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা আহমাদ—আবূ সাঈদ, সুলায়মান, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, সহল ইবনে আবূ সালিহ, আবূ হুরারাতা সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ -

রাসূলে করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার কার্য করেছেন।

উসমান ইবনুল হিকাম, জুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ, সুহায়ল ইবনে আবূ সালিহ— তাঁর পিতা— জায়দ ইবনে সাবিত সূত্রে অনুরূপ কথা নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অপর হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে বকর আবূ দাউদ, উসমান ইবনে আবূ শায়বা ও আল-হাসান ইবনে আলী সূত্রে। জায়দ ইবনুল হুবাব তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, সায়ফ— অর্থাৎ ইবনে সুলায়মান আল-মক্কী, কায়স ইবনে সাঈদ, আমর ইবনে দীনার, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'রাসূলে করীম (স) কিরা-কসম ও একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ও সালমাতা ইবনে শুবাইব, আবদুর রায্‌যাক, মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম, আমর ইবনে দীনার সূত্রে উক্ত অর্থেরই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ— তাঁর পিতা— আবদুল্লাহ ইবনুল হরস, সায়ফ ইবনে সুলায়মান, কায়স ইবনে সাঈদ, আমর ইবনে দীনার, ইবনে আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'নবী করীম (স) কিরা-কসম ও একজন সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচার করেছেন। আমর বলেছেন, এটা ধন-মালের ব্যাপারে ফায়সালা ছিল। আবদুর রহমান ইবনে সীমা, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ— তাঁর পিতা আহমাদ, অকী, খালেদ ইবনে আবূ করীমা, আবূ জাফর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَزَشَهَادَةَ رَجُلٍ مَعَ يَمِيْنِ الْمُدَّعِىْ فِىْ الْحُقُوْقِ -

রাসূলে করীম (স) বাদীর একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে হক্-হুকুকের মামলার বিচার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এ হাদীসটি মালিক ও সুফিয়ান জাফর ইবনে মুহাম্মাদ-তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, নবী করীম (স) এক ব্যক্তির ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করেছেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এ সব হাদীস গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক রয়েছে। তাতে যে একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা জায়েয প্রমাণিত হয়, তা-ও কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি কারণ, সাক্ষ্য গ্রহণের গোটা ব্যবস্থা ও বিচার পদ্ধতি এর ফলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়— যাঁদের থেকে উক্ত হাদীসসমূহ বর্ণিত হওয়ার কথা

বলা হয়েছে, তাঁরা তা অস্বীকার করেছেন। তৃতীয়— তাতে কুরআনের অকাট্য দলীলকে 'রদ' করা হয়। চতুর্থ— এসব হাদীস যদি আঘাত ও বিনষ্ট থেকে সুরক্ষিত মেনেও নেয়া হয়, তবুও বিপরীত মতটি প্রমাণিত হয় না। পঞ্চম— এ সব হাদীস কুরআনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে, তার সম্ভাবনা আছে।

এ সব হাদীসের বর্ণনাধারায় বিপর্যয় থাকার ব্যাপারটি সম্পর্কে বলা হল, সায়ফ ইবনে সুলায়মান বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণিত হয়। কেননা এ সায়ফ ইবনে সুলায়মান দুর্বল বর্ণনাকারী। আর আমর ইবনে দীনার ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট হাদীস শুনেছেন, এ কথা সহীহ্ প্রমাণিত হয়নি। অতএব তা বিপরীত মতের লোকদের দলীল হতে পারে না।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ, আহমাদ, আবূ সালমাতা আল-খুজায়ী, সুলায়মান ইবনে বিলাল, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, ইসমাইল ইবনে আমর ইবনে কায়স ইবনে সাদ ইবনে উবাদাতা— তাঁর পিতা আমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সাদ ইবনে উবাদাতা লিখিত কিতাবে এ কথা লিখিত পেয়েছেন যে, নবী করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচারকার্য করেছেন। যদি তার নিকট আমর ইবনে দীনার, ইবনে আব্বাস সূত্রের সনদ থাকত, তাহলে সে তা অবশ্যই উল্লেখ করত। তারা নিশ্চয়ই সাদ ইবনে উবাদা লিখিত কিতাবে কিছু লিখিত পাওয়ার কথা বলত না। সুহায়ল বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে কথা হল, মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, আহমাদ ইবনে আবূ বকর আবূ মুসয়ির আজ-জুহরী দারাওয়ার্দী, রবীআতা ইবনে আবূ আবদুর রহমান, সুহায়ল ইবনে আবূ সালিহ, আবূ সালিহ, আবূ হুরায়রাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচারকার্য করেছেন। আবূ দাউদ বলেছেন, রুবাই ইবনে সুলায়মান আল-মুয়ায্যিন এ হাদীসের কথা আরও বাড়িয়ে বলেছেন। বলেছেন, শাফেয়ী আবদুল আজীজ সূত্রে বলেছেন। পরে এ কথা আমি সুহায়লকে বলেছি। তখন তিনি বললেন, রবীআতা আমাকে খবর দিয়েছে। আমার মতে রবীআতা 'সিকাহ' বর্ণনাকারী। আমি তাকে হাদীস শুনিয়েছি। তবে আমি তা মুখস্থ করে রাখিনি। আবদুল আজীজ বলেছেন, সুহায়লকে কোন 'ইল্লাত' পেয়ে বসেছিল, যা তার বিবেক-বুদ্ধি দূর করে দিয়েছে। আর তার বর্ণিত হাদীসের কিছু অংশ সে ভুলে গেছে। পরে সুহায়ল রবীআতা— তাঁর পিতা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন।

মুহাম্মদ ইবনে বকর, আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ আল-ইসকান্দারানী, যিয়াদ ইবনে ইউনুস, সুলায়মান ইবনে বিলাল, রবীআতা আবূ মুসয়িব-এর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান বলেছেন, আমি সুহায়লকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, আমি তো তা জানি না, চিনি না। আমি তাঁকে বললাম, রবীআতা আমাকে আপনার নামে এ হাদীস শুনিয়েছেন। রবীআতা যদি তোমাকে আমার নামে এ হাদীস শুনিয়ে থাকে, তাহলে তুমি তা রবীআতার নামেই বর্ণনা কর। এ ধরনের বর্ণনার হাদীস দ্বারা শরীয়াত প্রমাণিত হতে পারে না, যখন যার নামে তা বর্ণিত, তিনিই তা অস্বীকার করেন। তিনি তা চিনতেও পারেন না।

যদি কেউ বলেন, হতে পারে, এক সময় তা তিনি বর্ণনা করেছেন, পরে তিনি তা ভুলে গেছেন।

জবাবে বলা যাবে, এ-ও তো হতে পারে যে, শুরুতেই তাঁর এ বিষয়ে সংশয় ঘটেছে এবং যা শুনেন নি, তা-ই তিনি বর্ণনা করেছেন। আমরা জানি যে, এ অস্বীকৃতি তাঁর জীবনের শেষ দিকের ব্যাপার ছিল। তিনি এ সম্পর্কিত জ্ঞান-ই হারিয়ে ফেলেছিলেন।

আর জাফর ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণিত হাদীসটি 'মুরসাল'। আবদুল ওহাব আস্-সকফী সেটিকে 'মুত্তাসিল (متصل) বানিয়েছেন। এ-ও বলা হয়েছে যে, তিনি তাতে ভুল করেছেন। পরে তিনি তা জাবিরকে শুনিয়েছেন। সেটি আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, নবী করীম (স) সূত্রে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আমরা এই যে সব কথার উল্লেখ করলাম, তা যেসব কারণ এসব হাদীস গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক, তার মাত্র একটি কারণ। এসব কারণে এসব হাদীসের ভিত্তিতে শরীয়াতের কোন হুকুমই প্রমাণিত হতে পারে না।

অপর একটি দিক দিয়ে বলা যায়, আবদুর রহমান ইবনে সীমা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, আহমাদ, ইসমাঈল, সওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আমি রবীআতার রায়কে বললাম ঃ তোমাদের কথা হচ্ছে, সাক্ষীর সাক্ষ্য, আর দাবিদারের কিরা-কসম তা কোথায় পেলে ? বললেন, সাদ লিখিত কিতাবে পেয়েছি। তাই বলতে হয়, সুহায়ল বর্ণিত হাদীস যদি রবীআতার নিকট সহীহ্ হতো, তাহলে তার উল্লেখ অবশ্যই করতেন। সাদ লিখিত কিতাবের উপর নির্ভরতা গ্রহণ করতেন না।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, তাঁর পিতা আহমাদ, আবদুর রাযযাক, মামার, জুহরী সূত্রে সাক্ষী ও কিরা-কসম পর্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি এই হাদীস লোকদের নিকট বর্ণনা করি; কিন্তু তা দুজন সাক্ষী ছাড়া নয়।

হাম্মাদ ইবনে খালিদ আল-খায়ত হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, আমি ইবনে আবূ যিবকে জিজ্ঞাসা করেছি, একজন সাক্ষী ও কিরা-কসম সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জুহরীর কি বক্তব্য ছিল ? বললেন, তিনি বলতেন, এটা বিদআত। এই ব্যবস্থার অনুমতি প্রথম দিয়েছেন মুআবিয়া (রা) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে আবূ যিব থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি জুহরীর নিকট একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও বাদী দাবিকারীর কিরা-কসম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন ঃ

مَا اَعْرِفُهُ وَاِنَّهَا بِدْعَةٌ وَاَوَّلُ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ -

আমি তা জানি না। তা নিঃসন্দেহে বিদআত। মুআবিয়াই সর্বপ্রথম এর ভিত্তিতে বিচার কার্য সম্পন্ন করেছেন।

ইমাম জুহরী তাঁর সময়ে ইলমে হাদীস তথা ইলমে শরীয়াতের সর্বাধিক ইলমের অধিকারী ছিলেন। তাই বলা যায়, এ হাদীসটি যদি প্রমাণিত হতো তাহলে তাঁর নিকট তা অজানা অপরিচিত থাকতে পারত না। ইলমে শরীয়াতে এটা একটা বিরাট মৌলনীতি। তাছাড়া কথা সকলেরই জানা যে, মুআবিয়াই সর্বপ্রথম এই ভিত্তিতে বিচারকার্য করেছেন এবং তা বিদআত।

মুআবিয়া থেকেই বর্ণিত, তিনি ধন-মালের মামলায় বাদীর কিরা-কসম ছাড়াই একজন মাত্র মেয়ে সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা দিয়েছেন।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা, আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ, আহমাদ, আবদুর রাযযাক ও রুহ ও মুহাম্মাদ ইবনে বকর প্রমুখ বলেছেন, ইবনে জুরাইয, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ মুলায়কাতা, আল-কামা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস সূত্রে বর্ণিত, তিনি জানিয়েছে, উম্মে সালমাতা, রাসূলে করীম (স)-এর স্ত্রী, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জুহাইর ও তাঁর ভাইদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রবীআতা ইবনে আবূ উমাইয়্যা তাঁর ভাই জুহাইর ইবনে আবূ উমায়্যাতাকে তাঁর জমির

অংশ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এজন্যে উম্মে সালমাতা ছাড়া আর কাউকে সাক্ষী বানান নি। পরে মুআরিয়া (রা) কেবল তাঁর সাক্ষ্যকেই জায়েয ধরে ফায়সালা দিয়েছিলেন। আল-কামা উপস্থিত থেকে মুআবিয়ার এ ফয়সালা দিতে দেখেছিলেন। অতএব মুআবিয়ার একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে এ বিচার ফায়সালা দান জায়েয হলে কোন কিরা-কসম ব্যতীতই শুধু একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া অবশ্যই জায়েয হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব তোমরা সে রকমই বিচার কর। আর কুরআন সুন্নাহ্‌র নির্দেশকে অগ্রাহ্য করতে থাক।

আবদুর রহমান ইবনে সীমা আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, আহমাদ, আবদুর রাযযাক, ইবনে জুরাইয সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, আতা বলতেন, ঋণ ইত্যাদির বেলায় দুজন সাক্ষী ছাড়া সাক্ষ্য জায়েয হবে না। কিন্তু আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ক্ষমতাসীন হয়ে একজন পুরুষের সাক্ষ্য ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করতে শুরু করলেন। মুতরাফ ইবনে মাজেন, ইয়ামানবাসীদের বিচারক, ইবনে জুরাইয, আতা ইবনে আবূ রিবাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আতা বলেছেন, আমি এ মক্কা নগরকে এমন পেয়েছি যে, লোকদের হক-হুকুকের ব্যাপারে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া কোন রায় দেয়া হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ক্ষমতাসীন হয়ে একজন সাক্ষী ও বাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার চালাতে লাগলেন।

লায়স ইবনে সাদ জুরাইক ইবনে হুকায়ম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি উমর ইবনে আবদুল আজীজ (জুরাইক তাঁর গভর্নর ছিলেন) কে লিখে পাঠালেন, আপনি মদীনায় একজন সাক্ষী ও পাওনাদারের কিরা-কসমের ভিত্তিতে ফায়সালা করতেন। জবাবে উমর লিখেছিলেন, হ্যাঁ, আমি সেভাবেই বিচারকার্য করতাম। যদিও লোকদেরকে আমি ভিন্নভাবে বিচার করতে দেখেছি। আজ আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে। এভাবে আগের কালের শরীয়াতবিদগণ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচারকার্য করা মুআবিয়ার (রা) ও আবদুল মালিকের রীতি বা সুন্নাত। তা রাসূলে করীমের সুন্নাত নয়। তা যদি রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত হতো, তাহলে তাবেয়ী আলিমগণের নিকট তা অজানা থাকতে পারত না।

আমরা এই যে দুই কারণের উল্লেখ করলাম,— তার একটি সনদ বেঠিক হওয়া ও তার উল্টা-পাল্টা হওয়া। আর দ্বিতীয়, সুহায়লের অস্বীকৃতি— যে, তিনি তা বর্ণনা করেন নি, অথচ তিনি উত্তম বর্ণনাকারী এবং রবীআতার এই সংবাদ দান যে, এই বর্ণনার মূল হল সাদের লিখিত কিতাব। সেই সাথে তাবেয়ী আলিমগণের অস্বীকৃতি এবং তাদের এ সংবাদ দান যে, তা বিদআত, মুআবিয়া ও আবদুল মালিকই সর্বপ্রথম এ পদ্ধতিতে বিচারকার্য করেছেন। আর তৃতীয় কারণ হল, এসব হাদীস যদি সুদৃঢ় বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হতো, তাহলে এ ধরনের 'খবরে ওয়াহিদ অবশ্যই গৃহীত হতো, আগের কালের মনীষীদের অস্বীকৃতি ও তা বিদাআত অভিধায় অভিহিত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতো। তাই এসব হাদীস কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কেননা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কুরআনের হুকুম মনসূখ হতে পারে না। মনসূখ হওয়ার দিকটি হল, আয়াতটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিদগণ যে তাৎপর্য বুঝতে পারেন, যাতে কারোর মনে একবিন্দু সন্দেহের উদ্রেক হয় না, তা হল, দুজন পুরুষ সাক্ষী কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে সাক্ষী ছাড়া বিচারকার্য সম্পন্ন হতে পারে না। উদ্ধৃত হাদীসসমূহ গ্রহণ করা হলে আয়াতে উল্লেখ করা সংখ্যার কমে বিচার করা জায়েয হয়ে পড়ে। কেননা আয়াতের

উল্লিখিত সংখ্যায় একজন সাক্ষী ও কিরা-কসম কখনই শামিল গণ্য করা যায় না। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ 'ওদেরকে আশি দোররা মার' এবং 'ওদের দুজনের প্রত্যেককে একশটি দোররা মার'— এতে লিখিত সংখ্যার কম করা হলে শরীয়াতসম্মত শাস্তি 'হদ্দ' কার্যকর হবে না।

যদি কেউ প্রশ্ন তোলে যে, 'কযফ'-এর 'হদ্দ' আশি দোররার কমে হতে পারে— জায়েয, আর ব্যভিচারীর শাস্তিও একশ' দোররার কমে হতে পারে— আয়াতের বিপরীত। তেমনি যে একজন সাক্ষী গ্রহণ করল, সেও আল্লাহ্র আদেশ লঙ্ঘন করল— আল্লাহ্র বলা দুজন সাক্ষীর বদলে একজন সাক্ষী গ্রহণ করে আয়াতের অর্থের বিরুদ্ধতা করল। তেমনি অপর দিক দিয়ে সে কুরআনের কথার মূলে নিহিত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যকেই সে নস্যাৎ করে দিল। সাক্ষী বানাতে বলার লক্ষ্যকেই ব্যর্থ করে দিল। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ 'এ বিধান আল্লাহ্র নিকট অধিকতর ন্যায় বিচারের ধারক, সাক্ষ্যের জন্যে অধিক নির্ভরযোগ্য এবং সন্দেহ-সংশয় থেকে অনেক দূরে থাকার ব্যবস্থা।'

এবং আল্লাহ্র কথা ঃ 'সাক্ষী হিসেবে তোমরা যাদের পছন্দ কর, তাদের থেকেও একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'

এসব ঘোষণার দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বন, পাওনাদারের হক পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান এবং কুরআনী বিধানের বিজয় সাধন, সাক্ষীদের প্রতি সন্দেহ না হওয়া ও সব মিথ্যা দোষারোপ থেকে মুক্তি লাভ।

একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করা হলে উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের কোনটিই কার্যকর থাকে না। সেসবের গুরুত্বই অস্বীকৃত হয়ে যায়। আমরা এই যা বললাম, এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ওভাবে বিচার কার্য করা হলে কুরআনের পরিপন্থী কাজ হবে। উপরোক্ত দুটি দিকের বিশ্লেষণে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করা হলে আয়াতের স্পষ্ট বিরুদ্ধতা করা হবে। কুরআনের হুকুম তো দুজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে সাক্ষীর দ্বারা বিচার করাই ছিল চিরকালের প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর ব্যবস্থা। একজন সাক্ষী ও কিরা-কসম কুরআন পরিপন্থী বলে চিহ্নিত। অতএব একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার পদ্ধতি কুরআন দ্বারাই মনসূখ হয়ে গেল। কেননা তা যদি প্রমাণিত হতো, তাহলে তা লোকদের দ্বারা ব্যবহৃতও হতো, যেমন কুরআনের বিধান অনুযায়ী কাজ চালু ছিল।

আর চতুর্থ দিক হচ্ছে, একজন সাক্ষী ও কিরা-কসম যদি কুরআন-বিরোধী নয় বলে ধরেও নেয়া হয়, এবং তা দৃঢ়-শক্ত সূত্রে বর্ণিত-ও হতো, তবুও তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা সহীহ্ হতে পারে না। কেননা একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও বাদীর কিরা-কসম দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না। তাতে খুব বেশি ধরলেও শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, স্বয়ং নবী করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করেছেন, নবী করীম (স)-এর বিচারকার্যের এ বর্ণনায় এমন সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, যাতে একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করা ওয়াজিব-ফরয প্রমাণিত হতে পারে এবং অন্য লোকদের জন্যে তা অবশ্যই পালনীয় হতে পারে। হাদীসে তার অবস্থাটাও পূর্ণ মাত্রায় বিবৃত নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) একজন সাক্ষী ও কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। এরূপ কথার অর্থ এ-ও তো হতে পারে যে, একজন সাক্ষীর উপস্থিতি বিবাদীকে কিরা-কসম করতে বলার প্রতিবন্ধক নয়। যদি একজন সাক্ষীর

সাক্ষ্য লওয়ার পর বিবাদীকে কিরা-কসম করতে বলা হয়। বোঝা গেল, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য হলে তাতে বিবাদীর কিরা-কসম করা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। তার হওয়া না হওয়া বা থাকা-না থাকা অভিন্ন। কেউ ধারণা করতে পারে যে, কিরা-কসম করা বিবাদীর জন্যে কর্তব্য। কেননা বাদীর একজন সাক্ষী হিসেবে ধর্তব্য নয় আসলেই। বর্ণনাকারী তার বিচারের বর্ণনাকে বাতিল করে দিয়েছেন। এ একটা ধারণা মাত্র। তা ছাড়া 'সাক্ষী' শব্দটি বর্ণনাম-ও হতে পারে। হতে পারে, বর্ণনাকারী বলতে চেয়েছেন, কিরা-কসমের ভিত্তিতে বিচার এক অবস্থায় একভাবে হয়, অন্য অবস্থায় অন্য রকমের হয়। কাজেই 'সাক্ষী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে তা 'একজন সাক্ষী বোঝাবে,' এমন প্রমাণ নেই। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِ يَهُمَا -

পুরুষ চোর ও মেয়ে চোর— উভয়েরই হাতসমূহ কেটে ফেল। (সূরা মায়িদা ঃ ৩৮)

এ আয়াতে 'চোর' একটা বর্ণনাম। তার অর্থ একজন চোর হতেই হবে, এমন কথা নয়। হতে পারে, নবী করীম (স) একজন মাত্র সাক্ষী— খুজায়মা ইবনে সাবিত, যার একার সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বানানো হয়েছে— সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। তার পরেও বাদীর দ্বারা কিরা-কসম করানো হয়েছে। কেননা বিবাদী তো নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছেন।

পঞ্চম কারণ হচ্ছে, বিষয়টি হানাফী মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ারও পূর্ব সম্ভাবনা রয়েছে। তার এভাবে যে, বিচারের ব্যাপারটি ছিল এই— এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল এবং সেখানেই তার মধ্যে ত্রুটি বা খুঁত ধরে ফেলল। কোন ওযর ছাড়া সেদিকে নজর দেয়া যাবে না। ত্রুটি বা খুঁত প্রমাণে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য কবুল করা যাবে, আর সে সাথে ক্রয়কারীর কিরা-কসম গ্রহণ করা হবে। তা হবে আল্লাহ্‌র নামে। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হবে, বিক্রয়কারীর নিকট দাসীকে ফেরত দেয়া হবে, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। সেই সাথে বাদীকে কিরা-কসম করতে বলা হবে। এ বাদী তো সেখানে দাসী ক্রয়কারী। এখানে সাক্ষী ও কিরা-কসম আমাদের বিবৃত কথাসমূহের ধারক। সেই অর্থেই তা গ্রহণ করা কর্তব্য। তার সাথে একটি প্রতিষ্ঠিত হুকুম সব সময়ই থাকবে কুরআনের দলীল হিসেবে। কেননা নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

مَااَتَاكُمْ عَنِّىْ فَاعْرِضُوْهُ عَلٰى كِتٰبَ اللّٰهِ، فَمَا وَافَقَ كِتٰبَ اللّٰهِ فَهُوَمِنِّىْ، وَمَا خَالَفَهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ -

আমার বিষয়ে তোমাদের নিকট যা-ই আসে, তোমরা তা আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর ফেলে যাচাই কর। যা কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে, তা আমার থেকে মনে করবে। আর যা তার বিপরীত প্রমাণিত হবে, তা আমার থেকে নয় মনে করবে।

উপরন্তু একজন সাক্ষী ও কিরার ব্যাপারে যে বিচারকার্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ প্রমাণ নেই যে, তা ধন-মাল ইত্যাদি সংক্রান্ত ছিল। আর ফিকাহবিদগণ ধন-মাল ছাড়া অন্য ব্যাপারে তা বাতিল বলে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। ধন-মালেও তা বাতিল গণ্য হবে অনুরূপভাবে।

যদি বলা হয়, আমর ইবনে দীনার তো তা ধন-মালের ব্যাপার বলে দাবি করেছেন।

জবাবে বলা যাবে, তা আমর ইবনে দীনারের নিজের কথা। আর এটাই তাঁর মাযহাব। নবী করীম (স) ওভাবে ধন-মালের ক্ষেত্রে বিচারকার্য করেছেন— এমন কথা কিন্তু বলেন নি।

ধন-মাল ছাড়া অন্যবারে অন্য ব্যাপারে এরূপ বিচার করা যাবে না, এ যখন সঙ্গত, যদিও বিচার সংক্রান্ত কথা অস্পষ্ট, তাতে ধন-মালের বা অন্য কিছুর উল্লেখ নেই। অতএব ধন-মাল সংক্রান্ত ব্যাপারেও ওভাবে বিচার করা যাবে না, যখন সে বিচারের অবস্থাটারই কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ধন-মালে যখন সেরূপ বিচার নেই, তখন আরও সঠিকভাবে অন্য বিষয়েও তা হবে না।

যদি বলা হয়, সেভাবে বিচার করা যাবে সেসব ব্যাপার, যাতে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আর তা হচ্ছে ধন-মালের ব্যাপার। তাহলে বাদীর কিরা-কসম একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য অপর একটির সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত করা হবে।

জবাবে বলা যাবে, এ একটি দাবিমাত্র। এর দলীল-প্রমাণ কিছু নেই। তা সত্ত্বেও বাদীর কিরা-কসম অপর পুরুষ সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হল কি করে, একজন মেয়ে সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত না হয়ে। এ-ও বলা যায়, বাদী যদি একজন মেয়েলোক হয়, তাহলে তার কিরা-কসম কি কোন পুরুষ সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হবে? জবাবে যদি হ্যাঁ বলে, তাহলে বলা যাবে, কিরা-কসম সাক্ষ্যের অপেক্ষাও অধিক তাগিদপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা হক্-হুকুকের মামলায় একজন মেয়েলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য তার কিরা-কসম গ্রহণ করা যাবে। আর তা এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হবে। আল্লাহ তো আমাদেরকে তার সাক্ষ্য গ্রহণের আদেশ করেছেন, যাকে সাক্ষী হিসেবে আমরা পছন্দ করব। কিন্তু এই মেয়েলোকটি যদি একজন সাক্ষী হিসেবে গৃহীত হয়, অথবা তার হলপ একজন পুরুষের সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত গণ্য হয়, তাহলে কুরআনের বিরুদ্ধতা করা হবে। কেননা একটি লোক নিজের জন্যে যে দাবি করে, তাতে সে পছন্দনীয় ব্যক্তি রূপে গণ্য হবে না। তাদের কথার পারস্পরিক বিরুদ্ধতা বোঝা যায় এ দিক দিয়ে যে, অর্থনৈতিক ঋণ চুক্তিতে মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন কাফিরের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, কাফির ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণীয় নয়, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। পরন্তু বাদী যদি হয় কাফির বা ফাসিক, আর সাক্ষ্য দিল মাত্র একজন সাক্ষী, তারা তাকে হলপ করতে বলল এবং সে যা দাবি করে তা সে তার কিরা-কসম দ্বারা পেয়ে যায়, সে যদি এ ধরনের কোন সাক্ষ্য অপর একজনের জন্যে দেয়, আর সে তাতে পঞ্চাশবার কিরা-কসম করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না— গ্রহণ করা যাবে না তার কিরা-কসম। যদি সে নিজের জন্যে দাবি করে— অর্থাৎ মামলার বাদী নিজে হয়েও কিরা-কসম করে, সে যার দাবি করেছিল, তা সে পেয়ে যাবে তার কথার দ্বারাই। যদিও সে সাক্ষী হিসেবে অপছন্দনীয় ব্যক্তির সংরক্ষিতও সে নয়, না তার সাক্ষ্যে, না কিরা-কসমে। এ থেকেই প্রমাণিত হল যে, তাদের কথা বাতিল, তাদের মাযহাব চূর্ণকারী।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا -

সাক্ষীগণকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ডাকা হলে তারা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবে না।

সাঈদ ইবনে যুবায়র, আতা, মুজাহিদ, শবী ও তায়ূস থেকে বর্ণিত, সাক্ষীগণকে সাক্ষ্যদানের জন্যে ডাকা হলে (তাহলে যেতে অস্বীকার করতে পারবে না)। আর কাতাদাতা ও রুবাই ইবনে আনাস থেকে উক্ত আয়াতের অর্থ হিসেবে বর্ণিত, লিখিত সাক্ষ্যের সত্যতা যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন ডাকা হবে, তখন উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা) ও আল-হাসান থেকে বর্ণিত, উক্ত আয়াতটি এক সাথে দটি কথা বলেছে। একটি হল— লিখিত

দলীলে সাক্ষী হিসেবে দেয়া সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণ করা এবং দ্বিতীয়— বিচারকের নিকট বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা।

আবূ বকর (রা) বলেছেন, আয়াতটি বাহ্যত উক্ত দুটি বিষয়েই বলা হয়েছে, একথা ঠিক। কেননা ব্যবহৃত শব্দ সাধারণ তাৎপর্য সম্পন্ন। তা শুরুতে সাক্ষ্য প্রমাণিত করার ব্যাপার। যেন বলা হয়েছে, দলীলে তাদের লিখিত সাক্ষ্যসমূহের প্রমাণ করার জন্যে যদি ডাকা হয়, তাহলে .... চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হওয়া সাক্ষীগণ সম্পর্কে একথা নয়। চুক্তির পক্ষদ্বয়ের উপর কর্তব্য হচ্ছে, সাক্ষ্যদ্বয়কে সাক্ষ্যদানের জন্যে উপস্থিত করা। যখন তারা দুজনই উপস্থিত হলে। এবং তাদেরকে দলীলে তাদের লিখিত সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণ করতে বলা হবে, ঠিক এ অবস্থাই বক্তব্যের মধ্যে শামিল আল্লাহ্র এই اذاما دعوا 'যখন তাদের ডাকা হবে' কথায়। অর্থাৎ ডাকা হবে সাক্ষ্যকে প্রমাণ করার জন্যে। তবে তারা দুজন তাদের সাক্ষ্যদ্বয়কে প্রমাণিত করল, পরে তা বিচারকের নিকট প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাদেরকে ডাকা হল, আয়াতে এ ডাকার কথাই বলা হয়েছে এবং তা হল, বিচারকের নিকট হাজির হওয়া। কেননা বিচারক নিজে তো আর সাক্ষীদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হবে না এজন্যে যে, তারা তার নিকট সাক্ষ্য দেবে। বরং সাক্ষীদেরই কর্তব্য হচ্ছে বিচারকের নিকট উপস্থিত হওয়া । অতএব প্রথম ডাকা হল, দলীলের সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে। আর দ্বিতীয় ডাকা হল, বিচারকের নিকট হাজির হয়ে, তার নিকট তাদের দেয়া সাক্ষ্যের সত্যতা-যথার্থতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ -

এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী বানিয়ে নাও।

এর দুটি অবস্থা হতে পারে। শুরু থেকে একটা অবস্থা এবং বিচারকের নিকট সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা। আর আল্লাহ্র কথা ঃ 'একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে' থেকে সাক্ষ্যদানের শুরুতেই তা হওয়া জরুরী নয়। কেননা তাতে শব্দ যত শামিল করে তার কিছু অংশের উল্লেখ হয়েছে তাতে। অতএব তাতে কোন বিশেষ প্রমাণ নেই।

যদি কেউ বলেন, আল্লাহ্ যখন 'সাক্ষীগণ অস্বীকার করবে না যখন তাদের ডাকা হবে' বলেছেন, এতে 'সাক্ষীগণ' নামে তাদেরকে অভিহিত করেছেন। বোঝা গেল, এটা সে অবস্থার কথা যখন সাক্ষ্য বিচারকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কেননা তারা দলীলের সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে 'সাক্ষী' নামে অভিহিত হতে পারে না।

জবাবে বলা যাবে, একথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই জন সাক্ষী বানাও।' এতে আল্লাহই তাদেরকে 'দুইজন সাক্ষী' বলেছেন। তাদেরকে সাক্ষী বানাতে— সাক্ষ্য দিতে আদেশ করেছেন। অথচ এখন পর্যন্ত সাক্ষ্য দেয়ার কোন কাজ-ই করেনি। কেননা একথার অর্থ যে শুরু অবস্থা বোঝানো, তাতে কোন মতপার্থক্য নেই। তা আল্লাহ্র এ কথাটির মতই ঃ

فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ -

সে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ সে তাকে বাদে আর একজন স্বামী গ্রহণ না করবে।

এতে বিয়ের আগেই তাকে (যাকে পরে বিয়ে করবে) 'স্বামী' বলা হয়েছে। সাক্ষীর পক্ষে শুরুতেই সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব রয়েছে। ফরয হিসেবেই সে কাজ তাকে করতে হবে, যখন তাকে ছাড়া সাক্ষ্যদানের জন্যে অন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। তা ফরযে কিফায়া— যেমন জিহাদ, জানাযার নামায, মৃতের গোসল দান, তার কাফন-দাফন। কিছু লোক যখন তা পালন করবে, অন্যদের পক্ষ থেকেও তা আদায় হয়ে যাবে। সাক্ষ্যের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তা করা ও যথাযথ পালন করাও ফরযে কিফায়া। কিছু লোক সে দায়িত্ব পালন করলেই তা আদায় হয়ে যাবে। তা যে ফরযে কিফায়া— সকলের জন্যে ফরয নয়, তার প্রমাণ হল, সকলকেই তার বোঝা বহন করতে হবে— এমন কথা নয়। যদি প্রত্যেকের জন্যে জায়েয হতো যে, তার বোঝা বহন করা থেকে বিরত থাকবে, তাহলে সমাজে দলীল-দস্তাবেজ তৈরীই হতে পারত না। সাক্ষী বানাবার কাজটি অচল হয়ে যেত। আর তাতে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানটাও অকেজো হয়ে যেত। অথচ লোকদের জন্যে দলীল রচনা করার ও সাক্ষী বানানোর কাজটি খুবই পছন্দ করা হয়েছে। এ থেকে মোটামুটিভাবে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করার ফরয বাধ্যতামূলক হওয়া প্রমাণিত হয়।

এ ফরয অনির্দিষ্ট, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তা নির্দিষ্টভাবে ধার্য হয়নি, তার প্রমাণ এই যে, তার বোঝা বহন করা যে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্যেই ফরয নয়, সে বিষয়ে সব মুসলমান সম্পূর্ণ একমত। তা আল্লাহ্‌র এ কথাটি দ্বারাও প্রমাণিত হয়, বলেছেন ঃ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيدٌ -

দলীলের লেখক ও সাক্ষী— কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

সাক্ষী হওয়ার বোঝা বহন যখন ফরযে কিফায়া প্রমাণিত হল, বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালনও ফরযে কিফায়াই। কিছু সংখ্যক লোক তা করলেই অন্যদের পক্ষ থেকেও তা আদায় হয়ে যাবে। আর কুরআনে যখন মাত্র দুজন সাক্ষী বানাবার কথা বলা হয়েছে, তখন সে দুজনের উপরই তা 'ফরযে আইন' হয়ে যাবে, যখন তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ডাকা হবে। এর দলীল, আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'সাক্ষীদেরকে যখন ডাকা হবে, তখন তারা তা অস্বীকার করবে না।' এবং তাঁরই কথা ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ - وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَانَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপী।

বলেছেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত কর আল্লাহ্‌র জন্যে।

বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও, আল্লাহ্‌র জন্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে— তা যদি তোমাদের বিরুদ্ধেও হয়।

যদিও সাক্ষীদ্বয় স্বাধীন, তাদের দুজন ছাড়া অন্যরা তা কায়েম করার জন্যে এগিয়ে আসতে পারত। তা করলে তাদের উপর ফরয দাঁড়িয়ে থাকত না।— যেমন এর পূর্বে বলেছি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَاتَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْكَبِيرًا اِلَى اَجَلِهِ -

এবং তোমরা ছোট বা বড় বিষয়ে তার মিয়াদের উল্লেখ সহ লিখতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না।

মানব সমাজে সাধারণত অল্প মিয়াদের যে চুক্তি হয় কিংবা হয় বড় ও দীর্ঘ মিয়াদের— বা অল্প মালের চুক্তি হোক কি বড় মালের চুক্তি, তা লিখতে তোমরা ক্লান্তি বোধ করো না। লিখবে এবং তাতে সাক্ষীও বানাবে। একথা জানা আছে, ক্ষুদ্র পরিমাণের বা মূল্যের মুদ্রা তদানীন্তন মদীনায় সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না। তাহলেও তাতে মিয়াদ নির্দিষ্ট হতো না। কিন্তু আয়াতের হুকুম হল, অল্প পরিমাণের লেনদেনের সময় নির্ধারণ বড় পরিমাণের লেনদেনে সময় নির্ধারণে কোন পার্থক্য নেই। দুটিতে দলীল লেখা ও সাক্ষী বানানোর আদেশ অবশ্য পলনীয়। তবে খুব সামান্য মাত্র পরিমাণের লেনদেন ও দলীল লিখতে হবে, সাক্ষী বানাতে হবে, এ কথা বলা আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। সে সামান্য ব্যাপারে দলীল লেখা বড় জোর মুস্তাহাব হবে। সাধারণ প্রচলন হিসেবে যা চালু আছে, তা ইজতিহাদের পন্থায় চালু হয়েছে লোকদের বিজয়ী ধারণার ফলে। আর তাতে নিত্য নব ঘটনায় ইজতিহাদ করাই জায়েয প্রমাণিত হয়। কেননা সে বিষয়ে 'তাওকীফ' বিধানদাতার নিকট থেকে বিধান নাযিল হয়নি বলেই তাতে ইজতিহাদ করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ اِلَى اَجَلِهِ । অর্থাৎ মিয়াদের শেষ হওয়ার সময়ের উল্লেখ সহ। দলীলে এই মিয়াদ শেষ হওয়ার সময়কালের উল্লেখ থাকতে হবে মূল ঋণের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে। এর অর্থ এ-ও যে, সাক্ষীদ্বয়ের কর্তব্য, তারা দলীলে ঋণের বিবরণ তার নগদ, পরিমাণ ইত্যাদিও লিখাবে। মিয়াদ হলো তার একটি বিষয় মাত্র। ঋণ সংক্রান্ত সব ব্যাপারে গুরুত্ব অভিন্ন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

ذَلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ -

এই পদ্ধতিটা আল্লাহ্‌র নিকট অতীব ন্যায়পরতাপূর্ণ এবং সাক্ষ্যদান ব্যবস্থার দৃঢ়তা বিধানকারী।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, দলীল লিখতে ও সাক্ষী বানাতে বলার উদ্দেশ্য লেনদেনে দৃঢ়তা বিধান করা, ঋণ-চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সতর্কতা কার্যকর করা, অস্বীকৃতি প্রতিরোধ করা ও পারস্পরিক বিরোধ-পার্থক্য বিদূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা। লিখতে বলার তাৎপর্যও বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট ন্যায়পরায়ণতাপূর্ণ ব্যবস্থা। অর্থাৎ এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাদের পরস্পরের জুলুম শোষণ হতে না পারে, তার নিশ্চয়তা দান। সেই সাথে তা সাক্ষ্যদান ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকারী। একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, লেনদেনের দলীল লিখিত না হলে কঠিন অবস্থা দেখা দেয়া অসম্ভব নয়। সেই সাথে পারস্পরিক শোবাহ-সন্দেহ দূর করার এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। আল্লাহ্ আমাদের জন্যে একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সে সতর্কতা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে যেমন, আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারেও তেমনি। সমাজের লোকদের মধ্যে এক ব্যাপক নিয়ম-শৃঙ্খলা কার্যকর করাও এর

একটা উদ্দেশ্য। এ সবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, দলীল লিখে নেয়ার মধ্যে সাক্ষ্যের ব্যাপারেও সতর্কতার ব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলে শোবাহ্ সন্দেহ্ দূর হয়ে যাবে। দলীল লিখিত না হওয়ার তুলনায় লিখিত হওয়া আল্লাহ্‌র নিকটও অধিক সুবিচারপূর্ণ পন্থা। যদি দলীল লিখিত না হয়, তাহলে সাক্ষীর মনেও সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগতে পারে। পরে এ সন্দেহ সংশয়ের কারণে সুষ্ঠুভাবে সাক্ষ্য দাঁড় করা তার পক্ষে আর কখনই সম্ভব হবে না। তখন সে একটি নিষিদ্ধ কাজের দিকে অগ্রসর হয়ে পড়তে পারে কিংবা সাক্ষ্যদানকেই পরিহাস করতে পারে। আর তার ফলে পাওনাদারের হক বিনষ্ট হয়ে যাতে পারে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্য সহীহ্ হবে যদি তার দ্বারা সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয়। সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষদান তখনই জায়েয হবে, যদি সে সাক্ষী হওয়ার কথা স্মরণ করতে পারে এবং তার নিজের লেখা সে নিজে চিনতে পারে, অন্যথায় জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটি সন্দেহ্ মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি দলীল লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। বোঝা গেল, সন্দেহ্ সহকারে সাক্ষ্য দেয়া জায়েয নয়। তাতে সন্দেহ উদ্রেক হলে সাক্ষ্য দেয়া নিষিদ্ধ হবে। অতএব স্মরণ ও জানা না হলে সাক্ষ্যদান সহীহ্ হবে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا -

যে সব ব্যবসায় তোমরা নগদ ও হাতে-হাতে কর, তা না লিখলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

অর্থাৎ যে সব ক্রয়-বিক্রয় তোমাদের প্রত্যেকেই পণ্য ও তার মূল্য নগদ ও হাতে-হাতে দেয়া-নেয়া সম্পন্ন কর, তা না লেখা মুবাহ। এটা আল্লাহ্‌র দেয়া সুবিধা। তিনি তাঁর বান্দাগণকে এর দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এটা তাঁর একটা রহমতও। অন্যথায় দৈনন্দিন যেসব ক্রয়-বিক্রয় নগদা-নগদি হয়, তা লেখা বাধ্যতামূলক ও ফরয হলে লোকদের জীবন যাত্রা কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ত। এ সব বেচা-কেনা সাধারণ খাদ্য-পানীয়ের ব্যপারে প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন পূরণের জন্যে হয়ে থাকে। এ কথারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ -

আর তোমরা যখন পারস্পরিক কেনা-বেচা কর, তখন তোমরা সাক্ষী বানাও।

এ একটি সাধারণ হুকুম। তা সকল প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যা নগদ মূল্যে হোক, কি বাকী মূল্যে। মিয়াদহীন উপস্থিত ও নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে লেখার কাজ না করলেও কোন দোষ হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এ সব ক্ষেত্রে সাক্ষী বানানো মুস্তাহাব মাত্র। তবে খুব অল্প-স্বল্প মূল্যের নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা খুব বেশি। প্রয়োজন নেই বলে তাতে সাক্ষী বানানোর প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। যেমন রুটি, শাক-সবজি, পানি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়।

আগের কালের ফিকাহবিদদের বহু সংখ্যক লোকদের মত হচ্ছে শাক-সব্জি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়েও সাক্ষী রাখার প্রয়োজন। কিন্তু তা যদি খুব পছন্দনীয় কাজ হতো, তাহলে নবী

করীম (স), সাহাবী, আগের দিনের ফিকাহ্‌বিদ প্রমুখ থেকে তার বর্ণনা অবশ্যই পাওয়া যেত। সর্বসাধারণ লোকের সাধারণ প্রয়োজন পূরণার্থে তা ব্যবহৃতও হয়ত হতো। আমরা জানি, তারা খাদ্য-পানীয় দ্রব্যাদি পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় করত, এমন বহু জিনিসই রয়েছে, যা ক্রয় না করলে মানুষের জীবন চলে না। তাতেও সাক্ষী বানাবার আদেশ তা মুস্তাহাব হলেও তা আসলে চুক্তি ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়েই প্রযোজ্য। কেননা তাতে বিরাট মূল্য ও উত্তম পণ্যের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করার মত অবস্থা দেখা দিতে পারে। তাতে বহু মানুষের হক-হুকুক বিনষ্ট হতে পারে, একজন অপর জনের উপর দোষ চাপাতে পারে। ত্রুটি বের করা যেতে পারে, সমস্ত বা কতক পাওনাদারের ক্রয়-বিক্রয়ে মাল ফেরত দেয়ার প্রশ্নও দেখা দিতে পারে। এ জন্যে বানাবার আদেশ হয়েছে, যদিও তা মুস্তাহাব। মিয়াদী মূল্যের চুক্তিতে অনুষ্ঠিত ক্রয়-বিক্রয়ের উপর সাক্ষী রাখা ও দলীল লেখা এবং উপস্থিত ও নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে দলীল না লেখা ও শুধু সাক্ষী রাখা এ দুটি ব্যবস্থার কথাই আয়াতে বলা হয়েছে।

লায়স মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'এবং সাক্ষী বানাও যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর' আল্লাহ্‌র এ কথার ব্যাখ্যা হল, বাকী মূল্যে হলে লিখে রাখতে হবে এবং নগদ মূল্যে হলে শুধু সাক্ষী রাখবে। আল-হাসান বলেছেন, নগদ মূল্যের ক্রয়-বিক্রয়ে সাক্ষীও রাখা হলে নিশ্চয়তা— নিশ্চিন্ততা দৃঢ়তা আসে। আর সাক্ষী রাখা না হলেও কোন দোষ হবে না। শবীও এরূপ মতই দিয়েছেন। কিছুসংখ্যক লোক বলেছেন, সাক্ষী বানাবার আদেশ মনসূখ হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র এ কথার দ্বারা ঃ

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا –

তোমাদের কতক লোক অপর কতককে যদি বিশ্বাস করে ......।

এর সঠিক তাৎপর্য ইতিপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ –

এবং লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

ইয়াযীদ ইবনে আবূ জিয়াদ মাকসাম, ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তা এভাবে যে, একজন লোক লেখক বা সাক্ষীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে, আমার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পরে বলবে, তুমি আদেশ করেছ যে, তুমি জবাব দেবে। অতএব ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। তায়ূস ও মুজাহিদ-ও সে কথা বলেছেন। আল-হাসান ও কাতাদাতা বলেছেন, লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। অতএব সে লিখবে না যা লেখার আদেশ করা হয়নি। সাক্ষীকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না, অতএব সে তার সাক্ষ্যে বাড়াবাড়ি করবে না। আল-হাসান কাতাদাতা ও আতা وَلَا يُضَارِرْ كَاتِبٌ পাঠরীতি অনুসরণ করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও মুজাহিদ وَلَا يُضَارَرْ পাঠক্রম গ্রহণ করেছেন। একটি পাঠে দাবিদারকে নিষেধ করা হয়েছে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতি করা থেকে। আর অপর পাঠে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে বাদী পাওনাদারকে। এ দুটোই সহীহ কাজে ব্যবহৃত। পাওনাদারকে নিষেধ করা হয়েছে লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে। তা এভাবে হতে পারে যে, তাদের দুজনের প্রয়োজনীয় কাজ থেকে অন্যদিকে মশগুল রাখা হল এবং তাদের দুজনকে কেবল দলীল লেখার ও সাক্ষ্য দেয়ার কাজে মশগুল করে রাখা হল। আর লেখক ও সাক্ষী উভয়কে নিষেধ করা হয়েছে

পাওনাদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে। সে ক্ষতি হতে পারে যদি লেখক তাই লিখে যা লিখতে তাকে বলা হয়নি, সাক্ষী এমন সাক্ষ্য দেবে, যা তার নিকট জানতে চাওয়া হয়নি। সাক্ষী পাওনাদারের ক্ষতি করতে পারে সাক্ষী না দিয়ে অথচ সাক্ষী দুজনের উপরই ফরয আদায় করার কর্তব্য চেপেছে। সাক্ষ্য না দিয়ে বাদীর ক্ষতিকে পরিহার করা। অনুরূপভাবে লেখকের কর্তব্য দলীল লেখা, যদি তাকে ছাড়া আর কোন লেখক না পাওয়া যায়।

যদি বলা হয়, ব্যবসায় সম্পর্কে আল্লাহ্র কথা ঃ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا -

তোমরা যদি তার উপর দলীল না লিখ, তাহলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

এতে ব্যবসায় ও মিয়াদী ঋণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তা প্রমাণ করে যে, মিয়াদী ঋণের দলীল লিপিবদ্ধ করা ও তাতে সাক্ষী রাখা তাদের কর্তব্য।

জবাবে বলা যাবে, ব্যাপার তা নয়। কেননা সাক্ষী বানাতে আদেশ করা হয়েছে মিয়াদী ঋণের লেনদেন চুক্তিতে। এটা মুস্তাহাব। তা না করলে ধন-মালের ব্যাপারে সতর্কতার জন্যে যা মুস্তাহাব করা হয়েছিল, তাই তরক করা হবে। তারই পরে সংযোজিত হয়েছে একথা ঃ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا -

তবে যদি উপস্থিত ব্যবসায় হয় যা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে আবর্তিত কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

অর্থাৎ তোমরা তরক করবে না— না লিখে, যা তোমাদের জন্যে মুস্তাহাব করে দেয়া হয়েছিল, যেমন তোমরা মিয়াদী ঋণের দলীল না লিখে ও তাতে সাক্ষী না বানিয়ে মুস্তাহাব ও সতর্কতার ব্যবস্থা তরক করবে।

আল্লাহ্র কথা ঃ 'তোমাদের উপর দোষ হবে না' অর্থাৎ, ধন-মাল সংরক্ষণে সতর্কতার ব্যাপারে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না— এ অর্থও হতে পারে। কেননা তাদের প্রত্যেকেই অপরের নিকট যা মাল দেয়া দরকার তা যদি সঁপে দেয়।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ -

যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমাদের গুনাহ্ হবে।

পারস্পরিক ক্ষতি করা প্রসঙ্গের কথার সাথে একটা সংযোজন। এ থেকে বোঝা যায়, বাদী— পাওনাদারের দ্বারা লেখক ও সাক্ষীর ক্ষতি হওয়া এবং এই দুইজনের পারস্পরিক ক্ষতি গুনাহ, কেননা এদের প্রত্যেকেই অপরের ক্ষতি সাধনের সংকল্পকারী— আল্লাহ্র নিষেধের পর— এজন্যে তা গুনাহ।

রিহন

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ -

তোমরা যদি বিদেশ সফরে থাক এবং তখন দলীল লেখক না পাও, তাহলে তোমাদেন পারস্পরিক ঋণের কাজ হবে রিহনের মাধ্যমে, যা ঋণদাতার হস্তগত হবে।

অর্থাৎ তোমরা যখন দলীল লিখে ও সাক্ষী বানিয়ে লেনদেনের চুক্তিকে নির্ভরযোগ্য বানাতে অসমর্থ হবে, তখন ঋণদাতার দখলে রিহন জমা দিয়ে তোমরা ঋণের লেনদেন করতে পার। রিহন তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভরতার মাধ্যম হবে। আর তা তখনকার জন্যে ব্যবস্থা, যখন দলীল লিখে ও সাক্ষী বানিয়ে নির্ভরতা অর্জনের সুযোগ থাকবে না। আয়াতে সফর অবস্থার উল্লেখ হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। কেননা দলীল লিখানো ও সাক্ষী বানানোর কাজটা সাধারণত সফর কালেই কঠিন হয়ে পড়তে পারে। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সফরকাল ছাড়া অন্য সময়ে রিহন-ভিত্তিক লেনদেন করা মাকরূহ মনে করেন। আতা নিজ বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও তা করায় কোন দোষ মনে করেন নি। ফলে মুজাহিদের মাযহাব হল, 'রিহন'-এর ব্যবস্থা আয়াতে মুবাহ করা হয়েছে কেবলমাত্র সফরকালের জন্যে। অন্য সময়ে তা করা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু সকল শরীয়াতবিজ্ঞ লোকের এ মত নয়। নিজ বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও রিহন ভিত্তিক লেনদেন করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ও আগের কালের সর্বসাধারণ ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে কোন দ্বিমত নেই।

ইবরাহীম আল-আসওয়াদ আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) নিজে এক ইয়াহুদীর নিকট বাকী মূল্যে মিয়াদ নির্দিষ্ট করে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন এবং সে জন্যে তাঁর নিজের বর্ম 'রিহন' (বন্দক) রেখেছিলেন।

কাতাদাতা আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) তার বর্ম মদীনার এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে গম নিয়েছিলেন।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, বিদেশ সফরে নয়, নিজ বাড়িতে থেকেও রিহন-এর ভিত্তিতে ঋণের লেনদেন সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা নবী করীম (স) নিজে তা করেছেন। আর আল্লাহ তো فَاتَّبِعُوهُ 'তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর' বলেছেন।

বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে।

বোঝা গেল, আল্লাহ কুরআনের আয়াতে রিহন ভিত্তিক লেনদেন করতে বলার প্রসঙ্গে সফরকালের উল্লেখ করেছেন এজন্যে যে, সেই সময়েই সাধারণত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীল লেখা ও সাক্ষী বানানো অসম্ভব হয়ে থাকে। তাই তখনকার জন্যে এ ব্যবস্থা। কিন্তু অন্য সময় সে ব্যবস্থানুযায়ী লেনদেন করা যাবে না, তা বলা হয়নি। কুরআনের এ কথটি রাসূলের এ কথার মত ঃ 'পঁচিশটি উটে— একটি بنت مخاض এবং ছত্রিশটিতে একটি بنت لبون এই কথার অর্থ المخاض ও بنت বোঝানো হয়নি। এটা সাধারণ ও বেশির ভাগ অবস্থার কথা। যদিও তার মা'র সঙ্গে مخاض ও لبن না হওয়াও অসম্ভব নয়।

এ ভাবেই উক্ত আয়াতে 'সফর' শব্দের উল্লেখ হয়েছে। নবী করীম (স)-এর এ কথাটিও তেমনি ঃ

لَاقَطْعَ فِي ثَمَرٍ حَتّٰى يُؤْوِيْهِ الْجَرِيْنَ -

এ হাদীসেও جرين -এর উল্লেখ, বেশির ভাগ অবস্থার দৃষ্টিতেই হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে তার দৃঢ়তা বিধান। আলোচ্য আয়াতে সফরের উল্লেখও ঠিক সে ভাবেই হয়েছে।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ -

এমন রিহন যা ঋণদাতার হস্তগত হয়েছে।

বোঝা যায়, 'রিহন' ভিত্তিক লেনদেন জায়েয তখন, যদি তা ঋণদাতার হস্তগত হয়। অন্যথায় সহীহ হবে না। তা দুটি দিক দিয়ে প্রামাণ্য। একটি, এর পূর্বে বলা হয়েছে ঃ 'এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী বানাও। দুজন পুরুষ না হলে একজন পুরুষ ও দুজন মেয়েলোক, যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর'।

এ আয়াতের সাক্ষীদের যে সংখ্যা বলা হয়েছে এবং গুণের উল্লেখ হয়েছে, তা যথাযথ ও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অতএব 'রিহন' সম্পর্কিত কথায় যে শর্ত ও গুণের উল্লেখ হয়েছে, তা-ও যথাযথ ও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তা না হলে 'রিহন' ভিত্তিক লেনদেন জায়েয হবে না। যেমন সাক্ষ্যদানের কাজ যেভাবে করতে বলা হয়েছে, সে ভাবে না হলে অন্যভাবে সহীহ্ হবে না। কেননা আয়াতের প্রথম শব্দটি হল আদেশবাচক, যা করা ফরয হয়ে যায়।

আর দ্বিতীয়, রিহন-সংক্রান্ত হুকুম যে আয়াতে পাওয়া গেছে, সে আয়াতে এ কাজের অনুমতি দেয়া হয়েছে যেভাবে ও যে শর্তে, তা ঠিক সেভাবে ও সে শর্তে করাই জায়েয হতে পারে, অন্যভাবে হতে পারে না। কেননা রিহন জায়েয হওয়ার এখানে অন্য কোন ভিত্তি তো নেই এ আয়াত ছাড়া।

এ আয়াতই প্রমাণ করে যে, রিহন ঋণদাতার করায়ত্ত না হলে তার ভিত্তিতে ঋণের লেনদেন জায়েয হবে না। কেননা তা ঋণদাতার দেয়া ঋণের নির্ভরতা । তাই বন্ধকী বস্তু তার হস্তগত না হলে সে নির্ভরতা অর্জিত হয় না। তখন তা অন্যান্য হাজারো ধন-মালের মত হয়ে যায়, যা থেকে সে কোন নির্ভরতা লাভ করতে পারে না। আর তা যখন তার নির্ভরতা, তখন তা তার দখলে থাকতে হবে তার দেয়া ঋণের বদলে। ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা দারিদ্র্য কালে সে তার দ্বারা নিজের পাওনা আদায় করে নেয়ার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি অধিকার সম্পন্ন হতে পারবে ও তার দ্বারা আদায় করে নিতে পারবে। কিন্তু বন্ধকী জিনিস তার করায়ত্ত না থাকলে 'রিহন' পদ্ধতিটাই অকেজো ও অর্থহীন হয়ে যাবে। তখন সে অন্যান্য পাওনাদারদের সমান অবস্থায় পৌঁছে যাবে। লক্ষণীয়, পণ্য—বিক্রয়ের বস্তুটা বিক্রেতার হাতে থাকা পর্যন্ত তার মূল্য পেয়ে যাওয়া নিশ্চিত থাকে। সে যদি তা ক্রেতার হাতে তুলে দেয় মূল্য না নিয়ে তাহলে তখন তার প্রাপ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। সে অন্যান্য সব পাওনাদারের সমান হয়ে যায়।

ঋণ কার্য সম্পাদনের পক্ষদ্বয়ের বন্ধকী বস্তুর করতলগত হওয়া অঙ্গীকার হলে তা জায়েয হবে কিনা, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হানাফী আলিমগণ এবং শাফেয়ী বলেছেন, ঋণ গ্রহীতা ও বন্ধক দাতার 'কবজ'-এর অঙ্গীকারের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও ঋণদাতা— বন্ধকী গ্রহীতা যদি তার দাবি করে, তাহলে তাতে সাক্ষ্যদান জায়েয হবে। রিহন সহীহ হবে। ইমাম মালিকের মতে 'কবজ'-এর সত্যতা স্বীকারকারীর অঙ্গীকারের বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেলে 'কবজ' দেখার সাক্ষ্য দিলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। বলা হয়েছে,

'রিহন' পর্যায়ে কিয়াস বলে, তার কথা গৃহীত হবে রিহন বস্তুর কবজ সম্পর্কে উভয়ের স্বীকৃতির সাক্ষ্যদান জায়েয হওয়ার দলীল হচ্ছে, সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, বিক্রয়ের, অপহরণের ও হত্যার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি যখন জায়েয, তখন 'রিহন' 'কবজ' সম্পর্কেও তা জায়েয।

জমি রিহন রাখা সম্পর্কে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ও জুফর বলেছেন, জমি রিহন রাখা জায়েয নয়। যা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় তা-ও নয়, যা হয় না তাও নয়। মালিক ও শাফেয়ী বলেছেন, উভয় প্রকারের জমিই রিহন রাখা জায়েয। ইবনুল মুবারক সওরী থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি একটা 'রিহন' বন্ধক রাখে, সে তার মাত্র কতকাংশ পাওয়ার অধিকারী, বলেছেন, তা 'রিহন'-এর বাইরে চলে যাবে। কিন্তু সে তা রিহন রেখে তার ক্ষতিপূরণ করতে পারে। তা 'রিহন' বানাবার পূর্বেই যদি সে মরে যায়, তাহলে তা তার ও পাওনাদারদের মধ্যের জিনিস গণ্য হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় না এমন জমি রিহন রাখা জায়েয। যা ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে, তা রিহন রাখা জায়েয নয়।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আয়াতের প্রমাণে যখন বন্ধকী বস্তু ঋণদাতার করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত যখন 'রহন' জায়েয নয়,— কেননা তা ঋণদাতার নির্ভরতা, আর 'কবজ' না হলে যখন 'রিহন'-এর তাৎপর্যই বাস্তবায়িত হয় না,— কেননা তার নির্ভরতাই কিছু থাকে না, তখন জমি 'রিহন' রাখা জায়েয না হওয়াই উচিত, যে জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে তা। যা হবে না তাও। কেননা 'কবজ'-এর অধিকার হওয়ার কারণ ও নির্ভরতা বাতিল হওয়া চুক্তির সাথে জড়িত। কেননা অংশীদারিত্ব 'কবজ'-এর প্রতিরোধক। অতএব প্রতিরোধক বহাল রেখে— যদ্দারা রিহন বাতিল হতে পারে— রিহন ভিত্তিক লেনদেনই সহীহ হবে না। কেননা 'রিহন' হিসেবে প্রস্তুত করা জমি দখল বা 'কবজ' করতে গেলে শরীকের হাত যদি ফিরে আসে, তাহলে নির্ভরতার তাৎপর্যই বাতিল হয়ে যাবে। তখন তা হবে এমন রিহন-বন্ধকী, যা দখল করা হয়নি। তা 'রিহন'-এ ধারের মতও হবে না, যা দখল করার পর রিহনদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তা করা হলে 'রিহন' বাতিল হবে না। তার জন্যে তা তার হাতে ফিরিয়ে দেয়া জায়েয এ হিসেবে যে, এ দখলটা পাওয়ার অধিকারী সে নয়। রিহন রক্ষক— ঋণদাতার অধিকার আছে তার নিকট থেকে তা নিয়ে নেয়ার যখনই ইচ্ছা হবে। এ হচ্ছে সূচনা, সে দখল পাওনার অধিকার এখনও জন্মেনি এ অর্থে, যা চুক্তির কাছাকাছি সময়ে হয়। এটা জমি 'হেবা' করার মত-ও নয়, যা বন্টন করা যায় না। তাহলে আমাদের মতে তা জায়েয, যদিও 'হেবা'র শর্ত হচ্ছে দখল ও 'কবজ'— ঠিক রিহন-এর মতই। এদিক দিয়ে যে, 'হেবা'য় যে 'কবজ'-এর প্রয়োজন মালিকানা সহীহ্ হওয়ার জন্যে মালিকত্বের স্থিতির জন্যে স্থায়ীভাবে দখলিভুক্ত থাকা শর্ত নয়। শুরুতেই যখন 'কবজ' সহীহ্ হল, তখন মালিকত্ব শেষ হওয়ার ব্যাপারে দখলের অধিকারের কোন প্রভাব নেই। রিহন গ্রহণকারীর পাওয়ার অধিকার হওয়ায় নির্ভরতার তাৎপর্য শেষ হয়ে যায়, তখন তা সহীহ্ হবে না, তা বাতিল করে ও তার পরিপন্থী তা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও।

যদি বলা হয়, শরীকানা জমি রিহন রাখা জায়েয মনে করছ না কেন ? যখন তাতে দ্বিতীয়বারে তার হাতের অধিকার হয় না। কেননা তার দখল তো অবশিষ্ট থাকবে ভাগ হওর পর্যন্ত।

জবাবে বলা যাবে, শরীকের অধিকার আছে দাসের খিদমত লওয়ার, যদি তার দাস হয়ে থাকে— তার মালিকানা অধিকারের দরুন। আর যে তা করবে, তাতে তার হাত 'রিহন'-এর হাত হবে না। রিহন-এর হাত তা পাওয়ার অধিকারী হয়েছে দ্বিতীয় দিনে। ফলে শরীক ও নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। কেননা এখানে 'রিহন' 'কবজ' করার অধিকার হয়েছে চুক্তির পাশাপাশি।

ঋণের রিহন পর্যায়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। সকল ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, ঋণের রিহন কোন অবস্থায়ই সহীহ্ নয়। ইবনুল কাসিম মালিকের মত উদ্ধৃত করেছেন, একজন ব্যক্তির যদি অপর ব্যক্তির উপর ঋণ থাকে, তখন সে বলে ঃ আমি তা বিক্রয় করলাম বিক্রয় করার মতই এবং তার নিকট থেকে সেই ঋণ 'রিহন' রাখলাম যা আমার উপর তার আছে। তাহলে তা জায়েয হবে। অন্য ব্যক্তির উপর যে ঋণ চাপা আছে, তা 'রিহন' রাখার তুলনায় এটা অধিক শক্তিশালী। কেননা তার নিজের উপর যা আছে, এটা সে ক্ষেত্রে জায়েয়। ইমাম মালিকের কথায় এক ব্যক্তির উপর যে ঋণ আছে অপর ব্যক্তির উপর সে ব্যক্তির পক্ষে সেই ঋণটা রিহন রাখা জায়েয এবং কারোর নিকট থেকে তা ক্রয় করতে পারে। তার নিকট থেকে সেই ঋণটা রিহন রাখতে পারে, যা তার জন্যে সে ব্যক্তির উপর রয়েছে। তার সে হক্‌টি সে 'কবজ' করতে পারে। তার জন্যে সাক্ষ্য দিতে পারে। কিন্তু এটা এমন একটা কথা, যা শরীয়ত-জ্ঞানী কোন একজন ব্যক্তিও বলেন নি তিনি ছাড়া।

তা সহীহ্ নয়। কেননা আল্লাহ্‌র কথা হল 'রিহন যা কবজ করা হয়েছে।' কিন্তু ঋণ 'কবজ' করা সহীহ্ হয় না যতক্ষণ তা ঋণ থাকবে। না যখন তা তার উপর থাকবে, না যখন তা অন্য কারোর থাকবে। কেননা ঋণ একটা হক্। তাতে 'কবজ' সহীহ্ হয় না। 'কবজ' হয় বস্তুগত জিনিসের উপর। তা সত্ত্বেও সে ঋণ হয় প্রথম ضمان দায়িত্ব গ্রহণের হুকুম মতো হবে। অথবা তা সরে যাবে— স্থানান্তরিত হবে 'রিহন' এর দায়িত্ব গ্রহণে। যদি তা রিহন-এর ضمان এ সরে যায়, তাহলে বাড়তি থেকে সম্পর্কহীন হওয়া কর্তব্য। যখন ঋণ যার সাথে রিহন রয়েছে— রিহন-এর কম হবে। আর যদি তা প্রথম দায়িত্ব গ্রহণের হুকুমে অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা হলে তা 'রিহন' নয়। কেননা তা তো যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায়ই রয়ে গেছে। যে ঋণ অন্য ব্যক্তির উপর চাপানো, তা জায়েয হওয়া তো সুদূরপরাহত ব্যাপার। কেননা তাতে তো কোন ইখতিয়ার চলে না। তা 'কবজ'-ও করা যায় না কোন অবস্থায়।

'রিহন' যদি সালিসের (মধ্যস্থতাকারীর) হাতে রেখে দেয়া হয়, তা জায়েয কিনা এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, ও সওরী বলেছেন, রিহন সহীহ্ হবে, যদি দুপক্ষই একত্রিত হয়ে তা মধ্যস্থতাকারীর হাতে রেখে দেয়া হয়। তা 'রিহন' গ্রহীতার নিশ্চয়তা-নির্ভরতার মাধ্যম হবে। আল-হাসান, আতা ও শ'বী এ মত দিয়েছেন। ইবনে আবূ লায়লা, ইবনে শাবরামাতা ও আওজায়ী বলেছেন, ঋণদাতা— রিহন গ্রহীতা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের দখলে না নেবে, ততক্ষণ সে 'রিহন' জায়েয হবে না। মালিক বলেছেন, পক্ষদ্বয় মিলিত হয়ে যদি তা মধ্যস্থতাকারীর নিকট রাখে, আর তখন তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তা যাবে রিহনদাতা— ঋণ গ্রহীতার।

তরবারির অংশ রিহন রাখা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তা 'কবজ' আবর্তিত হবে, রিহনদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই তা মধ্যস্থতাকারীর হাতে রাখবে অথবা রাখবে শরীকের নিকট।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কথা فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ -এর দাবি হল, তা জায়েয হবে

যদি তা মধ্যস্থতাকারী নিজ হাতে নিয়ে নেয়। কেননা তাতে ঋণদাতা ও রিহ্‌ন গ্রহীতা এবং মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য হয় না। আয়াতের সাধারণ তাৎপর্যের আলোকে বলা যায়, দুজনের যে কেউ 'রিহ্‌ন' 'কবজ' করতে পারে। উপরন্তু মধ্যস্থতাকারী রিহ্‌ন করার কাজে রিহ্‌ন গ্রহীতার উকীল— প্রতিনিধি। হেবায় যেমন ওকালতি চলে, এতেও 'কবজ' করা চলে মধ্যস্থতাকারীর। 'কবজ' করার সমস্ত ব্যাপারই এরূপ। যাকে 'কবজ' করতে হবে, সে না করে উকীল দ্বারা 'কবজ' করালেও কোন অসুবিধা হয় না।

যদি বলা হয়, মধ্যস্থতাকারী যদি উকীল হয় রিহ্‌ন গ্রহীতার, তাহলে তা তার পক্ষ থেকে কবজ করা খুবই সঙ্গত। তাহলে মধ্যস্থতাকারীর কোন ইখতিয়ার থাকে না তা না করার।

জবাবে বলা যাবে, তাতে মধ্যস্থকারীর উকীল হওয়া থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সে তার পক্ষ থেকে অবশ্যই 'রিহ্‌ন' 'কবজ' করতে পারে। রিহ্‌নদাতা তার হাতে রিহ্‌ন দিতে রাজী না হওয়ার দরুন তার 'কবজ' করার অধিকার না হলে রিহ্‌ন গ্রহীতা তো তা উকীলের মাধ্যমে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। কোন জিনিস ক্রয়ের যে উকীল হয়, সে মুয়াক্কিলের পক্ষ থেকে পণ্য 'কবজ' করতে পারে। মূল্যের বিনিময়ে— মূল্য দেয়ার শর্তে সে পণ্য আটক করেও রাখতে পারে। আটক করার পূর্বে সে পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে মুয়াক্কিলের মাল হিসেবেই তা ধ্বংস হবে। উকীল 'রিহ্‌ন'-কে রিহ্‌ন গ্রহীতার পক্ষ থেকে আটক করে রাখতে পারে না যদি তাকে উকীল বানানো না হয়। তার পক্ষ থেকে 'কবজ' কারী হিসেবেও নয়। এ থেকে বোঝা যায়, মধ্যস্থতাকারীর হাত 'রিহ্‌ন' গ্রহীতারই হাত। রিহ্‌ন' 'কবজ' করার জন্যে সে তার উকিল। রিহ্‌ন গ্রহীতার ইখতিয়ার আছে, সে যখন ইচ্ছা 'রিহ্‌ন' চুক্তি ভঙ্গ করে দিতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর অধিকারকেও বাতিল করে দিতে পারে এবং একটি রিহ্‌নদাতাকে ফেরত দিতে পারে। কিন্তু রিহ্‌দাতার ইখতিয়ার নেই মধ্যস্থতাকারীর হাতকে বাতিল করা। বোঝা গেল, মধ্যস্থতাকারী ও উকীল— উভয়ই রিহ্‌ন গ্রহীতার জন্যে।

যদি বলা হয়, ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনই একসাথে পণ্য দ্রব্যাদি মধ্যস্থতাকারীর হাতে সোপর্দ করে, তাতে বিক্রেতার ঝুঁকি ও দায়িত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় না। মধ্যস্থতাকারী ক্রেতার উকীল হওয়া জায়েয নয় পণ্য 'কবজ' করার ব্যাপারে। রিহ্‌ন গ্রহীতা সম্পর্কেও সেই কথা।

জবাবে বলা যাবে, দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিক্রয়ে মধ্যস্থতাকারী যদি ক্রেতার উকীল হয়, তাহলে বিক্রেতার ঝুঁকি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তার বিক্রেতার ঝুঁকি থেকে বের হয়ে যাওয়ার তার উপর তার হক শেষ হয়ে যায়। সে যদি তা 'কবজ' করার অনুমতি দেয়, তাহলে তার হক বাতিল হয়ে যায়। তা ফিরিয়ে চাওয়ার তার অধিকার হয় না। কেননা পণ্য তো একবারই 'কবজ' হতে পারে। তাই যখনই সে 'কবজ' হবে, বিক্রেতার হক প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে। তা তার হাতে ফিরিয়ে দেয়া তার জন্যে জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে তা যদি তারই নিকট গচ্ছিত রাখা হয় তাহলেও তাই হবে। এ কারণে মধ্যস্থতাকারী ক্রেতার উকীল হতে পারে না। কেননা সে যদি তার উকীল হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে 'কবজ'কারীও হবে বিক্রয়ের কবজ। তখন ক্রেতাকে তা থেকে বিরত রাখা যাবে না। তখন অবস্থা হবে এই যে, মধ্যস্থতাকারীর 'কবজ' হবে অর্থহীন। বরং ক্রেতারই তা 'কবজ' করার মত অবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রেতা তাতে রাজী হবে না। ফলে তা প্রমাণিত হবে না। মধ্যস্থতাকারীর ক্রেতার জন্যে

উকীলও হতে পারবে না। অপরদিক দিয়ে কথা হল, সে যদি তা ক্রেতার জন্যে 'কবজ' করে, তাহলে তাতেই বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আর বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বিক্রেতার 'হক' নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তার মধ্যস্থতাকারীর হাতে থেকে যাওয়ার কোন অর্থ হবে না, বরং তা ক্রেতার জন্যে গ্রহণ করা কর্তব্য হবে; কিন্তু বিক্রেতা তাতে রাজী হবে না। রিহন-এর ব্যাপার সে রকমের নয়। কেননা তাতে মধ্যস্থতাকারীর রিহন গ্রহীতার উকীল হওয়ায় রিহনদাতার 'হক' বাতিল হওয়ার কোন কারণ ঘটবে না। বুঝতে হবে, রিহন গ্রহীতা রিহন 'কবজ' করার পরও রিহনদাতার 'হক' অবশিষ্ট থাকে। মধ্যস্থতাকারীর 'কবজ' হওয়ার পরও তাই। ফলে মধ্যস্থতাকারীর 'কবজ' ও রিহন গ্রহীতার 'কবজ'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু মধ্যস্থতাকারীর ক্রেতার উকীল হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে ক্রয়ে মধ্যস্থতাকারী বিভন্ন রকম হয়ে যায়। যখন সে ক্রেতার 'কবজ'-এর তাৎপর্যে বিক্রেতার দায়িত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়া ও তার দায়িত্বে প্রবেশ করা হয়ে যায়। আর তাতে বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার ও তা থেকে বিক্রেতার 'হক' প্রত্যাহৃত হওয়া বিক্রেতার তাতে রাজী না হওয়া সত্ত্বেও একাকার হয়ে যায়। বিক্রেতার জন্যে তার মধ্যস্থতাকারী হওয়া জায়েয হবে না। এ দিক দিয়ে যে, চুক্তির কারণে তার আটক করে রাখার অধিকার জন্মে। তা প্রত্যাহৃত হবে না। অথবা তা ক্রেতার নিকট সোপর্দ করতে রাজী হবে অথবা মূল্য নিয়ে নেবে।

'রিহন' এর দায়-দায়িত্ব

আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ - فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ -

তাহলে 'রিহন' হস্তান্তরিত করে কাজ করতে হবে। তোমাদের কেউ যদি অপর কারোর উপর বিশ্বাস করে লেনদেনের কাজ করে, তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথ আদায় করে দেয়া।

এ আয়াতটি 'রিহন'-এর উল্লেখ সহ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সংযোজন। তা প্রমাণ করে যে, 'রিহন' আমানতের ব্যাপার নয়। আর যখন তা আমানত নয়, তখন তার দায়-দায়িত্ব অবশ্যই গৃহীত হবে। কেননা 'রিহন' যদি আমানত হতো, তাহলে তার উপর আমানতকে সংযোজিত করা হতো না। যেহেতু একটি জিনিস তার নিজের সাথে সংযোজিত হয় না, হয় অন্য জিনিসের সাথে।

'রিহন' সম্পর্কে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর, ইবনে আবূ লায়লা ও আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, 'রিহন'-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তার কম-সে-কম মূল্যে এবং ঋণেরও। সকফী উসমানুলবত্তী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'রিহন' যা-ই হোক— স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা কাপড়, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যা বারবার আবর্তিত হয়। 'রিহন' যদি জমি কিংবা জন্তু হয় এবং তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা রিহনদাতার মাল থেকে যাবে। রিহন গ্রহীতা তার হক পেয়ে যাবে। কিন্তু রিহনদাতা যদি ক্ষতিপূরণের শর্ত ধার্য করে থাকে, তাহলে শর্তানুযায়ীই কাজ হবে।

ইবনে অহব ইমাম মালিকের মত উদ্ধৃত করেছেন, তা ধ্বংস হওয়ার খবর জানা গেলে তা

রিহনদাতার মাল থেকে যাবে, রিহন গ্রহীতার হক কিছু মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না। তার ধ্বংস হওয়ার খবর জানা না গেলে, তা রিহন গ্রহীতার মাল থেকে যাবে, সে তার মূল্য দিতে বাধ্য হবে। তাকে বলতে হবে, বিবরণ দাও। বিবরণ দিলে তার এ বর্ণনা ও তাতে তার মালের নাম করা মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে তাকে হলপ করতে হবে। পরে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তা নিয়ে বসবে। তার নির্ধারিত মূল্যের অধিক হলে রিহনদাতা তা নিয়ে নেবে। আর রিহনদাতার নির্ধারিত মূল্যের কম হলে তার নির্ধারণের উপর হলপ করতে হবে এবং বাড়তিটা তা থেকে বাদ পড়বে। রিহনদাতা যদি হলপ করতে অস্বীকার করে, রিহন গ্রহীতাকে 'রিহন'-এর মূল্যের পরে যা অতিরিক্ত প্রমাণিত হবে, তা দিয়ে দেয়া হবে।

ইবনুল কাসিমও তাঁর এ মত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলেছেন, রিহনগ্রহীতা সাদকাকারী হবে তা ধ্বংস হলে এবং তাতে তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই, তাহলে তার এ শর্ত বাতিল। তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আওজায়ী বলেছেন, 'রিহন' বাবদ দেয়া ক্রীতদাস যদি মরে যায়, তাহলে তার বাবদ ঋণটা অবশিষ্ট থাকবে। কেননা 'রিহন' বন্ধ হয়ে যায়নি, কথাটি যখন মৃত্যুর খবর জানা যাবে, সে সময়ে হবে না, বরং তার ধ্বংসের খবর জানা গেলে তা বারবার আসবে। আওজায়ী বলেছেন ঃ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ -এর অর্থ হচ্ছে, ছাগলের মূল্য বাড়তি হলে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তার কমতি হলে তা পূরণ করে দিতে হবে। লায়স বলেছেন, 'রিহন' যা-ই হোক, তা ধ্বংস হলে এবং সে ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তা গণ্য হবে, তার মূল্য নিয়ে মতপার্থক্য হলেও। তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেলে বাড়তিটা আবর্তিত হবে। শাফেয়ী বলেছেন, 'রিহন' আমানত, সেজন্যে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না কোন অবস্থায়ই, যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তার এই ধ্বংস বাহ্যিকভাবে হোক, কি গোপনে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, সাহাবী ও'তাবেয়ীন সকলেই একমত হয়ে বলেছেন, রিহন-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনরূপ ভিন্নমত থাকার কথা আমরা জানি না। তবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পদ্ধতিতে তাঁদের ভিন্নমত রয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত আলী (রা) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইসরাঈল আবদুল আলা মুহাম্মদ ইবনে আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা) বলেছেন, যে মূল্যের 'রিহন' রাখা হয়েছে ঋণ যদি তার বেশী হয়, তখন 'রিহন' ধ্বংস হয়ে যায়, তা যেভাবে ছিল, সেই ভাবেই হবে। কেননা সে অতিরিক্তের জন্যে আমানতদার। আর যদি রক্ষিত 'রিহন' ঋণের অপেক্ষা কম মূল্যের হয়, তারপর 'রিহন' ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে রিহন-দাতা অতিরিক্তকে ফেরত দেবে। আতা উবাইদ ইবনে উমাইর উমর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। ইবরাহীম নখয়ীও তাই বলেছেন। শবী, হরস, আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'রিহন' যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অতিরিক্তটা আবর্তিত হবে। কাতাদাহ খালাস ইবনে আমর, আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'রিহন' মূল্যে অতিরিক্ত আর সে রিহনে যদি কোন যখম লাগে, তাহলেও তা তা-ই থাকবে। আর যদি কোন যখম না-ও লাগে, তার দোষারোপ হয়, তাহলেও অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেবে।

হযরত আলী (রা) থেকে এ তিনটি বর্ণনা পাওয়া গেছে এবং তিনটিতেই 'রিহন'-এর ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তবে ক্ষতিপূরণ দানের স্বরূপ ও অবস্থার ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে উমর (রা) থেকেও অতিরিক্ত মূল্যের আবর্তিত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া গেছে। শুরাইহ, আল-হাসান, তায়ূস, শবী ও ইবনে শাবরামাতা বলেছেন, 'রিহন' যে বিষয়ে, তাতেই তা থাকবে। শুরাইহ্ বলেছেন, একশত দিরহাম মূল্যের একটি লোহার আংটি হলেও তাই হবে। আগের কালের মনীষীবৃন্দ যদি তার ক্ষতিপূরণে একমত হয়, আর মতপার্থক্য শুধু তার রূপ ও অবস্থা সম্পর্কে, কেউ বলতেন, তা আমানত, তার ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ কথা সকলেরই মতের বিপরীত। তাদের মতপার্থক্য ইজমা পরিপন্থী। তাঁরা সকলেই যখন রিহন-এর ক্ষতিপূরণ দানের কথা বলেছেন, তখন তাদের এ কথাই ক্ষতিপূরণ না দেয়ার কথার বিপরীত। ক্ষতিপূরণ দানের পদ্ধতি পর্যায়ের মতপার্থক্য এবং একটি পন্থায় তাদের ঐকমত্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই। কেননা তাদের ঐকমত্য প্রমাণ করে যে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ঐকমত্য চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দিয়েছে যে, তাকে যারা আমানত বলেছে, তাদের কথা ঠিক নয়। উদ্ধৃত আয়াত যে ক্ষতিপূরণদানের কথা বলে, সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীস থেকেও তা প্রমাণিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মুসয়িব ইবনে সাবতি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, আমি আতাকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি— এক ব্যক্তি একটা ঘোড়া রিহন রাখল, তার হাত আহত হল। তখন নবী করীম (স) রিহন গ্রহীতাকে বললেন, তোমার পাওনা হারিয়ে গেছে। অপর বর্ণনার শব্দ হল ঃ 'তোমার জন্যে কিছুই নেই। রিহন গ্রহীতাকে যে নবী করীম (স) বললেন, 'তোমার হক চলে গেছে— এর অর্থ তার দেয়া ঋণ প্রত্যাহৃত হয়েছে। কেননা ঋণ গ্রহীতার হক্ হচ্ছে তার দেয়া ঋণ।

আবদুল বাকী ইবনে কানে আল-হাসান ইবনে আলী আল-গনভী ও আবদুল ওয়ারিস ইবনে ইবরাহীম সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দুজনই বলেছেন, আমাদের নিকট ইসমাঈল ইবনে আবূ উমাইয়্যাতা আজ-জারে হাম্মাদ ইবনে সালামাতা, কাতাদাতা, আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'রিহন যা নিয়ে তাই নিয়েই থাকবে।' আবদুল বাকী আল-হুসায়ন ইবনে ইসহাক, আল-মুসাইয়্যিব ইবনে ওয়াযিহ, ইবনুল মুবারক, মুসয়িব ইবনে সাবিত, আল-কামাতা ইবনে মারসাদ, মুহারিব ইবনে দিসর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, রাসূলে করীম (স) ফায়সালা করে দিয়েছে, 'রিহন যেমন, তেমনই থাকবে' এর অর্থ, তার ক্ষতিপূরণ তাতে যে ঋণ রয়েছে, তা। শুরাইহ্ বলেছেন, 'রিহন যে জন্যে, তাতেই তা নিয়োজিত, তা যদি একটা লোহার আংটিও হয়, তবু। মুহারিক ইবনে দিসারের কথাও তাই। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, ঋণের রিহন বাবদ দেয়া আংটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা যাতে ছিল, তা-ই হবে। এর বাহ্যিক অর্থ, তা ঋণ বাবদ ফেরত হয়ে যাবে, ঋণ কম হোক, কি বেশি। তবে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, তার অর্থ হল— ঋণ যদি রিহন পরিমাণ হয় কিংবা হয় তার কম, তাহলে তার দ্বারাই ঋণ আদায় হয়ে যাবে। আর ঋণ যদি বেশি হয়, তাহলে সেই বেশিটা ফেরত দিতে হবে। তা এ-ও প্রমাণ করে যে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সকলেই একমত যে, ঋণদাতা-রিহন গ্রহীতা ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুর পর বেশি অধিকারী সব পাওনাদারের তুলনায়। তা বিক্রয় করা হবে ও তার দ্বারা ঋণ আদায় হয়ে যাবে। বোঝা গেল, তা 'কবজ' করা হবে ঋণ আদায়ের জন্যে। অতএব তার দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে পুরা মাত্রায়। কেননা যে জিনিস যে উদ্দেশ্যে 'কবজ' করা হবে, তা ধ্বংস হলে সেই জিনিস আদায় হবে যাবে যে

জন্যে 'কবজ' করা হয়েছে। যেমন অনুদ্ধৃত জিনিস। যখনই তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তা ধ্বংস হবে অপহরণের ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে। ফলে বিক্রয়ের পর পণ্য 'কবজ করার ব্যাপারটিও তাই। তা ধ্বংস হলে যেভাবে তা 'কবজ' করা হয়েছে, ধ্বংসের ফলে তার যথারীতি আদায় হয়ে যাবে। 'রিহন' 'কবজ' করা হয় ঋণ পুরা মাত্রায় আদায় করার নিশ্চয়তার জন্যে। তার দলীল পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, তখন তার ধ্বংসটার দ্বারাও তাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ তা ধ্বংস হলে তার দ্বারা ঋণ সম্পূর্ণ আদায় হয়ে যাবে। আর এভাবেই ঋণ পূর্ণমাত্রায় আদায় হওয়া সম্ভব। 'রিহন' যদি ঋণের কম মূল্যের হয়, তা হলে এ পরিমাণের 'রিহন' দ্বারা ঋণ পূর্ণমাত্রায় আদায় হয়ে যাওয়া জায়েয হবে না। যদি তার মূল্য ঋণের পরিমাণের বেশি হয়, তা হলে তার সবটাই নিয়ে নেয়া জায়েয নয়। কেননা তা পাওয়ার অতিরিক্ত। তাই অতিরিক্তটা তার নিকট আমানত হবে এবং সে হবে তার আমানতদার। সকলেই রিহন দ্বারা ঋণের ক্ষতিপূরণ হওয়ার ব্যাপারে একমত। ফলে গচ্ছিত রাখা জিনিস, মুদারিবা ও অংশীদারিত্ব ইত্যাদিকে রিহন রাখা জায়েয নয়। কেননা তা নষ্ট হয়ে গেলে তার দ্বারা ঋণ আদায় হওয়া নিশ্চিত হবে না। তবে জামানত দেয়া ঋণের রিহন হতে পারে। তা এ-ও প্রমাণ করে যে, রিহন দ্বারা ঋণের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। ফলে তা ধংস হলে রিহন গ্রহীতা তার ঋণ পূর্ণমাত্রায় ফেরত পেয়ে গেল বলে ধরে নিতে হবে।

তা এ-ও প্রমাণ করে যে, মৌলনীতি হিসেবে অপরের মালিকানা কোন হক-এর জন্যে আটক করার নির্দেশ পাইনি, যার সাথে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত নয়। কেননা পণ্য বিক্রেতার ক্ষতিপূরণের জিনিস যতক্ষণ না তা ক্রেতার নিকট সোপর্দ করা হবে।.তা মূল্যের বদলে আটকে রাখা যাবে না। ভাড়ায় লওয়া জিনিসের অবস্থাও তাই। তা ভাড়ায় গ্রহণকারীর হাতে আটকে থাকবে, সে যে মুনাফা বা ফায়দা পাবে তার দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে, ব্যবহার করুক আর নাই করুক— তা আটকে রাখার দরুন ভাড়া বা মজুরীর ক্ষতিপূরণ দেয়া তার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে। আর তা-ই মুনাফার বিকল্প। প্রমাণিত হল যে, অন্যের মালিকানা আটকে রাখা ক্ষতিপূরণের সম্পর্কশূন্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী যুক্তি দিয়েছেন যে, তা একটি আমানত। হাদীসের দলীল হচ্ছে, ইবনে আবূ যুয়াইব জুহরি— সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ রিহন যে রেখেছে, তার নিকট থেকে তা আটকানো যাবে না। তার ক্ষতি তার এবং তার ক্ষতিপূরণ তাকেই করতে হবে। শাফেয়ী বলেছেন, ইবনুল মুসাইয়্যিব হাদীসটির সনদ আবূ হুরায়রা— নবী করীম (স) সূত্রে মুত্তাসিল বানিয়েছেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এ সনদকে মুত্তাসিল বানিয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনে আবূ উনায়সা। আর তাঁর কথা ঃ 'তার ক্ষতি তার, তার ক্ষতিপূরণ তাকেই দিতে হবে কথাটি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের। যেমন মালিক, ইউনুস ও ইবনে আবূ যুয়াইব ইবনে শিহাব— ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, রিহন আটকানো যাবে না। ইউনুস ইবনে জায়দ বলেছেন, ইবনে শিহাব বলেছেন। ইবনুল মুসাইয়্যিব বলতেন, রিহন তার, যে তা রেখেছে। তার ক্ষতি তার, তার ক্ষতিপূরণও তাকেই করতে হবে। ইবনে শিহাব জানিয়েছেন, এটা ইবনুল মুসাইয়্যিবের কথা, নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত নয়। ইবনুল মুসাইয়্যিব যদি তা

নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন না ঃ 'ইবনুল মুসাইয়্যিব বলতেন।' কথাটি ইবনুল মুসাইয়্যিবই বলতেন, কিন্তু তিনি নবী করীম (স) পর্যন্ত সূত্র স্থাপন করতেন। তাই শাফেয়ী তাঁর কথা ঃ 'ক্ষতি তার, জরিমানাও তাকে দিতে হবে' কে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এ কথার দ্বারা রিহনওয়ালার জন্যে তার বৃদ্ধি ওয়াজিব করেছেন, তার ক্ষতিটাও তারই উপর চাপিয়েছেন। আর ঋণটা তো তার আসল অবস্থায়ই রয়েছে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, তাঁর কথা ঃ 'রিহন আটকানো যাবে না' ইবরাহীম ও তায়ূস দুজনই এটার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা রিহন রাখতেন, বলতেন ঃ আমি তোমার নিকট মাল নিয়ে এসেছি আমুক সময় পর্যন্তকার জন্যে। অন্যথায় তা তোমার হয়ে যাবে।' নবী করীম (স) বলেছেন, 'রিহন' আটকানো যাবে না। ইমাম মালিক ও সুফিয়ানও এর এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। আবূ উবায়দ বলেছেন, রিহন বিনষ্ট হলে আরবী ভাষায় বলা হয় না ঃ قَدْغَلَقَ الرَّهْنُ 'রিহন আটকে দেয়া হয়েছে।' বরং রিহন গ্রহীতা যখন তা পাওয়ার যোগ্য তখন বলা হয় ঃ আটকে দেয়া হয়েছে। তখন সে তা নিয়ে যেত।

এটা ছিল জাহিলিয়াতের যুগের কথা। নবী করীম (স) তা বাতিল করে দিয়েছেন এ কথা বলে ঃ 'রিহন বন্ধ করা যাবে না, আটকানো যাবে না।' ভাষাভাষীরা বলত ঃ غَلَقَ الرَّهْنُ যখন তা অর্থহীন ও বিনিময়হীন ভাবে চলে যেত, তখন এ কথা বলত। .....।

'রিহন' আটকনো যায় না' কথাটির দুটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি তা যদি যথাযথ কায়েম থাকে, তা হলে 'রিহন' গ্রহীতা তা পাবে না মিয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর। আর দ্বিতীয়— তা ধ্বংস হলে বিনা বিনিময়ে যাবে না। আর لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ কথাটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের। কোন কোন বর্ণনাকারী তা বর্ণনার কথার মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন। কেউ কেউ সেটি আলাদা করেছেন এবং বলেছেন, কথাটি রাসূলে করীম (স)-এর নয়। ইমাম শাফেয়ী তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন— তার উপর বৃদ্ধি তার হবে, আর কমতিও তার হবে। এ ব্যাখ্যা ফিকাহবিদদের কথার বাইরের ভাষার ভুল বিশেষ। তা এজন্যে যে, غرم শব্দের আসল আভিধানিক অর্থ হল অনিবার্যতা, অবিচ্ছিন্নতা। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا -

জাহান্নামের আযাব অনিবার্য— অবিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়াবে।

অর্থাৎ তা বাধ্যতামূলক হবে, চিমটি কেটে লেগে থাকবে, কোন ক্রমেই ছেড়ে দেবে না। আর غريم হচ্ছে সে, যার দেয়া ঋণ পাওনা রয়েছে, তা তাকে অবশ্যই ফেরত পেতে হবে। এ-ও বলা হয় ঃ لَهُ الدَّيْنُ 'ঋণ তার দেয়া।' কেননা তাকে তা ফেরত পেতে হবে, তা পাওয়ার জন্যে তাকে দাবি করতে হবে। নবী করীম (স) المأثم والمغرم থেকে পানাহ চাইতেন। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন ঃ 'এক ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে'। এভাবে غرم শব্দটি অনিবার্য, নাছোড়বান্দা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঋণ যে দিয়েছে সে তা ফেরত পাওয়ার জন্যে অবশ্যই দাবি করবে। কুরাইসাতা ইবনুল মুখারিক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ -

লোকদের নিকট চাওয়া তিনটি কারণে হালাল হতে পারে। অতীব দুর্দশাগ্রস্ততার দারিদ্র্য, অপমানকর ঋণগ্রস্ততা ও বেদনাদায়ক রক্ত।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ -

দান-সাদকা-যাকাত ফকীরদের জন্যে।

তার এক পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ وَالْغَارِمِيْنَ 'ঋণগ্রস্ত লোকগণ'। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ অর্থাৎ বাধ্যতাকারী, ঋণসমূহের দাবিকারী। এ-ই হচ্ছে غرم শব্দের আসল অর্থ। আবূ উমর সালবের গোলাম, সালব—ইবনুল ই'রাবী সূত্রে বলেছেন غرم শব্দের অর্থ আবূ উমর বলেছেন, মাল নষ্ট বা ধ্বংস হওয়া ও তার ক্ষতি হওয়াকে غرم বলা হয়। এ কথা যারা বলে তারা ভুল করে। কেননা যার মাল চলে গেছে তাকে বলা হয় ফকীর। কিন্তু তাকে غريم বলা হয় না। কেননা غريم সে, যার উপর লোকদের জন্যে দাবি নিবদ্ধ হয়েছে। এ-ই যখন ব্যাপার, তখন وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ -এর অর্থ যে বলেছে 'তার ক্ষতি', সে ভুল করেছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এ হাদীসের বর্ণনাকারী। আগেই প্রমাণ করেছি যে, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ কথাটি আসলে তাঁরই। শাফেয়ী যা বলেছেন, সে ব্যাখ্যা তিনি করেন নি। কিন্তু তাঁর মাযহাব হল 'রিহন'-এর ক্ষতিপূরণ দান। আবদুর রহমান ইবনে আবূ জিনাদ তাঁর পিতা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়াতা, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান, খারিজা ইবনে জায়দ উবায়দুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ্ প্রমুখ বলেছেন, 'রিহন' তার সাথে যাতে তা দেয়া হয়েছে যখন তা ধ্বংস হবে ও তার মূল্য দিয়ে দেয়া হবে।' তাদের থেকে সিকাহ্ নবী করীম (স) পর্যন্ত উঠে যায়। অথচ একথা প্রমাণিত যে, সাঈদ ইবনুল মূসাইয়্যিবের মাযহাব হল, 'রিহন'-এর ক্ষতিপূরণ করা (ضمان الرهان) তাহলে (عليه غرمه) কথাটির অর্থ কি করে হতে পারে যে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না?

তা যদি রাসূলে করীম (স) বর্ণিত হয়ে থাকে, তা হলে নবী করীম (স)-এর উপর যে ব্যাখ্যা বর্ণনাকারী দিয়েছেন তা-ই হওয়া উচিত শাফেয়ী মাযহাবের ঘোষণা। কেননা তিনি কিরা-কসম ও সাক্ষীর বিষয়ে আমর ইবনে দীনারের কথাকে ধন-মালের ব্যাপারে অকাট্য দলীল মনে করে নিয়েছে। বলেছেন, ধন-মাল ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তার ভিত্তিতে ফায়সালা করা যাবে না। 'কুল্লাতাইন'-এর হাদীসে ইবনে কুরাইজের কথার ভিত্তিতে ফায়সালা করেছেন। আর ক্রয়-বিক্রয়ের দুই পক্ষের খেয়ার-ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে ইবনে উমরের মাযহাবকেই নবী করীম (স)-এর কথার তাৎপর্য ধরে নিয়েছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের পক্ষদ্বয়ের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত এ ইখতিয়ার থাকে। এ বিচ্ছিন্নতা শারীরিকভাবে হতে হবে। তাহলেই নবী করীম (স)-এর বক্তব্যানুরূপ ফায়সালা করা হবে। এ কারণে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের কথাকেই রাসূলে করীম (স)-এর কথার চূড়ান্ত তাৎপর্য মনে করাই তার কর্তব্য। অবশ্য 'তারই উপর ধার্য তার ক্ষতিপূরণ' কথাটি নবী করীম (স)-এরই প্রমাণিত হয়। আর لَهُ غُنْمُهُ কথাটির অর্থ হল, রিহনদাতা বাড়তিটা পাবে, আর 'রিহন' যে ঋণের কারণে তা তারই উপর বহাল

থাকবে। আর তাই হচ্ছে নবী করীম (স)-এর لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ কথাটির তাফসীর বা ব্যাখ্যা। কেননা তারা মনে করত যে, 'রিহ্‌ন' গ্রহীতা রিহ্‌ন-এর মালিক হয়ে যায় ঋণ ফেরত দেয়ার পূর্বেই যদি নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে যায় তখন। তাই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ -

অর্থাৎ ঋণদাতা রিহ্‌ন গ্রহীতা নির্দিষ্ট মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেই 'রিহ্‌ন' এর মালিক হয়ে যাবে না।

পরে এ কথার তাফসীর করা হয়েছে, রিহ্‌নদাতা তার অতিরিক্তটা পাবে। বলা হল—রিহ্‌ন গ্রহীতা মূল রিহ্‌ন-এর সম্পদটুকুই পাবে, তার উপর বাড়তিটা পাবে না। তার দেয়া ঋণ ঋণ গ্রহীতার উপর চাপানো থাকবে যেমন ছিল। আর তা-ই হচ্ছে তাঁর কথা وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ কথার তাৎপর্য। যেন বলাই হল, তার উপর ঋণটা থেকে যাবে। এ হাদীসেও রিহ্‌ন-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এমন কোন কথাই নেই। বরং এ হাদীসই প্রমাণ করে যে, তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে যেমন পূর্বে বলেছি।

আবূ বকর (র) বলেছেন, নবী করীম (স)-এর لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ কথাটি তো তখনকার জন্যে যখন দায়মুক্তির সময়ে ঋণ বাকী থাকার অবস্থার কথা বলতে চাওয়া হবে। আর নবী করীম (স)-এর বাতিলকরণ হল মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেই তার মালিকানা শর্তকে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হল ফাসিদ শর্তসমূহ 'রিহ্‌ন'কে নষ্ট করে না; বরং শর্তকেই বাতিল করে। এ-ও হতে পারে যে, নবী করীম (স) তাদের আরোপিত শর্তকে বাতিল করার জন্যেই এ কথাটি বলেছেন এবং রিহ্‌নকে জায়েয করেছেন। আর এ কথাও, 'রিহ্‌ন' সহীহ্ হওয়ার শর্ত হচ্ছে 'কবজ' হওয়া। যেমন হেবা ও সাদকা। বিভিন্ন শর্ত আরোপিত হলেও তা বিনষ্ট হয় না। তেমনি 'কবজ' ছাড়া যা সহীহ্ হয় না— যেমন হেবা ও সাদকা, তার হুকুমও এরূপ হওয়া উচিত যে, আরোপিত শর্তসমূহ তাকে নষ্ট করে না— দুটিরই সহীহ্ হওয়ার জন্যে 'কবজ' শর্ত হওয়ার কারণে।

এ হাদীস একথাও প্রমাণ করে যে, মালিক বানাবার চুক্তিসমূহে ঝুঁকি আরোপিত হয় না। কেননা মিয়াদ শেষে রিহ্‌ন-এর মালিক হওয়ার জন্যে তাদের আরোপিত শর্ত ছিল ঝুঁকির উপর ঝোলানো মালিক বানাবার ব্যাপার এবং ভাবিষ্যতের সময় আসার উপর। এভাবে মালিক বানিয়ে দেয়ার রীতিকে নবী করীম (স) বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে তা মালিক বানানোর সব চুক্তিতেই মৌলনীতি হয়ে দাঁড়ালো এবং ঝুঁকির উপর তার ঝুলে থাকা নিষিদ্ধ হওয়ার সম্পর্কহীনতার।

হানাফী ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে লোক বলে, আগামীকাল যখনই আসবে তখনই আমি তোমাকে ক্রীতদাস দান করে দিয়েছি। অথবা বলে তখন তা তোমার নিকট বিক্রয় করে দিয়েছি। এ ধরনের কথা বাতিল। এ ধরনের কথার দ্বারা মালিকানা হয় না। তেমনি, যদি বলে, যখন আগামীকাল এসে গেল, বুঝবে, তোমার উপর আমার যে ঋণ আছে তা থেকে তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি— এ কথাও বাতিল, অর্থহীন। তবে দাসমুক্তি দান ও তালাক ভিন্নতর ব্যাপার। কেননা এ দুটির ঝুকির উপর ঝুলে থাকা জায়েয। কেননা এ দুটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

গ্রহণের মৌল ভিন্ন ভিন্ন তর— অন্য আর একটি। তা হল, দাসমুক্তি দান পর্যায়ে আল্লাহ্‌ চুক্তি লেখার অনুমতি দিয়েছেন এই বলে ঃ

وَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا –

এবং তাদের সাথে মুক্তির চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ কর যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ জানতে পার।

তা এভাবে হয়, দাস মালিক বলে ঃ 'এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্তি দানের চুক্তিনামা আমি তোমাকে লিখে দিলাম। এক হাজার টাকা দিলেই তুমি মুক্ত। যদি তা দিতে অক্ষম হও, তাহলে তুমি ক্রীতদাসই থাকলে। এটা ঝুঁকির উপর ঝুলন্ত দাসমুক্তি এবং তা ভবিষ্যতের জন্যে। তালাক পর্যায়ে আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ –

অতঃপর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের ইদ্দতকে সামনে রেখে।

এ তালাক তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া ও সুন্নাত অনুযায়ী তালাক দেয়ার মধ্যে আয়াতে তো কোন পার্থক্য করা হয়নি। এ চুক্তি অর্থাৎ দাসমুক্তির চুক্তি যদি অর্থভিত্তিক হয়, এবং 'খুলা' তালাক হয় স্বামীকে মাল দেয়ার শর্তে, তাহলে প্রথম প্রস্তাব থেকে ফিরে যাওয়া যাবে না ক্রীতদাস ও স্ত্রীর তা কবুল করার পূর্বে। তাহলে দাসমুক্তিটাও একটা শর্তভিত্তিক কথা হয়ে দাঁড়াল। যেমন কিরা-কসমের শর্ত তা থেকে ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই।

আর এতেই রয়েছে বিভিন্ন শর্তের উপর ও দুটিকে ঝুলিয়ে দেয়া জায়েয হওয়ার দলীল। ভবিষ্যতে হওয়ার সময় নির্ধারণ করার। এ দুটির ক্ষেত্রে তার অর্থ হল, সে দুটি ঘটে যাওয়ার পর তা ভঙ্গ করা যাবে না। আর মালিক বানানো পর্যায়ের যত চুক্তির কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, সেসব সঙ্ঘটিত হওয়ার পর তা ভঙ্গ হতে পারে। এ কারণে এসবকে ঝুঁকির উপর ঝুলিয়ে দেয়া সহীহ্‌ নয়। রাসূল করীম (স)-এর কথা 'রিহন' বন্ধ করা যায় না' এর দৃষ্টান্তমূলক দলীল হচ্ছে আর একটা হাদীস। নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'মুনাবিযা' ও 'মুলামিসা' ধরনের বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। بيع الحصاة করতেও নিষেধ করেছেন। এ সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জাহিলিয়াতের যামানায় ব্যাপকভাবে চালু ছিল। কেউ যদি পণ্যদ্রব্য স্পর্শ করত অথবা তার মালিকের দিকে কাপড় নিক্ষেপ করত কিংবা তার পাথর-খণ্ড রেখে দিত, তাহলে তা বিক্রয় করা বাধ্যতামূলক হতো। ফলে মালিকানা লাভ হতো এমন উপায়ে যা কিছুমাত্র সঙ্গত ছিল না। ইজাব-কবুল ছাড়াই অপর একজন একটা কাজ করত। আর তাতেই তা কর্তব্য হয়ে দাঁড়াত। নবী করীম (স) এসব ক্রয়-বিক্রয়ের বাতিল করে দিয়েছেন। প্রমাণিত হল— মালিক বানাবার চুক্তি ঝুঁকির উপর ঝুলতে পারে না।

হানাফী ফিকাহবিদগণ রিহনকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জিনিস বানিয়েছেন তার কম-সে কম মূল্যে এবং ঋণেরও। অথচ পূর্বে তা কবজ করা হয়েছিল তা থেকে ঋণটা পুরা মাত্রায় আদায় করে নেয়ার উদ্দেশ্যে। অতএব যতটা দ্বারা সেই ঋণ পুরামাত্রায় আদায় হয়ে যায়, ততটাকেই সহীহ্‌ মনে করা বাঞ্ছনীয়। তার কম বা বেশি আদায় করে নেয়া জায়েয হতে পারে না। কাজেই বাড়তিটার জন্যে তাকে আমানতদার হতে হবে। আর ঋণ পরিমাণের কম হলে তা পূরণ করে

দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যেমন মনে করেছে, কম হোক বেশি হোক তা-ই ঋণের সম্পূর্ণ আদায়ের বিকল্প সে তাকে সেই বিক্রীত দ্রব্যের মত মনে করেছে, যা বিক্রেতার হাতে ধ্বংস হয়ে গেলে মূল্যের বিনিময়েই ধ্বংস হবে, কম হোক, কি বেশি হোক।

এ দুটির মধ্যে সমন্বয়কারী অর্থ হল, প্রত্যেকেই তার ঋণে বন্দী কিন্তু আমাদের মতে ব্যাপার তা নয়। কেননা পণ্য তো তার মূল্য দ্বারাই পরিপূরিত হয়—তা কম হোক, কি বেশী। কেননা পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে বিক্রয় ভঙ্গ হয়। তার মূল্যও থাকে না। কেননা বিক্রয় ভঙ্গ হওয়ার পর মূল্য অবশিষ্ট থাকা না-জায়েয। কিন্তু 'রিহন' বাবদ গচ্ছিত বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে তা সম্পূর্ণতা পায়, ভঙ্গ হয় না। তার দ্বারা ঋণ পুরাপুরি আদায় হয়ে যায়। অতএব তার ক্ষতিপূরণকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে।

যদি বলা হয়, ঋণের অতিরিক্ত যদি হয় 'রিহন বস্তুর মূল্য, তাহলে সেই অতিরিক্তটা আমানত হয়ে যায়। তাহলে গোটা 'রিহান'টাকেই 'আমানত' মনে করে নিতে পারছ না কেন? তখন তা ঋণের বিনিময়ে আটকে রাখা ঋণ আদায় করে নেয়ার জন্যে হবে না, তার ক্ষতিপূরণ দেয়াও ওয়াজিব হবে না। আমরা এ তাৎপর্য পাচ্ছি ঋণের অতিরিক্ত হওয়ার মধ্যে। তখনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। রিহন বাবদ দেয়া দাসীর গর্ভজাত সন্তান যেমন, যদি তা রিহন হিসেবে দেয়ার পর প্রসূত হয়ে থাকে, তখন তা রিহন গ্রহীতার হাতে মার সঙ্গে সঙ্গে আটক থাকবে। আর তা ধ্বংস হয়ে গেলে কিছুই দিতে হবে না। রিহন গ্রহীতার হাতে তার আটক থাকাটা তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার 'ইল্লাত' হবে না।

জবাবে বলা যাবে, 'হিরন'-এর মূল্য পরিমাণের তুলনায় ঋণ বেশি হয় ও রিহন বাবদ দেয়া দাসীর সন্তান হওয়া— দুটোই একটি মূল্যের অধীন। মূলকে বাদ দিয়ে সে দুটোকে আলাদা-আলাদা করা জায়েয নয়। যখন দুটোই অধীন হিসেবে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অবস্থা যখন তাই হবে, তখন ক্ষতিপূরণের দাবিতে সে দুটোকে আলাদা করা জায়েয হবে না। কেননা সন্তান প্রসবের ঘটনা সজ্ঘটিত হওয়ার পূর্বে পূর্ববর্তী চুক্তির সাহায্যে তাদের দুজনকে আলাদা করা নিষিদ্ধ। আর চুক্তিতে অনুসঙ্গ হিসেবে যে শামিল নয়, তার দ্বারা ওদের দুজনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা জায়েয হতে পারে না। লক্ষণীয়, 'উম্মে ওয়ালাদ' (যে দাসী মনিবের সন্তান প্রসব করে)-এর সন্তান মার হুকুমের মধ্যে শামিল হয়। তার জন্যে অনুসঙ্গ হিসেবে সন্তান প্রসবের অধিকার হয়। আর তাকে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এ অধিকারের ভিত্তিতে। অনুসঙ্গ হিসেবেও নয়। তেমনি যে দাসীর মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি হয়েছে তার সন্তানও সে চুক্তিতে শামিল ও গণ্য হবে। তা সে অবস্থায় চুক্তির বলে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন হওয়ার কারণে। রিহন পরিমাণে বাড়তি ও রিহন বাবদ রাখা দাসীর সন্তান-ও অনুরূপ, অনুসঙ্গত হিসেবে চুক্তির মধ্যে তারা গণ্য হবে না। এ কারণে তার হুকুমটা মূলের হুকুম বানানো বাধ্যতামূলক নয়। প্রথমে যে দুজনের উপর চুক্তি সূচিত হয়েছিল সেইভাবে সে দুজনকে জড়িতও করা যাবে না। কেউ যদি একটি ছাগী 'হাদিয়া' হিসেবে দেয়, পরে তার দেহ প্রবৃদ্ধি পায় কিংবা বাচ্চা প্রসব করে, তখন তা সেই বাচ্চাসহ 'হাদিয়া' দেয়া কর্তব্য। কেননা সেটা সেই 'হাদিয়ারই বাড়তি, সেটিরই সন্তান।' যদি বাড়তিটা চলে যায়, সন্তান ধ্বংস হয়, তাহলে এজন্যে তাকে কিছুই দিতে হবে না। শুধু তা-ই দিতে হবে, যা দেয়ার সে সিদ্ধান্ত করেছিল। তেমনি যদি মাঝারি ধরনের ছাগী দেয়া কর্তব্য হয়, আর সে দেয়া তার চাইতে উত্তম উঁচু ছাগী, এই বাড়তিটার

হুকুম প্রমাণিত— প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ মূল থাকবে। তা যবেহ করার আগেই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে বাড়তির হুকুম বাতিল হয়ে যাবে, তার যিম্মায় যা ছিল, তা-ই থেকে যাবে। তেমনি, বাড়তির বদল যদি সন্তান হয়, যা দাসী প্রসব করেছে, তা-ও এ অবস্থায় গণ্য হবে। রিহন রাখা দাসীর সন্তান-ও তেমনি, রিহন-এর মূল্যের বাড়তিটাও তা-ই। দুটো যতদিন থাকবে, ততদিনই সে দুটোর হুকুম এ-ই থাকবে। আর দুটোই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দুটোর হুকুমই প্রত্যাহৃত হবে।

'রিহন' দ্বারা উপকৃত হওয়া পর্যায়ে বিভিন্ন মত

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, আল-হাসান ইবনে যিয়াদ ও জুফর বলেছেন, রিহন গ্রহীতা ও রিহনদাতা দুজনার কোন একজনের পক্ষেও রিহন বাবদ দেয়া জিনিস ব্যবহার করা বা তার দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। তাঁরা বলেছেন, রিহন গ্রহীতা যদি রিহনদাতার অনুমতিক্রমে 'রিহনকে' (রিহন বাবাদ রাখা জিনিসকে) ভাড়ায় দেয় কিংবা দেয় রিহনদাতা রিহন গ্রহীতার অনুমতি নিয়ে, তাহলে তা রিহন থাকবে না, তা ফিরিয়েও নেয়া যাবে না।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, রিহন গ্রহীতা যদি রিহনদাতার অনুমতি নিয়ে ভাড়ায় লাগায় তাহলে তা তার রিহন অবস্থায়ই থাকবে। আর আয়টা রিহন গ্রহীতার পাওনা আদায়ে কাটা যাবে। ইবনুল কাসিম বলেছেন, ইমাম মালিকের মত হল, রিহন গ্রহীতা যদি রিহন ও রিহনদাতার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন সে রিহন ভাড়ায় দিতে পারে; কিংবা নিজে তাতে বাস করতে পারে, অথবা তা ধার দিতে পারে— যা-ই করুক, তখন তা 'রিহন' থাকবে না। রিহন গ্রহীতা যদি তা রিহনদাতার অনুমতিক্রমে ভাড়ায় লাগায়, তাহলে তা 'রিহন' থেকে যাবে। তেমনি রিহন গ্রহীতা যদি রিহনদাতার অনুমতিক্রমে ধারে দেয়, তাহলে তা রিহন অবস্থাই থাকবে। তবে রিহন গ্রহীতা যদি রিহনদাতার অনুমতিক্রমে ভাড়ায় দেয়, তাহলে ভাড়াটা রিহন-এর মালিক (যদি তা জমি হয়) পাবে। ভাড়াটা রিহন-হিসেবে তার 'হক' হয়ে যাবে না। তবে রিহন গ্রহীতা আগেই যদি তার শর্ত করে থাকে তবে ভিন্ন কথা। কেননা বিক্রয়ে যদি শর্ত করা হয় যে, বিক্রেতা তা রিহন দেবে এবং ভাড়া থেকে তা, 'হক' আদায় করে নেবে। ইমাম মালিক এটাকে মাকরূহ মনে করেছেন। বিক্রয়ে যদি তার শর্ত করা না হয় এবং রিহনদাতা বিক্রয়ের পর তা দান করে, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। আর বিক্রয় যদি এ শর্তে একটা জানা মিয়াদ পর্যন্তকার জন্যে হয় অথবা বিক্রেতা যদি তাতে রিহন বিক্রয়ের শর্ত করে যে, সে তার 'হক' এভাবে আদায় করে নেবে, ইমাম মালিকের মতে তা জায়েয হবে। ঘর-বাড়ি ও জমি-জায়গা ক্ষেত্রেই তা সমান। তবে জন্তু-জানোয়ারের বেলায় তা মাকরূহ বলেছেন। মুয়াফী সওরীর মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি 'রিহন' থেকে কোনরূপ উপকৃত হওয়াকে মাকরূহ মনে করেছেন। কোন গ্রন্থ রিহন বাবদ রাখা হলে তা পড়াও যাবে না। আওজায়ী বলেছেন, রিহন-এর আয় তার মালিকের প্রাপ্য। তা থেকে তারই জন্যে ব্যয় করতে হবে। বাড়তিটা তার হবে। যদি মুনাফা না হয় এবং সে তার খিদমত গ্রহণ করছিল, তাহলে তার খাবারটা হবে তার খিদমতের বিনিময়ে। আর যদি তার খিদমত না নেয়, তাহলে তার ব্যয়টা তার মালিককে বহন করতে হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, 'রিহন' ব্যবহার

করা যাবে না, তদ্দ্বারা উপকার গ্রহণ করা যাবে না। তবে রিহ্‌ন যদি এমন ঘর হয় যা খারাপ হয়ে যেতে পারে, এ জন্যে রিহ্‌ন গ্রহীতা তাতে বসবাস করে, তা থেকে ফায়দা সে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, সে চায় ঘরটাকে ভালোভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করতে, তাহলে জায়েয হবে।

ইবনে আবূ লায়লা বলেছেন, 'রিহ্‌ন' বাবদ দেয়া আংটি যদি রিহ্‌ন গ্রহীতা নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি তা শুধু দখলে রাখার নিয়তে পরে, তাহলে কিছুই দিতে হবে না। লায়স ইবনে সাদ বলেছেন, রিহ্‌ন বাবদ দেয়া গোলামের খিদমত লওয়া হয় তাকে খাবার খাওয়ানোর বিনিময়ে,— ব্যয় যদি তার কাজের সমান হয় তাহলে দোষ হবে না। তবে কাজের মূল্য যদি খাওয়ার খরচের অধিক হয়, তাহলে রিহ্‌ন গ্রহীতার নিকট থেকে সেই অতিরিক্তটা নিয়ে নিতে হবে।

আল-মুজানী শাফেয়ীর এ মত রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস ঃ

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ -

রিহ্‌ন বাবদ রাখা জন্তুর দুধ দোহানো হবে, তার পিঠে সওয়ারও হওয়ার যাবে—

এর অর্থ সম্পর্কে এই যে, রিহ্‌ন যদি যান হিসেবে ব্যবহার্য হয় ও হয় ঘর-বাড়ি, তাহলে তার পিঠ ও ঘর থেকে বিরত রাখা যাবে না। রিহ্‌নদাতার জন্যে দাসের খিদমত নেয়া, জন্তুর পিঠে সওয়ার হওয়া জায়েয। তার দুধও দোহন করা যাবে। পশম কাটা যাবে। রাত্রি বেলায় তা রিহ্‌ন গ্রহীতার নিকট সোপর্দ করা যাবে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ যখন বলেছেন ঃ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ তাহলে এমন রিহ্‌ন-এর বিনিময়ে ঋণ নেয়া যাবে, যা ঋণদাতা নিজের দখলে নেবে। ঋণদাতার রিহ্‌ন-এর মালটা 'কবজ' করবে এটা রিহ্‌ন-এর পরিচিতি— শর্ত। এ 'কবজ'-এর 'হক' হওয়া রিহ্‌ন বাতিল করার কারণ হতে পারে। তাই দুজনার কোন একজন যদি অপরজনের অনুমতিক্রমে রিহ্‌ন ভাড়ায় লাগায়, তাহলে রিহ্‌ন থেকে বাইরে চলে যাবে। কেননা ভাড়ায় গ্রহণকারী সেই 'কবজ' করার অধিকারী হয়েছে যদ্দ্বারা রিহ্‌ন সহীহ্ হয়। আমাদের মতে তা ধারের মত নয়। কেননা ধার 'কবজ'-এর অধিকার হওয়ার কারণ হয় না। কেননা ধারদাতা তার ধারে দেয়া জিনিস যে কোন সময় নিজ হাতে ফেরত নিতে পারে, যখনই সে ইচ্ছা করবে।

যে লোক 'রিহ্‌ন' বাবদ গচ্ছিত জিনিসি ব্যবহার করা ও তা থেকে ফায়দা লাভ করা জায়েয বলেছেন, তাঁরা দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে বকর, আবূ দাঊদ, হাম্মাদ, ইবনুল মুবারক যাকারিয়া, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفْقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا -

দুধ তার খরচেই তাকে দোহন করতে হবে যদি তা রিহ্‌ন বাবদ রাখা হয়ে থাকে। পিঠ অবশ্যই তার উপর আরোহন করা হবে— তারই ব্যয় যদি তা 'রিহ্‌ন' হয়ে থাকে। যে লোক যানবাহন হিসেবে তা ব্যবহার করবে বা দুধ দোহাবে, খরচ তাকেই বহন করতে হবে।

এ হাদীসের বক্তব্য হল, খরচ বহন করার দায়িত্ব আসবে তাকে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে তার দুধ পান করার জন্যে। আর একথা জানাই আছে যে, রিহনদাতাকে তার খরচ বহন করতে হয় এজন্যে যে, সে-ই তার মালিক। তার পিঠে সওয়ার হওয়ার কারণে নয়, তার দুধ পান করার জন্যে নয়। কেননা 'রিহন' বস্তু যদি এমন না হতো যা পিঠে সওয়ার হওয়া যায় বা তার দুধ পান না করা যায়, তা হলেও তাকেই তার খরচ বহন করতে হতো। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, হাদীসটির বক্তব্য হচ্ছে দুধ ও পিঠ রিহন গ্রহীতার জন্যে সেই খরচের বিনিময়ে যা সে 'রিহন'-এর জন্যে করে। একথা হুশাইম তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন। হাদীসটি তিনি যাকারিয়া ইবনে আবূ জায়েদা, শবী, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اذا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُوْنَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّيُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهَا، وَيَرْكَبُ -

কোন জন্তু রিহন রাখা হলে রিহন গ্রহীতার কর্তব্য তাকে ঘাস খাওয়ানো; জন্তুর দুধ দোহন ও পান করা যাবে। যে পান করবে, সে-ই তার বাবদ খরচও বহন করবে ও সওয়ার হবে।

এ হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, 'রিহন গ্রহীতাই খরচ বহন করতে বাধ্য'। সে-ই তার উপর সওয়ার হতে পারবে, তার দুধও খেতে পারবে।

শাফেয়ী বলেছেন, 'রিহন'-এর খরচ রিহনদাতা বহন করবে, রিহন গ্রহীতা নয়। উক্ত হাদীসটি তাঁর মতের বিপরীত কথা প্রমাণ করে। এটি তার পক্ষে দলীল নয়।

আল-হাসান ইবনে সালিহ্ ইসমাইল ইবনে আবূ খালিদ-শবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَايُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ -

রিহন থেকে কোন ফায়দাই গ্রহণ করা যাবে না।

শবী তাঁর বর্ণিত হাদীসে এ কথাটুকু বাদ দিয়েছেন। অথচ তা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে দুটি অর্থের যে কোন একটি বুঝতে হবে। হয় হাদীসটি মূলতই প্রমাণিত নয়। অথবা হাদীসটি প্রমাণিত; কিন্তু তা তাঁর মতে মন্‌সূখ; আমাদের মত-ও তাই। কেননা সে রকমের রিহন সূদ হারাম হওয়ার পূর্বে জায়েয ছিল। পরে সূদ যখন হারাম হয়ে গেল, জিনিসসমূহ তার যথার্থ পরিমাণের উপর স্থিত হল, তখন তা মনসূখ হয়ে গেল। পরবর্তীতে খরচকে দুধের বদল ধরা হয়েছে, তা কম হোক, কি বেশী। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে المصراة -এর হাদীস। জন্তু ফেরত দেবে আর সেই সাথে একশ' খেজুরও দেবে। দুধের পরিমাণ কত, তার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য দেয়া হয়নি। আমাদের মতে তা-ও মনসূখ হয়ে গেছে সূদ হারাম হওয়ার কারণে। রিহনদাতার জন্যে জন্তুর পিঠে সওয়ার হওয়া ও দুধ নেয়া ওয়াজিব বলে যাঁরা মত দিয়েছেন, উপরোক্ত দলীল সে মতকে বাতিল প্রমাণ করেছে। কেননা আল্লাহ্ রিহন-এর একটা বড় পরিচয় দিয়েছেন, তা রিহন গ্রহীতা কর্তৃক 'কবজ' হতে হবে। যেমন সাক্ষ্যের একটা বড় পরিচয় হচ্ছে— সততা-ন্যায়পরায়ণতা সম্পন্ন হওয়া। এক আয়াতে বলেছেন ঃ

اثْنَانِ ذَوَاعَدْلٍ مِنْكُمْ -

তোমাদের মধ্য থেকে দুজন সততা-ন্যায়পরায়ণতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্য থেকে সাক্ষী' হিসেবে যাদের পছন্দ কর তাদের থেকে।' একথা জানাই আছে যে, সাক্ষীর পরিচিতি না থাকলে তার সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতাই হয় না, তার সাক্ষ্য গৃহীতই হবে না। তেমনি 'রিহ্ন'-এর পরিচিতিই হল, তা রিহ্ন গ্রহীতা কর্তৃক 'কবজ' হতে হবে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণানুযায়ী। তাই সে পরিচিতি যখন অনুপস্থিত হবে, তখন তা রিহ্ন হবে না।— সে পরিচিতিটি হবে 'কবজ' করার অধিকার হওয়া। রিহ্নদাতা যদি তা 'কবজ' করার অধিকারী হয়— যার দ্বারা রিহ্ন সহীহ্ হয়, তাহলে তা শুরুতে সহীহ্ হতে পারে না। কেননা নিকটে হয়েছে তা, যা তাকে বাতিল করে। আর শুরুতে তা সহীহ্ হলেও তা বাতিল হওয়া জরুরী হবে তার কবজ করার অধিকার হওয়ার কারণে। তাই তা তার হাতে ফিরিয়ে দেয়াই কর্তব্য।

উপরন্তু সকলেই একমত এ ব্যাপারে যে, রিহ্নদাতার জন্যে রিহ্ন বাবদ দেয়া দাসীর সাথে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। আর সঙ্গম হল রিহ্ন থেকে পাওয়া ফায়দা। অতএব সব প্রকারের ফায়দার ব্যাপারেই এ হুকুম কার্যকর হওয়া জরুরী। অর্থ রিহ্ন-এর উপর রিহ্ন দাতার কোন হক থাকবে না। অন্যদিক দিয়ে কথা হল, রিহ্নদাতা রিহ্ন-এর দাসীর সাথে সঙ্গম করতে পারবে না এজন্যে যে, রিহ্ন গ্রহীতার অধিকার রয়েছে তার উপর তার 'কবজ' প্রতিষ্ঠিত করার। খিদমত লওয়ারও।

মিয়াদ শেষে রিহ্ন-এর মালিক হবে রিহ্ন গ্রহীতা— রিহ্ন দেয়ার সময় এরূপ শর্ত করা সম্পর্কে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, যুবায়র ও আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, যখন কোন কিছু 'রিহ্ন' বাবদ রাখবে, বলবে, এক মাসের মধ্যে আমি যদি ঋণ ফেরত দিই তাহলে তো ভালই, অন্যথায় 'রিহ্ন'টা তোমার হয়ে যাবে। তাহলে রিহ্ন জায়েয হবে। শর্তটি বাতিল গণ্য হবে।

মালিক (র) বলেছেন, 'রিহ্ন' বিনষ্ট হয়ে যাবে, ভেঙ্গে যাবে। যদি ভেঙ্গে না যায়, আর মিয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে সে শর্তের কারণে রিহ্ন গ্রহীতার পক্ষে রিহ্ন আটক করে রাখার অধিকারী হবে না। যদিও সে অন্যান্য পাওনাদারদের তুলনায় সে জিনিসটির উপর বেশি অধিকারী। তার হাতে যদি তাতে কোন বিকৃতি ঘটে তাহলে সে তা ফেরত দিতে পারবে না। তার মূল্য দিতে সে বাধ্য হবে মিয়াদ শেষ হওয়ার দিন। একথা পণ্যদ্রব্য ও জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে। কিন্তু রিহ্ন যদি ঘর-বাড়ি বা জমি হয়, তাহলে সে তা রিহ্নদাতার নিকট ফেরত দেবে তা তুলে ধরা হলেও। অন্যথায় তা ভেঙ্গে ফেলা হবে, যা সেখানে নতুন নির্মাণ করা হবে বা জমিতে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এ সব ধ্বংস বা হারানোর পর্যায়ের কাজ। মূল্যটা দিতে হবে। যেমন বেঠিক বিক্রয় কাজে হয়ে থাকে।

মুয়াফী সওরীর বক্তব্য বলেছেন, যে লোক তার সঙ্গীর নিকট কিছু রিহ্ন রাখে এবং বলে, আমি যদি তোমার পাওনা না দিই তা হলে এ মাল তোমার— বলেছেন, এই রিহ্ন বন্ধ রাখা যাবে না। আল-হাসান ইবনে সালিহ বলেছেন, তাঁর একথা গ্রহণযোগ্য নয়। রুবাই শাফেয়ীর মত বলেছেন, যদি কেউ কিছু রিহ্ন রাখে এবং বলে, অমুক তারিখ পর্যন্ত তোমার পাওনা না

দিলেই এটা তোমার হয়ে যাবে, তাহলে এ রিহনটা বিক্রয় পর্যায়ের হয়ে যাবে, রিহন সহীহ্ হবে না। রিহন-এর জিনিস তার হয়ে যাবে, যে তা রেখেছে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মিয়াদ শেষ হয়ে গেলেই রিহন গ্রহীতা স্বতই রিহন-এর মালিক হয়ে যাবে না। রিহন কিভাবে জায়েয হয় এবং কিভাবে কেন নষ্ট হয়, এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। পূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি, রাসূলে করীম (স)-এর কথা ঃ 'রিহন বন্ধ করা যাবে না' এর অর্থ, মিয়াদ শেষ হলেই শর্ত থাকা সত্ত্বেও রিহন গ্রহীতা রিহন-এর মালিক হয়ে যাবে না। নবী করীম (স) 'তা বন্ধ করা যাবে না' বলে এই কথাটিই বলেছেন। তাকে আরোপিত শর্তের ভিত্তিতে 'রিহন' সহীহ্ হওয়াকে তিনি অস্বীকার করেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 'রিহন' তো সহীহ্ হবে, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কিয়াস-ও তাই বলে। এজন্যেই নবী করীম (স) সহীহ্ হবে, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কিয়াস-ও তাই বলে। এজন্যেই নবী করীম (স) শর্ত বাতিল করেছেন, আর 'হেবা'কে সহীহ্ বলেছেন। এ দুটির মধ্যে সমন্বয়কারী তাৎপর্য হল, এ দুটির কোনটিই শুধু চুক্তির বলে সহীহ্ হয়ে যাবে না 'কবজ' না হওয়া পর্যন্ত।

ঋণের পরিমাণ নিয়ে রিহনদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মতপার্থক্য হলে কি করা হবে, এ বিষয়েও ফিকাহবিদদের বিভিন্ন কথা রয়েছে। আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ, জুফর ও আল-হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন, রিহন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর রিহনদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ঋণের পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে রিহনদাতার কথাই গ্রহণ করতে হবে ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে। তবে সেই সাথে তাকে কিরা-কসমও করতে হবে। আল-হাসান ইবনে সালিহ, শাফেয়ী, ইবরাহীম নখয়ী ও উসমানুলবত্তীরও এ মত। তায়ূস বলেছেন, রিহন-এর মূল্য সম্পর্কে রিহন গ্রহীতার কথাকে সত্য মেনে নিতে হবে। সেই সাথে তাকে হলপ করতে হবে। আল-হাসান, কাতাদাতা, আল-হিকামের কথাও তাই। আয়াস ইবনে মুআবিয়া বলেছেন এই দুটি কথার মধ্যবর্তী একটি কথা। কথাটি হল, রিহনদাতার নিকট যদি অকাট্য প্রমাণ থাকে রিহন গ্রহীতাকে রিহন দেয়ার, তাহলে রিহনদাতার কথাই মানতে হবে। আর যদি কোন অকাট্য প্রমাণ তার নিকট না থাকে, তাহলে রিহন গ্রহীতার কথা মেনে নিতে হবে। কেননা সে ইচ্ছা করলে রিহন পাওয়ার কথাটাকেই অস্বীকার করতে পারে। আর যখন সে কিছুটা পাওয়ার কথা স্বীকার করছে, তার বিপরীতে কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নি, এমতাবস্থায় তার কথা মেনে না নিয়ে কোন পথ পাওয়া যায় না।

ইবনে অহব ইমাম মালিকের এ মত প্রকাশ করেছেন যে, ঋণ ও রিহন-এর ব্যাপারে রিহনদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে মতপার্থক্য হলে রিহন যদি রিহন গ্রহীতার পাওনা পরিমাণ হয়, তাহলে রিহন গ্রহীতা তা নিয়ে নেবে। এটাই উত্তম তার জন্যে। অবশ্য তাকে হলপ করতে হবে। তবে রিহনদাতা অন্য কিছু চাইলে ভিন্ন কথা। তখন তার প্রাপ্য তার উপর চাপানো হবে এবং সে তার রিহন নিয়ে নেবে।

ইবনুল কাসিম মালিকের এ মতের উল্লেখ করেছেন যে, রিহন-এর মূল্য ও তার ঋণের ব্যাপারে রিহন গ্রহীতার কথাকেই মেনে নিতে হবে। তবে ঋণের পরিমাণের অতিরিক্ত দাবি সত্য মানা যাবে না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا -

যার উপর প্রাপ্য ধার্য হচ্ছে, সে দলীল লেখাবে। তার উচিত তার রব্ব আল্লাহ্‌কে ভয় করা, এবং তা থেকে এক বিন্দু জিনিস কম করবে না।

এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, যার উপর ঋণ ধার্য হচ্ছে, কথা তারই গ্রহণ করতে হবে। কেননা মূল ঋণ পরিমাণে কম যা করার নসীহত তাকেই করা হয়েছে। বোঝা গেল, তার কথা গ্রহণ করার উপরই আয়াতটি গুরুত্বারোপ করেছে। নবী করীম (স)-এর কথাও তা-ই প্রমাণ করে ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ -

বাদীর কর্তব্য অকাট্য প্রমাণ পেশ করা। আর বিবাদীর কর্তব্য কিরা করা।

আলোচ্য সমস্যায় রিহন গ্রহীতা হল বাদী। কেননা সে তার দেয়া ঋণ ফেরত পেতে চায়। আর রিহনদাতা হল বিবাদী, ঋণের মামলার আসামী। কাজেই তার কথাই গ্রহণ করতে হবে নবী করীম (স)-এর ফরমান অনুযায়ী। উপরন্তু এখানে 'রিহন' যদি দেয়া না-ও হতো, তাহলেও যার উপর ঋণ ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে তার কথাই গ্রহণ করতে হতো। এটা সর্বসম্মত কথা। আর ঋণের বদলে যদি রিহন রাখা হয়, তাহলেও তা-ই হবে। কেননা রিহন দিলেই যে সে ঋণের মামলার আসামী হতে পারবে না— এমন কোন কথা নেই।

আবূ বকর (র) বলেছেন, ইমাম মালিকের মত সমর্থন করে কেউ কেউ যুক্তি পেশ করেছেন যে, তাঁর কথাই কুরআনের বাহ্যিক কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা কুরআনের কথা হল ঃ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ 'এমন রিহন যা 'কব্জ' করা হয়েছে।' এতে রিহন সাক্ষ্যের স্থানে দাঁড় করানো হয়েছে। যেমন যে ঋণ নিয়েছে সে ঋণ লওয়ার সময়ে কোন নির্ভরতার ব্যবস্থা করেনি। তার পরিমাণেরও কোন প্রমাণ রাখেনি, যার উপর ভিত্তি করে সাক্ষী দিতে পারে। সাক্ষী ও লিখিত দস্তাবেজ থেকেই তো ঋণের পরিমাণ নিশ্চিতরূপে জানা যেতে পারে। এমতাবস্থায় রিহনদাতার কথাকে সত্য মানা যাবে না। রিহনটাই সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে, যেন তার মূল্য দিয়ে ঋণটা আদায় হয়ে যায়। ঋণ যদি রিহনের মূল্য ছাড়িয়ে যায়, তার তো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। রিহন গ্রহীতা এখানে বাদী। আর রিহনদাতা হল বিবাদী।

আবূ বকর (র) বলেছেন— এ এক আশ্চর্যজনক যুক্তি প্রদর্শন। সে ধারণা করেছে সে যখন নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করেনি, রিহন গ্রহণ করেছে, তখন রিহনটাই প্রমাণকারী সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আর তাকেই কুরআনের কথার বাহ্যিক অর্থের সাথে সঙ্গতি সম্পন্ন বলে মনে করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তো স্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা ঋণ গ্রহীতা-রিহনাদাতার কথাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। যে সময় সাক্ষী বানাতে ও দস্তাবেজ লিখতে আদেশ করেছেন, তখনই তো রিহনদাতার কথা গ্রহণ করার কথা বলে দিয়েছেন। বাদী যদি বিবাদীর জন্যে কোন নিশ্চয়তার ব্যবস্থা না-ও করে থাকে, তবু বিবাদীর কথা গ্রহণীয় হওয়ার প্রতিবন্ধক কিছুই নেই। তাহলে নির্ভরতার না হলেও রিহন-এর উপর দৃঢ়তা স্থাপন করা হলে বিবাদীর কথা গ্রহণীয় হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক কি করে হতে পারে ? আর বাদী যা দাবি করবে তা-ই সত্য মেনে নিতে হবে, তারই বা কি কারণ

থাকতে পারে ? বিরোধী মতের লোক যে দাবি করেছেন, কুরআনের বাহ্যিক অর্থ তার কথা সমর্থন করে এবং রিহন গ্রহীতার নির্ভরতা গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়ার এই দাবি বরং কুরআনের অকাট্য দলীলের পরিপন্থী। এতদ্সত্ত্বেও তার মত কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে দাবি করা এক বিস্ময় উদ্রেককারী দাবি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কেননা যে অবস্থায় নির্ভরতা গ্রহণ করা হয়নি, তখন কুরআনেই লিখিত দলীল ও সাক্ষী গ্রহণ দ্বারা তাকে বলিষ্ঠ ও নিশ্চিত করার আদেশ করা হয়েছে। তাতেই বলা হয়েছে যে, মতপার্থক্য হলে বিবাদী— অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতার কথাই গ্রহণ করতে হবে। বিপরীত মতের লোক ধারণা করেছে যে, রিহন গ্রহণকালে যখন নির্ভরতা গ্রহণ করা হয়নি, তখন বাদী— অর্থাৎ ঋণদাতার কথাই গ্রহণ করতে হবে কিন্তু তা ঠিক নয়। তার এই মত কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করাই ঠিক নয়। তাতে কথার ভিত্তি এরূপ বানানো হয়েছে যে, নির্ভরতা গৃহীত না হলেও রিহন সেটাকে দৃঢ়তর করেছে। যেমন সাদকা দৃঢ়তর করে দেয়। ফলে রিহন সাক্ষ্যের স্থানে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তা কুরআনের কথা নয়। আমরা প্রমাণ দিয়েছি যে, তাদের কথা কুরআনের পরিপন্থী। তা একটি ধারণা, একটি কিয়াস। তাতে রিহন-এর ব্যাপারকে সাক্ষ্যের ব্যাপার বানিয়ে দেয়া হয়েছে ইল্লাতের দরুন। ঋণ গ্রহীতার উপর যে ঋণ রয়েছে, দুটি অবস্থায়ই তার কোন নির্ভরতা গ্রহণ করা হয়নি। কয়েকটি কারণেই তা একটি বাতিল কিয়াস হয়ে যায়। তার একটি— কুরআনে বাহ্যতই তা বাতিল করে দেয়। এ বিষয়ে পূর্বেই বলেছি। দ্বিতীয়— সকল ফিকাহবিদের ঐকমত্যের দ্বারা তা নস্যাৎ হয়ে গেছে। কেননা ব্যক্তির নিকট যদি কারো ঋণ বাবদ দেয়া টাকা পাওনা থাকে, সে তার নিকট থেকে কোন দায়িত্বশীল গ্রহণ করে, পরে দাতা গ্রহীতা— উভয়ের মধ্যে ঋণের পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে বিবাদীর কথাই চূড়ান্ত হবে তার উপর যা বাধ্যতামূলক হয় সেই বিষয়ে। দায়িত্বশীল গ্রহণ করে নির্ভরতা গ্রহণ করে না থাকলে ইল্লাতের দরুন বাদী— ঋণদাতার কথাকেই সত্য মানতে হবে, তা কিছুমাত্র জরুরী নয়। ফলে তার ইল্লাতটা কিফালতের দ্বারা নস্যাৎ হয়ে গেল। তৃতীয় বাদীর কথাকেই সত্য না মানার মূলে যে তাৎপর্য নিহিত, তা হল, সাক্ষীদের সাক্ষ্য অবশ্যই গৃহীত হবে, এর উপর যদি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তাদের সত্যতার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। তারা তার উল্লেখের চেয়েও বেশি পরিমাণের স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষ্য দিয়েছে। তা বাদীর দাবির তুলনায়ও পরিমাণে বেশি। ফলে তা বুদ্ধি সহকারে বিচারকের নিকট স্বীকারোক্তি করার মতই হয়ে গেল। রিহন এর মূল্য দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ঋণ বুঝি সেই পরিমাণের। কেননা বেশি ঋণের জন্যে কম মূল্যের রিহন দেয়া কিংবা কম পরিমাণের ঋণের জন্যে বেশি মূল্যের রিহন দেয়া যে জায়েয এবং তা হয়েও থাকে, এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। অন্য কথায় রিহন-এর মূল্য দ্বারা ঋণের পরিমাণ বোঝা যেতে পারে না। তাতে তার কোন প্রমাণও থাকে না। তাহলে রিহন সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কি করে ? তাদের এই কিয়াস যে ঠিক নয়, তা-ও প্রমাণিত হয়ে গেল। ঋণদাতা গ্রহীতা উভয়ই যদি একমত হয়ে বলে যে, ঋণ রিহন-এর মূল্যের চেয়ে কম, তাতে রিহন বাতিল হওয়ার কোন কারণ হতে পারে না।

আল্লাহ্র কথা ঃ

وَلَاتَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না। যে লোকই সাক্ষ্য গোপন করবে, তার হৃদয় অত্যন্ত পাপী।

আবূ বকর (র) বলেছেন, 'তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না' এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য। যদিও কথাটি পূর্ববর্তী কথার সাথে সংযোজিত। পূর্ববর্তী কথা সাক্ষী বানাবার আদেশ হয়েছে পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় করায় সময়। তা হলূ ঃ 'তোমরা সাক্ষী বানাও যখন তোমরা পরস্পর কেনা-বেচা করবে।' এ আদেশ সর্বপ্রকারে সাক্ষ্যদানের বেলায়। সাক্ষী তার সাক্ষ্য দিতে সর্বাবস্থায় বাধ্য। এ দায়িত্ব তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ -

এবং তোমরা সাক্ষ্য কায়েম কর আল্লাহ্‌র জন্যে।

আর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, সাক্ষ্যদাতা হও আল্লাহ্‌র জন্যে তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হলেও। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৫)

এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন। সাক্ষ্যদানের কাজ না করলে মানুষের অধিকার বিনষ্ট হওয়া অনিবার্য। তা যেমন বলেছি লিখিত দস্তাবেজে সাক্ষী হতে হবে যেমন, তেমনি তা প্রয়োজনের সময় যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিতও করতে হবে। এটা সব মুসলমানের জন্যে ফরযে কিফায়া। এই দুইজন সাক্ষী ছাড়া সাক্ষ্য দেয়ার আর কোন লোক না থাকলে— না পাওয়া গেলে এ ফরয আদায় করা এ দুইজন সাক্ষীর জন্যে 'ফরযে আইন'— সুনির্দিষ্ট ফরয হয়ে যাবে। অন্যথায় আয়াতে যে কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে, তা কার্যকর হবে এ দুজনের উপর সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করার অপর অর্থ, সাক্ষ্য দেয়া অবশ্য কর্তব্য। বরং আল্লাহ্ এই ফরযকে অধিকতর তাগিদপূর্ণ করে তুলেছেন এই বলে ঃ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ -

যে লোক সাক্ষ্য গোপন করবে, তার হৃদয় অত্যন্ত পাপী।

আয়াতটি পাপ বা গুনাহ হৃদয় হবে বলে ঘোষণা করেছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে গুনাহ্‌টা হবে তার, যে তা গোপন করবে। কিন্তু এই গুনাহটা হয় হৃদয়ের প্রবণতার কারণে। আর সাক্ষ্য গোপন করা নিয়তের ফলশ্রুতি। মুখে তা উচ্চারণ না করার সংকল্প গ্রহণ করলেই তা গোপন করা হয়। আর নিয়ত বা সংকল্প গ্রহণ তো হৃদয়ের কাজ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সাক্ষ্য গোপনকারী দুটি দিক দিয়ে গুনাহ্ করে। একটি হচ্ছে, তার সংকল্প গ্রহণ, সে সাক্ষ্য দেবে না এই ব্যাপারে। আর দ্বিতীয়, মুখে সাক্ষ্য না দেয়া। 'তার হৃদয়টা অত্যন্ত পাপী' কথাটি প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বরং কথাটি অতিশয় তাগিদপূর্ণ। প্রত্যক্ষ কথার তুলনায় তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। যদি বলা হতো, 'যে সাক্ষ্য গোপন করে সে পাপী' তাহলে কথাটি ততটা বলিষ্ঠ হতো না। আল্লাহ্‌র কঠোরতা এ ভাষায়ই অধিক মাত্রায় স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে। এটা কুরআনের অতি উচ্চ— উন্নতমানের বাচনভঙ্গী।

আবূ বকর (র) বলেছেন, ঋণ সংক্রান্ত আয়াত সমৃদ্ধ হয়েছে দস্তাবেজ লেখা, পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিদ্বয়কে সাক্ষী বানানো ও রিহন রাখার ব্যবস্থার দ্বারা। এ ব্যবস্থা ঈমানদার লোকদের দ্বীন ও

দুনিয়ার সামগ্রিক কল্যাণময়। দুনিয়ায় এর কল্যাণ হচ্ছে লোকদের পারস্পরিক কল্যাণের বিধান হিসেবে। ঝগড়া-বিবাদ ও ফাসাদের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা হিসেবে। মূলত এটা পারস্পরিক কারবারের ক্ষেত্রে অতীব কার্যকর সতর্কতার ব্যবস্থা। অন্যথায় পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও মারাত্মক ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আর তার ফলে দীনদারী নষ্ট হতে পারে যেমন, তেমনি দুনিয়া— অর্থাৎ বৈষয়িক জীবন হতে পারে বিপর্যস্ত, সংকটাপন্ন। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَاتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ -

তোমরা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। যদি হও, তাহলে তোমরা শৌর্যবীর্য হারিয়ে ফেলবে ও তোমাদের সাথে হিম্মত-বীরত্ব শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।

তা এভাবে বিবাদী ঋণ গ্রহীতা যখন জানবে যে, তার উপর ঋণ চাপানো আছে, তার সাক্ষী রয়েছে কিংবা দলীল-দস্তাবেজ লিখিত রয়েছে অথবা ঋণের বদলে রিহন রয়েছে— তা ঋণদাতার নিকট অকাট্য ও বস্তুগত প্রমাণ, যা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। তা হলে সে বিরুদ্ধতা বা ঋণ-অস্বীকার করার সাহস পাবে না। অন্তত তার মাত্রা অনেকখানি কম হয়ে দাঁড়াবে। সে জানবে, তার বিরোধ ও পাওনাদারের পাওনার পরিমাণ কম বলে তার কোন ফায়দা হবে না। বরং সাক্ষীদের সাক্ষ্য, লিখিত দস্তাবেজ ও অন্যান্য সতর্কতার ব্যবস্থা তার মিথ্যাবাদিতাকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেবে। কাজেই এ লিখিত দস্তাবেজ, সাক্ষী বানানো ও অন্যান্য ব্যবস্থা সবই ঋণদাতা, গ্রহীতা— উভয়ের জন্যেই কল্যাণের ব্যবস্থা— দুনিয়ার দিক দিয়েও, দ্বীন ও পরকালের দিক দিয়েও। কেননা তা না করলে ঋণ দাতার পাওনার পরিমাণ কম হয়ে যেতে পারে। তা কম না হলে ঋণ গ্রহীতার দ্বীনের দিক দিয়ে কল্যাণ। আর অস্বীকার করলে বা পরিমাণে কম করলে তার দ্বীনের দিক দিয়ে ক্ষতি। কেননা যা সে নিয়েছে, তাই ফেরত দেয়া তার কর্তব্য। তেমনি ঋণদাতার হাতে যখন অকাট্য প্রমাণ থাকবে, তার সাক্ষী থাকবে, তা সবই তার দেয়া ঋণের পরিমাণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেবে। আর না হলে, পাওনাদার ঋণ গ্রহীতার কথিত পরিমাণ না মানলে মুকাবিলা প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়াবে। ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে যাবে। অনেক সময় সে তার পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি দাবি করতে পারে। দুনিয়ায় এ রকমটা হওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ সব কারণেই নবী করীম (স)-এর ঘোষণায় 'অজ্ঞাত পরিমাণ' অনির্দিষ্ট মিয়াদের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। রাসূলের আগমনের পূর্বে সাধারণ যে নিয়মে বেচা-কেনা হয় তা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদেরই সৃষ্টি করত। ফলে পারস্পরিক বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা তীব্র, ব্যাপক ও মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। হিংসা-প্রতিহিংসা ভয়ংকর হয়ে যেত। আর এই কারণে জুয়া খেলা ও মাদক দ্রব্য পান নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা এ সবের ফলেই পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-প্রতিহিংসা এবং মারামারি খুনাখুনি হওয়া একান্তই অবধারিত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ -

শয়তান তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক ও সচেষ্ট এ মদ্যপান ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায় আল্লাহ্র যিক্র ও নামায থেকে। এক্ষণে প্রশ্ন হল তোমরা কি (মাদক ব্যবহার ও জুয়া খেলা থেকে) বিরত থাকবে? (সূরা মায়িদা ঃ ৯১)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যে এসব কাজ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছেন, তা এজন্যে, যেন তোমাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য, শত্রুতা ও দলাদলি না কর। তা ছাড়া ও কাজ করলে আল্লাহ্র যিক্র ও নামায থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে এ কারণে। এক্ষণে যে লোক আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী চলবে, তাঁর আদেশসমূহ যথারীতি পালন করবে ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বিরত থাকবে, সে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا - وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا اَجْرًا عَظِيْمًا - وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا -

আর তারা যদি কার্যত করে সেসব কাজ, যা করার জন্যে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তা হলে তাদের অতীব কল্যাণ হবে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হবে। আর তখন আমরা আমাদের নিকট থেকে তাদেরকে বিরাট শুভ ফলদান করব এবং তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করব। (সূরা আন-নিসা ঃ ৬৬-৬৮)

যেসব আয়াতে আল্লাহ্ মিয়াদি লেনদেনে দলীল-দস্তাবেজ লিখতে এবং ঋণ, চুক্তি এবং কখনো সাক্ষী বানাতে ও কখনো রিহন ভিত্তিক লেনদেন করতে আদেশ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ধন-সম্পদের সংরক্ষণ ও তা বিনষ্ট করা থেকে বাঁচানো। এ উদ্দেশ্যে এই নির্দেশটিও দেয়া হয়েছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا -

তোমরা নির্বোধ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদেরকে তোমাদের ধন-মাল দিও না, যাকে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫)

বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا -

এবং যারা ধন-সম্পদ ব্যয় কালে সীমালঙ্ঘন করে না, কার্পণ্যও করে না। বরং এই দুই প্রান্তিক অবস্থার মধ্যবর্তী নীতি অনুসরণ করে। (সূরা ফুরকান ঃ ৬৭)

বলেছেন ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا -

এবং তোমরা কোনরূপ বেহুদা খরচ করো না।

এসব আয়াতই প্রমাণ করে যে, ধন-মালের হেফাজত একান্তই কর্তব্য। তা বেহুদা ব্যয় করা ও বিনষ্ট করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (স) থেকেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস

বর্ণনায় কোন দোষে অভিযুক্ত নন এমন লোক মুয়ায ইবনুল মুসান্না মুসাদ্দাদ, বশর ইবনুল ফযল, আবদুল রহমান ইবনে ইসহাক, সাঈদুল মুকবেরী, আবূ হুরায়রাতা (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايُحِبُّ اللّٰهُ اِضَاعَةَ الْمَالِ وَلَا قِيْلَ وَلَا قَالَ -

আল্লাহ্ ধন-মালের বিনষ্টি ও ধ্বংস পছন্দ করেন না, না কথা কাটাকাটি।

অনুরূপ আর একজন নির্দোষ বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, মূসা ইবনে আবদুর রহমান, আল-মসরূক, হাসানুল জাফী, মুহাম্মাদ ইবনে সূকা, আরবাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, মুআবিয়া মুগীরা ইবনে শুবাকে লিখেছিলেন ঃ

اُكْتُبْ اِلَىَّ بِشَتَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَحَدُ -

তুমি আমার নিকট এমন কিছু লিখে পাঠাও, যা তুমি রাসূলে করীম (স) থেকে সরাসরি কোন মাধ্যম ছাড়াই শুনেছিলে।

তিনি বলেন, পরে আমি তাকে লিখে পাঠালাম ঃ

اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَاَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِيْ حَرَّمَ فَعُقُوْقُ الْاُمُّهَاتِ وَوَادُ الْبَنَاتِ وَلَاوَهَاتِ وَالثَّلَاثُ الَّتِىْ نَهَى عَنْهُنَّ فَقِيْلَ وَقَالَ وَالْحَافُ السُّوَالِ وَاَضَاعَةُ الْمَالِ -

আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তিনটি জিনিস হারাম করেছেন এবং তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। যে তিনটি হারাম করেছেন, তা হল— মাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করা এবং যা দেয়া দায়িত্ব তা না দেয়া। আর যে তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা হল— তর্ক বিতর্ক করা, জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চাওয়া এবং ধন-মাল বিনষ্ট করা।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ -

তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন।

আবূ বকর (র) বলেছেন, এই আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে এ আয়াত দ্বারা।

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -

আল্লাহ্ মানুষকে তার সাধ্যের অতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না (যে কাজেরই দায়িত্ব দেন, তা করার সাধ্য তার আছে)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকুল মিরওয়াজি আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই আল-জুরজানী, আবদুর রাযযাক, মামার কাতাদাতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর আর গোপন রাখো, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের নিকট থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন— আয়তটিকে মনসূখ করেছে এই আয়াত ঃ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনে আবূ রুবাই, আবদুর রাযযাক, মামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন আমি জুহরীকে বলেত শুনেছি , আয়াতটি ইবনে উমর (রা) পাঠ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। বলেছেন ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ -

আমাদের মন আমাদেরকে যা বলেছে সে বিষয়েও আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

এই বলে তিনি কাঁদতে থাকলেন। তাঁর কান্নার ধ্বনি শোনা গেল। তাঁর নিকট থেকে এক ব্যক্তি উঠে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল। সে তাঁর নিকট এই ঘটনার বিবরণ পেশ করল। তিনি সব শুনে বললেন, আল্লাহ ইবনে উমরের প্রতি রহমত করুন। এ আয়াতটি পড়ে সে যেমন কাতর হয়ে পড়েছে, অন্যান্য মুসলমানরাও তেমনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাই পরে নাযিল হল, 'আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের অতীত কাজের দায়িত্ব দেন না।'

শবী, আবূ উবায়দাতা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, উক্ত আয়াতের পর-পরই যে আয়াত রয়েছে তার দ্বারা উক্ত আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেল। আয়াতটি হল ঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ -

তার জন্যে তা-ই হবে যা সে উপার্জন করেছে। তার বিপক্ষেও তা-ই লিখিত ও ধার্য হবে, যা সে উপার্জন করেছে।

মুআবিয়া ইবনে সালিহ আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'তোমাদের মনে যা আছে, তা যদি তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, তা হলেও আল্লাহ তোমাদের নিকট তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন'— মর্মের আয়াতটি মনসূখ হয়ে যায়নি। তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন যখন সমগ্র সৃষ্টিকুলকে একত্রিত করবেন, তখন তিনি বলবেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে তোমাদের মনের যে সব গোপন কথা যা আমার ফেরেশতারাও জানে না— জানিয়ে দেব। পরে তিনি মুমিন লোকদেরকে তাদের মনের কথা জানিয়ে দেবেন এবং তাদের সে সব মনের কথা তিনি মাফ করে দেবেন। এ কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ - فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ -

আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। অতপর যাকে চাইবেন তিনি ক্ষমা করে দেবেন, আর যাকে চাইবেন আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ -

বরং তিনি পাকড়াও করবেন সেসবের জন্যে যা তোমাদের হৃদয়সমূহ উপার্জন করেছে। হৃদয় উপার্জন হচ্ছে, শোবাহ্-সন্দেহ ও মুনাফিকী।

রুবাই ইবনে আনাস থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। আমর ইবনে উবাইদ বলেছেন, আল-হাসান বলতেন, আয়াতটি দৃঢ় ভিত্তিক, মনসূখ নয়। মুজাহিদ থেকে বর্ণিত সন্দেহ ও দৃঢ় প্রত্যায়ের দিক দিয়ে আয়াতটি দৃঢ় ভিত্তিক, মনসূখ নয়।

আবূ বকর (র) বলেছেন, দুটি তাৎপর্যের কারণে আয়াতটি মনসূখ হতে পারে না। একটি আয়াতে যে বিষয়ে খবর দেয়া হয়েছে তা তখনই মনসূখ হতে পারে না। কেননা দেয়া খবরের মনসূখ হওয়া প্রাথমিক ও সূচনাকালীন ব্যাপার বোঝায়, কিন্তু আল্লাহ তো সর্ব জিনিসের চরম পরিণতি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। সূচনাকালীন অবস্থায় কিছু মনসূখ হওয়া জায়েয নয়। আর দ্বিতীয়, মানুষের সাধ্যের অতীত কোন কাজের দায়িত্ব তার উপর চাপানো কোন ক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না। কেননা তা নির্বুদ্ধিতা, নিরর্থক। আর আল্লাহ্ নির্বুদ্ধিতা ও নিরর্থক কাজ করার অনেক উর্ধ্বে মুক্ত ও পবিত্র। 'তা মনসূখ'— এ কথা যে লোক বর্ণনা করেছে সে মস্তবড় ভুল করেছে। বর্ণনাকারীর এ ভুল শব্দের বর্ণনায় ঘটেছে। এ হাদীসটির তাৎপর্য বর্ণনা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তার লক্ষ্য থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়ার সংশয় দূর করাই উদ্দেশ্য। মাকসাম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতটি সাক্ষ্য গোপন করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। ইকরামা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গেছে। এ দুজন ছাড়া অন্যরা বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত সর্ব ব্যাপারে প্রযোজ্য। এটা উত্তম কথা কেননা তা সাধারণত্বের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সাক্ষ্য ও সাক্ষ্য-বহির্ভূত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। হৃদয়ের উপার্জন পর্যায়ে অপর একটি আয়াত হচ্ছে ঃ

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ -

বরং তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন তোমাদের হৃদয়ের উপার্জনের কারণে। (সূরা বাকারা ঃ ২২৫)

বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

যারা ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা-চরিত্রহীনতা, যিনা-ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে উঠুক, এটা পছন্দ করে—ভালোবাসে, তাদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (আন-নূর ঃ ১৯)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ -

তাদের হৃদয়সমূহে রোগ রয়েছে। এ রোগ হল সংশয়-সন্দেহের রোগ, দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাবের রোগ।

যদি বলা হয়, নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَفَا الْأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ يَتَكَلَّمُوْا بِهِ أَوْيَعْمَلُوْا بِهِ -

আমার উম্মতের লোকদের মনে যেসব খারাপ কথার উদয় হয়; তা যতক্ষণ মুখে উচ্চারণ না করবে বা যতক্ষণ তদনুযায়ী কাজ না করবে, আল্লাহ্ তা মাফ করে দেবেন।

জবাবে বলা যাবে, এসব হচ্ছে সে সব হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত কথা, যা পালন করা বাধ্যতামূলক। এমতাবস্থায় দাসমুক্তি, স্ত্রী তালাক, বিক্রয়, সাদকা, হেবা ইত্যাদি কাজ শুধু নিয়ত দ্বারা সম্পন্ন হবে না। মুখে উচ্চারণ করতে হবে— অন্যথায় কার্যকর হবে না। আর আয়াতে যা বলা হয়েছে আল্লাহ্র পাকড়াও করার কথা, তা নিতান্ত আল্লাহ্ ও বান্দার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার। আল-হাসান ইবনে আতীয়াতা— তাঁর পিতা আতীয়াতা— ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, 'তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর আর গোপন রাখো, আল্লাহ্ তার হিসাব-নিকাশ করবেন'-এর তাৎপর্য হল, মানুষের গোপন কাজ ও প্রকাশ্য কাজ সব কিছুরই হিসাব-নিকাশ লওয়া হবে। ঈমানদার ব্যক্তির মনের ভালো কথা গোপন রাখবে তা কার্যত ভালোর জন্যে। সে যদি তা কাজে পরিণত করে, তাহলে তার জন্যে দশ নেকী লেখা হবে। আর যদি সে কার্যত করতে সক্ষম না-ও হয় তাহলেও তার জন্যে একটি নেকী লেখা হবে। কেননা সে ঈমানদার ব্যক্তি। আর আল্লাহ্ মুমিনদের গোপন ও প্রকাশ্য উভয় প্রকার কাজেই সন্তুষ্ট। তা যদি খারাপও হয়, আর তার মনে জেগে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি তা জানিয়ে দেবেন, যেদিন সকল গোপন তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সে যদি কার্যত তা না করে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ সে জন্যে তাকে পাকড়াও করবেন না। হ্যাঁ, কাজে পরিণত করলে তবেই তাতে তিনি বান্দাকে অবশ্যই পাকড়াও করবেন। তবে মাফও করে দেবেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ -

এরাই হচ্ছে সেই লোক, যাদের উত্তম কাজসমূহ আমরা কবুল করব এবং তাদের খারাপ কার্যাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করব। (সূরা আল-আহকাফ ঃ ১৬)

এ আয়াতটিরই ব্যাখ্যা হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর পূর্বোদ্ধৃত কথা, যাতে বলেছেন যে, মনে উদয় হওয়া খারাপ কথা মুখে কথিত ও উচ্চারিত না হওয়া বা তদনুযায়ী কাজ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -

আল্লাহ্ কাউকে এমন কাজের দায়িত্ব দেন না, যা করার সাধ্য তার নেই।

যে কাজ করার সাধ্য বান্দার নেই, সে কাজ করতে আল্লাহ্ হুকুম দেন না— দায়িত্ব চাপান না। যে কাজ করার সাধ্য বা শক্তি কিংবা ক্ষমতা বান্দার নেই, তিনি যদি সে কাজ করার হুকুম বা দায়িত্ব দেন, আর সে তা করতে কার্যত অক্ষম থেকে যায়, তাহলে সাধ্যাতীত কাজের

দায়িত্ব চাপানো হয়। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মত সম্পূর্ণ একমত যে, অক্ষম-চলা শক্তিহীন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ চলার হুকুম দেন না, অন্ধকে দেখবার হুকুম দেন না। দুই হাত কর্তিত ব্যক্তিকে শক্ত করে ধরার আদেশ করেন না। দেন না এই জন্যে যে, তা করার সাধ্য নেই তার। এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। রাসূলে করীম (স) থেকে এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الصَّلٰوةَ قَائِمًا فَغَيْرُ مُكَلَّفٍ لِلْقِيَامِ فِيْهَا، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْهَا قَاعِدًا فَغَيْرُ مُكَلَّفٍ لِلْقُعُوْدِ بَلْ يُصَلِّيْهَا عَلٰى جَنْبٍ يُوْمِيْ اِيْمَاءً، لِاَنَّهٗ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهَا اِلَّا عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ -

যে লোক দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম, সে নামাযে দাঁড়াতে বাধ্য নয়। যে বসে নামায আদায় করতে পারে না, সে বসে নামায আদায় করতে আদিষ্ট নয়। সে পার্শ্ব শুয়ে থেকে ইশারায় নামায আদায় করবে, কেননা সে এরূপ ছাড়া অন্য ভাবে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়।

যে লোক কার্যত কোন কাজ করতে পারে না, সে তা করতে শরীয়াত দ্বারাই আদিষ্ট নয়। অথচ কিছু সংখ্যক মূর্খ লোক এরূপ কাজের আদেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন বলে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। তারা ধারণা করে নিয়েছে. আল্লাহ্ যে কাজ যে ভাবে করতে আদেশ করেছেন সে কাজ তাকে সে ভাবেই করতে হবে, তা করবার ক্ষমতা তার থাক আর না-ই থাক। কিংবা যা করতে নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ করতে সে বাধ্য, তা ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হোক, আর না-ই হোক। এরূপ কথা বলে তারা আল্লাহ্র প্রতি সম্পূর্ণ মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ আল্লাহ্ নিজেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যে কাজ করার সাধ্য কারুর নেই, তা করার দায়িত্ব আল্লাহ তার উপর চাপান না। তাছাড়া সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিও বুঝে যে, এটা অত্যন্ত খারাপ যে, যা করার সাধ্যই নেই, তা করার নির্দেশ দেয়া হবে। যে লোক খারাপ-বীভৎস কাজ চিনে ও জানে, সে তা করার মুখাপেক্ষী নয়, সে তা করবে না। যে কাজ করার সাধ্য নেই, তা করা ফরয হলেও সে ফরয প্রত্যাহৃত হবে। কোন ফরয আদায় করতে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিংড়িয়ে, তার শেষ বিন্দুও ব্যয় করে দেবে, তা তার কর্তব্য নয়। যেমন থুরথুরে বৃদ্ধ, রোযা পালন তার সাধ্যের অতীত। করতে গেলে তার দেহের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হতে পারে। যদিও সে মরে যাবে এমন আশাংকা না-ও দেখা দেয়, তবু তার রোযা রাখা জরুরী নয়। কেননা সাধ্য-সামর্থের বাইরের কোন কাজের হুকুম আল্লাহ কাউকেই দেন নি। যে রোগীর রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়, সে রোযা রাখবে না। কেননা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকলে সে পানি ব্যবহার করবে না। কেননা তা সাধ্যের আয়াতের মধ্যে পড়ে না। আর যা সাধারণত নয়, তা করার দায়িত্ব আল্লাহ দেননি। যা করলে অসহনীয় কষ্ট হতে পারে, জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়তে পারে, তা-ও করতে আল্লাহ বলেন নি। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ -

আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করতেন।

নবী করীম (স)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ -

যে কাজে তোমাদের খুবই কষ্ট করতে হয়, তা তার নিকট দুঃসহ।

আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও আইন-বিধানে তা হচ্ছে স্থায়ী নিয়ম ও নীতি। তা চিরন্তন ও শাশ্বত। এই কথা বান্দার দো'আ হিসেবেও ঘোষিত হয়েছে ঃ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْاَخْطَاْنَا -

হে আমাদের রব্ব! আমরা যদি বিস্মৃত হই বা ভুল করে বসি, তাহলে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না।

আবূ বকর (র) বলেছেন, বিস্মৃতি দুই প্রকারের। একটি মানুষের কাজের ব্যাপারে আসে, যার কারণে সে কাজটি করা হয় না। এ অবস্থায় তার ওযর অগ্রহণীয় নয়। যদি তার দ্বারা কোন অপরাধ ঘটে যায় বিভ্রান্তির কারণে। আর দ্বিতীয় হল— আদেশ পালন না করা। এও এক প্রকারের বিস্মৃতি। তা সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার কারণে হতে পারে কিংবা ভুল বাখ্যা মনে বাসা বাধার কারণে হতে পারে, যদিও মূল কাজটি বাস্তবে সঙ্ঘটিত হয়নি ভুলবশত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র নিকট এই অবস্থায় কাজ ঘটে যাওয়ার জন্যে মাগফিরাত চাওয়ার অবকাশ রয়েছে। نسيان শব্দের একটি অর্থ ত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া। অভিধানেও এর অর্থ সুপরিচিত ও ব্যাপক ব্যবহৃত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ -

তারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ্ও তাদের ভুলে গেছেন।

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র আদেশ পালন করেনি। ফলে তার সওয়াব পাওয়ার অধিকারী তারা হয়নি। আল্লাহ্র ভুলে যাওয়ার কথাটি এ আয়াতে প্রথম কথার প্রতিকূলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا -

মন্দের প্রতিফল তার-ই মত মন্দ।

আল্লাহ্র কথা ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -

যে লোক তোমাদের প্রতি সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করবে, তোমরাও তার প্রতি সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ কর, যেমন সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ সে তোমাদের প্রতি করেছে।

আবূ বকর (র) বলেছেন, نسيان বিস্মৃতি স্মরণ বা স্মৃতির বিপরীত অর্থজ্ঞাপক। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার ব্যাপার শাস্তি পাওয়ার দিক দিয়ে। এরূপ ক্ষেত্রে শরীয়াত পালনের দায়িত্ব অর্পণ ব্যাহত। পরকালে তা নিয়ে পাকড়াও অসঙ্গত। এজন্যে নয় যে, তাতে ইবাদতের কোন হুকুম দেয়া হয়নি। কেননা নবী করীম (স) এ পর্যায়ের বহু ব্যাপারেই বাধ্যতামূলক হওয়ার হুকুম দৃঢ়ভাবে দিয়েছেন ভুল ও বিস্মৃতি সত্ত্বেও। মুসলিম উম্মাহ্ এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। রাসূলের এ কথাটি এ পর্যায়েরই, বলেছেন ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا -

যে লোক নামাযের সময় ঘুমিয়ে ছিল অথবা নামায পড়তে ভুলে গেছে, সে যেন তা আদায় করে যখন সে তার কথা স্মরণ করবে।

এর পরই তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -

এবং তোমরা নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্যে।

বোঝা গেল, 'আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর' কথাটি বলে আল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন, ভুলে যাওয়া কাজটা স্মরণকালে করার কথা।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ -

তুমি যখন ভুলে যাও তখন তোমার রব্বকে স্মরণ কর।

সব ভুলে যাওয়া ফরয কাযা করার ব্যাপারে এ একটা ব্যাপক ও সাধারণ হুকুম। রোযা রাখতে যে ভুলে যাওয়া, যাকাত দিতে ও অন্যান্য যাবতীয় ফরয কাজ করতে ভুলে যাওয়া নামায পড়তে ভুলে যাওয়ার মতই ব্যাপার। তার কথা স্মরণ হতেই তা আদায় করা বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেছেন, যে লোক নামাযে ভুল করে কথা বলবে, সে যেন ইচ্ছা করেই কথা বলেছে। কেননা আসল কথা হল, ফরয পালনের ব্যাপারে ভুল করে না করা ও ইচ্ছা করে না করা দুটোই সমান। তার কোনটি প্রত্যাহার করার ব্যাপারে ভুল যাওয়ার কোন প্রভাব নেই। তবে যে বিষয়ে توقيف শরীয়াতী ফায়সালা নাযিল হয়েছে তার কথা ভিন্ন। যে ভুল করে তাহারাত করেনি, আর যে ইচ্ছা করে করেনি, এ দুজনের মধ্যে কোন তফাত নেই। উভয় অবস্থায় নামায পড়লে তা বাতিল হয়ে যাবে। রমযান মাসের দিনের বেলা ভুল করে খাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা বলেছেন, সে রোযাকে অবশ্যই কাযা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা কিয়াসকে বাদ দিয়েছেন। এ পর্যায়ে হাদীস রয়েছে বলে তাঁরা কিয়াসের পরিবর্তে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যে ভুলে গেছে, সে তার ফরয আদায় করবে, যেভাবেই তা করতে পারে। যদিও ঠিক সেই অবস্থায় আল্লাহ্ তা করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেন নি। 'কাযা' করাও একটা ফরয। আল্লাহ্র দলীল দ্বারা তা বাধ্যতামূলক করেছেন। সে দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভুলে যাওয়ার কোন প্রভাব শুধু গুনাহ না হওয়ার ক্ষেত্রে মাত্র। ফরয বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে ভুলে যাওয়ার কোন প্রভাব নেই। নবী করীম (স)-এর কথা ঃ رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ 'আমার উম্মতের উপর থেকে ভুল ও বিস্মৃতি তুলে নেয়া হয়েছে' কথাটি শুধু গুনাহ না হওয়া পর্যন্তই সীমিত। মূল আদেশটা কিন্তু প্রত্যাহার করা হয়নি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত ও কাফফারা দেয়ার হুকুম দিয়েছেন, তা বাধ্যতামূলক। এ কারণেই নবী করীম (স) نسيان ভুলে যাওয়া ও خطا ভুল করাকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন— এ অর্থেই বুঝতে হবে।

কেউ যদি বলেন, তোমাদের মৌল নীতি হল জন্তু যবেহ্ করা কালে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা ফরয। যদি কেউ ইচ্ছা করে নাম উচ্চারণ না কর তা হলে জন্তুটা মৃত গণ্য হবে, খাওয়া হারাম হবে। আর যদি ভুলের কারণে নাম উচ্চারণ না করে, উচ্চারণ করতে ভুলে যায়, তা হলে জন্তু হালাল হবে— সেটা যবেহ হয়েছে বলা যাবে। তোমরাই এ ব্যক্তিকে তার মত মনে করো না যে ভুলবশত তাহারাত গ্রহণ না করেও নামায পড়ে ফেলেছে। তখন তার প্রতি আদেশ হচ্ছে তাহারাত সহকারে পুনরায় নামায পড়া এবং এটা চূড়ান্ত নিশ্চিত। নামাযে ভুল করে কথা বলার ব্যাপারটিও এমনি।

এ কথার জবাবে বলা যাবে, যে মুহূর্তে কেউ ভুলবশত একটি কাজ করেছে সেই অবস্থায় তাকে অন্য কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। স্মরণ হওয়ার পর তার জন্যে সেই ফরয পালনই কর্তব্য। এ একটা নতুন সূচনা। এ রূপই ব্যাপার যখন ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেনি। এজন্যে তার যবেহ সহীহ্ হবে। যবেহ করার এখানে অন্য কোন যবেহকৃত জন্তু আনা হয়নি। ফলে তার জন্যে তা বাধ্যতামূলক নয়, যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি পুনরায় করার জন্যে আদিষ্ট।

আল্লাহ্র কথা ঃ

لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ -

সে যা ভালো উপার্জন করেছে তা তার, যা মন্দ উপার্জন করেছে তা-ও তারই উপর চাপবে।

এটিও তেমনি কথা ঃ

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا -

প্রত্যেকটি মানুষ যাই উপার্জন করে, তা তারই উপর বর্তিবে। (সূরা আন'আম ঃ ১৬৪)

এটিও তেমনি ঃ

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى

মানুষের জন্যে নিশ্চিতভাবেই তা, যার জন্যে সে চেষ্টা করেছে। আর তার চেষ্টা নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে। (সূরা আন-নাজম ঃ ৩৯)

এসব আয়াতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে, যে শরীয়াত পালনে বাধ্য। তার যাবতীয় কাজ তার সাথেই সংশ্লিষ্ট। অন্য কারোর সঙ্গে নয়। কেউ নিজে নিজে করে অন্যের উপর চাপাতে পারে না, জায়েয নয়। তার অপরাধের জন্যে তাকেই পাকড়াও করা হবে, অন্য কাউকে নয়। নবী করীম (স) আবূ রমযাকে তার পুত্রের সঙ্গে দেখতে পেয়ে বললেন ঃ এ তোমার পুত্র? বললেন, হ্যাঁ। বললেন, তুমি তোমার কোন অপরাধ তার উপর চাপাতে পারবে না, সেও পারবে না তার কোন অপরাধ তোমার উপর চাপাতে। এ পর্যায়ে তাঁর ঘোষণা হল ঃ

لَايُؤَاخَذُ اَحَدٌ بِجَرِيْرَةِ اَبِيْهِ وَلَا بِجَرِيْرَةِ اَخِيْهِ -

কোন লোক তার পিতার অপরাধে পাকড়াও হবে না, তার ভাইয়ের অপরাধেও নয়।

বস্তুত এ এমন ন্যায়বিচার, যার বিপরীত কিছু কল্পনা করা যায় না, বিবেক-বুদ্ধি গ্রহণ করে না।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'তার জন্যে তা যা সে উপার্জন করে, তার উপর তা চাপবে যা সে উপার্জন করেছে।' এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কারোর কাজকর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না কোন বিচারকের সিদ্ধান্তক্রমে বা অন্য কারুর। তার মাল বিক্রয় করতে বা না করতে বাধ্য করা যাবে না। হ্যাঁ, কোন বিশেষ ব্যাপারে যদি দলীল পাওয়া যায়, তাহলে অন্য কথা।

ইমাম মালিকের একটি মত এই আয়াতের ভিত্তিতে বাতিল মনে করা যায়। বিষয়টি হল—যদি কেউ অন্য কারোর ঋণ তার আদেশ ছাড়া-ই আদায় করে দেয়, তার অধিকার আছে, তা সেই ব্যক্তির নিকট দাবি করতে পারে। এ মত বাতিল এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তার অর্জনকে তার নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। ভাল করলেও তার, মন্দ করলেও তার। অন্য কারোর উপর তা চাপানো যাবে না, অন্য কারোর জন্যে বাধ্যতামূলক করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا -

হে আমাদের রব্ব! তুমি আমাদের উপর দুর্বহ বোঝা চাপিও না, যেমন তা তুমি চাপিয়েছিলে আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর।

আয়াতের اصر শব্দের অর্থ বলা হয়েছে ভার, বোঝা। অভিধানে তার মূল হল, তার অর্থ হল inclination —স্নেহ, হৃদয়াবেগ। তা থেকেই হয় اواصرالرحم রিহম-এর বন্ধন, সম্পর্ক। কেননা মা' যার রিহম, সে স্নেহ বোধ করে। এর এক বচন اصرة ও اٰلْاصِرُ বলা হয়, তার অর্থ রশি, যা রাস্তার উপর দীর্ঘ করে ছাড়া হয়, বা কোন খালের উপর রাখা হয়, তার দ্বারা চলাচলকারীকে বাঁধা হয়। প্রবেশ করা থেকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়—তাদের নিকট থেকে শুল্ক বা কর ইত্যাদি আদায় করার জন্যে। لاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا-এর অর্থ চুক্তি, ওয়াদা, স্বীকৃতি। তা ব্যক্তির উপর ভারী ও দুর্বহ হয়ে দাঁড়ায়। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাতা থেকে এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে আয়াতটির তাৎপর্য তাই, যা এ আয়াতের তাৎপর্য ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَاجٍ -

আল্লাহ তোমাদের উপর দ্বীন পালনে কোন অসুবিধা চাপিয়ে দেন নি। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

جِئْتُكُمْ بِالْحَنْفِيَةِ السَّمْحَةِ -

আমি তোমাদের নিকট একমুখী সৌজন্যমূলক ও ক্ষমাশীলতার আদর্শ নিয়ে এসেছি।

তাঁর থেকেই বর্ণিত, বনী ইসরাঈলের লোকেরা নিজেদের উপর কঠোর আচরণ করেছে। ফলে আল্লাহ-ও তাদের উপর কঠোর নীতি চালু করেছেন।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ 'আমাদের উপর اصر চাপিয়ে দিও না'-এর অর্থ ভারী দুর্বহ দুঃসাধ্য কাজের আদেশ বা নিষেধ দিও না। যেমন আমাদের আগের লোকদের উপর তুমি চাপিয়ে দিয়েছিলে। এ কথা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে এ ভাষায় ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ -

নবী তাদের উপর থেকে দুর্বহ কাজের বোঝা ও বাধা-বন্ধন-শৃঙ্খল নামিয়ে দেয়, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৭)

এ সব ও এ ধরনের অপরাপর আয়াতকে দলীল বানিয়ে বলা হয়, কোন ব্যাপারেই লোকদের উপর বাধা, অসুবিধা, সংকীর্ণতা ও দুর্বহ বোঝা চাপানো যাবে না। অবশ্য এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তাঁরা এ নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা ও ইজতিহাদ করেছেন। আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হল যে, দ্বীন ইসলামে দুর্বহ বোঝা, সংকীর্ণতা ও বাধা-প্রতিবন্ধকতা নেই, চাপানোও যাবে না। যেমন তাহারাতে নিয়ত করাকে ওয়াজিব বা ফরয বলা, তাতে পরম্পরাকে ওয়াজিব বা ফরয মনে করা। এ ধারনের আরও যে সব কাজে মানুষকে কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, ইসলামে তার কোন অবকাশ নেই। উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতেই এ কথা বলা যায়।

আল্লাহ্‌র কথা ঃ

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ -

হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাদের উপর এমন কাজের দায়িত্ব চাপিও না, যা করার সাধ্য আমাদের নেই।

এ আয়াতের দুটি দিক আছে। একটি হল কঠিন ও দুর্বহ কাজের আদেশ করা। যেমন বনী ইসরাঈলীদের উপর চাপানো হয়েছিল। তাদেরকে নিজেদেরকেই হত্যা করতে বলা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় এমন কাজের আদেশ যা করা কঠিন, দুঃসাধ্য। যেমন, তুমি বলবে, আমি তার সাথে কথা বলতে পারি না, তাকে দেখতে পারি না। এ ধরনের কথায় বোঝা যায় না যে, কথা বলার বা দেখার আদপেই কোন ক্ষমতা নেই। এর অর্থ, তার পক্ষে তা করা কষ্টসাধ্য, ভারী বোঝাস্বরূপ। তা যদি হয়, তাহলে সে তারই মত হবে, যার কথা বলা বা দেখার সাধ্য নেই দূরত্বের কারণে। তার হৃদয় থেকে তাকে দেখা পছন্দ নয় বলে। যেমন আল্লাহ্‌র কথা ঃ

وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا -

ওরা শুনতে সক্ষম হচ্ছিল না। (সূরা কাহাফ ঃ ১০১)

অথচ ওদের সুস্থ দৃষ্টিশক্তি ছিল। তাই অর্থ হল, ওরা শুনাটাকে ভারী মনে করছিল। ফলে তারা অন্যদিকে ফিরে গেল। ফলে তারা শুনতে পায় না— এমন হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় দিকটি হল, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আযাব দিও না, যা সহ্য করার সাধ্য আমাদের নেই। আর এ দুটো অর্থ এক সঙ্গেই বক্তব্য হতে পারে। প্রকৃত কথা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

খায়রুন প্রকাশনী